ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

সূচীপত্র

অষ্টত্রিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ—১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

চিত্র-সূচী—মাসানুক্রমিক

শিল্পী—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত　　বুদ্ধ ও সন্ন্যাসী　　ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

পৌষ—১৩৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

শ্যাম ও শ্যামা

শ্রীনটবর দত্ত ভক্তিবিনোদ, পুরাতত্ত্বনিধি, ভাগবতরত্ন

শরদোৎফুল্লমল্লিকা পূর্ণিমায় দেবী যোগমায়ার উপাশ্রয়ে ভগবান্ শ্যামসুন্দর কৃষ্ণের রাসক্রীড়া—হেমন্তের কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়। শ্রীমদ্ভাগবতকার ব্যাসদেব তাহার সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

হেমন্তের কার্ত্তিকী তামসী অমাবস্যায় শ্যামামায়ের আবির্ভাব। চণ্ডমুণ্ডবধকালে কোপে দেবী অম্বিকার বদন মসীবর্ণ (অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ) হইল। অতঃপর—

ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥

দেবী কালিকা করালবদনা, অসিপাশধারিণী, পরন্তু তিনি ভীষণা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা—। যথা,

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয় বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥

শ্যামা কি কেবল করালবদনা, ভীষণা! তবে কেন লোকে ভীষণা ঐ শ্যামাকে পূজা করে, অর্চ্চনা করে, হৃদয়ে স্নেহময়ী জননীর আসনে বসায়?—তিনি যে বরাভয়া, অভয়া ও বরদা, শ্যামা এক করে অভয়া, অন্য করে বরদা। আর্ত্তসন্তানে মায়ের অভয়, বর যে মহামূল্য বস্তু। সন্তানকে শক্তিমান করিতে মহাশক্তির শক্তিই যে শ্রেষ্ঠ; তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেবাসুরের যুদ্ধ ও শ্রীশ্রীঅম্বিকার আবির্ভাব এবং শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থ।

শ্যাম শ্যামায় মধুর মিলন সংযোজনায় বাঙালী সাধক-বৃন্দের হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক-চিন্তা, অনুভাত্মক-জ্ঞান, রসাস্বাদন পরিস্ফুট হইয়াছিল এবং তাহা যেরূপে প্রকট ও

পরিবেশিত হইয়াছে তাহা অতুলনীয় এবং তাহা অভূতপূর্ব্ব। যথা—

আজ কেন কালী কদম্বের মূলে।
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে বামে হেলে॥
নরশিরহার লুকালে কোথায়?
বনফুলমালা গলেতে দোলে॥
বামকরে অসি ওগো মুক্তকেশি!
আজ করে বাঁশী রাধা রাধা বলে॥

ইহা শাক্ত ও বৈষ্ণবে মনোরম মিলনাত্মক। আবার দ্বন্দ্ব যে নাই, তাহা নহে। শুক-সারির দ্বন্দ্বের মত শাক্ত-বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে, তবে তাহা কলহ নহে; ত্রিতাপদগ্ধ জীব তাহা বুঝে না, বা বুঝিয়াও বুঝে না। শাক্ত ও বৈষ্ণবে দ্বন্দ্বও যেমন, মিলনও তেমনি, যেমন শুক সারির দ্বন্দ্ব; ইহার মধ্যে রাজনৈতিক মিলনরূপ প্রহেলিকা নাই, পাটোয়ারী বুদ্ধি বা বৃত্তি নাই। সুতরাং আসলে বিষয়টি দ্বন্দ্বাতীত। শ্যাম ও শ্যামা সম্পর্কে, তদ্বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক, সংক্ষিপ্ত ভাবেই তাহা করিতেছি, অন্যথায় শাক্ত ও বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব কোথায় এবং কিরূপ তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে এবং বুঝাইতে অসুবিধা ঘটিবে, বুঝা যাইবে না বলিলেও অসমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না।

কৃষ্ণনামগানে বিভোর সচল জগন্নাথ চৈতন্য মহাপ্রভু, দর্শন বন্দনাদি করিলেন শিয়ালী ভৈরবী দেবীর, দাক্ষিণাত্যে।

শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন।
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন॥

ইহা হইল প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। সাম্প্রতিক কি ঘটিয়াছে, তাহা দেখা যাউক।

কালীঘাটে (কলিকাতা) শ্রীশ্রীকালীমাতার নাট্যমন্দিরে বৈষ্ণব-সভার উদ্যোগে শাক্ত-বৈষ্ণব সম্মেলন অনুষ্ঠান। দেশবরেণ্য মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। শাক্ত ও বৈষ্ণব পণ্ডিতবৃন্দ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের ভাবধারায়-আবেগময়ী, হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন, কোথাও বিরোধ নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দবংশাবতংশ প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন মহোদয় করিলেন—শক্তিবাদের গূঢ়তত্ত্বের আলোচনা। শাক্ত ও বৈষ্ণবে কোলাকুলি, আনন্দাশ্রুতে সিক্ত। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় তাঁহার অভিভাষণ-মুখে প্রারম্ভেই বলিলেন—"আমি বহু সভায় যোগদান করিয়াছি, এখন বার্দ্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, কিন্তু শ্রীশ্রীকালীমাতার মন্দিরে অদ্যকার শাক্ত-বৈষ্ণব সম্মেলনে যোগদান করিয়া যে আনন্দ লাভ করিলাম, আমার জীবনে কোন সভায় সেরূপ আনন্দ পাই নাই।" সভাপতি মহোদয় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমন্বয়ে তত্ত্বও আলোচনা করেন। তৎকালে কালীনাম, কৃষ্ণনাম, গৌরনাম ও হরিনামের ঘন ঘন ধ্বনিতে শ্রীমন্দির মুখরিত হইতেছিল। শ্রীশ্রীকালীমাতার সর্ব্ববয়োজ্যেষ্ঠ এবং অতি বৃদ্ধ সেবায়েৎ—শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ হালদার মহাশয় বাহ্যহারা হইয়া সভাস্থলেই বৈষ্ণব-সভার সম্পাদককে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলিলেন—"ভাই! তুই আমাদের কে বল্ ত? এমন আনন্দের খনি লুকিয়ে রেখেছিলি!" এবং আর্দ্রস্বরে শাক্ত-বৈষ্ণব সম্মেলন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য ও সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করেন। কোথাও বিরোধ নাই, ইহাই ত শ্যাম শ্যামায় মিলন মাধুর্য্যের রসাস্বাদন।

সম্মেলনের উদ্বোধনে স্তোত্র পাঠ করিলেন—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল এবং বৈষ্ণব সভার অন্যতম সহঃ সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কানুপ্রিয় গোস্বামী। বৈষ্ণব-সভার সভাপতি অতিবৃদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় অসুস্থতাপ্রযুক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে না পারায়—একখানি লিপি এবং একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাগ্মিবর বৈষ্ণবকুলতিলক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, (সান্যাল) বি-এ, ভাগবতরত্ন, বৈষ্ণব সিদ্ধান্তভূষণ মহোদয় একখানি লিপি এবং "শ্রীরাধা ও শ্রীদুর্গা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-সভার অন্যতম সহঃ সভাপতি বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ রাধাবিনোদ গোস্বামী ভাগবতাচার্য্য মহোদয় কলিকাতার বাহিরে থাকায়, শুভেচ্ছা এবং শ্রীশ্রীকালীমাতার চরণারবিন্দে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সভার কার্য্যের প্রারম্ভে বৈষ্ণব-সভার সম্পাদক—শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থোক্ত—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে! লোকানাং বরদা ভব॥

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্ব বীজং পরমাঽসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতত্ত্বং বৈপ্রসন্নাভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

শ্লোক কয়টি সুরপঞ্চকে পাঠ করিয়া শাক্ত-বৈষ্ণব সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভাব বিষয়ে সংক্ষেপে তুলনামূলক আলোচনা করেন এবং বলেন—

এক ব্রহ্ম এক বেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ,
নাহি উচ্চ নাহি নীচ সবই একাকার।
অমূল্য এ মহানীতি বিশ্বপ্রেম মহাগীতি,
চৈতন্য প্রভাবে ভবে হইল প্রচার॥
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং সভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচিনন্দনঃ॥

তৎপরে সম্মেলন সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাস্থলে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ ছয় হাজার নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন, সাহিত্যিক, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি, সন্ন্যাসী, বৈরাগী, তান্ত্রিক এবং খৃষ্টীয় পাদ্রীও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। কোথাও বিরোধ নাই। অপরাহ্ন ৩টায় সম্মেলন সভার কার্য্যারম্ভ হয়, রাত্রি ৮টায় সভার কার্য্য শেষ হয় এবং কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। বৈষ্ণব-সভার কীর্ত্তনীয়া উড়িষ্যাবাসী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস গোস্বামী সদলে কীর্ত্তনগান আরম্ভ করিলেন—

আজ কৃষ্ণ কালী সেজেচে।
বনমালা পরিহরি,
মুণ্ডমালা প'রেচে॥

* * * *

প্রথম ছত্রটি গাহিতেই সভাস্থলস্থ সকলেই হর্ষ-চমকিত ও চমৎকৃত হয়েন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই গীতটি হইয়াছিল শ্রোতৃবৃন্দের বারম্বার অনুরোধে। এই সময়ে গৌরাঙ্গ নামে মাতোয়ারা কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত এম-এ সদলে সঙ্কীর্ত্তন মুখে যোগদান করেন, সঙ্কীর্ত্তনের রোল বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় শত শত নরনারী আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলে শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণ জনপূর্ণ হইয়া উঠে। কীর্ত্তনানন্দে সকলেই মাতোয়ারা। শাক্ত, বৈষ্ণব, গোস্বামী সকলের ললাটে দেবী কালিকার প্রসাদী সিন্দূর। বৈষ্ণব-সভার অন্যতম সহঃ সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া—শ্রীশ্রীকালীমাতার অন্যতম সেবায়েৎ অতি-বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ হালদার মহাশয়ের "গৌরহরি" বলিতে বলিতে নৃত্য, দুই বৃদ্ধের নৃত্য, চক্ষে জলধারা। অপূর্ব্ব দৃশ্য! বিরোধ কোথায়? ইহাইত শ্যামশ্যামায় মিলন মাধুর্য্য রসাস্বাদন। শ্রীশ্রীকালীমাতার সেবায়েৎ সমিতি, সেবায়েৎবৃন্দ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ ধুইয়া মুছিয়া পরিচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, বলির স্থানে দুর্গন্ধনাশক রাসায়নিক দ্রব্য ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দ, ব্যক্তিবর্গকে আদর-আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ১১টায় কীর্ত্তন শেষ হয়। ইহা সন ১৩৩৯ সালের কাহিনী এবং অত্র প্রবন্ধের মুখবন্ধ। অতঃপর মূল বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্যাম ও শ্যামা

শ্যাম ও শ্যামা বাঙলার, বাঙালীর ইষ্টদেবতা। শ্যাম ও শ্যামার মিলন মাধুর্য্যকে বাঙালী সাধকবৃন্দ, ভক্তমণ্ডলী যেরূপভাবে বুঝিয়াছেন, অন্তর্দৃষ্টির সহিত অনুভাত্মক জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ রসাস্বাদন বাঙলা দেশ ব্যতীত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্যাম ও শ্যামার মিলন মাধুর্য্য রসাস্বাদন এক বাঙালী সাধকবৃন্দের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়াছে, ইহা বাঙালীর সাধনোজ্জ্বল কীর্ত্তি, ভারতের অপূর্ব্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্যাম ও শ্যামার যুগলমিলন সাধনাতেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতে এ সকল কথা ও কাহিনী মনে রাখিতে হইবে।

বাঙলা তথা ভারতের প্রায় সকল তীর্থস্থানেই শ্যামা মায়ের পার্শ্বে শ্যামসুন্দর। ইহাই শাক্ত-বৈষ্ণবে মিলনের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যেমন শ্যাম তেমনি শ্যামা, যেমন কালা তেমনি কালী।
ভুবনমোহন যুগল মিলন অতুলন রূপ কৃষ্ণ-কালী॥
শ্যামের মুখে মোহন বাঁশী, শ্যামার মুখে মধুর হাসি।
মুণ্ডমালা করালীতে, মোহনমালা বনমালী॥

ভয় যেমন অভয় তেমন, মায়ের কোলেই জীবন মরণ।
মধুর ভীষণ মিলন রে ভাই! শ্যাম-শ্যামা কালায়-কালা॥

নন্দব্রজকুমারীগণ করিলেন দেবী মহামায়া কাত্যায়নীর অর্চ্চনা, ব্রত, মন্ত্রে বলিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে! মহাযোগিনাধীশ্বরী।
নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

সেজন্য শ্যামের ধাম বৃন্দাবনে ব্রজগোপিনীরূপে দেবী কাত্যায়নী বিরাজিতা। কাত্যায়নী কর্ত্তৃক অসুরেন্দ্র শুম্ভ নিহত হইলে বহ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রসহ দেবগণ ইষ্টলাভ-প্রযুক্ত প্রফুল্লবদন হইয়া সেই কাত্যায়নীকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া দেবী কাত্যায়নী বলিলেন—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে শুম্ভ এবং নিশুম্ভ নামক অন্য দুই মহাসুর উৎপন্ন হইবে। তদনন্তর আমি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে উৎপন্না এবং বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া সেই দুইজনকে নাশ করিব।" ইনিই ব্রজকুমারীগণের অর্চিতা দেবী কাত্যায়নী—

"নন্দগোপ গৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।"

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—বিশ্বাত্মা ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন, দেবি! গো ও গোপগণ শোভিত ব্রজে গমন কর। বসুদেবপত্নী রোহিণী গোকুলে নন্দগোপ-গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্তদেব নামে আমার অংশ রোহিণীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন। আমি পূর্ণরূপে দেবকীর উদরে জন্মগ্রহণ করিব এবং তুমিও নন্দগোপ-পত্নী যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। দুর্ম্মতি কংস বধোদ্দেশে তোমায় শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপকালে তুমি স্বপ্রকাশ হইবে। লোকে তোমাকে সকল কামনার অধীশ্বরী ও বরদাত্রী বলিয়া পূজা করিবে, পৃথিবীতে নানা স্থানে বিবিধ নামে পূজিত হইবে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থে মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিয়াছেন—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাহসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি! সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।

তুমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবী শক্তি, এজন্য বিশ্বের বীজ পরমা-মায়া-তুমি। হে দেবি! এই সমস্ত তোমা কর্ত্তৃক সম্মোহিত। প্রসন্না হইলে—তুমি জগতের মুক্তির হেতু।

"ভুবি" অর্থে এই ভূলোক। প্রাচীন টীকাকার গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই "ভুবি" কথাটির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"তীর্থাদিদেশবিষাগ্রহ পরিহারায়োক্তম্। ত্বয়ি প্রসন্নাং যত্র কুত্রাপি স্থিতস্য মুক্তির্ভবতি। তদুক্তং, বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্ত ইতি॥" সুতরাং মা জগদম্বাকে জানিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করাই প্রয়োজন। এজন্য তীর্থাদি দর্শন করার আবশ্যকতা করে না। মহামায়ার ইচ্ছা কি, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে। মায়ের ইচ্ছা বুঝিয়া সেই ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করাই মায়ের প্রসন্নতা-লাভ। এই প্রসন্নতা যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই বিদ্যাময়"। এই প্রসন্নতা যিনি লাভ করিতে পারেন নাই, যিনি মাকে জানেন না, মাকেও ভাবেন না, মাকে খোঁজেন না, যিনি কেবল এই 'আমি'টাকে লইয়াই আছেন, তিনি 'অবিদ্যাময়'। যিনি 'বিদ্যাময়' তিনি মুক্ত, আর যিনি 'অবিদ্যাময়' তিনি বদ্ধ। আর এই মহামায়াই বিদ্যা ও অবিদ্যা এই উভয় মূর্ত্তি ধরিয়া লীলা করিতেছেন। তিনি যখন বিদ্যারূপিণী, তখনই তিনি যোগমায়া।

মধুর কোমলকান্ত পদাবলী "গীত গোবিন্দ"এ সিদ্ধ কবি জয়দেব সরস্বতী দশাবতার স্তোত্রে ব্যক্ত করিলেন—

বসতি দশন-শিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না।
কেশবধৃত-শূকররূপ, জয় জগদীশ হরে॥

হে কেশব, হে বরাহরূপধারিণ্, সর্ব্বলোকধাত্রী এই ধরণী তোমার শুভ্রদন্তের অগ্রভাগে চন্দ্রমণ্ডলের কলঙ্করেখার ন্যায় লগ্ন হইয়া অবস্থিত। হে জগদীশঃ, হে হরেঃ, তুমি জয়যুক্ত হও।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিতেছেন—

গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

হে ভয়ঙ্কর-মহাচক্র গ্রহণকারিণি! দন্তদ্বারা বসুন্ধরা উদ্ধারকারিণি! বরাহরূপিণি! শিবে! নারায়ণি! তোমায় নমস্কার।

বিষ্ণু, নারায়ণ বা কৃষ্ণ আসিলেন, নৃসিংহরূপে—

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্
দলিত-হিরণ্যকশিপু-তনু-ভৃঙ্গম্।
কেশবধৃত-নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

(জয়দেব)

হে কেশব! হে নরসিংহরূপধারিণ্! তোমার শ্রেষ্ঠ করকমলে (কেশবের ন্যায়) অদ্ভুত শৃঙ্গ বা উগ্রভাগযুক্ত নখর হিরণ্যকশিপুর দেহরূপ ভৃঙ্গকে বিদলিত করিযাছে; হে কেশব! হে হরে। তুমি জয়যুক্ত হও।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বলিতেছেন—

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণ সহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

মা! তুমি অতি ভয়ঙ্কর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যকুলকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তুমি ত্রৈলোক্যত্রাণ-কারিণি! নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার।

নারায়ণ ও নারায়ণী একই তত্ত্ব, বরাহ ও বারাহী একই তত্ত্ব, একই বস্তু, নৃসিংহ নারসিংহীও ঠিক তাহাই। একজন পুরুষের দিক হইতে দেখিয়াছেন, একজন প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিয়াছেন। কিন্তু বস্তু এক, তত্ত্ব এক, সাধনও এক। এই ঐক্যজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। ঐক্যের ভূমিতে চিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যাবতীয় প্রভেদ ও পার্থক্যকে ঐ ঐক্যের আলোকে বুঝিয়া লইয়া হইবে। তাহা হইলেই আমরা আমাদের—সনাতনধর্ম্মের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিব।

ভারতে বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র (পুরী) এবং দ্বারকা বৈষ্ণবমণ্ডলীর পুণ্যতীর্থ এবং মহাপুরাণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পবিত্রস্থান। উপরোক্ত পুণ্যতীর্থগুলি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রধান স্থান হইলেও, বৃন্দাবনে মহামায়া দেবী কাত্যায়নী ব্রজযোগিনীরূপে বিরাজিতা; পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গণেই ভৈরবী দেবী বিমলা বিরাজিতা; নবদ্বীপে ধামেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরের একদিকে মহাকাল বৃদ্ধশিবের (বুড়াশিব) মন্দির, অপরদিকে ভৈরবী দেবী প্রৌঢ়ামাতা (পোড়া মা) বিরাজিতা; অদূরে শ্রীশ্রীশ্যামা মূর্ত্তির রূপদানকারী, সুবিখ্যাত "তন্ত্রসার" প্রণেতা তান্ত্রিকশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীআগমেশ্বরীর মন্দির। কেহ কখনও শাক্ত ও বৈষ্ণবে বিরোধ শোনেও নাই; বিরোধও নাই, পরন্তু আছে মিলন।

শ্রীনবদ্বীপধামে শাক্ত সম্প্রদায়ের পট-পূর্ণিমা পূজা, উৎসব—শাক্ত বৈষ্ণব মিলনের সাংবাৎসরিক উৎসব—মহাসমারোহে দেবী কালিকার পূজা, অর্চ্চনা। শ্রীশ্রীকালী পূজা, রক্ষাকালী পূজা অমাবস্যা তিথিতেই বিধি, কিন্তু এস্থলে পূর্ণিমা তিথিতে। অন্য পূর্ণিমাতে নহে, রাস-পূর্ণিমায়। একই দিনে শ্যামের রাসোৎসব ও শ্যামার পূজা, অর্চ্চনা, উৎসব, শ্যাম-শ্যামায় মিলন। শাক্ত বৈষ্ণবে কোন বিরোধ কোনদিন ঘটে নাই, দেখা দেয় নাই।

তত্ত্ব

বিভিন্ন শাস্ত্র অনুধাবন ও নিশ্চয়ানুসরণ করিলে জানা যায় যে, সকল আর্য্যশাস্ত্রেই বর্ণিত আছে—পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর, শক্তি বা মহামায়া বা প্রকৃতি এবং চৈতন্য এতদুভয়াত্মক; এই উভয় অংশের দ্বারা তিনি কেবল মনুষ্য নহে—দৃশ্যাদৃশ্যমান জগৎ, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নব নব ভাবে সৃষ্টি করিতেছেন। সৃজনের অন্ত বা শেষ নাই। শাস্ত্রমতে ভগবানের সেই সর্ব্বব্যাপক চৈতন্য অংশ—পুরুষাংশটি নিতান্ত নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ, তাঁহার কোনপ্রকার ক্রিয়ামাত্রও নাই এবং কোনপ্রকার গুণও নাই, যত কিছু ক্রিয়া, যত কিছু গুণ সমস্তই তাঁহার মায়াংশের বা প্রকৃত্যাংশের।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

নিজাংশকলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি॥
মায়াসঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্ন-রূপ।
জীবতত্ত্ব নহে, নহে কৃষ্ণের স্বরূপ॥

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতু শক্তঃ প্রভবিতুম্।
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াদি কার্য্য করিতে সক্ষম; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সক্ষম নহেন।

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি জন্মরহিত, অবিনাশী ও সকল ভুতের (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তের) ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় (শুদ্ধসত্বাত্মিকা) প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া নিজ মায়া দ্বারা (দেহধারীবৎ) আবির্ভূত হই অর্থাৎ স্বেচ্ছানুসারে নানারূপ শরীর ধারণ করি।

মায়া

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥
মায়াধীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ।
অন্তর্যামী চ সর্ব্বজ্ঞো জগদ্‌যোনিঃ স এব হি॥

মায়াকে প্রকৃতি এবং ঈশ্বরকে মায়াবিশিষ্ট পুরুষ বলিয়া জানিবে, তাঁহার অবয়ব সমুদায় জীব দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। শ্রুতিতে মায়ার অধীন সেই চিদাভাস—মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ এবং জগদ্‌যোনি রূপে উক্ত হইয়াছেন।

সৃষ্টিতত্ত্বে আর কিছু অগ্রসর হইলে আমরা অবগত হই—

পুরুষ ঈশ্বর যৈছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া।
বিশ্ব সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান হৈয়া॥
মায়ার যে দুই বৃত্তি "মায়া" আর "প্রধান"।
মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের "প্রধান" উপাদান॥
সেই পুরুষ মায়াপানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান॥
স্বাঙ্গত বিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥

মায়াদ্বারে সৃজে তিঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
জড়রূপাপ্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ড কারণ॥

মার্কণ্ডেয় পুরণান্তর্গতে শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্রহ্ম বলিয়াছেন—

অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চর্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি! জননী পরা॥

যাহা বিশেষতঃ অনুচ্চর্য্য (বাক্যাতীত) নিত্যস্থিত অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপ (ব্যঞ্জনবর্ণ), তাহা আপনিই; আপনি সাবিত্রী; হে দেবি! আপনি জননী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।

গীতায় পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

ময়াপ্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্॥

শ্রীভগবান কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া আমার স্বকীয় যোগমায়া প্রভাবে এই তেজোময়, বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, পরমরূপ তোমায় দেখাইলাম, আমার এই রূপ তুমি ভিন্ন অপর কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই।

অতএব, পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের সেই নিষ্ক্রিয় চৈতন্যাংশের বক্ষে থাকিয়া, তাঁহার সর্ব্বব্যাপিনী মায়া বা মায়াশক্তি বা প্রকৃতি অথাৎ পরাশক্তি বা পরমামায়া অনন্ত জগতে, সৃজনাদি কার্য্যের দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। এতদুভয়ই—
—শ্যাম ও শ্যামা।

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো—
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥

ক্ষমতা

জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত

ভূধরবাবু এত করিয়াও ব্রীজ কম্পিটিশনের ফাইনালে হারিয়া গেলেন। অথচ ভূধরবাবু ভালো খেলেন বলিয়া নাম আছে। সবাই বলিয়াছে, ভূধরবাবু ও তাঁর পার্টনারকে তাসে হারাইতে পারে সে-ক্ষমতা ওখানে অপ্রাপ্য। ভূধরবাবুও মনে মনে তাই জানিতেন। পার্টনারকে একান্তে বলিয়াছিলেন—আরে ছোঃ! হীরেন ঘোষ আর বিমল মুৎসুদ্দির বিরুদ্ধে খেলা!—ওদের এখনো কার্ড সেন্স্ই হয়নি। কিন্তু সেই হীরেন ও বিমল তাঁহার নাকের উপর দিয়া কাপ জিতিয়া নিল।

ভূধরবাবু এম্নি খুব ধীর-স্থির। বাইরের বদভ্যাস কিছু নাই; শুধু কোর্টে বিচার করেন আর সান্ধ্য ক্লাবে নিয়মিত ব্রীজ খেলেন এবং সবাই প্রকাশ্যে স্বীকার করে, ভূধরবাবু খুব ভালই খেলেন। তাই ব্রীজে হারিলে তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া যায়।

এত নাম ছিল তাঁর!···কিন্তু বিধাতা তাঁহার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিলেন।

*

পরের দিন ক্ষুব্ধ মনেই তিনি কোর্টে গেলেন। কোর্টে যে তাঁহার অপ্রতিহত ক্ষমতা তাহা টের পাইয়াই ক্লাবে তাহার অমন পরাজয়টা যেন আরও দুঃসহ হইয়া উঠিল। কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইল না; পক্ষ প্রতিপক্ষ উকিল আমলা ভূধরবাবুকে রোজকার মত ধীর স্থিরই দেখিতে পাইল।

বিধাতা নাকি এত বড় সৃষ্টি করিয়াছেন, এখানে নানা প্রকার উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি করিয়া মজা দেখিবার জন্য।—আশ্চর্য নয়। কারণ ঠিক সেই দিনেই তাঁহার ব্রীজের প্রতিপক্ষ হীরেন ঘোষ জমিদারের একটা মামলা উঠিল! হীরেন ঘোষ প্রতিপক্ষ! বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষীর জবানবন্দীর পরে হীরেন ঘোষের উকিল জেরা করিতেছেন। জেরা কিছুটা দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। ভূধরবাবু বিরক্ত হইয়া একবার ভ্রূ কুচকাইলেন। একবার নড়িয়া বসিলেন। গলা সাফ করিলেন।···হীরেন ঘোষের মুখটা থাকিয়া, থাকিয়া মনে জাগিয়া উঠিতেছে। হীরেন ঘোষ নিম্নকণ্ঠে উকিলের পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে পরামর্শ দিতেছিল; সুতরাং তাহার কণ্ঠও মাঝে মাঝে ভূধরবাবুর কানে আসিতেছে।···ব্রীজ খেলার প্রতিপক্ষ হীরেন ঘোষ—মনের সূক্ষ্ম বৃত্তিতে মামলার প্রতিপক্ষ হীরেন ঘোষের সাথে জড়াইয়া যাইতেছে। ভূধরবাবুর মন শক্ত হইয়া উঠিল। তারপর উকিল সাক্ষীকে আর একটি প্রশ্ন করিতেই ভূধরবাবু গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—"আপনার জেরা অসঙ্গত রকম দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে—আর সময় দেওয়া যাবে না।"

বৃদ্ধ উকিল থামিয়া বলিলেন—"হুজুর?"

ভূধরবাবু নিজ ক্ষমতার নিশ্চিত বিশ্বাসে বলিলেন—"যা বলছি শুনুন।"

উকিল সম্মতি জানাইয়া বসিয়া পড়িলেন।

*

হীরেন ঘোষের মনটা খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। সে নিম্নকণ্ঠে উকিলকে বলিল—"একটু বলুন না আদালতকে যে, আর একটু জেরা করা দরকার।"

উকিল চাপা অথচ হাকিমের শোনার মত গলায় বলিলেন—"থামুন, এ-হাকিম অল্পেই বুঝে নেন সব।"

কিন্তু মামলার ফলাফলের ভোগ হীরেন ঘোষের, কাজেই সে আবার কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উকিল তাহাকে ধমক দিয়া বলিল—"আইনের কি বোঝেন আপনি? যা' বলছি শুনুন।"

হীরেন ঘোষ অসন্তুষ্ট মনে গাড়ী হইতে বাড়ীর দরজায় আসিয়া নামিলেন। এই গৃহে সে সর্বে-সর্বা, কাজেই এখানে সে তার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। ভিতরে পা' দিয়াই ভারিক্কি গলায় ডাক দিল—"অনন্ত! অনন্ত!"

অনন্ত বড় ছেলে। আসিয়া মাথা একটু নীচু করিয়া দাঁড়াইল। হীরেন ঘোষ বলিল—"কাল একবার মফঃস্বলে যাও দেখি।—ওদিকের মহালটা একটু দেখা দরকার।"

অনন্তের মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে একটু স্ত্রৈণ

কাজেই মফঃস্বলে যাইবার কাজটা তাহার কাছে একটু শক্ত ব্যাপার! গেলে ৭।৮ দিনের কমে ফিরিতে পারা যাইবে না। মাথা একটু চুলকাইয়া সে বলিয়া ফেলিল—"মা আজ বলছিলেন, বাড়ীর মেরামতটা তদারক করতে।"

হীরেন ঘোষ চলিতে চলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল, তারপর থামিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—"যা বলছি শোনো।" তারপর ভিতরে চলিয়া গেল।

*

অনন্তও ভিতরে চলিয়া গেল, কিন্তু সে গেল স্ত্রীর কাছে। স্ত্রী চুল বাঁধিতেছিল; অনন্ত পিছন হইতে গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"বাবা কাল মফঃস্বলে যেতে বল্লেন।"

স্ত্রী বেণীতে হাত রাখিয়া ঘুরিয়া বলিল—"রাজি হয়েছ?"

—"রাজি নারাজি আবার কি। মা'র কথা বল্লাম, তাও হ'লো না!—আচ্ছা, তুমি একবার ঠাকুমাকে যেয়ে ধরো না?"

স্ত্রী মাথা ঘুরাইয়া নিয়া বলিল—"আমি পারবো না!"

—"তা' পারবে কেন?"

—"তুমি যাও না, লক্ষীটি!"

অনন্তের রাগ হইল, বলিল—"বেশী বুদ্ধি খরচ না-ই করলে? যা' বলছি শোনো।" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

*

স্ত্রী অগত্যা ঠাকুমা'কেই ধরিবে ঠিক করিল। তাহার ছয় বৎসরের মেয়ে ও তিন বৎসরের ছেলে উঠানে খেলিতেছিল। মেয়েকে ডাকিয়া বলিল—"দেখ্‌তো, ঠাকুমা কি কচ্ছেন।"

মেয়ে খেলিতেছিল, বলিল—"একটু পরে যাচ্ছি মা!" তাহার অবস্থাটা তখন ক্রুসিয়াল, কারণ তাহার মতে তাহার উনানের উপর ধুলির ভাত ফুটিয়া গিয়াছে তাহা এখনই না নামাইলে অখাদ্য হইয়া যাইবে!

মা' রাগিয়া বলিল—"যা বলছি শোন্।"

অগত্যা মেয়ে দৌড়াইয়া উঠিয়া গেল এবং উর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"বুড়িমা রামায়ণ পড়ছেন।"

*

ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে হইল বলিয়া মেয়ের মনটা একটু বিরক্ত হইল। ছোট ভাই মিন্টু তাহার রান্নার অ্যাসিষ্টান্ট্। সে হঠাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিল—"দিদি, এখন আমি একটু রান্না করি, তুই একটু কাঁঠাল পাতার মাছ নিয়ে আয়!"

দিদি ধমকাইয়া উঠিল—"নাঃ, তুই পুরুষমানুষ, রাঁধবি কি? মাছ নিয়ে আয়!—ভাতটা বুঝি ধরেই গেল!"

মিন্টু তবু মিঠি সুরে বলিল—"আমি রোজ মাছ আনি—একদিনও রাঁধি না!"

দিদি গম্ভীর হইয়া বলিল—"যা' বলছি শোন্।"

*

অগত্যা মিন্টু তাহার কাঠের রঙ্গিন পুতুলটা বাঁ-হাতে ও ছোট্ট ছড়িগাছা ডান হাতে লইয়া কাঁঠাল-তলায় মৎস্য-সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। মাছ কুড়াইতে কুড়াইতে তাহার ছোট হাত ভরিয়া আসিল এবং পুতুলটাকে হাতে ধরিয়া রাখা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাই সে মাছগুলি রাখিয়া পুতুলটাকে মাটির উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিল—"এখানে দাঁড়িয়ে থাক! আসছি আমি।" কিন্তু ভারকেন্দ্রের গোলমালে পুতুলটা না দাঁড়াইয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল!

মিন্টুর মনে হইল, পুতুলটা ইচ্ছা করিয়া তাহার কথা শোনে নাই। হাতের ছড়িটা দিয়া সেটাকে এক ঘা' লাগাইয়া দিয়া বলিল—"আমার সাথে সাথে আসতে চাইছে, পাজি!"

সে দৃঢ়হস্তে আবার পুতুলটাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া কর্ত্তৃত্বের স্বরে আদেশ করিল—"দাঁড়িয়ে থাক্।—যা' বলছি শোন্!"

*

কাঠের পুতুলটা নিরুত্তর ঋজু ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল॥

পারসী সম্প্রদায় ও ঋষি জরথুস্ত্র

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

যীশু জন্মাবারও প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বেকার কথা। সেই সময়ে একদল লোক মধ্য-ইউরোপে তাদের আদি বাসভূমি ত্যাগ করে ভারতবর্ষে চলে এসেছিল। এরা দেখতে বেশ সুশ্রী ও গৌরবর্ণের ছিল এবং নিজেদের আর্য বলে পরিচয় দিত। এই আর্য শব্দের অর্থ হ'ল—পূজনীয়। ভারতে আগত এই আর্যরাই পরে হিন্দু নামে অভিহিত হয়।

আর্যরা মধ্য ইউরোপ ছেড়ে যখন ভারতবর্ষের দিকে আসছিল, তখন এই আর্যদেরই একটি দল পথে পারস্যদেশে থেকে যায় এবং সেইখানেই বসতি স্থাপন করে। পারস্যের এই আর্যরা পরবর্তী কালে পারসী নামে পরিচিত হয়।

ভারতের আর্যরা ও পারস্যের আর্যরা অর্থাৎ হিন্দু ও পারসীরা মূলে একই গোষ্ঠীর লোক ছিল ব'লে, উভয়ের ভাষা, দেবদেবী এবং আচার-ব্যবহার প্রথমে একই ছিল। দু'টা দল দু'টা স্বতন্ত্র দেশে বসতি স্থাপনের জন্য, সেই সেই দেশের প্রভাবহেতু পরে উভয়ের মধ্যে ভাষায়, ধর্মাচরণে এবং অন্যান্য বিষয়েও পার্থক্য দেখা দেয়। স্থান ও কালের ব্যবধান থাকলেও কিন্তু পারসীদের সঙ্গে হিন্দুদের ভাষায়, দেবদেবীর নামে এবং ক্রিয়াকলাপে এখনও অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—অগ্নি পারসীদের দেবতা, হিন্দুদেরও দেবতা। হিন্দুরা হোম করে, পারসীরাও করে। তবে হিন্দুরা বলে হোম, পারসীরা বলে হাওম। পারসীদের আলোর দেবতা মিথ্, হিন্দুদেরও আলোকের দেবতা মিত্র (সূর্য)। হিন্দুদের রাজারা ক্ষত্রিয়, পারসীদের রাজধর্ম হচ্ছে ক্ষাথ্। পারসীরা তাদের ধর্মীয় কাজকর্মে দুধ, ননী, মাংস বা ফল, পিঠে প্রভৃতি ব্যবহার করে। হিন্দুরাও যজ্ঞ পূজাদিতে এই সব উপকরণ ব্যবহার করে। উপনয়ন ও উপনয়নকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ বিধিও উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত।

হিন্দু ও পারসী উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে যেমন এই-ভাবে অনেক মিল দেখা যায়; আবার এই ধর্ম ব্যাপারেই কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা যায়। এই বিপরীত ভাবের কারণ হিন্দু ও পারসী উভয়ের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক একটি কলহ। এক সময় যে ধর্ম নিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে একটি বিবাদ বেধেছিল, তার বহু নিদর্শন এদের উভয়েরই শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উভয় সম্প্রদায়ই এই বিবাদের ফলে একে অপরের আরাধ্য দেবতাকে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে। যেমন—হিন্দুদের বেদের পূজাস্পদ দেব বা দেবতাদের পারসীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তায় দএব অর্থাৎ দেব বলেছে। সেখানে পারসীরা এই দেব শব্দের অর্থ করেছে দৈত্য। আবার হিন্দুদের প্রধান দেবতা ইন্দ্রকেও পারসীরা তাদের আবেস্তায় দৈত্যাধিপতির অন্যতম সভাসদ্ করেছে।

অপরদিকে হিন্দু ঋষিরাও পারসী ধর্ম এবং পারসীদের দেবতাদেরও নিন্দা করতে ছাড়েন নি। পারসীদের দেবতাদের নাম অহুর, আর তাদের প্রধান দেবতার নাম অহুর মজ্‌দা। আবেস্তার অহুর ও সংস্কৃত অসুর একই শব্দ। বেদের প্রাচীনতর অংশে অসুর শব্দ প্রাণদাতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে অসুর শব্দ দেবতাদেরই গুণবাচক। কিন্তু পরবর্তী-কালে হিন্দুরা পারসীদের দেবতাদের হেয় করবার জন্যই নিজেদের শাস্ত্র-সমূহে এই অসুরদের দেবদ্বেষী দৈত্য বলে বর্ণনা করেছেন। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা তাঁদের নিজেদের দেবতারা যে অসুর নন, এই কথা বোঝাবার জন্য তাঁদের দেবতাদের নাম দিয়েছেন সুর।

পারসীদের আবেস্তার যিম রাজা আর হিন্দুদের যম রাজা একই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ধর্মসংক্রান্ত বিবাদ হেতু পারসীদের যিম রাজার রাজ্য সুখ ও সম্পদের স্থান হলেও, হিন্দুদের যমের আলয় ভয় এবং দুঃখেরই স্থান বলে বর্ণিত হয়েছে।

এইভাবে হিন্দু ও পারসীদের মধ্যে এক সময় একটি ধর্মীয় কলহের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে দু'টা সম্প্রদায় দু'টা পৃথক দেশে বাস করায় এই কলহ তেমন মারাত্মক হয়ে ওঠেনি। এই কলহের কথা ক্রমে তারা ভুলে গিয়েছিল এবং উভয় সম্প্রদায়ই তাদের নিজ নিজ ধর্মকর্ম নিয়েই ব্যস্ত ছিল।

এই আদিম পারসীদের ধর্মসাধন প্রণালীকে সংস্কার করে যিনি সুনির্দিষ্ট করে যান, তিনি হলেন ঋষি জরথুস্ত্র—পারসীদের একমাত্র ধর্মগুরু। এক সময়ে পারসীদের মধ্যে ধর্মের নামে নানারূপ অনাচার চলেছিল এবং লোকের মনও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। সেটা তখন খ্রীষ্ট পূর্ব ৭ম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়। সেই সময় এই অনাচার ও কুসংস্কারের হাত থেকে পারসীদের রক্ষা করবার জন্যই ঋষি জরথুস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছিল।

সাধারণত প্রত্যেক মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠে। কথিত আছে, জরথুস্ত্র নাকি ভূমিষ্ঠ হয়ে না কেঁদে হেসেছিলেন। এই দেখে ধার্মিক লোকেরা জরথুস্ত্র সম্বন্ধে তখনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এই শিশু সাধারণ শিশু নয়। কোনও বিশেষ উদ্দেশে স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃকই এই শিশু প্রেরিত হয়েছে।

এই সময় পারস্যে দুরাসরোবো নামে একজন খুব প্রভাবশালী পুরোহিত বাস করতেন। এই পুরোহিতের এমনই প্রতাপ ছিল যে, পারস্যের রাজার উপরেও তাঁর কর্তৃত্ব চলত। জরথুস্ত্র বড় হলে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন, এই ভেবে দুরাসরোবো জরথুস্ত্রকে শৈশবেই হত্যা করবার জন্য নানারকমে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দৈব কৃপায় দুরাসরোবোর সমস্ত ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ হয়।

জরথুস্ত্রকে হত্যা করবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলে, অবশেষে দুরাস-রোবো জরথুস্ত্রের পিতাকে পুত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করলেন। তিনি

জরথুস্ত্রের বাবাকে বোঝালেন যে, তাঁর ছেলের দ্বারা তাঁর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব জরথুস্ত্রকে ত্যাগ করা—এমন কি হত্যা করাই হ'ল শ্রেষ্ঠ উপায়।

পুরোহিতের প্ররোচনায় জরথুস্ত্রের বাবা শেষ পর্যন্ত ছেলেকে হত্যা করবারই মতলব করলেন। একদিন রাত্রে জরথুস্ত্র যখন ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন, সেই সময় জরথুস্ত্রের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সেদিন আশ্চর্যজনকভাবে জরথুস্ত্র সেই আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন। এরপর জরথুস্ত্রের বাবা ছেলেকে হত্যা করবার জন্য আরও অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারেন নি। অবশেষে তিনি জরথুস্ত্রকে এক গভীর অরণ্যের মধ্যে নির্বাসিত করলেন। তিনি ভেবেছিলেন, জরথুস্ত্রকে গভীর অরণ্যের মধ্যে ছেড়ে দিলে বনের বাঘ ভালুকে নিশ্চয়ই তাঁকে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বনের হিংস্র জন্তুরা তাঁর কোনও ক্ষতি করল না।

জরথুস্ত্র এই সময় যুবক হয়ে উঠেছিলেন। তিনি অরণ্য থেকে আবার লোকালয়ে ফিরে এলেন। বন থেকে বেরিয়ে এসে এবার তিনি সাধারণ লোকদের মধ্যে জ্ঞানের কথা প্রচার করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর এই উপদেশের কথা দেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে পুরোহিত দুরাসরোবো বহু চেষ্টা করেও জরথুস্ত্রের কোনও দৈহিক ক্ষতি করতে না পেরে, এবার জরথুস্ত্রকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করলেন। জরথুস্ত্র কিন্তু দুরাসরোবোকে তর্কযুদ্ধে ভীষণরূপে পরাজিত করলেন।

এরপর জরথুস্ত্র দীর্ঘ দিন ধরে ঈশ্বর সাধনায় মগ্ন রইলেন। অবশেষে দৈতী নদীর তীরে একদিন তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করলেন। দিব্য জ্ঞান লাভ করে জরথুস্ত্র তাঁর নতুন মতবাদ প্রচার করতে বেরুলেন।

এই সময় পারস্যের লোকে ধর্মের নামে নানা অনাচার চালাচ্ছিল এবং লোকের মনও নানা কুসংস্কারে ভরে উঠেছিল। জরথুস্ত্র দেশের এই অনাচার দূর করবার উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের মত প্রচার করতে লাগলেন। সকল ধর্মগুরুর ন্যায় জরথুস্ত্রকেও প্রথম প্রথম অনেক বাধা বিপত্তি ভোগ করতে হ'ল। তিনি পায়ে হেঁটে লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিজের মত প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। ফলে অনেকেই তাঁর মত মেনে নিল এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। এইভাবে নানা স্থান ঘুরতে ঘুরতে তিনি শেষে রাজা ভিস্টাম্পের রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জরথুস্ত্র সেখানে নিজের মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে, সেখানকার পুরোহিতদের চক্রান্তে পড়ে কারাগারে বন্দী হলেন। কিন্তু একটা অলৌকিক ঘটনায় তিনি শীঘ্রই জেল থেকে মুক্তি পেলেন। সেই ঘটনাটা হ'ল—

রাজা ভিস্টাম্পের একটা খুব সখের ঘোড়া ছিল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জরথুস্ত্র যেদিন বন্দী হলেন, সেইদিনই এই ঘোড়াটার পাগুলো সবই পেটের ভিতর ঢুকে যায়। এই ব্যাপার দেখে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। রাজা ভিসটাম্প দেশবিদেশ থেকে বহু পশুচিকিৎসক আনালেন। কিন্তু কেউই ঘোড়ার পা আর বা'র করাতে পারলেন না। অবশেষে রাজা ভিসটাম্প জরথুস্ত্রেরই শরণাপন্ন হলেন।

জরথুস্ত্র তখন রাজাকে বললেন—আমি আপনার ঘোড়াকে সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে দোব। কিন্তু ঘোড়ার ঐ চারটে পায়ের জন্য আমার চারটে কথা রাখতে হবে।

রাজা অগত্যা জরথুস্ত্রের কথায় সম্মত হলেন। তখন জরথুস্ত্র একটা একটা করে ঘোড়ার পা বা'র করিয়ে দিতে লাগলেন, আর অমনি রাজার কাছ থেকেও একটা একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে লাগলেন। জরথুস্ত্র রাজাকে যে চারটে কথা বলেছিলেন সেগুলো হল—(১) আপনার দেশে প্রচলিত অনাচার ও কুসংস্কারমূলক ধর্ম ত্যাগ করে আপনাকে আমার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। (২) আমার এই ধর্ম প্রচারের জন্য যদি যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে আপনি বা আপনার পুত্র পিছু পা হবেন না। (৩) রাণীকেও আমার ধর্মে দীক্ষা নিতে হবে। (৪) যারা ষড়যন্ত্র করে আমাকে কারাগারে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিল, তাদেরও আমার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

রাজা ভিসটাম্প জরথুস্ত্রের চারটে কথাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। রাজা নিজে জরথুস্ত্রের ধর্ম গ্রহণ করায় জরথুস্ত্রের পক্ষে এই দেশে তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার বিশেষ সহজ হয়েছিল।

জরথুস্ত্র প্রচার করলেন—ঈশ্বর এক এবং সর্বশক্তিমান। তিনি "অহুর মজদা" অর্থাৎ জ্ঞান ও শক্তির আকর। জরথুস্ত্র অজ্ঞান ও মিথ্যাকে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন—মানুষ সর্বদাই অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং মানুষ সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হবে। জরথুস্ত্র কৃষিকার্যকে শ্রেষ্ঠ কার্য বলে প্রচার করলেন। এই জন্যই বোধ হয় জরথুস্ত্রের শিষ্যরা বলদকে এখনও পবিত্র বলে জ্ঞান করে। অগ্নিকে তিনি অন্যতম দেবতা বললেন এবং হোম ও আহুতির কথাও প্রচার করলেন। পারসীরা অগ্নিকে দেবতা হিসাবে পুজা করে বলে মানুষের মৃত্যুর পর কৃমিবিষ্ঠাময় মৃতদেহকে আগুনে পুড়িয়ে অগ্নিদেবতাকে অপবিত্র করতে চায় না। কারও মৃত্যু হলে পারসীরা একটা নির্দিষ্ট স্থানে খুব উঁচু জায়গায় মৃতদেহটাকে ফেলে রেখে আসে। কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি সেই মৃতদেহ খেয়ে নেয়।

জরথুস্ত্র যে মত প্রচার করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করে যান "আবেস্তা" নামক একটি গ্রন্থে। এই আবেস্তাই হ'ল পার্শীদের মূল ধর্মগ্রন্থ।

পারসীরা জরথুস্ত্রের মতবাদ মেনে নিয়ে বেশ সুখেই কাটাতে লাগল। এইভাবে প্রায় বার শ' বছর কেটে গেল। এমন সময় পারস্যের পাশেই আরব দেশে হজরৎ মহম্মদ জন্মগ্রহণ করে নতুন ইসলাম ধর্ম প্রচার করলেন। পরে আরবের ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা দেশে দেশে তাদের এই নতুন ধর্ম প্রচারে বেরুলে, সমস্ত পারস্য দেশটাই একরূপ এই নতুন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কেবল অল্পসংখ্যক লোক তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মকে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না। তারা তাদের ধর্মকে আঁকড়ে রইল বটে কিন্তু চারিদিকে এই নবধর্মে দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে টিকে থাকতে পারল না। তখন তারা খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে তাদের দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষে এসে আশ্রয় নিল। এখন আমরা বোম্বাই শহরে পারসী সম্প্রদায় বলে যাদের দেখি এরাই হ'ল সেই আগন্তুকদের বংশধর। এই পারসীরা সংখ্যায় খুব কম। সংখ্যায় বোধ হয় এরা ৮০ হাজারের বেশি হবে না। এরা এখনও এদের সেই পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাসই মেনে আসছে।

অসমীয়া বীর লাচিত্ বড়ফুকন্

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, আই-এ-এস

কাব্যে উপেক্ষিতাদের পক্ষ লইয়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অমর করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রতি দেশে, প্রতি যুগে উপেক্ষিতদের অভাব নাই। ইতিহাস মানে শুধু রাজবংশের কুল-কাহিনী, জয়যাত্রা, তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ বহুভাষিত গুণাবলীর কীর্ত্তন নয়—সত্যকার ইতিহাস একটা জাতির অন্তর্নিহিত সত্তার প্রবহমান ধারার অখণ্ড রূপ। জন্ম-মৃত্যুর চক্রকাটা পরিধির ধারে ধারে হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে চিরন্তনীর রথ চলে। শতকরা নিরেনব্বই জন লোকই সেই চক্রের আবর্ত্তে বুদ্বুদের মত মিলিয়া যায়। মনে রাখে না কেউ। তবু প্রত্যেক দেশের সমাজে এমন দু'একজন লোক ওঠেন, যাঁরা সত্যকার বীর, সত্যকার কর্ম্মী, সত্যকার সংস্কারক। তাঁরাই হলেন আসল গণপতি বা জনপতি—সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। অসমীয়া ইতিহাসের এমনি একটি বীরের কথাই আজ নিবেদন করিব। তাঁর নাম লাচিত্ বড় ফুকন্। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের অতি গৌরবের দিনে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' শাহনশাহ আলমগীর বাদশাহের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। আসামের বাহিরে ক্বচিৎ কেহ রসিক ঐতিহাসিক মহলে বা বিদ্বজ্জন সভায় তাহার কীর্ত্তির উল্লেখ করিলেও সম্যক্ আলোচনা হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। এমন কি ঐতিহাসিকদের মুকুটমণি স্বয়ং স্যার যদুনাথ সরকারের আওরঙ্গজেবের ইতিহাসেও তাঁহার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। আসাম গভর্ণমেণ্টের Department of Historical and Antiquarian studiesএর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার ভূঞা ১৯৩৬ সালে পুণায় সর্ব্ব-ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের অধিবেশনে এই অসমীয়া বীরকে সর্ব্বপ্রথম ভারত সভায় প্রতিষ্ঠিত করেন ও আসামের পুরাতন বুরুঞ্জী হইতে তাঁহার জীবন কাহিনী উদ্ঘাটিত করিয়া একটি গবেষণামূলক মনোরম ঐতিহাসিক চিত্র দিয়াছেন।

এই বুরুঞ্জীগুলি ও তাহাদের ঐতিহাসিকতা কতটুকু তাহা না বিচার করিয়া গ্রহণ করিলে সমস্ত কাহিনীকে হয়ত ইতিহাসের মর্য্যাদা দেওয়া যায় না। এই সব বিবরণীতে কিছুটা অতিরঞ্জন অতিভাষণ থাকিতে বাধ্য। মুঘল যুগে রাজসভায় যেমন ওয়াকিয়ানবীশ (Recorder of Events) থাকিত এবং তৈমুর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেরই আত্ম-জীবনী লেখার রেওয়াজ ছিল ; যেমন তুজুক্-ই-বাবরী, তুজুক্-ই-জাহাঙ্গীরী, হুমায়ুন নামা (আকবরের আদেশে গুলবদন্ বেগম কর্ত্তৃক লিখিত) তেমনি অহম্ দেশেও বুরুঞ্জী লেখার প্রচলন ছিল। এই বুরুঞ্জীগুলি প্রধানতঃ কৌল বিবরণী হিসাবে অহম্ রাজগণ ও তাঁহাদের পাত্র মিত্র অমাত্যদের কাহিনী। ঐতিহাসিক মতে বিচার বিশ্লেষণ ও বর্জ্জন করিয়া কাহিনীগুলিকে সংশোধিত করিয়া লইলে সমসাময়িক ঘটনা পুঞ্জের এক অপূর্ব্ব ইতিহাস পাওয়া যায়। "রামসিংহের যুদ্ধ কথা" বলিয়া একটি সম্পূর্ণ পৃথক বুরুঞ্জীই পাওয়া যায়। ডাঃ ভূঞার মতে লাচিত বড়ফুকনের দৈবজ্ঞ-প্রধান সমুদ্র চূড়ামণিই ইহার রচয়িতা। উত্তর গৌহাটির সুকুমার মহান্তির নিকট প্রাপ্ত "অসম্ বুরুঞ্জী"তেও অহম রাজ্যের একটী সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কামরূপের বুরুঞ্জী দেওধাই আসাম বুরুঞ্জী, আসামের পদ্যবুরুঞ্জী, কাচারী বুরুঞ্জী, জয়ন্তীয়া বুরুঞ্জী, ত্রিপুরা বুরুঞ্জী প্রভৃতি আরও বহু বুরুঞ্জী পাওয়া যায়।

মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি যে কথা বলিয়াছিলাম আসামের ইতিহাসের সেই মূল কথাটির পুনরুল্লেখ করিলে কিছু অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতের এই প্রত্যন্তিক প্রদেশের চলোর্ম্মি ইতিহাস ও কৃষ্টিসংঘর্ষের বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা এখানে আগন্তুক। তাহার পূর্ব্বে, অষ্ট্রিক্, নিগ্রোবটু, কিরাত, বোড়ো, তিব্বতীয় ও দ্রাবিড় মঙ্গোলিয়ানরা এখানে আসিয়াছে। অলৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে মিকির, খাসি, জয়ন্তীয়ার পার্ব্বত্য জাতিরা, পরবর্ত্তী কালে শান্ জাতির অহম্ শাখার অভিযান, শ্রীহট্ট কাছাড় মণিপুর হেরম্ব দেশে মগধ গৌড় সভ্যতার ঢেউ, প্রাগজ্যোতিষ কামরূপে তন্ত্র মতের প্রতিষ্ঠা, তারও পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব আসাম সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক বিচিত্র রূপায়নে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা কবির ভাষায় এইখানে প্রযুজ্য

"কেহ নাহি জানে
কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্ব্বার স্রোতে এলো কোথা হতে
সমুদ্রে হলো হারা"

এই সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসের মণিমেখলায় কত কথা ও কাহিনী কত কিম্বদন্তী কত গাথা যে গ্রথিত আছে তার ইয়ত্তা নাই। তার ঐতি-হাসিক মূল্য কতটুকু নিক্তির ওজনে সমালোচকের নিরীখে তাহার বিচার হউক্ তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু মানব মনের চিরন্তনী বেদনার ইতিহাসে রসবেত্তার মর্মকোষেও তাহার একটি নিজস্ব মূল্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরক ভগদত্ত বাণ উষা অনিরুদ্ধ অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদা উলুপী বভ্রুবাহন, ভীম হিড়িম্বা, ঘটোৎকচ, ভাস্কর বর্ম্মা, হিউয়েন্তসাঙ, শীলভদ্র, কামেশ্বর মহাগৌরীর উপাসকরা, শালস্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, অভিনবগুপ্ত কুটিয়া জাতির আদি পুরুষ কুঞ্জী ও আদি জননী 'মামা', কমতাধিপতি পৃথুরাজ, মুলাগাভরু, হেড়ম্বপতি তাম্রধ্বজ, জৈন্তাধিপতি রামসিংহ, রাজা শিবসিংহ, রাণী ফুলেশ্বরী, চন্দ্রমালা, জয়মতী, কনকলতা, নিরঞ্জন বাপু, স্বর্গদেবগণ, বড় গোঁহাই, বুঢ়া গোঁহাই

নিত্যপাল, তুলারাম ও সর্ব্বোপরি মহাপুরুষ শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব তাঁহাদের শিষ্যগণ আসামের ইতিহাস জুড়িয়া বসিয়া আছেন। অনেকের মতে মুদ্রারাক্ষস আসামেই প্রণীত হইয়াছিল। ভাস্কর-বর্ম্মার পরবর্ত্তী অবন্তী বর্ম্মার সভা-কবি বিশাখ দত্তই নাকি ইহার রচয়িতা। অন্তরবোল দেশ হইতে যাঁহারা আসিয়া আসামে বসবাস করেন তাহারা হইলেন 'চোলিহা'। উড়িষ্যা হইতে রাজবংশীয় যে সব কুমারদের লইয়া আসা হইয়াছিল তাঁহাদের বংশধরেরাই যুবরাজ বা দুবরাজ হইতে 'দুয়ারায়' পরিণত হইয়াছিলেন।

আসামের ইতিহাসে যখন লাচিত বড়ফুকনের আবির্ভাব, তখন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য ধনে মানে বিস্তারে গৌরবের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে ক্ষুদ্র অহম্ রাজ্য তখন সদীয়া হইতে প্রায় কুচবিহার পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকুল দক্ষিণকুল ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন হইতে আগত টাই জাতির শান শাখার একটি বংশ ব্রহ্মপুত্র অধিকার করিয়া নিজ আধিপত্য স্থাপন করে। কামরূপ রাজ্য তখন হীনবল ও গতগৌরব। ছোটখাট অন্য রাজ্যগুলিও পরাক্রান্ত বৈদেশিক্ আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করিতে অক্ষম। ইতিহাসের অন্যত্রও যা দেখা যায় এখানেও তার পুনরাবৃত্তি হইল। বিজেতারাই ক্রমশঃ বিজিত হইয়া পড়িল এবং পুরাদস্তর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া প্রজাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সেই ধর্ম্ম কিছুটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক ও প্রাচীন পার্ব্বত্য জাতির প্রথা মিশ্রিত হইলেও মূলে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের প্রাণশক্তির সঞ্জীবনী ধারা সব সময়েই আগন্তুকের কিছু না কিছু গ্রহণ করিয়া তাহাকে নিজের সঙ্গে একাত্মা করিয়া লইয়াছে। এই সমন্বয়ও সমীকরণ শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে, বর্জ্জন করে নাই। ইহারই ফলে অষ্ট্রিক কা-মা-ই-খা কামাখ্যা, কামেশ্বরী গৌরী হন, মহেন্দ্র দড়র ভুমাতাকে দেখা যায় কিছু উৎসবে হুণ হেলিও ডোরাস পরম ভাগবত হন্, বৈদিক রুদ্র হন তান্ত্রিক শিব, শূন্য হন নিরঞ্জন, বুদ্ধদেব হন জনার্দ্দন, ক্ষণিকবাদ মিশিয়া যায় ব্রহ্মবাদে। কবি বলিয়াছেন যে আমাদের এই মহাদেশ "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" আমরা মায়ের পূজার জন্য মঙ্গল ঘট ভরিতেছি। আসামে এই কথা সর্ব্বতোভাবে বলা চলে।

অসম বুরুঞ্জীর প্রথমেই প্রথম অধ্যায়ে আহোম স্বর্গদেব সকলের উৎপত্তির কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিম্বদন্তী যে বশিষ্ঠের অভিশাপে শ্যামা বিদ্যাধরীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে প্রথম স্বর্গনারায়ণদেবের উৎপত্তি অসম্ বুরুঞ্জীতে (পৃঃ ৩) লিখিত যে "১০৪১ শকত শুভযোগন রাজ-মহিষীর পুত্র জন্মিল......ইন্দ্রের আদেশে নাম দিল স্বর্গনারায়ণ...পাকে স্বর্গনারয়ণ ১০৯৮ শকেত মৃত্যু হৈল, ভোগ ৩৯ বৎসর। পুতেক পামি পুং রাজা হ'ল"।

প্রায় ছয়শত বৎসর ধরিয়া অহমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও তন্নিকটবর্ত্তী রাজ্য-উপরাজ্যগুলির উপরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অহম্‌রাজ স্বর্গদেব প্রতাপসিংহের (১৬০৩-১৬৪১ খৃঃ অঃ) সময় অর্থাৎ জাহাঙ্গীর ও সাজাহান বাদশায় রাজত্বকালে প্রথম মুঘল-অহম সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। ইহার কিছু পূর্ব্বে পরাক্রান্ত কোচ্ নরপতি নরনারায়ণ ও তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজ গৌড়, কাছাড়, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং কামরূপে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড় আক্রমণ কালে মুসলমানদের সহিত সংঘর্ষ হয়। শুক্লধ্বজ বা সংগ্রামসিংহের (চিলা রায়) মৃত্যুর পর কুচবিহার রাজ্যে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয় এবং অহম্‌দেব সাহায্য প্রাপ্তির আশায় রাজা রঘুদেব অহম্-রাজ প্রতাপসিংহকে কন্যাদান করেন। কিন্তু এই অন্তর্বিবাদ এইখানেই শেষ হয় না। রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ দুই জনেই মুঘল সাহায্য প্রাপ্তির আশায় দিল্লীশ্বরের কাছে দরবার করেন। কোন কোন সামন্ত কোচ রাজারা অহম্ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অহম্ রাজ্যের সীমানায় মুঘল সৈন্যের আগমনে ওপারে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে দুর্গ নির্ম্মাণ হইতে লাগিল। নিম্ন আসামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি বড়ফুকনের পদ সৃষ্টি হইল। তিনিই প্রধান শাসন কর্ত্তা ও সেনাপতি হইলেন। এই স্থানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আসামে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক লোকই স্থায়ী সৈন্যবাহিনী (standing militia) ভুক্ত ছিল। সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যেও পদানুসারে বিভাগ ছিল। বিংশজনের নায়কের নাম ছিল "বোরা", একশজনের অধিনায়কের নাম ছিল শতকীয়া বা "সাইকা", এইরূপ "হাজারিকা", বরুয়া (তিন হাজারী) 'ফুকন' (ছয় সহস্রাধিনায়ক) "বড়ফুকন" ইত্যাদি।

পঁচিশ বৎসর এইরূপ সীমান্ত যুদ্ধ চলিবার পর ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে অহম্ সেনাপতি মোমাই তামুলি বরবরুয়া ও মুঘল সেনাপতি আল্লা ইয়ার খাঁর সহিত একটি সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি অনুসারে পশ্চিম আসামের গৌহাটি সমেত সমগ্র ভূভাগ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু মহারাজ জয়ধ্বজসিংহ (১৬৪৮-১৬৬৩ খৃঃ অব্দ) সাজাহানের অসুস্থতা ও পুত্রদের বিরোধের সুযোগ লইয়া মুঘলদের গৌহাটি হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হন্ এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া বহু বন্দী লইয়া যান্। কুখ্যাত "বঙ্গাল খেদা" কথাটির ঐতিহাসিক উৎপত্তি এই সময় হইতেই। তখন ইহার অর্থ ছিল বঙ্গদেশ হইতে আগত শত্রু সৈন্যবাহিনীদের তাড়াইবার আয়োজন (অসম্ বুরুঞ্জী পৃঃ৬২১)। কুচবিহারও এই সুযোগে মুঘল অধীনতা অস্বীকার করে। আওরঙ্গজেব তখন সবেমাত্র দিল্লীর মসনদে বসিয়াছেন। এই খবর শুনিয়া তিনি মীরজুমলার উপর কুচবিহার ও আসাম জয় করিবার ভার দেন। বুরুঞ্জীরা মীরজুমলাকে মজুম খাঁ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বাদুলি ফুকন, প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত আসামীও মীরজুমলার দলে যোগদান করেন এবং মুঘল জয়ের কারণ হন। মীর-জুমলার আসাম জয়ের কাহিনী এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে মীরজুমলা অহমদের পরাজিত করিয়া ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে যে সন্ধি করেন তাহাতে অসম্ বুরুঞ্জীর মতে নিম্নলিখিত সর্ত্ত ছিল—

"লিখিতং শ্রীযুত জয়ধ্বজসিংহ রাজা আচাম সুলতান সুজাকে খলমকে উক্ত বিচলাফ হমিদ লোক কহেসো পাৎশা জিকি রাজ বিলায়ত বৈয়ত্‌শে দৌত কয়কৈ আৎসামে জিন্না খৈয়োঁ। আস্তে

পাৎশা হুকুমতসা সকল নিঙ্গিত নানাগুণালঙ্কৃতাশেষগুণৈক ধাম নিজ তনু সৌন্দর্য্য ধর্ম্মযুধিষ্ঠির গঙ্গাজল নির্ম্মল পবিত্র কলেবর মহামহিম মহিমারম্ভ শ্রীযুত নবাব খান্খানা বিপহ-চালার পাৎশাই কৌশল করাকে আচাম চাবা বিলাইত লিয়া থা হামাকো জলাউতম কর লাল গোস্ত যাইবেক। আপোনর জীউ লেকবকে পাহোরকে ভিতর ভাগা আরাতব আপোনা জীউকে রক্ষার পাৎশাই বন্দগি।··· · আচাম মুলুক মুজে দেও, মক্রি বচিলা করকে নবাব খান্-খানা বিপহচালার জীউকে পাৎশা আর শাই-মহলাকো বিচ্ যে পেজমেত্কো দও। আর আপোনর বেটী, আউর রাজা তিপামো বেটী সোনা কুরি হাজার তোলা ২০০০০, রূপ ১২০০০ টকা, আর ২০ হাতীর ১৪ দন্তাল ও হস্তিনী, আর দরঙ্গ মুলুক উত্তর কোলে কিবত করি দিয়া ও রায়ত ভড়রী আরব মুলুক রাজা ডিমরুরাকো, আউর বেলতলীয়া দক্ষিণ কোলে কেস্কয় কর দি, আউর কলঙ্গ সীমনা করকে পেছকচ্ বতাহে ইচমস্তে। মক্রি কবুল করিয়া জমা দি শালিমন ১০২৩ শক মাঘ মাসকে লিকরকে ৩০০০০০, রূপা, চার চার মহিনে এক লাখ করকে বার মাহিনাকে দেও, আর ৯০ হাথা। ৩০, বর দন্তাল ১০, সক দন্তাল ১০, মাকুন্দী ১০, এই তিছ হাতী ইনকো তিন মাহিনা পিছু পিছু দেও। আর হাতী ৬০, বর দন্তাল ২০, মাকুন্দী ২০, ইচই মাঘ মহিনা লেকরকে বার মহিনামে ভর দেও। জয়াতয়ী রূপয়া হাতী দেনেকো দাবা কিয়াকে। তেগি তেগি বর গোহাঁই বেটা, বুঢা গোহাঁইকে ভতিজা, বর গোহাঁইকে বেটা, বর ফুকনকো বেটা মেব মুলুককে বিচ এই চাবি আদমি বরা আর মর্দভি, এই তিনিকো ওপর ইচো আস্তে এই চারি আদমিকো তল দিয়ে তোমার পাশে আর বজকুছু পাৎশাই বিলাইত কৌরত আচাম মুলুক বিচ বহিব উচ্কুচ বহারলে কর দেও।···আউর পাৎশাই বন্দেগি ফরমান বরদারি বিচ্ রহোগা"

১৫৮৪ শকত মাঘ মাসত মজুমর্খার এই লিখা শাৎশার ঠাই পালাগৈ • পাৎশাই এই বুলি পঠালে আচাম মুলুক চাপ করিয়া আগপাছ নিবন্ধ করি চিতাপি আহিব" (অসম বুরুঞ্জী পৃঃ ৯৯-১০০)

এই দলিলটি অসম বুরুঞ্জীতে হুবহু উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ভাষা ও পদ্ধতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে উর্দ্দু, হিন্দুস্থানী, অসমীয়া, সংস্কৃত ও অহম ভাষার মিশ্রিত এক বাক্যপুঞ্জ গ্রহণ করা হইয়াছে। মীরজুমলার সহিত অসম সন্ধিপত্র কি ভাষায় (ফারসী) হইয়াছিল তাহা একটু গবেষণা করিলেই জানা যাইতে পারে। বুরুঞ্জীর এইরূপ ভাষা ব্যবহারে অনেকেই বুরুঞ্জীর সমসাময়িক ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন কিন্তু অন্য প্রমাণ যেমন মুঘল সেনাপতিদের পত্রাবলী, অম্বরের রাজকাহিনী, বাদশাহী বিবরণ প্রভৃতির সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে বুরুঞ্জীগুলি ঠিক সমসাময়িক না হইলেও প্রায় তন্নিকটবর্ত্তী সময়ের তাহা প্রতীয়মান হয়।

মীরজুমলা ও মুঘলদের চলিয়া যাওয়ার পর রাজা জয়ধ্বজসিংহ ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র চক্রধ্বজ সিংহ পুনরায় অহম রাজাকে সুদৃঢ় করিয়া মুঘল আধিপত্য ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অসম বুরুঞ্জীতে এই সময়ের কয়েকখানি কূটনৈতিক (Diplomatic) পত্রের সারমর্ম্মও উদ্ধৃত আছে। কুচবিহার, জয়ন্তীয়া, কাছাড় ও অহম রাজ্য লইয়া মুঘলদের বিরুদ্ধে একটি Anti-mogal confederacy করিবার চেষ্টা হয়। জয়ন্তীয়া রাজ লিখিলেন—রাজন্ মুঘলরা আমার বিরুদ্ধে অভিযান করে নাই বটে কিন্তু আপনার পরাজয় আমারও পরাজয়। আপনার বিপদের দিনে আপনার পার্শ্বে দশ বিশ সহস্র সৈন্য লইয়া কেন দাঁড়াই নাই তজ্জন্য অনুশোচনা হইতেছে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, কিন্তু মুঘলদের বিরুদ্ধে এবার আমাদের সমবেত চেষ্টা সফল হউক্—আমরা যেন প্রতিহিংসা লইতে পারি। কোচ্ নৃপতি প্রাণনারায়ণ লিখিলেন—আপনিও রাজ্য হারাইয়াছেন, আমিও তদ্রূপ, এবং আমরা দুইজনেই রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি—রামচন্দ্র, সুরথ, যুধিষ্ঠিরও একদিন সাম্রাজ্য হারাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের মহাগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই—আমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন না হয়। অহম রাজও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উত্তর দিলেন—বন্ধু সূর্য্য একবার অস্ত গেলেও পুনরায় প্রাতে উদিত হয়, আমি পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি, আপনিও করুন।

সন্ধির সর্ত্তানুযায়ী আরঙ্গজেব প্রদত্ত "খেলাত" যখন দিল্লীশ্বরের দূতেরা মহারাজ চক্রধ্বজ সিংহকে উপহার দিয়া দরবারে পড়িবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলেন—স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে এক প্রস্থ কাপড়ই কি বেশী মূল্যবান—এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

প্রধান মন্ত্রী বড় গোহাঁইয়ের পরামর্শে আশু যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেও চক্রধ্বজ মুঘলদের হস্ত হইতে দেশকে পুনরায় উদ্ধারের চিন্তাতেই মত্ত রহিলেন এবং কুচকাওয়াজ, সৈন্য ও রসদ সংগ্রহ, দুর্গ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও দৈবজ্ঞের নির্দ্দেশে লাচিত বড় ফুকনের উপর যুদ্ধের ভার প্রদত্ত হইল। তিনি প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। লাচিত্ ছিলেন মোমাইতামুলী বরবরুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতা জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময় অহম মুঘল যুদ্ধে অহম সেনাপতি ছিলেন ও সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। মহারাজা প্রতাপসিংহ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাহার এক কন্যা মহারাজ জয়ধ্বজসিংহের মহিষী ছিলেন। এই মহিষী গর্ভজাতা কন্যাই আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আজমশাহর বেগম হন। মোমাই তামুলী বরবরুয়া অতি বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাকে বলা হইত "নামযানী রাজা" অর্থাৎ নিম্ন আসামের রাজা। সারা আসাম দেশকে তিনি সমরনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক দিক হইতে পুনর্গঠিত করেন। প্রত্যেক গ্রামে সমর্থ বয়স্ক পুরুষ সৈন্য বাহিনীতে ভর্ত্তি হয়। প্রত্যেক গ্রামের শাসন ব্যবস্থা সংস্কৃত করা হয়। সর্ব্বত্র চরকা ও তাঁতের প্রচলন হয়। এই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুব্যবস্থার ফলে আজ পর্য্যন্ত সম্ভ্রান্ত অসমীয়া মহিলারা নিজেদের কাপড় বয়ন্ করিতে অসম্মানের কাজ বলিয়া মনে করেন না। এই বরেণ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন লাচিত। বাল্যে পিতার কাছেই তিনি রাজনীতি, সমরনীতি ও শাসননীতিতে শিক্ষা লাভ করেন। কর্ম্মজীবনে তিনি প্রথমে "ঘোড়া বরুয়া" বা অশ্বাধ্যক্ষ (Superintendent of Royal Horses") পদ পান, তাহার পর "দোলাঘরিয়া বরুয়া বা রাজার পার্শ্বচরদের প্রধান (Superintendent of the Royal Guards) পদে বৃত হন। প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হওয়া কালে তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(আগামী বারে সমাপ্য)

কালের মন্দিরা

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

গিরিলঙ্ঘন

রট্টা ও চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে জম্বুক ছুটিয়া আসিয়া চিত্রকের অশ্বাসনে একটি বস্ত্রের পোট্টলী বাঁধিয়া দিল। চিত্রক প্রশ্ন করিল—'এ কী?'

জম্বুক বলিল—'কিছু খাদ্য। সঙ্গে থাকা ভাল। হয়তো প্রয়োজন হইবে।'

চিত্রক বলিল—'ভাল। তুমিও আর বিলম্ব করিও না।'

জম্বুক বলিল—'না। কিন্তু আমার অশ্ব নাই, গর্দভ পৃষ্ঠে যাইতে হইবে। পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে।'

রট্টা জম্বুকের হস্তে একটি স্বর্ণদীনার দিয়া বলিলেন—'তোমার পারিতোষিক। ভিক্ষুদের কথা ভুলিও না।'

জম্বুক স্বর্ণমুদ্রা সসম্ভ্রমে ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল—'আজ্ঞা, ভিক্ষুদের জন্য গোধূম লইয়া যাইব। সঙ্গে ভৃত্য থাকিবে, সে সংঘে গোধূম পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে। আমি কপোতকূটে চলিয়া যাইব।'

অতঃপর জম্বুকের কর্মকুশলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া উভয়ে পশ্চিমদিকে অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। সম্মুখে উপত্যকা; তাহার পরপ্রান্তে পাহাড় আছে, কিন্তু এখান হইতে দেখা যায় না। সেই পাহাড় পার হইয়া স্কন্দগুপ্তের স্কন্ধাবারে পৌঁছিতে হইবে।

রট্টা বায়ুকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্যন্ত চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন্ স্থানে যাইতে হইবে? দিগ্‌দর্শন হইবে কি প্রকারে?'

চিত্রক বলিল—'ওই যে-স্থানে চিল্ল-শকুন উড়িতেছে উহাই আমাদের গন্তব্য স্থান। উহা লক্ষ্য করিয়া চলিলে স্কন্ধাবারে পৌঁছিব।'

বিস্মিতা রট্টা বলিলেন—'কি করিয়া বুঝিলেন?'

চিত্রক একটু হাসিয়া বলিল—'অনেক দেখিয়াছি। যুদ্ধের প্রাক্‌কালে সৈন্য-শিবিরের মাথায় চিল্ল-শকুন ওড়ে; উহারা বোধহয় জানিতে পারে। —আসুন, আর বিলম্ব নয়; আজ দ্রুত অশ্ব চালাইতে হইবে।'

দুইটি অশ্ব নদীর বাম তীররেখা ধরিয়া ছুটিয়া চলিল। রট্টা একবার চক্ষু ফিরাইয়া পান্থশালার পানে চাহিলেন; তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। মনে হইল, চির পরিচিত গৃহ ছাড়িয়া কোন্ অজানা নিরুদ্দেশের পথে চলিয়াছেন।

* * *

দ্বিপ্রহরের সূর্য মধ্যাকাশে উঠিয়াছে।

চিত্রক ও রট্টা এক বিশাল শিংশপা বৃক্ষের তলে আসিয়া অশ্ব থামাইলেন। নদীটি এইখানে ঈষৎ বক্র হইয়া নৈঋত কোণে চলিয়া গিয়াছে; পরপারের ভূমি শিলা-বন্ধুর ও উচ্চ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা উপত্যকার পশ্চিমপ্রান্ত বলা যাইতে পারে।

চিত্রক চারিদিক অবলোকন করিয়া বলিল—'এবার নদী পার হইতে হইবে।'

রট্টা বলিলেন—'নদীর জল যদি গভীর হয়?'

চিত্রক নদীর অর্ধস্বচ্ছ জলের ভিতর দৃষ্টি প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'না, নদীগর্ভ প্রস্তরময়, স্রোতও মন্দ, সুতরাং অগভীর হইবার সম্ভাবনা। যাহোক তাহা পরে পরীক্ষা করা যাইবে, আপাততঃ আহার ও বিশ্রামের প্রয়োজন।'

রট্টা যেন এই প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, তিনি অশ্ব হইতে নামিয়া তরুচ্ছায়ার শষ্পাসনে বসিলেন। চিত্রক অশ্বদুটিকে বল্গা ধরিয়া নদীর তীরে লইয়া গিয়া জলপান করাইল; তারপর তাহাদের যথেচ্ছা বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া, খাদ্যের পোট্টলী লইয়া রট্টার কাছে আসিয়া বসিল।

পোট্টলি খুলিয়া দেখা গেল জম্বুক অনেক খাদ্য

দিয়াছে : যবের পিষ্টক ও তণ্ডুলের পৌলিক ; কয়েকটি শঙ্খাকৃতি শর্করাকন্দ ; এক কুঞ্চি * চণক ও কিছু গুড়। চিত্রক সহাস্যে বলিল—'জম্বুক বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত খাদ্য দিয়াছে যে দুই দিনেও ফুরাইবে না।'

পোট্‌লী মধ্য স্থলে রাখিয়া উভয়ে তাহা হইতে তুলিয়া তুলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। চিত্রক রট্টার প্রতি একটি সকৌতুক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'খাদ্য কেমন লাগিতেছে ?'

রট্টা অর্ধমুদিত নেত্রে বলিলেন—'বড় মিষ্ট।'

চিত্রক তরবারি দ্বারা শর্করাকন্দ কাটিতে কাটিতে বলিল—'ক্ষুধায় চায় না সুধা। বৈশ্বানর জ্বলিলে তিন্তিড়ীও মিষ্ট লাগে।'

রট্টা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

আহার শেষ হইলে চিত্রক পুটুলি আবার সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। দুইজনে নদীতীরে গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জলপান করিলেন। তারপর আবার তরুচ্ছায়া তলে আসিয়া বসিলেন। রট্টা তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিয়া অজিনের ন্যায় ঘন শষ্পশয্যায় অর্ধ-শয়ান হইলেন।

চিত্রক জিজ্ঞাসা করিল—'আপনার কি ক্লান্তি বোধ হইতেছে ?'

'না, আমি প্রস্তুত।' বলিয়া রট্টা উঠিবার উপক্রম করিলেন।

চিত্রক বলিল—'ত্বরা নাই। অশ্বদুটির আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম প্রয়োজন।'

অশ্বদুইটি ইতিমধ্যে শষ্পাহরণ করিতে করিতে নদী-তীর হইতে কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছিল ; অলস নেত্রে তাহাদের একবার দেখিয়া লইয়া চিত্রকও শ্যামল তৃণশয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর রট্টা ধীরে ধীরে যেন আত্মগতভাবে বলিলেন—'পৃথিবীতে যদি যুদ্ধবিগ্রহ স্বার্থপরতা কুটিলতা না থাকিত !'

চিত্রক চক্ষু মুদিত করিয়া একটু হাসিল।

রট্টা বলিলেন—'কেন এই হিংসা ? কেন এত লোভ ? এত কাড়াকাড়ি ? আর্য চিত্রক, আপনি বলিতে পারেন ?'

চিত্রক উঠিয়া বসিল ; কিছুক্ষণ নত নেত্রে চিন্তা করিয়া বলিল—'না। বোধহয় ইহাই মানুষের নিয়তি। মানুষ যাহা চায় তাহা পাইবার অন্য উপায় জানেনা বলিয়াই যুদ্ধ করে, হিংসা করে।'

'কিন্তু অন্য উপায় কি নাই ?'

চিত্রক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল—'জানিনা। হয় তো আছে—'

নদীর দিকে চক্ষু তুলিয়া চিত্রক সহসা নীরব হইল। রট্টা তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলেন, নদীর পরপারে প্রায় ত্রিশ দণ্ড দূরে একটি সুন্দর শৃঙ্গধর মৃগ মদগর্বিত পদক্ষেপে আসিতেছে। নদীর কূলে আসিয়া সে জলপান করিল, তারপর নির্ভয়ে নদী উত্তরণ করিয়া এপারে আসিয়া উপস্থিত হইল, নদীর জল তাহার উদর স্পর্শ করিল না। সে বৃক্ষচ্ছায়ায় মানুষের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে নাই, প্রত্যাশাও করে নাই। তীরে উঠিয়া সহসা তাহাদের দেখিতে পাইয়া নিমেষ মধ্যে অতি দীর্ঘ লম্ফ প্রদানপূর্বক বিদ্যুদ্বেগে পলায়ন করিল।

চিত্রক হাসিয়া উঠিল। পোট্‌লী হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল—'চলুন এবার যাত্রা করি। নদীর গভীরতা সম্বন্ধে প্রশ্নের সমাধা হইয়াছে।'

* * *

পশ্চিম দিগ্বলয় সুরঞ্জিত করিয়া সূর্য অস্ত যাইতেছে। চারিদিকে পাহাড় ; দীর্ঘশায়িত অনুচ্চ পর্বতের শ্রেণী, মাঝে মাঝে প্রস্তরের স্কন্ধ উচ্চ হইয়া আছে। পর্বত-গাত্রে সর্বত্র বর্বুর ও বন-বদরীর গুল্ম। এই দৃশ্যের মধ্যস্থলে অশ্বারূঢ় চিত্রক ও রট্টা দাঁড়াইয়া।

রট্টা নীরবে চিত্রকের পানে চাহিলেন ; তাঁহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাঁহাদের পর্বত-লঙ্ঘনের চেষ্টা বহু পথে বিপথে আবর্তিত হইয়া এই কুটিল গিরি-সঙ্কটের চক্রে আবদ্ধ হইয়াছে। রাত্রি আসন্ন ; স্থান এখনও সুদূর পরাহত।

এ সময় দূরাগত দুন্দুভির ডিণ্ডিম শব্দ তাঁহাদের কর্ণে আসিল ; শব্দ নয়, স্থির বায়ুমণ্ডলে একটা অস্পষ্ট স্পন্দন মাত্র। চিত্রক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল ; তারপর রট্টার দিকে ফিরিয়া বলিল—'স্কন্ধাবারে সন্ধ্যার ভেরী বাজিতেছে। শুনিলেন ?'

---

* খুঁচি ; অষ্ট মুষ্টি পরিমাণ।

রট্টা বলিলেন—'হাঁ। এখান হইতে কতদূর অনুমান হয়?'

চিত্রক ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'সিধা আকাশ পথে অন্তত এক যোজন। আজ স্কন্ধাবারে পৌঁছানো অসম্ভব।'

'তবে—?'

চিত্রক চারিদিকে চাহিল।

'এই স্থানেই রাত্রি কাটাইব। এখানে জল আছে।' বলিয়া সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কিছু দূরে নগ্ন পর্বত গাত্র প্রাচীরের ন্যায় উর্ধ্বে উঠিয়াছে; তাহার অঙ্গ বহিয়া ক্ষীণ ধারায় জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

'আসুন, আলো থাকিতে থাকিতে রাত্রির জন্য একটা আশ্রয়স্থল খুঁজিয়া লইতে হইবে।' বলিয়া চিত্রক অশ্ব চালাইল।

গিরি-স্রুত জলধারা যেখানে সঞ্চিত হইয়াছে তাহার চারিপাশে তৃণ জন্মিয়াছে। চিত্রক ও রট্টা অশ্বদুটিকে এই স্থানে ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজে এই পর্বত স্কন্ধের পাদমূলে ইতস্তত খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়া একটি গুহা দেখা গেল। ঠিক গুহা নয়, দুইটি বিশাল পাষাণ খণ্ড পরস্পরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া অধোদেশে ক্ষুদ্র একটি কোটর রচনা করিয়াছে। পর্বতের তুলনায় কোটর ক্ষুদ্র হইলেও দুইটি মানুষ তাহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে রাত্রি যাপন করিতে পারে। রন্ধ্রমুখ ক্ষুদ্র বটে কিন্তু ভিতরে বেশ পরিসর।

গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া রট্টা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন—'এই তো সুন্দর গৃহ পাওয়া গিয়াছে।'

চিত্রক হাসিল—'সুন্দর গৃহই বটে! আদিম যুগের মানব মানবী বোধ করি এমনই গৃহে বাস করিত। যাহোক, মুক্ত আকাশের তলে রাত্রিযাপন অপেক্ষা এ ভাল। আপনি অপেক্ষা করুন।' বলিয়া সে ছুটিয়া গিয়া অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে কম্বলাসন দুইটি লইয়া আসিল, রট্টার পদপ্রান্তে রাখিয়া বলিল, 'আপনি গৃহের সাজসজ্জা করুন, আমি অন্য চেষ্টা করিতেছি।'

দিনের আলো দ্রুত ফুরাইয়া আসিতেছে। চিত্রক ত্বরিতে বর্বুর-গুল্ম ও বদরী বনের মধ্য হইতে শুষ্ক শাখাপত্র কুড়াইয়া আনিয়া গুহার ভিতর জমা করিতে লাগিল। এইরূপে শুষ্ক পত্র ও কাষ্ঠের স্তূপ প্রস্তুত হইলে সে একখণ্ড প্রস্তরের উপর তরবারির লৌহ পুনঃপুন আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল।

কিছুক্ষণ মন্থনের পর অগ্নি জ্বলিল; চড়্ চড়্ পট্ পট্ শব্দ করিয়া শুষ্ক শাখাপত্র জ্বলিতে লাগিল।

রট্টা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'আর আমাদের অভাব কি? অগ্নি-দেবতাও উপস্থিত!' বলিয়াই তিনি সহসা লজ্জায় রক্তমুখী হইয়া উঠিলেন।

অগ্নির দুই পাশে দুইটি কম্বল পাতিয়া চিত্রক বলিল—'আপনি বসুন, আমি অশ্ব দুটির ব্যবস্থা করিয়া আসি।'

চিত্রক বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখন দিবা-দীপ্তি প্রায় নির্বাপিত হইয়াছে।

রট্টা প্রোজ্জ্বল অগ্নিশিখার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, জীবন কী অদ্ভুত, কী ভয়ঙ্কর, কী সুন্দর! এতদিন তিনি কেবল বাঁচিয়াছিলেন, আজ প্রথম জীবনের স্বাদ পাইলেন।

চিত্রক ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, রট্টা মস্তক হইতে উষ্ণীষ মোচন করিয়াছেন। অগ্নিশিখার চঞ্চল আলোকে ছদ্মবেশমুক্ত সুন্দর সুকুমার মুখখানি দেখিয়া চিত্রকের চিত্ত ক্ষণকালের জন্য যেন স্ফুলিঙ্গের মতো চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ মনকে সংহত করিয়া সহজভাবে বলিল—'ঘোড়া দুটিকে বল্গা খুলিয়া ছাড়িয়া দিলাম। এদিকে যদি শ্বাপদ থাকে—সম্ভবত নাই—তাহারা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।'

শ্বাপদ! এই পার্বত্য বনানীর মধ্যে শ্বাপদ থাকিতে পারে একথা রট্টার মনে আসে নাই।

চিত্রক রট্টার সম্মুখে খাদ্যের পুঁটুলি রাখিয়া বলিল—'এইবার আহার।'

দুইজনে এক কম্বলাসনে বসিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। পিষ্টক পৌলিক কিছু অবশিষ্ট ছিল, চিত্রক সেগুলি রট্টাকে দিয়া নিজে শুষ্ক চণক চিবাইতে লাগিল। রট্টা তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন; কিছু বলিলেন না। তিনিও দুই চারিটি চণক লইয়া মুখে দিলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে আহার চলিবার পর চিত্রক বলিল—'আপনার এই দুর্দশার জন্য আমি বড় কুণ্ঠাবোধ করিতেছি।'

রট্টা বলিলেন—'আপনার কুণ্ঠা কেন? আমি তো স্বেচ্ছায় আসিয়াছি।'

চিত্রক বলিল—'কিন্তু আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম।'

রট্টা দৃঢ়স্বরে বলিলেন—'অন্যায় প্রস্তাব করেন নাই। এ পর্বত যে এত দুর্গম তাহা আপনি জানিতেন না।'

চিত্রক অগ্নিতে একটি শাখাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'তাহা সত্য। তবু ভয় হয়, আপনি সন্দেহ করিতে পারেন আমার কোনও দুরভিসন্ধি আছে—'

'আর্য চিত্রক!' রট্টার চক্ষুদুটি দীপ্ত হইয়া উঠিল—'আমার অন্তঃকরণ এত নীচ মনে করিবেন না।'

চিত্রক দীনকণ্ঠে বলিল—'ক্ষমা করুন, রাজকুমারী। কিন্তু আপনার ক্লেশের নিমিত্ত হইয়া আমি প্রাণে শান্তি পাইতেছি না।'

রট্টা তেমনই উদ্দীপ্তস্বরে বলিলেন—'আপনি আমার ক্লেশের নিমিত্ত হন নাই। আর ক্লেশ! স্ত্রীজাতির কিসে ক্লেশ হয় তাহা আপনি কী বুঝিবেন?'

চিত্রকের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল। সে আর কথা কহিল না। স্ত্রীলোকের কিসে ক্লেশ হয়—কিসে সুখ হয়, তাহা অধম যুদ্ধজীবী কি করিয়া বুঝিবে? স্ত্রীজাতির চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না, মানুষ কোন্ ছার। কিন্তু তবু, রট্টা যশোধরা নাম্নী এই যুবতীটির চরিত্র যতই রহস্যময় হোক, তাহা যে অনন্য, অনিন্দ্য এবং অনবদ্য তাহাতে চিত্রকের মনে সংশয়মাত্র রহিল না।

আহারের পর দুইজনে গুহার বাহিরে জলাধারে গিয়া জলপান করিলেন। চিত্রক একটি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড হাতে লইয়া আলো দেখাইল। বাহিরে তখন গাঢ় অন্ধকার চারিদিকে ছাইয়া গিয়াছে; কেবল এখানে ওখানে কয়েকটি জ্যোতিরিঙ্গণ নীল নেত্রানল জ্বালিয়া কোন্ অলক্ষ্য বস্তুর সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

গুহায় ফিরিয়া আসিয়া চিত্রক অবশিষ্ট কাষ্ঠগুলি অগ্নিতে সমর্পণপূর্বক বলিল—'এইবার শয়ন।'

এক পাশে রট্টা শয়ন করিলেন, অন্য পাশে চিত্রক। মধ্যস্থলে অগ্নিদেবতা জাগ্রত রহিলেন।

শয়ন করিয়া চিত্রক চক্ষু মুদিত করিল। আজিকার এই অপরূপ পরিস্থিতি, রট্টার সহিত এই কক্ষে দুই হস্ত ব্যবধানে শয়ন, চিত্রকের স্নায়ুমণ্ডলে আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চিন্তাগুলি মস্তিষ্কের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিবার পূর্বেই ছায়াবাজির ন্যায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল। দুই দিন অশ্বপৃষ্ঠে এবং এক রাত্রি বিনিদ্র চক্ষে যাপন করিয়া তাহার লৌহময় শরীরেও ক্লান্তি প্রবেশ করিয়াছিল। সে অচিরাৎ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

* * *

মধ্য রাত্রির পর চিত্রক জাগিয়া উঠিল। একেবারে পরিপূর্ণ চেতনা লইয়া উঠিয়া বসিল। অগ্নি নিঃশেষ হইয়া নিভিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তাহার মধ্যে চিত্রক অনুভব করিল, রট্টা আসিয়া তাহার বাহু চাপিয়া ধরিয়াছেন, তাহার কানে কানে বলিতেছেন—'ঐ দেখুন—গুহার দ্বারের দিকে দেখুন—'

গুহামুখের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া চিত্রক দেখিল, অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ দুইটি চক্ষু তাহাদের পানে চাহিয়া আছে। অন্ধকারে এই অঙ্গার-চক্ষু জীবের শরীর দেখা যাইতেছে না; মাঝে মাঝে চক্ষুর পলক পড়িতেছে—

চিত্রক জানিত হিংস্র জন্তুর চক্ষু অন্ধকারে রক্তবর্ণ দেখায়; সুতরাং এই জন্তুটা তরক্ষু হইতে পারে, আবার ব্যাঘ্রও হইতে পারে। বোধহয় গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু ক্রমে সাহস পাইবে; রক্ত-লোলুপতার কাছে ভয় পরাজিত হইবে।—

চিত্রকের দেহের পেশীগুলি শক্ত হইয়া উঠিল। রট্টা তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া তাহার বাহু জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন; কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—'উহা কি ব্যাঘ্র?'

চিত্রক রট্টার কথার উত্তর দিল না। তৎপরিবর্তে তাহার কণ্ঠ হইতে এক দীর্ঘ-বিকট শব্দ বাহির হইল। শব্দ এত বিকট ও ভয়ঙ্কর যে কোনও হিংস্র জন্তুর কণ্ঠ হইতে এরূপ শব্দ বাহির হয় না; অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত এবং তূর্যনিনাদ মিশাইয়া এইরূপ ঘোর শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে।

এই নিনাদ থামিবার পূর্বেই গুহা-মুখ হইতে রক্তচক্ষু দুইটি সহসা অন্তর্হিত হইল; বাহিরে শুষ্ক পত্রাদির উপর

পলায়মান জন্তুর দ্রুত পদধ্বনি ক্ষণেক শুনা গেল। তারপর আবার সব নিস্তব্ধ।

চিত্রকের মুখ-নিঃসৃত রোমহর্ষণ শব্দ শুনিয়া রট্টার সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল। চিত্রক এখন তাঁহাকে কোমল স্বরে বলিল—'রাজকুমারি, আর ভয় নাই, জন্তুটা পালাইয়াছে।'

রট্টা মুখ তুলিলেন। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। রট্টা ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'ও কী ভয়ানক শব্দ! আপনি করিলেন?'

চিত্রক বলিল—'হাঁ। উহার নাম সিংহনাদ। যুদ্ধকালে ঐরূপ হুঙ্কার ছাড়িবার প্রথা আছে।'—বলিয়া লঘুকণ্ঠে হাসিল।

রট্টা একটি অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলিগুলি নামিয়া আসিয়া চিত্রকের অঙ্গুলি জড়াইয়া লইল; তাঁহার কপোল চিত্রকের বাহুর উপর ন্যস্ত হইল।

চিত্রক উদ্‌গত হৃদয়াবেগ দমন করিয়া বলিল—'রাজকুমারি—'

অস্ফুটকণ্ঠে রট্টা বলিলেন—'রাজকুমারী নয়, বলো রট্টা।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক কম্পমানকণ্ঠে বলিল—'রট্টা!'

'বলো রট্টা যশোধরা।'

'রট্টা যশোধরা।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর রট্টা বলিল—'আজ অন্ধকার আমার লজ্জা ঢাকিয়া দিয়াছে তাই বলিতে পারিলাম। তুমি আমার। জন্মজন্মান্তরে আমি তোমার ছিলাম, এজন্মেও তোমার। পরজন্মেও তোমার হইব।'

হৃদয়তন্ত্র ছিঁড়িয়া চিত্রক বলিল—'রট্টা, তুমি জান না আমি কে! যদি জানিতে—'

রট্টার অন্য হস্তটি আসিয়া চিত্রকের অধর স্পর্শ করিল; সে পূর্ববৎ শান্ত অস্ফুট স্বরে বলিল—'আমি আর কিছু জানিতে চাহি না। তুমি ক্ষত্রিয়, তুমি বীর, তুমি মানুষ—কিন্তু এ সকল অবান্তর কথা। তুমি আমার, ইহাই আমার কাছে যথেষ্ট। চিত্রকের স্কন্ধের উপর মাথাটি সুবিন্যস্ত করিয়া বলিল—'এখন আমি ঘুমাইব; আমার চক্ষু ঢুলিয়া আসিতেছে—' অন্ধকারে ক্ষুদ্র একটি জৃম্ভণের শব্দ হইল।

'তুমি কি আজ ঘুমাও নাই?'

'না। তুমি ঘুমাইলে, আমার ঘুম আসিল না। কী অদ্ভুত মানুষ তুমি, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে জাগিয়া রহিলাম। তাই তো ঐ শ্বাপদের চক্ষু দেখিতে পাইলাম। —কিন্তু এখন ঘুমাইব। তুমি কাল রাত্রে যেমন জাগিয়া ছিলে আজও তেমনি জাগিয়া থাক।' একটু হাসির শব্দ হইল; তারপর রট্টা চিত্রকের স্কন্ধে মাথা রাখিয়া ঘুমাইল। তাহার নিশ্বাস ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল।

চিত্রক উদ্বেল হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

* * *

ঊষার আলোক গুহার রন্ধ্র-মুখ পরিস্ফুট করিলে রট্টার ঘুম ভাঙিল; সে হাসি-ভরা চোখ তুলিয়া চাহিল। চিত্রকের বিনিদ্র চক্ষু তাহাকে নূতন দিনের অভিবাদন জানাইল।

'রট্টা যশোধরা!'

'আর্য!'

দুই জনের মধ্যে দীর্ঘ গভীর দৃষ্টি বিনিময় হইল। তারপর তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিত্রক বলিল—'চল, এখনও অনেক কাজ বাকি।'

সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাহারা আবার বাহির হইল।

জটিল শিলাবন্ধুর পথ; তাহাও কণ্টকগুল্মে আবৃত। কখনও একটি পথ বহুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখা যায়, আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই; দুর্ভেদ্য কণ্টকগুল্ম কিম্বা দুরারোহ শৈল-প্রাচীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া নূতন পথ ধরিতে হয়।

পর্বত শ্রেণীরও যেন শেষ নাই; একটির পর আর একটি। অতি কষ্টে এক পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দেখা যায় সম্মুখে আর একটি পাহাড়। গন্তব্য স্থানের চিহ্ন নাই।

দ্বিপ্রহর অতীত হইল। অবশেষে বহু আয়াসে কয়েকটি পর্বতপৃষ্ঠ অতিক্রম করিবার পর একটির শীর্ষে উঠিয়া তাহারা হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল। সম্মুখেই উপত্যকা।

উপত্যকাটি সুচিত্রিত পারসিক গালিচার মতো তাহাদের নেত্রতলে প্রসারিত হইয়া আছে। আয়তনে অনুমান দশ ক্রোশ বর্গ হইবে। এই সুবিশাল ভূমিখণ্ডের উপর তিল ফেলিবার স্থান নাই। যতদূর দৃষ্টি যায় অগণিত শিবির—বস্ত্রাবাস, তালপত্রের ছত্রাবাস; তাহাদের ফাঁকে

কাঁকে পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্কন্ধাবারের বাম প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অশ্বের আগড়; শ্বেত কৃষ্ণ পিঙ্গল নানা বর্ণের অসংখ্য অশ্ব; কম্বোজ সিন্ধু আরট্ট বনায়ু—নানাজাতায় তীক্ষ্ণ-বীর্য রণ-অশ্ব। অন্য প্রান্তে স্কন্ধাবারের দক্ষিণ দিকে নিদাঘের মেঘাড়ম্বরবৎ হস্তীর পাল; মদস্রাবী হস্তিপুঞ্জ গল ঘণ্টা বাজাইয়া দুলিতেছে, শূন্যে শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে, বৃংহিতধ্বনি করিতেছে।

এই বিক্ষুব্ধ সমুদ্র তুল্য সৈন্যাবাস দেখিয়া রট্টার মুখ শুকাইল। চিত্রক তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—'ভয় নাই, আমার কাছে মন্ত্রপূত কবচ আছে।—ঐ যে মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ বৃহৎ পট্টাবাস দেখিতেছ উহাই সম্রাটের শিবির। ঐ খানে আমাদের পৌঁছিতে হইবে।'

অতঃপর তাহারা পর্বতগাত্র অবরোহণ করিয়া উপত্যকায় নামিল। কিন্তু এখনও তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক শেষ হয় নাই। একদল অশ্বারোহী শিবির-রক্ষী আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল। কে তোমরা? কী অভিপ্রায়?

চিত্রক স্কন্দগুপ্তের অভিজ্ঞান-মুদ্রা দেখাইয়া পরিত্রাণ পাইল। তারপর আরও কয়েকবার রক্ষীরা তাহাদের গতিরোধ করিল; সাধারণ সৈনিকরা নূতন লোক দেখিয়া রঙ্গ তামাসা করিল। কিন্তু ভাগ্যবলে রট্টাকে নারী বলিয়া কেহ চিনিতে পারিল না।

অবশেষে তাহারা স্কন্দগুপ্তের প্রহরি-বেষ্টিত শিবির সম্মুখে উপস্থিত হইল; অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শূলধারী প্রধান দ্বারপালের সম্মুখে দাঁড়াইল।

দ্বারপাল বলিল—'কি চাও?'

চিত্রক বলিল—'ইনি বিটঙ্ক রাজার রাজদুহিতা কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরা—পরম ভট্টারক সম্রাট স্কন্দগুপ্তের সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।' বলিয়া রট্টার মস্তক হইতে উষ্ণীষ খুলিয়া লইল। বন্ধনমুক্ত বিসর্পিল বেণী রট্টার পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

বৃশ্চিক রাশি

আপনার জন্মরাশি যদি বৃশ্চিক হয়, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে বৃশ্চিক নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনার প্রকৃতিতে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতা খুব বেশী পরিস্ফুট। আপনি দৃঢ়চিত্ত ও স্থির-প্রতিজ্ঞ। নিজের মতবাদ বা কর্মধারা কারো প্ররোচনায় বদলাতে চান না। আপনি পুরোমাত্রায় রক্ষণশীল, যদিও নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে বাইরে সংস্কারক বা উদার-পন্থীর ভাব দেখাতে পারেন, কিন্তু তা কখনই আপনার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত করে না। শুধু এইখানেই নয়, অন্য সকল ব্যাপারেও আপনার আসল মনোভাবের সবখানি কখনও বাইরে প্রকাশ পায় না। মন্ত্রগুপ্তিতে আপনার যথেষ্ট দক্ষতা থাকাই সম্ভব।

কর্মশক্তি আপনার যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং নিজের অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য যে কোন রকম কষ্ট স্বীকারে আপনি পরাঙ্মুখ হন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধি কৌশলের চেয়ে ব্যক্তিত্বের জোর, ইচ্ছা-শক্তির প্রাবল্য এবং অবিরত চেষ্টা দ্বারা আপনি সাফল্য অর্জন করেন।

আপনার মনের আবেগ প্রায়ই প্রবল ও প্রচণ্ড হ'য়ে থাকে এবং বিশেষ সতর্ক না হ'লে, আবেগের প্রাবল্যে আপনার বাক্য ও আচরণ শোভনতা ও শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম ক'রে যেতে পারে। আপনার মধ্যে সৌন্দর্য-বোধ ও রসোপলব্ধির বীজ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা স্থূল গণ্ডীর মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে।

আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এবং গভীর মনোবেগ দুইই আপনার মধ্যে প্রবল এবং যদিও অনেক সময় অভীষ্ট

সিদ্ধি বা প্রতিষ্ঠালাভের জন্ম আপনি মনোভাব গোপন ক'রে বাইরের আচরণ সংযত করতে পারবেন, তাহ'লেও এক এক সময় প্রচণ্ড আবেগের বশবর্তী হ'য়ে এমন কাজ করে বসতে পারেন যা আপনার প্রতিষ্ঠাহানি বা অন্য কোনরকম বিপর্যয়ের কারণ হ'তে পারে।

আপনার পছন্দ অপছন্দ বেশ পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট এবং তা সব সময় যুক্তি-বিচার মেনে চলে না। পরমত-সহিষ্ণুতা আপনার মধ্যে খুব বেশী নেই। বিরোধী মতের মধ্যে যে কিছু সত্য থাকতে পারে, এ ধারণা করা আপনার পক্ষে কঠিন। তর্ক বিতর্কে আপনার কথার মধ্যে যুক্তির চেয়ে প্রত্যয়ের প্রাবল্যই প্রকাশ পায় বেশী। অনেক সময় শুধু জোরাল কথা দিয়েই আপনি শ্রোতাকে মুগ্ধ ও অভিভূত করতে পারেন, অন্ততঃ সাময়িকভাবে।

আপনার রিপুগুলি দুর্দমনীয় হ'য়ে উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। ক্রোধ আপনার প্রচণ্ড হ'তে পারে এবং তা সহজে শান্ত হ'তে চায় না। কেউ আপনার অনিষ্টের চেষ্টা করলে, প্রতিশোধের স্পৃহা অনেকদিন পর্যন্ত মন থেকে লোপ পায় না এবং ক্রোধের বেগ শান্ত হ'য়ে এলেও, বাইরে ক্রোধের কোন চিহ্ন প্রকাশ না পেলেও সুযোগ পাওয়া মাত্র শত্রুকে সাংঘাতিক-ভাবে দংশন করতে ছাড়েন না।

আপনার মধ্যে কর্মপটুত্ব প্রকাশ পাবে এবং সাধারণতঃ আপনি শ্রমকাতরও নন। ঝোঁক চাপলে দীর্ঘকাল একটানা পরিশ্রম করে যেতে পারেন ; কিন্তু যেখানে স্বার্থ-সম্বন্ধ নেই অন্ততঃ যেখানে ভবিষ্যতেও নিজের ব্যক্তিগত কোন লাভের আশা নেই, সেখানে আপনি একেবারে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকেন।

আপনার মধ্যে নিজেকে বড় ক'রে তোলার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকা সম্ভব, যার জন্য আপনার আত্মপ্রশংসা স্থানে অস্থানে অশোভনভাবে প্রকাশ পেতে পারে। শিক্ষা ও সংসর্গের দ্বারা যদি বিশেষভাবে মার্জিত না হয়, তাহ'লে আপনার রুচি প্রায়ই স্থূলত্বর আশ্রয় ক'রেই অভিব্যক্ত হবে। শিক্ষা দ্বারা মার্জিত হ'লেও এক এক সময় সুরুচি বা শ্লীলতার অভাব আপনার কথাবার্তায় বা আচরণে ব্যক্ত হ'য়ে পড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে বস্তুর সৌন্দর্যের চেয়ে মহার্ঘতার গুরুত্বই আপনার কাছে বেশী। আপনার গৃহসজ্জা, আসবাবপত্র, বসন-ভূষণ ইত্যাদির বহুমূল্যতা অপরকে জানিয়ে যত খুশী হন, এত আর কিছুতে নয়।

আপনি যদি প্রবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেন, তাহ'লে নানা-রকমের ঝঞ্ঝাট ও উদ্বেগে জীবনে শান্তি পাবেন না। আপনার প্রবৃত্তিগুলি প্রবল হ'লেও তাদের দমন করার শক্তিও আপনার আছে। একবার যদি আপনার মনে এ ধারণা জন্মায় যে, প্রবৃত্তিগুলি সংযত না করতে পারলে আপনি উন্নতি করতে পারবেন না, তখন প্রবৃত্তির সকল তাড়না আপনি সবলে সংযত করতে পারেন।

অর্থভাগ্য

আর্থিক উন্নতির জন্য আপনাকে দস্তুরমত লড়াই করতে হবে, বিশেষতঃ প্রথম জীবনে। কখন কখন উপার্জনের এমন কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে যা সম্পূর্ণ নীতি-সঙ্গত নয়, অথবা যাকে সমাজ নিন্দনীয় ব'লে মনে করতে পারে। উপার্জনের ব্যাপারে পিতামাতা বা নিকট-আত্মীয়ের তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যের আশা করলে হতাশ হ'তে হবে। বরঞ্চ পরিবারের জন্য ব্যয়বাহুল্য আপনার অর্থসঞ্চয়ের বিঘ্ন হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু যদি অপরিমিত ব্যয়ের প্রবণতা সংযত করতে পারেন, তাহ'লে জীবনের শেষার্ধে আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি নিশ্চয় হবে। কোন নীচ ব্যক্তির বা বিধর্মীর সংশ্রবে অথবা কোন গুপ্ত উপায়ে অথবা অপর কারো কোন বিপদ বা দুর্ঘটনার ব্যাপার থেকে আপনার সহসা প্রভূত প্রাপ্তি হ'তে পারে। তাছাড়া কোন গোপনীয় ব্যাপারে অপরের সহযোগিতা ক'রেও একযোগে কিছু প্রাপ্তি অসম্ভব নয়।

কর্মজীবন

কর্মজীবনে আপনি অনেক মুরুব্বি ও বন্ধু পাবেন যাঁরা আপনার উন্নতিতে সাহায্য করবেন। কিন্তু তবুও কর্ম-জীবনে পূর্ণ উন্নতিতে কম-বেশী বিঘ্ন উপস্থিত হবে। কর্মস্থলে আপনার শত্রুও অনেক থাকবে, যারা আপনার উন্নতি ঈর্ষার চক্ষে দেখবে এবং নানা রকমে আপনার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করবে। বিদেশী বা বিধর্মী কোন শত্রুর ষড়যন্ত্রে কর্মস্থানে আপনার মানহানি বা

অপযশের আশঙ্কা আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আপনার নিজের চেষ্টায় ও কোন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সাহায্যে অপযশ নাশ হ'য়ে প্রতিষ্ঠালাভ হবে। শেষবয়সে আপনার কর্মে যথেষ্ট উন্নতি হবে কিন্তু একেবারে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্তিতে কম-বেশী বিঘ্ন ঘটবে, অথবা শ্রেষ্ঠপদ পেয়ে পুনরায় পতন হওয়াও অসম্ভব নয়। মোটকথা কর্মজীবনের শেষে কিছু আশাভঙ্গের দুঃখ সম্ভব। আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগবে যাতে সাহস এবং স্নায়ুশক্তির পরিচয় দিতে হয়। যে সব কাজ অপরে বিপজ্জনক ব'লে মনে করে, সেই সব কাজ আপনাকে সহজেই আকর্ষণ করবে। যার মধ্যে কোনরকম গোপনীয়তা আছে এবং যেখানে নিজের কৃতিত্ব স্থাপন করবার সুযোগ আছে সেই কাজে আপনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। সামরিক বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, মিল, ফ্যাক্টরী ইত্যাদির কাজেও আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পাবে। যার সঙ্গে অপরের বিপদ-আপদের সংশ্রব আছে বা যে সব কাজে দুর্গম স্থানে যাওয়া বা বাস করা প্রয়োজন হয়, সে সকল কাজেরও দক্ষতা আপনার থাকা সম্ভব। সব রকম ইন্সিওরেন্সের কাজ, চিকিৎসকের কাজ, খনি বা ভূতত্ত্ববিদের কাজ, পর্যটকের কাজ প্রভৃতি যে কোনটা ক'রে আপনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেন। এছাড়া, যেখানে বহু শ্রমজীবী বা নীচ-জাতীয় ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয় সেখানেও কাজ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

পারিবারিক

ভ্রাতৃভাগ্য আপনার ভাল নয়। ভ্রাতা না হওয়াই সম্ভব। হ'লেও তাদের সংখ্যা কমই হবে। ভ্রাতা ভগ্নী বা আত্মীয়-স্বজনের সংশ্রব খুব সুখকর হবে না। ভ্রাতা থাকলে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে এবং ভ্রাতা-ভগ্নীদের দ্বারা বা তাদের জন্য আপনার সাফল্যে বিঘ্ন বা আর্থিক ক্ষতিও অসম্ভব নয়।

আপনার জন্মের কাছাকাছি সময়ের কিছু আগে বা পরে পরিবারের মধ্যে কোন মৃত্যুঘটনার আশঙ্কা আছে, অথবা পারিবারিক আবেষ্টনে বা গৃহস্থালীর ব্যাপারে কোনরকম ওলট পালট হ'তে পারে। জাবনে উন্নতির পথে পিতামাতার পক্ষ থেকে কোন উল্লেখযোগ্য সাহায্য প্রায়ই পাবেন না। পিতামাতার মধ্যে একজনকে আপনি অল্প বয়সেই হারাতে পারেন, কিম্বা আপনার জন্মের পর তাঁদের কোন অনিষ্ট বা ভাগ্য বিপর্যয় হ'তে পারে।

আপনার সন্তান বেশী হওয়াই সম্ভব এবং সন্তানের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ প্রতিষ্ঠা পেতে পারে। কিন্তু তেমনি কোন সন্তানের জন্য পারিবারিক অশান্তি বা কোনরকম অপবাদও হ'তে পারে। সন্তানের জন্য ও গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনার বহু ব্যয় হবে। কোন পুত্র বা কন্যার বিবাহে বা দাম্পত্যজীবনের সংশ্রবে কোন বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে, তা সে ঘটনা সুখকরই হোক্ আর দুঃখকরই হোক্।

বিবাহ

বিবাহ আপনার জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে। বিবাহসূত্রে কিছু প্রাপ্তি সম্ভব, কিম্বা বিবাহের পর অবস্থার কিছু উন্নতি কি কোনরকম সাফল্য বা প্রতিষ্ঠা লাভ হ'তে পারে। কিন্তু আপনার দাম্পত্যজীবন খুব সুখকর না হওয়াই সম্ভব। আপনার মধ্যে যৌন আকর্ষণ প্রবল হ'লেও, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আপনি দাম্পত্য ব্যাপারে কতকটা উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা প্রভুত্বপ্রিয়তা আপনার দাম্পত্যসুখের অন্তরায় হ'তে পারে। যদি এমন কারো সঙ্গে আপনার বিবাহ হয় যাঁর জন্মমাস জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ অথবা চৈত্র, কিম্বা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের তৃতীয়া বা কৃষ্ণপক্ষের দশমী, তাহ'লে আপনার দাম্পত্যজীবন কতকটা সুখকর হ'তে পারে। একটা কথা মনে রাখা উচিত, পুরুষের পক্ষে বৃশ্চিক রাশি দাম্পত্যজীবনের যতটা প্রতিকূল, স্ত্রীলোকের পক্ষে ততটা নয়।

বন্ধুত্ব

যদিও কর্মের সংশ্রবে আপনার বহু ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হবে, তাহ'লেও সামাজিক জীবনে বন্ধু আপনি খুব কমই পাবেন। অবশ্য অনেক উচ্চপদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং বন্ধুদের উপকারের জন্য আপনি মধ্যে মধ্যে চেষ্টাও করবেন, কিন্তু বিদেশে দু'চারজন বন্ধু ছাড়া অপর কারো কাছ থেকে বিশেষ উপকার পাবেন না। বিশেষ ক'রে আপনার কোন তথাকথিত বন্ধু গুপ্ত শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে বিশেষ

ভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা করতে পারে। যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সম্ভব হয়—তা হবে এমন কারো সঙ্গে যাঁর জন্মমাস শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ অথবা চৈত্র কিম্বা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের তৃতীয়া বা কৃষ্ণপক্ষের দশমী।

স্বাস্থ্য

আপনার মধ্যে জীবনীশক্তি খুব প্রবল। বাল্যে দেহ কিছু দুর্বল বা রুগ্ন হ'লেও, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তা প্রায়ই বেশ সবল হ'য়ে উঠবে। অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত আপনার ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ ও কর্মক্ষম থাকা সম্ভব, যাতে করে বার্ধক্যেও আপনার মধ্যে যৌবনের একটা আভাষ লক্ষিত হ'তে পারে। আপনার স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল হওয়াই সম্ভব। আপনার শ্রমশক্তিও প্রচুর আছে। সামান্য অনিয়ম, অত্যাচার বা অবহেলা আপনাকে সহজে কাবু করতে পারে না বলে, অনেক সময় এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি হ'য়ে যেতে পারে, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। নতুবা অতিরিক্ত অত্যাচারে কোন দুরারোগ্য কঠিন ব্যাধি দেহকে আশ্রয় করে কোন রকম অঙ্গ-বৈকল্য বা পঙ্গুত্ব নিয়ে আসতে পারে। কোন রকম আঘাতপ্রাপ্তি বা রক্তে বিষক্রিয়া সম্বন্ধেও আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আপনার মধ্যে গুহ্যদেশ বা জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, মস্তিষ্কের পীড়া, দেহে মেদাধিক্য প্রভৃতির প্রবণতা আছে। দেহ সুস্থ রাখতে হ'লে আপনার শারীরিক পরিশ্রম ও নিয়মিত ব্যায়াম আবশ্যক। প্রত্যহ স্নান এবং অঙ্গ-সংবাহন আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করবে।

আহারের ব্যাপারে বিশেষ কোন রুচি-অরুচি আপনার না থাকাই সম্ভব, কিন্তু খাদ্য আপনার পর্যাপ্ত হওয়া চাই এবং খাদ্যে ফলমূল ও পানীয়ের আধিক্য প্রয়োজন। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাব আপনার স্বাস্থ্যহানির কারণ হ'তে পারে। যদিও মধ্যে মধ্যে এক আধদিন উপবাস আপনার স্বাস্থ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে, তবুও দীর্ঘ উপবাস বা ক্রমাগত কিছুদিন অপর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ আপনার স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, এমন কি অসুস্থ অবস্থাতেও আপনার পর্যাপ্ত খাদ্য প্রয়োজন হ'বে। যথোপযুক্ত ব্যায়াম, পর্যাপ্ত আহার এবং মধ্যে মধ্যে বৃক্ষচ্ছায়া-সমাকুল জনকোলাহলবর্জিত স্থানে বাস, আপনার পূর্ণ স্বাস্থ্য সুখভোগের জন্য একান্ত আবশ্যক।

অন্যান্য ব্যাপার

সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্মের উপর আপনার একটা নিষ্ঠা থাকতে পারে—কিন্তু ধর্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন ঔৎসুক্য না থাকাই সম্ভব। ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান বা তীর্থাদি ভ্রমণ অথবা দানধ্যানে আপনার কিছু ব্যয় হ'তে পারে, কিন্তু সে সকল ব্যাপারে প্রকৃত ধর্মের চেয়ে নিজের প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য থাকবে বেশী। তবে যদি কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপারের দিকে ঝোঁক চাপে, তাহ'লে আপনি এমন কাউকে গুরুত্বে বরণ করতে চাইবেন, সিদ্ধপুরুষ বা অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন বলে যাঁর খ্যাতি আছে।

আপনাকে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করতে হবে বটে, কিন্তু ভ্রমণ সব সময়ে সুখকর হবে না। জলযাত্রায়, দূর ভ্রমণে বা তীর্থভ্রমণে কোন বিপদ ঘটতে পারে। চুরি, প্রতারণা, রাহাজানি ইত্যাদির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ারও আশঙ্কা আছে। কিন্তু তেমনি আবার ভ্রমণকালে বা প্রবাসে কোন গুপ্ত ব্যাপারের সংশ্রবে বা কোন নিন্দিত কার্যে মধ্যে মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে কিছু লাভ হওয়াও অসম্ভব নয়।

আপনার জীবনে নানারকম ঝঞ্ঝাট, অশান্তি ও বিপদ-আপদ উপস্থিত হবে বটে, কিন্তু একটা দৈবশক্তি যেন আপনাকে সহজেই তা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ৩, ১৫, ২৭, ৩৯, ৫১ এই সকল বর্ষগুলিতে নিজের অথবা পরিবারস্থ কারো কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, ৯, ২১, ৩৩, ৩৫, ৫৭ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে কোন আনন্দজনক অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে বেগুনী। এই রঙের সব রকম প্রকারভেদই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু রঙ একটু চক্‌চকে হ'লেই ভাল হয়। দেহের অসুস্থ অবস্থায় গাঢ় নীল রঙ উপকারী হ'তে পারে।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন হ'চ্ছে রক্তমুখী নীলা, অ্যামোনিয়া (Amethyst) প্রভৃতি। অসুস্থ অবস্থায় খাঁটি নীলা ধারণ করতে পারেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জনকয়েকের নাম—চার্লস ডিকেন্স, বালজাক, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন, হাক্সলি, এডগার এ্যালেন পো, প্রবর্তকের শ্রীযুত মতিলাল রায়, হায়দর আলি, লর্ড রবার্টস, প্রসিদ্ধ বাগ্মী জন্ ব্রাইট্, প্রসিদ্ধ যাদুকর হ্যারি হুডিনি প্রভৃতি।

মৃগাবতী

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

(১)

সেকালের, সে সময়ের কথা।

সেই প্রাচীনকালে উত্তর ভারতে কৌশাম্বী নামে এক মহানগরী ছিল।...

আজ সমস্ত কৌশাম্বী নিরানন্দ। মহারাজ শতানীক কঠিন রোগশয্যায় শায়িত। রাজ্যের প্রধান ভীষকগণ একত্রিত হইয়া মহারাজকে ভীষণ অতিসারের প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতে সচেষ্ট, কিন্তু রোগ উপশান্ত না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতেছে। পট্টমহিষী মহারাণী মৃগাবতী স্বামীর শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া সেবা করিতেছেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইতেছে। মৃত্যুর করাল ছায়া মহারাজের বদনে ক্রমশঃ ঘনাইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ মহামন্ত্রী বিষণ্ণবদনে এক পত্র হস্তে লইয়া মহারাজের রোগশয্যা পার্শ্বে উপনীত হইলেন। উজ্জয়িনীর অধিপতি প্রদ্যোত পত্র পাঠাইয়াছেন যে—শতানীক অসামান্য রূপবতী মৃগাবতীর উপযুক্ত পতি হইতে পারে না, একমাত্র প্রদ্যোতই তাঁহার উপযুক্ত, অতএব পত্রপাঠ মৃগাবতীকে প্রদ্যোতের নিকট পাঠান হউক—নতুবা তিনি সসৈন্যে কৌশাম্বী আক্রমণ করিয়া বলপূর্বক মৃগাবতীকে গ্রহণ করিবেন। মহামন্ত্রী আরও জানাইলেন যে, তিনি সংবাদ পাইয়াছেন—চণ্ডপ্রদ্যোত পত্র পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সসৈন্যে অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন।

অন্য সময় হইলে মহারাজ শতানীক যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হইতেন, কিন্তু এখন তাহা অসম্ভব। আজ তিনি উত্থানশক্তিহীন। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তিনি মহামন্ত্রীকে আদেশ করিলেন যে—প্রদ্যোতকে এরূপ পত্র দেওয়া হউক যে, যাহাতে তাঁহাদের পরস্পরের আত্মীয়তার কথা থাকিবে পরনারীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা নীতি ও ধর্মবিরুদ্ধ ইত্যাদি থাকিবে এবং নীতিকথার উল্লেখ থাকিবে, আর সেই সঙ্গে এ সময়ে যুদ্ধাভিযান না করিবার জন্য অনুনয় করা হইবে। কিন্তু তাঁহারা সকলেই জানিতেন যে প্রদ্যোতকে এরূপ পত্র দেওয়া বৃথা, সে নিবৃত্ত হইবার পাত্র নয়। পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপতা ও রণোন্মাদনার জন্যই সে চণ্ডপ্রদ্যোত বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে।

প্রদ্যোতের পত্র পাইবার পর শতানীক আরও চিন্তাকুল ও মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মৃগাবতী তাঁহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মহারাজকে বলিলেন, "প্রভু, আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় কন্যা ও মহারাজের ন্যায় প্রতাপশালী ক্ষত্রিয়ের মহিষী। প্রদ্যোত যদি সত্য সত্যই আক্রমণ করে, তবে সে আমার মৃতদেহই পাইতে পারিবে, আমার আত্মা প্রভুর নিকটই গমন করিবে।" মৃগাবতীর এই কথায় মহারাজ শতানীকের চিন্তা অনেকটা কমিয়া গেল।

কয়েকদিন পরেই মহারাজ শতানীকের মৃত্যু হইল ও সঙ্গে সঙ্গে প্রদ্যোতের সৈন্যবাহিনী আসিয়া কৌশাম্বীর উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করিল।

(২)

নগরবাসিগণ সাশ্চর্যে দেখিতে লাগিল যে, কৌশাম্বীর চতুর্দিকে পরিখা খনন ও প্রাকার নির্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সহস্র সহস্র শ্রমিক এই কার্যে নিয়োজিত। সৈন্যবাহিনীতে বাছিয়া বাছিয়া যুদ্ধক্ষম নূতন সৈন্যগণকে নিযুক্ত করিতে ও তাহাদিগকে অস্ত্র পরিচালনায় শিক্ষিত ও সুসজ্জিত করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এই সমস্ত কার্য স্বয়ং প্রদ্যোতের পরিদর্শনাধীনেই হইতেছে।

দিনের পর দিন এই সমস্ত কার্য হইতে লাগিল। প্রদ্যোত আক্রমণ করিতে আসিয়া আক্রমণের কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়াই অবস্থান করিতেছে, বরং তাহার প্রচেষ্টাতেই নগরীর সর্বপ্রকার রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার কারণ মহামন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নাগরীক পর্যন্ত কেহই জানিতে পারিল না—সকলেই আশ্চর্যের সহিত দেখিতে লাগিল। ক্রমে পরিখা ও

প্রাকার নির্মিত হইয়া গেল, বহু যুদ্ধ-সম্ভার নগরীর দুর্গে একত্রিত করা হইল। সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যগণ প্রাকারের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে থাকিয়া দিবারাত্র নগরী-রক্ষায় সচেতন হইল। কোষাগার প্রভূত ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং স্তরে স্তরে খাদ্যসামগ্রী একত্রিত হইল।

(৩)

মহারাণী মৃগাবতী কৌশাম্বীর মহামাত্য, মহাদণ্ডনায়ক প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ ও বিশিষ্ট নাগরিকগণকে এক সভায় আহ্বান করিলেন। সকলে সমবেত হইলে তিনি স্বয়ং এই সভা আহ্বানের প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—"আপনারা জানেন যে আমাদের নগরীর চতুর্দিকে পরিখা-খনন, প্রাকার-নির্মাণ, সৈন্যদলবৃদ্ধি, যুদ্ধসম্ভার-সংগ্রহ প্রভৃতি বহিঃশত্রু হইতে রক্ষার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নগরী পরিবেষ্টিত হইলেও দুই তিন বৎসর যাবৎ যুদ্ধসম্ভার ও খাদ্যসামগ্রীর অভাব হইবে না। এই সমস্ত কার্য চণ্ডপ্রদ্যোতের সহযোগিতায় হইয়াছে তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। প্রদ্যোত আক্রমণ করিতে আসিয়া আক্রমণের পরিবর্তে নগরীকে শত্রুর অভেদ্য করিয়া তুলিল, ইহা রহস্যজনক সন্দেহ নাই। সেই কথা বলিবার জন্যই আজ আপনাদিগকে একত্রিত করিয়াছি। মহারাজার মৃত্যুর পর আমি নিজকে অসহায় অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। চণ্ডপ্রদ্যোতের আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার কোন উপায় তখন ছিল না। কুমার উদয়ন নাবালক। এ অবস্থায় কুমার ও রাজ্যকে রক্ষা করিতে আমি কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি প্রদ্যোতকে অতি গোপনে বলিয়া পাঠাইলাম যে আমি আপনার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছুক—কিন্তু নগরীর রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই, কুমার নাবালক- অতএব আপনি সহায়তা করিয়া নগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলে কুমারকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া আমি আপনার নিকট যাইব। আমার এই স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করিয়া প্রদ্যোত কিরূপ সাহায্য করিয়া নগরী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। এখন তিনি অধৈর্য হইয়া পড়িয়াছেন—আগামী কল্যই শেষ দিন। প্রদ্যোত আমার দেহের প্রত্যাশী, অতএব আগামী কল্য আপনারা আমার মৃতদেহ বহন করিয়া প্রদ্যোতকে দিয়া আসিবেন—আমার আত্মা স্বর্গত স্বামীর নিকট গমন করিবে।

মহারাণী মৃগাবতীর কথায় সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। সভার মধ্যে মহারাণীর প্রশংসাবাচক গুঞ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু মহারাণীর আত্মহত্যার প্রস্তাবে সকলে বিষণ্ণ ও মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় অন্য কোন উপায় আছে কি না তদ্বিষয়ে আলোচনা চলিতে লাগিল। এমন সময়ে একজন নাগরিক উত্থিত হইয়া মহারাণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আত্মহত্যা রূপ মহাপাপ না করিয়া যদি মহারাণী ভগবান্ মহাবীরের সাধ্বী সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন তবে উভয় দিকই রক্ষা পায়।" এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আগামী কল্য পর্যন্ত সভা স্থগিত রহিল। ভগবান্ মহাবীর এখন কোথায় এবং কি উপায়ে তাঁহার নিকট যাওয়া যাইতে পারে তাহাও বিবেচনার বিষয় হইয়া রহিল।

(৪)

প্রাতঃকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃগাবতীর নিকট সংবাদ আসিল যে শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কৌশাম্বীর দিকে আগমন করিতেছেন। এই সংবাদে মৃগাবতী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ভগবান্‌কে দর্শন ও বন্দন করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

এদিকে প্রদ্যোতের শিবিরেও ভগবান্ মহাবীরের আগমন ও কোন শত্রু রাজা উজ্জয়িনী আক্রমণ করিতে অভিযান করিয়াছে এই উভয় সংবাদ এক সঙ্গে আসিল। প্রদ্যোত তৎক্ষণাৎ উজ্জয়িনী যাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু পরবর্তী বিবেচনায় একদিনের জন্য থাকিয়া মহাবীরকে দর্শন এবং মৃগাবতীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন।

কৌশাম্বীর উপকণ্ঠে স্থিত "চন্দ্রাবতরণ চৈত্য" নামক উদ্যানে ভগবান্ মহাবীর শিষ্যগণ সহ অবস্থান করিতেছেন। কৌশাম্বী ও নিকটবর্তী অন্যান্য নগর ও গ্রাম হইতে বহু ব্যক্তি তাঁহার সৌম্যমূর্তির দর্শন ও তাঁহার উপদেশামৃত শ্রবণ করিতে সমবেত হইয়াছেন। মহারাণী মৃগাবতী ও মহারাজ প্রদ্যোতও আসিয়া যথোপযুক্ত স্থানে বসিয়াছেন। মহাবীরের প্রশান্ত ও জ্যোতির্ময় বদন, অমৃত-নিস্যন্দিনী বাণী ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সমবেত জনতার মনে গভীর

প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। চতুর্দিকে সাত্ত্বিকতা ও পবিত্রতার এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকলে পরস্পরের বৈরভাব ভুলিয়া একত্রে ভগবানের বচনামৃত পানে বিভোর হইয়া আছে। আত্মার অমরত্ব, কর্মের বন্ধন, সংসারের অসারতা, জন্ম-মৃত্যুর দুঃখ এবং অহিংসা, সংযম ও তপস্যার দ্বারা সেই ভীষণ দুঃখ হইতে চিরমুক্তি পাইবার কথা তিনি তাঁহার ওজস্বিনী ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করিতে লাগিলেন। জনতা মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিতে লাগিল। সমবেত সমস্ত প্রাণীর মন হইতে রাগ-দ্বেষাদির প্রভাব যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

উপদেশ শ্রবণ করিতে করিতে মহারাণী মৃগাবতীর অন্তরে ভাবধারার ঘোর পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইল এবং তাহার প্রতিচ্ছায়া তাঁহার বদনে প্রতিভাত হইতে লাগিল। তাঁহার অনুপম মুখারবিন্দ হইতে বৈরাগ্য ও ত্যাগের ভাবনার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। উপদেশান্তে তিনি উত্থিত হইয়া ভগবান্ মহাবীরকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও বন্দন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন যে, তিনি সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন এবং জন্ম-জরা-মৃত্যুর দুঃসহ দুঃখ হইতে চিরমুক্তি পাইবার জন্ত দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবানের সাধ্বী সংঘে প্রবিষ্ট হইতে অভিলাষী, ভগবান্ কৃপা করিয়া অনুমতি প্রদান করুন। প্রত্যুত্তরে মহাবীর বলিলেন, 'হে দেবানু-প্রিয়া, যাহাতে তোমার অভিরুচি হয় তাহা কর।'

প্রদ্যোত স্থির দৃষ্টিতে মৃগাবতীকে দেখিতেছিলেন। মহাবীরের ব্যক্তিত্ব ও উপদেশ তাঁহার মনেরও বিষম পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। তিনি স্তম্ভিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই মহিমময়ী নারীই কি সেই অলোকসামান্যা রূপবতী মৃগাবতী ? যাহার আলেখ্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন ! মৃগাবতী অসাধারণ সুন্দরী বটে, কিন্তু ইঁহার রূপে ত' মোহ উৎপাদন করিতেছে না, বরং সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধারই উদ্রেক করিতেছে। তাঁহার কৌশাম্বী আগমন, মৃগাবতীকে লাভ করিবার উৎকট কামনা ও এতদিনের প্রতীক্ষা সমস্তই প্রকাণ্ড ভ্রম ও দারুণ অন্যায় বলিয়াই আজ তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত মধ্যেই মহাপুরুষের প্রভাবে চণ্ড প্রদ্যোতের ন্যায় ক্রূরকর্মা মনুষ্যের দৃষ্টিতেও অদ্ভুত পরিবর্তন সাধিত হইল! তিনি সহসা উত্থিত হইয়া মহাবীরকে তিনবার প্রদক্ষিণ ও বন্দন করিয়া ধীরে ধীরে শিবিরে গমন করিলেন।

(৫)

পরদিন প্রদ্যোত নিরস্ত্র হইয়া মাত্র কয়েকজন রক্ষী সহ কৌশাম্বীতে প্রবেশ করিলেন এবং স্বয়ং উদ্যোক্তা হইয়া কুমার উদয়নের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। কোন শত্রু যদি কৌশাম্বী আক্রমণ করে তবে তাঁহাকে সংবাদ দিলে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে আসিয়া রক্ষা করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি উজ্জয়িনা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

মৃগাবতী সাধ্বী হইয়া কঠোর সংযম ও তপস্যাচরণে অগৌণে মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন।

যাত্রী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল

নয়নের ফুল করি তোমার চরণ খানি ঢাকি
পরাণেরে করি প্রেম-ডালি,
হৃদয়েরে সিন্ধু করি গভীর অতলে তোমা রাখি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে দেই করতালি।

গভীর নীরব তুমি শব্দহীন যেন নভো আলো,
অন্তরেতে আছ সংগোপন ;
প্রতিদিন ঘুচিতেছে দেহ হ'তে সব অন্ধ কালো,
চোখে জ্বলে প্রভাত-তপন।

দুর্যোগের কালো রাত্রি নাহি আর বিশাল ভয়াল,
চন্দ্র-তারা জ্বলে চারিদিক ;
প্রেমের তরণী বাহি পার হব এই মহাকাল,
যাত্রী আমি দুরন্তনির্ভীক।

নিখিল ভারত ভ্রাম্যমান চিত্র প্রদর্শনী

শ্রীস্বপনকুমার সেন

গত কয়েক মাস যাবৎ ভারতের বিভিন্ন সহরে যে ভ্রাম্যমান চিত্র প্রদর্শনী প্রদর্শিত হচ্ছে, সেটির উদ্যোক্তা নূতন দিল্লীর নিখিল ভারত চারু ও কারু কলা সমিতি।

ভারতে এ ধরণের ভ্রাম্যমান কলা প্রদর্শনী এই প্রথম। জনসাধারণের মনে শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করার পক্ষে এ ধরণের প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে। রুশ, ইতালী প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য স্বাধীন দেশের জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিরা বহু পূর্ব্বেই এ ধরণের প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন।

আলোচ্য প্রদর্শনীটি লক্ষ্ণৌতে প্রদর্শিত। গত বৎসর জুলাই মাসে কলকাতায় "আর্টিষ্ট্রী হাউসে" এটির উদ্বোধন করেছিলেন বাঙলার প্রদেশপাল। তারও পূর্বে মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, নাগপুর, বোম্বাই প্রভৃতি সহরে প্রদর্শনীটি সাফল্যের সঙ্গে প্রদর্শিত হয়েছিল।

আলোচ্য প্রদর্শনীর চিত্রসংগ্রহ সংখ্যায় খুব বেশী নয়। ন্যূনাধিক দেড়শত থেকে দুই শত চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের উদীয়মান শিল্পীদের আঁকা চিত্র ছাড়াও কয়েক খানি স্বনামধন্য শিল্পীদের চিত্রও প্রদর্শনীর শোভা বর্ধন করেছিল। অল্পসংখ্যক শিশু মনের সরল বিকাশের চিত্রও ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের তরফ থেকে প্রদর্শিত হয়েছিল।

বরদাবাবুর (India in transition) "পরিবর্ত্তনশীল ভারত" প্রদর্শন নং ৯৫ বৃহৎ ছবিখানিতে চার ভাগে ভারতের রাজনৈতিক রূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথম চিত্রে ভারত মাতার অঙ্কে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাই। দ্বিতীয় চিত্রে সাম্প্রদায়িক বিবাদলীলার মধ্যে ভারত মাতার অঙ্গ ছেদ। তৃতীয় চিত্রে ভারত তার অন্তর দাহে জর্জ্জরিত। চতুর্থটি পুনঃ সংস্থাপন। চিত্র সমষ্টির রাজনৈতিক ভাব পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী, কিন্তু চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছু বোঝা যায় না; বর্ণের উজ্জ্বলতা আছে, মাধুর্য্যের স্পর্শ কিছুতে নাই বলেই মনে হয়। অজস্র রেখা ও বর্ণের উৎকটতায় (সামঞ্জস্যহীন ও বটে) চিত্রের বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে।

প্রদর্শন নং ৯১ শিল্পী কমলারঞ্জন ঠাকুরের "শকুন্তলা"—বর্ণ-বিন্যাস ও রেখা-নৈপুণ্যে চিত্রখানি সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে; কিছুটা রেখাধিক্য চোখে পড়ে এখানেও। এর পরের চিত্রটি ৭৭ নং প্রদর্শন "প্রেমের জয়"—এটি এঁকেছেন শিল্পী অমূল্য গোপাল সেন। বিষয় বস্তুর সঙ্গে ভাবের খুবই সামঞ্জস্য রাখতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী। বাঙলার কোনও এক পল্লীর শ্যামল পরিবেশের অলৌকিক ভাব ফুটিয়ে তুলতে কোথাও কার্পণ্য করেন নি ইনি। সর্ব্বোপরি মহামানবের অপূর্ব্ব প্রেম ও ক্ষমার ভাবটি চমৎকার ধরে রেখেছেন শিল্পী কাগজের উপর রঙ আর রেখার সীমায়। ছবিটি দেখলেই মনে সেই বৈষ্ণব প্রেমের অমর বাণী—

মেরেছ তায় ক্ষতি নাই
হরি বলে আয় নাচি গাই॥

শিল্পী নির্ম্মল দত্তের জলরঙা প্রাকৃতিক চিত্রগুলির মধ্যে জাপানী প্রাকৃতিক অঙ্কনের কিছুটা সামঞ্জস্য মনে হয়। যেমন "ডুমুর গাছ" (A fig tree)—বিষয় বস্তু নির্ব্বাচন কাজের ধরণটির উপযোগী হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা কঠিন হয় না যে শিল্পী তার সৃষ্টি মধ্যে কতটা পরিমাণে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারলে এ ধরণের সুষ্ঠু শিল্পের সৃষ্টি হয়।

বংশীবাদিনী—৪২ নং প্রদর্শন ছোট চিত্র হলেও বিষয়বস্তুটি বেশ জমজমাট। বর্ণ বিন্যাসের সামঞ্জস্য, সর্ব্বপরি বৈচিত্র্যময় ভঙ্গী এরই সমন্বয় চিত্রটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে। চিত্রটি দেখে শিল্পাচার্য্য নন্দলালের "হরপার্ব্বতী"র কথা স্মরণ হয়। সেটির অঙ্কন পদ্ধতির সঙ্গে এটির বহু সামঞ্জস্য দেখতে পাই। তফাৎ কেবল সেটি রেশমী বস্ত্রের উপর কাজ করেছিলেন শিল্পাচার্য্য, আর এটি হয়েছে কাগজের উপর। এই চিত্রখানি এঁকেছেন শিল্পী প্রিয় প্রসাদ দাসগুপ্ত।

কুমারী এস, এস, আনন্দবার অঙ্কিত, "ভারতীয় খেলা" ও "নির্ব্বাণ"—প্রদর্শন নং ৩ এবং ৪। মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার পট শিল্পের ধারাবাহিক ইঙ্গিত আছে এই চিত্র দুইটিতে। চিত্র দুখানির প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব হলে আলোচনার সুবিধা হতো। কুমারী আনন্দকরের আঁকার মধ্যে বেশ স্পন্দন অনুভব করা যায়।

ভি, এস, মাসোজীর "হরিণ" ৫৪ নং প্রদর্শন। দুটি হরিণ—সামনেরটি পিছনের পানে ঘাড় ফিরিয়ে আছে তখনও কর্ণদ্বয় ও পিছনের পা দুটির চঞ্চলতা মিলিয়ে যায় নি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যে তারা ঐ জায়গায় ছিল না, তা চিত্রটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। একটি বাঁকা গাছ আর বড় বড় ঘাস সামনের জমিতে, দু'চারটে সাদা ফুল ঘাসগুলির ডগায়। হালকা সবুজ এলো মেলো ধোঁয়াটে রঙের বিন্যাসের উপর কালো রঙের আঁচোড় কাটা; মাঝে মাঝে আলতো সবুজের ছোপ—নিবিষ্ট মনে না চেয়ে থাকলে চোখেই পড়ে না সেগুলি। জাপানী পদ্ধতির ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

কাগজের আর্দ্রতা নষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেই শিল্পীকে চিত্রখানি সম্পূর্ণ করতে হয়েছে। স্থানে স্থানে বহু রঙের সংমিশ্রণ হয় তো করতে হয়েছে, কিন্তু শিল্পীর সংযমের পরিচয় ক্ষুণ্ণ হয় নি অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে। শিল্পী মাসোজীর অন্যতম চিত্র সাঁওতাল রমণী—প্রদর্শন নং ৩৫। এটি শুধু

কালো রঙে আঁকা। কিন্তু ধোঁয়াটে হালকা কালো রঙের উপর, গাঢ় কালো রঙের রেখায় বাহাদুরীর পরিচয় পাওয়া যায়।

তার পরই চোখে পড়ে শিল্পী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের আঁকা একখানি মুখ—ব্রাউন রঙের প্যাস্টেল বোর্ডে। স্বল্প রঙ ব্যবহার করেছেন শিল্পী। ছুরির সাহায্যে আলো অর্থাৎ লাইট বার করেছেন শিল্পী আঁচোড় কেটে। আঁধারের মধ্যে ও মুখখানি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কপালের সিন্দুর বিন্দু আর কর্ণকুণ্ডলের অল্প নীল ও শুভ্রতায়। এঁরই আঁকা মাতা ও পুত্র প্রদর্শন নং ৭০।

"বাপু ও বা" ১৩২ নং প্রদর্শন একটি উল্লেখযোগ্য জল-রঙা চিত্র। যদিও চিত্রটি ছোট, তবু এর বৈশিষ্ট্যের অনেক রঙ-ছবিকেও ম্লান করে দেয়। এটি এঁকেছেন শিল্পী বিদ্যাভূষণ। চিত্রখানির প্রতিলিপি

প্রতিলিপি নং ১ "বাপু ও বা"

নিচে দেওয়া হলো (প্রতিলিপি নং ১)। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আত্মার মহান আদর্শের ছাপ পড়েছিল শিল্পীর মনে, তারই আংশিক প্রকাশ পেয়েছে এই চিত্রতে। বিলাতী হাণ্ডমেড কাগজে আঁকা এই চিত্রে শিল্পীর নিজস্ব একটি ভাবধারার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রদর্শন নং ৭২ শিল্পী অনিল রায় চৌধুরীর "দুই বোন" (প্রতিলিপি নং ২) শ্যামলী দুটি মেয়ে এই চিত্রের বিষয় বস্তু, সভ্যতার মেকি রঙের প্রলেপ তাদের গায় নাই। গ্রামের সহজ সরল দুটি কিশোরী। অনিল-বাবুর আঁকা বৃষটি আরও বেশী ভাল লাগে; নেপালী তুলোট কাগজে গিরি মাটির রঙ দিয়ে আঁকা (Indian Red) রেখাঙ্কন। সরল ও সুস্থ মন দিয়ে শিল্পী তুলি ধরেছিলেন, তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রেখার গতিতে। বৃষটি ও পশুসুলভ গতি পেয়েছে শিল্প মাধুর্য্যে। মনে পড়ে সেই আদিম কালের গুহা চিত্র "বাইসনের" রূপ ও গতি। কে, এম, ধরের আঁকা "মহারাষ্ট্রের হলকর্ষণ উৎসব"—প্রদর্শন নং ৩৪ চিত্রখানির মধ্যে জাতির সমৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যের ছাপ খুব সুন্দর ফুটেছে। এর পর প্রদর্শন নং ৮৯ সোমলাল সাহা অঙ্কিত "দরশন" (চিত্র শিল্পী নং ৩) মন্দির প্রাঙ্গণে পূজার ডালি হাতে দরশনার্থী রমণীবৃন্দ, বিষয়বস্তুর অঙ্কন প্রণালীর মধ্যে নূতনত্ব আছে। রঙের সামঞ্জস্যেও কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। এর আঁকা আর একখানি চিত্র "মানিনী রাধা" প্রদর্শন নং ৮৮, শিল্পীর চিত্র দুখানির মধ্যে প্রাচীন রাজপুত বা কাংড়া ও আধুনিক আবিষ্কৃত পট শিল্পের ছাপ বর্ত্তমান।
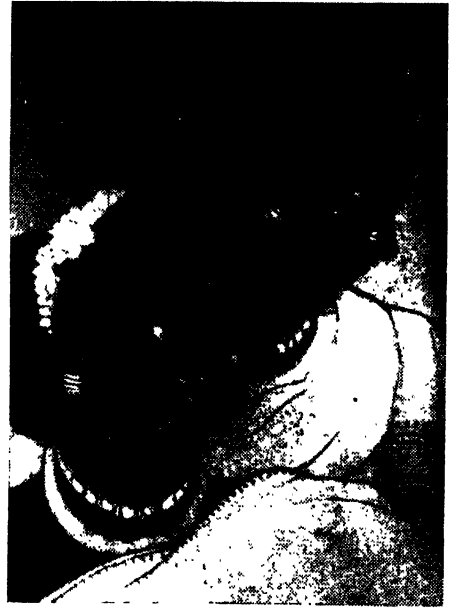
প্রতিলিপি নং ২ "দুই বোন"

কে, শ্রীনিবাসালু অঙ্কিত ৮৭ নং প্রদর্শন "বসন্ত"; চিত্রখানিতে প্রাচীন কাংড়া বা পাহাড়ী চিত্রের আভাস পাওয়া যায় বর্ণ বিন্যাসের দিক থেকে। পিছনে গাঢ় নীল বর্ণ, তার উপরে কয়েকটি ফুল ও পাতা, আর সম্মুখের জমিতে চারটি মনুষ্য মূর্ত্তি (চিত্র লিপী নং ৪)! চিত্রটিতে দূরত্ব-বোধের কোনও ইঙ্গিতই শিল্পী প্রকাশ করেন নি। তাই বলে কোনও অভাব পরিলক্ষিত হয় না চিত্রখানি দেখার সময়। এইটেই শিল্পীর বাহাদুরী।

শিল্পী যামিনী রায় অঙ্কিত দুখানি চিত্রও এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে। তন্মধ্যে "প্রসাধন" ১২৪ নং প্রদর্শন এবং ১২৫ নং প্রদর্শন "হরিণ"। প্রসাধন চিত্রখানি লাল জমিতে, কাল, লাল, ঈষৎ হরিদ্রা রঙের সমন্বয় আঁকা এইটি মাত্র নারী মূর্ত্তি; ছাঁট কাঁট কাপড়, পাড়,

কুন্তল বিন্যাসের একটি সাবলীল ভঙ্গী। আগত সন্ধ্যার ইসারাও আছে ছবিটিতে।

শিল্পী কে, ভীমচুর আঁকা ভুটাওয়ালী প্রদর্শন নং ৯৭। শ্যামল শস্যক্ষেত্রের ধারে বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়ে শ্যামাঙ্গী তন্বী এক ভুট্টা ভাজছে। কাছে দেখলে মোটা দানা বিলাতী কাগজে পুরু রঙ দিয়ে কাজ করার পর আবার তাকে ধুয়ে ফেলা হয়েছে এমনি বার কয়েক ধোয়ার ফলে কাগজের দানাগুলি অল্প দেখা দিয়েছে; তারই উপর শিল্পী ধীরে ধীরে মহিমা মণ্ডিত করে তুলেছেন তুলির স্পর্শে। শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় সত্যই প্রাণ পেয়েছে চিত্রখানি।

প্রতিলিপি নং ৩ "দরশন"

শিল্পী অবনী সেনের এক রঙা চিত্র দুখানি প্রদর্শিত হয়েছে; এর তুলির বলিষ্ঠতা রসপিপাসু চিত্রামোদী মাত্রেই জানেন। তাই ও বিষয় আর স্বতন্ত্র আলোচনা করলাম না।

প্রদর্শন নং ২৭, শিল্পী সতীশ দাশগুপ্তের আঁকা "মহিষ মর্দিনী" চিত্রখানির মধ্যে বিশেষত্ব আছে। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল প্রবর্ত্তিত ভারতীয় চিত্র কলার ধারার সুস্পষ্ট প্রকাশ এতে পাওয়া যায়।

প্রদর্শন নং ৯৩ শিল্পী রতন ঠাকুরের আঁকা "সিমলা ষ্টেশন" প্রাকৃতিক চিত্রটি মন্দ নয়। রঙের গভীরত্বের মধ্যে রঙের আবহাওয়াটি চমৎকার ফুটেছে।

"কি করা যায়" প্রদর্শন নং ৭১ চিত্রখানি শিল্পী জীবেন্দ্র সেন-এর আঁকা। রান্না ঘরে আলোর দিকে পিছন ফিরে বসা একটি নারী, তার হাতের কাছে কিছু কিছু তৈজসাদি, মুখে চিন্তার রেখা। নামানুসারে চিত্রের ভাব ব্যঞ্জনার সামঞ্জস্য যথেষ্ট বর্ত্তমান। এটিও বিলাতী দানা-ওয়ালা হোয়াইট মেন কাগজের উপর তাজা রঙের বলিষ্ঠ বিন্যাস। আলোছায়ার প্রকাশটিও অঙ্কন পদ্ধতির মাধুর্য্যে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে।

শিল্পী পানিকর অঙ্কিত থালেতে প্রদর্শন নং ১০৪। জল-রঙা প্রাকৃতিক চিত্র অঙ্কনে পানিকরের দক্ষতা অতুলনীয়। এর আর

প্রতিলিপি নং ৪ "বসন্ত"

দুখানি ছবির মধ্যে "মার্কেট ব্রাজ" প্রদর্শন নং ১০২ চিত্রখানিও তৃপ্তি দেয় রস-পিপাসুদের মনে।

শিল্পী সফিউদ্দিন আহম্মদ এর ১নং প্রদর্শন "আগুনের দিকে।" এটি একখানি কাঠ-খোদাই চিত্র (এক রঙা)। আরও দু'একখানি কাঠ-খোদাই চিত্র প্রদর্শিত হলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনওটাই নয়।

শিল্পী সুশীল সেন-এর "একখানি এচিং" প্রদর্শন নং ৭৯। আমাদের দেশে এচিং এর কার্য্যের তেমন প্রচলন নাই। শান্তিনিকেতন থেকে শিল্পী মুকুল দেকে বিলাতে পাঠান হয় এচিং সেখার জন্য। এই প্রণালীতে

কাজ শিক্ষা করা ব্যয়সাধ্য। যাই হোক মুকুলবাবু এ কার্য্যে সুনাম অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ইচ্ছা ফলবতী হয় নি। তিনি আর্ট স্কুলে শিল্পাধ্যক্ষ থাকাকালীন কোনও ছাত্রকেই এচিং শিক্ষার জন্য সাহায্য করেন নি। একমাত্র সুশীলবাবুর ভাগ্য বিশেষ প্রসন্ন হওয়ায় এ বিদ্যাটি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন দে'মহাশয়ের দয়ায়। এচিং করার পদ্ধতি তামার পাতের উপর অল্প পুরু মোম দিয়ে আস্তরণ করা হয় এবং তার উপর শিল্পী সূক্ষ্ম কোনও ধাতু সলাকার দ্বারা 'স্কেচ্' করেন; স্কেচ্ খানি সম্পূর্ণ হওয়ার পর এসিড ঢেলে দেওয়া হয়। নির্দ্দিষ্ট সেই এসিড ও মোম অপসারণ করলেই দেখা যাবে তামার পাতের গায়ে দাগ পড়েছে স্কেচের। বর্ত্তমানের পদ্ধতিতে ব্লক সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে এই প্রথায় ইস্পাত ও তামার উপর ব্লকের কাজ চালান হতো। সুশীলবাবুর একখানি লিথোগ্রাফ্ও প্রদর্শিত হয়েছিল। ইচ্ছাসত্ত্বেও স্থানাভাবে চিত্রখানির সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করা সম্ভব হলো না।

শিল্পী গোপাল ঘোষের আঁকা "ঢেউ" প্রদর্শন নং ৪১। সমুদ্রের বিরাটত্ব, তার আস্ফালন, গাঢ় নীল সত্ত্বেও জলের স্বচ্ছতা শিল্পী চমৎকার ফুটিয়েছেন। প্রাচ্য পদ্ধতিতে আঁকা এই চিত্রখানি যে কোনও দর্শককে আকর্ষণ করবে। অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে গোপালবাবুর সহজ সাবলীল ভঙ্গী আছে, যা দেখে স্বভাবতই মনে হয় শিল্পী অতি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে তুলি চালিয়ে এগুলি সম্পূর্ণ করেছেন। চিত্রখানির মধ্যে একটু অসামঞ্জস্য ঠেকে, সমুদ্র যেখানে বেলাভূমি চুম্বন করে আবার সমুদ্রে ফিরে যাচ্ছে; এখানে শিল্পী যে হলুদ রঙ ব্যবহার করেছেন, তা যেন দর্শকের দৃষ্টিশক্তিকে পীড়া দেয়। আমার মনে হয় এটি শিল্পীর চোখও এড়ায়নি; তবু তিনি ওটার প্রতি বিশেষ ঔদাসীন্য দেখিয়েছেন। গোপালবাবুর "লোহিত বাঁক" চিত্রখানিও স্বচ্ছন্দতা পেয়েছে প্রচুর।

শিল্পী এল, মানস্বামীর আঁকা "তাঁর প্রার্থনা সভার পথে" প্রদর্শন নং ১২২, চিত্রখানি সাদা মিশিয়ে (Tempera work) কাজ করেছেন। অয়েল কালার যেমন স্প্যাচুনার সাহায্যে চাপানর পদ্ধতি আছে। এটিও সেই পদ্ধতিতে মোটা মোটা রঙ তুলির সাহায্যে উপর উপর চাপানোর ফলে চিত্রের গাম্ভীর্য্য বেড়েছে। চিত্রের পদ্ধতি, বিষয়বস্তুর সাম্যতা, বর্ণবিন্যাসের মনোহারিত্ব মনে ছাপ পড়ার মত।

এর পরই তৈল চিত্র। প্রদর্শনীতে তৈল চিত্র সংগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প। তথাপি প্রত্যেক চিত্রই নিঃসন্দেহে প্রদর্শনীর গাম্ভীর্য্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

ভি, ডি, চিঞ্চলকর অঙ্কিত "কার্য্যরত শিল্পী" প্রদর্শন নং ২০ চিত্রখানি দর্শককে আনন্দ দেয়, কিন্তু এমন জায়গায় প্রদর্শিত হয়েছে যা অতিমাত্রায় রসগ্রাহী ব্যক্তি ছাড়া খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। মোটা মোটা মিশ্র তেল-রঙ স্প্যাচুনার সাহায্য চাপিয়েছেন শিল্পী ক্যানভাসের উপর। এই পদ্ধতিতে কাজ করতে চিঞ্চলকর সিদ্ধহস্ত। এ যাবৎ ওঁর যতগুলি চিত্র বিভিন্ন প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়েছে, সবগুলোতেই দেখতে পাওয়া যায় সবুজের মনোহারিত্বটাকে বেশী প্রাধান্য দেন শিল্পী। সাদা রং অল্প ব্যবহার করেন বলে অনুমান হয়।

প্রদর্শন নং ২১ "ভোজের সময়" এখানিও স্প্যাচুনা ওয়ার্ক। চিত্রখানি মন্দ লাগল না। এটির শিল্পী শ্যামলেন্দু দাশগুপ্ত।

শিল্পী শৈলজ মুখার্জ্জির "কালো মেয়ে" (Brown Bella) প্রদর্শন নং ৫৮। একটি তামাটে রঙের মজুর রমণীর প্রতিকৃতির পিছনে, দূরে হালকা ঝোপের পাশ দিয়ে দেখা যায় পুষ্করিণীতে স্নানরতা কয়েকটি নগ্ন নারীদেহ। চিত্রখানি নিবিষ্ট মনে দেখলে শিল্পীর মনের গোপন ছবিটি স্বচ্ছ হয়ে উঠে দর্শকের কাছে। শৈলজ বাবুর আঁকার একটি নিজস্ব ধারা আছে যার অভিনবত্ব অস্বীকার করা যায় না। এঁর আর একখানি চিত্র প্রদর্শন নং ৫০ হালকা একটু রঙের উপর তুলির কয়েক আঁচড়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে একটি পশ্চিমা নারী, মাথায় জলের গাগরী, চলে যাচ্ছে দূরে, দোদুল্যমান ঘাগরা— যা হয়ত ঢেউ তুলেছিল শিল্পীর মনে। বিষয়বস্তুর সমন্বয়তা অটুট রাখতে গিয়ে হালকা আঁচড়ে পল্লবিত ডাল বাড়িয়ে দিয়েছেন কামিনীর মাথার কাছে। চিত্রখানির নাম দিয়েছেন "চলে যায়"।

শিল্পাধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর আঁকা প্রদর্শন নং ১৮ তৈলচিত্রখানি বিহার অথবা মধ্য-ভারতের গ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রমেনবাবুর রঙধারণ পদ্ধতি বড়ই আনন্দদায়ক। প্রত্যেক রঙটি সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। যেন গুণে গুণে রঙ লাগিয়েছেন। শিল্পীর আর একখানি চিত্র প্রদর্শন নং ১৭ "বুদ্ধের ভিক্ষা"। তৈলচিত্র হলেও, পদ্ধতির মধ্যে বৈদেশিকতার ছাপ এড়াতে চেষ্টা করেছেন। বিষয়-বস্তুর সঙ্গে অঙ্কন পদ্ধতির ভাবের নিগূঢ় সামঞ্জস্য দর্শককে মুগ্ধ করে। রমেন বাবুর প্রত্যেক চিত্রেই হলদে রঙের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। শেষোক্ত চিত্রটির পিছনের আকাশে শুধু হলদে রঙ চাপিয়ে রেখেছেন। বর্ণ-বিন্যাসের মাধুর্য্যে ভগবান বুদ্ধের পিছনে স্বর্ণাকাশের অপূর্ব্ব জ্যোতি (সোনা বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক) ভারতের প্রাকৃতিক আবহাওয়ার সৌন্দর্য্যকে পটের গায়ে ধরে রাখার অদম্য ইচ্ছা শিল্পীর চিত্র দুখানিতে পরিস্ফুট।

প্রদর্শন নং ৫ "স্বপ্নময়ী" তৈলচিত্রখানি এঁকেছেন শিল্পী এস, এন, ব্যানার্জ্জি। স্প্যাচুনার সাহায্যে শিল্পী রঙ চাপিয়েছেন। বর্ণবিন্যাসের মধ্যে স্বপ্নমহিমা মণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছেন শিল্পী, কোবাল্ট ব্লু, এমারেল্ড গ্রীণ ও ফ্রেঞ্জ হোয়াইটের ব্যবহার কাল্পনিক আমেজের সৃষ্টি করেছে চিত্রে।

শিল্পী রামকিঙ্করএর আঁকা "জোয়াল" চিত্রখানি প্রদর্শন নং ৭, শিল্পীর অঙ্কন পদ্ধতির মধ্যে গতানুগতিক সংস্কার কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুটি সাধারণ ও সহজ হলেও অঙ্কণ পারিপাট্য ও সমন্বয়ের চাতুর্য্যে বেশ গাম্ভীর্য্য সৃষ্টি করেছে। চিত্রের উপলব্ধি সব সময় লিখে বোঝান যায় না। বর্ণবিন্যাসের মধ্যে যে সংযমের পরিচয় শিল্পী দিয়েছেন তা খুব কমই দেখা যায়।

প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনার দিক থেকে কোনও ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নি।

বিশেষ করে চিত্র নির্ব্বাচন, আলো ও চিত্র প্রদর্শন ব্যাপারে বরং এঁরা দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য প্রদর্শনীর অপেক্ষায় এই প্রদর্শনের স্থান নির্ব্বাচন ও প্রদর্শন ব্যাপারটি শিল্পী মনে আঘাত ত করেই, উপরন্তু দর্শকের মনেও অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের উপর। অবশ্য কলকাতা "আর্টিষ্ট্রী হাউসের" সাজান প্রদর্শনী-কক্ষ এরা ব্যবহার করেছেন। তাতে অনেকটা সুরাহা হয়েছে প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের।

আর একটি কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। দেশের পট আজ পরিবর্ত্তিত হয়েছে। দেশবাসী আজ জানার স্পৃহায় মাতাল হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের অচেতন মনের অনেক সংশয় আজ দূর হয়েছে। আজ থেকে ২০ বৎসর আগের চিত্র প্রদর্শনী, আর আজকের চিত্র প্রদর্শনীর অনেক প্রভেদ। বিশিষ্ট শিল্পীর অভাব নেই ভারতে। সত্যই যাদের তুলি কথা বলে, চিত্র যার ভাবে আলুলায়িত—সেই সব শিল্পী, যাঁরা স্রষ্টার সম্মান পাওয়ার আসনে আসীন, তাঁদের চিত্র আজ আমরা কয়েক বৎসর ধরে দেখতে পাচ্ছি না। এ প্রদর্শনীতেও তাঁদের একখানাও প্রদর্শন নাই।

কিন্তু কেন? ভারতের দর্শক সমাজ কি তাঁদের গুণের সমাদরে অবহেলা করেছে? কিম্বা তাঁদেরই সেই মনের ঐশ্বর্যে ভাঁটা পড়েছে, যার জন্য তাঁরা নিজেদের এমন তফাৎ ক'রে রাখছেন?

বড় রাস্তা

শ্রীদেবেন ভট্টাচার্য

এক কাপ্ চা সামনে নিয়ে সেকেণ্ড লেফ্টেন্যাণ্ট্ ডাক্তার বেণু বোস রেস্তোরাঁয় বসে হাই তোলেন: এমন জানলে কে ছুটি নিত। চেনা জানা সব লোকগুলো কলকাতা থেকে তবে গেল নাকি? আরে না, এই তো!—মৃদু হাসিতে মুখ ভরিয়ে তোলেন তিনি: কোথায় যেন লোকটিকে—ও হ্যাঁ একবার—আমারই ডাক্তারখানায় চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন···ঠিক, মনে পড়েছে, লিকলিকে চেহারার পিলে-মোটা এক ছেলে কোলে ভদ্র লোক এসেছিলেন।

—সব ভাল তো? নিজের বেঞ্চটাতে একটু নড়ে চড়ে বসেন বেণু: যাক তবু কথা বলবার লোক পাওয়া গেল বোধহয়।

—হুম্। কেমন যেন একটা উপেক্ষার ভাব: একটা নড়বড়ে তেপায়ার সামনে সন্তর্পণে বসে ভদ্রলোক আধকাপ চায়ের জন্যে হুকুম দেন।

একটু হতাশ হ'য়ে পড়েন বেণু বোস। বাব্বাঃ! গুমর কিসের এত? মুখখানা যেন পোড়া-হাঁড়ি করে তুললো। কেন? মিলিটারীর ডাক্তার হ'য়েছি বলে নাকি? না খেতে পেয়ে যখন মরছিলাম তখন তো খয়রাতি রুগী ছাড়া এক ব্যাটারও দেখা পাওয়া যেত না। গোল্লায় যাক শালারা।···

···আরে কে ও? শ্যামলাল ক্ষ্যাপাটা না? এক চুমুকে সব চা টুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বেণু বোস ফুটপাথে গিয়ে ইতস্ততঃ করেন। পাগলাটা আবার নাগালের বাইরে না সরে পড়ে!

মিলিটারী ট্রাকগুলো যমদূতের মত চলে যায়। ট্রাম, বাস, আর ট্যাক্সিগুলো যেন ভয়ে ভয়ে পাশ কাটিয়ে নেয়।

—খবর সব ভাল তো শ্যাম? একেবারে কাঁধে হাত দিয়ে ফেলেন বেণু। এ ব্যাটা আর পালাচ্ছে না নিশ্চয়ই, ওর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্য যে আমি···

—ডাক্তারবাবু যে! গদগদ হ'য়ে ওঠে শ্যাম: ডাক্তারবাবু, একেবারে পাশ-করা ডাক্তার, অথচ কত অমায়িক···ভাবতেও সঙ্কোচে চোখ নেমে আসে।

শ্যামলালের চাউনী বেণুর ভাল লাগে, মজাও লাগে। ওঃ, তখনকার দিনে পাড়ার সব ছেলে মিলে সারা দুপুর একে নিয়ে কি হল্লাই না করা যেত। বেচারা!

—তোমার ফিল্ম কোম্পানীতে ঢোকার কি হোলো, শ্যাম?···গান টান চলছে তো?

—আজ্ঞে বাড়ীতে তো দিন রাতই গাইছি···তবে ফিল্মে একটিং করা···

—কেন?

—কেই বা ব্যবস্থা করে।—শ্যামলাল অসহায়ের মত হাসে।

—ও এই কথা? হারিয়ে-যাওয়া দুষ্টুমী যেন ধীরে

ধীরে বেণুকে আবার পেয়ে বসে। তবু খানিকটা সময় মজা করে কাটানো যাবে তো। কিন্তু না, হাসলে চলবে না।···তুমি শোনোনি শ্যাম? ডাক্তারী ভাল লাগল না বলে আমি আজকাল ফিল্ম কোম্পানীতে চাকরী করছি··· ডিরেক্টরী। নিজের জিব কামড়ে বেণু হাস্যরক্ষা করেন। সত্যি অমন ভল্লুকের মত তাকালে কার না হাসি পায়।

—সত্যি? হঠাৎ শ্যামলাল ঘুরে দাঁড়িয়ে বেণুর দু' হাত চেপে ধরে: আপনার দু' পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমার একটা হিল্লে করে দিন।

—আচ্ছা, হবে, হবে।—হাত ছাড়িয়ে নেন বেণু। রাস্তার লোকগুলো যদি দেখে ফেলে তো ভাববে কি?

—আমার সারা জীবনের স্বপ্ন!—আনন্দ ও বেদনার আবেগে হঠাৎ শ্যামলালের ভাবলেশহীন চোখদুটির দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে আসে। না হয় আমার চেহারায় ভগবান কতগুলো খুঁৎ দিয়েছেন···মাথার বিশ্রী টাকটা···কিন্তু তা সেরে নেওয়া চলতে পারে তো।

—চল, একটা পার্কে গিয়ে বসা যাক।—নিজকে বিব্রত বোধ করেন বেণু ডাক্তার: কিন্তু উপায় কি? আহা বেচারা···এখন এতদূর এগিয়ে চট করে একে ছেড়ে সরে পড়াই বা চলে কি করে? তার চেয়ে বরং ···হ্যাঁ, এই দিকটা একটু নিরিবিলি আছে। কলকাতার ছেলেগুলো যা বখাটে, হয়তো খেলাধুলো ছেড়ে এসে আমাদের নিয়ে পড়বে।

—তুমি য়্যাক্টিং করেছ কখোনো? বেণুর কণ্ঠস্বরে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীর আভাস।

—না। তবে এমনি বাড়ীতে বসে অনেক সময় অভ্যেস করেছি···

—আমি একবার দেখে নিতে চাই আমাদের ষ্টুডিওর মাইক্রোফোন টেষ্টে তোমার গলা উতরোবে কিনা···

—নিশ্চয়ই।

—আর তাছাড়া অভিনয়ের ধাঁচ, স্বরের গভীরতা সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

—তবে সুরু করো···হ্যাঁ, এই দিকে ওই বকুল-গাছটার তলায়। থামতে সুরু করেন ডাক্তার বেণু নিজেই: বলে কি? এ দেখি সব-তাতেই রাজী···একটু মাত্রা জ্ঞান নেই।

—কি রকম পার্ট করবো বলুন?—শ্যামলাল ঘাড় চুলকোয়।

—ধর তুমি কোনো একটি মেয়েকে ভালবাস···প্রাণ দিয়ে ভালবাস···হঠাৎ সে তোমার সঙ্গে ছলনা করে পালিয়ে গেল।—তারপর বহুদিন কেটে গেছে—হঠাৎ একদিন তোমার সঙ্গে তার দেখা হোলো···

শ্যামলাল চোখ বুজে শুনছিল। যখন সে চোখ মেলে চাইল, তখন তার দৃষ্টিতে বহু দূরের বাণী: অতীত, ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান যেন এক হ'য়ে গেছে সেখানে।

চমকে ওঠেন বেণু ডাক্তার শ্যামের গলার স্বর শুনে। কে একে পাগল বলবে? হ্যাঁ, তা এ এক রকমের পাগল বটে···কোনো বিশেষ খেয়ালে বাঁধা পড়েনি বলে যখন যে খেয়াল আসে তার সঙ্গেই নিজকে এক করে দেয়···তা পাগল বই কি। খানিকটা অসহায় ভাবেই বেণু শ্যামলালের দিকে লক্ষ্য করেন: মানুষ হিসেবে ওর বেঁচে থাকাটা যেন একটা সখ, একটা বিলাসিতা।

···কোনো অভিযোগ নেই, রাণী।···বুকের ভেতর থেকে ঠেলে আসা একটা আবেগের দলাকে শ্যামলাল গিলে ফেলে।

কচি ঘাসের ওপর বেণু আরও একটু এগিয়ে বসেন।

···দাও, তোমার হাত দুটো দাও, আমি আনন্দে চোখ বুজবো···

শ্যাম, শ্যামলাল!—সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন ডাক্তার। কি ব্যাপার, নড়ে না যে! আশ্চর্য্য, একেবারে কাঠ হ'য়ে পড়ে···য়্যাঁ, নাড়ী এত ক্ষীণ। বিব্রত হয়ে বেণু চারিদিকে তাকান। মুখ দিয়ে ফেনা উঠছে দেখি। সত্যিই অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি? হ'য়েছে কর্ম, আবার লোক জমতে সুরু করল।

অপ্রকৃতিস্থের মত তিনি শ্যামলালকে জোরে জোরে ধাক্কা দিয়ে ডাকেন।

—দয়া করে একটু জল এনে দেবেন?—একজন দর্শককে মিনতি করেন ডাক্তার।

—কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? কৌতূহল নিবৃত্ত না করে ভদ্রলোক নড়তে চান না।

—ব্যাপারটা একে বাঁচিয়ে তোলবার পর শুনলে ভাল হোতো না?

চোখে মুখে জলের প্রচণ্ড ঝাপ্‌টা পেয়ে শ্যামলাল ধীরে ধীরে চোখ মেলে: ছিঃ, আপনি আমার এমন মুড্‌-টা নষ্ট করে দিলেন।

বেণু ডাক্তার উত্তর খুঁজে পান না। চারদিকের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এড়িয়ে এখন পালাতে পারলে বাঁচেন।

দুহাতে শ্যামলালকে তুলে বসিয়ে তিনি ওঠবার জন্যে ইঙ্গিত করেন।

—মাফ্‌ করবেন ডাক্তারবাবু, আপনার কোম্পানীতে আমার দ্বারা একটিং করা হবে না।

—তা, তা,···ভুলে যান বেণু কি বলতে চাইছিলেন। সারাটা সময়ই শ্যাম অভিনয় করেছে নাকি?···না সত্যিকারের অভিনয় এখন সুরু করল? বোধ হয় আন্দাজ করেছে আমার ডিরেক্টারী-ফিরেক্টারী সব ভুয়ো···কে জানে কি ভাবছে ও? অথচ চাইছে দেখ কেমন ভাল-মানুষটির মত···উঃ, এ ব্যাটাদের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, ভীড় জমাচ্ছে দেখ।

—আচ্ছা, আমি তাহ'লে চলি, শ্যাম।

ভীড় ঠেলে বেণু ডাক্তার তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দেন। মাঠের এ পাশটা একটু ফাঁকা: পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘামটা মুছে ফেলতে হয়। আর দু পা একটু ধীরে সুস্থেই চলেন বেণু। তার পরেই বড় রাস্তা···

মুর্শিদাবাদে আগত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ

শ্রীশোভেন্দ্রমোহন সেন

বর্ত্তমান সময়ে মুর্শিদাবাদ জেলাকে যে সকল সমস্যা ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে ও যে সকল গুরুতর সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন, তন্মধ্যে খাদ্য সমস্যা ও পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের সমস্যাই হইল প্রধান। আশ্বিন সংখ্যা ভারতবর্ষে মুর্শিদাবাদের বর্তমান খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা আমি করিয়াছি, সমস্যার মূল কোথায় এবং কি ভাবে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইতে পারে তাহার সম্বন্ধেও বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদের অপর একটি প্রধান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি। এই সম্পর্কে ভাগ্য বিড়ম্বনায় যে সকল নরনারী পূর্ববঙ্গ হইতে—নিজ বাসভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের সংবাদ দেশবাসীর নিকট ভালভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হইবে।

দেশ বিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফল হইলেন এই আশ্রয়প্রার্থীবৃন্দ। বঙ্গ-বিভাগের পর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে আশ্রয়প্রার্থী আসিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে নদীয়া জেলাতেই আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা সর্বাধিক হইয়াছে, তাহার পর বেশি পরিমাণে যে সকল জেলায় উদ্বাস্তুগণ আসিয়াছেন, মুর্শিদাবাদ জেলা হইল তাহার মধ্যে অন্যতম। এই আশ্রয়-প্রার্থীদের আগমন ঘটিয়াছে দুই দফায়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের পর হইতে প্রথম দফায় আশ্রয়-প্রার্থীগণ মুর্শিদাবাদ জেলায় আগমন করেন ও তাহার পর দ্বিতীয় দফায় আগমন করেন ১৯৫০ সালের বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের পর। এই দুই দফায় প্রায় এক লক্ষেরও অধিক আশ্রয়-প্রার্থী পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার সকল মহকুমাতেই আশ্রয়প্রার্থীরা আসিয়া বাস করিতেছেন। ইহার মধ্যে বহরমপুর সদর ও লালবাগ মহকুমাতে আশ্রয় প্রার্থীদের সংখ্যা বেশি দাঁড়াইয়াছে। আশ্রয় প্রার্থীরা কেহ কেহ তাঁহাদের পরিচিত আত্মীয়-স্বজন অথবা বন্ধু-বান্ধবদের আশ্রয় লইয়া বাস করিতেছেন বটে—তথাপি জেলার বিভিন্ন স্থানে একটি একটি এলাকায় আশ্রয়প্রার্থীরা বাস করিতে থাকায় তথায় এক একটি কলোনী গড়িয়া উঠিয়াছে। সরকার হইতেও জেলার এক একটি স্থান নির্বাচন করিয়া তথায় আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন ও তথায় কলোনী বা শিবির স্থাপন করিয়াছেন। লালবাগ, নিমতিতা, মহালন্দি ও লালগোলায় এই ভাবে শিবির স্থাপিত হইয়াছে।

আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেরাই যেখানে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন, সরকার তথায় আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ঋণ মঞ্জুর ছাড়া আর কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু সরকারী শিবিরগুলিতে আশ্রয়প্রার্থীদের সর্ব-প্রকারের সাহায্য সরকার হইতে করা হইয়া থাকে। কাশিমবাজারের মণীন্দ্রনগর কলোনী বর্তমানে এক বিরাট জনপদে পরিণত হইয়াছে। কাশিমবাজারের মহারাজার জমিতে এই কলোনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

বলরামপুরের জমিদার শ্রীরামরঞ্জন চৌধুরীর জমিতে বলরামপুর কলোনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহরমপুরের অনতিদূরে কৃষ্ণমাটি নামক স্থানে, খিদিরপুর গ্রামে ও জয়চাঁদ খাগড়া নামক স্থানেও এক একটি কলোনী গড়িয়া উঠিয়াছে।

সরকার হইতে সরকারের আর্থিক সঙ্গতি অনুপাতে সকল প্রকারের সাহায্য আশ্রয়প্রার্থীরা পাইতেছেন। ইহা ছাড়া মুর্শিদাবাদের বেসরকারী বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ও পুনর্বাসনকল্পে যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে জেলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান, জেলা আর এস পি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, স্বর্ণধাম সেবক সংঘ, জেলা ব্যথারী সমিতি, জেলা জনমঙ্গল সমিতি, জেলা রেডক্রশ সমিতি ও রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলী সত্যই প্রশংসার্হ। চরম দুর্দিনে এই সকল প্রতিষ্ঠানের সেবাপরায়ণ কর্ম্মীবৃন্দ যে প্রকার নিঃস্বার্থ জনসেবার আদর্শ লইয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন তাহাতে জেলাবাসী হিসাবে আমরা সকলেই তাঁহাদের জন্য গৌরব অনুভব করিতে পারি। ইহা হইল প্রতিষ্ঠানের কথা। ব্যক্তিগতভাবেও জেলার কয়েকজন সুসন্তান আশ্রয়প্রার্থীদের যে সাহায্যদান করিয়াছেন কৃতজ্ঞ অন্তরে তাহা আমরা স্মরণ করিতেছি। বহু বদান্য ব্যক্তি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী নানা দিক দিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য করিয়াছেন। জেলার সীমান্তবর্ত্তী এলাকার জমিদারগণ তাঁহাদের জমি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া তথায় কৃষিজীবী আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়াছেন, এমন সংবাদও আমরা পাইয়াছি। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী তাঁহার বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড নামমাত্র অর্থের বিনিময়ে বিলি বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহার বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। মণীন্দ্রনগর কলোনীতে তিনি জলের ব্যবস্থার জন্য নলকূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার সৈদাবাদের বাস ভবনটির একাংশ তিনি জেলা কংগ্রেস কমিটির কর্তৃপক্ষের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন। তথায় পূর্ববঙ্গ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী অস্থায়ীভাবে কাজ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আসিতেছে। আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যের জন্য জেলার বাহির হইতে যে সকল প্রতিষ্ঠান সক্রিয় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইষ্টবেঙ্গল রিলিফ কমিটীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমিটীর সভাপতি ডাঃ মেঘনাদ সাহা মুর্শিদাবাদে আসিয়া বিভিন্ন আশ্রয়প্রার্থী কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং কাশিমবাজার মণীন্দ্র কলোনীতে বেঙ্গল রিলিফ কমিটীর অর্থানুকূল্যেই একটি কূপ খনন করা হইয়াছে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও মুর্শিদাবাদের আশ্রয়প্রার্থীদের অবস্থা দেখিতে দুই দিনের জন্য আসিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানাদিক দিয়া আশ্রয়প্রার্থীদিগের পুনর্বাসনের চেষ্টা করিতেছেন এবং তদনুযায়ী মুর্শিদাবাদ জেলাতেও কার্য্য চলিতেছে। লালবাগ মহকুমাতে লালবাগ সহরের সন্নিকটে মোগলটুলি ও শ্যামপুর-হায়দারগঞ্জ নামক দুইটি স্থানে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বাসস্থান প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই দুইটি স্থান যখন বসতিপূর্ণ হইয়া উঠিবে তখন ইহা স্বয়ংসম্পূর্ণ দুইটি ছোট গ্রামে পরিণত হইবে। বাঞ্জেটিয়া নামক স্থানে কৃষি-উদ্বাস্তু পরিবারদের পুনর্বাসনের জন্য পতিত জমি সরকার হইতে দখল করা হইয়াছে। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেও এইভাবে ও এই উদ্দেশ্যে জমি দখল করা হইয়াছে। ইহাতে বহু চাষী উদ্বাস্তু পরিবার স্থায়ীভাবে নিজদিগের জীবিকা নির্বাহ করিবার প্রয়াস পাইবে। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী বাস করিতেছেন তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেণীর ও সর্বপ্রকারের কাজ জানা সম্প্রদায় রহিয়াছেন। বুদ্ধিজীবী, অর্থাৎ উকীল, মোক্তার ও ডাক্তার আছেন, ব্যবসায়ী আছেন, শ্রমজীবী আছেন ও বিভিন্ন শিল্পের কারিকর আছেন। কাশিমবাজার, বলরামপুর ও কৃষ্ণমাটীতে এই কারণে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। হাতের কাজ—যথা ছুতার, কামার, কুমোর, কংস-বণিক ও ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুতকারী ইত্যাদি বহু প্রকারের শিল্প-জানা ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে রহিয়াছেন।

যে সকল আশ্রয়প্রার্থী এখানে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই এখানে আসিয়াও তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে শিল্প ও ব্যবসায় প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা অদূর-ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদ জেলাকে এক শিল্প ও ব্যবসায় প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করিবে। আশ্রয়প্রার্থীদের কর্মোদ্যম সত্যই প্রসংশনীয়। তাঁহারা রিক্ত হইয়া আসিয়াও নিরাশ হন নাই এবং শ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সকল ধরণের জীবিকাই হৃষ্ট মনে গ্রহণ করিয়াছেন। বহরমপুর সহরে আমরা দেখিয়াছি, বহু ভদ্রসন্তান ও শিক্ষিত শ্রেণীর আশ্রয়প্রার্থী সামান্য মুদীখানার দোকান অথবা তরিতরকারীর দোকান করিয়া উপার্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। বহু ভদ্রপরিবারের সন্তান রিক্সচালনা ও এমন কি চানাচুর বিক্রয় করিয়াও নিজের জীবিকার উপায় করিতেছেন। তাঁহাদের এই কায়িকশ্রমের প্রতি নিষ্ঠা কখনই বৃথা যাইবে না। তাঁহাদের এই শ্রমস্বীকার সকলেরই অনুকরণীয়। ইহা ব্যতীত বর্তমান খাদ্যাভাবের দিনে পূর্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থীরা যেভাবে তরিতরকারী ইত্যাদি উৎপাদনের কার্য্য নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন জমিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা খাদ্যাভাব বিশেষ করিয়া তরিতরকারীর অভাব অনেকাংশে মিটাইবে। মণীন্দ্র কলোনীতে এই তরকারীর উৎপাদন খুবই সন্তোষজনকভাবে চলিয়াছে। নদীর নিকটবর্ত্তী এলাকায় পূর্ববঙ্গের বহু ধীবর পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন ও তাঁহারা নিজেদের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। লালগোলার নিকট এবং নিমতিতার নিকট এইভাবে বহু ধীবর মাছের ব্যবসায় চালাইতেছেন। নিমতিতা হইতে প্রত্যহ যে মাছ চালান যাইতেছে তাহা কলিকাতার মাছের বাজারদর অনেকাংশে নামাইতে সাহায্য করিতেছে, এ সংবাদ আমরা পাইতেছি। বহরমপুর সহরেও আমরা দেখিয়াছি বহু আশ্রয়প্রার্থী দোকান খুলিয়াছেন এবং নিষ্ঠার সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদেরই উদ্যমে সহরে

অনেক করাতকল, তাঁত ও ময়দার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও সাময়িক ভাবে জেলার সম্পদ তাহাতে বর্দ্ধিত হইতেছে।

পূর্ববঙ্গ হইতে যে সকল ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসিয়াছেন তাঁহারা অধিকাংশই এইরূপ নূতনভাবে নিজেদিগের জীবন গড়িয়া তুলিতেছেন। তাঁহাদের কর্মোদ্যম দেখিয়া আমরা সত্যই ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি। নিঃস্ব ও রিক্ত হইয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ আমরা বুঝিতেছি যে তাঁহাদের যাত্রা সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। মুর্শিদাবাদের অধিবাসী হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য—আশ্রয়প্রার্থীদের সকল কর্ম প্রচেষ্টাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা। সরকার হইতে সম্ভবমত সর্বপ্রকারের সাহায্য অবশ্য করা হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসনের সমস্যা এতই জটিল ও ব্যাপক যে তাহার সমাধানে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও সমর্থন একান্ত প্রয়োজন। আশ্রয়প্রার্থীদিগকে আমাদেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে নূতনভাবে দেশকে গঠন করিতে প্রয়াসী হইতে হইবে। দেশ বিভাগের পর কাতারে কাতারে যে সকল ভাগ্যহীন আশ্রয়প্রার্থী এখানে আসিয়াছিল, তাহাদের উপস্থিতিতে প্রথমে আমরা আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু কর্মকুশল, উদ্যোগী ও স্বাবলম্বী আশ্রয়প্রার্থীরা নিজেদের চেষ্টার দ্বারা, শ্রমের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের ভারস্বরূপ চিরকাল থাকিবেন না, পরন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আশ্রয়প্রার্থীরা অধিকাংশই দেশের সম্পদ হিসাবে গণ্য হইবেন। বহু সাঁওতাল পরিবারও এখানে চলিয়া আসিয়াছেন। আমরা জানিয়াছি যে সেই সকল সাঁওতালগণ কোনো প্রকারের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, পরিবর্তে তাঁহারা চাহিয়াছেন কর্মের সুযোগ। আত্মনির্ভরশীলতার ইহা এক অপূর্ব নিদর্শন।

সত্যই—বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে আর হতাশার কোনো কারণ নাই। হয়তো স্থানে স্থানে বা সময়ে সময়ে কিছু ত্রুটী বা অনিয়ম সরকারী পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ঘটিতে থাকিবে। কিন্তু তাহাতে কাহারও কোনো প্রকারের উত্তেজনা বা অসন্তোষের সৃষ্টি করা বিধেয় হইবে না। আশ্রয়প্রার্থীদিগকে দুর্ভাগ্যের চরমতম দুর্দিনে আমরা আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম, আজ দেখিতেছি যে বিধাতার সেই অভিশাপ বরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদের ও আমাদের সকলের চেষ্টায় ও সমবেত কর্মোদ্যমের ফলে মুর্শিদাবাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধান অচিরেই সাধিত হইবে। পূর্বে মুর্শিদাবাদের যে সকল স্থান পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, আশ্রয়প্রার্থীদের আগমনে আজ সেই সকল স্থানই কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কম আশা ও লাভের কথা নহে।

আশ্রয়প্রার্থীদিগের প্রতি কয়েকটি কথা নিবেদন করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব। আশ্রয়প্রার্থীরা যে দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিতেছেন তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতেছি ও তাঁহাদের সহিত সমান অংশ গ্রহণ করিতেছি। সব থাকিয়াও যাঁহাদের আজ কিছুই নাই, যাঁহারা পথের যাত্রী হইয়া পড়িলেন—তাঁহাদের দুঃখের ভার যেন ভগবানের দয়ায় ও আশীর্বাদে লাঘব হয়। ভারত-রাষ্ট্র তাহাদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারাও নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়া রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা করুন। শক্তি দিয়া, দরদ দিয়া তাঁহারা কর্মে অগ্রসর হউন—দেখিবেন তাঁহাদের কষ্টের লাঘব হইবে। আবার তাঁহারা তাঁহাদের সংসার-সুখ পাইবেন, গৃহ পাইবেন—আবার তাঁহাদের গৃহের আঙ্গিনায় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিবে, শিশুকোলাহলের কলকাকলীতে প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিবে। হঠাৎ বিপদে যাঁহাদিগকে অবাঞ্ছিত দায় ও ভার বলিয়া গণ্য করা হইতেছিল—ভগবানের করুণায় তাঁহারাই আবার জাতির ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হইয়া উঠিবেন।

আকস্মিক

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাইরে দারুণ জল, হাত ধরে ঘরে ডেকে আন্লে,
বিকেলের কান্নায় সন্ধ্যার ভীরু দীপ জ্বালো,
সিঁদুরের টিপখানি অপরূপ মানিয়েছে সত্যি,
চাঁদের গ্রহণ আজ—কারা যেন বাঁকা হেসে বল্লো।

তোমারও কি মনে হায় অলকার মায়া তুলি ছুঁয়েছে,
এতটুকু ভাল লাগা, এত দাম দিয়ে সে কি কেনবার?

আঁধারেতে ডাইনির চোখ দুটো জ্বলে বলে শুনেছি,
তোমার দুচোখে চাঁদ, বাইরে থাকবে কোথা চাঁদ আর?

জানলার ফাঁক দিয়ে বাদলা বাতাস যেন শীস্ দেয়,
কড়্ কড়্ বিদ্যুতে ছাদ ভেঙ্গে ফুল বুঝি ফুটবে,
বুকে যে অচেনা ঢেউ, অবাক হওয়ার ঘোর কাটলো,
নিবেদন পারাবারে তুমিও কি মোর সাথে ডুববে?

সব কিছু মধুময়, সব ভালো, কোথা কোন পাপ নাই,
আজ আমি সম্রাট, গোষ্পদে সমুদ্র স্বাদ পাই।

ভৈরবী—কওআলী

(বাঙ্গলা ভজন)

তোমারে খুঁজি কেন দেশে বিদেশে
রয়েছ হৃদয়ে শ্রীহরি,
যোগাসনে বসি সাধু সন্ন্যাসী
নিত্য নাম জপে তোমারি,
রয়েছ হৃদয়ে শ্রীহরি।
তীর্থধামে যায় কত শত নরনারী,
এ যে মহাভ্রম মোরা কভু বুঝিতে না পারি,
রয়েছ হৃদয়ে শ্রীহরি।
সকল ঘটে তুমি বিরাজ বংশীধারী,
তুমি মন-চঞ্চল-হরণকারী,
রয়েছ হৃদয়ে শ্রীহরি।
গোপেশ কেমনে পাবে তোমার চরণ তরি,
দয়া করে বল তারে ওহে ভব-কাণ্ডারী,
রয়েছ হৃদয়ে শ্রীহরি॥

রচয়িতা—গীত-সম্রাট শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি—গীত-সরস্বতী শ্রীমতী সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়

{ । পা পা পা | দা মা পা পা | । পা দা ণা | পণা দপা মজ্ঞা জ্ঞা |
- তো মা রে খুঁ জি কে ন - দে শে বি দে০ শে০ ০০ শে০ ০

। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সা জ্ঞা মা পা | মজ্ঞা জ্ঞা সা ঋা | ণ্‌া ঋা সা । }
- র য়ে ছ হৃ দ য়ে শ্রী হ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি -

মা । মা মা | মা । মা মা | পা । পা পা | দা মা পা পা |
যো - গা স নে - ব সি সা - ধু স ন্ন্যা ০ ০ সী

পা । দা র্সা | । র্সা র্ঋা সা | ণা ণা ণা ণা | পণা দপা মদা পা |
নি - ত্য না - ম জ পে তো মা ০ ০ ০০ ০০ ০০ রি

। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সা জ্ঞা মা পা | মজ্ঞা জ্ঞা সা ঋা | ণ্‌া ঋা সা । II
- র য়ে ছ হৃ দ য়ে শ্রী হ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি -

দা । মা দা | । ণা র্সা । | র্সা র্সা র্ঋা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা |
তী - র্থ ধা - মে যা য় ক ত শ ত ন র না রী

১´ ০ ১´
দা জ্জা র্রা জ্জা | র্সা ঋা র্সা র্সা | ণা ণা ধা ণা | পা ণা দা পা |
এ যে ম হা ভ্র ম মো রা ক ভু বু ঝি তে না পা রি

া জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সা জ্ঞা মা পা | মজ্ঞা মা সা ঋা | ণ্া ঋা সা া II
- র য়ে ছ হৃ দ য়ে শ্রী হ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি -

২য় অন্তরা—

১´ ০ ১´ ০
{ দা মা দা ণা | র্সা া র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা ঋা | ণা ণা র্সা র্সা |
স ক ল ঘ টে - তু মি বি রা জ বং ০ শী ধা রী

দা জ্জা র্রা জ্জা | র্সা ঃঋা র্সা র্সা | ণা ণা দর্সা ণধা | ণা দা পা া }
তু মি ম ন চ ০ ঞ্চ ল চ র ণ০ ০০ ০ কা রী -

১´ ১´ ১´ ০
া জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সা জ্ঞা মা পা | মজ্ঞা জ্ঞা সা ঋা | ণ্া ঋা সা া II
- র য়ে ছ হৃ দ য়ে শ্রী হ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি -

৩য় অন্তরা—

১´ ০ ১´ ০
{ দা মা দা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা ঋা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা |
গো পে শ কে ম নে পা বে তো মা র চ র ণ ত ঃরি

১´ ০ ১´ ০
দা জ্জা র্রা জ্জা | র্সা ঋা র্সা র্সা | ণা ণা ধা ণা | পা ণা দা পা } |
দ য়া ক রে ব ল তা রে ও হে ভ ব কা ০ ণ্ডা রী

১´ ০ ১´ ০
া জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সা জ্ঞা মা সা | মজ্ঞা জ্ঞা সা ঋা | ণ্া ঋা সা া II
- র য়ে ছ হৃ দ য়ে শ্রী হ০ ০ ০ ০ ০ ০ রি -

বেকার সমস্যা

শ্রীকৃষ্ণকান্ত শাস্ত্রী

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রসূত সুখ-সম্পদের আশা তাহার বহুদূরে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতামূলে ভারত আজ বহু সমস্যাপ্রপীড়িত। স্বাধীনদেশের অধিবাসী হিসাবে প্রত্যেক অধিবাসীর দেশের সেবা করিবার যে স্বতঃসিদ্ধ অধিকার আছে সেই অধিকার-মূলে "বেকার"-সমস্যারূপ ভারতীয় সমস্যার অন্যতম সমস্যার সমাধান কল্পে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি, অবশ্য সঠিক্ সমাধান হইবে কিনা তাহা দেশবাসীর সদিচ্ছার উপরই নির্ভর করিবে।

প্রথমতঃ রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে রোগের কারণ নির্ণয় করা প্রয়োজন; কারণ রোগের মূল কারণ না জানিয়া চিকিৎসা করিলে প্রায়শঃ চিকিৎসা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। অতএব আমাদের প্রথমে চিন্তা করিতে হইবে এই সমস্যার মূল কারণ কি? প্রধানতঃ "বেকার" এই শব্দটী মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব এই সংবাদটী প্রকাশ করে। এই কর্ম্মক্ষেত্রের অভাব কেন হইল? প্রকৃত তথ্য চিন্তা করিলে দেখা যায় বর্ত্তমান প্রচলিত জড়-বিজ্ঞানই এই দেশব্যাপী হাহাকারের প্রধান ও প্রথম কারণ। বিজ্ঞানের মোহজালে আজ বিশ্ববাসী অন্ধ হইতে বসিয়াছে। বণিক্-নিয়ন্ত্রিত-সভ্যতার প্রসাদে আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র বহুবিধ হিসাব-নিকাশই হইয়া থাকে, কিন্তু হতভাগ্য ভারতবাসী এই জড় বিজ্ঞানের দ্বারা কি লাভ করিল এবং কি লোক্সান্ দিল তাহারই হিসাব নিকাশ করিল না। আমি আপাততঃ তাহারই হিসাব-নিকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমে আর্থিক জগতে লাভের হিসাব করিতে গেলে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রযুগে লাভবান্ হইয়াছে ধনকুবের বণিক্‌গোষ্ঠী; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহারা বৃহৎ বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করিয়া লাভের অঙ্ক ক্রমশঃ বাড়াইয়া চলিয়াছে, তাহাদের এই ধনাশার-পরিসমাপ্তির আশা দেখা যায়না—লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় ইহা গগনস্পর্শী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ ইহা হইতে কি পাইল? সূক্ষ্ম হিসাব করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের লভ্যাংশ আনুপাতিক অতি নগণ্য—হিসাবের বহির্ভূত বলিয়াই মনে হইবে। এ সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনার বিষয়-বস্তু থাকিলেও বর্ত্তমানে তাহা আমার প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু না হওয়ায় তাহা হইতে বিরত হইলাম। এখন লোক্সানের হিসাব করিতে গেলে দেখা যাইবে বিত্তশালী বণিক্‌সম্প্রদায়ের যন্ত্রশিল্পরূপ যূপকাষ্ঠে দরিদ্র জনসাধারণই বলি স্বরূপ। বণিক্ প্রবর্ত্তিত এই যন্ত্রশিল্পই সাধারণ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করিয়াছে। দৈহিক-শক্তি যন্ত্র-শক্তির করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ভারতীয় নরনারী পূর্ব্বে দৈহিক শক্তির সাহায্যে কুটীর শিল্প তথা অন্যান্য আনুসঙ্গিক উপায়ে তাহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সমাধান করিতে পারিত। কিন্তু ধূর্ত্ত বণিক্ জাতি যন্ত্রের সাহায্যে তাহাদের এই কর্ম্ম পন্থাকে গ্রাস করিয়া জনসাধারণকে হৃত-সর্ব্বস্ব ও কঙ্কাল-সার করিতে বসিয়াছে। বিজ্ঞানের মায়া মরীচিকায় মুগ্ধ বর্ত্তমান জনসাধারণ হয়ত আমার এই কথাগুলি ভাল শুনিবেন না। কারণ বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়া তাঁহারা যে সমস্ত আপাতঃ মধুর সুখের অধিকারী হইয়াছেন তাহা ত্যাগ করিতে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইবে। তথাপি অত্যন্ত শ্রুতিকটু হইলেও অতি ধ্রুব একটী সত্য তাঁহাদের আমি শুনাইব—তাহা এই যে—বর্ত্তমান ধূর্ত্ত বণিক্-নিয়ন্ত্রিত সভ্যতা তাঁহাদের নিকট নিত্যনূতন অভাব রচনা করিয়া তাহা পূরণের অছিলায় যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে তাহাদের অস্থিমজ্জা ও রক্ত জোঁকের মত চুষিয়া খাইতেছে, দরিদ্র জনসাধারণ তাহা বুঝিবারও অবসর পাইতেছে না। দরিদ্র জনসাধারণ বর্ত্তমানে মনে করে কলকারখানার ফলে অনেক চাকুরী লাভ হইবে এবং তাহার ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে। তার পর আরও দুঃখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও তাঁহাদের উপদেশ বাণীতে উহারই পুনরুক্তি করিতেছেন। কিন্তু হায়, ভক্ষক কি কখনও রক্ষক হয়, এই কারখানাগুলিই বেকারের স্রষ্টা, তাহারা ইহার কি সমাধান করিবে। এই বিরাট জন সংখ্যার মধ্য হইতে কারখানায় কয়টী লোকের সংস্থান হইবে।

অপরদিকে হীন সেবাব্রতই যদি আমাদের একমাত্র কাম্যবস্তু হয় তাহা হইলে স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য আত্মবলিদানের সার্থকতা কোথায়? সেবা ভারতবাসী করে; সে সেবা করে তাহার ইষ্ট দেবতার—সেবা করে দেশ মাতৃকার—সেবা করে তাহার চতুর্বর্গ সাধক জনক জননীর। শোণিত-পিপাসু ধনী বণিক্‌কুলের সেবা করিয়া লাভ কি? তাহাদের সেবা করার অর্থ হইবে, স্বীয় রক্তের দ্বারা ধনীর শক্তি বৃদ্ধি করা। ইহা কি বর্ত্তমান মুমূর্ষু দরিদ্র জনসমাজের চিন্তার বিষয়ীভূত বস্তু হইবে না। দাসত্ব মানবের ধীশক্তি তথা কর্ম্মশক্তির বিলোপ সাধন করে ইহা প্রত্যেকেরই চিন্তা করা উচিত।

তথাকথিত সুসভ্য সমাজ জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যন্ত্রশিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সত্য কথা বলিতে গেলে ইহা একটী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। হ্রাস বৃদ্ধি আনুপাতিক আপেক্ষিক সম্বন্ধে আবদ্ধ, মৌলিক বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। দৈহিক শক্তির সাহায্যে যে কার্য্য যে সময়ের মধ্যে সাধিত হয়, যন্ত্রশক্তি মূলে তাহা তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের

ইহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য। এই বিশ্ব সীমাবদ্ধ আধার মাত্র, সুতরাং তাহার আধেয়ও সীমাবদ্ধ হইবে, আধার হইতে আধেয়ের আধিক্যের সম্ভাবনা কোথায়? বৈজ্ঞানিকরা হয় ত বলিবেন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করিলে শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে—আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও তাঁহারা দিতে পারিবেন, কিন্তু শেষ পরিণতিমূলে ঐ ভূমি যে বন্ধ্যা হইবে এ কথা তাঁহারা বলিবেন না। কেহ বলিবেন—বিজ্ঞানসম্মত সার দিয়া উৎপাদনী শক্তি বৃদ্ধি করা যায়। বৈজ্ঞানিক শক্তির সহিত সংঘর্ষে জীবনীশক্তি ধ্বংস হইলে তাহার বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে জীব আজ অমর হইত। সুতরাং ইহা ধ্রুব সত্য—জড়বিজ্ঞান উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারে না, জড়বিজ্ঞান পারে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাজ করিতে। কিন্তু তাহার লভ্যাংশ কি? তাহার লভ্যাংশ হইয়াছে বেকার সমস্যা। জড়বিজ্ঞানের মাহাত্ম্য-প্রচারকারীরা খোদার উপর খোদ্‌কারী করিতে গিয়া রচনা করিয়াছেন গোদের উপর বিস্ফোটক। যিনি জন্মিবার পূর্ব্বে জীবের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন হতভাগ্য জীব তাঁহার এই করুণার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিল না। এই মূঢ় জীব কর্ত্তার উপর কর্তৃত্ব করিয়া অনর্থকেই বরণ করিয়া লইয়াছে।

বিশ্বে যত জীব আছে প্রত্যেকেরই কর্ম্মক্ষেত্র আছে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ—এই কর্ম্মক্ষেত্রের বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই—কারণ জীবের শক্তি সীমাবদ্ধ।

ধনাশায় উন্মত্ত বণিক্ জাতি বৈজ্ঞানিক চাতুর্য্য বলে ব্যক্তিগত কর্ম্মক্ষেত্রকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহার ফলে আজ শুধু ভারতে কেন বিশ্ব সংসার জুড়িয়া উঠিয়াছে হাহাকার—ক্রন্দন রোল। যাঁহারা সত্যের ও ধর্ম্মের উপাসক, আমার ধ্রুব বিশ্বাস তাঁহারা ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন!

এই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হইতেছে দেশ-কাল-পাত্রভেদে ব্যক্তিগত যোগ্যতার মানদণ্ডে কর্ম্মক্ষেত্র নিরূপণ। আমি এই কথাটী যত সহজে বলিলাম, ইহার প্রকৃত রূপ ফুটাইয়া তোলা বাস্তব পক্ষে তত সহজ নয়। বর্ত্তমানে দুর্ব্বল জনসাধারণের ইহা সাধ্যাতীত; ইহাকে বাস্তবে পরিণত করিবার এখন একমাত্র অধিকারী ভারতীয় সরকার অথবা রাষ্ট্রের কর্ণধার।

এই বেকার-সমস্যারূপ দুষ্টব্রণকে রাষ্ট্রীয় দেহ হইতে উৎপাটিত করিতে হইলে সরকার কর্ত্তৃক দুইটী পরিকল্পনা গ্রহণ করা বর্ত্তমানে যুক্তি-সংগত বলিয়া মনে হয়—প্রথমটী স্বল্প-মেয়াদী, দ্বিতীয়টী দীর্ঘ-মেয়াদী। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনামূলে যাহা কর্ত্তব্য এখন তাহাই আমি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ ভারতের কর্ম্মযোগ্য ব্যক্তি-পুঞ্জকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পর উহার প্রথমাংশকে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক রাষ্ট্রীয় সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগের মধ্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য; ইহার ফলে একদিকে তাহাদের কর্ম্মের সংস্থান হইবে, অপরদিকে তাহারা দেশমাতৃকার সেবার সুযোগ পাইবে। বিশেষতঃ সদ্যপ্রসূত স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করিবার জন্য সমরবিভাগে যুব-সমাজের নিয়োগ অপরিহার্য্যরূপে গৃহীত হওয়া উচিত। তারপর অপরাংশকে তাহাদের যোগ্যতার মাপ কাঠিতে ব্যক্তিগত কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিয়া দিতে হইবে। যদি কেহ বলেন যে ইহা বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। কথাটা আংশিক সত্য হইলেও আমার মনে হয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ যদি বৈদেশিক মোহজালের করাল গ্রাস হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে ইহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইবে না। রাষ্ট্র যদি এই অসংখ্য জীবের পোষণের আতঙ্কে অর্থাভাবের প্রশ্ন তোলেন, তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য হইবে যে আমাদের টাকার প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী প্রয়োজন অন্ন বস্ত্রের। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। অন্ন-বস্ত্র প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং ইহার অভাব কি করিয়া স্বীকার করা যায়। সাময়িক অভাব হয় ত স্বীকার করা যাইত, যদি দেশের উপর তীব্র আকারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা প্রভৃতি অথবা যুদ্ধ দেখা যাইত। ইহার একটীর দ্বারাও ভারতের মাটী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ইহা স্বীকার করা যায় না। তার পর যে ব্রহ্মদেশ শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল সেই ব্রহ্মদেশও যখন ভারতে চাল পাঠাইতে পারে তখন ভারতভূমিতে এই অভাবের, কাল্পনিক জগতে ছাড়া স্থান নাই। সুতরাং অর্থের অভাব এই প্রশ্নে অবসর আসে না। ভারত সরকার তাঁর জনশক্তি বলেই দেশের সম্পদ উৎপাদন ও বৃদ্ধি সাধন করিতে পারেন, তারপর অর্থের অতি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার মাধ্যমে ইহার যথাযোগ্য বণ্টন করিলেই দেশের দুঃখ দুর্গতির অবসান হয়। যদি কেহ এস্থানে আপত্তি করেন যে এ দিনে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে সরকারের অর্থাভাব ঘটিবে এবং অনিবার্য্য কারণে যে সমস্ত দ্রব্য বিদেশ হইতে আনিতে হয় তাহার বিশেষ অসুবিধা হইবে। এই প্রশ্নের সমাধান কল্পে আমি বলিব দ্রব্যের কোন মূল্য নাই। মূল্য মাত্র প্রয়োজনের এবং এই প্রয়োজন একতরফা নয়, বিদেশী বণিক তথা রাষ্ট্রের আমাদের নিকট হইতে গ্রহণযোগ্য অনেক বস্তু আছে। সুতরাং প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারেই দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে।

অপর দিকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহা এই যে ভারতবর্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ; ইহার দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কল্পে পরমুখাপেক্ষী হইবার উল্লেখযোগ্য কোন প্রমাণ আছে বলিয়া মনে হয়না। ভারতবর্ষ পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সংস্করণ মাত্র, পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু আছে, ক্ষুদ্রতম আকারে ভারতের মাটীতে তাহার সকলেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাই কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—"যা নেই ভারতে তা নেই জগতে" যে ভারতে ছয়টি ঋতু সমভাবে খেলা করে—যে ভারত স্বর্ণপ্রসূ বলিয়া সমাখ্যাত, যে ভারত প্রকৃতির অশেষ দানে পরিপুষ্ট, সেই ভারতে অন্ন বস্ত্রের অভাব, ইহা এক অদ্ভুত অদৃষ্টের পরিহাস। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেও এই দেশ এইরূপ অলৌকিক অভাবের সম্মুখীন হয় নাই। সুতরাং কি কারণে ভারতবাসী এই

অভাব স্বীকার করিবে। তারপর পরধীনতামূলে অসীম সম্পদের উৎস হইয়াও ভারতবাসী তাহার সম্পদের সঠিক সন্ধান পায় নাই, আজ তাহার সম্পদের দ্বার উন্মুক্ত। আজ কেন ভারতবাসী ক্ষুধার জ্বালায় চিত্রগুপ্তের অতিথি হইবে।

এক্ষণে আমার মূল বক্তব্য বিষয় এই যে ব্যক্তিগত কর্ম্মক্ষেত্রের সংস্থান কল্পে যন্ত্র শিল্পের শক্তিকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিতে হইবে এবং এই কার্য্য রাষ্ট্রশক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সম্ভবপর নয়। দৈহিক শক্তির সহিত যন্ত্রশক্তির যাহাতে কোনরূপ প্রতিযোগিতা না হয় এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে রাষ্ট্রকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই পন্থা অবলম্বন করিলেই বর্তমান বেকার সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইবে।

দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা

উল্লিখিত কল্পনা মূলে আমার বক্তব্য এই যে বেকার সমস্যার কারণ সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে যান্ত্রিক সমস্ত শিল্প কেন্দ্রগুলিকে কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে আনিতে হইবে। তারপর ভারতীয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা স্বার্থে অন্য শিল্পগুলির অর্দ্ধাংশকে সামরিক শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে, এক চতুর্থাংশ বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য এবং অবশিষ্ট অংশ ভারতীয় জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সাহায্য কল্পে নিযুক্ত করিতে হইবে। এখন যদি কেহ বলেন, ভারতীয় কারখানার এক চতুর্থাংশ দ্বারা দেশের সমস্ত অভাব পূরণ করা কি ভাবে সম্ভব হইবে। এই প্রসঙ্গে দেশবাসীকে আমি এই কথাই ভাবিতে বলিব যে যন্ত্রযুগে বাস করিয়া ভারতীয় দৈহিক শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। একদিকে যন্ত্র শিল্পের প্রসারে দাসত্ব মূলে মানুষ তাহার স্বাধীন সত্তা ও বিবেককে হারাইতে বসিয়াছে, অপরদিকে অঙ্গ পরিচালনার অভাবে দেহ রোগজর্জ্জরিত, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, তাহার এই লব্ধ স্বাধীনতাকে স্থায়ী ও সুদৃঢ় করিবার বাসনা থাকে তাহা হইলে তাহাকে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে এবং এই শক্তি সঞ্চয়ের সহজ ও সরল উপায় হইবে হিংসা দ্বেষ ও ঘৃণা বর্জ্জন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা রক্ষা করিয়া দেশ কাল পাত্র ভেদে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া লইয়া কুটীর-শিল্প শিক্ষায়তন ও বিভিন্ন ব্যবসা কেন্দ্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যকে সফল করিয়া তুলিতে নাগরিক সভ্যতাকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া ধ্বংসোন্মুখ পল্লীগুলির সংস্কার ও আদর্শ পল্লী সংগঠন করিতে হইবে। আদর্শ পল্লী বলিতে কি বুঝা যায় তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব। প্রথমতঃ পল্লীর জনসংখ্যাও তাহাদের যোগ্যতার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। তাহার পর সেই জনসংখ্যাকে যোগ্যতার তারতম্য বিচার করিয়া শিক্ষক কর্ম্মকার, কৃষক, তন্তুবায়, নাপিত, রজক, কলু, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত করিয়া মূল জনসংখ্যার অনুপাত লক্ষ্য করিয়া আবাস স্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। এই উপায় অবলম্বন করিলে সেই স্থানের কর্ম্মক্ষম অধিকাংশ ব্যক্তিই তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র পাইবে এবং ইহারই ফলে আর তাহাদের নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া চাকরী করিবার জন্য সহরে ছুটিতে হইবে না। গ্রাম্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই শিল্পগুলি মানুষ যদি তাহার ব্যক্তিগত বা অল্প কয়েকজন ব্যক্তির সমবায়ে গঠিত শক্তি মূলে পরিচালনা করে তাহা হইলে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয় পরিচালনা মূলে তাহাদের মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং অপর দিকে রোগমুক্ত হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিবে ও জাতিকে শক্তিশালী করিবে। মানুষ যদি সহজ ও সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চায় তাহা হইলে তাহাদের যান্ত্রিক সভ্যতা অবশ্য কর্ত্তব্যবোধে পরিত্যাগ করা উচিত। মানুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, প্রাকৃতিক সম্পদ তাহাকে যে শক্তি সাহস বা আনন্দ দিবে তাহা অপরের অসাধ্য। মাতৃ স্তন্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহা কি বাসি দুধের গুঁড়ার মধ্যে পাওয়া যাইবে। যন্ত্র শিল্প বহুলাংশে প্রাকৃতিক সম্পদকে বিধ্বস্ত করিয়া নগর নির্ম্মাণ করিতেছে। এই নগর প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস ক্ষেত্র ও কতিপয় জনসাধারণের দাসত্ব ক্ষেত্র। এই দাসত্বমূলে মানুষ হারায় তাহার স্বাধীন কর্ম্মশক্তি ও বিচার শক্তি। সুতরাং আমি আমার এই প্রবন্ধের পাঠকবর্গকে যান্ত্রিক তথা নাগরিক সুখ ও গ্রাম্য সুখের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিতে অনুরোধ করিতেছি। বর্ত্তমান পৃথিবীতে যান্ত্রিক সভ্যতার যে রূপ আমি দেখিতেছি তন্মূলেই আমি এইরূপ মতবাদ প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা যন্ত্র শিল্পের সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে মনে করেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমার সবিনয় অনুরোধ এই যে তাঁহারা যেন একটু স্থির চিত্তে মোহমুক্ত হইয়া চিন্তা করিবার চেষ্টা করেন। তাহা হইলে তাঁহারা অতি সহজেই সত্যের উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

প্রাসঙ্গিক এখানে আমি বলিতে চাই যে যন্ত্রশিল্পের ধ্বংস সাধনই আমার মূল বক্তব্য বিষয় নহে। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমূহকে বর্জ্জন করিয়া বাঁচিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান যুগে বাঁচিতে হইলে আত্মশক্তির বৃদ্ধি করিতে এবং শত্রুপক্ষের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে। "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্" এই নীতিমূলে শুধু কাঁটা তুলিবার জন্যই অর্থাৎ শত্রু নিপাতের জন্যই এই শক্তির ব্যবহার করিতে হইবে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে উল্লিখিত উপায়ে আশু যদি এই ভীষণ সমস্যার সমাধান না করা হয়, তাহা হইলে এই ভারতবর্ষ সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইবে। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে "Idle brain is the devil's workshop," যে মানুষ দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির কারণ সেই মানুষ যদি কর্ম্মক্ষেত্রের অভাবে অলস ও অকর্ম্মণ্য অবস্থায় দিনাতিপাত করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সে অনর্থের কারণ হইবে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্ণধার ও দেশের নেতৃবৃন্দকে এই বিষয়ে সযত্নে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আশা করি সুধী সমাজ এই বিষয়ে অবহিত হইয়া জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ দুর্গতির অবসান করিবেন।

সোপেনহরের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জগৎ ইচ্ছার ব্যক্ত রূপ

এই জগৎ, এই সংসার যদি অবভাস মাত্রই হয়, তাহা হইলে এই অবভাসের উৎপত্তি হয় কিরূপে ?

জগৎ প্রকাশিত হয় আমাদের মনে—সংবিদের মধ্যে। প্রায় সকল দার্শনিকই চিন্তা এবং সংবিদকেই মনের স্বরূপ বলিয়াছেন। সোপেনহর বলিলেন, এই মত ভ্রান্ত। চিন্তা মনের স্বরূপ নহে। ইচ্ছাই মনের স্বরূপ। "সংবিদ মনের উপরিভাগ মাত্র। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ যেমন আমরা দেখিতে পাই না, তাহার উপরিভাগের সহিত কেবল আমাদের পরিচয়—তেমনি মনেরও অভ্যন্তরে যাহা আছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না।"। অভ্যন্তরে আছে ইচ্ছা। পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ বুদ্ধি ও ইচ্ছা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়াছিলেন। কিন্তু সোপেনহরের মতে বুদ্ধি ও ইচ্ছা স্বতন্ত্র। বুদ্ধি ইচ্ছাকে চালিত করে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি ইচ্ছার ভৃত্য মাত্র। অন্ধ কর্ত্তৃক স্কন্ধে বাহিত খঞ্জের মত, বুদ্ধি ইচ্ছাকে বহন করিয়া চলে। "ইচ্ছা" শব্দ সোপেনহর একপ্রকার শক্তি বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা একপ্রকার প্রচেষ্টা (striving)মূলক প্রাণশক্তি (vital force), স্বতঃ ক্রিয়াশীল প্রাণশক্তি। এই শক্তিই আমাদের অন্তরে চৈতন্যরূপে প্রকাশিত। ইচ্ছা কামনামূলক এবং অনিবার্য্য বেগে কামনা-পূরণের জন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু এই কামনা সর্বদা সচেতন নহে, জ্ঞানসমন্বিত নহে। আমাদের বুদ্ধি এই ইচ্ছার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যন্ত্র মাত্র। বুদ্ধি দ্বারা ইচ্ছা তাহার কাম্যবস্তুর দিকে চালিত হয়, কিন্তু তাহার গতির দিক-পরিবর্ত্তন হয় না। আমরা যখন কোনও বস্তু কামনা করি, তখন সেই কামনা করিবার পক্ষে যুক্তি দেখিতে পাইয়া যে কামনা করি, তাহা নহে ; বরং আমাদের কামনার পক্ষে যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া আমরা তাহার সমর্থন করি। কামনা যুক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী। আমাদের কামনার সমর্থনের জন্য আমরা দর্শন ও ধর্ম্মের সৃষ্টি করি এবং কাম্য-সুখ-বহুল স্বর্গের কল্পনা করি। এই জন্য সোপেনহর মানুষকে "দার্শনিক প্রাণী" বলিয়াছেন। ইতর জন্তুদেরও কামনা আছে, কিন্তু তাহাদের "দর্শন" নাই। যখন কোনও লোকের সহিত তর্কের সময় সকল যুক্তি-তর্কের প্রয়োগ করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না, দেখিতে পাওয়া যায় সে কিছুতেই বুঝিবে না তখন মনে ক্রোধের সঞ্চার হয়।" কিন্তু তাহার না বুঝিবার কারণ তাহার ইচ্ছার গতি যুক্তিতর্কের বিপরীতমুখী কোনও লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইলে, তাহার স্বার্থ, তাহার কামনা, তাহার ইচ্ছার অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। আমাদের পরাজয় অল্পদিনের মধ্যেই আমরা ভুলিয়া যাই, কিন্তু জয় দীর্ঘকাল মনে থাকে। স্মৃতিশক্তি ইচ্ছার দাস।" "হিসাব করিবার সময় আমরা প্রতিকূল ভুল অপেক্ষা অনুকূল ভুল অধিক করি। কিন্তু ইহার মধ্যে অসাধু অভিপ্রায় থাকে না।" "প্রকাণ্ড মূর্খের বুদ্ধিও সতেজ হইয়া ওঠে, যখন তাহার অভিলষিত বিষয়ের কথা উঠে।" "বিপদে এবং অভাবে যে বুদ্ধির বিকাশ হয়, শৃগালের এবং অপরাধীদিগের দৃষ্টান্তে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বত্রই এই বুদ্ধির বিকাশ স্বার্থের অনুকূল।"

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সোপেনহর জগৎকে প্রত্যয়রাজির সমাবেশ বলিয়াছেন। জগৎ যে প্রত্যয় মাত্র নহে, তাহা যে প্রত্যয়ের অতিরিক্ত কোনও বস্তু, তাহার মূলে যে ইচ্ছা আছে এবং সেই ইচ্ছাই যে দেশ ও কালে জগৎরূপে প্রতীত হয় তাহার প্রমাণ কি ? সোপেনহর আমাদের দেহের জ্ঞানের মধ্যে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের দেহ জগতের একটা অংশ, দেশ ও কালে বিস্তৃত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু দেহের জ্ঞান আমরা কেবল আমাদের ইন্দ্রিয় হইতেই প্রাপ্ত হই না। অন্য এক উৎস হইতেও আমাদের দেহের জ্ঞান উদ্ভূত হয় ; সে জ্ঞানের সহিত দেশ ও কালের সম্বন্ধ নাই। আমরা অব্যবহিতভাবে অন্তরের মধ্যে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হই। অন্তরের মধ্যে অব্যবহিতভাবে যাহার বোধ উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের ইচ্ছা এবং তাহাই আবার দেশ ও কালে আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরও বিষয় হয়। মনের মধ্যে ইচ্ছার ক্রিয়া যখন সংঘটিত হয়, তখন তাহার সঙ্গে অঙ্গ বিশেষ সঞ্চালিত হয়। এই অঙ্গ সঞ্চালন ও ইচ্ছার ক্রিয়া একই ক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ। অন্তরের মধ্যে তাহা ইচ্ছারূপে অনুভূত হয়, বাহিরে অঙ্গসঞ্চালনরূপে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বিষয় হয়। ইচ্ছার যে অব্যবহিত জ্ঞান হয়, তাহাকে দেহের জ্ঞান হইতে পৃথক করা যায় না। আমাদের দেহ জগতের অন্তর্গত হইলেও, জাগতিক অন্যান্য বস্তুর সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, আমাদের দেহের জ্ঞান আমরা দুইভাবে প্রাপ্ত হই, কিন্তু অন্যান্য বস্তু কেবল দেশ ও কালের মধ্যে জ্ঞানের বিষয় হয়। দেশ ও কালে বিস্তৃত আমাদের দেহকে যখন আমরা "ইচ্ছা"রূপে জানিতে পারি, তখন দেশ ও কালে বিস্তৃত অন্যান্য বস্তুও যে ইচ্ছারই বাহ্যরূপ, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। এই জন্যই সোপেনহর জগৎকে ইচ্ছা-স্বরূপ বলিয়াছেন।

ইচ্ছা এক ও অভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন দেহে ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার অস্তিত্ব নাই। বহুত্ব দেশ ও কালের সৃষ্টি। দেশ ও কালের ধারণা ব্যতীত বহুত্বের ধারণা করা যায় না। এই জন্য সোপেনহর দেশ ও কালকে "বিশেষক তত্ত্ব" (principle of individuation) বলিয়াছেন। কিন্তু দেশ ও কাল আমাদের জ্ঞানের রূপ—ইহারা স্বয়ং-সৎ-বস্তুর রূপ নহে। স্বয়ং-সৎ-বস্তুতে জ্ঞানের কোনও রূপেরই অস্তিত্ব নাই। জ্ঞানের রূপ প্রত্যয়ের

মধ্যে। সুতরাং স্বয়ং-সৎ-বস্তু প্রত্যয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইচ্ছাই স্বয়ং-সৎ-বস্তু—সুতরাং ইচ্ছা দেশ ও কালের বাহিরে অবস্থিত এবং তাহার সহিত বহুত্বের কোনও সম্বন্ধ নাই। ইচ্ছা এক ও অবিভক্ত। জগতে এক বলিতে যাহা বুঝায়, ইচ্ছা সেই অর্থে এক নহে। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুকে অথবা সামান্য প্রত্যয়কে (concept) আমরা এক বলি। কিন্তু ইচ্ছা সেরূপ এক নহে। বহুত্বের সম্ভাবনাও তাহাতে অসম্ভব। প্রস্তরের মধ্যে যে "ইচ্ছার" একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং মানুষে বৃহত্তর অংশ বর্ত্তমান, তাহা নহে। কেননা সমগ্রের সহিত অংশের সম্বন্ধ দেশের মধ্যেই সম্ভবপর। কম ও বেশীর ধারণা দেশের মধ্যে ইচ্ছার প্রকাশ—সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য। বিভিন্ন বস্তুতে এই প্রকাশের তারতম্য আছে—প্রস্তরের মধ্যে ইহার যতটা প্রকাশ, উদ্ভিদে তাহা অপেক্ষা অধিক এবং উদ্ভিদ অপেক্ষা মানুষের মধ্যে অধিকতর। উজ্জ্বলতম সূর্য্যালোক এবং প্রদোষের ক্ষীণতম আলোকের মধ্যে যেমন পরিমাণের তারতম্য আছে, তেমনি ইচ্ছার প্রকাশেরও অসংখ্য ক্রম আছে। কিন্তু প্রকাশের পরিমাণ এবং তাহার বিভিন্ন রূপের সংখ্যা ইচ্ছাকে স্পর্শও করিতে পারে না। ইচ্ছার প্রকাশ হয় দেশ ও কালের মধ্যে, কিন্তু ইচ্ছার অবস্থিতি দেশ ও কালের বাহিরে। একটি বৃক্ষের মধ্যে যেমন ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান, লক্ষ বৃক্ষের মধ্যেও তেমনি বর্ত্তমান; তাহার তারতম্য নাই। দেশ ও কালে যাহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহাদের নিকটই ইচ্ছা বহুরূপে প্রতিভাত হয়। সুতরাং যদি অসম্ভব সম্ভব হইত, যদি কোনও প্রকৃত সত্তাবান বস্তুর বিনাশ সম্ভব হইত, তাহা হইলে সামান্যতম বস্তুর বিনাশের সহিত সমগ্র জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। সেই জন্যই Angelus Silesius বলিয়াছিলেন—"আমি জানি—আমা ছাড়া ঈশ্বর একমুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারেন না। আমার অস্তিত্বের যদি বিনাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহাকেও প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।"

বহু বিশিষ্ট বস্তুর সমাবেশই জগৎ, এই সকল বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই আছে। সাদৃশ্য অনুসারে যাবতীয় বস্তু নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সদৃশ বস্তুসকলের মধ্যে যাহা সাধারণ, যাহা তাহাদের "সামান্য", তাহাই সেই শ্রেণীর "প্রত্যয়"। এই সকল প্রত্যয়ই Plato's Idea। Plato's Ideas দেশ ও কালের বাহিরে অবস্থিত। অবভাসিক জগতে বিশেষের মধ্যে তাহাদের প্রকাশ, কিন্তু কোনও বিশেষেই তাহার Idea সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না। Ideas-গণ স্থাণু, তাহাদের পরিবর্ত্তন নাই, তাহারা অবিনশ্বর। সোপেনহর বলিয়াছেন যে দেশ ও কালের জগতে বস্তুর মধ্যে যে সকল ক্রম-ভেদ (grades) আছে, তাহারা প্লেটোর Ideas। কিন্তু ইচ্ছা দেশ ও কালের অতীত। প্লেটোর Ideasও দেশ ও কালের অতীত। তবে কি ইচ্ছা ও প্লেটোর Ideas এক? সোপেনহর বলেন—না, এক নহে। দেশ, কাল এবং পর্য্যাপ্ত কারণের (sufficient Reason) অন্যান্য রূপ-বর্জ্জিত হইলেও, প্লেটোর Ideasদের অন্য একটি রূপ আছে, তাহা বিষয়ীর সহিত বিষয়ের-সম্বন্ধ রূপ। ইচ্ছা বিষয়ীর বিষয় নহে, সুতরাং তাহার সে রূপ নাই। জাগতিক বস্তুদিগের ক্রমভেদ ও ইচ্ছা এই জন্য এক বস্তু নহে। ইচ্ছা স্বয়ং-সৎ-বস্তু। জাগতিক বস্তুর ক্রমভেদ অথবা সামান্য দেশকালের অতীত হইলেও, ইচ্ছার সান্নিধ্যবর্ত্তী হইলেও, তাহারা ইচ্ছা নহে। তাহারা ইচ্ছার বিষয়ীভূত (objectified) রূপ। সমস্ত জগৎ "বিষয়ীভূত ইচ্ছা" (objectified will)।

জগতে খাদ্য ও স্ত্রীলোক লইয়া যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার কারণ কি? "ইচ্ছা"—বাঁচিবার ইচ্ছাই (will to live)—ইহার কারণ। এক অদৃশ্য শক্তি মানুষকে এই সংঘর্ষের মধ্যে ঠেলিয়া ফেলিতেছে। আমরা ভাবি আমরা যাহা দেখি বা শুনি, তাহার জন্যই আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু তাহা নহে। যে সহজাত "প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আমরা অন্তরে অনুভব করি, সেই সহজাত প্রবৃত্তিই আমাদের কর্ম্মের প্রেরক। ব্যক্তির ইচ্ছা-পূরণের জন্যই প্রকৃতি তাহার মধ্যে বুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছার যাহা সহায়ক নহে, তাহার সত্য জ্ঞান বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ইচ্ছাই মনের একমাত্র স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান। উদ্দেশ্যের সাতত্য দ্বারা ইচ্ছাই সংবিদের একত্ববিধান করে এবং সমস্ত চিন্তা এবং প্রত্যয়ের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গতিরূপে তাহাদিগকে ধারণ করিয়া থাকে।"

ইচ্ছাই চরিত্রের মূল, বুদ্ধি নহে। সাধারণে বুদ্ধিমান লোক অপেক্ষা "হৃদয়বান" লোককেই অধিক বিশ্বাস করে। যাহার ইচ্ছা সৎ, তিনিই হৃদয়বান। যখন কোনও লোককে চতুর ও "বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন" বলা হয়, তখন তাহার মধ্যে সন্দেহ ও অপ্রীতির ভাব থাকে।

আমাদের দেহও ইচ্ছা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। মাতৃগর্ভে প্রাণশক্তি কর্ত্তৃক চালিত হইয়া রক্ত ভ্রূণের দেহের মধ্যে যে সকল খাতে প্রবাহিত হয়, তাহাই শিরা ও ধমনীতে পরিণত হয়। জানিবার ইচ্ছা মস্তিষ্ক, ধরিবার ইচ্ছা হস্ত এবং ভোজনের ইচ্ছা পরিপাক-যন্ত্রের সৃষ্টি করে। প্রকৃত পক্ষে এই ত্রিবিধ ইচ্ছা এবং ত্রিবিধ অঙ্গের রূপ একই পদার্থের দুই দিক মাত্র। আমাদের দেহ জ্ঞানে প্রকাশিত ইচ্ছার রূপ। দেহের জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হয় অব্যবহিতভাবে, আমাদের কর্ম্ম ও অঙ্গচালনা হইতে। আমাদের ইচ্ছার ক্রিয়া অনুসারে দেহ চালিত হয়। ইহা আমরা অব্যবহিতভাবে জানিতে পারি। বুদ্ধিতে দেহ দেশে বিস্তৃত এবং সংঘাতরূপে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃত পক্ষে ইহা ইচ্ছাই। যখন কোনও প্রবল হৃদয়াবেগের আবির্ভাব হয়, তখন সেই অনুভূতি ও দেহের তৎকালিক আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক হইয়া যায়।

ইচ্ছা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে দৈহিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারা কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ দুইটি বিভিন্ন ক্রিয়া নহে। উহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। উহারা অভিন্ন, একই কার্য্যের দুই রূপ। ইচ্ছা—ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অব্যবহিত জ্ঞান হয়। কিন্তু এই ক্রিয়া যখন প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হয়, তখন ইহা দৈহিক ক্রিয়ারূপে প্রতীত হয়। তখন দেশ-কালে, কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন ক্রিয়ারূপে উহার জ্ঞান হয়। দেহের প্রত্যেক ক্রিয়া সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। সমগ্র দেহই জ্ঞানের বিষয়ীভূত (objectified will) ইচ্ছা ভিন্ন অন্য

কিছুই নহে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সহিত বিভিন্ন কামনার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তাহারা ঐ সকল কামনার চক্ষুগ্রাহ্য রূপ। দন্ত, কণ্ঠ ও অন্ত্র ক্ষুধার মূর্ত্ত রূপ, জননেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়-লিপ্‌সার রূপ। মানবদেহের সহিত মানবীয় ইচ্ছার ঈদৃশ সাধারণ সাদৃশ্যবশতঃ ব্যক্তির দৈহিক গঠন তাহার ইচ্ছা ও চরিত্রের অনুরূপ হয়।

"বুদ্ধি পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়, ইচ্ছার ক্লান্তি নাই। নিদ্রার মধ্যেও ইচ্ছার ক্রিয়ার বিরাম নাই, কিন্তু বুদ্ধির জন্য নিদ্রা প্রয়োজনীয়। নিদ্রাকালে মানুষের প্রাণ উদ্ভিদস্তরে নামিয়া যায়, এবং তখন তাহার মৌলিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। বাহিরের কোনও বাধা থাকে না, মস্তিষ্ক ও জ্ঞানের প্রচেষ্টা দ্বারা তাহার শক্তির খর্ব্বতা হয় না। এই জন্যই নিদ্রাকালে ইচ্ছার সমগ্রশক্তি দেহের রক্ষা এবং পুষ্টিসাধনের জন্য প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই নিদ্রাকালেই পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ ঘটে।" নিদ্রাই মানুষের আদিম অবস্থা। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ প্রায় সকল সময়েই নিদ্রিত থাকে। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশুও প্রায় সমস্ত দিন রাত্রি নিদ্রা যায়। "জীবন নিদ্রার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এই সংগ্রামে প্রথমে আমরা জয়লাভ করি, কিন্তু পরিশেষে নিদ্রাই জয়ী হয়। দিবসের পরিশ্রমে জীবনের যে অংশ ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তাহার রক্ষা ও সঞ্জীবনের জন্য মৃত্যুর নিকট হইতে ধার-করা তাহার একটা অংশই "নিদ্রা"। নিদ্রা আমাদের চিরন্তন শত্রু। জাগ্রত অবস্থায়ও ইহা আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি দেয় না। প্রতি রাত্রিতে যখন বিজ্ঞতম লোকের মস্তকও অর্থহীন অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইয়া নূতন করিয়া চিন্তা আরম্ভ করিতে হয়, তখন মানুষের বুদ্ধি হইতে আর কিই বা আশা করা যাইতে পারে!"

মানুষের স্বরূপ ইচ্ছা। জীবনের যতরূপ আছে, ইচ্ছা তাহার সকলেরই স্বরূপ। যাহাকে অচেতন পদার্থ বলা হয়, তাহার স্বরূপও ইচ্ছা। ইচ্ছাই স্বয়ং-সৎ বস্তু, ইচ্ছাই পরমসত্তা। আমাদের দেহ যেমন আমাদের ইচ্ছার ব্যক্ত অবস্থা, তেমনি সকল বস্তুই ইচ্ছার ব্যক্ত অবস্থা, সমগ্র প্রাকৃতিক জগৎই ইচ্ছার ব্যক্তরূপ। প্রকৃতি যে ইচ্ছার ব্যক্তরূপ, তাহা তোমার অথবা আমার ইচ্ছা নহে, তাহা সার্বিক ইচ্ছা। উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধিতে যে প্রচেষ্টা ব্যক্ত হয়, জীবের জন্ম ও বিকাশ এবং অবশেষে মানুষের সংবিদের আবির্ভাবে যে প্রেরণা লক্ষিত হয়, তাহা এই সার্বিক ইচ্ছার সহিত অভিন্ন। জগতের প্রত্যেক শক্তিই 'ইচ্ছা'র প্রকাশভেদ। ইচ্ছাই জগতের মূলতত্ত্ব। হিউম যে কারণ-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, ইচ্ছাই সেই কারণ তত্ত্ব। আমাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলই যেমন ইচ্ছা, তেমনি জড় চেতন সকল বস্তুর মধ্যে যাহা কিছু আছে, ইচ্ছাই সব। কারণকে যদি "ইচ্ছা" বলিয়া গণ্য না করা যায়, তাহা হইলে কারণত্ব চিরকাল দুর্বোধ্য থাকিয়া যাইবে, যাদুকরের ক্রিয়ার মত দুর্বোধ্য থাকিবে। "শক্তি", "আকর্ষণ", "সংসক্তি" প্রভৃতি শব্দ আমরা ব্যবহার করি, কিন্তু যাহা বুঝাইতে এই সকল শব্দের ব্যবহার হয় তাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। কিন্তু "ইচ্ছা" কি, তাহা আমরা জানি—অন্ততঃ ইতা অপেক্ষা ভাল জানি। আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংযোগ, বিয়োগ, চুম্বকাকর্ষণ, তাড়িৎ, মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি যাবতীয় শক্তিই 'ইচ্ছা'। প্রেমিক যুগলের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ এবং গ্রহদিগের পরস্পরের আকর্ষণের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই।

উদ্ভিদ জীবনে 'ইচ্ছা'ই অভিব্যক্ত। জীব জগতের যতই নিম্নস্তরের দিকে যাওয়া যায়, বুদ্ধির বিকাশ ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া আসে, কিন্তু ইচ্ছা তথায় পূর্ণরূপে প্রকাশিত দেখা যায়। মানুষের মধ্যে যাহা সজ্ঞানে তাহার উদ্দেশ্যের অনুসরণ করে, উদ্ভিদ জীবনে তাহা মূক ও অন্ধভাবে একই প্রণালীতে তাহার লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হয়। —কিন্তু তাহাও ইচ্ছা। অচেতন অবস্থাই সকল বস্তুর প্রথম ও স্বাভাবিক অবস্থা, ইহা হইতেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। কিন্তু চেতন পদার্থেও অচৈতন্যের পরিমাণ চৈতন্য অপেক্ষা অধিক। অধিকাংশ বস্তুর মধ্যেই চৈতন্য না থাকিলেও, তাহারা তাহাদের স্বভাবের নিয়মানুসারে—অর্থাৎ ইচ্ছার নিয়মানুসারেই ক্রিয়া করে। উদ্ভিদে চৈতন্যের পরিমাণ অতি সামান্য। প্রাণী জগতে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইতে হইতে "ইচ্ছা" মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞায় উপনীত হইয়াছে, কিন্তু উদ্ভিদের অচেতন অবস্থা মানুষের মধ্যেও তাহার সংবিদের ভিত্তি। ইহার জন্যই নিদ্রার আবশ্যক হয়।

আরিস্ততল বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক বস্তুর মধ্যস্থিত এক শক্তি দ্বারা তাহার রূপ গঠিত হয়। এই শক্তি যেমন উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের মধ্যে, তেমনি গ্রহ নক্ষত্রেও বর্ত্তমান। "প্রকৃতির মধ্যে যে উদ্দেশ্যের অনুসরণ (teleology) দেখিতে পাওয়া যায়, ইতর জন্তুর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে তাহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লক্ষিত হয়। উদ্দেশ্যের সজ্ঞান ধারণা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কর্মের সহিত সহজাত প্রবৃত্তির সাদৃশ্য সুস্পষ্ট হইলেও তাহার মধ্যে যেমন উদ্দেশ্যের সজ্ঞান ধারণা বস্তুতঃ নাই, তেমনি প্রকৃতির যাবতীয় সৃষ্টির সহিত সজ্ঞান উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টির সাদৃশ্য থাকিলেও তাহার মধ্যে ঈদৃশ উদ্দেশ্যের একান্ত অভাব। জন্তুদিগের কর্ম্মে যে অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইচ্ছা যে বুদ্ধির পূর্ব্ববর্তী, তাহা প্রমাণিত হয়। যে হস্তী সমগ্র ইয়োরোপ ভ্রমণ করিয়া শত শত সেতু পার হইয়া গিয়াছিল, সে অতিরিক্ত ভারবহনে অশক্ত এক সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়া আর অগ্রসর হইল না; বহু অশ্ব ও মনুষ্য সেতু পার হইয়া গেল, কিন্তু হস্তী তাহার উপর পদক্ষেপ করিল না। কুক্কুর শাবক টেবিল হইতে লম্ফ দিয়া কক্ষতলে পড়িতে ভয় পায়; এখানে সে যে যুক্তিদ্বারা পতনের পরিণাম বুঝিতে পারে তাহা নহে, কেননা এরূপ পতনের অভিজ্ঞতা তাহার নাই। তাহার সহজাত বৃত্তি তাহাকে বাধা দেয়।...ঈদৃশ সকল কার্য্যেই ইচ্ছার প্রকাশ, বুদ্ধির নহে।"

"এই ইচ্ছা বাঁচিবার ইচ্ছা (Will to live), পরিপূর্ণ জীবনের ইচ্ছা। জীবন সকল প্রাণীর অতি প্রিয়। কত ধৈর্য্যের সহিত ইহা সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।...শস্যবীজের মধ্যে প্রাণশক্তি তিন সহস্র বৎসর সুপ্ত থাকিয়া অঙ্কুরিত হইয়াছে, দেখা গিয়াছে। চূণের

পাথরের মধ্যে জীবন্ত ভেকের আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে জীবের প্রাণও সহস্র সহস্র বৎসর যাবত সুপ্তভাবে থাকিতে পারে। ইহাই বাঁচিবার ইচ্ছা—চিরন্তন শত্রু মৃত্যুকে জয় করিবার ইচ্ছা।"

"মৃত্যু পরাজিত হইয়াছে আত্মাহুতি দ্বারা। প্রত্যেক জীব দৈহিক পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে আত্মবিসর্জ্জন করে। প্রজনন ক্রিয়া সমাপ্ত হইবা মাত্র স্ত্রী-মাকড়সা পুরুষকে গ্রাস করিয়া ফেলে। যে সন্তান কখনও দেখিতে পাইবে না, তাহার জন্য মক্ষিকা খাদ্য সঞ্চয় করে। মানুষ সন্তানদিগের লালন-পালন করে ও শিক্ষার জন্য আপনার সমগ্র শক্তি ব্যয় করে। বংশরক্ষা প্রত্যেক জীবের সহজাত প্রবৃত্তি। এই উপায়েই ইচ্ছা মৃত্যুঞ্জয় হয়। মৃত্যুর পরাভব সুনিশ্চিত করিবার জন্য বংশরক্ষার ইচ্ছা জ্ঞান ও পরিচিন্তনের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে স্থাপিত হইয়াছে। বংশরক্ষার ইচ্ছা অন্ধভাবে কাজ করে।" "জননেন্দ্রিয় ইচ্ছার অধিশ্রয় (focus), ইহা মস্তিষ্কের বিপরীত দিকে অবস্থিত। * * * জননেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণের অবিচ্ছেদ রক্ষিত হয়—অন্তহীন জীবনধারা সুনিশ্চিত হয়। এই জন্যই গ্রীকগণ phallus রূপে ইহার উপাসনা করিত এবং হিন্দুগণ লিঙ্গরূপে উপাসনা করে। * * * * স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা গুপ্ত রাখিবার সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এই সম্বন্ধ যুদ্ধের কারণ, শান্তির লক্ষ্য, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিত্তি, পরিহাসের বিষয়, হাস্য রসের অফুরন্ত উৎস, সকল মোহের জনক এবং যাবতীয় গূঢ় ইঙ্গিতের অর্থ।"

প্রজনন প্রবৃত্তির প্রাবল্য দ্বারা ইচ্ছার দুর্জ্জয় শক্তি প্রমাণিত হয়। ব্যক্তির চিরকাল বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া পুরুষ স্ত্রীর গর্ভে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। (এই জন্য পত্নীর নাম "জায়া") পুনর্জন্মের জন্য প্রজনন-প্রবৃত্তির প্রয়োজন। নূতন দেহ ধারণ করিয়া 'ইচ্ছা' সর্ব্ব-সংহারক মৃত্যুকে প্রতারিত করে। যৌন-আকর্ষণের প্রকৃতির আলোচনা করিলে ইচ্ছা-কর্ত্তৃক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবলম্বিত কৌশল ধরা পড়ে। পিতা-মাতার দৈহিক দুর্বলতা সন্তানে সংক্রামিত হয়। এই দুর্বলতা পরিহার করিবার জন্য উভয়ের মধ্যে এক জনের যে গুণের অভাব আছে, অন্যের মধ্যে তাহার সদ্‌ভাব দ্বারা সে আকৃষ্ট হয়। যে পুরুষের শরীর দুর্ব্বল, সে বলবতী স্ত্রীর সন্ধান করে। প্রত্যেকের যে যে গুণের অভাব আছে, তাহাই তাহার নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সন্তান উৎপাদনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বয়স যে পুরুষ অথবা স্ত্রীর যত বেশী অতিক্রান্ত হয়, ততই অপর পক্ষের নিকট তাহার আকর্ষণের ন্যূনতা সাধিত হয়। সৌন্দর্য্যবিহীন যৌবনের আকর্ষণ সর্বদাই থাকে, কিন্তু গতযৌবন সৌন্দর্য্যের কোনও যৌন আকর্ষণই থাকে না। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রধান লক্ষ্য যে উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদন, তাহার প্রমাণ এই যে এই মিলনে পরস্পরের প্রতি প্রেম অপেক্ষা পরস্পরকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই বলবত্তর।"

প্রেমের জন্য যে সকল বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহারা প্রায়ই সুখকর হয় না। ইহার কারণ স্বামী-স্ত্রীর সুখ এই প্রকার বিবাহের লক্ষ্য নয়, মানব জাতির রক্ষাই ইহার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যেই প্রেমের উৎপত্তি। পিতা মাতার সুখের দিকে প্রকৃতির লক্ষ্য নাই, সন্তানের উৎপত্তিই তাহার লক্ষ্য। "সুবিধাজনক বিবাহ"—পিতা মাতা কর্ত্তৃক নির্বাচিত বর-কন্যার বিবাহ—অনেক সময় প্রেম-পূর্ব্বক বিবাহ হইতে সুখকর হয়। প্রেম-মূলক বিবাহ প্রকৃতির অভিপ্রায়ের অনুযায়ী বলিয়া জাতির পক্ষে অধিকতর মঙ্গলকর। কিন্তু প্রেম মায়া-মরীচিকা মাত্র এবং বিবাহে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রেমদ্বারা প্রকৃতি জীবকে প্রতারিত করে। প্রেমদ্বারা নর-নারীকে ভুলাইয়া প্রকৃতি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।

ব্যক্তির জীবনীশক্তি তাহার দেহস্থ প্রজনন-কোষের (Reproduction cells) অবস্থার উপর নির্ভর করে। ইহা হইতেও প্রমাণিত হয় যে প্রজনন-দ্বারা জাতির সাতত্য রক্ষা ভিন্ন প্রকৃতি ব্যক্তির নিকট অন্য কিছুই আশা করে না। প্রজনন-প্রবৃত্তিই জাতির জীবনী শক্তি। ব্যক্তি জাতি-বৃক্ষের পত্রস্বরূপ। বৃক্ষ হইতে যেমন পত্রের পুষ্টি হয়, আবার পত্রও বৃক্ষের পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে, তেমনি জাতিকর্ত্তৃক ব্যক্তি রক্ষিত হয় এবং ব্যক্তিকর্ত্তৃক জাতি রক্ষিত হয়। এই জন্যই জাতির জীবনী শক্তিরূপ প্রজনন প্রবৃত্তি ব্যক্তির মধ্যে এত প্রবল। কাহারও অঙ্গ-বিশেষ বিদূরিত করিয়া তাহার প্রজনন-শক্তির ধ্বংস সাধন করিলে তাহাকে জাতির জীবনীশক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ফলে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির খর্ব্বতা সাধিত হয়।...জন্ম ও মৃত্যু জাতি-দেহে নাড়ীর স্পন্দন।...ব্যক্তির পক্ষে নিদ্রা যাহা, জাতির পক্ষে মৃত্যুও তাহাই। সমগ্র সংসার এক অবিভাজ্য ইচ্ছার ব্যক্তরূপ—এই ইচ্ছাই "মহা প্রত্যয়" (The Idea)। বিভিন্ন সুরের সমবায়োদ্‌ভূত সংগতির সহিত প্রত্যেক সুরের যে সম্বন্ধ, এই মহা প্রত্যয়ের সঙ্গে অন্যান্য প্রত্যয়ের সেই সম্বন্ধ। গেটে বলিয়াছেন "আমাদের আত্মা (spirit) অবিনশ্বর-স্বরূপ বস্তু বিশেষ; অনন্তকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত ইহা ক্রিয়াশীল। সূর্য্য যেমন আমাদের দৃষ্টিতে অস্ত যায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কখনও অস্ত যায় না, অবিচ্ছেদে দীপ্তি পায়, আমাদের আত্মাও তেমনি।"

"দেশ ও কালে ইচ্ছারূপ এক সত্তা বিভিন্নরূপে প্রতীত হয়"। দেশ ও কালই বিশেষের তত্ত্ব (Principle of individuation) তাহারাই জীবনকে (এক অনবচ্ছিন্ন জীবন) বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন কালে বিভক্ত বিবিধ সংঘাত (organism) রূপে প্রকাশিত করে। দেশ ও কাল মায়া-যবনিকা—বস্তুর একত্ব ইহাদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।...ব্যক্তি যে অবভাস মাত্র, সৎ বস্তু নহে, এই জ্ঞান এবং জড়ের বিরামহীন পরিবর্ত্তনের মধ্যে অবিচল স্থায়ীরূপ দর্শনই দর্শন শাস্ত্রের সার।"

সোপেনহরের মতে সার্বিক ইচ্ছা স্বাধীন। কেন না তাহার পার্শ্বে অন্য কোনও ইচ্ছা নাই। সার্বিক ইচ্ছার অবচ্ছেদক কিছুই নাই। কিন্তু ব্যক্তির ইচ্ছা সার্বিক ইচ্ছা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, সুতরাং "আমি স্বাধীন" এই বিশ্বাস থাকিলেও ব্যক্তির ইচ্ছা স্বাধীন নহে। (ক্রমশঃ)

পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী হিন্দু—

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নর-নারীর বাসজন্য আগমনের বিরাম নাই। উদ্বাস্তু-সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রীর সহিত যে চুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে ঈপ্সিত ফললাভ হয় নাই। হইবার কথাও নহে। কারণ, চুক্তিতে একাধিক পক্ষ থাকে এবং সকলেরই চুক্তি সার্থক করিতে আগ্রহ না থাকিলে চুক্তি সফল হয় না। আলোচ্য চুক্তির প্রথম ক্রটি, ইহাতে স্বীকার করা হইয়াছে, পাকিস্তানের মত ভারতও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে দোষী। অথচ অত্যাচার পাকিস্তানেই হইয়াছে এবং ভারতে যে সামান্য অনাচারের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাকিস্তানের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

চুক্তি যে সফল হয় নাই, তাহার প্রমাণ—

(১) চুক্তি সফল করিবার জন্য ভারত সরকার একজন অতিরিক্ত মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাসকে সেই পদ প্রথমতঃ ৬ মাসের জন্য প্রদান করিয়া পরে কার্য্যকাল বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চারুবাবু চুক্তি সফল করিবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। তিনিও বরিশাল হইতে আসিয়া ২রা সেপ্টেম্বর বলিয়াছিলেন—

বরিশালে যে সকল ভয়াবহ অত্যাচার (হিন্দুর প্রতি) হইয়াছে, সে সকলের স্মৃতি হিন্দুদিগের মন হইতে সহজে অপনীত হইতে পারে না। এখনও তথায় উচ্ছৃঙ্খলতার অভাব নাই এবং সে সকল দমিত করিবার উপযুক্ত উপায় (পাকিস্তান সরকার কর্তৃক) অবলম্বিত হয় নাই। হিন্দু-দিগের যে সকল আগ্নেয়াস্ত্র সরকার কাড়িয়া লইয়াছেন, সে সকল প্রত্যর্পিত হয় নাই ; সুতরাং হিন্দুরা আপনাদিগকে অসহায় মনে করিতেছেন। হিন্দুদিগের মনে এখনও আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

(২) ২৫শে সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদে গভর্ণর ডক্টর কাটজু বলিয়াছিলেন—

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের মনে আস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা দুষ্কর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বরাষ্ট্রে মুসলমানদিগের মনে আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে-ছেন। কিন্তু যে (অন্ততঃ ৪০ লক্ষ) হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা আর পূর্ব্ববাসে ফিরিয়া যাইতে চাহেন না।

(৩) ৩০শে অক্টোবর কলিকাতায় রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছিলেন :—

চুক্তির পরে অবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন (উন্নতি নহে) লক্ষ্য করা যাইতেছে। * * * কিন্তু এমন কথা বলিবার উপায় নাই যে, সমস্যার সমাধান হইয়াছে এবং সে বিষয়ে আর মনোযোগদানের প্রয়োজন নাই। এখনও করণীয় অনেক আছে। তবে তিনি আশা করেন, অবস্থা এমন হইবে যে, যে সকল আগন্তুক ফিরিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে চাহেন, তাঁহারা যাইতে পারিবেন এবং যাঁহারা এখনও পূর্ব্ববঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তথায় অবস্থান সম্ভব হইবে।

(৪) গত ৯ই নভেম্বর শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ মন্ত্রী ডক্টর মালিকের সহিত একযোগে আসাম—শিলং সহরে ৮টি আশ্রয়প্রার্থী শিবিরের মধ্যে ২টি

পরিদর্শন করিয়াছিলেন। যেটিতে শ্রীহট্ট হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীরা ছিলেন সেটিতে আশ্রয়প্রাপ্তগণ শ্রীহট্টে ফিরিয়া গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তথায় থাকিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের ফিরিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিয়াছিলেন—

তাঁহারা যাইয়া স্ব স্ব বাসগৃহে বাস করিতে পারেন নাই; মুসলমানগণ ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিল—বলিয়াছিল, তাঁহারা যদি মুসলমান হ'ন, তবেই তথায় থাকিতে পারিবেন—নহিলে নহে। তাঁহাদিগের সম্পত্তি হয় লুণ্ঠিত, নহে ত বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনারের নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন—ফল পা'ন নাই।

ঐ আশ্রয়প্রার্থীদিগের মধ্যে কয়জন স্ত্রীলোক শ্রীহট্টে তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা বিবৃত করিয়া বলিয়াছিলেন, যত দিন তাঁহারা শ্রীহট্টে শান্তিতে ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাস করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহারা তথায় যাইতে চাহেন না।

এই অবস্থায় ১৪ই নভেম্বর পার্লামেন্টের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে বলিয়াছেন :—

১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিলের চুক্তির ফলে যে অবস্থার ক্রমোন্নতি হইতেছে এবং লোক তাহাদিগের পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে, তাহাতে আমি প্রীত হইয়াছি—

তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পশ্চিম পঞ্জাব হইতে আগত হিন্দুরা যে তথায় ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণর বলিয়াছেন, তাঁহারা পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইতে চাহেন না।

পার্লামেন্টে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, যদিও এখন করিবার অনেক অবশিষ্ট আছে, তথাপি চুক্তি কার্য্যকরী করা সম্পর্কে অনেক কাজ হইয়াছে।

কিন্তু সরকারী হিসাবে আগমন-নির্গমনের যে অঙ্ক দেখা যায়, তাহাতে উল্লসিত হইবার কোন কারণ বুঝা যায় না। ৯ই এপ্রিল হইতে ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত ১৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩ শত ১৮ জন হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে গিয়াছেন; আর ঐ সময়ের মধ্যে ১২ লক্ষ ২৩ হাজার ৭ শত ৯৪ জন হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছেন। সুতরাং এই কয় মাসে (চুক্তির পরে) পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী হিন্দুর সংখ্যা—পূর্ব্ববঙ্গগামীদিগের তুলনায় প্রায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজার অধিক। ইহাতেই বুঝা যায়, হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গত্যাগ করিয়া আসিতেছেন—তথায় তাঁহারা থাকিতে চাহেন না। আর—এই সময়ে ৭ লক্ষ ৫ হাজার এক শত ২০ জন মুসলমান পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে গিয়াছেন এবং ৭ লক্ষ এক হাজার এক শত ৪০ জন মুসলমান পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছেন। যত মুসলমান গিয়াছেন তদপেক্ষা ৪ হাজার অধিক মুসলমান আসিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে হিন্দুর ও মুসলমানের আগমনই অধিক হইয়াছে। ইহার অর্থ—মুসলমানের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে বাস যত সুবিধাজনক, হিন্দুর পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে বাস সেরূপ নহে। এই সঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদিগের সরকারী চাকরীপ্রাপ্তিতে কোন বাধা নাই—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের পক্ষে সরকারী চাকরীর দ্বার অর্গলবদ্ধ—ব্যবসা-ব্যাপারেও তাহাই।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করিয়াছেন—

সরকারের বা প্রধান মন্ত্রীর যে অবস্থা উপলব্ধি করিবার মত বুদ্ধি নাই, এমন কথা বলা যায় না। প্রকৃত অবস্থার সম্মুখান হইবার সাহস তাঁহাদিগের নাই।

শ্রীজওহরলাল নেহরু চুক্তির সাফল্যের এত অধিক আশা করিয়াছিলেন এবং এমন ভাবে সে আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অন্য লোক যে স্থানে আলোক দেখিতে পায় না, তিনি যদি সে স্থানেও আলোক দেখেন, তবে তাহা কেবল "আশার ছলনে ভুলি।" তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, হয়ত ভারতে সরকার আশ্রয়প্রার্থীদিগের বাসের কোনরূপ সুব্যবস্থা করিতে না পারায় বহু আশ্রয়প্রার্থী বাধ্য হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাহার পরেই বলিয়াছেন--এত লোক যে ফিরিয়া যাইতেছেন, তাহা বিস্ময়ের বিষয়! তাঁহার উক্তির যুক্তি যে পরস্পর-বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতে কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকার যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, এই উক্তি সরকারের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে।

জওহরলাল প্রথমাবধিই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণকে ভারত রাষ্ট্রে স্থান দিতে অসম্মত ছিলেন। তিনি স্থানাভাবের যুক্তি দেখাইয়াছিলেন এবং সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল যখন

বলিয়াছিলেন, পাকিস্তান যদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগের তথায় সসম্মানে বাসের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তবে তাঁহাদিগের জন্য ভারতকে পাকিস্তানের নিকট আবশ্যক জমী দাবী করিতে হইবে, তখন তিনিই বলিয়াছিলেন—ঐ কথায় ভয় দেখান হয় নাই। প্রধান-মন্ত্রী হইয়া জওহরলাল যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি আশ্রয়-প্রার্থীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে কলিকাতায় যে সকল শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল, সে সকলের স্মৃতি সহজে লোক ভুলিতে পারিবে না। তাহার পরে শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে—অব্যবস্থাহেতু—আশ্রয়প্রার্থীদিগের যে দুর্দ্দশা লক্ষিত হইয়াছিল, পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর বলিয়াছেন, তাহা তিনি কখন ভুলিতে পারিবেন না। তিনিই বলিয়াছেন, তখনও ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীদিগের ব্যাপার পশ্চিম-বঙ্গের দায়িত্ব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চিম পঞ্জাব হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগের সম্বন্ধে ভারত সরকার সেরূপ মত পোষণ বা প্রকাশ করেন নাই। এই ব্যবস্থার বৈষম্য লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পুনর্ব্বসতি—

পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দুদিগের পুনর্ব্বসতি-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার—ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া—কতকগুলি পরিবার আন্দামানে, বিহারে, উড়িষ্যায় ও আসামে পাঠাইয়াছেন।

গত ১৭ই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, তিনি মহীশূরে যাইয়া তথায় ২ হাজার আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের বাসোপযোগী ভূমি আবিষ্কার করিয়া আসিয়াছেন। মহাশূর সরকারও সেই সকল স্থানে বাঙ্গালী আশ্রয়প্রার্থীদিগের পুনর্ব্বসতিতে সম্মতি দিয়াছেন। মহাশূরের যে অংশ আর্দ্র সেই অংশই ব্যবহৃত হইবে। এ সম্বন্ধে স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে আগ্রহ হয়, এই জমী যে "পতিত" আছে, তাহার কারণ—লোকাভাব, না স্থানের অস্বাস্থ্যকরতা? প্রধান-সচিব অভিজ্ঞ চিকিৎসক। তিনি নিশ্চয়ই ২ হাজার বাঙ্গালী পরিবারকে অস্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইবেন না।

ত ৩০শে অক্টোবর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ যখন পশ্চিমবঙ্গে ২টি আশ্রয়প্রার্থী কেন্দ্রে নীত হইয়াছিলেন, তখন আশ্রয়প্রার্থীরা পশ্চিমবঙ্গে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু তাহাতে বলিয়াছিলেন :—

প্রায় ৪০ লক্ষ লোক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের সকলকে পশ্চিমবঙ্গে বাস করান যাইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যত জনকে পশ্চিম-বঙ্গে স্থান দান করা যায়, তত জনের সম্বন্ধে সে ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করা হইবে। যাঁহাদিগের জন্য স্থানাভাব ঘটিবে, তাঁহাদিগকে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইতে হইতে পারে।

বোধ হয়, পাছে বিহারের বঙ্গভাষাভাষী অঞ্চলের কথা উত্থাপিত হয়, সেই জন্য রাজেন্দ্রবাবু পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্ত্তী স্থানের বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই।

কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন, আগত ৪০ লক্ষ লোককে পশ্চিমবঙ্গে স্থান দান করা সম্ভব হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় মহীশূরে জমী আবিষ্কার করিয়া আসিবার পরে রাষ্ট্রপতি উদ্ধৃত উক্তি করিয়াছিলেন। তবে কিরূপে বিধানবাবু, সে সন্দেহ দূর না হইবার পূর্ব্বেই, ২ হাজার পরিবারকে সুদূর মহীশূরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন? তিনি বলিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত ৪ হাজার ৪ শত ৬টি পরিবারকে প্রধানতঃ বাঁকুড়া ও বীরভূম জিলাদ্বয়ে বাস করান হইয়াছে। কিন্তু ২৪পরগণায়, বর্দ্ধমানে, হুগলীতে ও মুর্শিদাবাদে যে বহু বাস্তু ও জমী শূন্য আছে, সে সকলের হিসাব কি লওয়া হইয়াছে? সে সকল স্থানে বহু গ্রামের উন্নতি সাধনের এই সুযোগ কেন গ্রহণ করা হইতেছে না? তাহাতে ব্যয়ও অনেক অল্প হয়; আর পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি হয়; ভারত সরকার পুনর্ব্বসতির জন্য যে অর্থ দিবেন, তাহাও পশ্চিমবঙ্গে থাকে। তাহাই কি বাঞ্ছনীয় নহে? সে অর্থের পরিমাণও অল্প নহে।

১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার পশ্চিম ও পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আগতদিগের সাহায্য ও পুনর্ব্বসতির জন্য ১০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এ বার তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতদিগের জন্য প্রথমে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন এবং তাহার পরে আবার ৮ কোটি টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই ১৩ কোটি টাকা

ব্যতীত তাঁহারা সাধারণ বাজেটে এক কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মোট অর্থের পরিমাণ—১৪ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই টাকা যদি পশ্চিমবঙ্গে ব্যয়িত হয়, তবে তাহাতে অনেক উপকার হইতে পারে।

উড়িষ্যায় ও বিহারে প্রেরিত বাঙ্গালীদিগের কতকাংশ যে—সে সকল স্থানে বাসের অসুবিধাহেতু ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে।

কোন আশ্রয়প্রার্থী বলিতেছিলেন, তাঁহারা দুই দিকেই বিপদ ভোগ করিবেন—পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাইলে ধর্ম্মত্যাগ করিতে হয়, পশ্চিমবঙ্গে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দূরে যাইলে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি বর্জ্জন করিতে হইবে—এক দিনে না হইলেও ক্রমে তাহা অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় তাঁহারা কি করিবেন?

ডক্টর রায় বলিয়াছেন—সরকারী ব্যবস্থায় কৃষকদিগকে এক হাজার ৭শত ও অকৃষকদিগকে ১৪ হাজার ৬শত ৬৫ টুকরা জমী দেওয়া হইয়াছে এবং এখনও ২ হাজার এক শত ৩ টুকরা কৃষির ও ৪২ হাজার ৯শত ৪০ টুকরা অকৃষি জমীর টুকরা রহিয়াছে, দিতে পারা যায়।

সরকারী ব্যবস্থার উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে মতভেদ দেখা যায় নাই, এমন নহে। কোন কোন স্থানে চাষের জমী বাসের জন্য গৃহীত হইয়াছে এবং জমীদার বা ফাটকাবাজ মূল্য পাইবে বটে, কিন্তু প্রকৃত কৃষক ক্ষতিপূরণ বাবদ কি পাইবে, তাহা বলা যায় না। কলিকাতার দক্ষিণে বৃহত্তর কলিকাতার সীমায় জমী সম্বন্ধে এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে এবং সরকার অবশ্যই তাহা জানেন। আবার শুনা যাইতেছে, কলিকাতার উত্তরে গৃহীত জমীর মূল্য সরকারের জমীর দামের তুলনায় অল্প হওয়ায় ব্যাপার আদালতে যাইতেছে। এইরূপে নানা জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে।

কলিকাতার নিকটে যদি চাষের জমী বাসের জন্য গৃহীত হয়, তবে যে খাদ্যোপকরণ উৎপাদনে বাধার উদ্ভব হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গে ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ৪০ লক্ষ লোকের চাষের ও বাসের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে কি না—সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সন্দেহ আছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিবের কি দৃঢ় বিশ্বাস—স্থান সঙ্কুলান হইবে না? তিনি মহীশূরে বাঙ্গালীদিগকে বাস করাইবার জন্য—অসুবিধা দূর করিতে—বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের ব্যবস্থাও করিতেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে "পতিত" বাসের ও চাষের জমী সরকার কর্ত্তৃক গ্রহণ করার কার্য্যে কি বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা লওয়া হইয়াছে? সে সহযোগিতায় অনেক ভুল হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় এবং অনেক আবশ্যক সংবাদ অনায়াসে পাওয়া যায়। সমস্যা যে স্থানে জটিল, সে স্থানে বাহিরের লোকের সাহায্য অবজ্ঞা করার কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

খাদ্য-সমস্যা—

খাদ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া ত পরের কথা, তাহা আরও জটিল ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। গত ১৪ই নভেম্বর পার্লামেণ্টের উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন—

দেশে সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে খাদ্যের অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে। পক্কপ্রায় শস্য বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে—কোন কোন স্থানে সঞ্চিত খাদ্যশস্য ভাসিয়া গিয়াছে। আবার অনেক স্থানে অনাবৃষ্টিহেতু আগামী ফশল নষ্ট হইয়াছে। বিহারে যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা লোকের স্মরণকালে আর কখন হয় নাই।

এই উক্তি ও সরকারের নীতি পার্লামেণ্টে তীব্রভাবে সমালোচিত ও নিন্দিত হইয়াছে। আচার্য্য কৃপালনী বলিয়াছিলেন—

বন্যা, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প—এই সকল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ঘটিয়াই থাকে। আমাদিগের দেশে কৃষি অনিশ্চিত বারিবর্ষণের উপর নির্ভর করে। সে সব বিবেচনা করিয়া হিসাব করা কর্ত্তব্য। যে শিকারী বায়ুর বেগ ও শিকারের পশু বা পাখীর গতি বিবেচনা না করিয়া গুলী করে, সে ব্যর্থশ্রমই হয়। অথচ সব বিবেচনা না করিয়াই মন্ত্রীরা বিবৃতি প্রদান করেন। যে সরকার কোন স্থানে ভয়াবহ অন্নকষ্ট ঘোষণা করিবার পক্ষকাল পূর্ব্বেও সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, সংবাদপত্রে প্রচারিত সংবাদ অতিরঞ্জিত বলিয়া উপেক্ষা করেন, অনাহারে মৃত্যু অন্য কারণে ঘটিয়াছে বলিতে দ্বিধানুভব করেন না এবং

প্রাদেশিক মন্ত্রী প্রতীকার না হইলে পদত্যাগ করিবেন—না বলা পর্য্যন্ত সচেতন হন না, সে সরকার সম্বন্ধে লোক কি মনে করিতে পারে?

পার্লামেণ্টে বক্তার পর বক্তা খাদ্য-নীতির জন্য সরকারকে যেমন নিন্দা করিয়াছেন, তেমনই নিখিল-ভারত কংগ্রেস সমিতির পত্র 'ইকনমিক রিভিউ' লিখিয়াছেন—

প্রকৃতিকে দোষ দিলে চলিবে না। খাদ্যাভাবের প্রধান কারণ—আমলাতান্ত্রিক সরকারের ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক অর্থনীতিক অবস্থায়—পুলিস-শাসিত দেশের উপযোগী। সহস্র সহস্র টাকা বেতনের কর্ম্মচারীরা দরিদ্র, নিরক্ষর, ক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য কৃষকের নিকটেও গমন করেন না। অযোগ্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা-হেতুই খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির অনেক পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। পুরাতন কৃষি-ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির অন্তরায়।

সমালোচকগণের যুক্তি খণ্ডন করা অসম্ভব দেখিয়া খাদ্য-মন্ত্রী মিষ্টার মুন্সী বলিয়াছিলেন—

যে কংগ্রেসপন্থীরা বর্ত্তমান সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সরকারের সমালোচনা করা ও লোকের মনে ব্যর্থতার অবসাদ সৃষ্টি করা অকর্ত্তব্য।

ইহা যুক্তি নহে—কৃতকর্ম্মের কৈফিয়ৎও নহে; সুতরাং সমর্থনযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

মন্ত্রীরা কিরূপ অসহিষ্ণু তাহার প্রমাণ—কৃষি-মন্ত্রীর বিভাগের দোষে দেশের কোটি টাকারও অধিক ক্ষতি হইয়াছে, শ্রীত্যাগীর এই অভিযোগে প্রধান-মন্ত্রী যে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে সম্মতি দিয়াছেন, তাহাতে খাদ্য-মন্ত্রী মর্ম্মাহত হইয়া প্রধান-মন্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছেন। অর্থাৎ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানেও তাঁহার আপত্তি আছে! তবে তিনি আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন—প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্য তাঁহার প্রতি অনাস্থা-জ্ঞাপক মনে করিয়া পদত্যাগ করেন নাই।

রাষ্ট্রপতি স্বীকার করিয়াছেন, খাদ্যোপকরণের অবস্থা ভীতিপ্রদ।

শ্রীমতী রেণুকা রায় নিয়ন্ত্রণের সমর্থন করিয়াও বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—

খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের গঠন-মূলক কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই এবং যে ভাবে কতকগুলি সেচের ও বিভাগীয় পরিকল্পনায় অর্থের অপব্যয় করা হইয়াছে, তাহা দেশের অবস্থা বিবেচনা করিলে নিন্দনীয় ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

বলা হয়, গত বৎসর পার্লামেণ্টে ঘোষণা করা হয়, দুই মাসের মধ্যেই চিনির মূল্য হ্রাস হইবে, আর দেড় বৎসর পরে বলা হইতেছে, চিনি সরবরাহের অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে পারে। চোরাবাজার চলিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায়ও যে রাষ্ট্রপতি ও খাদ্য-মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন—

অবস্থা যত শোচনীয়ই কেন হউক না, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের মধ্যে ভারতকে খাদ্যবিষয়ে স্বাবলম্বী করা হইবে; অর্থাৎ তাহার পরে আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করা হইবে না।

তাহাতে অনেকেই আপত্তি করিয়াছেন। এইরূপ অসতর্ক ও ভিত্তিহীন ঘোষণার কুফলও দেখা গিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছিলেন, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করা হইবে না। সে উক্তির ব্যর্থতায় যে সরকারের সম্ভ্রমহানি হইয়াছে এবং লোকের মনে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে, কেবল তাহাই নহে; ঐ উক্তি হেতু, ভারত আর চাউল লইবে না বুঝিয়া—ব্রহ্ম-সরকার অতিরিক্ত চাউল অন্য দেশে বিক্রয় করিয়া ফেলায় এ বার প্রয়োজনের সময় ভারত সরকার আর ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী করিতে পারেন নাই—তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে একাধিক সদস্য বলিয়াছেন, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের পরে আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করা হইবে না, একথা বলা অসঙ্গত হইয়াছে। বিশেষতঃ অবস্থা যেরূপ, তাহাতে হয়ত আগামী দশ বৎসর ভারতকে বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিতে হইবে; কারণ, এ দেশে সরকার যে দুই চারি বৎসরের মধ্যে খাদ্যোপকরণের উৎপাদন-বৃদ্ধি করিয়া স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন, এমন সম্ভাবনা নাই। অসতর্ক উক্তি যে অনেক সময় অবিমৃশ্যকারিতার পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই হয় না, তাহা বলা বাহুল্য।

খাদ্যোপকরণ উৎপাদনে কৃষি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল

বৈজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন—অন্যান্য দেশ, বিশেষ রুশিয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছে—এ দেশে সরকার সে সকল প্রবর্ত্তিত করেন নাই। সে সকলের প্রবর্ত্তন করিলে খাদ্যোপকরণের উৎপাদন দ্বিগুণ করাও সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে সেচের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে সরকারের শস্য-সংগ্রহ নীতি ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। দুর্ভিক্ষ বা ভূমিকম্পাদির মত আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে বা যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবসার সাধারণ-ব্যবস্থার স্থানে সরকারের খাদ্যোপকরণ-সংগ্রহ ও বণ্টননীতি গ্রহণ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ সাময়িকভাবে প্রয়োজন ও ফলপ্রদ হইতে পারে। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের মত বিশাল রাষ্ট্রে তাহা কার্যকরী করা দুঃসাধ্য। রুশিয়ার মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির ভার রাষ্ট্রের উপর থাকায় তাহা আংশিকরূপে সফল হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্যত্র হয় না। এ দেশে নিয়ন্ত্রণের ফলে বহু লোকের স্বার্থত্যাগে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক উপকৃত হয়। সেদিন পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর বলিয়াছেন, সহরে লোক চাকরীতে বা শ্রমিকের কার্য্যাদিতে অর্থোপার্জ্জন করে—অথচ সহরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থায় লোক সতের টাকায় চাউল পায়—আর গ্রামে যাহারা তাহা উৎপন্ন করে তথায় চাউলের মূল্য ৪০.৪৫ টাকা—এ অবস্থা অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক অবস্থা স্থায়ী হইলে জনগণের মনে অসন্তোষের উদ্ভব ও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব তাহার অপসারণ করা কর্ত্তব্য।

পার্লামেণ্টে শ্রীমতী রেণুকা রায় বলিয়াছেন, নিয়ন্ত্রণ-নীতি বর্জ্জন করিলে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় যেমন ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, সেইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সরকারের চীফ-সেক্রেটারীর পত্নী। তাঁহার পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা ও সরকারী ব্যবস্থা জানিবার সুযোগ আছে। তিনি কি জানেন না যে, জাপানী যুদ্ধ, নৌকা অপসরণ, গভর্ণরের সমর্থিত দুর্নীতি এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রী সরকারের দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগকে খাদ্যোপকরণ বা খাদ্য যোগাইয়াও অর্থলাভের লোভ—এই সকলের সমন্বয়ে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল? আশা করি, তিনি স্বীকার করিবেন, সে অবস্থার পুনরুদ্ভব যেমন অবাঞ্ছনীয় তেমনই অসম্ভব। যদি তাহা হয়, তবে দীর্ঘ তিন বৎসরে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে সরকারের অক্ষমতা অযোগ্যতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিলে, তাহা অসঙ্গত হয় না।

সচিবদিগকে সদুপদেশ—

ভারত-রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা সম্বন্ধে সচিবদিগকে সতর্কতাবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া এক পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে, সরকারের—প্রাদেশিক সরকারের সচিবরা যেন তাঁহাদিগের সরকারের সাধারণ নীতি সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা বর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব বিভাগের ব্যাপারেরই উল্লেখ করেন এবং তাহাতেও বর্তমানের বিষয় আলোচনা-কালে ভবিষ্যতে কি করা হইবে তাহার আলোচনায় বিরত থাকেন।

প্রধান-মন্ত্রী বলিয়াছেন—

(১) দেখা গিয়াছে, কোন কোন স্থানে সচিবগণ যে সকল প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন, সে সকল পালিত হয় নাই।

(২) ইংলণ্ডে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিপালন করিতে না পারায় সচিবদিগকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে।

কথায় বলে, মুখের কথা আর হাতের তীর একবার বাহির হইলে—আর ফিরান যায় না। কিন্তু সময় সময় সচিবরা লোককে বিভ্রান্ত করিবার জন্য যে সকল প্রতিশ্রুতি দেন, সে সকল পালিত হয় না। জওহরলাল পশ্চিমবঙ্গে সচিবসঙ্ঘের পরিবর্ত্তন ও অচিরে নির্ব্বাচন, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে খাদ্যোপকরণ আমদানী বন্ধ প্রভৃতি ব্যাপারে যে সকল অসতর্ক প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, সে সকল পালন করা সম্ভব হয় নাই।

ইংলণ্ডে চার্চ্চিল একবার নির্লজ্জভাবে বলিয়াছিলেন, ভোজ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অনেক সময় অপ্রিয় সত্য বর্জ্জন করিয়া বা অভিপ্রায় গোপন করিয়া লোককে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে হয়। কিন্তু সেই চার্চ্চিল আজ ক্ষমতাভ্রষ্ট হইয়াছেন।

রাজনীতিকের পক্ষে অসতর্কতা বর্জ্জনীয়—অসত্য কথন জয়লাভ করে না। সেই জন্যই বলা হয়, সকল লোককে

কিছুদিন এবং কিছু লোককে চিরদিন ভুলাইয়া রাখা যায়; কিন্তু সকল লোককে চিরদিন ভুলাইয়া প্রতারিত করা যায় না। জওহরলাল নেহরু—অভিজ্ঞতার ফলে—সেই কথাই বলিয়াছেন।

নির্ব্বাচন ও ভোট—

কলিকাতায় আসিয়া রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি-মাত্র যুক্তি উপস্থাপিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখের পরে আগত হিন্দুদিগকে নির্ব্বাচনে ভোট ব্যবহারের অধিকারে বঞ্চিত করিবেন বলিয়াছিলেন—

নির্ব্বাচনের আর মাত্র কয়মাস অবশিষ্ট আছে; ভোটার-তালিকা প্রস্তুত; তাহার পরিবর্ত্তন করিলে নির্ব্বাচনে বিলম্ব হইবে; সে বিলম্ব রাষ্ট্রের স্বার্থের অনুকূল নহে।

কিন্তু পক্ষকাল মধ্যেই রাষ্ট্রের পক্ষে অনিষ্টকর ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে—নির্ব্বাচনের সময় ছয় মাস পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আগতদিগকে ভোট ব্যবহারের অধিকার দানের যে দাবী করা হইয়াছিল, তাহা প্রত্যাখ্যান করার আর কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ৩ লক্ষ ১৯ হাজার ৩শত ২৩জন হিন্দু ভোট ব্যবহারের অধিকার লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানাইয়াছেন, জওহরলাল নেহরু সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন!

অথচ পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বলিয়াছেন, আগামী মে-জুন মাসে নির্ব্বাচন হইলে গত বৎসর জুলাই মাসের পরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিরা ভোট ব্যবহারের অধিকারে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই তিনি ঐ সময়ে নির্ব্বাচনে আপত্তি করিয়াছেন। নির্ব্বাচন পিছাইয়া গিয়াছে। এখন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পশ্চিমবঙ্গে গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আগত ব্যক্তিদিগকে ভোট ব্যবহারের অধিকার দিবার জন্য ভারত সরকারকে বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে দাবী জানাইবেন?

অবশ্য সেজন্য আইনের পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইবে। কিন্তু অন্ততঃ ৪০ লক্ষ লোককে অধিকারে বঞ্চিত করা অপেক্ষা যে আইনের পরিবর্ত্তন করা বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারে না। ভারত সরকার যদি জনগণের প্রাথমিক অধিকার অস্বীকার করেন, তবে তাহা একান্ত দুঃখের বিষয় হইবে।

রেল-দুর্ঘটনা—

গত জুন হইতে সেপ্টেম্বর এই চারি মাসে ভারতে ৬ শত ৫০টি ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়াছে! এই সকলের মধ্যে—গুরু-লঘু হিসাবে—

অত্যন্ত গুরু—১০টি
গুরু — ৪৭টি
সামান্য — ৩৭৫টি
তুচ্ছ — ২১১টি

এই সকল দুর্ঘটনায় এঞ্জিন হইতে লাইন পর্য্যন্ত হিসাব করিলে ক্ষতির পরিমাণ ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা। নিহত যাত্রীদিগের স্বজনগণকে ও আহত ব্যক্তিদিগকে ক্ষতিপূরণ বাবদে কত টাকা দিতে হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে তাহার পরিমাণও যে অল্প হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

সাধারণতঃ দুই কারণে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে—কর্ম্মচারীদিগের অসতর্কতা ও যন্ত্রাদির বিকৃতি। এই সঙ্গে আরও দুইটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে—দুষ্কৃতকারীদিগের ট্রেণ নাশ করিবার ব্যবস্থা ও রেলপথের ত্রুটি। কারণ যাহাই কেন হউক না—চারি মাসে এতগুলি দুর্ঘটনা যে ভয়াবহ ব্যাপার তাহা বলা বাহুল্য। কিছুদিন পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল, একটি ট্রেণ-দুর্ঘটনায় ধৃত এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তি এই যে, কয় জন পাকিস্তানী ভারত রাষ্ট্রে আসিয়া ট্রেণ-দুর্ঘটনা ঘটাইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে আর কোন কথার উল্লেখ কেন হয় নাই এবং সেই স্বীকারোক্তি নির্ভরযোগ্য কি না, তাহা কেন প্রকাশ করা হয় নাই, সরকার সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই।

একজন রেল এঞ্জিনিয়ার কানাডা হইতে আনীত এঞ্জিন অল্প-দূরগামী ট্রেণের উপযোগী নহে—এই রিপোর্ট দাখিল করায় কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন কি না, পার্লামেণ্টে এক জন

সদস্য এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রশ্ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল! এই নিষেধে যে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব হয়, তাহা কি সরকার বুঝিতে পারেন না? দুর্ঘটনার কতগুলি ট্রেণে কানাডা হইতে আনীত এঞ্জিন ছিল, তাহা কি জানা যাইতে পারে?

দক্ষিণ আফ্রিকা ও সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ—

ভারতীয়গণই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ত্তমান সমৃদ্ধ অবস্থার স্রষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না বটে, কিন্তু তথায় শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়দিগের প্রতি যে কুব্যবহার করিয়া আসিতেছে, তাহা ভারতের আত্ম-সম্মান-ক্ষুণ্ণকর। ভারতীয়দিগের প্রতি অবিচার ও অনাচার বৃটেনের দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার অন্যতম কারণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাকে—তাহার যুদ্ধে পরাজয়ের পরে, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিয়া ইংরেজ বলিয়াছিলেন, ভারতীয়দিগের প্রতি তাহার ব্যবহারে ইংরেজ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। অথচ যুদ্ধের পরে দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদানকালে ইংরেজ ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে কোনরূপ সর্ত্ত করেন নাই এবং সেইজন্য ভারতীয়দিগের পক্ষে ইংরেজের কার্য্যের আন্তরিকতায় সন্দেহ উদ্ভূত হইয়াছিল।

এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ (বর্ত্তমানে ভারতের ও পাকিস্তানের প্রজারা) শ্বেতাঙ্গদিগের সকল অধিকারে বঞ্চিত। ভারতীয় ও পাকিস্তানীদিগকে শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত এক পল্লীতে বাস করিবার অধিকারও প্রদান করা হয় না। ভারত সরকার বাধ্য হইয়া প্রতিশোধাত্মক বিধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা জানি, প্রথমে যে আইন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তাহা রচনা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও পাকিস্তানীদিগের অধিকার সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিতেছিল,তাহা বন্ধ হইয়াছে এবং ভারত-রাষ্ট্র যেমন সেজন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে—দক্ষিণ আফ্রিকা তেমনই ভারত-রাষ্ট্রকে দায়ী করিতেছে।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ নামক যে প্রতিষ্ঠান কাশ্মীরে ভারত ও পাকিস্তানের বিরোধের সুষ্ঠু সমাধান আজও করিতে পারেন নাই, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার আবার সেই সঙ্ঘেই বিবেচনার জন্য উত্থাপিত করা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত রাজনীতিক সমিতি প্রায় সপ্তাহকাল ভারতের অভিযোগের আলোচনা করিয়া গত ২০শে নভেম্বর বহু পরিবর্ত্তনের পরে যে প্রস্তাব বহুমতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে :—

(১) দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও পাকিস্তানীদিগের প্রতি ব্যবহারের আলোচনার জন্য ভারত, পাকিস্তান ও দক্ষিণ আফ্রিকা—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে স্থগিত "গোল টেবল বৈঠকের" অধিবেশন আরম্ভ করুন।

(২) দক্ষিণ আফ্রিকা যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য গৃহীত আইন কার্য্যকরী করিতে বিরত থাকেন। কারণ, তাহাতে মীমাংসার চেষ্টার অনিষ্ট সাধিত হইবে।

আরও স্থির হয়—

(১) যদি দেশত্রয় বৈঠক বসাইতে অসম্মত হ'ন, তবে মীমাংসার বিষয় আলোচনায় সাহায্য করিবার জন্য তিন জন সদস্য লইয়া এক সমিতি গঠিত করা হইত।

(২) সম্মিলিত জাতিসমূহের দ্বারা গৃহীত মানুষের অধিকার সম্বন্ধীয় মতের ভিত্তিতে আলোচনা করিতে হইবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—২৬টি দেশের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবের সমর্থন ও ৬টি দেশের প্রতিনিধিরা তাহার বিরোধিতা করেন এবং ২৪টি দেশের প্রতিনিধিরা কোন পক্ষে মত প্রকাশ করেন নাই। বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়ার প্রতিনিধিরা শেষোক্ত ২৪ জনের মধ্যে ছিলেন।

মূল প্রস্তাব যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়,তাহাতে প্রস্তাবকারী—বলিভিয়া, ব্রেজিল, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেন—কেহই ভোট দেন নাই।

বলা বাহুল্য, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি প্রস্তাবের প্রত্যেক অংশেই আপত্তি করিয়াছিলেন এবং ভারতের ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকার ব্যবহারে ভারত-সরকার বাধ্য হইয়া সে দেশের সহিত বাণিজ্য বন্ধ করিয়াছেন এবং তাহারই

ছল ধরিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা আলোচনা-বৈঠক বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারকে দায়ী করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণভেদের জন্য বাস-ব্যবস্থা-ভেদের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে যে পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়ের (বর্তমানে ভারতীয়ের ও পাকিস্তানীর) সংখ্যা অল্প নহে। তাহাদিগকে যদি মানুষের অবশ্যপ্রাপ্য প্রাথমিক অধিকারে বঞ্চিত করা হয়, তবে তাহার বিরোধিতা না করিলে ভারত ও পাকিস্তান ভারতীয় ও পাকিস্তানীদিগের সম্বন্ধে কর্তব্যভ্রষ্ট হইবেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবহারে বৃটেন ও আমেরিকা কি করেন, তাহা দেখিবার বিষয়। আমেরিকাতেও শ্বেতাঙ্গগণ কাফ্রীদিগকে আপত্তিকর ব্যবহারে লাঞ্ছিত করেন। রুশ-লেখক মেকিনস্কী বলিয়াছেন—আমেরিকার দক্ষিণাংশের রাষ্ট্রগুলিতে কাফ্রী বালক-বালিকারা শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত এক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারে না এবং দক্ষিণাংশের রাষ্ট্রগুলিতে সেরূপ কোন নিয়ম না থাকিলেও বর্ণবিভেদের প্রাবল্যহেতু কাফ্রীরা শ্বেতাঙ্গদিগের সহিত এক বিদ্যালয়ে যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষেও ইংরেজের শাসনকালে কতকগুলি ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গগণ ভারতীয়দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই মনোভাবই ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে য়ুরোপীয়দিগকে প্ররোচিত করিয়াছিল। তাই হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"নেভার সে অপমান
হতমান বিবিজান
নেটিবে পাবে সন্ধান—আমাদের জানানা!
বিবিজান দেহে প্রাণ—কখন তা' হ'বে না।"

সে দর্প-দম্ভের পরিণতি কি হইয়াছে?

ভারত-সরকার ও পাকিস্তান-সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করেন এবং একযোগে কোন ব্যবস্থাবলম্বন করিবেন কি না, তাহা জানিবার জন্য—অন্ততঃ ভারতের জনগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে।

কোরিয়া—

কোরিয়ার দুই অংশে যুদ্ধ যদি বা গৃহযুদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইত, আমেরিকা সে উপায় রাখে নাই; কারণ, যুদ্ধ আরম্ভ হইতে না হইতেই আমেরিকা এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহা এমন জটিল করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বলিয়া মনে করিলে তাহা অসঙ্গত না-ও হইতে পারে। আমেরিকার "নব-অভ্যুদয়" লক্ষ্য করিয়া হেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, সে—

"পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়;
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার—ভূমণ্ডল টলে
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।"

দীর্ঘকালে—বিশেষ দুইটি মহাযুদ্ধে জয়ের পরে, তাহার সেই ভাব যে পৃথিবীতে প্রাধান্যের স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে এবং তাহার ঐশ্বর্য্য তাহাকে সে স্বপ্ন সফল করিতে প্ররোচিত করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লিওনার্ড ম্যাটার্স লিখিয়াছেন, যদিও মাসাধিক কাল পূর্ব্বে কোরিয়ায় সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বাহিনীর সুস্পষ্ট বিজয় বিঘোষিত হইয়াছে, তথাপি আজও যুদ্ধ শেষ হয় নাই এবং শেষ হইবার কোন চিহ্নও লক্ষিত হইতেছে না। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান বলিয়াছেন বটে, সম্মিলিত জাতিবাহিনীর মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করিবার অভিপ্রায় নাই, কিন্তু সেই বাহিনী ৩৮ অক্ষরেখা অতিক্রম করিবার পরে চীন আর সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছে না। যে জওহরলাল নেহরু অ্যাংলো-আমেরিকান পক্ষের সমর্থক, তিনিও ঐ অতিক্রমে প্রতিশ্রুতিভঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই অবস্থায় উত্তর কোরিয়ার সরকার যদি সীমান্ত হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া পরে সমগ্র দেশ আক্রমণের চেষ্টা করে, তবে কত দিনে যুদ্ধের অবসান হইতে পারে? অথচ কোরিয়ার যুদ্ধ অচিরে শেষ না হইলে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের বহ্নি-ব্যাপ্তির সম্ভাবনা প্রবল বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রকৃত কথা এই যে, পৃথিবী আজ সন্দেহের ও স্বার্থের জন্য হিংসায় উন্মত্ত এবং তাহার সেই মনোভাব কেবল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত প্রকাশের সুযোগ অপেক্ষা করিতেছে। এখন সন্দেহের প্রধান কারণ, কম্যুনিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ—দুই মতে বিরোধ। বলা বাহুল্য,

ধনিকবাদ সাম্রাজ্যবাদে মিশিয়া বিলীন হইয়াছে এবং সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন যেমন, ধনিকবাদী আমেরিকা তেমনই মুখে গণতন্ত্রানুরাগী হইলেও কার্য্যতঃ সে অনুরাগের পরিচয় দিতে পারিতেছে না। চীন কম্যুনিষ্ট-সরকার প্রতিষ্ঠা করায় সাম্রাজ্যবাদীদিগের মনে সন্দেহ আতঙ্কে পরিণত হওয়াও অসম্ভব বা বিস্ময়কর নহে। কোরিয়া চীনের প্রতিবেশী-দেশ হইলেও এবং কোরিয়ার একাংশ কম্যুনিষ্টপ্রধান হইলেও চীন এখনও প্রত্যক্ষভাবে এক পক্ষে যোগদান করে নাই এবং চীনের প্রতিনিধিরা নির্ব্বিঘ্নতা-পরিষদে প্রাচ্যের অবস্থা আলোচনার জন্যও প্রেরিত হইয়াছেন। তথায় তাঁহারা কিরূপ ব্যবহার লাভ করেন, তাহার উপর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বা শান্তি নির্ভর করিবে। ঐ পরিষদে ফরমোসার ভবিষ্যৎও আলোচিত হইবে। চীনের সরকার জানাইয়া দিয়াছেন, চীনের প্রতিনিধিরা বিচারপ্রার্থী হইয়া বা অপরাধীর বিচারালয়ে গমনের মত পরিষদের অধিবেশনে যাইতেছেন না; পরন্তু সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য সদস্যের সহিত তুল্যাধিকারে অধিকারী হইয়া চীনের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে যাইতেছেন।

মূল কথা, কোরিয়ার ব্যাপারে চীনের উদ্বেগ অনিবার্য এবং চীন যদি মনে করে, এশিয়ায় কম্যুনিজম-প্রসার বন্ধ করাই অ্যাংলো-আমেরিকান দলের মনোগত অভিপ্রায়, তবে সে যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারে এবং চীন যুদ্ধে যোগ দিলে রুশিয়া কি করিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই জন্যই আশঙ্কা করা অসঙ্গত নহে—কোরিয়ার যুদ্ধ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রথমে পরাভূত হইয়া কোরিয়ার বাহিনী এখন প্রবল আক্রমণে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বাহিনী বিপন্ন করিয়াছে। সে বাহিনীর অবস্থা কি হইবে, বলা যায় না। আর আমেরিকা বলিতেছে, চীনা সৈন্যেরা কোরিয়াকে সাহায্য করিতেছে।

তিব্বতের অবস্থা—

তিব্বতের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদের দৈন্য নানা-ভাবে লোককে বিভ্রান্ত করিতেছে। এই ব্যাপার লইয়া ফাটকাবাজরা লাভবান হইবার চেষ্টায় তিব্বতী মুদ্রার ব্যবসা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়াছে ও করিতেছে। কেহ কেহ তাহার সহিত ভারতে স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে আলোচনাও করিতেছেন।

তিব্বত যে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। গত ৭ই নভেম্বর দালাই লামা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘকে লিখিয়াছেন—

তিব্বতের সমস্যা যে ভয়াবহ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, সেজন্য তিব্বত দায়ী নহে; পরন্তু দুর্ব্বল জাতিসমূহকে তাহার অধীনে আনিবার জন্য চীনের অবাধ আকাঙ্ক্ষার জন্যই তাহা ঘটিয়াছে। তিব্বত কখনই চীনের প্রাধান্য স্বীকার করে নাই এবং উভয় দেশে যে সামান্য সম্বন্ধ ছিল, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর তাহা ক্ষীণ হয় এবং এবং চীন কম্যুনিষ্ট হওয়ায় তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের বিষয় বিবেচনা করিয়া ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দেও তিব্বত চীনের সহিত রাজনীতিক সম্বন্ধ বর্জ্জন করে এবং এখন তিব্বত জড়বাদজর্জ্জরিত চীনের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিতে অসম্মত। যদিও শান্তিভক্ত তিব্বত যুদ্ধবিলাসী বর্ব্বর জাতির সহিত সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না, তবুও তিব্বত বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করিবে না। চীনের পক্ষে তিব্বত আক্রমণ—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। যদিও চীন তিব্বতকে তাহার অধীন রাজ্য বলিতেছে, তথাপি তিব্বত সে দাবী স্বীকার করে না—তিব্বতীরা জাতিহিসাবে, ভৌগোলিক অবস্থানে এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে—চীনাদিগের সহিত বিভিন্ন।

মূল কথা—চীনের অধিকার লইয়া। যদিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা অপর কাহারও প্ররোচনায় তিব্বত আজ সেই অধিকার অস্বীকার করিতেছে, তথাপি ইংরেজও সেই অধিকার স্বীকার করিয়া আসিয়াছে এবং অল্পদিন পূর্ব্বে আমেরিকাও তাহাই করিয়াছে।

গত ২৩শে নভেম্বর লণ্ডনে তিব্বত লইয়া ভারত সরকারের সহিত চীন-সরকারের পত্র-ব্যবহার প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, চীন-সরকার প্রথমাবধি ভারত সরকারকে বলিয়া আসিয়াছেন—

তিব্বত চীনের অধিকার-সীমার অন্তর্গত এবং সেইজন্য তিব্বতের ব্যাপার চীনের "গার্হস্থ্য" ব্যাপার। সুতরাং তিব্বতকে মুক্ত করিবার ও স্বীয় সীমান্ত রক্ষা করার পূর্ণ অধিকার চীনের আছে। চীন যে তিব্বতকে আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়াছে—সে অধিকার চীনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া প্রদত্ত অধিকাররূপে ব্যবহার করিতে হইবে। গত ২৬শে আগষ্ট তারিখে ভারত সরকার ইহা স্বীকার করিয়াছেন। অথচ যখন চীন সরকার সেই অধিকার অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করেন, তখনই ভারত সরকার তাহা প্রভাবিত করিবার ও তাহাতে বাধাদানের চেষ্টা করিয়াছেন! ইহাতে চীন-সরকার বিস্মিত হইয়াছেন। তিব্বতে চীনাবাহিনী প্রেরণের পূর্ব্বেও চীন-সরকার তাহা ভারত সরকারকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

ভারত সরকার নাকি এখন "প্রকৃত প্রাধান্য" ও "নামমাত্র প্রাধান্য"—এতদুভয়ে প্রভেদ আছে বলিয়া—তিব্বতে চীনের নামমাত্র অধিকার থাকিলেও প্রকৃত অধিকার নাই—এই মত প্রকাশ করিতেছেন।

ভারত সরকারের এইরূপ মত প্রকাশিত হইলে চীন সরকারে তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা বলা যায় না। ভারত সরকার যদি চীনের প্রকৃত প্রাধান্য স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তবে যে লর্ড কার্জ্জনের কৃত সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জটিল অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীন যে সহজে তাহার অধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইবে না, তাহা ভারত সরকারকে লিখিত তাহার পত্রেই সপ্রকাশ।

নেপাল—

নেপাল ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য। বর্ত্তমান রাজবংশ গুর্খা সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু। এই গুর্খারা ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে—নেপালী অধিবাসী নেওয়ারদিগকে পরাভূত করিয়া নেপালে অধিকার-প্রতিষ্ঠা করেন। সে অধিকার সামন্ত প্রথানুবর্ত্তী। গুর্খারা পূর্ব্বে সিকিমে, পশ্চিমে কুমায়ুনে ও দক্ষিণে গাঙ্গেয় সমভূমিতে অধিকার বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলে গাঙ্গেয় স্তরে বৃটিশের প্রজাদিগের পক্ষ হইয়া সার জর্জ্জ বার্লো ও লর্ড মিন্টো প্রতিবাদ করেন। নেপালী রাজা তাহাতে কর্ণপাত না করায় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ নেপালের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলে প্রথমে পরাজিত হইয়া পরে জয়লাভ করে এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দুই দেশে সন্ধি হয়—সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে গুর্খারা সিকিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে যে অংশে নাইনীতাল, মশুরী ও সিমলা অবস্থিত সেই অংশ ত্যাগ করে। তাহার পরে মধ্যে মধ্যে উভয় দেশে যে সকল সন্ধি হইয়াছে—পূর্ব্বোক্ত সন্ধিই সে সকলের ভিত্তি।

নেপালের সহিত ভারতের সম্বন্ধ কেবল ব্যবসাগত নহে, পরন্তু ভারতীয় সেনাবলে গুর্খা সৈনিক অনেক আছে এবং হিন্দুর তীর্থস্থানরূপেও নেপাল ভারতীয়দিগের নিকট আদৃত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নেপাল সামন্ত প্রথায় শাসিত! রাজার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণ, কিন্তু মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রভুত্ব অসাধারণ। রাণাগোষ্ঠীই ক্ষমতা হস্তগত করিয়া আছেন এবং তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য যেমন অসাধারণ, ষড়যন্ত্রও তেমনই ভয়াবহ। প্রজাসাধারণ শোষণে জর্জ্জরিত—রাজনীতিক অধিকারে বঞ্চিত—দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নেপাল কিন্তু পৃথিবীর নূতন ভাব-বিস্তার হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহা সম্ভব নহে। বিশেষ ভারতের সহিত প্রাত্যহিক সম্বন্ধহেতু তথায় গণতান্ত্রিক ভাবও প্রবেশ করিয়াছে। সেই ভাবের ফলে তথায় নেপালী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, রাণারা গণতান্ত্রিক মতের বিরোধী এবং কংগ্রেস চূর্ণ করিতে আগ্রহশীল।

নেপালে যে প্রজাদিগের মধ্যে জাগরণের পরিচয় প্রকট হইতেছে, সে সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। শেষে তথায় যে পরিবর্ত্তন আসন্ন সে সংবাদ সরকারী সূত্রে প্রকাশিত না হইলেও লোকমুখে প্রচারিত হইয়াছিল।

এই সময় দিল্লী হইতে গত ২১শে কার্ত্তিক সংবাদ প্রকাশিত হয়—

(১) নেপালী সরকারের সহিত মতভেদহেতু নেপালের রাজা পরিবারস্থ কয়জনকে লইয়া ২০শে কার্ত্তিক ভারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভারতে আসিবার ইচ্ছা জানাইয়াছেন।

(২) নেপালী সরকার রাজার কার্য্য নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার সহগামী যুবরাজের তিন বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্রকে রাজা ঘোষণা করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের দায়িত্ব লইয়াছে।

২৫শে কার্ত্তিক নেপালের রাজা তাঁহার দুই স্ত্রী ও কয়টি সন্তান লইয়া বিমানে দিল্লীতে উপনীত হইয়া ভারত সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপে গৃহীত হন।

ওদিকে নেপালী কংগ্রেসের সেনাদল বীরগঞ্জ অধিকার করে এবং কংগ্রেস দলের দলপতি ত্রিভুবন মল্ল যুদ্ধে আহত হইয়া ১২ই কার্ত্তিক রক্সলে ডানকান হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। নেপাল সরকারের সেনাদল বীরগঞ্জ আক্রমণ করে এবং লোকের উপর অকারণ অত্যাচার করিতে থাকে। নেপাল সরকারের সেনাবলের কতকাংশ কংগ্রেসী দলে যোগ দেওয়ায় জটিল অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য হয়। নেপালী কংগ্রেসের দলপতি শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈলারা ঘোষণা করেন—রাণাদিগের সহিত আপোষ করা অসম্ভব—রাণাশাসনের উচ্ছেদসাধন করিতেই হইবে।

নেপাল কংগ্রেসের বাহিনী অসীম সাহসে সরকারী সেনাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছে এবং চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। নির্য্যাতন-পীড়িত জনগণের সহানুভূতি কংগ্রেস লাভ করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়; তবে সক্রিয় সাহায্যের উপর সাফল্য নির্ভর করিবে।

পররাষ্ট্র নেপাল সম্বন্ধে কোনরূপ মত প্রকাশ করা ভারত সরকারের পক্ষে সমীচীন হইতে পারে না; কারণ, নেপালের ব্যাপার আন্তর্জ্জাতিক সীমাভুক্ত। তবে ১লা অগ্রহায়ণ ভারতীয় মন্ত্রী মিষ্টার আবুল কালাম আজাদ বলেন—নেপালের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা নিবারণের একমাত্র উপায়—তথায় রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সংস্কার প্রবর্ত্তন। যাহাতে নেপালের ব্যাপার যথাসম্ভব শীঘ্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসিত হয়, তাহাই ভারতের অভিপ্রেত। কারণ, ভারত নেপালের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে না পারিলেও সেই প্রতিবেশী রাজ্যের ব্যাপার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারে না—তথায় সঙ্কট উপস্থিত হইলে ভারতের বিপন্ন বা বিব্রত হইবার সম্ভাবনা।

তাহার পরে ৮ই অগ্রহায়ণ প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতিতে বলিয়াছেন—

(১) রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে প্রধান রাখিয়া নেপালে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠাই বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা নিবারণের উপায়।

(২) রাজার জনপ্রিয়তা আছে।

ভারত সরকার রাজার পৌত্রকে রাজা স্বীকার করিবেন কি না, সে বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করেন নাই।

নেপালের মন্ত্রী অর্থাৎ যাঁহারা সরকার অধিকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতিনিধি ভারত সরকারের সহিত মীমাংসার বিষয় আলোচনা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছেন এবং ১১ই অগ্রহায়ণ নেপালের বর্ত্তমান সরকারের প্রতিনিধিরা, আলোচনার জন্য দিল্লীতে উপনীত হইয়াছেন। পরদিন হইতেই আলোচনা আরম্ভ হয়। আলোচনার ফল কি হয়, তাহা দেখিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু রাণা-গোষ্ঠীর আলোচনার পশ্চাতে যে দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে, তাহা মনে রাখা প্রয়োজন :—

(১) রাণাদিগের কার্য্যের সহিত বৃটিশ সাংবাদিক আলফ্রেড নক্সের সম্বন্ধ কি? সন্ধিক্ষণে তাঁহার কাটমুণ্ডে উপস্থিতি দরিদ্র প্রজাদিগের রাজনীতিক অধিকার লাভ-প্রয়াস ব্যর্থ করিবার জন্য বলিয়াই অনেকে মনে করেন। এই ব্যক্তি কাশ্মীরে যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য হয়। ইনি নিরপেক্ষ সাংবাদিক পরিচয়ে নেপাল কংগ্রেসের অনেক কথা জানিয়া সে সব সংবাদ রাণা-গোষ্ঠীকে দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবং তাঁহার ভারত-বিরোধী মন্তব্য বেতারে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া বিদেশে বিকৃত সংবাদ প্রচারে সহায়তা করিতেছে। ইনি রাণা-গোষ্ঠীর পক্ষ হইয়া বিদেশে প্রচারকার্য পরিচালনার ভার লইয়াছেন—একথা যদি সত্য হয়, তবে সে কথা—আলোচনাকালে—স্মরণ রাখা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য হইবে।

(২) নেপাল সরকার কর্ত্তৃক ভারতীয় প্রজার উপর অত্যাচারের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে এবং নেপাল সরকারের সেনাবলের বন্দুকের গুলীতে ভারত-রাষ্ট্রে ভারতীয় প্রজা আহত হইয়াছেন। এ বিষয়ে নেপাল সরকার কিরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং ক্ষতিপূরণের কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, তাহা জানিতে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের ঔৎসুক্য অনিবার্য।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আন্দামানে বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতি

১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস। কলিকাতায় যে রক্তনদী প্রবাহিত হইল তাহার স্রোত পূর্ব্ব বাংলার নোয়াখালি চট্টগ্রাম ঘুরিয়া পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ প্লাবিত করিয়া পূর্ণ এক বৎসর পরে ভারতকে দ্বিধা বিভক্ত করাইয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে গৃহশূন্য পথের ভিখারী করিয়া ১৫ই আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখে ঘোষিত হইল ভারতের স্বাধীনতা। সিন্ধু, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের বাস্তুচ্যুতদের কথঞ্চিত স্থানসঙ্কুলান হইল ভারতের মধ্যেই—কিন্তু বাংলার তিন ভাগের দুই ভাগ অঞ্চলের হিন্দুদের স্থান এক-তৃতীয়াংশ বাংলায় কিরূপে হইবে? এদিকে অহিংস ভারতের কর্তৃপক্ষগণ ধর্ম্মনিরপেক্ষ, শত্রুকে তাঁহারা শত্রু বলিতে অক্ষম, ইহা তাঁহাদের ইডিয়টোলজিতে যুড়ি ইডিয়লজিতে নাই, অতএব পাকীস্থান যাহারা চাহিয়াছিল, তাহারা পাকীস্থান পাইয়াও যদি স্ব ইচ্ছায় সেখানে যাইতে না চায়, তাহা হইলে চলিয়া যাও বলিবার শক্তি ভারতীয় নেতৃবর্গের নাই, অন্য পক্ষে হিন্দু অর্থাৎ 'অমুসলমান' বাস্তহারাদের জন্য উপযুক্ত স্থান না দিলে দেশের মধ্যে নিদারুণ বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে, কাজেই নূতন স্থান চাই; সেই স্থান কোথায় পাওয়া যাইবে? চিন্তাশীল লোকের মাথায় আসিল আন্দামান দ্বীপ। এই জনবিরল দ্বীপে বহু লোকের বসবাস সম্ভব, অতএব স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই দিকে কর্ত্তাদের দৃষ্টি পড়িল। ইংরাজ রাজত্বে আন্দামান ছিল অপরাধীদের দীর্ঘকাল কারাবাসের উপযুক্ত স্থান, স্বাধীন ভারত আন্দামানকে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে চায় না, অতএব উহাকে বাস্তহারার উপনিবেশে পরিণত করা যায় কি না, সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা ও গবেষণা চলিতে লাগিল। এইরূপ গবেষণার প্রথম প্রশ্ন, আন্দামানের মাটীতে স্বয়ংপূর্ণভাবে লোকবসতি হওয়া সম্ভব কি না?

১৮৫৮ সালে আন্দামানে কয়েদী প্রেরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত আন্দামান বরাবরই ঘাটতি অঞ্চলরূপে গণ্য ছিল। পাকীস্থান ভাগের সময় সেইজন্যই মুসলীম লীগ এদিকে কোনরূপ নজর দেয় নাই, আন্দামান নিকোবরকে নিজেদের ভাগে টানিবার জন্য কোনরূপ আবদারও করে নাই; কিন্তু বিশেষজ্ঞের মতে আন্দামানের প্রাকৃতিক সম্ভাবনা এরূপ আছে যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে উহাকে ঘাট্‌তি অঞ্চল হইতে বাড়্‌তি অঞ্চলেও পরিণত করা যায়। পৃথিবীতে তিনটি জায়গা penal settlement বা অপরাধীদের উপনিবেশরূপে পৃথক করা ছিল, উহাদের মধ্যে একটি রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়া, দ্বিতীয়টি ছিল অষ্ট্রেলিয়া এবং তৃতীয়টি এই আন্দামান। সাইবেরিয়া বর্ত্তমানে সোভিয়েটের নিভৃত শক্তির ঘাঁটীতে রূপান্তরিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়, অষ্ট্রেলিয়া বর্ত্তমানে পৃথিবীর বাজারে সোনা, পশুসম্পদ ও কৃষিজপণ্য বিক্রয় করিয়া রীতিমত ধনী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার ইতিহাস আন্দামানের তুলনায় বেশী পুরাতন নয়। ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পথভ্রষ্ট হইয়া অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই আগষ্ট ৭৫০ জন নির্ব্বাসিত শ্বেতাঙ্গ কয়েদীকে এই অঞ্চলে প্রথম প্রেরণ করিবার হুকুম হয়। আন্দামানের তুলনায় অষ্ট্রেলিয়া মাত্র ৭২ বৎসর পূর্ব্বে কয়েদী উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু এখন অষ্ট্রেলিয়া একটি স্বাধীন মহাদেশরূপে গণ্য হইয়াছে। আন্দামান মহাদেশরূপে গণ্য হইবার মত আকারে বৃহৎ না হইলেও বিশেষজ্ঞের মতে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে ইহা ভারতবর্ষের একটি প্রয়োজনীয় অংশরূপে, ভারত মহাসাগরের জলপথে ভারতরক্ষার ঘাঁটীরূপে এবং কৃষিজ ও বনজ পণ্যের উদ্বৃত্ত অঞ্চলরূপে স্থায়ীভাবে ভারত উপমহাদেশের অতি প্রয়োজনীয় কেন্দ্র বলিয়া নিশ্চিৎ আদৃত হইবে।

আন্দামানে বাস্তহারাদের পুনর্ব্বসতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বাধীনতা লাভের এক বৎসর পরে সরকারী প্রচেষ্টায় Andaman exploratory party নামক একটি সরকারী দল গঠিত হয়। এই পার্টির উদ্দেশ্য ছিল "Generally to examine the possibilities of commerce—domestic, interprovincial and foreign—and industry in the island with special reference to the scope that colonists refugees and others from West Bengal are likely to find; and to advise what measures need be adopted to get colonists established in agriculture, commerce and industry." এই দলটি এগারো জন বাঙ্গালীকে লইয়া গঠিত হয়। ইহার অধিনায়ক ছিলেন পশ্চিম বাংলার তদানীন্তন মাননীয় পুনর্ব্বসতি মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি। অন্যান্য সভ্যদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুপ্ত I. F. S. Conservator of Forest, West Bengal,

শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, সরকারী কৃষি বিভাগের প্রতিনিধি।

শ্রীবিশ্বপদ দাশগুপ্ত, সরকারী মৎস্য বিভাগের প্রতিনিধি।

শ্রীশম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, Deputy Relief Commissioner.

শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য, Member, Advisory Board, Relief & Rehabilitation,

শ্রীসুধীরঞ্জন বিশ্বাস, National chamber of commerce.

শ্রীমহেন্দ্র চৌধুরী, চট্টগ্রাম কংগ্রেস প্রতিনিধি।

শ্রীঅমিয় রায় চৌধুরী, বরিশাল কংগ্রেস প্রতিনিধি।

ডাঃ শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রতিনিধি।

শ্রীবিভূতি বসু, অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধি।

ইঁহাদের প্রথম আন্দামান অভিযান—১৯৪৮ সালের ১৬ই নভেম্বর হইতে ২১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মাইতি মহাশয় এই সময়েই সেলুলার জেলের পশ্চাতে সমুদ্রের তীরে একটি স্থায়ী শহিদস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে এই প্রবন্ধে সেলুলার জেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

এগার জন সভ্য লইয়া গঠিত এই অভিযাত্রী দল আন্দামানে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিভাগ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী অনুসন্ধান কার্য্য আরম্ভ করেন এবং অচিরেই নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে এক এক বিবরণী লিখিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অর্পণ করেন। ইহাদের বিবরণীতে আন্দামানের নানা বিষয় সম্বন্ধে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং এক বিষয়ে ইঁহারা সকলেই একমত হইয়াছেন যে উপযুক্তভাবে পুনর্ব্বসতি করাইতে পারিলে আন্দামান একটি সমৃদ্ধ দ্বীপে পরিণত হইতে পারিবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ভারত সরকার উভয়েই ইঁহাদের অভিমত গ্রহণ করেন এবং পশ্চিম বাংলার উপনিবেশরূপে যাহাতে সুচারুরূপে এই দ্বীপটি গঠিত হইয়া বাস্তুহারাদের কল্যাণ সাধন করিতে পারে, বোধ হয় সেইজন্যই আন্দামানের চিফ্ কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার হইতে আরম্ভ করিয়া অধিকাংশ উচ্চপদস্থ অফিসারই বাংলা দেশ হইতে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর বাস্তুহারাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া সেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা করিয়া, গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী টিন এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য, লাঙ্গল এবং গো-মহিষাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রথম বাস্তুহারা দল প্রেরিত হয় ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাসে। ইহারা ২৩য়ে মার্চ্চ ১৯৪৯ সালে পোর্টব্লেয়ারে পদার্পণ করে। এই দলে কৃষক বলিয়া নাম লেখানো ১৯৯টি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু পরিবার ছিল।

[প্রবন্ধের এই অংশে উল্লিখিত অধিকাংশ তথ্যই শ্রদ্ধেয় শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত। আন্দামান হইতে মাদ্রাজ ফিরিবার পথে এস্ এস্ মহারাজা জাহাজে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার নিকট হইতে উপরোক্ত বিষয়গুলি শুনিয়াছিলাম, এ ছাড়া তাঁহার নিকট যে সমস্ত ফাইল ছিল সেগুলি হইতে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম, আগামী মাসে সেগুলির সংক্ষিপ্তসার একত্র করিয়া 'ভারতবর্ষে'র পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করিবার ইচ্ছা রহিল]

(ক্রমশঃ)

যেথা নামিয়াছে জীবন-সূর্য্য-গ্রহণের কালোছায়া

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

যা কিছু কঠোর, যাহা নিঠুর, তার সাথে মোর দেখা,
এই জীবনের লাঞ্ছনা ভোগ এখনো অনেক বাকী!
ফুলের ফসল ফুরায়ে গেল যে, কাঁদে স্বপনের পাখী,
অসম্মানের ধূলার আসনে বসে বসে ভাবি একা—
যেথা নামিয়াছে জীবন-সূর্য্য-গ্রহণের কালোছায়া :
শুধু কঙ্কাল—নাহি সুন্দর কায়া।
জাতি ধর্ম্মের উর্দ্ধে মানুষ, প্রেমে তার পরিচয়,
মানবিকতার যেথায় প্রকাশ, সেথায় দেবতা রয়।
মানুষ মমতা হীন,
তাই কি এসেছে পৃথিবীর দুর্দ্দিন!
জীবন-মৃত্যু মাঝখানে রহে আলোছায়া আবরণ,
ভালোবাসা আভরণ।
শারদোৎসব ঈদ মহরম জাগে,
এই বাংলার ভাব জীবনের পাঁচালীর সুরে সুরে ;
সমাজ চেতনা হৃদয় ভূমিতে ছিল যা অগ্রভাগে,
গিয়াছে কি বহুদূরে?
আগামী কালের পথে
আজিকার যত ব্যর্থ ব্যথার টুটিবে কি হানাহানি?
নূতন যুগের উদয়ন ক্ষণে জাগিবে কি নব-বাণী?
শান্তির দূত আসিবে কি কভু বিশ্ব বিজয় রথে?

পীড়া-জর্জ্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর দুর্ল্লভ,
তারি মাঝে করি নয়নের জলে বিজয়ার উৎসব।
যারা চলে গেল পথ রাঙা করে মুক্তির অভিযানে
যাদের পাথেয় হারায়ে গিয়েছে প্রিয়!
বিজয়া-মিলন উৎসব দিনে তারা দূরে অভিমানে
উড়ায়ে চলেছে লোক হ'তে লোকে জীবন উত্তরীয়।
আমরা তাদের প্রাণ-সূর্য্যের দেখেছি অস্তরেখা
ভারতের মহাকাশে।
আমরা দেখেছি পথের দু'ধারে হিংসা-রক্তলেখা,
তাহাদের নিঃশ্বাসে
প্রান্তিক নভে চাঁদ ডুবে গেছে শিহরি চক্রবাল,
তারা কি মোদের করিয়াছে ক্ষমা—ক্ষমিবে কি মহাকাল!
হে কবি! তাদের উদ্দেশে মোর হৃদয় অর্ঘ্য সঁপি,
আমার সমুখে ভেসে আসে আজ দূরে চলে-যাওয়া ছবি।
তাদের বিহনে শূন্য পরাণ মোর,
কেমনে নিবারি তপ্ত অশ্রুলোর!
যে নদী ছুটেছে সিন্ধুর পানে সে কি আর ফিরে চায়
পিছনের পথে নির্ঝর-মমতায়!
মোর আঙিনায় স্মৃতি পড়ে ঝুরে ঝুরে,
তারা আজ কত দূরে!

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বর্ণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশাইয়া বলিল—গোটা জংসন শহরটা হাসছে! অরুণার এই আচরণে ব্যঙ্গ ভরে হাসিয়া কৌতুক অনুভব করিতেছে। কথাটা স্বর্ণ মিথ্যা বলে নাই। সত্যসত্যই এই ঘটনাটি লইয়া সারা দ্বারমণ্ডল জংসনে আলোচনার আর অন্ত নাই। হিন্দু বিধবার বেশে তাহাকে পুলিশ আপিসে উপস্থিত হইতে না হইলে হয় তো ঠিক এমন ধরণের আলোচনার ব্যাপার হইয়া উঠিত না। যেন ঢেঁড়া পিটিয়া ঘোষণা করিয়া দিল—"এখানকার বালিকা বিদ্যালয়ের বড় দিদিমণি, যে মেয়েটির বেশবিন্যাস কেশ-প্রসাধন দেখে মানুষ বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকত—যার আধুনিক মতবাদের উগ্রতায় সভয়-বিস্ময়ে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়াত, যে মেয়ে এ সংসারে সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে চলেছে এতদিন, যে একদিন হিন্দু ধর্ম্ম ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, আবার ইসলাম ছেড়ে নামমাত্র হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেও কোন ধর্ম্মকেই যে মানে না ব'লে ঘোষণা করেছিল, সেই মেয়ে অকস্মাৎ বৈধব্যের নিরাভরণতায় নিজেকে নিরাভরণ করেই ক্ষান্ত হয় নাই—একাদশীর উপবাস ক'রে নূতন মূর্ত্তিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এর চেয়ে বিচিত্র আর কি হ'তে পারে?"

গোটা শহরটায় ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কথাটা ছড়াইয়া গিয়াছে।

কোথাও উঠিল উচ্চ হাস্য।—বল কি? একেবারে তপস্বিনী? কিন্তু সে বয়স তো হয় নি!

কোথাও তিক্ত ক্ষোভ রণরণ করিয়া উঠিল।—কোন অধিকার তার? লজ্জাহীনা নাস্তিক!

কোথাও তীক্ষ্ণ সন্দেহ উদ্যত হইয়া উঠিল—কারণ কি? নূতন কোন উদ্যম? কি সে উদ্যম?

কোথাও অবিমিশ্র বিস্ময় মনশ্চক্ষুকে বিস্ফারিত করিয়া তুলিল। আশ্চর্য্য—অবাক!

কোথাও আবার অনুচ্ছ্বসিত প্রকাশে জাগিয়া উঠিল বুদ্ধিমানের সহানুভূতি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শক্তি ফুরিয়ে গেলে পরাজয় এমনি ভাবেই মানুষকে পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়!

কোথাও বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল ক্রোধ।—জীবনে সম্মুখের পথ-ছেড়ে পিছন দিকে মুখ ফেরালো যে —সে পলাতক; শাস্তি তাকে পেতে হবে।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা—একটি বিস্তীর্ণ অংশের অনেক-অনেক মানুষ আবার বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রসন্ন স্নেহে গভীর শ্রদ্ধায় প্রায় বিগলিত হইয়া গেল। অনেকের চোখ সজল হইয়া উঠিল। এইটিই যেন তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়া ছিল। তাহারা বলিল—জয় হোক, তোমার জয় হোক! ইহারা দ্বারমণ্ডলের হিন্দু সমাজের সাধারণ মানুষ। ইহারা গণনায় অসংখ্য, কিন্তু গুরুত্ব নগণ্য; বুদ্ধি দিয়া বিচারের শক্তি ইহাদের নাই, দৃষ্টিহীন মানুষের স্পর্শ দিয়া পৃথিবীকে চেনার মত ইহারা সব কিছুকে হৃদয় দিয়া হয় গ্রহণ করে, অথবা প্রত্যাখ্যান করে। যখন গ্রহণ করে তখন চোখ ছল ছল করিয়া উঠে, ঠোঁট দুইটি কথা বলিতে গিয়া কাঁপে, নগ্ন বক্ষের উত্তাপও বোধ করিয়া বাড়িয়া যায়।

চারিপাশে চারখানি পঞ্চগ্রাম—অর্থাৎ বিশখানা গ্রামের হৃদপিণ্ডের মত কেন্দ্রস্থল জংসন দ্বারমণ্ডল। এখানেই আসে বিশখানা গ্রামের উৎপন্ন দ্রব্য, এখান হইতেই বিশখানা গ্রামে যায়—অন্ন-বস্ত্র, অর্থ, বিশখানা গ্রামের প্রাণবান দুঃসাহসী যাহারা—তাহারা এই দ্বারমণ্ডলেই আসিয়া আসন পাতে, এখান হইতেই তাহারা তাহাদের জীবনের প্রভাব ছড়াইয়া দেয়—চারিটি পঞ্চগ্রামে; দ্বারমণ্ডল এখানকার হৃদপিণ্ড। ক্ষুদ্র একটি

ঘটনা—একটি মেয়ের জীবনের ঘাত সংঘাতে পরিবর্ত্তনের প্রভাবে হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন ধক ধক করিয়া দ্রুত তালে চলিতে সুরু করিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যন্ত ভাগের মত সাধারণ মানুষগুলির দারিদ্র্য শীর্ণ পল্লী—এমন কি কুঁড়ে ঘরগুলিও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দ্বারমণ্ডলে একটি বিশেষ শ্রেণী আছে—তাহারা নূতন কালের অভিজাত শ্রেণী। এ শ্রেণীর অস্তিত্ব চারিদিকের পঞ্চগ্রামের গ্রামে বড় একটা নাই। ইহারা হইলেন একাধারে ধনী এবং জ্ঞানীর দল—অর্থাৎ মোটা চাকুরে উকীল মোক্তার ডাক্তার—ইংরাজী-কায়দায় চেয়ার-টেবিল-প্রধান ব্যবসাদার, দুচার জন জমিদার-বাড়ীর ছেলে বি-এ এম-এ পাশ করিয়া ইঁহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া একটি সমাজ নেতৃত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। সুরপতিই ইঁহাদের তরুণ নেতা। কঙ্কণার জমিদার বাড়ীর ব্যারিষ্টার ছেলেটি—যাহাকে সুরপতি জমিষ্টার বলিয়া থাকে—সেও এই দলের একজন মাননীয় ব্যক্তি! শুধু মাননীয় ব্যক্তিই নয়, সুরপতির একজন প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে। গেল মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌সনে চেয়ারম্যান পদে সেও একজন প্রার্থী ছিল; সুরপতির কাছে শোচনীয় হার হারিয়াছে। হারিয়া বিলাত ফেরৎ নরেন সর্ব্বাগ্রে সুরপতির হাত ধরিয়া অভিনন্দিত করিয়া-ছিল। সুরপতি এদেশের খাঁটী মফঃস্বল শহরের ছেলে, সে আপনার শিক্ষা-দীক্ষা অনুযায়ী ধন্যবাদ জানাইতে গিয়া নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিল—সাধে কি তোকে জমিষ্টার বলিরে ভাই? এই জন্যেই বলি। বনেদী চালের সঙ্গে বিলিতী চাল মিশিয়ে একেবারে স্বর্গীয় ব্যাপার করে তুলেছিস। তুই ভাই বয়সে বড় হ'লে—ফুটডাষ্ট নিয়ে মাথায় মাখতাম। বয়সে ছোট, তোর চাঁদমুখের একটা চুমো খাই!

চিবুক স্পর্শ করিয়া সত্যসত্যই সে চুমু খাইয়াছিল। চুমু খাইয়া বলিয়াছিল—কিন্তু মাই ডিয়ার—একটা কথা বলব—রাগ করোনা যেন। তোমরা ব্রাদার—বনেদী জমিদার—এ অঞ্চলের কিং-এম্পারার! শুনেছি—কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের পাল্কী যেত পথ দিয়ে—পথের দুধারে মানুষেরা দু হাতে সেলাম বাজাত'। বাবুরা যদি কান বা মাথা চুলকোতে হাত তুলতেন তো মানুষেরা আঁতকে উঠে মাথা নামিয়ে চীৎকার করত—হুজুর মাফ করুন, রাজা রক্ষে করুন! মানে কি? না—কঙ্কণার বাবুর হাত যখন উঠেছে—তখন কারুর মাথা না-নিয়ে তো নামবে না! ব্রাদার, তুমি হলে সেই বংশের Bamboo-holder, তার ওপর তুমি বিলেত ঘুরে এসে—সোনায় সোহাগা লাগিয়েছ। তোমার এই জংসনের চেয়ারে লোভ কেন? রাধে-রাধে—আমাদের এ হ'ল গিল্টীর বাজার—এর মধ্যে খাঁটী সোনা—তোমাকে মানাবেই বা কেন—আর তোমার দামই বা উঠবে কেন? না—না—না, এ দিকে নজর দেওয়া তোমাদের মানায় না; বেড়ালের চোখ ইঁদুর ছানার দিকে পড়ে, তোমরা বাবা—চিতে বাঘ—সিংহ হ'ল বৃটিশ, রয়াল বেঙ্গল হল—রাজা-রাজড়া, তোমরা চিতে বাঘ—তোমাদের নজর ইঁদুরের দিকে পড়লে—আমরা খাব কি?

এত বড় দীর্ঘ বক্তৃতার উত্তরে নরেন একটু হাসিয়াছিল মাত্র। কোন কথাই বলে নাই। ভিতরের সত্যটা অজানা কাহারও ছিল না, নরেনেরও না, সুরপতিরও না।

সে দিন চলিয়া গিয়াছে।

আজ দ্বারমণ্ডলের আধিপত্যের আসরের চেয়ারম্যান-শিপই এ অঞ্চলের রাজসিংহাসন। শিবকালীপুরের শ্রীহরি ঘোষ বলে—ও চেয়ার দখল আপনাকে করতেই হবে। এ অঞ্চলের মাটি আমাদের—আমরা কিস্তী-কিস্তী রাজকর যুগিয়ে যাচ্ছি—আর রাজত্বি করবে ওরা!

শিবকালীপুরের পত্তনীদার শ্রীহরি ঘোষ—সম্প্রতি তাহার দেউলিয়া জমিদারের জমিদারীস্বত্ব কৌশলে নীলামে কিনিয়া জমিদার হইয়াছে। দ্বারমণ্ডলের নদীর খেয়া ঘাট এবং আরও খানিকটা জায়গা—শিবকালীপুরের সীমানাভুক্ত, সেই হিসাবে সেও দ্বারমণ্ডলের একজন জমিদার। কঙ্কণার নরেনবাবুর সঙ্গে সেও এখানকার প্রাধান্যের একজন দাবীদার। এখানকার আভিজাত্যের অহঙ্কারে অহঙ্কৃত সম্প্রদায়টির পঞ্চায়েতের মাননীয় না হইলেও গণনীয় ব্যক্তি।

এই সম্প্রদায়টি নিজেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই অরুণার এই পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরপতি থানাতেই—আই-বি অফিসার রণদাবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া—কাঁধশ্রাগ করিয়া দুই হাত উল্টাইয়া বলিয়াছিল—কে জানে বাবা!

তাহার পর আসরে-মজলিসে এ সম্প্রদায়ের প্রবীণেরা

কাঁচাপাকা গোঁফের অন্তরালে—হাসি লুকাইয়া সুরপতিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—কি ব্যাপার হে সুরপতি ?

সুরপতি বলিয়াছিল—বুঝতে পারছি না দাদা! কিন্তু একেবারে তপস্বিনী!

—কিন্তু বয়সতো হয় নি ভাই!

—সেই তো!

এবার গোঁফের আড়ালে প্রচ্ছন্ন হাসিটুকু আড়াল হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখা-দেওয়ার ভঙ্গিতে বাহির হইয়া পড়িল। প্রবীণ ডাক্তার রমণীবাবু বলিলেন—এ যে একেবারে রাধিকার কালীমূর্ত্তি ধারণ!

বুড়া ব্রজবিলাসবাবুর টাকা পয়সার সুবাদ আছে, ভদ্রলোক তদনুযায়ী গম্ভীর এবং খট্‌রোগা ব্যক্তি—তিনি এ কথায় খিঁচাইয়া উঠিলেন—আঃ রমণী! দেবদেবীর নাম নিয়ে তুলনা দিয়ে আর অপরাধ বাড়িয়ো না! ও সব ওদের ঢং—ওদের—।

ঢং বলিয়াও পরিতৃপ্তি হইল না ব্রজবিলাসবাবুর—পরিশেষে বলিতে চাহিলেন—ওসব ওদের ছেনালী! কিন্তু ছেলেদের দিকে চাহিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—ছেলেপিলে রয়েছে—কি বলব বল ?

সুরপতি বলিল—বলছি দাদা—কি বলবেন—আমি বলছি ;—রহস্যময়ীদের রহস্য!

—হ্যাঁ—এই বলেছ ঠিক।

নরেন পাইপে অগ্নি সংযোগ করিতেছিল, এতক্ষণে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—woman in the white —the mistry woman—eh!

সকলে তারিফ করিয়া উঠিল।

এমনিভাবেই ব্যাপারটা সুরু হইয়াছিল কিন্তু হঠাৎ সকলে চকিত হইয়া উঠিল। অরুণা নিজেই চকিত হইয়া উঠিল বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারই উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল—অদ্ভুত দর্শন এক বৃদ্ধ। মাথায় ছয় ফুটেরও বেশী, কালো কষকষে গায়ের রঙ, দেহের চামড়া শিথিল হইয়াছে, কোঁচকানো চামড়ায় শীতের খড়ি পড়ার ছাপ এখনও সব উঠে নাই, কিন্তু এককালের জমাট বাঁধা হাতের গুল—বুকের অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পেশীযুগল বা কপাট-জোড়াটা ঠিক আছে। এত বড় কালো মানুষটার মাথায় চকচকে টাক ঘিরিয়া ধবধবে পাকা কোঁকড়ানো চুল, মুখে একজোড়া পাকা পাক-দেওয়া সুচালো বাহারে গোঁফ! ঘরের উঠানে আসিয়া গলার সাড়া দিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কোচ-হীন সাড়া এবং বেশ ভারিক্কী চালের জোরালো সাড়া!

সেদিন রবিবার। অরুণা চিঠি লিখিতেছিল জয়াকে। অকপটে খুলিয়া আপনার কথা জানাইতেছিল। এমন সময় গলার সাড়ায় সে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কে ?

জবাব আসিল—টুকচা বাইরে আসেন তো, মা ঠাকরণ!

—কে ? প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া অরুণা বাহিরে আসিয়া মানুষটিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। লোকটিও অসঙ্কোচে অরুণার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিনিট খানেক চাহিয়া রহিল, তারপর ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিল—চরণের ধূলো লোব আমি। অরুণা সাবধান হইবার পূর্ব্বেই অসঙ্কোচে হাত বাড়াইয়া সে অরুণার পায়ের আঙুল ছুঁইয়া মুখে মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—আপনাকেই দেখতে এসেছিলাম মা! তা'—তা' হ্যাঁ—সাথক হ'ল নয়ন!

অরুণা ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। সন্দেহ হইতেছিল—এ বোধ করি জংসনের উকীল মোক্তার ডাক্তারদের পক্ষের ইঙ্গিতে পরিচালিত—কোন বিচিত্র কুটীল পরিহাস। সে একটু কঠিন স্বরে বলিল—তুমি কে ? আমাকে দেখে তোমার নয়ন সার্থক হল, তার মানে ?

—মানে আবার কি ? শুনলাম—আপনার কথা, শুনে মন বললে—দেখে আসি ঠাকরুণকে ;—আমাদের ঠাকুর মশায়ের লাত বউ, বিশু দাদা ঠাকুরের বউ—দেখে আসি। দেখে যদি নয়ন সার্থক হয় তো পেন্নাম করে চরণের ধূলো মাথায় নিয়ে ফিরে আসব, না হয় তো মুখে মুখে বলে আসব। আমি রামভল্লা—আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ লয়। মাণিকে মাণিক চেনে, আমার পাপের অন্ত নাই, পাপ থাকলে আমার চোখে ছাপি থাকবে না। তা—তুমি মা—পবিত্ত! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পয্যন্ত ঝলমল করছ তুমি। নয়ন আমার সাথক হল!

বুড়ার কথায় বিস্ময়কর জোর, যেমন জোরালো গলার স্বর—তেমনি জোর দিয়া কথা উচ্চারণ করে, তেমনি হাত মাথা নাড়ে জোরে-জোরে!

অরুণা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, সন্দেহের অবকাশ নাই, প্রতিবাদ করিবারও কিছু নাই, তাহার অন্তরের পবিত্রতা—এ সত্য প্রশংসাতে বিনয়ে কুণ্ঠিত হইল না—

তপস্বীর মত দেবতার নিকট বরের মতই অসঙ্কোচে গ্রহণ করিল ;—কোন কিছু বলিবার না-পাইয়া—লোকটির নামটিই প্রশ্নের সুরে উচ্চারণ করিল।

—রামভল্লা ? নামটা যেন পরিচিত। শুনিয়াছে সে। কাহার কাছে ঠিক মনে পড়িতেছে না—হয়তো বা স্বামীর কাছে, হয়তো দেবুর কাছে— হয়তো স্বর্ণের কাছে।

রামভল্লা বিস্মিত হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য—তাহার নাম শুনে-নাই ঠাকরুণ ? সে বলিল—এ্যাই দেখেন ? রামভল্লার নাম শোনেন নাই ? ডাকাত রামভল্লা! বিশুদাদা বলতেন—রামচন্দ্র নয়—তুমি রামদাস। হনুমান বীর! আপনি তো মা—শ্বশুরের ভিটেতে থাক নাই, আর এসেছ ক'দিনই বা হল ? বুড়ো হয়েছি, ছ' বছর কালাপানি ঘুরে এই দিন পনের ঘর ফিরেছি। লইলে—শুনতে পেতে—রেতে রামের আবা-বা-বা শুনতে পেতে!

—অ! তুমিই রামভল্লা! সবিস্ময়ে সস্নেহে অরুণা মুহূর্তে যেন কতদিনের জানা মানুষ হইয়া গেল, যেন এতকাল তাহাকে জানিবার জন্য দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল সে।

—হাঁ আমিই সেই রামভল্লা। রাম হাসিল।—বিশুদাদা বলত—রামদাদা। হঠাৎ সে বিষণ্ণ হইয়া গেল—একমুহূর্তে অত্যন্ত সহজে—অতি স্বাভাবিকভাবে— ; সমুদ্রে যেন সূর্য্য ডুবিয়া গেল, লাল-ছটা-বাজা নীল জল—কালো হইয়া গেল। বলিল—বিশুদাদা আমাদের সোনার মানুষ ছিল গো! মহাগ্রামের ঠাকুরবংশ—সাক্ষাত আগুনের বংশ ; হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে তার আশ্চয্যি কি—ছটার দিকে চোখ চেয়ে কথা বলা যেত না। সেই বংশের ছেলে—তাপ নাই—চোখ জুড়িয়ে যায়—বুক জুড়িয়ে যায়! হ্যাঁ—আর গড়ে গিয়েছিল—দেবুকে! ভাল ছেলে। মরদ! তিনুদাদার মেয়ে স্বন্ন মা আমাদের—তাকে সে বিয়ে ক'রে সংসার পেতেছে—লেখাপড়া শিখিয়েছে—আচ্ছা কাজ করেছে!

অরুণা হাসিল। ভারী ভাল লাগিল মানুষটিকে। অপরূপ সহজ ছন্দের সোজা মানুষ, তেমনি সরল বিচারের প্রসন্ন ভাল লাগা। স্বর্ণ এবং অরুণা এবং দেবুকে—একই দৃষ্টিতে ভাল লাগিয়াছে তাহার, এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেল।

অরুণা বলিল :—স্বর্ণের সঙ্গে দেবুবাবুর সঙ্গে দেখা করেছ ? এই তো—ওই পাশে থাকেন ওঁরা!

—করব—করব দেখা। যাব। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দেখা করব মনে করি—কিন্তু একটুকুন—কিন্তু লাগে। বুঝেছ না মা—! এমনভাবে সে ম্লান হাসিয়া অরুণার মুখের দিকে চাহিল যে—অরুণা যেন সবই জানে—সবই তো বুঝিতেছে! বেশী বলিয়া কি হইবে!

—তা' আজ দেখা করেই আসি! কুয়ের মা—একটি নিবেদন কিন্তু করব তোমার কাছে।

—কি বল ?

—চারটি পেসাদ। আজ চারটি পেসাদ পাব তোমার ঘরে। অঃ—ছবছর ঘ্যাঁট আর তেঁতুল-গোলা খেয়ে জীবের আর সাদ বলে কিছু নাই। বাড়ীতেও কেউ নাই। মাগী মরেছে। বিটীর ঘর অনেক দুর। হাত পুড়িয়ে খাই আর ভাবি—একদিন কারুর ঘরে পেসাদ চেয়ে খেয়ে আসব। না-হয় ত কারুর বাড়ীতে একদিন রেতে—চুরি করে হেনসেলকে হেনসেল খেয়ে চেটে দিয়ে আসব।

বলিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া সারা হইয়া গেল। তারপরই ডাকিল ;—স্বন্ন! মা স্বন্নমণি!

সে বাহির হইয়া গেল। বলিতে বলিতেই গেল—নয়ন সাথক হ'ল মা—স্বন্ন—নয়ন সাথক হল! অন্তরটা জুড়িয়ে গেল! ক্রমশঃ

ক্যানসার রোগ দুরারোগ্য নয়

ডক্টর শ্রীসুবোধ মিত্র

বি-বি-সির তরফ থেকে আমাকে অনুরোধ করা হ'ল বিলেত, আমেরিকা এবং জার্মানীতে ক্যানসার রোগের কি রকম চিকিৎসা হয়—সে সম্বন্ধে ৫ মিনিটে সোজা ভাষায় সরল ভাবে আপনাদের কাছে কিছু বলতে হবে। যে ক্যানসার নিয়ে এদেশের হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক কোটী কোটী টাকা খরচ করে বহু বৎসর ধরে গবেষণা করে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে যদি ৫ মিনিটের ভেতর আপনাদের সঠিক খবর দিতে না পারি, আশা করি আপনারা আমার অক্ষমতা মার্জনা কোরবেন। ক্যানসার রোগের কথা আপনারা সকলেই কিছু না কিছু শুনেছেন, কিন্তু এর সত্যিকার রূপ যে কি সে সম্বন্ধে আপনাদের একটু বলতে চাই। ক্যানসার হ'চ্ছে এক রকম মারাত্মক টিউমার জাতীয় রোগ। সে জিনিষটা প্রথমতঃ ছোট একটা আবের মত দেখা দেয়, অথবা ছোট একটা ঘা থেকে সুরু হয়। একবার সুরু হলে ক্রমেই বাড়তে থাকে—এক মুহূর্ত্তও বিরাম নেই—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না রোগীর শেষ নিশ্বাস বন্ধ হয়। ক্যানসার রোগ যখন আরম্ভ হয় তখন রোগীর বিশেষ কোনো কষ্ট থাকে না, তাই বেশীর ভাগ সময়েই এই রোগ গোড়ার দিকে ধরা পড়ে না—এমন কি সাধারণ চিকিৎসকেরাও বুঝতে পারেন না। ক্যানসার রোগ যখন বেশ খানিকটা বেড়ে যায়, তখন রোগের যন্ত্রণা এত বেশী হয় যে চাক্ষুষ না দেখলে ধারণা করা যায় না; ভাষায় সে যন্ত্রণা ব্যক্ত করা অসম্ভব। গোড়ার দিকে ক্যানসার ধরা পড়লে এবং ঠিকমত চিকিৎসা করালে বেশীর ভাগ ক্যানসার রোগ নিশ্চিত ভাল হয়। তাই এদেশে, (বিলাতে) বিশেষতঃ আমেরিকায়, সারা দেশ-জুড়ে এরা অতি সরল ভাষায় প্রচার করছেন কী করে ক্যান-সার রোগ অতি সুরু থেকেই ধরা পড়ে। খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা, হাণ্ডবিল, সিনেমা এবং বেতারের সাহায্যে এরা প্রতিজনকে জানিয়ে দিচ্ছেন—শরীরের কি ব্যতিক্রম ঘটলে ক্যানসার বলে সন্দেহ হবে এবং সন্দেহ হ'লেই সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা এই রোগ ঠিক ভাবে নির্ণয় করা হয়—তার ব্যবস্থাও করেছেন। সারা দেশ জুড়ে এত বেশী ডিস্‌পেনসারী আছে যে যত দূর দেশই হোক না কেন—যে কোন জায়গার যে কোনো লোক অতি অল্প সময়ে নিজকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। এতে দুটি বিশিষ্ট রকমের উপকার হয়; যেমন, যদি ক্যানসার সুরু হ'য়ে থাকে তাহ'লে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ হয়, আর যদি ক্যানসার না হ'য়ে থাকে তাহ'লে লোকেরা নিশ্চিন্ত হন যে, এই মারাত্মক রোগ তাদের হয় নাই।

ক্যানসার রোগ সাধারণত একটু বেশী বয়সেই দেখা দেয়। মেয়েদের ৩৫ কিম্বা ৪০ বছরের পর যদি অকারণ এবং অনিয়মিত ভাবে রক্তস্রাব হয় তাহ'লে জরায়ুর ক্যানসার বলে সন্দেহ কত্তে হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে বলছেন যে এ ক্যানসার নয়—ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হবেন না। বিশ বছর আগেও এদেশের লোকেরা এই জিনিষটাকে খুব জরুরী বলে বিবেচনা কর্ত্তেন না, কিন্তু ক্রমাগত প্রচারের ফলে আজ এরা সতর্ক হয়ে উঠেছেন এবং অসুখের সুরু থেকেই ডাক্তারের নিকট যাওয়াতে বহু ক্যানসার রোগী আরোগ্যলাভ করছেন। ক্যানসার বেশী দিনের হ'লে বা বেশী বেড়ে গেলে ভাল করা মুস্‌কিল হয়। অনেক সময় ভাল হয় না, তাই এদেশে খুব বিশেষ রকম সাড়া পড়ে গেছে কি করে ক্যানসারের প্রথম অবস্থাতেই রোগ নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় মেয়েদের স্তনে আবের মত শক্ত চাকা দেখা দেয়; বহু সময় তাই থেকেই ক্যানসার সুরু হয়। জিবেতে হয়ত একটা ছোট ঘা হ'য়েছে—কোনো কষ্ট নেই অথচ ঘা ভাল হ'চ্ছে না—এ রকম ঘা থাকলে ক্যানসার বলে সন্দেহ কত্তে হবে। গলার স্বর অনেক কারণে ভঙ্গ হতে পারে—সেই ভাঙ্গা স্বর যদি থেকে যায় তাহ'লে ক্যানসার বলে সন্দেহ করতে হবে; সেইরূপ বহুদিনের অজীর্ণ রোগ থাকলে পেটের ক্যানসার হ'তে পারে। এইগুলো হ'চ্ছে মোটামুটি কথা; অবশ্য এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে গলার স্বর ভাঙ্গলে

কিম্বা অজীর্ণ হ'লেই ক্যানসার হল। তবে এই সব উপসর্গ থাকলে একবার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত।

জনসাধারণকে ত' সচেতন হতেই হবে এবং তার সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ ডাক্তারদেরও একটি বিশিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। কোনও কিছু অসুখের জন্যে লোকেরা সর্বপ্রথমে তাদের পারিবারিক ডাক্তারের কাছে আগে যান। ডাক্তার যদি সেই সময় সন্দেহজনক রোগীকে 'ও কিছু না' বলে এক শিশি মামুলি মিকশ্চার দিয়ে বিদায় করেন তাহ'লে তিনি তার কর্ত্তব্য করলেন না। যতক্ষণ না পর্য্যন্ত তিনি নিঃসন্দেহ হন যে এই রোগীর ক্যানসার হয় নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাকে বিশেষ ভাবে এই রোগীর পরীক্ষা করতে হবে এবং দরকার হ'লে বিশেষজ্ঞের মত নিতে হবে। এই দায়িত্ব তিনি যদি না নেন, তাহলে হয়ত তাঁরই ঔদাসীন্যে একটি জীবন নষ্ট হতে পারে। সাধারণ লোকে হয়তো কোনো দোষ দেবে না, কিন্তু জবাবদিহি তাকে কোরতেই হবে নিজের বিবেকের কাছে এবং তার চেয়েও যদি কোনো অদৃশ্য বৃহৎ শক্তি থাকে সেই ভগবানের কাছে।

ক্যানসার রোগের চিকিৎসা এদেশে অতি চমৎকার ভাবে হচ্ছে। এ চিকিৎসা কোনো একজন ডাক্তারের দ্বারা সম্ভব হয় না, এর জন্য চাই একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান, যেখানে অস্ত্রোপচার থেকে আরম্ভ করে রেডিয়াম এবং বহুশক্তিসম্পন্ন এক্সরের ব্যবস্থা থাকবে। আমেরিকায়, লণ্ডনে, বার্লিনে, ভিয়েনায়—ঠিক এই রকমই বন্দোবস্ত আছে। কোনও ক্যানসার রোগী এদেশে বিনা চিকিৎসায় মারা যান না।...আমাদের দেশে এ সব সম্ভব হবে কি?

ডক্টর সুবোধ মিত্র যখন গত বৎসর লণ্ডনে ধাত্রী-বিদ্যা কংগ্রেসের তরফ থেকে ক্যানসার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার জন্য আহূত হ'ন, তখন লণ্ডনের বি-বি-সি, (বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন) ডক্টর মিত্রকে আমেরিকা, জার্ম্মানী এবং বিলেতের ক্যানসার চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা কিরূপ সেই বিষয়ে কিছু বলতে অনুরোধ করেন। এই প্রবন্ধটি তারই সারাংশ। (ভাঃ সঃ—)

বৃথা তবে এই স্বাধীনতা

শ্রীনীলরতন দাশ

নব্যযুগের সব্যসাচী ও দধীচির সাধনায়
মূর্চ্ছিতা দেশ জননী জাগিল মুক্তির চেতনায়।
নরকাসুরের রাজ্য ভাঙিয়া পড়িল ধূলির 'পরে,
দুঃশাসনের রক্তচক্ষু নিমীলিত চিরতরে।
কংসের কারা ধ্বংস হয়েছে, টুটে গেছে বন্ধন;
তবু কেন এত দুঃখদৈন্য? তবু কেন ক্রন্দন?
অমারজনীর অবসানে যেই উজলিল চারিধার,—
রঙীন উষার দুয়ারে আবার কেন দেখি আঁধিয়ার?
অন্নপূর্ণা ভারত মাতার ক্ষুধার্ত্ত সন্তান—
পরের দুয়ারে কেন আর করে অন্নের সন্ধান?
নিঃস্বের বেশে কঙ্কালসার বিবস্ত্র নরনারী
বিলাসপুরীর রাজপথে কেন চলে আজো সারি সারি?
হুজুরে মজুরে বিরোধ কেন রে? যন্ত্রশালার কুলি
পেষণচক্রে গুঁড়া হ'য়ে কেন হ'তেছে পথের ধূলি?
প্রেত পিশাচেরা এখনো গোপনে হাসিছে অট্টহাস,
নাগিনীরা আজো চুপে চুপে ফেলে বিষাক্ত নিশ্বাস।
শান্তির নীড় পল্লীকুটীর ভাঙে যে গুণ্ডারাজ,
সম্বলহীন বাস্তুহারারা পথে পথে ফিরে আজ!
এখনো যে কত পল্লীভবন আর্ত্ত অশোকবন—
বন্দিনী সীতা লাঞ্ছিতা সেথা কাঁদিছে অনুক্ষণ!
সমাজের অরি চোরা-কারবারী, মুনাফা-খোরের দল—
লক্ষ লোকের বক্ষ শুষিয়া চক্ষে ঝরায় জল।
ধনিকে বণিকে কাঞ্চন লুটে সঞ্চিত করে টাকা,
বঞ্চিত জন লাঞ্ছিত শুনি' গালভরা বুলি ফাঁকা!
দেবতার তরে স্বর্গে এখনো মজুত হ'তেছে সুধা,
মর্ত্যে মানুষ কণিকা তাহার পায় না মিটাতে ক্ষুধা।
শত শহীদের রক্তের স্রোত, মাতার অশ্রুধারা—
ব্যর্থ কি হ'লো? ধরার ধূলায় হ'লো কি সকলি হারা?

মুক্তির স্বাদ নাহি পায় যদি চির দুর্গতজন,—
বৃথা তবে এই স্বাধীনতা, মিছে উৎসব-আয়োজন!

জন্মশিল্পী শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরী

শ্রীআনন্দকুমার

পেলব পলিমাটিতে গড়া বাংলার শ্রেষ্ঠসম্পদ যেমন তার সাহিত্য শিল্প-সৌকর্য, দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠসম্পদ তেমনি ভারতনাট্যম্। বাংলা সাহিত্যের কথায় যেমন একটা গরিমা ফুটে ওঠে সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে, তেমনি ভারতনাট্যমের জন্যও সর্বভারত গর্ব অনুভব করে থাকে।

অনেকেই মনে করেন, ভারতনাট্যম্ এমনই বিশেষত্বপূর্ণ, এর অনুশীলন এতই আয়াসসাধ্য এবং এ নাট্যের পরিবেশ এমন কন্যা-কুমারীর অঞ্চলঘেষা যে, এ নিয়ে হয়তো গর্ববোধ করা সহজ হতে পারে, কিন্তু ছেলে খেলার সামগ্রী নয়। তীক্ষ্ণ-রসানুভূতি যাদের মধ্যে নেই—তাদের জন্যে এ নয়—অর্থাৎ এ নৃত্যে প্রথমতঃ জন্মশিল্পীরই একমাত্র অধিকার—দ্বিতীয়তঃ এর রস মুষ্টিমেয় রসিকজনেরই প্রাপ্য। কেহ কেহ বলেন—ভারতনাট্যমে নারীরই একচেটিয়া অধিকার। সে নারী আবার যে সে নারী নয়—তাকে হতে হবে, দক্ষিণী-জন্মা, রমনীয় রম্ভা, মেনকা, উর্বশী তিলোত্তমা রূপোগত্রীরা!

এমনি অনেক ধ্যান-ধারণা, ভারতনাট্যম্‌কে কেন্দ্র করে এমনভাবে দেশব্যাপী প্রচারিত ও লোকচিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, উক্ত বক্তব্যগুলি আজ প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছে বল্লে এক বিন্দুও অত্যুক্তি হবে না। ভারতনাট্যম্ যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তারাই স্বীকার করবেন, প্রবাদগুলির ভিত্তি শিথিল নয়—এমন কি একে একেবারে অহেতুকও বলা চলে না।

এই তো সেদিন, মহানগরী কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে ভারতনাট্যমের এক প্রশংসনীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সে নৃত্যানুষ্ঠানের নৃত্যশিল্পী—শ্রীমতী শান্তা। কি তার ভাওবাতানা, কি চমৎকার নিখুত পায়ের কাজ, কি সেই সুন্দরী দেহকে ভাস্কর্যের ছন্দে ভাঙা-গড়ার ছন্দ! সবই আয়াসসাধ্য নিঃসন্দেহ। যে দেখলে সেই বল্লে—মনোরঞ্জক হোক্ বা না হোক্, শ্রীমতী শান্তার সাধনা বটে। কে জানে—কোনো শ্রীমান, তা তিনি যতই সুনিবিড় নিষ্ঠায় দুরূহ সাধনা করুন না কেন, তার পক্ষে কি এ নৃত্যকে সার্থক সৌন্দর্য কলায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? এ প্রশ্ন আরো স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না কি, যখন আমরা যুগযুগান্ত থেকে শুনে আসছি—নৃত্যে উর্বশীর তুলনা। সেই;

"নহ মাতা, নও কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী···
বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি······
হে অনন্তযৌবনা উর্বশী······"

তাইই তো চিরকাল নৃত্যে অধিকার।

তাছাড়া ভারতনাট্যম্ সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই যে দক্ষিণের দেবদাসীদের আরক্তিম ললাটে জয়ের টিকা পরিয়ে এসেছে। আজিও এ নৃত্যের সুরুতে পাদপ্রদীপের সুমুখে সর্বপ্রথমে সেই;—"দেবদাসী গো আমি পূজারিণী" ছন্দ ঝঙ্কারে লাস্যময় দেহালীতে, নারী—তরুণী তন্বী, দীপ জেলে নৃত্যলীলায় রঙ্গমঞ্চকে জাগিয়ে গেল।

এ সকল কাহিনী ছেড়ে দিলেও যুক্তি-আশ্রয়ী মাত্রেই বলবেন;—নৃত্যের ছন্দে স্বভাবতই নারীর অধিকার। একে নারী রূপের বহ্নি—মোহিনী, তায় তারই পদপাতে জাগ্রত হয়ে ওঠে সুপ্ত সুন্দর, তারই দেহে ভাস্কর্য দেদীপ্যময়।

আমরা কিন্তু বলতে চাই নিজিনিস্কির কথায়:···"There can be no real artist who has not characteristic ot both the sexes."······

এই সত্যই সূর্যের মতো ভাস্বর দেখতে পাওয়া যায়, উদয়শঙ্করের মধ্যে এবং এরই অন্যতম নিদর্শন জন্মশিল্পী শ্রীভাস্কর রায়চৌধুরীর মধ্যে।

সেদিন সকালে সংবাদপত্র খুলতেই দেখি, মাদ্রাজের প্রত্যেক সংবাদপত্র রায়চৌধুরীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আগের দিন সন্ধ্যায়, মহানগরীর সাংবাদিকদের সামনে শ্রীমান ভাস্কর রায়চৌধুরী একটি নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করেছেন—(এইটিই তার সর্বপ্রথম জন-মঞ্চাবতরণের প্রারম্ভিক ভূমিকা)—আর ঝুনো লেখক সমালোচক এই নবাগত শিল্পীটিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রাতারাতি প্রসিদ্ধির উচ্চমঞ্চে তুলে ধরেছেন। সমালোচকদের সেই উচ্ছ্বাসময়ী লেখা পড়লে, সত্যিই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়তে হয়। তবু ভাবলাম নৃত্যজগতে এ কোন "বায়রণ।"

কিন্তু প্রশংসায় সাংবাদিক সমালোচকদের এই পঞ্চমুখরতা অত্যুক্তি কি-না, সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে—অনতিকাল পরেই—লেখকের, সমালোচক ও দর্শক উভয়ের দৃষ্টিতে সতর্ক হয়ে, গণমঞ্চে নৃত্যশিল্পী ভাস্করের নৃত্যলীলা প্রত্যক্ষ না করে যেন উপায় ছিল না।

ইতিপূর্বে দক্ষিণের অন্যতম অসাধারণ নৃত্যশিল্পী কথাকলি নৃত্যের—নট সূর্য গোপীনাথের এক নৃত্যানুষ্ঠানে লেখকের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। সে নৃত্য দেখবার পর আলোচ্য আসরে কেবলমাত্র গোপীনাথই নয়, বিশ্ববিখ্যাত উদয়শঙ্কর অমলাশঙ্কর দম্পতির উপস্থিতি দেখেই অনুমান করতে পেরেছিলাম—একটা কিছু দেখতে পাবো। কিন্তু তখনও মনে জাগছিল অনেক কথা। সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সম্পর্কে ঐশ্বর্যশালী অতুলনীয় এই ভারত নাট্যকে······বিশুদ্ধ নাট্য শাস্ত্রানুসারে এর বিকাশ সমৃদ্ধ হবার পর, বর্তমানে এ নাট্য যে স্তরে এসে অহল্যার মত পাষাণত্ব পেয়েছে, সেই পাথর থেকে রস গ্রহণ "গুরুমার্কা" গুণীদের পক্ষেও ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠছে না কি? তাই দেখি;—প্রায়ই ভারতনাট্যম্ অনুষ্ঠানে রসপিপাসু নরনারী, এমন কি রসজ্ঞ মার্গপন্থীও অনেক সময় কয়েক মিনিটের বেশী কাটাতে পারেন না। তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে

নই অভাব ; যা নয়নকে আনন্দ দিতে পারে অফুরন্ত—রসানুভূতিকে াগান দিতে পারে রসের সরোবর, দর্শকজনকে নৃত্য-নৈপুণ্যে এমন বমুগ্ধ করে তুলতে পারে যে অতি চঞ্চল মানুষও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সমগ্র-াগৎলুপ্ত এক সৌন্দর্যলোকের সম্মোহন জালে জড়িয়ে পড়ে। কোথায় স নৃত্যের চরমোৎকর্ষ, যাপারে প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ শিল্পের মতোই অপামর ানসাধারণকে অভিভূত—ম্মোহিত করতে ? কোথায় সই শিল্পী যে বিশুদ্ধ, নিখাদ ৃত্য চর্চ্চায় সাধারণের প্রশংসার উর্দ্ধে উঠেও গুণী নগুণী নির্বিশেষে সকল রনারী শিশুকে নির্বাক নস্তব্ধ রোমাঞ্চিত করে লেবার ক্ষমতা রাখে ?

যেমন—সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট" যখন রূপালী র্দ্দায় প্রতিফলিত হয়—ংরেজী অনভিজ্ঞ অগুণী-ও খন তার থেকে রস-াস্বাদনে বঞ্চিত হয় না। যমন লাক্ষ্ণৌয়ের শ্রেষ্ঠ সুর-শল্পী নিখুঁত হিন্দী সংগীত থন কোন অ-ভাবপ্রবণ হিন্দী -বোঝা দক্ষিণী সাধারণ-ানুষও পথ চলতে চলতে কাথাও শোনে—সে যেমন নারাসে মন্ত্রমুগ্ধ—নিশ্চল য়ে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে ড়ে—কানপাতে বা তা সে, ক তেমনটি। কই এ ক্ষেত্রে ক্ষিণের হিন্দীদ্রোহিতা তো কান প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর লতে পারে না……। অতলে লিয়ে যায় দেখি ; অ-ভাব-বণতা।

তাই মনে হয়, "রেখা-ংগিম" "তরংগিত দেহ সুষমা ভারতনাট্যমে না-থাকার বাধা" । "দেহকে নানা ভাবে ভাস্কর্যের ছাঁচে ভেঙে আর গড়ে দক্ষিণী ৃত্যের পরিকল্পনায় লাবণ্যের অপ্রাধান্য" অথবা "লীলাভাব" কিংবা লালিত্য শূন্যতা" এ নৃত্যনাট্যের জনচিত্ত-বিদায় পটের কিছু কিছু ারণ হলেও সম্পূর্ণ কারণ নয়। এই কারণের চেয়েও, যে বৃহৎ ও বৃহৎ কারণ রয়েছে—সে বোধ হয়, ভারতনাট্যমের অনবদ্য রূপায়ণের জন্যে যে জন্মগত শিল্পী-প্রতিভার প্রয়োজন, যে কঠোর আয়াসসাধ্য অনুশীলনের দুরূহ পর্যায় অতিক্রমে বিশুদ্ধ—নিখাদ রূপায়ণ আরম্ভ করে পূর্ববর্তী শিল্প পূর্ণতাকেও ছাড়িয়ে ওঠার প্রয়োজনীয়তা—সুন্দরকে সুন্দরতর করবার সাধনার অংশ বিশেষ—তারই মর্মান্তিক অভাব।

ভাস্কর রায়চৌধুরীর একটি নৃত্যভংগিমা

কারণ প্রাচীনকে কেবল আঁকড়ে ধরাই শিল্পের যৌবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়—তার দেহে নব নব রক্তের প্রবাহ সঞ্চার করাই শিল্পের মহত্তর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা ও সমৃদ্ধ করার একমাত্র পন্থা। এক্ষেত্রে কথাটা আরো সুস্পষ্ট ও আরো সোজা করে বলা চলে যে, ভারতনাট্যমের যে শিল্পরীতি, যে মার্গীয় শিখর—সেই রীতিকে শুধু আঁকড়ে থাকলেই

আজকের দিনে আর সর্বজনচিত্তে ভারতনাট্যম অভিনব, মনোমোহন হয়ে উঠতে পারে না। আজ এই নাট্যমের (এমন কি অতীত ঐতিহ্যময় সকল নৃত্যশিল্পেরও বটে) ঐতিহ্যময় শিল্পরীতি কেবল পুরাপুরি আয়ত্ত করলেই বা সুপ্রতিষ্ঠিত মার্গ-আহরণ করলেই যথেষ্ট হোলো না—এরও অধিক এর প্রাণবীর্য আজ চাই। আজ একে পুরানো রীতি-পদ্ধতি

নৃত্যকুশলী ভাস্কর রায়চৌধুরী

ছাড়িয়ে নব উৎক্রান্তিতে এত কালের সকল রীতির উর্দ্ধে ও মার্গীয়-শিখর উল্লংঘনে এমন এক উচ্চতর স্থানে ঠাঁই করে নিতে হবে—যা কেবলই আগের কালের জাবর বা সুন্দরের প্রতিবিম্বে প্রতিভাত হবে না, বাস্তবে যথার্থই নতুন এক সৃষ্টিতে নৃত্যশিল্পের হবে নবজন্ম।

এই অভিনব সৃষ্টিই, বস্তুতঃ ভারতনাট্যমের, তথা নৃত্যলোকের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে ভাস্কর রায়চৌধুরীর এক অনবদ্য অবদান। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তর-অনুভূতিতে এ কথাটাই বেশী করে মনে হয়েছে শিল্পী রায়চৌধুরীর নৃত্যানুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখে।

আজকাল ভারতনাট্যম ও কথাকলির পুনরুজ্জীবনের একটা প্রয়াস সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় শিল্পের সার্থক রূপায়নের প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সুপ্ত জাতির নবজাগ্রত সৃষ্টি মানসের বলিষ্ঠতার পুনরুজ্জীবনের উদ্যম অনেকটা পরিস্ফুট হলেও যাকে বলে; "True spirit of the National Art" তার নিখুঁত প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায় না। তাই ভারতনাট্যমের সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক শ্রীকৃষ্ণ আইয়ার ঠিকই বলেছেন :

"While a few well trained artists display high technique, they are found to lack effective presentation and those who are experts in showmanship, deal out flimsy art with little or no technique of the classical type. Very few are the exceptions who combine both to a convincing degree, when in this context, a rare artist with a combination of such desirable features comes up, he easily gets into the hearts of understanding connoisseurs."

এমনি শ'তের মধ্যেও এক বলতে পারি—নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরীকে। নৃত্যানুষ্ঠানে এই শিল্পী জনসমক্ষে এলেই, প্রথমে চোখে পড়ে—শিল্পীর সুন্দর-দেহ যেন কোন অসাধারণ শিল্পীর সৃষ্টি এক ভাস্কর্যবিশেষ। জন্ম থেকেই এ দেহ যেন ভারতনাট্যমের যোগ্যতম অবয়ব নিয়ে বেড়ে উঠেছে। (শিল্পী-পিতা দেশ-বিদেশ বিখ্যাত ভাস্কর্যবিদ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর এ-ও কী এক অনিন্দ্য ভাস্কর্য সৃষ্টি !) কে যেন এ দেহে নৃত্যের কারুকার্য খোদাই করে রেখেছে, অবিনশ্বর বিস্ময়কর সৌন্দর্যের রেখায় রেখায়। আর এ মুখে, এ দেহে নিজিনিস্থি বাণত পূর্বোক্ত প্রকৃত শিল্পীর—নারীর লাবণ্য ও পুরুষের পৌরুষদৃপ্ত-দীপ্তি যেন ঐক্যতানে ছন্দের গরিমায় ব্যঞ্জনাময় !

রায়চৌধুরীর সালারিপু, তিলানা, কৃষ্ণভক্ত নৃত্য ভারতনাট্যমের একাধিক আশ্চর্য বিকাশের চমৎকার ও নিখুত নিদর্শন। যেমন প্রত্যেকটি নৃত্যে নৃত্যশিল্পীর দেহ নানা ছন্দে ভাঙে-গড়ে—ভাস্কর্যের ছাঁচে এক একটি অংগ জীবন্ত হয়ে ওঠে, তালবাটোয়ারার বোলের পদানুবর্তিতা অসম্ভব সুন্দর হয়ে দেখা দেয়—তেমনি অন্তরানুভূতির অভিনয়—ভাওবাতানায় আশ্চর্যজনক সুশ্রী পরিপূর্ণতায় প্রস্ফুটিত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে অতুলনীয় সুদক্ষ শিল্প-রূপায়ন রায়চৌধুরী তার থালা নৃত্যে বিকশিত করে তুলেছেন—দু'হাতে দু'খানা থালাকে তড়িৎ উৎক্ষেপে উর্দ্ধ অধঃ বিঘূর্ণনে, তার সেই অসাধারণ ভারসাম্য ক্ষমতা বাংলা দেশের লুপ্ত-সংস্কৃতির প্রখ্যাত কাঁচা-সরার ওপরে নটী নৃত্যের কাহিনী মনে করিয়েদেয়।

অথচ আগাগোড়া অনুষ্ঠানকে মার্গীয় বিশুদ্ধতা, প্রাচীন ঐতিহ্যসম্পদ কোথাও ক্ষুণ্ণ কিংবা তানকে বিকৃত না করেই, নৃত্যকে রায়চৌধুরী নব-লালিত্যে রূপায়িত করে তোলেন।

নৃত্যশিল্পী রায়চৌধুরীর স্ব-পরিকল্পিত "নাগনৃত্য" যে কোন দর্শককে এমন করে বশীভূত করতে পারে যে, দর্শকের সকল ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে আসতে থাকে নৃত্যের তালে তালে—আস্তে আস্তে সম্মোহনের রোমাঞ্চ-জাল ঘিরে ফেলতে থাকে চারিপার্শ্ব। তারপর চরমসীমায় প্রতিটি চোখই শুধু সুন্দরের অনুভূতিতে আশ্চর্য আনন্দে বিমুগ্ধ—আর সবই যেন বিলুপ্ত! প্রকৃত শিল্পীর অনন্তমণ্ডিত সৃজনীপ্রতিভার সামগ্রিক বিকাশের মহান গৌরীশঙ্কর সম্ভাবনাই এ নাগনৃত্যকে আখ্যা দেব।

নৃত্যের মাধ্যমে নৃত্যশিল্পী নরদেহধারী নাগরাজ রেখাভংগিম তরংগায়িত নাগদেহে নিজেকে রূপায়িত করেন এবং যথা ইচ্ছা বিচিত্র ছন্দভংগিমায় যতিতে-যতিতে, চক্রে-চক্রে, দেহের প্রতিটি অংশ প্রত্যংশকে সুন্দর হতে সুন্দরতর করে অপূর্ব সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টিতে মানুষ মাত্রেরই মুখ দিয়ে যেন, সবিস্ময়ে বলিয়ে ছাড়েন—"এদেহ তো দেহ নয়, এর হাড় কোথায়?...

সত্যি বলতে কি, বিশুদ্ধ সমালোচকের ভাষায় আমরাও দৃঢ়তার সংগে দেশবাসীকে জানাতে পারি:—

"আজকাল খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পীরা রঙ্গমঞ্চে যে শুদ্ধ, বহু খণ্ডিত, খাদ মেশান—মিশ্র প্রজনন সম্ভূত নৃত্যকে "ওরিয়েন্টাল ড্যান্স" বলে চালাচ্ছেন—নৃত্যশিল্পী রায়চৌধুরীর নৃত্যকলা তার থেকে সর্বাংশে পৃথক সত্তাশীল—একটি সত্যিকারের জাতীয় শিল্প।"

শ্রীঅরবিন্দ

জীবনের সর্ব্ব কার্য্য করি' সমাপন,
দেশহিত লোকহিত করিয়া সাধন;—
যশের সুমেরু-শিরে করি' আরোহণ
অস্তমিত অনির্ব্বাণ তারকা যেমন।

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ রাত্রিকালে পণ্ডিচারীস্থ আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। কার্ল মার্কসের মৃত্যুতে তাঁহার সহকর্ম্মী ইন্‌গেলস যাহা বলিয়াছেন, আজ কেবল তাহাই বলিতে ইচ্ছা হয়—চিন্তাশীল জীবিত মণীষীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাঁহার চিন্তার দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট প্রত্যুষে কলিকাতায় পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের গৃহে শ্রীঅরবিন্দ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা ডক্টর কৃষ্ণধন ঘোষ কোন্নগরের ঘোষ পরিবারোদ্ভূত—মাতা স্বর্ণলতা ঋষি রাজনারায়ণ বসুর কন্যা। অরবিন্দ পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। মাত্র ৫ বৎসর বয়সে তিনি দার্জ্জিলিংএ ইংরেজের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া দুই বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং তথায় শিক্ষালাভ করিয়া বরদার গায়কবাড়ের দরবারে চাকরী লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন (১৮৯৩ খৃঃ)

বিদেশী শিক্ষা তাঁহাকে বিদেশী ভাবে দীক্ষিত করিতে পারে নাই। স্বদেশে আসিয়া তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতি তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না—এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। তখন

আশ্রম প্রবেশ দ্বারে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনার্থীর সমাগম

ফটো—শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

বাঙ্গালায়—বঙ্গ বিভাগের প্রতিবাদে জাতীয় জাগরণের তূর্য্যনাদে স্বাধীনতা-সংগ্রাম সূচিত হয় এবং কবি ও শিক্ষক শ্রীঅরবিন্দ সেই সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথে সারথ্য করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের মত—আবির্ভূত হইয়া প্রথমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের কাজ করিয়া, প্রচার-কার্য্যের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, জাতীয়দলের সংবাদপত্র—প্রচারপত্র "বন্দে মাতরম" পত্রে যোগদান করেন। সে কার্য্যে তাঁহার সঙ্গী ও সহকর্ম্মী—বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি যে জাতীয়তার প্রচার করিয়াছিলেন, পথ আবেদন ও নিবেদনের পথ নহে, তাহা ত্যাগের ও সংগ্রামের পথ—তাহা কুসুমাস্তৃত নহে, বিঘ্নকঙ্করকণ্টকিত। তিনি গীতার উপদেশ স্মরণ করিয়া দেশবাসীকে সেই পথে অগ্রসর হইয়া সাফল্যের দ্বারে উপনীত হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমূর্ত্তি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। দেশবাসীকে "বন্দেমাতরম" মন্ত্র বলে সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মা'র জন্য মন্দির রচনা করিয়া সেই মন্দিরের রত্নবেদী ভক্তির গাঙ্গোদকে বিধৌত করিয়া তাহার উপর মা'র প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতে শিখাইয়াছিলেন।
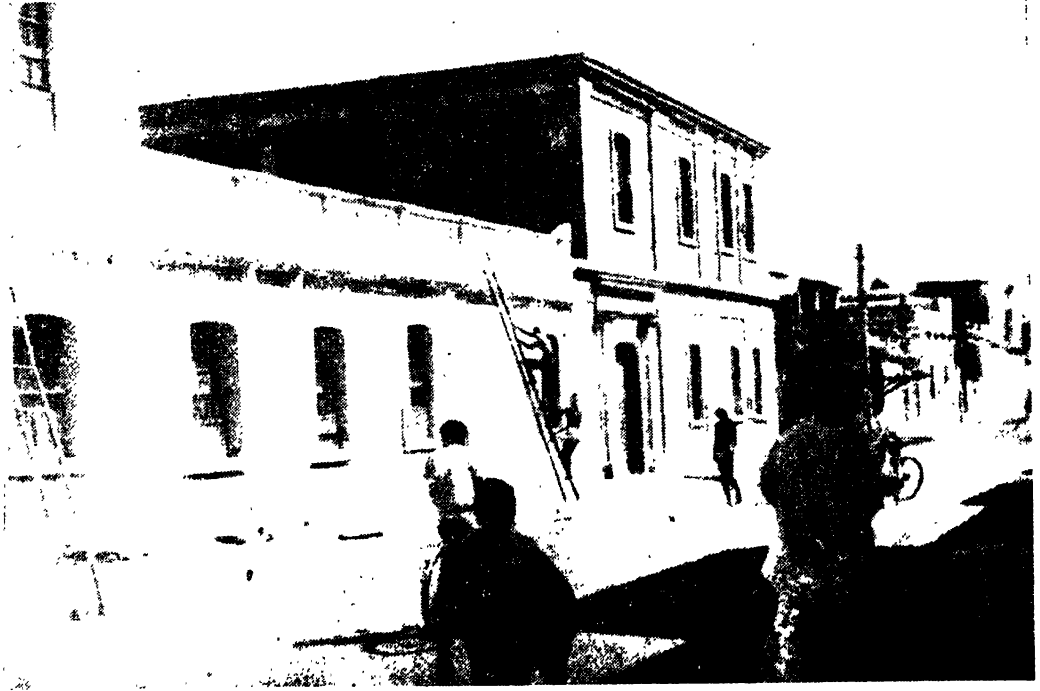
পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম গৃহ

তাহার পাবনী ধারা যে বাঙ্গালার গোমুখীমুখ হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা তিনি বোম্বাই নগরে বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা—মহাদেবের জটাজাল মধ্যে ধৃত গঙ্গার মত—এই ধারা মস্তকে ধারণ করিয়া শান্ত করার পরে যাঁহারা ভগীরথের মত তাহার গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহাদিগের অন্যতম।

তিনি তাঁহার রচনায় যে পথ দেখাইয়াছিলেন, সে

সাংবাদিক জীবনে তিনি একবার (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে) রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার অব্যাহতিলাভ ঘটে। তখন দেশে যে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছিল, তিনি তাহার নেতৃগণের সঙ্গে সম্মিলিত হ'ন; তিলক, লাজপত রায়, চিদাম্বরম পিলাই প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ আরম্ভ হয়।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে আবেদন-নিবেদন-পন্থী-

মহানিদ্রায় মহাযোগী শ্রীঅরবিন্দ

দিগের সহিত মতভেদে আংশিকরূপ জয়লাভ করিয়া জাতীয় দল সুরাটে (১৯০৭ খৃঃ) কংগ্রেসের অধিবেশনে জয়লাভের চেষ্টা করিলে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। তখন অরবিন্দের কার্য্য সপ্রকাশ হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার অর্ঘ্যলাভ করেন'—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

তাহার অল্পদিন পরে—মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম কর্ত্তৃক বোমা নিক্ষেপের অব্যবহিত পরে—বোমার বাগানের আবিষ্কার-ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে অরবিন্দকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়। আয়ার্লণ্ডে পুলিস যেমন ভাবে পার্ণেলের মাতার শয্যাকক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনই পুলিস তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

মামলা চলিতে থাকে—চিত্তরঞ্জন দাশ আর সকল কাজ ত্যাগ করিয়া বন্ধু শ্রীঅরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল এসেসাররা শ্রীঅরবিন্দকে "নিরপরাধ" বলিয়া মত প্রকাশ করায়—প্রায় এক মাস পরে বিচারক বীচক্রফট তাঁহাকে মুক্তিদান করেন।

মুক্তি লাভের পরে তিনি আবার জাতীয় দল গঠনের জন্য ইংরেজীতে 'কর্ম্মযোগিন্' ও বাঙ্গলায় 'ধর্ম্ম' সাপ্তাহিক পত্রদ্বয় প্রকাশ করেন।

কিন্তু আলীপুর কারাগারে তাঁহার মনে নূতন আলোকশিখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় ভাব—ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি সেই ভাবের পরিপুষ্টি সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এদিকে ইংরেজ সরকার তাঁহাকে দণ্ডদানের জন্য কোন উপায়ই অন্যায় নহে মনে করিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ সহসা কলিকাতা ত্যাগ করেন। কিছুদিন

বন্দেমাতরম্-সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ

চন্দননগরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পরে তিনি—গোপনে—কলিকাতার পথে ফরাসী জাহাজে যাত্রা করিয় মাদ্রাজে পণ্ডিচারীতে উপনীত হ'ন।

তিনি তথায় আশ্রম রচনা করিয়া পৃথিবীর ত্রিতাপতপ্ত মানবের জন্য আধ্যাত্মিক উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন

বাঙ্গালায় তাঁহার পত্নী মৃণালিনীর মৃত্যু হয়। শ্রীঅরবিন্দ আর বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই।

কবি শ্রীঅরবিন্দ, রাজনীতিক শ্রীঅরবিন্দ—তাঁহার পূর্ব্ব-গৃহীত কার্য্য জীর্ণ বাসের মত বর্জ্জন করিয়া নূতন রূপে দেখা দিলেন—সমগ্র সভ্য জগৎ তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া আত্মোপলব্ধির পথে প্রকৃত উন্নতির সন্ধান লাভ করিতে ব্যস্ত হইল।

To Saroj with blessings Sri Aurobindo

শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রীঅরবিন্দের হস্তলিখিত আশীর্বাণী

গীতায় শেষে সঞ্জয়ের যে উক্তি তাহাই তিনি তাঁহার উপদেশে মানুষের অবলম্ব্য নীতি বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন :—

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রী বিজয়ো ভূতি ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম॥"

তিনি মানুষকে কর্ম্মযোগী হইতে বলিয়াছেন—

"কুরুক্ষেত্রে সারথী শ্রীকৃষ্ণ যে ধ্বংসের ক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথ চালিত করেন, তাহাই কর্ম্মযোগের প্রতীক। কারণ, মানুষের দেহই রথ এবং তাহার বৃত্তিচয় রথের অশ্ব। পৃথিবীর রক্ত-সিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত পথেই শ্রীকৃষ্ণ মানবের আত্মাকে বৈকুণ্ঠে পরিচালিত করেন।"

শ্রীঅরবিন্দের যৌবনের সাধনা—ভারতের স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠা। সে সাধনার সিদ্ধিফল তাঁহারই প্রদর্শিত পথে হইয়াছে—তাহারই প্রতীক সুভাষচন্দ্র। কারণ, শ্রীঅরবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—ভগবানই যুদ্ধ, বর্ম্ম, তরবার, ধনুক প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সে সাধনার লক্ষ্য ছিল—"ভারত, স্বাধীন ও অখণ্ড—ইহাই আমাদিগের স্বপ্ন—মুক্তি আমাদিগের কাম্য।"

তাঁহার দ্বিতীয় সাধনা—

"আমাদিগের উদ্দেশ্য—আমাদিগের দাবী—আমরা জাতি হিসাবে বিনষ্ট হইব না—জীবিত থাকিব।"

জাতির সঙ্কটকালে চিত্তরঞ্জন, গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা আহুত হইয়াও তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। তিনি তাঁহার সাধনার দ্বিতীয় অংশের সিদ্ধির কি করিয়াছেন, তাহা কে বলিবে?

অনাগরিক ধর্ম্মপাল

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

বিলাস-ব্যসন-দুষ্ট ঝঞ্ঝা ধর্ম্ম প্রায় অবলুপ্ত,
ভ্রম-কুহেলিকা-মোহ ঘুম ঘোরে সঙ্ঘ মৌন সুপ্ত
বুদ্ধ আদেশে লঙ্কা-মাতার নাশিতে তন্দ্রাজাল
প্রজ্ঞা দীপের আলোক জ্বালিলে ধন্য ধর্ম্মপাল।

প্রাণ-পাত-শ্রমে সিংহল ভারতে জাগাইতে ম্লান ধর্ম্ম
বুদ্ধ-চরণে সঁপে দিলে বীর মহান্ শুদ্ধি কর্ম্ম,
মহাবোধি-শিখা দেশ-দেশান্তে জ্বলিবে দীর্ঘকাল
জ্ঞানের প্রদীপ নিজ হাতে জ্বালা অনাগর ধর্ম্মপাল।

বোধিদ্রুমতল আঁধার মলিন বিষণ্ণ ভারতবর্ষ
কোথা সম্বোধি অশোকের বিধি নাহি যে বিমল হর্ষ।
পুণ্য গয়াধাম ঘন-মেঘ-ঘেরা কুহেলিকা সুবিশাল,
মুক্ত করিতে নিবেদিলে প্রাণ-অর্ঘ্য ধর্ম্মপাল।

পর-সেবাব্রতী মহাপ্রাণ তুমি হে অনঘ অনাগার,
হিংসা-দ্বেষ কুটিল দ্বন্দ্ব সুপ্তির নিলে ভার।
সঙ্ঘ-সেবা, দশের সেবায় বিমুখ ছিলে না কভু,
নির্বাণ-পথের পাথেয় লভিলে সেবিয়া বুদ্ধ প্রভু।

সতেরো

ভুতুড়ে তালগাছগুলোর মাথার ওপরে কালো হয়ে এল ছাই রঙের আকাশ। কবরের ঝুরো মাটির ওপর শেষবার কোদালের উল্‌টো পিঠে ঘা দিয়ে মানুষগুলো সরে এল পেছনে। ওপরে সন্ধ্যা নামবার আগেই ওখানে ঘনিয়ে রইল বুক-চাপা অন্ধকার। এখানে রাত আসবে, রাত শেষ হয়ে যাবে; সূর্যমুখী আর চন্দ্রমল্লিকার মালা গাঁথবে দিন রাত্রি। অন্ধকার কবরের নিরন্ধ্র রাত জমাট হয়ে থাকবে, নড়বে না, সরবে না, একটি জোনাকি চমকে উঠবে না—শুধু মৃত্যুর গন্ধ দিনের পর দিন কটুস্বাদ হয়ে অপেক্ষা করবে—যতদিন না কোনো উল্‌কা-ধারা নিশি-পাওয়া প্রহরে শেয়ালের লুব্ধতা মাটি খুঁড়তে থাকবে পচা মাংসের আকর্ষণে।

—মাস্টার সাহেব, যাবেন না?—এলাহী বক্স কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল।

—কোথায়?—অন্যমনস্ক জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন। তাঁর দৃষ্টি তালবনের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে আছে বিলের জলে। আশ্চর্য রঙ জলটার। কালোর সঙ্গে লালের শেষ প্রতিবিম্ব দুলছে—যেন চাপ বেঁধে আসছে একরাশ রক্ত। একজোড়া উড়ন্ত চখা-চখীর পাখার শব্দ ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগল—মনে হল কোথায় একটা বিরাট হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে আসছে আস্তে আস্তে।

—কেন, ঘরে?—এলাহী আশ্চর্য হল।

—থাক, আর একটু বসি।

—এই গোরস্থানে?—এবার যেন বিব্রত বোধ করল এলাহী: রাত নামছে যে!

—নামুক। তোমরা যাও।

—একা বসে থাকবেন এখানে?

—ভয় করবে ভাবছ?—আবছা তিক্ত হাসি ফুটল মাস্টারের মুখে: মড়াকে আমার ভয় নেই।

সদল-বলে তবু দাঁড়িয়ে রইল এলাহী। কী করবে মনস্থির করে উঠতে পারছে না যেন।

মাস্টার এবার স্পষ্ট বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

—বলছি তোমরা চলে যাও, তবু দাঁড়িয়ে আছ কেন সব? আমি একটু একাই থাকব।

ওরা চলে গেল। ভালোই হয়েছে—বেঁচেছে মেয়েটা। নিস্তার পেল আজীবন বিষের জ্বালায় পুড়ে মরার হাত থেকে—বীভৎস বিকৃতাঙ্গ হয়ে টিঁকে রইল না লোকের ঘৃণা আর অনুকম্পা কুড়িয়ে। আলিমুদ্দিন অবশ্য তাঁর সামান্য বিদ্যে নিয়ে যথাসাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে মরাটাই ওর দরকার ছিল—নিজের দিক থেকে, এলাহীর দিক থেকেও।

তবু তুষের তাওয়ার মতো জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরে। এই মেয়েটার মৃত্যুর জন্যে নয়। চোখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন: শাহু বসে আছেন সারা সমাজটার একেবারে মাথার ওপরে; ইচ্ছে হলে যে কোনো লোককে ধরে তিনি 'বাইশ বাজারে পয়জারের' ব্যবস্থা করতে পারেন; কথায় কথায় মাপা সাত হাত নাকে খত দেওয়াতে পারেন তাঁর কাছারীর সামনে; নালিশ দিয়ে প্রজা তুলতে পারেন, বে-দখল করতে পারেন লাঠির ঘায়ে। আর নিজের বিষাক্ত কামনার জ্বালে—

তবু ফতে শা পাঠান আজ দেশের নেতা। আজাদীর যে নতুন স্বপ্ন নিয়ে মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে লীগের ঝাণ্ডার তলায়, সেই ভাবী পাকিস্তানের ওপরেও তিনি নিজের আসন কায়েম করতে চান! অসম্ভব—এ হতে দেওয়া যাবে না! সারা জীবন লড়াই করে এসেছেন—আজ আপোষ করতে রাজী নন মিথ্যার সঙ্গে।

এর মধ্যেই অনেক খবর কানে এসেছে। সেদিনের সেই জমায়েতের পর কাণ্ড গড়িয়েছে অনেক দূর অবধি। ইমাম সাহেব চটে আগুন হয়ে গেছেন, উস্‌কানি

দিচ্ছেন জমাদার, শাহ তাঁকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে আঁটছেন ফন্দি-ফিকির। ইস্‌মাইল বলে বেড়াচ্ছে, লোকটা কাফের। মুখে লীগের বুলি আওড়ালে কী হয়, তলে তলে মাস্টারের সাঁট আছে হিন্দুদের সঙ্গে।

এ হবেই—জানতেন আলিমুদ্দিন। সত্যের জন্য অনেকখানি দাম দিতে হয়। দিয়েছেন হজরত স্বয়ং—দিয়েছেন আবু বকর, দিয়েছেন আরো অনেকেই। তা নয়। তাঁর দুঃখ হয় ইস্‌মাইলের জন্যে। ধারালো তলোয়ারের মতো ছেলে; অফুরন্ত—উৎসাহ—অক্লান্ত উদ্যম—পাকিস্তানের জঙ্গী নও-জোয়ান। আজ এই সব ছেলেরাও এদের ফাঁদে পা দিচ্ছে—বুকের রক্ত দিয়ে গড়ে দিচ্ছে শয়তানের মসনদ!

গোরস্থানের ওপর সন্ধ্যা ঘনাতে লাগল। বাতাসের থর্‌ থর্‌ শব্দ উঠছে তালগাছের পাতায়। ভাঙা ভাঙা কবরগুলোর ওপর থেকে বাঁশের খুঁটি উঁকি দিচ্ছে ঝাপসা বিষণ্ণতায়; পচা কাফনের টুকরোর মতো অস্বচ্ছ অন্ধকারে অস্বাভাবিক শাদা হয়ে আছে ইতস্ততঃ কয়েকটি করোটি এবং কয়েকখানা হাড়; হাওয়ার মুখে থেকে থেকে কেমন একটা চিম্‌সে গন্ধের চমক।

একটু দূরে মাটি থেকে খানিক ওপরে এক ঝলক আগুন যেন ঝলমল করে উঠল হঠাৎ। মুহূর্তের জন্যে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন আলিমুদ্দিন, পরক্ষণেই দেখতে পেলেন ধূসর ছায়া দিয়ে গড়া একটা দেহরেখা। শেয়াল—হাই তুলল। আলিমুদ্দিন আরো দেখলেন চকচকে নতুন টাকার মতো তার দুটি ধারালো চোখ এক দৃষ্টিতে তাঁকেই পর্যবেক্ষণ করছে।

নতুন কবর খোঁড়া হচ্ছে—লক্ষ্য করেছিল নিশ্চয়ই। তাই সন্ধ্যার ছায়া নামতেই এসে হাজির হয়েছে খাদ্যের সন্ধানে। কিন্তু তাঁকে দেখে থমকে গেছে। তিনি সত্যিই লোকালয়ের শরীরী জীব, না এই কবরখানায় সারা রাত যে অশরীরীরা ছায়া হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—তাঁদেরই কেউ, এইটেই যেন বুঝে নিতে চাইছে ভালো করে।

—শালা বদ্‌মাস—

একটা অর্থহীন ক্রোধে মন ভরে উঠল আলিমুদ্দিনের। মাটি থেকে একটা ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন শেয়ালটাকে লক্ষ্য করে। দ্রুত গতিতে সেটা একটা ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলিমুদ্দিন বিড়ি ধরালেন।

না—এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না। করতেই হবে একটা কিছু। ফাঁকির বনিয়াদের ওপর কোনো সত্য গড়ে উঠবে না। চোরাবালির ওপর দাঁড় করাতে গেলে সব কিছু ধ্বসে পড়বেই একদিন—কেউ রক্ষা করতে পারবে না তাকে।

কাজ—অনেক কাজ। আগে যাচাই করে নিতে হবে আজাদীর অর্থ—জেনে নিতে হবে কাদের জন্যে সে আজাদী। ঘন শ্যামল দিগ্‌দিগন্তের ওপর ওই যে নদীর রূপোলি রেখায় আঁকা চন্দ্রচিহ্ন—এই মাটিতে সত্যিকারের স্বাধীন মানুষ হয়ে ঘুরে বেড়াবে কারা।

আর তা যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ খাওয়াদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নেবে শাহর পাইকের দল। ভিটের মাটি কামড়ে পরে মৃত্যুর প্রহর গুণবে মানুষ। পারার ঘায়ের বিষাক্ত যন্ত্রণায় জ্বলে যাবে এলাহী বকেসর বেটিরা। আর তাদের কবরের ওপর ঘিরে ঘিরে নামবে এমনি কটুগন্ধা রাত্রি—পচা মাংসের সন্ধানে ঘুরতে থাকবে শেয়ালের জ্বলন্ত চোখ!

ভুতুড়ে তালগাছগুলোর শুকনো পাতায় পাতায় অপমৃত্যুর খড়্গধ্বনি বেজে উঠল। হঠাৎ খসা একটা উল্কার অগ্নিরেখা শিউরে গেল বিলের কালো জলের ওপর দিয়ে।

—আদাব মাস্টার সাহেব!

হোসেন। কালু বাদিয়ার সেই দুর্বিনীত ছেলেটা।

—এই সকালেই কী মনে করে রে?—এই সাত সকালেই হোসেনকে দেখে কিছু বিস্ময়বোধ করলেন মাস্টার।

—সেদিনকার জমায়েতে আপনার কথাগুলো শুনেছি মাস্টার সাহেব। খুব ভালো কথা। কিন্তু ওগুলো না বললেই ভালো করতেন।

একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ল হোসেন।

আলিমুদ্দিনের মুখের পেসীগুলো শক্ত হয়ে উঠল।

—যা হক, তাই বলেছি।

—কিন্তু হক কথা শাহু শুনতে চায় না। ইমাম সাহেব না, থানার জমাদার বদরুদ্দিন মিঞাও না, এস্তাজ আলী ব্যাপারীও না।

—তা জানি।—আলিমুদ্দিন স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন হোসেনের দিকে: কিন্তু তোমরা?

—আমরা?—হোসেনের চোখ হঠাৎ চক চক করে উঠল: সেই জন্যেই তো আপনাকে সালাম করতে এলাম মাস্টার সাহেব।

হঠাৎ পিঠ সোজা করে উঠে বসলেন মাস্টার। অস্বস্তির শূন্যতায় বিশ্বাসের ডাঙ্গা মিলছে একটা। পায়ের নিচে খুঁজে পাচ্ছেন দাঁড়ানোর একটা শক্ত ভিত্তি। আছে—আছে। নতুন দুনিয়া, নতুন আজাদীর রাস্তায় এগিয়ে চলবার সঙ্গী এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে।

—তোমরা আমার সঙ্গে আছ হোসেন?

—আছি মাস্টার সাহেব।—হোসেন হাসল। চক-চকে শাদা দাঁত। আলিমুদ্দিন দেখলেন, কবাটের মতো চওড়া বুক—কাঁধের ওপর থেকে দু বাহু বেয়ে নেমেছে পেশীর কঠিন তরঙ্গ। হাঁ—ঠিক আছে। লোহার মতো শক্ত সোজা মেরুদণ্ড। নুয়ে পড়বে না—ভেঙে যাবেনা।

হোসেন বললে, লাগ আমরা চাই, তার আগে বোঝাপড়াও চাই। দুশমনকে চিনে নিয়ে তবে আমাদের কাজ। মাস্টার সাহেব যখনই ডাকবেন, আমরা হাজির থাকব।

কী বলবেন ভেবে পেলেন না মাস্টার। বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছে যেন। পাকিস্তান। আজাদী। ফতে শা পাঠানের নয়—সারা দেশের ক্ষুধার্ত মানুষের। যাদের জিনিস, তারাই আজ হাত তুলে দাবী জানাতে এসেছে, আর তাঁর ভাবনা নেই।

হোসেন আস্তে আস্তে বললে, কিন্তু একটা কথা বলব সাহেব?

—কী কথা?

—শাহু আপনাকে সহজে ছাড়বে না।

আলিমুদ্দিন হাসলেন: কী করবে?

—কিছুই বলা যায় না—সাক্ষাৎ ইব্লিস্ লোকটা।

আলিমুদ্দিন আবার হাসবেন: ইংরেজ সরকারকে ভয় করিনি— আজ শাহুকেও করব না। সে যাক, একটা কাজ করবে হোসেন?

—বলুন।

—যাওয়ার পথে পারো তো একবার জলিল আর বসির ধাওয়াকে খবর দিয়ো। বলবে, বিকেলে যেন একবার আমার কাছে আসে।

—কিন্তু আমাদের কী কাজ সেতো বললেন না মাস্টার সাহেব?

—সময় হলে এমনি ডেকে পাঠাব।

হোসেন দাঁড়িয়ে উঠল: তাই হবে। কিন্তু একটা কথা বলি মাস্টার সাহেব। আপনি যদি আমাদের হয়ে দাঁড়ান, তবে আপনার গায়েও কাউকে হাত ছোঁয়াতে দেব না।

খুব আস্তে আস্তে বলল কথাটা। কিন্তু এর চাইতে বেশি জোরে বলবার দরকার নেই। জাত বাদিয়ার ছেলে—গায়ে পাঠানের রক্ত। ওরা যখন টালের মধ্যে ডাকাতি করতে যায়, আর গোরুর গাড়ির সোয়ারীকে টুকরো করে কাটে হাঁসুয়া দিয়ে—তখনো নিঃশব্দে কাজ করাই ওদের অভ্যাস।

হোসেন চলে গেল। আলবোলাটা সরিয়ে দিয়ে আলিমুদ্দিন চেয়ে রইলেন জালালী পায়রার চক্র দিয়ে ওড়া পাল বুরুজের দিকে। সোনার রং ধরেছে ধানের মাঠে। কিন্তু ওই ধানের ওপর নামছে শাহুর একটা শক্ত ক্ষুধার্ত মুঠি—কেড়ে নেবে, ছিনিয়ে খাবে মুখের গ্রাস। ওই ধান যারা রুয়েছে, ও তাদের নয়। তাদের জন্যে গোরস্থান—শেয়ালে খোঁড়া গর্তের ভেতর থেকে পচা পচা বাঁশের খুঁটি বেরিয়ে আছে যেখানে, যেখানে তালগাছের শুকনো পাতায় পাতায় বাজছে খড়্গধ্বনি।

তবু হোসেন। হোসেন আছে। আরো আছে—আরো আসবে। ধানের মাঠ ছাড়িয়ে আরো দূরে তাকাতে চাইলেন আলিমুদ্দিন—দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে মেলে দিতে চাইলেন আরো কোনো দিগন্তের দিকে। যেন দেখতে চাইলেন বহুদূর থেকে কারা এগিয়ে আসছে—তাদের মুখ সূর্যের দিকে, তাদের দীর্ঘ ছায়াগুলো পেছনে লুটিয়ে পড়ে আছে!

কিন্তু ঘটনাটা শেষ পর্যন্ত ঘটল দুপুরের পর।

শাহুর ডাক পেয়ে আলিমুদ্দিন যখন মজলিসে গিয়ে পৌছুলেন, তখন থম থম করছে ঘরটা। সমস্ত আবহাওয়া যেন বিস্ফোরক দিয়ে তৈরী, ফেটে পড়তে পারে যে কোনো মুহূর্তেই!

শাহু তাঁর বিছের লেজের মতো গোঁফটাকে টেনে ধরলেন দু হাতে। তারপর বললেন, বসুন মাস্টার সাহেব।

আলিমুদ্দিন চৌকিতে বসলেন। ইমাম সাহেব মুখ ফিরিয়ে নিলেন, জমাদার বদরুদ্দিন হঠাৎ অত্যন্ত মগ্ন হয়ে গেলেন একখণ্ড 'মাসিক মোহম্মদী'র পাতায়। আর ইস্‌মাইলের ঠোঁট দুটো বার কয়েক নড়ে উঠল, যেন কী একটা বলতে গিয়ে অতি কষ্টে সামলে নিলে নিজেকে।

একবার গলা খাঁকারি দিলেন শাহু।

—বলো ইসমাইল—

ইস্‌মাইল মাথা তুলতেই আলিমুদ্দিনের সঙ্গে তার দৃষ্টি মিলল। মাস্টারের নীরব চোখে ইসমাইল কী আবিষ্কার করল সেই জানে, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে শাহুর দিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিলে।

—না চাচা, আপনি বলুন। আপনি বললেই ভালো হয়।

শাহু আবার কিছুক্ষণ পাকিয়ে নিলেন গোঁফটা—যেন প্রস্তুত হয়ে নিলেন অবস্থাটার মুখোমুখি হওয়ার জন্যে। তারপর:

—আপনাকে মাপ চাইতে হবে মাস্টার সাহেব।

—কার কাছে?—শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন মাস্টার, শান্তভাবে হাসলেন।

কেমন থতমত খেয়ে গেলেন ফতে শা।

মানে, কথাটা হচ্ছে এই—নিরুপায়ভাবে ইসমাইলকে একটা খোঁচা দিলেন শাহু: আরে বলেই দাও না। এতক্ষণে ইস্‌মাইল যেন জোর পেয়েছে। ফিকে হয়ে এসেছে অস্বস্তিটা। ইস্‌মাইল বললে, শাহুর কাছে, ইমাম সাহেবের কাছে।

—কেন? তেম্‌নি শান্ত জিজ্ঞাসা মাস্টারের।

—কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে তো চলবেনা। নির্ভীক হয়ে ওঠা ইস্‌মাইলের গলায় এবার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আভাস ফুটে বেরুল: তিন দিন আগেই যা করেছেন, সে কি এত শিগ্‌গির ভুলে যাওয়ার জিনিস?

—তিন দিন আগে এমন কিছু করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না—যে জন্যে আমায় ক্ষমা চাইতে হবে!

বদরুদ্দিন অনুভব করলেন, এইবারে তাঁর কিছু বলা উচিত। আসামীর সামনে উকিল দুর্বল হয়ে পড়ছে, সুতরাং এবার পুলিসের হস্তক্ষেপ দরকার।

বদরুদ্দিন বললেন, আপনি জমায়েতের মধ্যে এঁদের অপমান করেছেন।

কপালের দুপাশ দিয়ে শুধু দুটো শিরা ফুলে ওঠা ছাড়া আর কোনো ভাবান্তর ঘটল না মাস্টারের। নিরুত্তাপ স্বরে শুধু বললেন, না, মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা!—শাহু প্রায় ফরাস ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ইমাম সাহেব ঘুরে বসলেন বিদ্যুৎবেগে।

—হাঁ, মিথ্যে কথা। আমি কাউকে অপমান করিনি।

ইস্‌মাইলের চোখ ঝকঝক করে উঠল ছুরির ডগার মতো।

—ভালোমানুষি করারও একটা সীমা আছে মাস্টার সাহেব। সেদিন দুহাজার লোকের সামনে আপনি যেমন করে এদের অপদস্থ করেছেন, তার সাক্ষীর অভাব হবে না।

—অপদস্থ করেছি মানতে পারি, কিন্তু অপমান করিনি। যা সত্যি তাই বলেছি।

নিজের চারদিকে একটা পাথরের দেওয়াল তুলে দেওয়ার মতো কঠিন স্পষ্ট ভাষায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন মাস্টার।

—মুখ সামলে কথা কইবে তুমি—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রাচীন ইমাম সাহেব। অসহ্য ক্রোধে সমস্ত মুখ তাঁর কালো হয়ে গেছে—যেন এখনি ঝাঁপ দিয়ে পড়বেন মাস্টারের ঘাড়ের ওপর।

বদরুদ্দিন থানার লোক—প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। চট্ করে মাথা গরম করা তাঁর অভ্যাস নয়। ইমাম সাহেবের একখানা হাত তিনি চেপে ধরলেন।

—মিথ্যে রাগ করবেন না মৌলবী সাহেব। সবাই যখন আছি, ব্যবস্থা একটা হবেই।

—হাঁ, ব্যবস্থা একটা হবেই—ক্রোধে ঘন ঘন শ্বাস পড়তে লাগল শাহুর: মাস্টারকে মাপ চাইতেই হবে। ইস্‌মাইল দুটো হাত মুঠো করে ধরল: শুধু মাপ চাইলেই

চলবেনা। জমায়েৎ ডেকে সকলের সামনে কসুর স্বীকার করতে হবে তাঁকে। যে অন্যায় তিনি করেছেন, তাতে শুধু আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট হয়নি, লীগের কাজেরও ক্ষতি হয়েছে!

আলিমুদ্দিন আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

—এসব বাজে কথার কোনো মানে হয় না। যে অন্যায় আমি করিনি, তার জন্যে মাপ চাওয়ার শিক্ষা আমি পাই নি। আচ্ছা আমি তা হলে চলি শাহ্—আদাব!

এতক্ষণ পরে বাজের মতো ফেটে পড়লেন শাহ্! এতক্ষণের সঞ্চিত বিস্ফোরক প্রচণ্ড শব্দে বিদীর্ণ হয়ে পড়ল এইবার!

—মাস্টার, তুমি—

—আমাকে আপনি বলবেন—দোর গোড়া থেকে মাথা ঘুরিয়ে আলিমুদ্দিন জবাব দিলেন।

কথাটা শাহ্ শুনতে পেলেননা। গর্জন করে বললেন, কাল থেকে আমার স্কুলে আর তুমি ঢুকবেনা।

—বেশ!

—আজই আমার ঘর তুমি ছেড়ে দেবে—

—তাই দেব!—আলিমুদ্দিন বললেন, কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আপনার জুতোর চাকর নই। ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলতে চেষ্টা করবেন।

আলিমুদ্দিন বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় তিন মিনিট পরে স্তব্ধ ঘরটার আচ্ছন্নতা ভাঙলেন ইমাম সাহেব।

অসহ্য নিরুপায় ক্রোধে তিক্ততম গলায় উচ্চারণ করলেন: শালা কাফের, শালা হারামীর বাচ্চা!

* * *

এতক্ষণ আকাশে মেঘ জড়ো হচ্ছিল কালো ধোঁয়ার মতো। এইবারে একরাশ ঘন অন্ধকারের মতো তারা স্থির হয়ে দাঁড়ালো। মাত্র কয়েক মিনিটের ছায়া-ভরা স্তব্ধতায় নিশ্চল হয়ে রইল পৃথিবী, তার পর বাইরের আমবাগানটা আচমকা আর্তধ্বনি করে উঠল। রঞ্জন তাকিয়ে দেখল—দূর দিগন্তের ওপর কুয়াসার জাল ঘনিয়ে নিয়ে বল্লমধারী একদল ঘোড়সোয়ার ছুটে আসছে মালিনী নদীর দিকে।

আসছে বৃষ্টি।

এ সেই সর্বনাশা বৃষ্টির পূর্বাভাস নাকি? যে বৃষ্টিতে সমুদ্র গর্জাবে চাকালে চাকালে, হঠাৎ তোড় নামবে মালিনী নদীর জলে—ভেসে একাকার হয়ে যাবে কুমার ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে?

মালিনী নদীর জলটাকে টগবগ করে ফুটিয়ে দিয়ে ছুটন্ত ঘোড়সোয়ারেরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঞ্জনের জানালায়। কয়েকটা কাগজ উড়ে গেল ঘরময়, বিছানার খানিকটা ভিজে গেল বৃষ্টির ছাটে। রঞ্জন জানালাটাকে বন্ধ করে দিলে।

ঘর প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে—সুইচ্ টিপে সে আলো জ্বালালো। কুমার বাহাদুরের ডায়নামোর এই এক সুবিধে—এই পাড়াগাঁয়েও পা ফেলতে পারেনা কালো রাত্রি।

একা ঘরে এমনি সন্ধ্যায় মিতার কথা মনে পড়ে। আরো বিশেষ করে যখন বৃষ্টি নামে: মেঘে মেঘে তড়িৎ শিখার 'ভুজঙ্গ-প্রয়াতে'। রবীন্দ্রনাথের গান: 'বাহির হয়ে এল আমার স্বপ্ন-স্বরূপ'। স্মৃতির ভেতরে কতগুলো ঝরে-যাওয়া ফুলের রঙ ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। সেও একদিন কবিতা লিখত নাকি? সে কতদিন আগে? অনেক রোদের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে কোথায় হারিয়ে গেছে তাদের মুকুন্দপুরের বাড়িটা—বাতাবী-ফুলের গন্ধে-ভরা ছায়াঘন বাগান—ঝুপসী আমগাছে রাঙা টুকটুকে কাঁকরোলের দোলা!

বাইরে মালিনী নদীর জল বর্ষায় উত্তাল হয়ে উঠেছে। নাগিনী পদ্মা কোথায় কত দূরে এখন? তার স্রোত জীবনের কোন্ সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে স্বপ্নে-দেখা সেই মেয়েটিকে—সীতা যার নাম?

থাক—থাক ওসব। 'সময় কই—সময় নষ্ট করবার?' অনেক কাজ। কদিন ধরে প্রচুর খাটনি পড়েছে। নগেন ডাক্তারের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। তূরীরা প্রায় তৈরী—সাঁওতালদের মধ্য থেকে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। যমুনা আহীর এখন নগেনের আশ্রিত—কিছুতেই সে ধরা দেবেনা পুলিশের হাতে। তা ছাড়া সে থাকলে আহীরদের সকলকে পাওয়া যাবে—আর সে

সংগ্রামে হয়তো সেনাপতি হওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে যমুনাকেই!

মোটামুটি সব অবস্থাই অনুকূল। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের মধ্য থেকেই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। শাহুর লোক-লস্কর নিয়ে ইস্‌মাইল পূর্ণ-উদ্যমে নেমে পড়েছে আসরে। গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের ভূমিকা তৈরী চলছে এখন।

তা করুক। জাগুক। আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হোক। অনেক দিন ধরে অর্থ-নৈতিক পেষণ, আর হীনমন্যতার যে পীড়ন ভোগ করেছে, মুক্তিস্নান হোক তার কবল থেকে। কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার নীতিটাই কেমন বিসদৃশ ঠেকে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করুক—কিন্তু সর্বজনীন লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কেন এসে দাঁড়াবেনা পাশাপাশি পা ফেলে? সে তো হিন্দুরও নয় মুসলমানেরও নয়। সকলের দাবী—সকলের পাওনা।

রঞ্জনের পেছনে ঘরের দরজাটা প্রায় নিঃশব্দে খুলে গেল। দেওয়ালের ওপর পড়ল ছায়া। আর সেই ছায়ায় যার দেহের ইঙ্গিত ফুটে উঠল—সে এমনি অস্বাভাবিক আর অপ্রত্যাশিত যে তীব্রবেগে ফিরল রঞ্জন—উঠে দাঁড়ালো সীমাহীন বিস্ময়ের চমকে।

কুমার ভৈরবনারায়ণ স্বয়ং!

—একি আপনি!

কথাটা সে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করল না, তার মনের ভেতর থেকে উঠল একটা নিঃশব্দ চীৎকারের মতো, তাই সে ভালো করে বুঝতে পারল না।

কুমার তাঁর প্রকাণ্ড মুখে একটা বিস্তীর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুললেন। আফিঙের জড়তাভরা জ্যোতিঃহীন চোখে তাকালেন অর্থহীন দৃষ্টিতে। হঠাৎ মনে হল: একটা 'প্রাইজ বুল' যেন লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কোনো গাজর-ক্ষেতের দিকে।

—খুব অবাক হয়ে গেছেন ঠাকুরবাবু?—কুমার বাহাদুর যেন নিজের লীলায় নিজেই কৌতুক বোধ করছেন: দেখতে এলাম কেমন আছেন।

রঞ্জন শুধু বলতে পারল, বসুন।

কুমার সশব্দে একটা চেয়ারে আসন নিলেন।

—কোনো দরকার আছে? তা হলে ডেকে পাঠালেই পারতেন। এত কষ্ট করলেন কেন?—আনুগত্যের বিনয়ে কথাটা বলতে হল রঞ্জনকে। কিন্তু সেই সঙ্গে সে শক্ত হয়ে দাঁড়াল দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ দিয়ে। একটা কিছু ঘটবে। এই বর্ষার রাত্রে তার মতো অধমের ঘরে কুমার সাহেবের পদার্পণটা নিছক একটা কুশল-কৌতূহলই নয়! তাই দেওয়ালের গায়ে যেন একটা অবলম্বন খুঁজে নিচ্ছে—কিছুতেই নিজেকে নুয়ে পড়তে দেবেনা—দুর্বল হতে দেবেনা!

—কখনো কখনো মহম্মদকেও পর্বতের কাছে আসতে হয়—কুমার বললেন: এক তরফা কি চলা উচিত?

বাইরে আমবাগানে সমানে বৃষ্টি আর হাওয়ার শব্দ। তবু কুমার বাহাদুরের কথাগুলো নির্ভুল স্পষ্টতায় শুনতে পেল রঞ্জন। কৌন্তেয় অর্জুন মোহপাশ থেকে মুক্ত হচ্ছেন আস্তে আস্তে। কিন্তু বিশ্বরূপ দর্শনটা করালো কে? পোস্ট-মাস্টার বিভূপদ হাজরা? ডাক্তার পান্নালাল এল-এম-এফ (পি)? না, দারোগা তারণ তলাপাত্র?

—আপনি কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

—বলছিলাম কি ঠাকুরমশাই, হিজলবনীতে স্বাস্থ্যটা বোধ হয় আপনার ভালো থাকছে না।

—কেন, কোনো অসুখ-বিসুখ নেই তো আমার!—রঞ্জন কেমন হতভম্ব হয়ে গেল।

কিন্তু জালটা কেটে দিলেন ভৈরবনারায়ণ নিজেই। গোরুর মতো সুবিশাল মুখে আরো প্রসারিত হচ্ছে হাসিটা। গাজর ক্ষেতের আরো কাছাকাছি এসেছে বোধ হয়।

—লজ্জা করছেন কেন?—কুমার ক্রমশ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন, রঞ্জনের পিঠের পাশ দিয়ে তাকালেন শ্যাওলার চিহ্ন ধরা দেওয়ালের দিকে: শরীর ভালো থাকলে কি আর এমন করে হাওয়া বদলাবার জন্যে আপনাকে ছুটতে হয় জয়গড় মহলে, আর কালা-পুখ্‌রিতে?

মুহূর্তে শ্রদ্ধায় রঞ্জনের মন ভরে উঠল কুমার বাহাদুরের ওপর। সত্যিই অবিচার হয়েছে। আফিং খেয়ে ভৈরবনারায়ণ ঝিমোতে থাকেন বটে, কিন্তু কখনো ঘুমিয়ে পড়েন না। তা ছাড়া আত্মপ্রকাশের মধ্যে একটা আশ্চর্য শিল্পীর সূক্ষ্মতা আছে তাঁর—মুদ্গরের মতো নেমে পড়েন না ঘাড়ের ওপর।

কুমার বললেন, ও সব নগেন ডাক্তারের চিকিৎসার

কাজ নয় মশাই। কলকাতায় যান। কালই চলে যান।

—কিন্তু কলকাতায় যাওয়ার কোনো দরকার দেখছি না তো আমি?

—আমি দেখছি!—কুমার আপ্যায়িত বিনীত গলায় বললেন, আমার এখানে আছেন, আমাকে গীতা পড়ে শোনাচ্ছেন, পরলোকের কাজ করে দিচ্ছেন। কিন্তু আপনার কথাটা আমি ভাববনা, বলেন কি!—কুমারের স্বরে আত্মধিক্কার: আমাকে কি এমনি স্বার্থপর আর অকৃতজ্ঞ পেলেন? না, না, সে হবেনা।

—আমাকে যেতেই হবে?—দেওয়ালের ভর ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইল রঞ্জন।

—আপনি চলে গেলে আমার অবশ্য খুব কষ্টই হবে—এমন যোগ্য লোক আর কোথায় পাব বলুন? কিন্তু আপনার শরীরের কথা ভেবে চিন্তায় আমার রাতে ঘুম হয় না। তার চাইতে দিনকয়েক কলকাতায় গিয়ে স্বাস্থ্যটাকে ফিরিয়ে আসুন—কেমন?

কুমার উঠে দাঁড়ালেন: অবশ্য ছ মাসের মাইনে আগাম আপনাকে দেব। আর কাল বেলা দশটার ট্রেণে আমারি গাড়িতে করে আপনাকে পৌঁছে দেবো হজরতপুর স্টেশনে। কোনো অসুবিধে হবেনা।

—কিন্তু—

—আমার জন্যে ভাবছেন?—কুমার থামিয়ে দিলেন: হাঁ, মনটা আমার দিনকতক খুবই খারাপ থাকবে। কিন্তু কী করা যায় বলুন? আপনার দিকটাও তো ভাবতে হয়। তা ছাড়া কতদিন আত্মীয়-স্বজনের মুখ দেখেননি—সে জন্যেও তো একবার যাওয়া দরকার। তা হলে কথা রইল—কাল সকালেই। সাড়ে আটটার মধ্যেই গাড়ি রেডি থাকবে।

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কুমার বাহাদুর থামলেন: আর সময়টাও খারাপ। এদিকে প্রায়ই খুন-খারাপী হচ্ছে। আপনি ভালো মানুষ—কিছু একটা হলে আমার আফশোসের সীমা থাকবেনা। বুঝেছেন তো?—কুমার দরজাটা টেনে দিয়ে বিদায় নিলেন। বৃষ্টির শব্দে তাঁর জুতোর আওয়াজটা মিলিয়ে গেল।

বুঝেছে বই কি—সবই বুঝেছে। কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে—এ কুমার সাহেবের আদেশ। অনেকদিন ধরে বুকের মধ্যে কালসাপ লালন পালন করেছেন তিনি—কিন্তু আর নয়। যদি না যায়? এ বাড়ির তোষাখানায় সে আমলের ভারী তলোয়ার আছে—রামদা আছে। একটা বন্যা মালিনী নদীর বালির মধ্যে কোথায় তলিয়ে যাবে কে তার হিসেব রাখে?

কিন্তু—

কাল সকালের আগেই পালাতে হবে এখান থেকে। পালাতে হবে এই রাতে—এই বৃষ্টির মধ্যেই। আর দেরী করলে হয়তো সময় পাওয়া যাবেনা!

রঞ্জন জানলাটা খুলে দিলে। অন্ধকার আমবাগানে ঝড় বৃষ্টির মাতামাতি। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্যে দেখা গেল মালিনী নদীর জলটা—যেন একটা সোনালি অজগর মোচড় খাচ্ছে মৃত্যুযন্ত্রণায়!

(ক্রমশ)

শিল্পী

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়

সাধারণে আর বুঝিবে কি তার রূপ-সৃষ্টির দাম?
আঁকিবুকি দেখে নগণ্য কিছু ভাবে;
কালির আঁচড়, নানা বর্ণের খেলা,
মাটির আকারে মুর্ত্তির আভাস কিছু
কিম্বা পাথরে খোদিত শিল্প নব।
যুগ-সঙ্গতি হইতে যে-রূপ নব প্রেরণার দান,
অতুলন, সুমোহন,
"কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলা: চ পৃথ্বী:।"
কলাকুশলীর কল্পনা আনে বর্ণালী মনোলোভা,
রঙে রঙে দেয় রাঙাইয়া সব
অখিল—নিখিল—ব্যোম।
প্রগতি পাথরে দাগ কাটে সুগভীর,
নিত্য নূতন সৃষ্টির সমারোহে,
অচলায়তনে করে গতি-সঞ্চার।
শাস্ত্র বলিল: "রসো বৈ সঃ।"
রসিক সুজন নানা রস চিনে,
রসের বেসাতি তার;
রূপ আর রস দান করে দুই হাতে—
চিনি না অমৃত,
শিল্পীরে নাহি বুঝি।

বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন—

গত ২রা ডিসেম্বর বারাসত মহকুমার আমডাঙ্গা থানার গাদামারাহাট গ্রামে ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীবিজয়সিংহ নাহার তথায় অনুষ্ঠিত বুনিয়াদি শিক্ষা প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। জেলা স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার জেলায় শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তার সম্পর্কে এক লিখিত অভিভাষণে স্কুল বোর্ডের চেষ্টায় যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা সম্পূর্ণ হইলে জেলায় অশিক্ষিতের হার খুবই কমিয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে উৎসবে বহু লোক গমন করিয়াছিলেন এবং সহর হইতে বহু দূরে একটি গ্রামে এই বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠা হওয়ায় সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। স্থানীয় ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের জন্য ৮ বিঘা জমি দিয়াছেন এবং ৩২ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় স্কুল গৃহ ও ৪ জন শিক্ষকের বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। শীঘ্রই ২৪ পরগণায় ঐরূপ আর ৭টি বিদ্যালয় খোলা হইবে।

নিজামের ট্রাষ্ট গঠন—

৩০শে নভেম্বর পার্লামেণ্টে শ্রীযুক্ত রাজগোপালাচারী জানাইয়াছেন যে নিজাম তাঁহার আত্মীয় স্বজনের জন্য ১৬ কোটি টাকার একটি ট্রাষ্ট গঠন করিয়াছেন। অবশ্য ঐ ১৬ কোটি টাকাই সরকারী কোম্পানীর কাগজে লগ্নী করা হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, নিজামের কোষাগারে বহু কোটি টাকা মূল্যের রত্নাদি সঞ্চিত ছিল, সে সকল ধনরত্ন কি এখন ভারত গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত হইবে না? এই ১৬ কোটি টাকার সুদ ভারত গভর্ণমেণ্টকে বহন করিতে হইবে! বিদেশী ব্যাঙ্ক-সমূহেও নিজামের বহু কোটি টাকা জমা আছে। সে সকল অর্থ এখন কে পাইবে? ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য এখন ভারত রাষ্ট্রের বহু শত কোটি টাকার প্রয়োজন। দেশীয় রাজাদিগের অর্থ কি সে জন্য ব্যয়ের ব্যবস্থা হয় না। দেশের অর্থ দেশহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত না হইলে দেশ কোনদিনই সমৃদ্ধ হইবে না।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার—

গত ২৬শে ডিসেম্বর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্ত্তন উৎসবে বক্তৃতা কালে ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা সুধী ডক্টর এম আর জয়াকর এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ভারতের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বৈদিক সভ্যতা তথা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রচার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আমরা এ বিষয়ে দেশবাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আজ নানাকারণে সংস্কৃত শিক্ষা অর্থকরী নহে বলিয়া তাহার প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ নাই। যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষা মানুষের জীবনে সকল সময়ে উপকারী হয়, সরকার হইতে সেইরূপ ব্যবস্থার চেষ্টা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের চেষ্টা হইলে সরকারও এ বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন।

গুড় ও চিনির মূল্য—

চিনি ও গুড়, বিশেষ করিয়া গুড় ভারতবাসীর অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং জীবন ধারণের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপকরণ। কিন্তু আজ দেশে গুড় ও চিনির অভাব এত অধিক যে মানুষ ইচ্ছামত গুড় বা চিনি খাইতে পায় না। গত ১লা ডিসেম্বর দিল্লীর পার্লামেণ্টে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সী ঘোষণা করিয়াছেন যে গুড়ের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ১৯ টাকা মণ স্থির করা হইয়াছে। এ দেশে খেজুর, তাল প্রভৃতি গাছের রসে ও আখ হইতে গুড় প্রস্তুত হয়। ১৯ টাকা মণ দরে গুড় ক্রয় করা কি

সাধারণের পক্ষে সম্ভব? অধিক পরিমাণে গুড় উৎপাদনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা কেন করা হয় না। চিনির মূল্যও বর্তমানে ১ টাকা সের। উহা নাকি আরও বাড়িয়া যাইবে। অধিক চিনি উৎপাদন করিয়া চিনির মূল্য হ্রাসেরও কোন ব্যবস্থা নাই। শুনা যায় ধনী কলওয়ালাদিগের অধিক লাভ যাহাতে বন্ধ না হয়, সে জন্যই চিনি ও গুড়ের মূল্য কমিতেছে না। কতদিন দরিদ্র জনসাধারণকে এই ভাবে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে কে জানে?

পরলোকে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র—

কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সমাজ-সেবক ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র গত ২৮শে নভেম্বর ৭২ বৎসর

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ফটো—শ্রীমতী মীরা চৌধুরী

বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করিয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৯০১ সালে একশত পরীক্ষার্থীর মধ্যে একমাত্র তিনিই ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে বহু কাল তিনি মেয়ো ও শম্ভুনাথ হাসপাতালের চিকিৎসক ছিলেন। কলিকাতা মেডিকেল স্কুল ও ট্রপিকাল স্কুলে তিনি বহুদিন অধ্যাপক ছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি বিলাতে যাইয়া চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসেন। ১৯১৫ সাল হইতে বঙ্গীয় হিতসাধন-মণ্ডলী গঠন করিয়া তিনি গত ৩৫ বৎসর কাল নানাভাবে সমাজ-সেবার কাজ করিয়া দেশকে উপকৃত করিয়াছিলেন। চিত্রযোগে বক্তৃতা করার জন্য তিনি বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও সেই কার্য্যে বহু যুবককে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। তিনি পরে ১৯৩০, ১৯৩২ ও ১৯৩৬ সালে তিনবার ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন এবং ১৯৩৪ সালে চীন ও জাপান পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। তিনি সেই সকল ভ্রমণ বিবরণ বহু সভায় চিত্র দ্বারা জনসাধারণকে বিবৃত করিয়াছিলেন। দেশকে সর্ববিষয়ে উন্নতি করিবার আগ্রহ তাঁহার অত্যন্ত অধিক ছিল এবং সে জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াও অপরের সাহায্যে তিনি সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন।

পরলোকে পি-কে সেন—

ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্য খ্যাতনামা পণ্ডিত ও রাজনৈতিক ব্যারিষ্টার ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন গত ১৭ই নভেম্বর রাত্রিতে দিল্লীতে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক ভাই প্রসন্নকুমার সেনের পুত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ও পরে এল-এল্‌-ডি পাশ করিয়া তিনি ১৯০৩ সালে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। তিনি স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্তের দৌহিত্রী ও স্বর্গত ভূবিদ্যা-বিশারদ প্রমথনাথ বসুর কন্যা সুষমা সেনকে বিবাহ করেন—সুষমা সেন বর্তমানে বিহার প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। ডাক্তার সেন পাটনা হাইকোর্টের জজ (১৯২৪-১৯২৯) ও ময়ূরভঞ্জের প্রধান মন্ত্রী (১৯৩৫-১৯৪৫) ছিলেন। ১৯১৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক ছিলেন। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের তিনি অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রথম জীবন হইতে তিনি তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করেন ও শেষ পর্য্যন্ত নানা কর্মের মধ্য দিয়া তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রথম জীবনে কলিকাতা হাইকোর্টে ও পরে ১৯১৬ সাল হইতে পাটনা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন।

কর্ম্মচারী সমিতি—

১৯১৮ সালে শ্রীমুকুন্দলাল মজুমদার প্রভৃতি একদল কর্ম্মীর উদ্যোগে কলিকাতার সরকারী ও সওদাগরী অফিসের কেরাণীদিগের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্ম্মচারী থাকেন। বর্ত্তমানে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত সমিতির সভাপতি ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উহার সম্পাদক। গত ১১ই নভেম্বর কলিকাতা ৭২ ক্যানিং ষ্ট্রীটে সমিতির কার্য্যালয়ে সমিতির বিজয়া সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন

ধুবুলিয়া শরণার্থী শিবিরে বক্তৃতারত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
ফটো—শ্রীচন্দন রায়

শ্রীনগরে কাশ্মীর ষ্টেট হস্‌পিটাল পরিদর্শনে ভারতীয় সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ—একটি সদ্যপ্রসূত শিশুকে নিরীক্ষণ করিতেছেন

সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এখন প্রায় সকল অফিসে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠিত হইলেও কর্ম্মচারী সমিতির প্রয়োজন কমে নাই। যে সকল অফিসে ইউনিয়ন নাই, সমিতি সেই সকল অফিসের কেরাণীদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়া আবার নূতন করিয়া সমিতিকে প্রাণবন্ত করা প্রয়োজন হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—

গত ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৫৬শ

বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীসুশীলকুমার দে পরিষদের ৫৭ বর্ষের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন

জম্মু এবং কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন সভায় পৌরোহিত্য করেন ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (মাইক সম্মুখে বক্তৃতারত ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দৃশ্যমান)

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী কেন্দ্রে একটি সংগীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী আর আর দিবাকর সে সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন। ছবিতে শ্রী আর আর দিবাকরকে মাইক সম্মুখে বক্তৃতারত দেখা যাইতেছে

দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক, শ্রীগণপতি সরকার কোষাধ্যক্ষ, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পত্রিকাধ্যক্ষ, শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাধ্যক্ষ, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী চিত্রশালাধ্যক্ষ ও শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য পুঁথিশালাধ্যক্ষ হইয়াছেন। সাহিত্য পরিষদের কার্য্য প্রসারের জন্য সাধারণের যেরূপ উৎসাহ ও সাহায্যদানের প্রয়োজন, ইদানীং তাহা দেখা যায় না। পরিষদকে সর্বপ্রকারের সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নূতন কার্য্যনির্বাহক কমিটী সে বিষয়ে সচেষ্ট হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

পাকিস্থানী হানা—

গত ২৮শে নভেম্বর দিল্লীতে পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে জানা গিয়াছে যে ১৯৫০ সালের জুলাই হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৪ মাসে পাকিস্থানী পুলিস, ফৌজ ও অসামরিক অধিবাসীরা মোট ৮১ বার ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়াছে। পাকিস্থানী সরকারকে ঐ সকল হানার কথা জানাইয়া কোন লাভ হয় নাই। এ অবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া কি প্রয়োজনীয় নহে। ভারত রাষ্ট্র সকল সময়ে দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া এই সকল হানাদারকে উৎসাহ দান করে। কতদিন ভারতীয় রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা বলা যায় না। ভারতবাসী রাষ্ট্রের এই দুর্বল মনোভাবের জন্য সর্বদা শঙ্কিত হইয়া থাকে।

ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু—

ডাঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র বসু সম্বর্ধনা

গত ১৬ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে খ্যাতনামা চিকিৎসক ও দেশকর্মী ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের ৭৮তম জন্মোৎসব উপলক্ষে এক প্রীতি-সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রী হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ডাক্তার বসুর কর্ম জীবনের বর্ণনা করেন। ডাঃ বসু শুধু চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করেন নাই, দেশসেবার, বিশেষ করিয়া গ্রাম সংগঠনের কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ উৎসাহ দেশবাসীর অনুকরণের বিষয়। আমরা আশা করি, দেশের তরুণগণ ডাঃ বসুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবেন।

প্রাচ্য নাট্য কলা মন্দির—

ভরতের নাট্যশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া নাট্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রচার দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা ৬৫এ কাইজার ষ্ট্রীটে 'প্রাচ্য নাট্য কলা মন্দির' নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২১শে কার্তিক ঐ

দিল্লীতে সপরিবারে নেপালের মহারাজা—মহারাজার আগমনে দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিও একটি অনুষ্ঠানে তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানান। চিত্রে মহারাজাকে বক্তৃতা করিতে দেখা যাইতেছে এবং পশ্চাতে তাঁহার তিন পুত্র দণ্ডায়মান

মন্দিরের উদ্যোগে ই-আই-আর ম্যান্সন ইনিষ্টিটিউটে (শিয়ালদহ) দেবী-মাহাত্ম্য অবলম্বনে নৃত্য-গীত-সমৃদ্ধ নাটিকা 'মহামায়া' ও 'শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন' অভিনয় হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীকালীপদ বিদ্যারত্ন উহার পরিকল্পনা করিয়া দিয়াছেন এবং অভিনয়ের দিন কলিকাতার বহু সুধী উহা দর্শন করিয়া বিষয়টির প্রশংসা করিয়াছেন। এই ভাবে নৃত্য ও নাট্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রচার বর্ত্তমানে যে বিশেষ প্রয়োজন, সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। ইহার দ্বারা সংস্কৃত ভাষা ও শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রচার হইবে। আমরা এই অভিনয়ের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ও আশা করি, এইরূপ প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতের লুপ্ত সংস্কৃতির উদ্ধারে তাঁহারা ব্রতী থাকিয়া দেশের কল্যাণসাধন করিবেন।

পরলোকে মেঘেন্দ্রলাল রায়—

স্বর্গত কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মেঘেন্দ্রলাল রায় মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতার বাসভবনে

মেঘেন্দ্রলাল রায়

পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সাহিত্যিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সারা জীবন অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়াছিলেন। কলিকাতার বহু সভা সমিতিতে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের গান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করিতেন।

শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু সম্মানিত—

গত ২৬শে নভেম্বর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় অন্যান্য সুধীগণের সহিত শান্তি-নিকেতনবাসী খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুকে 'ডি-লিট' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হইয়াছে। শ্রীযুত বসু তাঁহার শিল্প-চর্চ্চার জন্য সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার এই সম্মান প্রাপ্তি বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

পরলোকে ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ—

বঙ্গবাসী কলেজের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক বেদ-সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিত ভববিভূতি বিদ্যাভূষণ গত ১৪ই নভেম্বর ৬১ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন; তাঁহার পিতা পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী মেঘদূতের পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়া সেকালে যশস্বী হইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় 'বিদ্যোদয়' নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন, ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ঐ পত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি সামবেদের একটি সটিক সংস্করণ প্রকাশ করেন—ভারতবর্ষে এক সময়ে তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিনয় সরকারের স্মৃতিরক্ষা—

খ্যাতনামা অধ্যাপক সুপণ্ডিত বিনয়কুমার সরকার মহাশয়ের মৃত্যুর এক বৎসর পরে গত ২৫শে নভেম্বর কলিকাতায় এক স্মৃতি সভায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। সভায় প্রস্তাব করা হইয়াছে কলিকাতার কলুটোলা ষ্ট্রীটের নাম পরিবর্তন করিয়া 'বিনয় সরকার ষ্ট্রীট' করার জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হইবে। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে অধ্যাপক সরকারের দান অপরিমেয়। তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিলে তাঁহার গুণের প্রতি সম্মানই প্রদর্শন করা হইবে।

পরলোকে চন্দ্রচূড় চৌধুরী—

খ্যাতনামা বস্ত্রশিল্পী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র, সোদপুর বঙ্গশ্রী কটন মিলের পরিচালক চন্দ্রচূড় চৌধুরী গত ২৯শে নভেম্বর রাত্রিতে মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রবাবু প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া যখন বহু শিল্প প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন, তখন হইতে চন্দ্রচূড়বাবু পিতার সহিত এই কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার অসাধারণ শ্রম ও কর্ম্মকুশলতায় বঙ্গশ্রী কটন মিল এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তিনি শুধু শিল্পী ও ব্যবসায়ী ছিলেন না, বহু সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন, সেজন্য সোদপুর অঞ্চলের ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তিনি সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার ৮১ বৎসরের পিতা, বৃদ্ধা মাতা, পত্নী ও একমাত্র পুত্র বর্তমান।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ ও কমনওয়েলথ

প্রথম টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ১৬৯ ও ৪২৯ (৬ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)
কমনওয়েলথ ঃ ২৭২ ও ২১৪ (১ উইঃ)

বহু প্রত্যাশিত ভারতীয় দলের সঙ্গে কমনওয়েলথ দলের প্রথম টেষ্ট ম্যাচ দিল্লীতে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। ক্রিকেট খেলার ফলাফল কতখানি যে অনিশ্চিত, দিল্লীর ফলাফল তার আর একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দিল্লী ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী। এখানে অনেক কিছু ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ নিদর্শনের কথা জনসাধারণের সুপরিচিত। বর্ত্তমানকালের ফিরোজসা কোটলা মাঠ রাজধানীর মহিমা রক্ষা করেছে। এ এক অদ্ভুত ক্রিকেট মাঠ; এখানের ক্রিকেটের পিচ বোলারদের ইচ্ছামত কাজ ক'রে ব্যাটসম্যানদের বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। এ মাঠ যেন বোলারদের হাতে আলাউদ্দিনের প্রদীপের মত। কিন্তু এবার প্রথম টেষ্ট খেলায় ফিরোজসা কোটলা মাঠের উইকেট বোলারদের আজ্ঞাবাহক ছিল না। আগের মত বোলারদের পক্ষপাতিত্ব না ক'রে উইকেট ব্যাট্‌সম্যানদেরও বোলারদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। খেলা যেমন এগিয়ে যাচ্ছে তেমনি প্রচলিত স্বভাব মত উইকেটের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা। কিন্তু খেলোয়াড়, দর্শক এবং ক্রিকেট খেলার বিশারদদের সমস্ত প্রত্যাশা উপেক্ষা ক'রে উইকেট এক অদ্ভুত আচরণের পরিচয় দিয়েছে, যার কারণ নির্ণয় করা আজও কারও সম্ভব হয়নি। অবিশ্যি কারণ কিছু আছে, কিন্তু তার আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ভৌতিক ব্যাপার বলেই সকলে মনে করছেন। আসামে কয়েক মাস আগে এক বিরাট ভূমিকম্প হয়ে গেছে। জানি না, তারই কম্পন তরঙ্গ উইকেটের তলায় মাটির ভাঁজে ভাঁজে কোন এক রহস্য সৃষ্টি করেছে কিনা? এ সমস্তই ভূতত্ত্ববিদ এবং ক্রিকেট খেলার উইকেট সম্পর্কে বিশারদগণের গবেষণার বিষয়। দিল্লীর প্রথম টেষ্ট ম্যাচ খেলা একাধিক বৈশিষ্ট্যে দর্শকদের আশা, উদ্দীপনার বিষয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কমনওয়েলথদলের কড়া ফিল্ডিং, দ্বিতীয় ইনিংসে ফিসলকের নট আউট ১০২ রান, প্রথম ইনিংসে ডুলাণ্ডের ১০৮ রান, হাজারের ক্রটীবিহীন নট আউট ১৪৪ রান, প্রথম উইকেটে মার্চ্চেণ্ট ও মুস্তাকের জুটিতে ৯৬ রান এবং দ্রুতবেগে খেলে মুস্তাকের ৬১ রান উল্লেখযোগ্য। দু'দলের খেলার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে খেলার অমীমাংসিত ফলাফল ঠিকই হয়েছে বলা যায়।

৪ঠা নভেম্বর দিল্লীর ফিরোজসা কোটলা মাঠের প্রথম টেষ্ট ম্যাচে মার্চ্চেণ্ট টসে জয়ী হলেন। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক এমসের অসুস্থতার জন্যে ওরেল দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। ভারতীয়দলের সূচনা খুব আশাপ্রদ হ'ল না। প্রথম দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ৭ উইকেটে মাত্র ১৬৭ রান উঠে। দলের সর্ব্বোচ্চ রান করেছিলেন ফাদকার ৪১। ট্রাইব ৪৬ রানে ৩টে এবং যিনি ব্যাটসম্যানদের কাছে গূঢ় রহস্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন সেই রামাধীন নিয়েছিলেন ৪৩ রানে ১টা।

প্রথমে ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েও ভারতবর্ষ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলো না। এ ক্রিকেট খেলায় সুযোগ পাওয়া দলের পক্ষে মস্ত বড় আশার কথা। ৫ই নভেম্বর খেলার দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস

মাত্র ১৬৯ রানে শেষ হ'ল; ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে (Proverbial uncertainty-র পরিচয় পাওয়া গেল; দ্বিতীয় দিনে ভারতীয় দলের খেলার সূচনার ১০ মিনিটের মধ্যে ৩টে উইকেট পড়ে খেলা মাত্র ২ রানে। এই ৩টে উইকেট পেলেন রামাধীন একাই একেবারে 'বোল্ড' ক'রে। তাঁর মোট উইকেট পাওয়া হ'ল ৪টে, ৪৪ রানে। উইকেটের পীচ আজ ভালভাবেই বোলার রামাধীনকে সম্মানিত করলো।

কমনওয়েলথ দল যে উইকেটের উপর প্রথম ইনিংসের খেলা সুরু করলো তখন তা আর মন্ত্রপূত উইকেট নয়। ফিসলক অফ্ ষ্টাম্পে একটা দূরের বল মেরে নাইডুর হাতে ধরা দিলেন, দলের মাত্র ১৩ রানে। ১৩ সংখ্যাটা ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে কতখানি অশুভ তার প্রমাণ হাতে নাতে পাওয়া গেল। এর পর হাজারে সট লেগে গিম্বলেটের হুক-মারা একটা শক্ত বল ধরতে গিয়ে আহত হয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে মাঠ ত্যাগ করেন। দলের ৩৬ রানে গিম্বলেট নিজস্ব ১৯ রানে চৌধুরীর একটা 'top-spinner' বল 'forward' খেলে মিড-অনে হাজারের হাতে ধরা পড়লেন। দিনের শেষে ৬ উইকেটে ১৭৪ রান উঠলো। এমেট ৫৫ রান করেন। ডুলাণ্ড ৬৩ রান ক'রে নট আউট থাকেন। মানকাদ ৩৯ রানে ৪টে উইকেট পেলেন। বোলিং এবং রানসংখ্যার দিক থেকে উভয় দলের একটা ভার-সাম্য দেখা গেল। চৌধুরী ৮২ রানে ৩টে এবং মানকাদ ৬৬ রানে ৪টে উইকেট পেলেন।

৬ই নভেম্বর, তৃতীয় দিনে ২৭২ রানে কমনওয়েলথ দলের ১ম ইনিংস শেষ হ'ল। স্পুনার প্রবল জ্বরের জন্যে খেলায় যোগদান করতে পারেন নি। দলের ভাঙন এবং নিরাশার মধ্যে ডুলাণ্ডের ১০৮ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর খেলার বৈশিষ্ট্য সর্ট বলের অপেক্ষায় থেকে তিনি কখনও 'Square cut' অথবা 'হুক' ক'রে রান তুলেছেন।

ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলার সূচনা ভাল হ'ল। দিনের শেষে ১ উইকেটে ১৪৮ রান উঠে। মুস্তাক দ্রুত-বেগে ৬১ রান ক'রে ওরেলের বলে এল-বি-ডবলিউ হ'ন। রামাধীন সম্পর্কে ব্যাটসম্যানদের যে ইতস্তত ভাব, মুস্তাক তাঁর বল পিটিয়ে খেলে সকলের মন থেকে ভয় এবং সঙ্কোচ জুটীতে ৯৬ রান উঠে। মার্চ্চেণ্ট এবং উমরীগড় যথাক্রমে ৪৮ এবং ১৪ রান ক'রে নট-আউট থাকেন।

৭ই নভেম্বর, টেষ্ট খেলায় চতুর্থ দিনে ভারতীয় দল সারাদিন খেলে ৪ উইকেটে ৩৪০ রান করে। পূর্ব্বদিনের নট আউট ব্যাটসম্যান মার্চ্চেণ্ট ৪৮ রানে এবং উমরীগড় ৫৬ রানে আউট হ'ন। চতুর্থ দিনে নট আউট অবস্থায় থেকে যান, হাজারে ৯৮ রানে এবং অধিকারী ১৯ রানে। চতুর্থ দিনের খেলাটা টেষ্ট ম্যাচের মত হয়েছে। বোলার এবং ব্যাটস্‌ম্যান উভয় দলই তাঁদের সমপরিমাণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গত তিন দিনে উইকেটের উপর বোলারদের যে প্রভাব ছিল, চতুর্থ দিনে তত ছিল না। ব্যাটস্‌ম্যানদের কাছে উইকেট আর ভয়ের কারণ ছিল না, মাত্র তিন দিনের পরিচয়ে আজ তাঁরা এই পথটা খুবই সহজ এবং নিরাপদ মনে করে বেশ স্বচ্ছন্দে আপন খুশী মত উইকেটের চারিপাশে বিভিন্ন 'ষ্ট্রোক' মেরে খেলতে লাগলেন। রামাধীন ৫২ ওভার বলে, ২২ মেডেন নিয়ে এবং ৮০ রান দিয়ে মাত্র ১টা উইকেট পান। রামাধীন ঐ দিন ব্যাটসম্যানদের অধীন হয়ে পড়েন। ভারতবর্ষের পক্ষে একটা সেঞ্চুরী দরকার, সে আর ২ রানের অপেক্ষা। ওদিকে প্রথম ইনিংসের দ্বিতীয় দিনের সূচনায় ভারতীয় দলের মাত্র ২ রানে ৩টে উইকেট পড়ার বিপর্য্যয়ের কথা মন থেকে দূরে ফেলা যাচ্ছে না। এক নিদারুণ দুশ্চিন্তা নিয়ে দর্শকেরা বাড়ী ফিরলেন। আমরা ক'লকাতায় বসে দিল্লীর দূরত্ব হিসাবে কম উত্তেজিত এবং চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম না। টেষ্ট ম্যাচের পঞ্চম দিনে রেডিও খুলে খেলার গতি অনুধাবনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে রইলাম।

৮ই নভেম্বর, টেষ্ট খেলার পঞ্চম বা শেষ দিন। খেলা আরম্ভের পর কয়েক ঘণ্টা কাটাতে না পারলে ক্রিকেট খেলার অনিশ্চয়তার উপর কোন রকম ভরসা করা যায় না। হাজারে নিরাশ করলেন না; সেঞ্চুরী ক'রে অধিকারীর জুটিতে রামাধীন এবং ওরেলের বলের উপর বেশ রান তুলতে লাগলেন। অল্প সময়েই হাত জমে উঠলো। দলের ৬ উইকেটে ৪২৯ রানের মাথায় ভারতীয় দল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রে কমনওয়েলথ দলকে দ্বিতীয় ইনিংস

থাকে। হাজারে ১৪৪ রান করে নট আউট থেকে যান। দলের দারুণ ভাঙনের মুখে বিশ্বাসী চীনের প্রাচীরের মত অটল অবস্থায় দাঁড়িয়ে হাজারের বহু খেলার দৃষ্টান্ত আছে। ভারতীয় ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে আর একটি খেলার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করলেন। এই খেলায় অধিকারীর নট আউট ৫৬ রানও উল্লেখযোগ্য।

জয়লাভের জন্য তখন কমনওয়েলথ দলের ৩২৭ প্রয়োজন, হাতে সময় ২২৫ মিনিট। কমনওয়েলথ দল ১ উইকেটে ২১৪ রান করে এবং ঐ রানের উপরই খেলার নির্দ্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়। কমনওয়েলথ দলের ফিসলকের নট আউট ১০২ রান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ফিসলক তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে এই নিয়ে ১০০ বার সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব লাভ করলেন। খেলার পঞ্চম দিনে উভয় দলে দু'টি সেঞ্চুরী পূর্ণ হয় এবং এই শেষ দিনে ব্যাটসম্যানরা বোলারদের উপর আধিপত্য বজায় রেখে দলের প্রচুর রান তুলেছিলেন।

ভারতীয় দলের ২য় ইনিংসের ৪০০ রান তুলতে ৪৮৮ মিনিট লাগে। হাজারে-অধিকারীর জুটিতে ১১৬ রান উঠে। পঞ্চম দিনে উভয় দলের মিলিয়ে ৩৩৯ রান উঠে, অপর দিকে ৩টে উইকেট পড়ে। প্রথম দু' দিনের খেলায় আশা হয়েছিল খেলায় জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হবে। প্রথম দু' দিনের 'পীচ' বোলার এবং ব্যাটসম্যানদের খেলার একটা সমতা রক্ষা করেছিলো কিন্তু বাকি তিন দিন উইকেট কেন যে ব্যাটসম্যানদের খুব বেশী সহায়ক হয়ে বোলারদের উপর বিরূপ হয়ে দাঁড়ালো তার নির্ভরযোগ্য উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এ রহস্য যে নিশ্চয় গবেষণার বিষয়বস্তু সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৮২ ও ৩৯৩

কমনওয়েলথ ঃ ৪২৭ ও ৪৯ (কোন উইকেট না পড়ে)

বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ বনাম ভারতীয় দলের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় কমনওয়েলথ দল ১০ উইকেটে ভারতীয় দলকে পরাজিত করেছে। দিল্লীর ১ম টেষ্ট ম্যাচের ২য় ইনিংসে ভারতীয় দলের রান সংখ্যা দেখে আশা করা গিয়েছিলো ব্যাট্সম্যানদের স্বর্গরাজ্য হিসাবে বোম্বাইয়ের ব্রেবোর্ণ মাঠের উইকেটে ভারতীয় দল ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখাতে পারবে। ব্যাট্সম্যান এবং বোলার উভয়ের কথা বিবেচনা ক'রেই উইকেটের পীচ তৃণাচ্ছাদিত করা হয়েছে। উভয়ের পক্ষে সমান সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ব্রেবোর্ণ ষ্টেডিয়ামের পীচ বেশীর ভাগ সময়ই ব্যাট্সম্যানদের পক্ষপাতিত্ব করে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতীয় দল বনাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচে প্রায় ভারতীয় দলকে খেলায় জয়ী ক'রে দিয়েছিলো। বিশেষ ক'রে, ব্রেবোর্ণ পীচে যে দলই প্রথম ব্যাট করতে পাবে সেই দলই খেলায় দলগত প্রাধান্য লাভে যথেষ্ট সুযোগ পেল বুঝতে হবে। ভোর দিকে শিশির ভেজা পীচ, খেলা আরম্ভের একঘণ্টা পর্য্যন্ত স্পিন বোলারদের বোলিংয়ে সাফল্যলাভ করতে সাহায্য করে। পাঁচ দিনের খেলায় বিশেষ ক'রে চতুর্থ এবং শেষ দিনের নির্দ্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টার মধ্যে স্পিন বোলারদের উইকেট পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। ভারতীয় দলের প্রথম টেষ্টের চারজন খেলোয়াড় কিষেণ চাঁদ, সি এস নাইডু, জোসী এবং চৌধুরীকে দ্বিতীয় টেষ্টে বসিয়ে তরুণ খেলোয়াড় সিন্ধে, আলভা, রাজেন্দ্রনাথ এবং মঞ্জেরেকারকে দলভুক্ত করা হয়। কিন্তু সিন্ধে না খেলায় নাইডু দলভুক্ত হ'ন। আগন্তুক দলের বিপক্ষে তরুণ খেলোয়াড় নামিয়ে তাঁদের খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই দলের এই পরিবর্ত্তন সমর্থনযোগ্য। জোসীর পরিবর্ত্তে রাজেন্দ্রনাথের উপর উইকেট রক্ষার ভার পড়ে। কমনওয়েলথ দলের অধিনায়ক ওরেলকে টসে পরাজিত ক'রে বিজয় মার্চ্চেণ্ট মুস্তাক আলীকে নিয়ে ব্যাট করতে নামলেন। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভ একটা মস্তবড় সাফল্য খেলার দিক থেকে। সূচনার এতটা ভাল হ'য়েও সেই প্রবচনই সত্য হ'ল 'যার শেষ ভাল, তার সব ভাল'। টসে জয়লাভ করে ভারতীয় দল খেলায় আধিপত্য বিস্তারে যে প্রথম সুযোগ পেল তার বিন্দুমাত্র গ্রহণ করতে পারলো না। মাত্র ৮২ রানে ভারতীয় দলের ১ম ইনিংস শেষ হয়। রীজওয়ে ১৬ রানে ৪, ল্যাকার ৩২ রানে ৩ এবং ওরেল ২৩ রানে ২টে উইকেট পান। টসে জয়ী হওয়ার সৌভাগ্য এই শোচনীয় পরিণতির মধ্যে শেষ হয়। চা-পানের ৩৫ মিনিট আগে

কমনওয়েলথ দল ব্যাট করতে নামে। নির্দ্ধারিত সময়ে ২টো উইকেট পড়ে গিয়ে ৫৫ রান উঠে। আলভা ১৪ রানে উইকেট পান।

খেলার দ্বিতীয় দিনের নির্দ্ধারিত সময়ে ৮ উইকেটে কমনওয়েলথ দলের ৩০৪ রান উঠে অর্থাৎ হাতে ২টো উইকেট জমা রেখে তারা ২২২ রানে অগ্রগামী থাকে। দলের পক্ষে উল্লেখযোগ্য রান, গ্রিভস ৮৯, আইকিন ৭৭ এবং ওরেল ৫৫। সকলেই আউট হয়ে যান। আলভা ৫৮ রানে, নাইডু ৪৪ রানে ২টো উইকেট পান। হাজারে এবং উমরিগড় ১টা ক'রে।

তৃতীয় দিনে কমনওয়েলথ দলের ৪২৭ রানে ১ম ইনিংস শেষ হয়। স্পুনার ৬২ রান ক'রে নট আউট থাকেন।

লাঞ্চের পর ৩৪৫ রান পিছিয়ে থেকে ভারতীয় দল ২য় ইনিংসের খেলা সুরু করে। নির্দ্ধারিত সময়ে ৩ উইকেটে ১১৭ রান উঠে। মার্চ্চেন্ট ৬২ এবং মুস্তাক ২৬ ক'রে আউট হন। হাজারে এবং উমরিগড় যথাক্রমে ০ এবং ১৯ রান ক'রে নট আউট থাকেন। ইনিংস পরাজয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা ধরে নিয়েই ভারতীয় ক্রীড়ামোদীগণ দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। পূর্ব্ব দিনের ৩ উইকেটে ১১৭ রান নিয়ে ভারতীয় দল চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ করে। ইনিংস পরাজয়ের অব্যাহতির জন্য ২২৮ রান প্রয়োজন। চতুর্থ দিনে হাজারে আউট হলেন ১১৫ রানে। হাজারের নিজস্ব ১১৫ রানে ১৭টা বাউণ্ডারী ছিল, ৮টা বাউণ্ডারী হয়েছিলো 'কভার' দিয়ে। তাঁর খেলায় বিভিন্ন ষ্ট্রোক ছিল, বিশেষ ক'রে 'স্কোয়ার কাট', কভার ড্রাইভস এবং 'হুক'। নির্দ্ধারিত সময়ে স্কোর বোর্ডে ৫ উইকেটে ৩৫৫ রান উঠে। পঞ্চম দিনে লাঞ্চের ৪০ মিনিট আগেই ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংস ৩৯৩ রানে সমাপ্ত হ'ল। উমরিগড় শতরান পূর্ণ করেন। প্রয়োজনীয় ৪৯ রান তুলতে কমনওয়েলথদল ২য় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে এবং কোন উইকেট না হারিয়ে কমনওয়েলথ দল প্রয়োজনীয় রান তুলে দিয়ে ১০ উইকেটে জয়লাভ করে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীগোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত ইতিহাস "স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম" (২য় খণ্ড)—৪৲
নবেন্দু ঘোষ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "কান্না"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ভাঙন"—২৸৵০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রহস্যোপন্যাস "শার্লকহোম্‌স্-এর কথা"—১৲
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ছায়ালোকের শ্রীমতীরা"—১৸৵০
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "সিংহ-স্বপন"—২৲, "মোহনের হাতে-খড়ি"—২৲, "মহান মোহন"—২৲
শ্রীবিভূপদ কীর্ত্তি প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "মহর্ষি রমণ"—৩৲
শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী প্রণীত জীবনীগ্রন্থ "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর"—৷৷০, "শ্রীশ্রীচণ্ডী"—৷৷০
শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত "ধর্মকথা"—১।০
মন্মথ রায় প্রণীত চিত্রনাট্যোপন্যাস "রাত্রির তপস্যা"—২৲
শ্রীমৎ স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী প্রণীত "তরণী-বিহারঃ"—৷৷০, "পরমহংস শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ সরস্বতী"—৩৲
শ্রীপ্রশান্তকুমার বাগচী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "শ্রীমতী"—১।০
শ্রীহরিদাস দে প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "অঞ্জলি"—৸০
তারক হালদার ও গোপী ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "যাযাবরী"—৩৲
শ্রীনীলাপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত "মানুষের মহিমা"—১৲
আবদুর রউফ প্রণীত "যুগের ডাক"—৷৷০
শ্রীদুলালচাঁদ চৌধুরী প্রণীত কাব্য-গ্রন্থ "বিষাণ"—১৲
দুর্গাপদ তরফদার প্রণীত "জাগ্রত কাশ্মীর"—৩৲
বেলা দে প্রণীত "গৃহস্থালী"—১৷৷০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীঅরবিন্দ

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
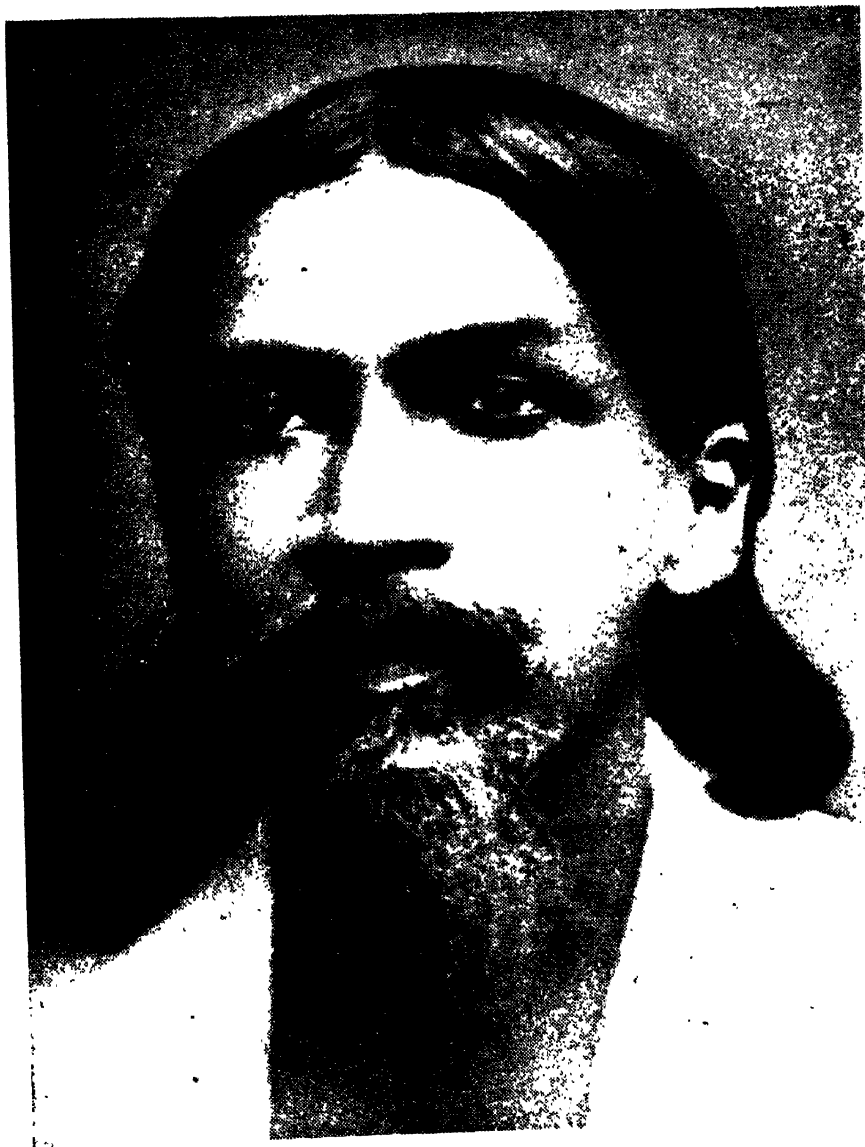
মাঘ—১৩৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে যন্ত্রপাতির কাহিনী

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ এম-এ, এম-এল-এ

আমরা এ যুগের লোকেরা যখন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করি, তখন তার মধ্যে অনেক সময়ই একটা বিপদ দেখা যায়। আমাদের বর্তমান কালের মানদণ্ডে প্রাচীন ভারতের কতকগুলি জিনিষ ভাল লাগে, কতকগুলি নয়। যেগুলি আমাদের ভাল লাগে সেগুলিকে আমরা খুব উজ্জ্বল করে তুলি, যেগুলি খারাপ লাগে সেগুলিকে অনেকটা চেপে যাই। অর্থাৎ আমরা ভারতবর্ষকে যেমনটি দেখতে চাই সেই রকমটী ব্যাখ্যা করি, ঠিক যেমনটী ছিল তেমনটী করি না। বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিকের কাজ এ নয়, এতে ইতিহাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। ইতিহাস কথাটীর মানে হল ইতি-হ-আস, ঠিক এই রকমটী ছিল। সুতরাং যা ছিল, তা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্, তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়াই ঐতিহাসিকের কর্তব্য। বর্তমান কালের রুচি নিয়ে সেকালের জিনিষের আপেক্ষিক গুরুত্ব বদল করা ঐতিহাসিকের কাজ নয়।

ভারতবর্ষের সভ্যতা এখনও পর্যন্ত কৃষিসভ্যতা; যন্ত্রপাতির আমদানি ও উৎকর্ষ পশ্চিম থেকেই ভারতবর্ষে এসেছে। অথচ এই সব যন্ত্রপাতির উন্নতি দেখে আমাদের অনেক সময় ভাবতে ইচ্ছে করে, প্রাচীন ভারতে কি যন্ত্রপাতি ছিল না? যদি থাকত তাহলে আমরা জোর করে বলতে পারতুম আজকাল যে সব আবিষ্কার হচ্ছে সে সব আর নতুন কথা কি, প্রাচীন ভারতেও সবই ছিল। যেমন বিমানের কথা। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে আছে, রাম যুদ্ধ জয় করে বিমানে চড়ে অযোধ্যায় ফিরছেন, সেই বিমান হাঁসে টানত—

অনুজ্ঞাতং তু রামেণ তদ্বিমানমনুত্তমম্।
হংসযুক্তং মহানাদমুৎপপাত বিহায়সম্॥
—লঙ্কাকাণ্ড, ১২৩ সর্গ, ১ম শ্লোক।

রামের আদেশ পেয়ে হংসযুক্ত মহানাদ সেই বিমান আকাশে উঠল। মহাভারতেও তেমনি বিমানের উল্লেখ আছে, যদিও সে বিমান হাঁসে টানত না। বিশেষতঃ বনপর্বে এক বিরাট্ বিমানের কথা আছে, যাতে সৈন্যসামন্ত সব থাকত। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করেছেন শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে মার্তিকাবত দেশের রাজা শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করলেন। শাল্ব এলেন বিমানে চড়ে, তার মধ্যেই তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত ছিল। বস্তুতঃ শাল্ব রাজার যে সৌভনগর ছিল সেই গোটা নগরটাই ছিল বিমান। সেই কথা বর্ণনা করে যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ বলছেন—

অরুদ্ধত্তাং সুদুষ্টাত্মা সর্বতঃ পাণ্ডুনন্দন।
শাল্বো বৈহায়সঞ্চাপি তৎপুরং ব্যূহ্য বিষ্ঠিতঃ॥
—বনপর্ব, ১৪ অধ্যায়, ৩ শ্লোক
(সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ)

কৃষ্ণ যখন পরে শাল্বের খোঁজ করতে করতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন তখন তিনি দেখলেন যে একক্রোশ দূরে সৌভনগরী আকাশে রয়েছে—

খে বিষক্তং হি তৎ সৌভং ক্রোশমাত্র ইবাভবৎ।

কৃষ্ণের বাণে সৌভবিমান থেকে দানবেরা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়তে লাগল। শেষকালে ক্রকচ (করাত) যেমন উচ্ছ্রিত দারু কাটে, কৃষ্ণও তেমনি সুদর্শন চক্র দিয়ে সৌভবিমানকে মধ্যখান থেকে কেটে ফেল্লেন।

তৎ সমাসাদ্য নগরং সৌভং ব্যপগতত্বিষম্।
মধ্যেন পাটয়ামাস ক্রকচো দার্বিবোচ্ছ্রিতম্॥

এই ধরণের বিমানের উল্লেখ পেয়ে আমরা বলে থাকি, সে যুগেও এরোপ্লেন ছিল। হয় তো ছিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা কাহিনীরই পর্যায়ভুক্ত করে রাখতে হবে, তাকে ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত করা চলবে না।[১]

সেইজন্য এই প্রবন্ধে যে কিছু যন্ত্রপাতির কথা উল্লেখ করব সে সব কথা ইতিহাস না মনে করে প্রাচীন ভারতে যন্ত্রপাতির কাহিনী মনে করাই ভাল। কিন্তু কাহিনী হিসেবেও তা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বাস্তুশাস্ত্রের মধ্যে একটি বই আছে, তার নাম সমরাঙ্গনসূত্রধার। বইটির লেখক হলেন ভোজরাজ। বরোদা সংস্কৃত সিরিজে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী বইটীকে প্রকাশ করেছেন। গণপতি শাস্ত্রী অনুমান করেছেন বইটী খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত। সে হিসেবে বইটী মোটামুটি ন'শো থেকে হাজার বছরের বেশী পুরোণো নয়। কিন্তু এই বইটীর বিশেষত্ব হল যে, এর মধ্যে শুধু নানা রকম যন্ত্রপাতির উল্লেখই করা হয় নি, তাদের আকারপ্রকার গঠন-কৌশল সম্বন্ধেও কিছু কিছু বলা হয়েছে। সেইজন্যই কাহিনীটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

সমরাঙ্গনসূত্রধারে প্রথমেই বলা হয়েছে, এই সব যন্ত্রপাতির কথা যেরকম শুনে আসছি সেই রকম বলব।[২]

আক্রমণ করলে যদু বীরেরা দ্বারকাপুরী সুরক্ষিত করলেন। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

পুরী সমন্তাদ্বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
সচক্রা সগুড়া চৈব সযন্ত্রখনকা তথা॥
* * *
লোহচমবতী চাপি সাগ্নিঃ সগুড়শৃঙ্গিকা।

এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নীলকণ্ঠ বলেছেন গুড় অর্থাৎ গোলা (গুড়ঃ স্যাদ্ গোলকে—মেদিনী।) ছুঁড়তে পারে এমন সব যন্ত্র—এই বলেই পরিষ্কার বলছেন, "যন্ত্রাণ্যাগ্নেয়ৌষধবলেন দৃষৎপিণ্ডোৎক্ষেপণানি মহান্তি 'কমান্' ইতি সংজ্ঞানি।" ক্ষুদ্রাণি সীসগুলিকোৎক্ষেপণানি 'বন্দুখ্' ইতি সংজ্ঞানি। অগ্নি কথাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন অগ্নি শব্দের অর্থ হল ঊর্বাগ্নি। কথিত আছে, ঊর্ব ঋষি নাকি বারুদ আবিষ্কার করেছিলেন, তাই সংস্কৃতে বারুদের নাম হল ঊর্বাগ্নি। এখন নীলকণ্ঠ, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মতে, ষোড়শ শতাব্দীর লোক—গোদাবরীর পশ্চিম তীরে কূর্পর গ্রামে তাঁর জন্ম। কাজেই গোলাগুলি বারুদ তিনি দেখেছেন এবং সেইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ প্রাচীন গ্রন্থে এর কোনও সমর্থন নেই—গ্রীক যবনেরা ও চীন যাত্রীরা এ সব কিছু দেখেন নি। সুতরাং মহাভারতের সময় বন্দুক কামান বারুদ ছিল একথা বলা দুঃসাহসের কাজ, অথচ নীলকণ্ঠ তাই করেছেন। এরকম ব্যাখ্যা ইতিহাসের পক্ষে বিপজ্জনক।

মানুষ ইচ্ছামত যাকে নিয়মন করে চালাতে পারে তারই নাম যন্ত্র। যন্ত্রের বীজ (power) চার প্রকার—ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল। যন্ত্রের কাজ নানা রকম, কোনটীর দ্বারা শব্দ হয়, কোনটী বা রূপ স্পর্শ বিধান করে, উপরে নীচে পাশে পিছনে চলা-ফেরা করতে পারে। এই মুখবন্ধ করে গ্রন্থকার কয়েকটি বিশেষ যন্ত্রের উল্লেখ করেছেন।

বিমান॥ বিমান হবে লঘু দারুময় মহাবিহঙ্গের মত। তার তনু হবে দৃঢ় ও সুশ্লিষ্ট। তার পেটের মধ্যে রসযন্ত্র (পারদ যন্ত্র) থাকবে, তার তলায় অগ্নিপূর্ণ জ্বলনাধার থাকবে।[৩] লোক তার উপর চড়ে তার দুই পাখা নাড়ার হাওয়ায় এবং অভ্যন্তরস্থ পারদের শক্তিতে অনেক দূর আকাশে যেতে পারে।[৪] এ ছাড়া বড় বিমানও হত। সুরমন্দিরতুল্য অলঘু বিমান এইভাবেই ভিতরে চারকোণে চারটী পারদপূর্ণ কুম্ভের জোরে চলে বেড়াত। লোহার আবরণের মধ্যে ঢিমে আগুন রেখে দেওয়া হত, সেই আগুনে কুম্ভগুলি তপ্ত হত, তখন 'ঝগ্' এই আওয়াজ করে তপ্ত পারদের শক্তিতে বিমান গর্জন করতে করতে আকাশে উঠত।[৫]

কতকগুলি মানুষাকৃতি যন্ত্র॥ এইরকম যন্ত্র দিয়ে নানা কাজ হতে পারে। হাত পা প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ খণ্ড খণ্ড করে গড়ে তারপর কীলক দিয়ে সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট করা হত, উপরটা কৃত্রিম চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। এই যন্ত্র পুরুষ বা স্ত্রীলোকের আকৃতি হত। ভিতরে নানারকম সুতো থাকত, তারই জোরে ঘাড়নাড়া ইত্যাদি হত।[৬] এই সব মূর্তি করগ্রহণ, তাম্বুলপ্রদান, জলসেচন, প্রণাম, আয়নায় চেহারা দেখা, বীণাবাদন প্রভৃতি কাজ করত।[৭] এইরকম ভাবে তৈরী একটি মূর্তি বাড়ীর দরজায় রেখে দিলে সে তার হস্তস্থিত দণ্ডের দ্বারা যে কোনও লোকের প্রবেশপথ রোধ করতে পারে—অর্থাৎ দরওয়ানের কাজ করতে পারে।[৮] এইরকম মূর্তির হাতে খড়্গ বা মুদ্গর বা কুন্ত দিলে সেই মূর্তি রাত্রে চোর ঢুকবার চেষ্টা করলে সেই চোরকে মেরে ফেলতে পারে।[৯] তা ছাড়া ধনু শতঘ্নী প্রভৃতি দিয়ে এদের দুর্গরক্ষা বা ক্রীড়ার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।[১০]

কতকগুলি জন্তুর আকৃতিসম্পন্ন যন্ত্র॥ নানারকম বিচিত্র কাজের জন্য হাতী ঘোড়া বাঁদর শুকপাখী প্রভৃতি আকারের জন্তু হত। এরা দীপে তৈলপ্রদান করত, তালগতিতে ঘুরে ঘুরে নাচত, জলপান করত।[১১] যন্ত্রকল্পিত হস্তী আওয়াজ করত, নড়াচড়া করত। পাখীরা তালে তালে চলত, নাচত, পড়ত।[১২] পুষ্করিণী বা গর্ত থেকে জল শোষণ করত। ছুটত, লড়াই করত, আঘাত করত। নৃত্যগীত করত, এমন কি বাঁশীও বাজাত। মানুষের যে কতকগুলি দিব্য চেষ্টা আছে তা ছাড়া এরা সবই করতে পারত।[১৩]

৩। লঘুদারুময়ং মহাবিহঙ্গং দৃঢ়সুশ্লিষ্টতনুং বিধায় তস্য।
উদরে রসযন্ত্রমাদধীত জ্বলনাধারমধোঽস্য চাগ্নিপূর্ণম্॥

৪। তত্রারূঢ়ঃ পুরুষস্তস্য পক্ষদ্বন্দ্বোচ্চালপ্রোজ্ঝিতেনানিলেন।
সুপ্তস্বান্তঃ পারদস্যাস্য শক্ত্যা চিত্রং কুর্বন্নম্বরে যাতি দূরম্॥

৫। অয়ঃ কপালাহিতমন্দবহ্নিপ্রতপ্ততৎকুম্ভভুবা গুণেন
ব্যোম্নো ঝগিত্যাভরণত্বমেতি সন্তপ্তগর্জদ্ রসরাজশক্ত্যা॥

৬। দৃগ্‌গ্রীবাতলহস্তপ্রকোষ্ঠবাহূরুকহস্তশাখাদি।
সচ্ছিদ্রং বপুরখিলং তৎসন্ধিষু খণ্ডশো ঘটয়েৎ॥

*　*　*　*

রন্ধ্রগতৈঃ প্রত্যঙ্গং বিধিনা নারাচসঙ্গতৈঃ সূত্রৈঃ।
গ্রীবাচলনপ্রসরণবিকুঞ্চনাদীনি বিদধাতি॥

৭। করগ্রহণতাম্বূলপ্রদানজলসেচনপ্রণামাদি।
আদর্শপ্রতিলোকনবীণাবাদ্যাদি চ করোতি॥

৮। পুংসো দারুজমূর্ধ্বং রূপং কৃত্বা নিকেতনদ্বারি।
তৎকরয়োর্নিহিতদণ্ডং নিরুণদ্ধি প্রবিশতাং বর্ত্ম॥

৯। খড়্গহস্তমথ মুদ্গরহস্তং কুন্তহস্তমথবা যদি তৎ স্যাৎ।
তন্নিহন্তি বিশতো নিশি চৌরান্ দ্বারি সংবৃতমুখং প্রসভেন॥

১০। যে চাপাদ্যা যে শতঘ্ন্যাদয়োঽস্মিন্ ষ্ট্রগ্রীবাদ্যাশ্চ দুর্গস্য গুপ্ত্যৈ।
যে ক্রীড়াদ্যাং ক্রীড়নার্থং চ রাজ্ঞাং সর্বোঽপি স্যুর্যোগতস্তে গুণানাম্॥

১১। দীপে তৈলং প্রনৃত্যন্তি তালগত্যা প্রদক্ষিণম্।
যাবৎ প্রদীয়তে বারি তাবৎ পিবতি সন্ততম্॥

১২। যন্ত্রেণ কল্পিতো হস্তী নদৎ গচ্ছৎ প্রতীয়তে।
শুকাদ্যাঃ পক্ষিণঃ কৢপ্তাস্তালস্যানুগমন্ মুহুঃ॥

১৩। বলনৈর্বর্তনৈর্নৃত্যং স্তালেন হরতে মনঃ।
যেনৈব বর্ত্মনা ক্ষেত্রং ভ্রিয়তে তেন তৎপয়ঃ॥

*　*　*　*

ঘাতং দদতি যুধ্যন্তে নির্যান্ত্যভ্রমনাবৃতম্।
নৃত্যন্তি গায়ন্তি তথা বংশাদীন্ বাদয়ন্তি চ॥

আওয়াজ হয় এমন কতকগুলি যন্ত্র॥ নানাকাজে এগুলির ব্যবহার হত। দারুনির্মিত বিহঙ্গের পিছনের দিকে উৎক্ষিপ্ত সমীরণে মৃদু শব্দ হত, তা শুনতে ভাল। খাটের তলায় এইরকম যন্ত্র রেখে দিলে তার কূজন বিহারকালে উল্লাসকর হত। এইরকমভাবে পটহ ও ধুরজের মত শব্দকারী যন্ত্রও তৈরী হত। দারুবিহঙ্গের মধ্যে পারদ দিয়ে তার মধ্যে এমন যন্ত্র দিয়ে দেওয়া হত যে সে যন্ত্র সিংহনাদ করতে থাকত, তাই শুনে মদস্রাবী হস্তীও ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত।[১৪]

কতকগুলি বিচিত্র যন্ত্র॥ আনন্দের জন্য কতকগুলি বিচিত্র যন্ত্র তৈরী হত। যেমন জলের মধ্যে আগুন দেখানো বা আগুনের মধ্য থেকে জল বার করা। এইপ্রসঙ্গে একটী কৌতূহলপ্রদ যন্ত্রের উল্লেখ আছে। সেটী হল খানিকটা প্লানেটারিয়ামের মত। এই গোলে (খগোল—আকাশ) সূর্য প্রভৃতি যেরকম প্রদক্ষিণ করছে তারই অনুকরণ করে যন্ত্রটী তৈরী হত। দিনরাত সেটী চলতে থাকত, গ্রহদের গতি তাতে প্রদর্শিত হত।[১৫]

বারিযন্ত্র॥ নানারকম ফোয়ারার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। উর্দ্ধস্থ দ্রোণীদেশ থেকে জল নীচে পড়ে, তার নাম পাতযন্ত্র। এই জল আবার নানাভাবে উৎসারিত করা হত। দারুনির্মিত হস্তী মূর্তি করা হত, তা পাত্রস্থিত জল পান করত। সুড়ঙ্গের সাহায্যে দূরে জল নিয়ে গিয়ে সেখানে ধারাগৃহ করা হত, সেখানে ধারাবর্ষণের মত জল পড়ত। সেই ধারাগৃহে নানারকম দৃশ্য অঙ্কিত থাকত, ভাল ভাল বেদী থাকত, স্তম্ভ থাকত, নানাবিধ মূর্তি থাকত। স্ত্রীমূর্তিদের স্তনযুগল থেকে জলধারা উৎসারিত হত, চোখের পাতা থেকে আনন্দাশ্রু পড়ার মত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ত। পুরুষমূর্তি বক্রনাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পদ্মফুলের ডাঁটা থেকে জল উপছে পড়ছে—এইরকম মূর্তিও থাকত। মধ্যে স্বর্ণময় মণিমণ্ডিত সিংহাসন থাকত, তাতে বসে রাজা স্নানাদি করতেন। এই হল প্রবর্ষণগৃহ। এ ছাড়া আরও নানা রকম জলযন্ত্রসমন্বিত গৃহের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন প্রণালগৃহ, জলমগ্নগৃহ ইত্যাদি। জলমগ্ন গৃহ তৈরী হত চার-কোণা অতিগভীর পুকুরের মধ্যে। সুড়ঙ্গ দিয়ে এই গৃহে প্রবেশ করতে হয়। এই বাড়ীতে চারদিকে ছবি থাকবে, কৃত্রিম মাছ মকর পক্ষী প্রভৃতি থাকবে—তাতে এই বাড়ী বরুণালয়ের মত দেখতে হবে।

অন্যান্য॥ এ ছাড়া দোলা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু দোলার কথা শুধু সমরাঙ্গনসূত্রধার কেন, অন্যান্য বাস্তুশাস্ত্রেও (যথা মানসার) পাওয়া যায়।

এই সব যন্ত্রের কথা সমরাঙ্গনসূত্রধারে থাকলেও তখনও যে এই সব যন্ত্রগুলি শোনা কথা মাত্র ছিল তারও ইঙ্গিত ঐ বই-এর মধ্যেই আছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে গ্রন্থকার বলেছেন যে যন্ত্রাধ্যায় যেমন প্রক্রমায়াত তেমনি বলব। দ্বিতীয়তঃ, এই সব যন্ত্রের গঠনপদ্ধতির কিছু কিছু আভাস দিয়েই গ্রন্থকার বলছেন—

যন্ত্রাণাং ঘটনা নোক্তা গুপ্ত্যর্থং নাজ্ঞতাবশাৎ।

অর্থাৎ যন্ত্রগুলির গঠনপ্রণালীর কথা বললাম না—তার কারণ অজ্ঞতা নয়। সেসব কথা গুপ্ত রাখাই উচিত, সেইজন্যই বললাম না। বলা বাহুল্য এ কৈফিয়ৎ অচল। যদি গুপ্তই রাখতে হবে তাহলে পারদের শক্তিতে বিমান উড়ে যায়, তার চেহারা হবে মহাবিহঙ্গের মত—এই সব কথাই বা তিনি বললেন কেন? তার তা ছাড়া সেকালে যদি এই সব যন্ত্রবহুল প্রচলিতই ছিল তাহলে তার মোটামুটি গঠনপ্রণালী সবাই জানত, সেখানে লুকোচুরিরই বা দরকার কি? আসলে, সে সময়েও এ সব জিনিষ কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে, ব্যবহারিক সত্য নেই। কিন্তু কাহিনী হলেও বা সে কাহিনী মন্দ কি? কাঠের পাখীর মত বিমানে চেপে বসলুম, ভিতরে পারার পাত্রের তলায় আগুন দেওয়া হল, অমনি পাখা নাড়তে নাড়তে ঝগ্ ঝগ্ শব্দ করতে বিমান আকাশে উঠল—একথা ভাবতে মন্দ লাগে কি?

১৪। বৃত্তসঞ্চিতমথায়সযন্ত্রং তদ্‌বিধায় রসপূরিতমন্তঃ।
উচ্চদেশবিনিধাপিততপ্তং সিংহনাদমুরজং বিদধাতি॥
স কোঽপ্যস্য স্ফারঃ স্ফুরতি নরসিংহস্য মহিমা
পুরস্তাদ্ যস্যৈতা মদজলমুচেঽপি দ্বিপঘটাঃ।
মুহুঃ শ্রুত্বা শ্রুত্বা নিনদমপি গম্ভীরবিষমং
পলায়ন্তে ভীতাস্তুরিতমবধূয়াঙ্কুশমপি॥

১৫। গোলশ্চ স্ব(চি) বিহিতঃ সূর্য্যাদীণাং প্রদক্ষিণম্।
পরিভ্রামত্যহোরাত্রং গ্রহাণাং দর্শয়ন্ গতিম্॥

দাঁতের মর্য্যাদা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

ফুটবল প্রতিযোগিতা? না। গঙ্গার ধারে মেঘের পরে পড়ন্ত রবির আলোর খেলা? না। ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের সামনে মাঠের উপর ধনী মহিলাদের ফুস্কি আর মুড়ি জলপান? কি হবে? প্রমোদ গৃহেই ফিরবে কাজের শেষে।

প্রমোদ ধীরে ধীরে লালদীঘির ধারে গেল, ট্রামগাড়ির প্রতীক্ষায়। বন্ধুরা খুব হাঁসলে। তাদের হাঁসির রেশ তার কানে পৌঁছিল। প্রমোদও নিজের মনে হাঁসলে। পঁচিশ বছরের মধ্যে তেইশ বছর সে খেলা-ধূলায় যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে। ভবঘুরের মত পথে পথে ঘুরে মজা লুটেছে। এখন সে শান্তি চায়। ঘরে একেলা থাকে রেখা। সত্যই তো বেচারার কাছে যত শীঘ্র ফিরতে পারে তত ভাল।

প্রমোদ প্রতিদিন রেখাকে অনুরোধ করতো পাচক রাখতে। সে প্রত্যহ হাসতো। বলতো—ফ্ল্যাটে সপ্তার মধ্যে ছ' দিন একেলা থাকি, তবু রান্নার উত্তেজনায় সময় কাটে।

প্রমোদ বলে—এ সৌধে তো আরও অনেক মহিলা আছেন তোমার মতো, তাদের সঙ্গে ভাব করলে তো পার। নির্জনতা গিলতে আসবে না।

রেখা বলে—তুমি কোন্ তাদের পুরুষ আত্মীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ? রোজ আবার রাত্রে সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটা অবধি জ্ঞানবাবুর বাড়ি থাক কেন?

সে বলে—ওঃ! সেটা তাস খেলতে। সে সময়টা তুমি যে রান্না ঘরে কি সব কর।

এই ভাবে প্রায় দু-বছর তাদের জীবন কেটেছে। রেখার বাবা দিল্লির ডাক্তার। বিবাহের পর সে দু-বার দিল্লি গিয়েছিল প্রমোদকে সাথে নিয়ে। রবিবারে তারা সিনেমা যায়, না হয় উত্তর কলিকাতায় কোনো আত্মীয়ের বাড়ি। কর্মস্থল হতে ফিরে প্রমোদ স্ত্রীর সঙ্গে চা খায়, আর সেই সঙ্গে রেখার হাতে-গড়া বা সংগ্রহ করা জলখাবার। তার পর তারা যায় দেশপ্রিয় পার্কে বা লেকের ধারে।

চা খাবার সময় প্রমোদ স্ত্রীকে সারাদিনের কাজের সমাচার দেয়। রেখার প্রতি প্রমোদের অত্যধিক আসক্তির উল্লেখ ক'রে যে সব রসের কথা কয় তার বন্ধুবান্ধব, সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রামোফোনের মত নিবেদন করে স্ত্রীর সকাশে। অবশ্য ভাষার একটু রদ্-বদল করতে হয়। কারণ পুরুষের ভাষার পারুষ্য বা অশিষ্টতা নারীর কর্ণ-গোচর হবার যোগ্য নয়।

যেদিন সাড়ে সাতটার পূর্বে তাদের ভ্রমণ শেষ হয়, প্রমোদ পড়ে, রেখা বোনে। উভয়ে প্রায় নিঃশব্দ থাকে। যদি কোনো কারণে রেখা অন্যত্র যায়, প্রমোদের পড়া হয় না। বরং তার পাঠের সময় যদি রেখা তার মা, বাবা, দাদা বা কোনো বান্ধবীর চিঠি পড়ে, প্রমোদের একাগ্রতা বাড়ে, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা এড্‌গার ওয়ালেসের রচনা রসে টলমল করে।

—তবে আসি—তরকারী গরম করতে হবে, লুচি ভাজতে হবে, সঠিক বেয়ারার হিসাব নিতে হবে।—এই কথা ব'লে যখন রেখা ওঠে, প্রমোদ গেঞ্জির ওপর হাত-কাটা সার্ট গায়ে দেয়। তার পর বই বন্ধ ক'রে বন্ধু জ্ঞানেন্দ্রের বাড়ি যায় তাস খেলতে। যেদিন বৃষ্টি বাদলের ভয় থাকে, সে হাতে একটা ছাতা নেয়।

দিনের পর দিন প্রায় দু-বছর এমনি করে তার জীবনের স্রোত বয়েছে। খাদটুকু সরু হলেও গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের দিনে জীবন-স্রোতস্বতী সমানভাবে স্বচ্ছ টলমলে জলে পূর্ণ থাকতো।

(২)

শরতের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। মাঝে মাঝে দু-এক টুক্‌রো সাদা মেঘ গাঢ় নীলের কোলে ভেসে যাচ্ছিল। পাঁচটার সময় অফিসের ছুটির পর তাকে সহকর্মী ধরলে। মথুর তার সমবয়স্ক, উভয়ে আশুতোঃ

কলেজে একত্র বি-এ পড়েছিল। কলেজের দিনে দুজনে ভালো ফুটবল খেলোয়াড় ছিল। এখনও উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য বা প্রেমের অভাব ছিল এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। কার্য্যের অবকাশে তারা পরস্পরের সঙ্গে পুরানো দিনের কথা কহিত, পরনিন্দা করত, আধুনিক ফুটবলের অধোগতি সম্বন্ধে আলোচনা করত।

শেষ প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। ইষ্ট বেঙ্গল শীল্ড বিজয়ী হয়েছে। প্রমোদ এবং মথুর খেলার গল্প করছিল। সুবোধের মেজাজ বা ভাষা মোটেই নামের উপযোগী নয়। তার মন্ত্র ছিল—স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। তার প্রাণে ময়লা ছিল না, তাই লোকে তার কথার তীব্রতা এবং সাময়িক আঘাত সহজেই বিস্মৃত হত।

আজ এরা যখন ক্রীড়ার প্রসঙ্গে ব্যস্ত, সুবোধ গুটি গুটি এসে মথুরের চেয়ার ধরে দাঁড়ালো। প্রমোদকে বিদ্রূপ করে বল্লে—মানুষটার সূক্ষ্মদৃষ্টি অনাসৃষ্টির মাত্রা ছাড়িয়েছে। অপুত্রক কানায়ের মা।

প্রমোদ বল্লে—যদি খেলার কথা শুনে মনের পটে ময়দানের ছবি না আঁকতে পারি, তা' হলে মাঠে দাঁড়িয়েও খেলা বুঝব না।

সুবোধ নির্বোধের মত হাসলে। বল্লে—মনের মাঝে যদি একটা ছবি দেওয়াল জোড়া থাকে, তা' হ'লে সেখানে কি অন্য ছবির স্থান থাকে? এক গগনে দুই চন্দ্র থাকতে পারে না।

প্রমোদ বল্লে—গালাগালির গগনে যুক্তির শশী ওঠে না। ওটা জোনাকী পোকার রাজ্য।

সুবোধ বল্লে—বহুৎ আচ্ছা। তবু একটা মানুষের মতো জবাব দিয়েছ মিঃ এস্, পি, ঘোষ।

মথুর এস্ পি ঘোষের মানে জানতো। এ ক্ষেত্রে দুষ্টবুদ্ধি বন্ধু-প্রীতিকে চাপা দিল। সে ভালো মানুষের মতো বল্লে—রসিকতার উন্মাদনায় সুবোধ বন্ধু-বান্ধবদের নাম অবধি ভুলে যায়। পি কে ঘোষ। এস পি ঘোষ নয় মশায়। পি কে প্রমোদ কুমার।

যেখানে লাঠির আঘাত এড়াবার উপায় নাই, সে ক্ষেত্রে বীরের মত বুক পেতে মার খাওয়াই ভালো। খেলোয়াড় প্রমোদকুমার সে নীতি বিলক্ষণ জানতো।

দিয়েছিলেন আমারি পিতামহী, আমার সহৃদয় বন্ধু সুবোধ মিত্র মশায় নাম দিয়েছেন—স্ত্রৈণ প্রমোদ ঘোষ—এস্ পি ঘোষ।

সুবোধের বাণের মুখটা ভোঁতা হ'ল বটে, কিন্তু তার বিষ কতকটা প্রবেশ করেছিল প্রমোদের রক্ত-স্রোতে। সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবার সময় ট্রামের ভিড়ের মাঝে তার উগ্রতায় একটু কাতর হ'ল। তাকে ওরা স্ত্রৈণ কেন বলে? স্ত্রৈণ সে—যে স্ত্রীর আদেশে বা আতঙ্কে বিবেকের অনুশাসন মানে না। লোভ বা অসূয়ার পরবশে নারীজাতি বহু কর্মে নিয়োজিত করতে চায় স্বামীকে। স্বামী যখন বোঝে তেমন কর্ম সুষ্ঠু নয়, অথচ আত্ম-নিয়োগ করে ভার্য্যা-নিয়ন্ত্রিত কর্মে, তখন সে স্ত্রৈণ। কিন্তু রেখা—

তার চিন্তাধারাকে বাধা দিয়ে টিকিট-পরিদর্শক বল্লে—টিকিট।

সে টিকিট দেখালে। চোখ মেলে ট্রামের বাহিরে দেখলে। গাড়ি তখন এসে পৌঁচেছে হাবিলদার পুকুরের ধারে। যৌবন-সরসীর মতো সরোবরের জল টলমল করছিল যেন উপচে ওঠবার প্রচেষ্টায়। বর্ষা-ধোয়া ময়দানে সবুজের বিছানা বিছানো। জলপিত্ব গাছ হ'তে যেন সৌন্দর্য্যের ধারা বর্ষিত হচ্ছিল পথের পরে। তার চিন্তা আবার রেখার গণ্ডী টানলে শ্রীমতী রেখা ঘোষকে ঘিরে। বেচারা রেখা! কেবল তার সুখের জন্য পরিশ্রম করে, তাকে প্রমোদ মিষ্ট কথা বলে না—রবীন্দ্রনাথের গল্পের নায়কেরা যে ভঙ্গিতে কথা কয়। না জগৎ নিষ্ঠুর। স্ত্রৈণ! রেখা বরং স্বৈম, যদি চলন্তিকা বা অন্য অভিধানে তেমন শব্দ থাকে। ভবানীপুরের বাজারে নানা নরনারী দেখে সে আবার পৃথিবীতে নামলো। সুন্দর, অসুন্দর, ব্যস্ত, অলস, কর্মী-নিষ্কর্মা লোকের বাসস্থান পৃথিবী।

একজন মহিলা নামবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন জগুবাবুর বাজারের কাছে। তাঁর পুরুষ সহযাত্রী মহিলার কোল থেকে শিশু তুলে নিলে নিজের কোলে।

প্রমোদ বুঝলে মানুষটা ভদ্রলোক। সে ভাবলে সুবোধ কি ভাবতো। ভদ্রলোক স্ত্রীলোকটির স্বামী হন্ যদি হয়তো সুবোধের মতো নির্বোধের দল, এঁকেও

(৩)

গৃহে ফিরে প্রমোদ রেখাকে দেখতে পেলে না। অন্যদিন সে যখন সিঁড়ির প্রথম চাতালে ওঠে, শব্দ পায় সৌধাংশের কবাট খোলার। আজ সে উপরে ওঠে দেখলে এক প্রকাণ্ড তালা ঝুলছে দরজার বুকে। কী ব্যাপার!

প্রায় দু-মিনিট বাদে ফটিক এলো একটা চাবী হাতে নিয়ে। বল্লে—চাবী।

—চাবী ?

—আজ্ঞা বাবু। মা চাবি দিয়ে চলে গেছেন। চিঠি দিয়ে গেছেন।

চলে গেছেন? চাবি দিয়ে চলে গেছেন? কী জঞ্জাল। চিঠি দিয়ে গেছেন ?

প্রমোদ চাবী নিল, চিঠি নিল। চাবী খুলে কক্ষে প্রবেশ করলে। একটা আদিম যুগের নরহত্যার সংস্কার তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ছুটাছুটি করতে লাগলো। ফটিকের নিরাপত্তার জন্য সে তাকে বাহিরে পাঠিয়ে দিলে।

চিঠি পড়লে। একবার, দু'বার, তিনবার।

প্রিয়তম ওগো

হঠাৎ দুপুরবেলা দাদা এসে পড়লো বর্দ্ধমান থেকে। বাবার বড় অসুখ। এখনি ট্রেণে না উঠলে হয়তো—ওঃ ভাবতেও ভয় করে। কেবল মার মুখখানা মনে পড়ছে আর বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

আজকের রাত্রের খাবার ঢাকা দেওয়া রহিল খাবার ঘরে। কেট্‌লিটায় জল আছে ইলেকট্রিক উনুনে বসিয়ে দিও। চা আছে পটে, বাটিতে চিনি রহিল। দুটো সিঙ্গাড়া আছে খেযো।

পাশের ফ্ল্যাটের ঠাকুর কাল সকালে একজন পাচক আনবে। একটু কষ্ট ক'রে তাকে চালিয়ে নিও।

উঃ! বড় কষ্ট হচ্ছে। ক্ষমা কর। আর দাঁতের মাজন আছে আলমারির মাথায়। বিদায়— তোমার

রেখা

পুঃ ধোবার কাপড়ের ফর্দ আছে টেবিলের টানায়।

বিপন্নের মনস্তত্ত্ব বিচিত্র। প্রথমে মনের মাঝে একটা দারুণ শূন্যতা অনুভব করলে যুবক প্রমোদ ঘোষ। সেই শূন্য মনে জেগে উঠলো ক্রোধের কালো টুকরো মেঘ। হঠাৎ মেঘটা রক্তমূর্ত্তি ধারণ করলে—বৃষ্টি পড়লো। শোণিত বর্ষণ—প্রথম ধোবা, তারপর আগন্তুক পাচক, পাশের বাড়ির পাচক এবং নিজের শ্যালক বিপিন মল্লিকের মাথার উপর।

তার পর মনে জাগলো দয়া। তার শান্তিজলে সিঞ্চিত হ'ল শ্বশুর এবং শাশুড়ী ঠাকুরাণী। রেখার সম্বন্ধে সে কি ভাববে তা ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

এবার তার ধিক্কার পড়লো নিজের ওপর। সে কি এতোই হীন যে একজন উচ্চমন মহিলাকে সেবানিরত না করলে তার দিন চলে না। শিশুকালে সে মাতৃহীন। পিসিমার কৃপা স্মরণ করলে—কি স্নেহ! কি মায়া!

প্রমোদ চায়ের জল ঢালতে গিয়ে অনেকটা গরম জল ফেললে ভূতলে। এমনি দু'একটা অঘটনের পর চয়নিকা টেনে নিলে। পড়ল—

ব্যথিত হৃদয় হতে—বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে—শুধু বলে রাখা, "যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি।" হেন কথা কে পারে বলিতে
"যেতে নাহি দিব।"

তার মন ছিল শূন্য। এমন কথাগুলা চোখের ভিতর দিয়ে মোটে মরমে পশিল না। কথাগুলা অর্থহীন। তারা কোন ছবি আঁকলে না মনের পটে। এবার তার মাথায় বুদ্ধি এলো। ওঃ! বুঝেছি—বল্লে সে চেঁচিয়ে।

তারপর মনের এক কোঠা হতে অন্য কোঠায় ভাব প্রবেশ করলে। হাওয়া না হলে মানুষ থাকতে পারে না। অথচ কেহ তো ক্ষণে ক্ষণে পলে পলে বোঝে না যে হাওয়ার কৃপায় জীবন। দম বন্ধ হয় বায়ুর অভাবে, অথচ তাকে তো কেহ খোঁজে না সজ্ঞানে। রেখা তার জীবনের হাওয়া। সে নীরবে পাঠ করে, রেখার কথা তো ভাবে না। আজ রেখা নাই—নীরবে পুস্তক পাঠ তো তাকে স্বচ্ছন্দতা দিচ্ছে না। মনে বাক্যও প্রবেশ করছে না, অর্থেরও প্রবেশ নিষেধ।

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, আর রেখাকে একেলা ফেলে তাস খেলতে যাবে না। একাকী থাকা বড় অমঙ্গল। সে নিজের মনের কথা চেঁচিয়ে বল্লে—

না আর তাকে একেলা রাখা হবে না। তাস যাবে ফুটবলের মতো ছেঁড়া কাগজের চুবড়িতে।

প্রমোদ সেদিন বেড়াতে গেল না। বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলো। আলনার হাতকাটা সার্টের নীরব আহ্বান সে শুনলে না। সার্টের পাশে ৪ এর মত কোঁচানো রয়েছে রেখার সাড়ি। সে তাকিয়ে দেখলে। তারপর একটা আতঙ্ক হ'ল—যদি তার পিতার কিছু হয়, রেখা না আসে।

সে উঠে বসলো। একটা শয়তান তার কানে কানে বল্লে—বাপের বাড়ি যাবে তো এতো অকস্মাৎ—তবে কি?

সে দাঁড়িয়ে উঠলো। তার মাথায় রক্ত ছুট্‌লো। সে নিজেকে শাসন করলে। ছিঃ! ছিঃ! সে এতো নীচ! মিথ্যা অজুহাত! ছিঃ! ছিঃ! এ ভাবনা এলো কোন্ নরক হ'তে? ছিঃ!

তাড়াতাড়ি গোসলখানায় গিয়ে প্রমোদ হাতে মুখে জল দিলে। ঘরের প্রত্যেক রেখা তাকে রেখার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে। সে আবার শপথ করলে—না প্রাণ-বায়ু রেখাকে জীবন হ'তে তাড়িয়ে আর শ্বাসরোধের অবকাশ সৃষ্টি করব না।

(৪)

খট্! খট্! খট্! দূরে শব্দ হ'ল। তার আবার মাথায় খুন চাপলো। ফটিক-শূন্ত করবে সে ধরণীতল।

খট্! খট্! খটাখট্! খট।

সে দরজা খুলে দিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার ক'রে বল্লে—হ্যাঁ! রেখা! তুমি ফিরেছ?

রেখা হেঁসে বল্লে—কেন? হাড়ে বাতাস লেগেছিল? কিন্তু অচল পয়সার মতো আবার ফিরে এলাম।

—বেশ করেছ। রেখা তুমি না থাকা ভালো না।

—তাই নাকি? বাবার কথা—

সে বল্লে—ভুলে গিয়েছিলাম আনন্দে। হ্যাঁ কী হ'ল? কেন ফিরলে? তিনি কেমন আছেন? দিল্লী থেকে এতো শীঘ্র এলে? হাওয়াই জাহাজে?

রেখা বল্লে—যখন ষ্টেশনে গেলাম। বর্দ্ধমান থেকে দাদার চাকর এসে তার দিলে। বাবা সেরে গেছেন। পূজার সময় সবাই মিলে যাব।

—ওঃ! বেশ! একটা দুর্ভাবনা গেল।

দুর্ভাবনাটা কি? কাকে ঘিরে—শ্বশুর, না তদীয় কন্যা?

রেখা বল্লে—দাঁড়াও একটু চা খাই।

প্রমোদ বল্লে—আমি চা করতে শিখেছি রেখা। আজ আমি তোমাকে চা করে দব?

রেখা টেবিলের পাশের জল দেখিয়ে বল্লে—এখানে জল ফেল্লে কে?

প্রমোদ হাঁসলে। ক্রমশঃ পুরানো ভাব ফিরলো।

সাড়ে সাতটা বাজলো। প্রমোদ সার্ট গায়ে দিলে। দু'বছরের অভ্যাস।

বল্লে—তবে আসি। জ্ঞানবাবুর বাড়ী থেকে।

নিশ্চিন্ত মনে সে চলে গেল। প্রাণ হাল্কা। অভ্যাস।

সে যখন চলে গেল রেখা বাহিরে গিয়ে এক বান্ধবীকে ডেকে আনলে। প্রথমে তারা দুজনে খুব হাঁসলে। পাশের ঘরে লুকিয়ে তারা সব দেখেছিল। কিন্তু বাজি জিতেছে রেখা। সে বলেছিল—উনি মুসড়ে পড়বেন আমাকে না দেখে।

বান্ধবী অনিলা বল্লে—কী আশ্চর্য্য। এরা স্বামীত্ব দাবী করে? একজন দিল্লী যাচ্ছিল। ফিরে এলো সঙ্গে একটা পোঁটরি আছে কিনা সেটা অবধি দেখলে না। আর দাদা কোথা? তুই এলি কার সঙ্গে? এরোপ্লেন!

রেখা বল্লে—এখন আর আমার স্বামীকে নিন্দা করলে হবে না। কই উনি তো রেগে থানা পুলিস করেন নি বা আমাকে গালাগালি দেন নি। একেবারে মুসড়ে পড়েছিলেন।

—তুই খেল্‌তে যেতে দিলি কেন?

রেখা বল্লে—ওটা অভ্যাস। আহা বেচারা! সারা দিন অফিসে খাটেন।

অনিলা বল্লে—পুরুষেরা দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না।

প্রমোদ সত্যই তার শপথের কথা একবারও ভাবলে না। রেখা যেমন অভ্যাস, খেলাও তেমনি।

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

শ্রীকুমুদভূষণ রায়

১—নদী বশীকরণ। ভারত সরকারের, বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে লিখিত ৬ সংখ্যক পুস্তিকা—দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:

"পতিত জমীতে সেচের জন্য ও কারখানার কাজে অতি প্রয়োজনীয় অমূল্য সলিল সম্পদ অযথা প্রবাহিত হইয়া নষ্ট হইতেছে। * * * বর্ত্তমানে এই সলিল প্রবাহ ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নদীর জলের প্রবাহ যথোচিত ভাবে বশীকরণ হইলে, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। জলরোধক বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিলে, বন্যার ধ্বংসলীলা জনিত ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাইবে। দামোদর নদী পথে নৌচালন সম্ভব হইলে, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতা দূর হইবে। সেচের জলের দ্বারা পতিত জমী উর্ব্বর হইয়া শস্য উৎপাদন করিবে।"

২—বন্যাজনিত ক্ষতি। দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে পুন পুনঃ প্রভূত ক্ষতি সাধন হইয়াছে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, গভর্ণমেন্ট দামোদর ও তাহার করদ নদীগুলিতে জলরোধক বাঁধ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের বন্যার পর জলরোধক বাঁধ ও হ্রদের সাহায্যে নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা হইয়াছিল। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের বন্যায় গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও ই আই রেলপথ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যুদ্ধোদ্যম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক এই সময়, দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী উপত্যকায়, টেনেসী উপত্যকা কর্ত্তৃপক্ষ (Tennessee Valley Authority) ধারাবাহিক ভাবে অনেকগুলি জলরোধক বাঁধ নিৰ্ম্মাণ দ্বারা, প্রবাহমান নদীকে অনেকগুলি শান্ত হ্রদে রূপান্তরিত করিয়া, বন্যানিয়ন্ত্রণ, নৌচালন এবং জলবৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন হওয়ার সংবাদের বহু প্রচার হয়। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন (Damodar Valley Corporation), টি ভি এ (T V A) পদ্ধতি অনুযায়ী, দামোদর উপত্যকায় জলরোধক বাঁধ ও হ্রদ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ডি ভি সি কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে এতদ্বারা তাঁহারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নৌচালন ও জল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবেন এবং তদুপরি দামোদরের জল সেচখালে চালিত করিয়া প্রায় ১০ লক্ষ একর (acre) জমীতে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে টি ভি এ (T V A) কর্ত্তৃপক্ষ টেনেসী উপত্যকায়, টেনেসীর জল সেচ কার্য্যে একেবারেই ব্যবহার করেন নাই।

৩—নদী, জলনিকাশ ও পলি সংবাহন। নদী নিয়ন্ত্রণ সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে, নদী তথ্য কিছু জানা প্রয়োজন। সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে পরিণত হওয়ার পর, বায়ু প্রবাহে চালিত হইয়া ও উপরে বৃষ্টিতে রূপান্তরিত হইয়া জমীতে পড়ে। নদীর অববাহিকা হইতে বৃষ্টির জল ক্রমশঃ নদীর গর্ভপথে সঞ্চিত হইলে, জল প্রবাহ শেষ পর্য্যন্ত সমুদ্রে ফিরিয়া আসে এবং সমুদ্র জলের স্বাভাবিক সমতা এই প্রকারে রক্ষিত হয়। অববাহিকার উপরিভাগের প্রস্তর ও মৃত্তিকাস্তর, বায়ুমণ্ডলের ক্ষয়কারী শক্তি দ্বারা চূর্ণীকৃত হইয়া, বৃষ্টির জলের সহিত নদীগর্ভে পড়িয়া পলিমাটির সৃষ্টি করে। এই পলিমাটি, জলস্রোতের সহিত নীত হইয়া, নদীর নির্গম পথে সমুদ্রতটে সঞ্চিত

কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে স্মারকলিপিতে তাহা সম্যক বর্ণিত হয় নাই; এজন্য তাঁহারা আশা করেন, যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারকালে এই বিষয়টির উপর যেন উপযুক্ত লক্ষ্য রাখা হয়।

ইহাও জানা যায়, যে ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত পরামর্শদাতা, তাঁহার মন্তব্যে হুগলী নদীর জোয়ার ভাটার ফলে, নিম্ন দামোদরের নির্গম পথে বালুর চর পড়িবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষ, দামোদর উপত্যকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবেন না। ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়াছেন, যে সময় জলরোধক বাঁধ হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জল ছাড়িয়া দিলে, এই জল নিম্ন দামোদর পথে বেগে প্রবাহিত হইয়া, গর্ভপথ ভাল ভাবে বজায় রাখিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে, যে "নদীতে যখন জলপ্রবাহ খুবই অল্প থাকে, তখন জলপ্রবাহের পরিমাণ হঠাৎ বৃদ্ধি করা হইলে, তাহার সুফল নদীর উপরের অংশে অল্প-বিস্তর হইলেও, যতই নদীর নির্গমপথের দিকে যাওয়া যায়, ততই উহা কমিতে থাকে।" সুতরাং হুগলীতে নির্গমপথে, নিম্ন দামোদরের সঙ্কুচিত নালাতে ইহার কোন ফলই হইবে না। নদীনালা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মনীষীদের মত এই যে "কেবলমাত্র নদীর অধিত্যকায় জলরোধক বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া এবং নিম্ন নদীপথের উন্নতি সাধন না করিয়া, নদীনিয়ন্ত্রণ সম্ভব নহে।"

৯—নৌগমন। আসানসোলের নিকট খনি ও কারখানা অঞ্চলের সহিত, হুগলী নদী অঞ্চলের অধিকতর যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য। টেনেসী নদীকে নয়টি জলরোধক বাঁধের দ্বারা নয়টি হ্রদে রূপান্তরিত করিয়া, টি ভি এ কর্ত্তৃপক্ষ ৬৫০ মাইল নদীপথে সর্ব্বপ্রকার শক্তিচালিত নৌচালনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু জলরোধক বাঁধ নির্ম্মাণের পর নিম্ন দামোদর পথের এতই অবনতি ঘটিবে, যে নৌচালন দূরের কথা, নদীগর্ভ মজিয়া তাহাতে গাছ গাছড়া জন্মাইবে। অবশ্য ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষ, সেচ-বনাম-নৌচালন উপযোগী খাল, হুগলী নদীর সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ দুইটি উদ্দেশ্যযুক্ত খালের গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা আছে, এবং এই কারণে সেচ খালকে নৌচালন উপযোগী রাখিবার নীতি ভারতবর্ষে পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষের নৌচালন উদ্দেশ্যও সুফল পাইবে না।

১০—জল বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন। জলরোধক বাঁধগুলিতে ১৯০,১৫০ কিলোওয়াট (Kilowatt) উৎপাদনকারী শক্তি কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষ করিতেছেন। প্রাথমিক স্মারকলিপির ১৭ পৃষ্ঠায়, ৮৩ প্যারায় বলা হইয়াছে যে "গ্রীষ্মকালে জল বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্রগুলি মাত্র ৬৭,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদনে সক্ষম হইবে, এবং অবশিষ্ট ১০৫,০০০ কিলোওয়াট কয়লার উত্তাপ চালিত শক্তিকেন্দ্রে উৎপন্ন হইবে।" ধান্যের চাষে, সেচকার্য্যের জন্য বর্ষাকালের ৪ মাসে সঞ্চিত জলরাশি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়ায়, অবশিষ্ট ৮ মাসে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে জল থাকিবে, তাহাতে ৬৫,০০০ কিলোওয়াট মাত্র উৎপাদন সম্ভব হইবে। সুতরাং এ ৮ মাসের জন্য অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি কয়লার তাপতাড়িত শক্তি কেন্দ্রে উৎপন্ন হইবে। সহজেই অনুমান করা যায়, যে দুই প্রকার শক্তি কেন্দ্র—জল বৈদ্যুতিক ও কয়লার তাপতাড়িত রাখিলে শক্তি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকেন্দ্রে উৎপন্ন শক্তি হইতে যদি সুলভ হয়, তবেই ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষের উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তি বিক্রয় হইবে।

১১—উপসংহার। ইহা সুনিশ্চিত, যে ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষ, যে সলিল সম্পদ অযথা বহিয়া যাইতেছে বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা সেচ কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু দামোদর অধিত্যকার জলপ্রবাহ সেচখালে অপসারিত হইলে, নিম্ন দামোদর পথের প্রভূত অবনতি ঘটিবে এবং হুগলী নদীতে দামোদর নির্গমপথ সঙ্কুচিত হওয়ায়, বন্যাজনিত ক্ষতি গুরুতর হইবে। বন্যার জল সঙ্কুচিত নির্গমপথে হুগলী নদীতে প্রবাহিত হইতে না পারায় সেচ অঞ্চলগুলিকে নিমজ্জিত করিয়া শস্য নষ্ট করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডি ভি সি কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান উদ্দেশ্য—বন্যা নিয়ন্ত্রণ—সফল হইবে না; পরন্তু সেচ কার্য্যের দ্বারা অধিকতর শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইবে। নিম্ন দামোদর পথে নৌচালন সম্ভব হইবে না।

সেচখাল—বনাম—নৌচালন খাল ভারতবর্ষে সফল হয় নাই এবং এই নীতি এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৎসরের ৮ মাস, জল—বৈদ্যুতিক শক্তিকেন্দ্রে মাত্র ৬৫,০০০ কিলোওয়াট উৎপন্ন হইবে, যদিও এগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ১,৯৮,৯৫০ কিলোওয়াট। এই ৮ মাস, অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক শক্তি কয়লা তাপ তাড়িত শক্তিকেন্দ্রে উৎপন্ন হইবে। দুই প্রকার শক্তিকেন্দ্র চালাইবার ফলে, বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে। বৈদ্যুতিক শক্তির বিক্রয়, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকেন্দ্রের বিক্রয় মূল্য হইতে সুলভ হইলেই সম্ভব হইবে। সব চেয়ে অত্যাবশ্যক বিষয় এই যে দামোদর 'পর্য্যাপ্ত পলিসংবাহনকারী' নদী শ্রেণীর মধ্যে গণ্য। জলরোধক বাঁধগুলির উপরের হ্রদগুলিতে জলস্রোত নিশ্চল হইলে, পর্য্যাপ্ত পরিমাণ পলি জমিয়া, হ্রদের জলধারণ ক্ষমতা কয়েক বৎসরের মধ্যে কমিয়া যাইবে এবং মজিয়া যাওয়া হ্রদগুলির নদী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লুপ্ত হইবে। জলরোধক বাঁধ ও হ্রদের সাহায্যে নদী নিয়ন্ত্রণ কেবলমাত্র 'অত্যল্প পলি সংবাহনকারী' নদীতেই প্রযোজ্য। মুসোরীর ন্যায় 'পর্য্যাপ্ত পলি সংবাহনকারী' নদীর পক্ষে ইহা প্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায়, মুসোরী উপত্যকা কর্ত্তৃপক্ষ (Mussoari Valley Authority) আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। সুতরাং দামোদরের ন্যায় 'পর্য্যাপ্ত পলি-সংবাহনকারী' নদীতে টি ভি এ পরিকল্পিত জলরোধক বাঁধ ও হ্রদ সাহায্যে নদী নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে তাপ্তি, নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি 'অত্যল্প পলিসংবাহনকারী' নদীতে, টি ভি এ পদ্ধতি অনুসারে নদী নিয়ন্ত্রণ হইতে পারে।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

স্কন্ধাবারে

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর স্কন্দগুপ্ত শিবিরের একটি কক্ষে শয্যায় শায়িত হইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। দুইজন সম্বাহক তাঁহার পদসেবা করিতেছিল, একজন কিঙ্করী চামর ঢুলাইয়া ব্যজন করিতেছিল। ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ! সেকালে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামের রীতি ছিল; রাজা হইতে আপামর সাধারণ সকলেই দ্বিপ্রহরে কিয়ৎকালের জন্য রাজবৎ আচরণ করিতেন।

স্কন্দের বস্ত্রাবাসে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ, তন্মধ্যে এইটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এটি মন্ত্রগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত; সেনাপতি ও অমাত্যগণের সহিত বসিয়া রাজা মন্ত্রণা করিতেন। সিংহাসনাদি কিছুই ছিলনা; ভূমির উপর স্থূল আস্তরণ বিস্তৃত; তদুপরি রাজার জন্য উচ্চ গদির শয্যা। মন্ত্রণাকালে ইহাই রাজার আসন; দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের জন্য ইহাই তাঁহার পালঙ্ক।

কিন্তু বিধাতা যাহাকে অসামান্য কর্মভার প্রদান করিয়াছেন তাহার বিশ্রামের সময় কোথায়? স্কন্দের তন্দ্রা থাকিয়া থাকিয়া বিঘ্নিত হইতেছিল। গুপ্তচর চুপি চুপি প্রবেশ করিয়া তাঁহার কানে কানে কথা বলিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল। আবার কিছুক্ষণ পরে অন্য গুপ্তচর আসিতেছিল—

এইরূপ অর্ধ-তন্দ্রিত অবস্থায় স্কন্দের মস্তিষ্কের ক্রিয়া চলিতেছিল—হূণ পঞ্চাশ ক্রোশ উত্তরে দল বাঁধিতেছে··· কোন দিকে যাইবে? এক—আমাকে আক্রমণ করিতে পারে······তাহা বোধহয় করিবে না! দুই—আমাকে পাশ কাটাইয়া আর্যাবর্তের সমতল ভূমিতে নামিবার চেষ্টা করিতে পারে······তাহা করিতে দিব না। তিন—আমাকে দক্ষিণে রাখিয়া বিটঙ্ক রাজ্যটা অধিকার করিয়া বসিতে পারে···বিটঙ্ক রাজ্যের রাজাটা হূণ······সম্মুখে শত্রু ভাল, কিন্তু পিছনে শত্রু যদি ঘাঁটি গাড়িয়া বসে······

দুই তিন দণ্ড এইভাবে কাটিবার পর স্কন্দের তন্দ্রাবেশ দূর হইল; তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। সম্বাহকদের হস্ত সঞ্চালনে বিদায় করিয়া স্কন্দ ডাকিলেন, 'পিপুল!'

কক্ষের এক অন্ধকার কোণে বিপুলকায় রাজবয়স্য পিপ্পলী মিশ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথেচ্ছা প্রসারিত করিয়া রাজবৎ আচরণ করিতেছিলেন, স্কন্দের আহ্বানে জাগিয়া উঠিয়া একটি প্রকাণ্ড জৃম্ভন ত্যাগ করিলেন। বলিলেন—'বয়স্য আমি ঘুমাই নাই, চক্ষু মুদিয়া ব্রাহ্মণীর চিন্তা করিতেছিলাম।'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—'পিপুল, ব্রাহ্মণীর জন্য কি বড়ই বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছ?'

'ঠিক বিরহ নয়; তবু চারিদিক ফাঁক-ফাঁক ঠেকিতেছে।' বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজসমীপে আসিয়া বসিলেন।

যে কিঙ্করী চামর ঢুলাইতেছিল, রাজা তাহাকে বলিলেন—'লহরি, বয়স্যের জন্য তাম্বূল আনয়ন কর।'

কিঙ্করী চামর রাখিয়া চলিয়া গেল। লহরী নাম্নী এই দাসীটি উত্তীর্ণ-যৌবনা কিন্তু সুদর্শনা। স্কন্দের যৌবনকাল হইতে সে তাঁহার সেবা করিয়াছে, যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। রাজপরিজনের মধ্যে লহরীই একমাত্র নারী; স্কন্দ যাহার হস্তে আপন গৃহস্থালীর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সে তাঁহার পাচিকা সন্নিধাতা তাম্বূল করঙ্কবাহিনী দেহরক্ষিণী। যুদ্ধ শিবিরে ছায়ার ন্যায় সে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। রক্ষিণীর ন্যায় তাঁহাকে চোখে চোখে রাখিত। স্কন্দ তাহাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করিতেন।

পিপ্পলী মিশ্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'কবি কালিদাস লিখিয়াছেন—কিং পুনর্দূরসংস্থে; মেঘ দেখিলে

প্রবাসী ব্যক্তির নাকি বড়ই কষ্ট হয়। * মেঘ না দেখিযাই আমার যেরূপ অবস্থা—

'তোমার কিরূপ অবস্থা ?'

'এত সৈন্যসামন্ত রহিয়াছে, তবু মনে হয় যেন কেহ নাই। বয়স্য, বয়স যতই ঝরিতে থাকে গৃহিণীর অভাবে দশদিক ততই শূন্য মনে হয়। কিন্তু এসকল গূঢ় বৃত্তান্ত তুমি বুঝিবে না। গৃহিণী কী বস্তু তাহা তো ইহজন্মে জানিলে না!'

'গৃহিণী কী বস্তু ?'

পিপ্পলী বলিলেন—'গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

স্কন্দ বলিলেন—'তোমার অবস্থা দেখিতেছি শঙ্কাজনক; বারম্বার কালিদাস আবৃত্তি করিতেছ। তোমার যুদ্ধ দেখিবার সাধ হইয়াছিল তাই সঙ্গে আনিয়াছিলাম; এমন জানিলে তোমার ব্রাহ্মণীকেও সঙ্গে লইয়া আসিতাম।'

'না বয়স্য, এই ভাল। আমার একটু ক্লেশ হইতেছে তাহাতে ক্ষতি নাই। সে যদি আসিত, এত সৈন্য আর হাতী ঘোড়া দেখিয়া ভয়েই মরিয়া যাইত।' পিপ্পলী মিশ্র অতিদীর্ঘ নিশ্বাস মোচন করিলেন; মনে হইল নিশ্বাসটি তাঁহার মূলাধার চক্রে জন্মলাভ করিয়া ষট্চক্র ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

এই সময় কিঙ্করী তাম্বূল করঙ্ক আনিয়া পিপ্পলী মিশ্রের অগ্রে রাখিল এবং পুনর্বার চামর লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। তাম্বূল পাইয়া ব্রাহ্মণের মুখ প্রফুল্ল হইল, তিনি শঙ্কুলার সাহায্যে গুবাক কাটিয়া স্বয়ং তাম্বূল রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

স্কন্দ তখন বলিলেন—'পিপুল, এবার হূণের সহিত যুদ্ধ করার এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছি।'

পিপুল হৃষ্ট হইয়া বলিলেন—'ভাল ভাল। পলাণ্ডু-সেবী দুর্গন্ধ ছুছুন্দরগুলাকে ভাল করিয়া শিক্ষা দাও। কী পন্থা বাহির করিয়াছ ?'

স্কন্দ বলিলেন—'দেখ, হূণেরা ঘোড়ার পিঠে ছাড়া যুদ্ধ করিতে পারেনা। কিন্তু পার্বত্য দেশে ঘোড়ায় চড়িয়া যুদ্ধ ভাল হয়না! তাই স্থির করিয়াছি—'

পিপুল বলিলেন—'বুঝিয়াছি, হস্তী চড়িয়া যুদ্ধ করিবে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তুমি একটি হস্তি-মূর্খ। আমি পদাতি দিয়া যুদ্ধ করিব।'

পিপুল অবাক হইয়া বলিলেন—'পদাতি দিয়া! তবে পাল পাল হাতী আনিয়াছ কেন ?'

স্কন্দ বলিলেন—'হাতীও কাজে লাগিবে। কিন্তু আসল যুদ্ধ করিবে পদাতি।'

'কিন্তু ইহাতে নূতন আবিষ্কার কী আছে ?'

'নূতন আবিষ্কার এই যে, পদাতিদের হাতে দ্বাদশহস্ত পরিমিত দীর্ঘ বংশদণ্ড থাকিবে।'

'অ্যাঁ! বাঁশ দিয়া হূণ তাড়াইবে ?'

স্কন্দ হাসিলেন—'শুধু বাঁশ নয়, বাঁশের অগ্রভাগে ভল্লের ফলক থাকিবে। বর্তমানে যে ভল্ল ব্যবহৃত হয় তাহার দৈর্ঘ্য মাত্র ছয় হস্ত।—কিছু বুঝিলে ?'

পিপ্পলী মিশ্র কিছুক্ষণ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া শেষে মাথা নাড়িলেন—'যুদ্ধবিদ্যায় আমার তেমন পারদর্শিতা নাই। কিন্তু তুমি যখন আবিষ্কার করিয়াছ তখন নিশ্চয় কিছু মানে আছে।'

স্কন্দ হতাশ হইয়া নিশ্বাস ফেলিলেন—'কাহাকেই বা বলি!'

এই সময় দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল, বিটঙ্ক রাজ্যের রাজকন্যা এক অনুচরসহ আয়ুষ্মানের দর্শন ভিক্ষা করেন।

স্কন্দ ঈষৎ বিস্ময়ে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন—'বিটঙ্কের রাজকন্যা! হূণ দুহিতা! লইয়া এস।'

দ্বারপাল চলিয়া গেল। লহরী একটি সূক্ষ্ম মল্লবস্ত্রের উত্তরীয় দিয়া রাজার নগ্ন স্কন্দ আবৃত করিয়া দিল। পিপুল তাঁহার তাম্বূল করঙ্ক লইয়া একপাশে সরিয়া বসিলেন।

অনতিকাল পরে রট্টা আসিয়া শিবির দ্বারের অগ্রে দাঁড়াইল, পশ্চাতে চিত্রক। রট্টার হৃদ্‌যন্ত্র দ্রুত স্পন্দিত হইতেছিল; সে দেখিল কক্ষের মধ্যস্থলে এক পুরুষ সিংহ

স্কন্দের সুগৌর দেহে জরার করাঙ্ক চিহ্নিত হয় নাই। তেজঃপুঞ্জ মুখমণ্ডল হইতে যৌবনের লাবণ্য বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার অনুভাব এত প্রবল যে শিবির প্রকোষ্ঠে অন্য কেহ আছে তাহা সহসা লক্ষ্য হয়না।

অপরপক্ষে রাজা দেখিলেন, এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। মনে হইল এক ঝলক বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

রট্টা ত্বরিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইল, পুটাঞ্জলি হইয়া বলিল—'রট্টা যশোধরার প্রণতি গ্রহণ করুন রাজাধিরাজ।' চিত্রকও রট্টার পশ্চাতে থাকিয়া রাজাকে প্রণাম করিল।

স্কন্দ হস্তের ইঙ্গিতে উভয়কে বসিবার অনুমতি দিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন—'রট্টা যশোধরা! তুমি বিটঙ্ক রাজের দুহিতা?'

'হাঁ রাজাধিরাজ।'

'হূণ কন্যা?'

রট্টার গ্রীবা ঈষৎ বক্র হইল। সে বলিল—'হাঁ, আমি হূণ কন্যা। কিন্তু সেজন্য আমার লজ্জা নাই। আমার পিতা মহানুভব পুরুষ।'

স্কন্দের অধরে অল্প হাসি দেখা দিল; তিনি বলিলেন—'তোমাকে লজ্জা দিবার জন্য এ প্রশ্ন করি নাই। তোমাকে দেখিয়া আর্যকন্যা বলিয়া মনে হয় তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।'

রট্টা বলিল—'আমার মাতা আর্য ছিলেন।'

স্কন্দ বলিলেন—'ভাল, এখন বুঝিলাম। রাজা কি তোমাকে দূতরূপে পাঠাইয়াছেন?'

'না মহারাজ, আমি নিজ ইচ্ছায় আসিয়াছি।'

স্কন্দের ভ্রূ ঈষৎ উত্থিত হইল, বলিলেন—'তুমি সাহসিনী বটে। এই বিপুল সেনা-সমুদ্রে অন্য কোনও নারী প্রবেশ করিতে পারিত না। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?'

রট্টা বলিল—'উপস্থিত এক পান্থশালা হইতে। পর্বত পার হইতে দুই দিন লাগিয়াছে।'

'দুই দিন রাত্রি কোথায় যাপন করিলে?'

'পর্বতের গুহায়।'

স্কন্দ প্রশ্ন-কুঞ্চিত চক্ষে রট্টার পানে চাহিলেন। রট্টাও নির্ভীক অকপট নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া রহিল। রাজার চক্ষু নিমেষের জন্য একবার চিত্রকের মুখের উপর গিয়া ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন—'ভাল কথা, তুমি কুমারী না বিবাহিতা?'

রট্টা বলিল—'আমি কুমারী।' চিত্রকের দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল—'ইনি চিত্রক বর্মা, বিটঙ্ক রাজার এক সেনানী।'

চিত্রক আবার যোড়হস্তে প্রণাম করিল। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় সে পূর্বেই কটিদেশে লুকাইয়াছিল।

স্কন্দ বলিলেন—'তোমরা অবশ্য কোনও প্রয়োজনে আমার নিকট আসিয়াছ। কিন্তু পথ লঙ্ঘন করিয়া তোমরা ক্লান্ত; আজ বিশ্রাম কর, কাল তোমাদের কথা শুনিব।'

রট্টা বলিল—'দেব, গুরুতর রাজকার্যে আপনার নিকট আসিয়াছি; অগ্রে আমার বক্তব্য নিবেদন করিব, তারপর বিশ্রাম।'

স্কন্দ বলিলেন—'ভাল! কিন্তু তৎপূর্বে একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি। বিটঙ্ক রাজার নিকট পত্র দিয়া আমি এক দূত পাঠাইয়াছিলাম। সে দূত কি পৌঁছে নাই?'

পিপ্পলী অদূরে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন, জনান্তিকে বলিলেন—'শশিশেখর—আমার ব্রাহ্মণীর ভ্রাতুষ্পুত্র।'

রট্টা একবার চিত্রকের দিকে কটাক্ষ করিল; চিত্রক বলিল—'দূতের কথা জানিনা আয়ুষ্মন্‌, কিন্তু রাজকীয় পত্র পৌঁছিয়াছে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তবে পত্রের উত্তর আমি পাই নাই কেন?'

রট্টা বলিল—'মহারাজ আমার বক্তব্য শুনিলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন।'

স্কন্দ শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি দিলেন। রট্টা তখন চষ্টনদুর্গে ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিল, কেবল চিত্রকের দূত পরিচয় গোপন রাখিল। রাজা মনোযোগের সহিত শুনিলেন। বৃত্তান্ত শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'এই কিরাত কি হূণ?'

রট্টা বলিল—'হাঁ মহারাজ, আমারই মতন।'

স্কন্দ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিলেন—'তোমার মতন অল্পই আছে। তোমার ন্যায় পিতৃভক্তি কর্তব্যনিষ্ঠা সাহস অতি বিরল। কিরাতের দোষ নাই; রূপে ও গুণে তুমি সকল পুরুষের লোভনীয়া।' বলিয়া মৃদু হাসিলেন।

রট্টা নতমুখে রহিল। স্কন্দ তখন বলিলেন—'আমি তোমার পিতাকে উদ্ধার করিব। আমার নিজেরও স্বার্থ আছে।' লহরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—'লহরি, গুলিক বর্মাকে ডাকিয়া পাঠাও।'

লহরী এতক্ষণ একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছিল এবং স্কন্দের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে চামর রাখিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

গুলিকবর্মা একজন কনিষ্ঠ সেনানায়ক এবং স্কন্দের পার্শ্বচর; ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ মূর্তি; ধূমকেতুর ন্যায় গোঁফ। সে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে স্কন্দ প্রশ্ন করিলেন—'গুলিক, চষ্টনদুর্গ কোথায় জানো?'

গুলিক বলিল—'জানি আয়ুষ্মণ। চষ্টন দুর্গ বিটঙ্ক রাজ্যের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত। এখান হইতে প্রায় বিংশ ক্রোশ উত্তর-পূর্বে।'

স্কন্দ বলিলেন—'শোনো। চষ্টনদুর্গের দুর্গাধিপ কিরাত বিটঙ্ক রাজকে ছলে নিজ দুর্গে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি একশত অশ্বারোহী লইয়া কল্য প্রত্যূষে যাত্রা করিবে। বিটঙ্ক রাজ্যের এই সেনানী চিত্রক বর্মা তোমার সঙ্গে যাইবেন। তুমি দুর্গাধিপ কিরাতকে আমার নাম করিয়া বলিবে যেন তদ্দণ্ডেই বিটঙ্করাজকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে। অতঃপর রাজাকে লইয়া তুমি অবিলম্বে ফিরিয়া আসিবে।'

গুলিক বলিল—'যথা আজ্ঞা। যদি কিরাত রাজাকে সমর্পণ করিতে সম্মত না হয়?'

'তাহাকে বলিও—আদেশ উপেক্ষা করিলে সহস্র রণহস্তী লইয়া আমি স্বয়ং গিয়া তাহার দুর্গ সমভূমি করিব।'

'আজ্ঞা। যদি তাহাতেও ভয় না পায়?'

'তখন আমার কাছে দূত পাঠাইবে। উপস্থিত চিত্রক বর্মাকে তোমার শিবিরে লইয়া যাও, উত্তমরূপে

চিত্রক একটু ইতস্তত করিল, কিন্তু স্কন্দের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। সে রট্টার প্রতি একবার পশ্চাদ্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গুলিক বর্মার সহিত প্রস্থান করিল।

চিত্রককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া রট্টার মনে ঈষৎ শঙ্কার উদয় হইল। কিন্তু সে তাহা দমন পূর্বক অল্প হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—'আর আমি? আমি কি চষ্টন দুর্গে যাইব না?'

স্কন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'না। তুমি আমার শিবিরে থাকিবে। তুমি রাজকন্যা; অনেক বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আমার কাছে আসিয়াছ। আবার তোমাকে বিপদের মুখে পাঠাইব না।'

রট্টা বলিল—'দেব, আপনার অসীম করুণা। কিন্তু—'

স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা যশোধরা, ভয় করিও না। তুমি তোমার পিতার প্রাসাদে যেরূপ নিরাপদে থাকিতে আমার শিবিরে তদপেক্ষা অধিক নিরাপদে থাকিবে।—লহরি, রাজকন্যাকে লইয়া যাও। উনি পথশ্রান্ত; তোমার উপর মাননীয়া অতিথির পরিচর্যার ভার রহিল।'

ইহার পর রট্টার মুখে আর আপত্তির কথা যোগাইল না। লহরী তাহার পাশে আসিয়া স্নিগ্ধস্বরে বলিল—'আসুন কুমার ভট্টারিকা।'

লহরী রট্টাকে লইয়া প্রস্থান করিলে পিপ্পলী মিশ্র জানু সাহায্যে রাজার পাশে আসিয়া বসিলেন, তাঁহার কানে কানে বলিলেন—'বয়স্য, কেমন দেখিলে?'

স্কন্দ মৃদুহাস্যে বলিলেন—'অপূর্ব।'

পিপ্পলী বলিলেন—'তবে আর বিলম্ব করিও না। যদি গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন করিতে চাও, এই সুযোগ। গৃহিণী সচিবঃ সখী—এমনটি আর পাইবে না।'

স্কন্দ স্মিতমুখে নীরব রহিলেন।

* * *

নৈশ ভোজনের পর রাত্রি প্রথম প্রহরে চিত্রক রট্টার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। প্রত্যূষে যাত্রা করিতে হইবে।

কক্ষে আর কেহ ছিল না; দীপদণ্ডে স্নিগ্ধ জ্যোতি বর্তিকা জ্বলিতেছিল। রট্টা আসিয়া চিত্রকের হাত ধরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—'আমি তোমার সঙ্গে যাইতে

নিম্নস্বরে কথা হইতে লাগিল। চিত্রক বলিল—'এই ভাল। এখানে তুমি নিরাপদে থাকিবে।'

রট্টা বলিল—'তুমি কাছে না থাকিলে আর নিরাপদ মনে হয় না।'

চিত্রক রট্টার স্কন্ধের উপর হাত রাখিল—'রট্টা, লক্ষ্য করিয়াছ কি, স্কন্দ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।'

চিত্রকের মুখের কাছে মুখ আনিয়া রট্টা বলিল—'লক্ষ্য করিয়াছি। ইহাতে ভালই হইবে।'

'সে তুমি জানো।' চিত্রক রট্টার স্কন্ধ হইতে হাত নামাইয়া লইল।

রট্টা বলিল—'হাঁ, আমি জানি। আমার মন আমি জানি!'

'তবে আজ চলিলাম। আবার কবে দেখা হইবে, দেখা হইবে কিনা জানিনা।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আবার শীঘ্রই দেখা হইবে।'

চিত্রকের মনে কিন্তু কাঁটা ফুটিয়া রহিল। চতুঃসাগরা পৃথ্বীর একচ্ছত্র অধীশ্বর, তাঁহার একমাত্র মহিষী—এ প্রলোভন কোন্ নারী ছাড়িতে পারে? কিন্তু সে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না; আরও দুই চারিটি কথার পর রট্টার নিকট বিদায় লইল। মনে মনে ভাবিল, এই বুঝি শেষ সাক্ষাৎ।

অতঃপর রট্টা শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিয়ৎকাল শূন্যে চক্ষু মেলিয়া থাকিবার পর দেখিল, দাসী লহরী নিঃশব্দে পদপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। লহরী মৃদুকণ্ঠে বলিল—'দেবি, আপনার পদ-সম্বাহন করিয়া দিই?'

রট্টা স্মিতমুখে বলিল—'তুমি অনেক সেবা করিয়াছ। আর প্রয়োজন নাই।'

লহরী বলিল—'সে কি কথা। আমি পদসেবা করি, আপনি ঘুমান। আপনি ঘুমাইলে আমিও আপনার পদতলে ঘুমাইব।'

রট্টা বুঝিল, এই কক্ষটি এবং এই শয্যা লহরীর; যে বস্ত্র রট্টা পরিধান করিয়াছে তাহাও লহরীর। সৈন্য শিবিরে অন্য নারী-বস্ত্র কোথা হইতে আসিবে? রট্টা আর আপত্তি করিল না; লহরী শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাহার পদসেবা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল; তারপর রট্টা বলিল—'শিবিরে অন্য নারী কি নাই?'

'না দেবি।'

'তোমার নাম লহরী? তুমি কতদিন রাজ-সংসারে আছ?'

'দশ বৎসর বয়সে কুমার স্কন্দের তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী হইয়া রাজ-সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সে আজ বিশ বছরের কথা। সেই অবধি আছি।'

'যুদ্ধক্ষেত্রেও তোমাকে আসিতে হয়?'

'আমি না থাকিলে কুমার স্কন্দের সেবা হয় না। তিনি সেবা লইতে জানেন না। ভৃত্যেরা অবহেলা করে। তাই আমাকে আসিতে হয়।'

'তুমি এখনও রাজাকে কুমার স্কন্দ বলো?'

'হাঁ দেবি। পুরাতন অভ্যাস ছাড়িতে পারি নাই।'

'তুমি বিবাহিতা?'

'না দেবি।'

'বিবাহ কর নাই কেন?'

'আমি বিবাহ করিলে কুমার স্কন্দের সেবা কে করিবে?'

রট্টা কিছুক্ষণ লহরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। স্কন্দের প্রতি এই দাসীর মনের ভাব কিরূপ? দাস্যভাব? বাৎসল্য? সখ্য? প্রেম? হয়তো সব ভাব মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রট্টা প্রশ্ন করিল—'মহারাজ বিবাহ করেন নাই কেন?'

লহরী বলিল—'যুদ্ধ করিয়াই জীবন কাটিয়া গেল, বিবাহ করিবেন কখন? তাছাড়া, কোন্ জ্যোতিষী নাকি বলিয়াছিল তিনি চিরকুমার থাকিবেন।'

'ইহাই বিবাহ না করার কারণ?'

লহরী ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল—'কুমার স্কন্দের ভোগে রুচি নাই। মনের মধ্যে তিনি বড় একাকী; কখনও মনের সঙ্গিনী পান নাই। পাইলে হয়তো বিবাহ করিতেন।'

রট্টা বলিল—'বিবাহ করিলে হয়তো মনের সঙ্গিনী পাইতেন। কিন্তু এখন উপায় নাই।'

'উপায় নাই কেন?'

'এখন কি তিনি আর বিবাহ করিবেন?'

'তাঁহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হয় নাই। অন্তরে বাহিরে তিনি যুবাপুরুষ। উপযুক্ত সঙ্গিনী পাইলে কেন বিবাহ করিবেন না?'

'তা বটে?'

আর কোনও কথা হইল না। ক্রমে রট্টা ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না; বারবার কোন নিভৃত উৎকণ্ঠার পীড়নে ভাঙিয়া যাইতে লাগিল।

শিবিরের আর একটি কক্ষে স্কন্দ শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারও আজ ভাল নিদ্রা হইল না। (ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা

শ্রীঅণিমেশ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন দেশ, কোন বিষয়েই আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা চলে না,—স্বাধীন ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশে পরিণত হইতে হইবে। সেইজন্য মাদ্রাজের ভিজাগাপট্টমে স্থাপিত হইয়াছে জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা, আর পশ্চিম বংগের আসানসোল হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের মিহিজামে স্থাপিত হইল "চিত্তরঞ্জন রেল-ইঞ্জিন কারখানা"। সেই কারখানার শত শত লোক নিজ নিজ কর্মশক্তি দিয়া নূতন নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্য লইয়া রেল-ইঞ্জিনে ভারতকে করিয়া তুলিবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এশিয়ার মধ্যে ইহাই হইবে বৃহত্তম রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা।

ভারত মাতার অন্যতম কৃতী সন্তান চিত্তরঞ্জন দাশের নামানুসারে এই বিরাট নব-পরিকল্পিত শহরের নামকরণ করা হইয়াছে "চিত্তরঞ্জন"। আর, রেল-ইঞ্জিন নির্মাণের জন্য ভারতের একমাত্র কারখানা এই শহরেই স্থাপিত হইয়াছে। গত ১লা নভেম্বর রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতীয় রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানার নামকরণ করিয়াছেন।

সাত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই চিত্তরঞ্জন শহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কারখানা নির্মাণের সংগে সংগে শহর তৈয়ারীর কাজ এবং কর্মীবৃন্দের বাসগৃহ নির্মাণের কাজও চলিতেছে। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে তৈয়ারী হইতেছে কারখানাটি। কি বিরাট কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে তাহা অনুমান করা যায় এই সম্পর্কে ব্যয়িত জিনিষ-পত্রাদির দিকে নজর দিলেই। এই নব-পরিকল্পিত বিরাট জাতীয় কারখানার কাজ কত কম সময়ে এবং কত দ্রুতগতিতে সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি সমাধা করিতে ১৪৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।

এই কারখানার জন্য আনীত যন্ত্রপাতিগুলি আধুনিক উন্নত ধরণের এবং সুবিখ্যাত কারখানায় প্রস্তুত। এই কারখানার কতকগুলি বিভাগের কাজ ইতিপূর্বেই সুরু হইয়া গিয়াছে; বহু প্রকার বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইয়াছে। তদ্ভিন্ন পূর্ব-পাঞ্জাব রেলওয়ে এবং আসাম রেলওয়ের জন্য এই কারখানায় ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশ সমূহও প্রস্তুত কারখানায় প্রতি বৎসর ১২০টি ইঞ্জিন, ৬০টি বয়লার এবং ভারতীয় রেলওয়েসমূহকে সরবরাহ করিবার জন্য ইঞ্জিনের যন্ত্রাংশও প্রস্তুত হইবে। বর্তমানে লণ্ডনের Locomotive manufacturer Companyর সহিত এই কারখানার চুক্তি হইয়াছে। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে উক্ত কোম্পানী এই কারখানাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিবে। অতঃপর এই কারখানা সকল বিষয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে সক্ষম হইবে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রস্তাবানুসারে এই কারখানায় প্রস্তুত প্রথম ইঞ্জিনের নামকরণ হইয়াছে "চিত্তরঞ্জন"।

বিভক্ত ভারতেও ৩৩,৮৬৫ মাইল রেলপথ আছে। এত দীর্ঘ রেলপথ যে দেশে আছে তথায় ইতিপূর্বেই এইরূপ একটি কারখানা প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন ছিল। বৈদেশিক শাসকগণ ভারতে ইঞ্জিন তৈয়ারীর গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া এই বিষয়ের পরিকল্পনা করেন কিন্তু সেই পরিকল্পনা পরিকল্পনাই ছিল,—কার্যে পর্যবসিত হইতে পারে নাই। ইঞ্জিন নির্মাণ ব্যাপারে এতদিন যাবৎ ভারতীয় রেলওয়ে-গুলিকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত;—বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন প্রায় সকল রেল-ইঞ্জিনগুলি জীর্ণ এবং অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল তখন সেইগুলি পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন হইয়াছিল। ফলে, ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার ভারতে ইঞ্জিন নির্মাণ কার্যের জন্য ২৪পরগণার কাঁচড়াপাড়ায় রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন। পরে স্থান পরিবর্তন হয়, মিহিজামে;—যাহা এক্ষণে চিত্তরঞ্জন নামে অভিহিত।

স্থান নির্বাচন অতি চমৎকার হইয়াছে—কারণ, শ্রমিক, কয়লা, লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি দ্রব্যাদি এবং সর্বোপরি "দামোদর-উপত্যকা-কর্পোরেশনে"র সুবিধা অল্প ব্যয়ে, সহজে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে।

যতদিন পর্যন্ত "দামোদর-উপত্যকা-কর্পোরেশন" এই কারখানার প্রয়োজনীয় জল বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করিতে না পারিবেন ততদিন কারখানায় প্রয়োজনীয় তড়িৎশক্তি সরবরাহ করিবার জন্য একটি ছোট

গিয়াছে, এক একটি নূতন ইঞ্জিন তৈয়ারী করিতে ১,০০,০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন।

ভারতের সহকারী রেল-সচিব শ্রী কে, শান্তনম্ বলিয়াছেন, "এই কারখানা স্থাপনের ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং বৈদেশিক বিনিময় খাতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ কোটি টাকা বাঁচিবে। এই কারখানায় সরাসরি ভাবে ছয় হাজার শ্রমিক নিযুক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরোক্ষভাবেও যত লোক নিযুক্ত হইবে, তাহাদের সংখ্যাও কম হইবে না।"

এই সকল কর্মীবৃন্দের বাসোপযোগী আবাস গৃহাদি নির্মিত হইবে। প্রতিটি গৃহে বিদ্যুৎ, অবিরাম জলসরবরাহ, স্নানাগার ও স্যানিটারী পায়খানা, পৃথক পৃথক রান্নাঘর, প্রভৃতি থাকিবে। শহরের জল নিকাশের বেশ সুন্দর এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায় গ্রহণ করা হইয়াছে। জল নিষ্কাশনের জন্য পাকা ড্রেনের ব্যবস্থাও আছে। তাহা ছাড়া, পল্লীতে পল্লীতে দোকান, স্কুল, খেলার মাঠ, ঔষধালয়, মাতৃসদন, পার্ক, লেক ও আমোদ-প্রমোদ ভবন রহিয়াছে।

স্বাধীন ভারতের এই বিরাট পরিকল্পনাকে সার্থক করিতে ভারতবাসীর দায়িত্ব বড় কম নয়। সর্বশেষে রাষ্ট্রপতির কথাতেই বলি, "দেশবন্ধুর মহৎ জীবন দেশবাসীকে প্রেরণা দিক, এই কামনাই করি।"

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আন্দামানে বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমগ্র আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্ণ আয়তন ২৫০৮ । অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলির মোট আয়তন ৩০৮ বর্গ মা দিলে উত্তর দক্ষিণে লম্বা আন্দামানের প্রধান দ্বীপটির আয়তন ০০ বর্গ মাইল। এই দ্বীপটি লম্বায় ১৯২ মাইল, কাজেই গড়ে ইহার প্রস্থ ১১ৡ মাইল। অবশ্য বাস্তবভাবে ইহার প্রস্থ কোথাও ২০।২৫ মাইল, কোথাও বা ৫।৬ মাইল হইবে। এই ভূখণ্ডের সমস্তই ভারতীয় বনবিভাগের অধীন এবং সেই বনবিভাগেরই বিশেষজ্ঞগণের মতে এই অংশের অর্দ্ধেক স্থান লোকবসতির জন্য গাছ কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও দ্বীপের স্বাস্থ্য, উর্ব্বরা শক্তি এবং পানীয়ের জলধারা কোন কিছুই ব্যাহত হইবে না। অর্থাৎ দেখা যায় যে, ১১০০ বর্গ মাইল স্থান লোকালয়ে পরিণত করা যায়। এই এগারশত বর্গ মাইলের মধ্যে দক্ষিণ আন্দামানের ১০০ বর্গ মাইল স্থান এ পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইয়া মধ্যে মধ্যে লোকালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই একশত বর্গ মাইলের মধ্যে ১৬ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান বর্ত্তমানে পোর্ট ব্লেয়ার সহর ও সহরতলীরূপে পরিগণিত অর্থাৎ বাকী ৮৪ বর্গ মাইল দেশ আন্দামানের কয়েদী এবং জাপানীদের দ্বারা গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্ররূপে এ পর্য্যন্ত গঠিত হইয়াছে। অতএব এই একশত বর্গ মাইল পরিমিত স্থান ছাড়া এখনও ১০০০ বর্গ মাইল পরিমিত বনভূমি পরিষ্কৃত করিয়া পুনর্ব্বসতির কার্য্যে নিয়োগ করা যায়। এই সহস্র বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ খাল, বিল এবং উপনদীর জন্য স্বতন্ত্রভাবে ছাড়িয়া দিলে ৭০০ বর্গ মাইল স্থান সম্পূর্ণরূপে ঘর বাড়ী এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে। এই ৭০০ বর্গ মাইলের প্রস্তাবিত লোকালয়ের মধ্যে প্রতি বর্গ মাইলে ৩০০ জন হিসাবে বাসিন্দা বসাইলে উহা অর্থনীতি, কৃষিব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া বেশ সুষ্ঠু ও সুগঠিত গ্রামেই পরিণত হইবে। প্রতি বর্গ মাইলে ৩০০ ব্যক্তির হিসাব করিয়া বর্ত্তমানে মাত্র ২০০ জন হিসাবে বসানো যুক্তিযুক্ত, কারণ ভবিষ্যতে ইহাদের সন্তান সন্ততি হইয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। স্বাস্থ্যকর স্থানে সভ্য মানুষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটামুটি বৎসরে শতকরা একজন হিসাবে হইয়া থাকে। এই হিসাবে আগামী ৫০ বৎসর ধরিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ৫০ বৎসর কালে প্রতি বর্গ মাইলে অধিবাসী সংখ্যা ৩০০ জন করিয়া হইবে। অবশ্য নূতন ঔপনিবেশিক অঞ্চলে ইহা অপেক্ষা কিছু দ্রুতগতিতেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কারণ পাঁচ দশবৎসর পর হইতেই ঔপনিবেশিকদের আত্মীয়স্বজনরা সুবিধা বুঝিয়া আসিতে আরম্ভ করিবে। মোটের উপর বর্ত্তমানে প্রতি বর্গ মাইলে ২০০ জন করিয়া বসানো হইলে আগামী ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ একপুরুষের মধ্যেও দ্বীপে জনবসতির কোনরূপ চাপ অনুভূত হইবে না। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া যায় যে, অবিভক্ত বাংলায় প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০০ জন হিসাবে, তবে ইহাই ছিল ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতি পূর্ণ স্থান। উপরন্তু এই হিসাবের মধ্যে নদী ও জলা জায়গা বাদ দিয়া গণনা করা হয় নাই, অর্থাৎ উহা বাদ দিয়া হিসাব করিলে লোকবসতির ঘনতা বাংলা দেশে আরও অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। অতএব শেষ পর্য্যন্ত ৭০০ বর্গ মাইলের প্রতি বর্গ মাইলে ২০০ জন হিসাবে ধরিলে ১,৪০,০০০ ব্যক্তিকে এখনই বসানো যায়। এ ছাড়া যে ১০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থান লোকালয়ের উপযুক্ত রহিয়াছে, উহাতেও এই হিসাবে ২০,০০০ লোক বসানো যায়, তবে এই স্থানে ইতিমধ্যেই ৬০০০ স্থায়ী বাসিন্দা রহিয়াছে,

এবং কুলী, শ্রমিক ও অন্যান্য চাকুরিয়া বাবদ আরও ৯,৯০০ অস্থায়ী ভাগ্যান্বেষী রহিয়াছে। মোটের উপর এই একশত বর্গ মাইলের মধ্যে বর্ত্তমানে ১৫,৯০০ ব্যক্তি রহিয়াছে। শ্রমিকের কাজ যদি ভারত হইতে আমদানী করা ভাড়াটিয়া শ্রমিকের পরিবর্ত্তে ঔপনিবেশিকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে মোটামুটি হিসাবে স্থায়ী বাসিন্দাদের কথা মনে রাখিয়াও বলা যায় যে, কমবেশী আরও ১০,০০০ লোককে বর্ত্তমানের তৈরী গ্রাম গুলিতেই বসানো সম্ভব, অর্থাৎ সর্ব্বসাকুল্যে এখনই উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা করিয়া দেড়লক্ষ বাস্তুহারাকে আন্দামানে খুব ভালোভাবে বসবাস করাইবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। ইহা ভিন্ন এখানকার শিল্পোন্নতি করিবার ব্যবস্থা করিলে আরও অধিকসংখ্যক লোক বসানো সম্ভব, তবে তাহা কথঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ।

আন্দামানের একটি মাত্র দ্বীপেই এই ভাবে দেড়লক্ষ লোকের পুনর্ব্বাসন সম্ভব। এ ছাড়া এখানে আরও অনেকগুলি ছোট এবং বড় দ্বীপ রহিয়াছে। সেগুলিতেও লোকবসতি হওয়া সম্ভব। Little Andaman নামে পরিচিত দ্বীপটিতে অঙ্গি নামক এক জাতীয় আদিম অধিবাসী বাস করে। তাহারা একেবারেই বিপজ্জনক নহে। এমন কি তাহাদের সহিত সভ্যজগতের আগন্তুকদের বিবাহও হইয়াছে। Rutland দ্বীপে এইরূপ এক বর্ম্মী অঙ্গি স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত শিশুদেরই লইয়া বাস করিতেছে। Little Andaman-এ একজন চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অঙ্গি স্ত্রী লইয়া বাস করিতেছেন। অঙ্গিদের সহিত বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়া সেখানে বাঙ্গালীর বসবাস করা সম্ভব। এ ছাড়া আন্দামানের দক্ষিণে অবস্থিত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও মোটের উপর ১৯টি দ্বীপ আছে। ঐ উনিশটির মধ্যে ১২টিতে লোকালয় আছে। ঐ গুলির মধ্যে 'কার নিকোবরে'র আয়তন ৪৯ বর্গ মাইল কামোর্টা ও নন্‌কৌড়ীর আয়তন ৭৭ বর্গ মাইল, Little Nicobar-এর আয়তন ৫৭॥০ বর্গ মাইল এবং গ্রেট নিকোবরের আয়তন ৩৩৩ বর্গ মাইল। এগুলি সমস্তই ভারত সরকারের সম্পত্তি এবং আন্দামানের পুনর্ব্বাসন কার্য্য সাফল্যলাভ করিলে এগুলিতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের লোকালয় গঠিত হওয়া খুবই সম্ভব। এই সমস্ত ক্ষুদ্র দ্বীপের ঔপনিবেশিকগণ সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ব্যাপারে এবং সুপারী ও নারিকেল চালান দেওয়ার কার্য্যে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী বন্ধুরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করাইতে পারিবে এবং বিপদের দিনে এই সমস্ত দ্বীপ বঙ্গোপসাগরের মুখে জলপথের সুদৃঢ় ঘাঁটীরূপে ভারত রক্ষার কার্য্যে নিজেদের উপযোগিতা প্রমাণ করিবে। তবে এগুলির পুনর্ব্বাসন সমস্তই নির্ভর করে আন্দামানের পুনর্ব্বাসনের সাফল্যের উপর।

আন্দামানের অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার দ্বীপ এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কথা বাদ দিয়া বর্ত্তমানে আন্দামানের প্রস্তাবিত দেড় লক্ষ লোকের পুনর্ব্বসতির জন্য আন্দামানের সাধারণ উর্ব্বরাশক্তি লক্ষ্য করিয়া কি পরিমাণ জমী কি বাবদ নিয়োগ করিতে হইবে, তাহার দুধ, ডিম, মাংস, বাদ দিয়া দেড় লক্ষ লোকের জন্য প্রয়োজনীয় কৃষিজ খাদ্য এবং বার্ষিক মাথা পিছু ২৫ গজ করিয়া কাপড়ের উপযুক্ত তুলা উৎপাদনের জন্য নিম্নলিখিত পরিমাণ জমী অবশ্য প্রয়োজনীয় :—

দেড় লক্ষ লোকের উপযুক্ত
চাউল, গম, ডাল, ইক্ষু,
সুপারী, ফল ও তরকারীর জন্য
জমী প্রয়োজন—৮৮, ৬৫০ একার
ও তৎসংলগ্ন পতিত জমী ১৩, ২৯৭'৫ একার *
মোট ১,০১, ৯৪৭'৫ একার

ইহাদের জন্য মাথা পিছু
২৫ গজ হিসাবে কাপড়ের
উপযোগী তুলা উৎপাদনের
জন্য প্রয়োজন—— ১১, ২৫০ একার
ও তৎসংলগ্ন পতিত জমী ১,৬৮৭'৫ একার *
মোট ১২,৯৩৭'৫ একার

আহার্য্য ও পরিধেয়র জন্য প্রয়োজন সর্ব্বসাকুল্যে ১,১৪,৮৮৫ একার

এ ছাড়া দেড় লক্ষ লোক অর্থাৎ, গড়পড়তা প্রতি পরিবারে ৫জন করিয়া লোক ধরিলে মোটের উপর ৩০,০০০ পরিবারের প্রতি পরিবারের বসত বাটীর জন্য অর্দ্ধ একার (অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক দেড় বিঘা) হিসাবে বাস্তু জমী ধরিলে আরও ১৫,০০০ একার বাস্তু জমী চাই। এই দেড় বিঘা জমীর বসত বাটীতে পারিবারিক প্রয়োজনের উপযুক্ত গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদি পালন করা সম্ভব। একসঙ্গে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, দেড় লক্ষ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ১,১৪,৮৮৫ একার এবং বাসের জন্য ১৫,০০০ একার মোট ১,২৯,৮৮৫ একার জমী প্রয়োজন। এক বর্গ মাইলে ৬৪০ একার জমী, অর্থাৎ ৭০০ বর্গ মাইলে ৪,৪৮,০০০ একার জমী হয়। দেড় লক্ষ লোকের কেবলমাত্র আহার, পরিধেয় ও বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ১,১৯, ৮৮৫ একার জমী বাদ দিলে ৭০০ বর্গ মাইল হইতে উদ্বৃত্ত থাকে ৩,১৮,১১৫ একার। এই উদ্বৃত্ত জমীতে যে কৃষি এবং পশুপালন হইবে, তাহার সবটাই এই দেড় লক্ষ অধিবাসীর নিকট উদ্বৃত্ত সম্পদ। ইহা বিক্রয় করিয়া তাহারা নগদ টাকা উপার্জ্জন করিবেন। সরকারী চেষ্টা ও ঔপনিবেশিকদের আন্তরিকতাপূর্ণ পরিশ্রমে আন্দামানের মাটীতে অন্যূন দেড় লক্ষ বাস্তুহারা অত্যন্ত সহজভাবে লক্ষ্মীলাভ করিতে পারিবেন।

---

* এই পতিত জমীগুলি বিশেষ প্রয়োজন। এই জমীতে বাঁশ, খুঁটী এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় কাঠ ও জ্বালানী কাঠ ইত্যাদির গাছ হইবে। এই সমস্ত পতিত জমীতে এই গাছ না লাগাইলে বর্ষার বৃষ্টিপাতে জমী ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে (Soil erosion), এবং পানীয় জলের স্বাভাবিক ভাবে রক্ষা ও পরিশ্রবণের জন্যও এই সমস্ত গাছ ও ছোট ছোট জঙ্গল লোকালয়ের আশে পাশে catchment areaরূপে থাকা

বর্ত্তমানে যে সমস্ত কৃষক পরিবার বিপৎসঙ্কুল পূর্ব্ব বাংলার মায়া কাটাইয়া বঙ্গোপসাগরের এই স্বাস্থ্যময় সুন্দর দ্বীপটিতে স্থায়ী বাসভূমি গঠন করিবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছেন বা করিতেছেন, অতি বিচক্ষণ লোকেরা হয়ত তাহাদের ধৃষ্টতা দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই এই ঔপনিবেশিক কৃষকের দল ধনে শস্যে লক্ষ্মীলাভ হইবে এবং এই অতি বিচক্ষণেরা হয়ত তখন ইহদেরই নিকট অল্প স্বল্প লাভের আশায় ঘোরাঘুরি করিবেন। আত্মবিস্তারের ক্ষমতাই প্রাণশক্তির অন্যতম পরিচয়; সম্পদের শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়া বাঙ্গালী একদা সারা ভারতে, ব্রহ্মদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়া খণ্ডে আত্মবিস্তার করিয়াছিল, বর্ত্তমানে সমূহ বিপদের চাপে পড়িয়া বাঙ্গালী যদি আর একবার আত্মবিস্তারের চেষ্টা করে, তবে হয়ত এই বিপদই তাহার নিকট পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিকভাবেও সেই পুরাতন লুপ্ত সম্পদ বহন করিয়া আনিতে পারিবে।

ক্রমশঃ

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

ধনু রাশি

আপনার জন্মরাশি যদি ধনু হয়, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে ধনু নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনার মধ্যে দুটো পরস্পর-বিরোধী ভাবের খেলা দেখা যায়, যাতে ক'রে অনেক সময় আপনার মনোভাব বোঝা কঠিন হ'য়ে ওঠে। রক্ষণশীলতা ও প্রগতি বা সংস্কারপ্রিয়তা, সামাজিকতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা, সাম্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, শান্তিপ্রিয়তা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব একই সঙ্গে আপনার মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে।

নিজের সম্বন্ধে আপনি বেশ সজাগ। সাধারণতঃ শান্তিপ্রিয় হলেও, যেখানে আপনার স্বার্থ, মত বা নীতি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হয় সেখানে নির্ভীকভাবে প্রতিপক্ষের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেন এবং সম্মানজনক না হ'লে কোন আপোষ বা রফা করতে রাজি হন না।

আপনার এই দ্বিমুখী প্রকৃতির জন্য অনেক ক্ষেত্রে আপনার বাইরের কথাবার্তা বা আচরণ থেকে আপনার মনের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা যায় না। যে সময় হয়তো কোন গভীর উদ্বেগ বা দুঃখ আপনার মনকে পীড়িত করছে, ঠিক সেই সময়েই আপনি আচরণে লঘু চাপল্য প্রকাশ করতে পারেন বা হাস্য-কৌতুকে মুখর হ'য়ে উঠতে পারেন। আবার মন যে সময় আনন্দচঞ্চল, বাইরে সে সময় আপনার ভাব অনাবশ্যক গম্ভীর হ'তে পারে। এর মানে এ নয় যে, আপনি কপটাচারের পক্ষপাতী। অপরের সঙ্গে আপনি সোজা ও খোলাখুলি ব্যবহারই ভালবাসেন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বাইরে প্রকাশ করতে আপনি নারাজ, তা নিজের মধ্যেই গুপ্ত রাখতে চান।

তেজস্বিতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা আপনার স্বভাবসিদ্ধ। আপনি সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার করতে চাইবেন না। কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার এই মনোভাব আপনাকে অসম্ভব রকম প্রভুত্বপ্রিয় বা স্বেচ্ছাচারী করে তুলতে পারে, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। যেন না সেক্ষেত্রে আপনি বহু ব্যক্তির বিরাগভাজন হ'য়ে পড়বেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুর সঙ্গে ক্রমাগত দ্বন্দ্বে ও বিরোধে এত বেশী শক্তি ও সময় অপব্যয়িত হবে যে, সার্থক কাজে আত্মনিয়োগ করার অবসর আপনি পাবেন না।

সকল ব্যাপারে গতি আপনার কাম্য। আপনি চান এগিয়ে যেতে। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন বিশৃঙ্খল অগ্রগতিও আপনার স্পৃহনীয় নয়। হাওয়ার পিছনে ছোটা আপনি পছন্দ করেন না। যদিও ধীরে সুস্থে অগ্রসর হওয়া আপনার রুচিকর নয় এবং কোন কাজে অযথা বিলম্ব আপনাকে অধীর ও চঞ্চল ক'রে তোলে, তাহ'লেও দৃঢ় ভূমির উপর নিয়ম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে অগ্রসর হ'তে না পারলে আপনি স্বস্তি পান না। গতিহীনতা ও বিশৃঙ্খল গতি দুইই আপনার পক্ষে সমান পীড়াকর।

সব জিনিষের খুঁটিনাটির চেয়ে সমগ্রতার দিকে এবং বাইরের আকারের চেয়ে ভিতরের গূঢ় তত্ত্বের দিকে আপনার লক্ষ্য বেশী। নিয়ম ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী হ'লেও, নিয়মের মধ্যে স্থিতি-স্থাপকতা না থাকলে, তা আপনার কাছে পীড়াকর হ'য়ে ওঠে। আপনার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের ভাব আছে, যার যথাযথ অনুশীলন হ'লে, আপনার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক আবিষ্কারে জগৎ উপকৃত হ'তে পারে। কিন্তু এর অযথা অনুশীলন আপনাকে নাস্তিক ও স্বেচ্ছাচারী ক'রে না তোলে, সে বিষয়েও সতর্ক থাকা উচিত।

আপনার মধ্যে একটা অধীরতা ও চাঞ্চল্য আছে, কিন্তু কী নিয়ে বা কোন দিক দিয়ে তা আত্মপ্রকাশ করবে—তা নির্ভর করছে আপনার শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের উপর। এই অধীরতা যদি বাইরে অভিব্যক্ত হয়, তাহ'লে আপনার চলা-ফেরা, ভাবভঙ্গী, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম, সকল বিষয়েই একটা চট্‌পটে ভাব, ব্যস্ততা ও অস্থিরতা লক্ষিত হবে। আপনি ঘন ঘন ভ্রমণ ও বাস পরিবর্তন করতে চাইবেন এবং খেলাধূলা ব্যায়াম প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু এও হ'তে পারে যে,

আপনার মধ্যে শিক্ষক ও উপদেষ্টার ভাব প্রবল এবং অপরকে পরিচালনা করার ইচ্ছা ও যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে। আপনার মন সাধারণতঃ উচ্চ বা সাধুভাবে পূর্ণ হওয়া সম্ভব, অন্ততঃ আপনার মধ্যে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকবে। যদি ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক চাপে, তাহ'লে তা আপনার জীবনে একটা বড় স্থান অধিকার করবে। আপনার ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে গোঁড়ামি না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তা আন্তরিকতাপূর্ণ হবে। গুপ্তবিদ্যা, যোগ, সম্মোহন প্রভৃতির দিকে আপনার কম-বেশী আকর্ষণ থাকতে পারে এবং যদি অনুশীলন করেন, তাহ'লে আপনার মধ্যে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় শক্তির বিকাশ হওয়াও অসম্ভব নয়। মোট কথা আপনার মধ্যে এমন সম্ভাবনা আছে যে, চেষ্টা করলে আপনি নিজেকে সাধারণ মানুষের ঢের উপরে তুলে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার অভাব বা অসৎ সংসর্গ হ'লে আপনার ভাল গুণগুলি চাপা প'ড়ে যেতে পারে। তখন অধীরতা চাঞ্চল্য প্রভৃতিই আপনার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়াবে এবং বাইরের ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকাই হবে আপনার প্রধান কর্ম। তখন শিকার, জুয়াখেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতি উত্তেজনাই আপনার উপভোগের বস্তু হবে।

অর্থভাগ্য

অর্থের ব্যাপারে আপনাকে মোটের উপর ভাগ্যশালী বলা চলে। আপনি নিজের গুণপনা ও কৃতিত্বের দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্থ বা সম্পত্তি প্রাপ্তিও অসম্ভব নয় এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অর্থ বা সম্পত্তি লাভ হ'তে পারে। তবে প্রথম বয়সের চেয়ে জীবনের শেষের দিকেই আপনার আর্থিক ব্যাপারে বেশী লাভবান হওয়া সম্ভব। প্রথম বয়সে পারিবারিক কারণেই হোক্, বা নিজের অধীরতা বা চাঞ্চল্যের জন্যই হোক্ উপার্জনের ব্যাপারে কম-বেশী বিঘ্ন ঘটতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হ'য়ে ওঠাই সম্ভব। আপনার একাধিক উপায়ে উপার্জন হবে কিন্তু কোন Speculation এর ব্যাপারে লিপ্ত হ'লে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। সাধারণতঃ গৃহ ভূমি সংক্রান্ত কাজ, লেখাপড়ার কাজ, সাধারণ সংশ্লিষ্ট কোন কাজ ইত্যাদি থেকে আপনি লাভবান হ'তে পারেন।

কর্মজীবন

সেই সকল কাজ আপনার ভাল লাগবে যাতে সাধারণের সংশ্রবে আসতে হয়, অথবা বহু ব্যক্তিকে পরিচালনা করার প্রয়োজন হয়। যাতে লোকশিক্ষাও জনহিতকর ব্যাপারের সংশ্রব আছে সে ধরণের কাজও আপনার প্রিয়। ধর্ম, আইন, রাজনীতি, শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মের যোগ্যতা বহুমুখী হওয়া সম্ভব, যার জন্য আপনি একই সময়ে একাধিক কর্মে লিপ্ত হতে পারেন, অথবা মধ্যে মধ্যে কর্ম পরিবর্তন করতে পারেন। কোন দুঃসাধ্য বা বিপজ্জনক কাজের জন্য অথবা ত্যাগমূলক কোন কাজের জন্য আপনার অসাধারণ খ্যাতি হ'তে পারে, তা সে কুখ্যাতিই হোক্ আর সুখ্যাতিই হোক্। উপরে আপনার প্রকৃতির যা বিশ্লেষণ দেওয়া হ'য়েছে তা থেকে এ বোঝা শক্ত নয় যে, দুরকম কর্মের যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে। এক, যে সকল কর্মে প্রত্যক্ষভাবে বহুজনের সংশ্রবে আসতে হয় এবং অনেক আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ ও ঘোরাফেরা দরকার হয়। দুই, যে সকল কর্ম বহুজনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'লেও একান্তে নিজের ঘরে ব'সে করা চলে। এর মধ্যে কোন্‌টা আপনি বেছে নেবেন, তা নির্ভর করবে আপনার শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের উপর।

পারিবারিক

আত্মীয় কুটুম্বের ব্যাপারে আপনার জীবনে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের কারো সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'তে পারে অথবা তাঁদের কোন বিপদে আপনি অবাঞ্ছনীয়ভাবে জড়িয়ে পড়তে পারেন। ভ্রাতা-ভগ্নীর সংখ্যা মাঝামাঝি হওয়া সম্ভব। তাদের সঙ্গে স্নেহের বন্ধন থাকলেও বিচ্ছেদ হ'তে পারে। তাদের সঙ্গে জড়িত কোন গুপ্ত কারণ বা দুর্ঘটনায় আপনার পারিবারিক আবেষ্টন বা গৃহ-স্থালীর ব্যাপারে সহসা একটা ওলট পালট এনে দিতে পারে। পারি-বারিক ব্যাপারে আপনার কম-বেশী অস্বাচ্ছন্দ্য বরাবরই থাকবে। হয় পিতা-মাতা, না হয় ভ্রাতা-ভগ্নী, না হয় পুত্র-কন্যা কারো না কারো জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হবে। আত্মীয় কুটুম্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে অন্যত্র বাস করাও বিচিত্র নয়।

কোষ্ঠীতে বিশেষ শুভযোগ না থাকলে আপনার বেশী পুত্র কন্যা হওয়া সম্ভব নয়। সন্তান হ'লেও তাদের ব্যাপারে আপনার কোনরকম আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট উপস্থিত হ'তে পারে। সন্তানস্থানীয় কোন স্নেহের পাত্রের জন্যও কোনরকম চিন্তা বা উদ্বেগ থাকা সম্ভব। আপনার স্নেহের অনুভূতি গভীর হ'লেও বাইরে তার অভিব্যক্তি নেই ব'লে অনেক সময় লোকে আপনাকে ভুল বোঝে এবং পরিবারের লোকেরা আপনাকে কঠোর বা হৃদয়হীন মনে করতে পারে। এই জন্যও আপনার পারিবারিক বন্ধন অনেক সময় উদাসীনতায় পরিণত হয়।

বিবাহ

আপনার বিবাহ বা দাম্পত্য জীবনের ব্যাপারে কোনরকম মনোকষ্ট বা আশাভঙ্গ হ'তে পারে। বিবাহে বাধা-বিঘ্ন ঘটা সম্ভব কিম্বা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ হ'তে পারে। দাম্পত্য ব্যাপারে

স্বামীর) দৈহিক বা মানসিক কোনরকম বৈকল্য থাকতে পারে। তা ছাড়া, মনের দিক দিয়েও অনেক সময় আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) মিল খুঁজে পাবেন না, যার জন্য আপনি ক্রমশঃ দাম্পত্য জীবনে উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন। যাঁর জন্ম মাস বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র অথবা পৌষ, কিম্বা যার জন্ম তিথি শুক্লপক্ষের চতুর্থী অথবা কৃষ্ণপক্ষের একাদশী—এ রকম কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনার দাম্পত্য জীবন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হ'তে পারে।

বন্ধুত্ব

আপনার পরিচিতি বিস্তৃত হওয়াই সম্ভব। কিন্তু পরিচয় বহু ব্যক্তির সঙ্গে হ'লেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অতি অল্প ব্যক্তির সঙ্গেই হবে। ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি অথবা কোন গোপনীয় ব্যাপারের সংশ্রবে দু'চারজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'তে পারে, কিন্তু এই রকম কোন বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় আপনার বিশেষ বিপন্ন হওয়া সম্ভব, সে জন্য সতর্ক থাকা উচিত। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর জন্য অর্থনাশ, অপমান ও কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা তো আছেই, এমন কি জীবনের আশঙ্কাও উপস্থিত হ'তে পারে। বন্ধুর সঙ্গে দেনা-পাওনার সংশ্রব না রাখাই আপনার পক্ষে ভাল। কেন না, দেনা-পাওনার ব্যাপার নিয়ে বন্ধুর দ্বারা প্রতারিত হ'তে পারেন, অথবা তা নিয়ে বন্ধু বিরোধ বা বন্ধু বিচ্ছেদও ঘটতে পারে। আপনার বহু অনুচর পরিচর বা সঙ্গী থাকতে পারে, যারা স্বার্থের খাতিরে বাইরে আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তাদের উপর সব সময় নির্ভর করা চলবে না। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গে—যাঁদের জন্ম মাস বৈশাখ, ভাদ্র অথবা পৌষ, কিম্বা যাঁদের জন্ম তিথি শুক্ল পক্ষের চতুর্থী অথবা কৃষ্ণপক্ষের একাদশী।

স্বাস্থ্য

আপনার মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য আছে এবং স্বাস্থ্য আপনার সাধারণতঃ ভালই থাকবে, যদি না অতিরিক্ত আলস্য বা বিলাস-ব্যসনের প্রশ্রয় দেন। আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হ'লে কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক বটে, কিন্তু সে পরিশ্রম আনন্দজনক হওয়া চাই। সাধারণতঃ খেলা-ধুলো, ঘোড়ায় চড়া, বন্ধুর সঙ্গে আনন্দ ভ্রমণ প্রভৃতি আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে সাহায্য করবে। কিন্তু একটানা দীর্ঘ শ্রম বা কষ্টকর ব্যায়াম আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়। উচ্চ চিন্তা এবং মৃদু প্রাণায়াম প্রভৃতি সহজসাধ্য যৌগিক প্রক্রিয়া আপনার জীবনী-শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনার দেহের দুর্বল অংশ হ'চ্ছে মাথা, মুখ, ঊরুদেশ, মেরুদণ্ড ও গলা। দেহ অসুস্থ হ'লে ঐগুলি আশ্রয় ক'রে কোন উপসর্গ প্রকাশ পেতে পারে। সুপথ্য হিসাবে আপনার সেই সব খাদ্য উপযোগী যা স্নিগ্ধ, রসালো, সুস্বাদু এবং মস্তিষ্কের পুষ্টিকর। বিস্বাদ, তিক্তাস্বাদ এবং তীক্ষ্ণ ও উত্তেজক বস্তু খাদ্য তালিকা থেকে যত বাদ দিতে পারেন ততই ভাল। খাদ্য আপনার পরিমিত হওয়া চাই। উপবাস ও গুরুভোজন দুইই আপনার পক্ষে হানিকর। অসুস্থ অবস্থায় জল আপনার একান্ত আবশ্যক। নদী বা সমুদ্রের উপকূলে বাস, নিয়মিত স্নান এবং আহারে জলীয় পদার্থের আধিক্য এবং প্রচুর জলপান অনেক সময় আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। খাদ্যে মধুর বা অম্লমধুর রস আপনার প্রিয় হবে। পরিমিতাচার আপনার স্বাস্থ্যকর বটে, কিন্তু মনে রাখবেন যে কৃচ্ছ্র সাধন এবং অবদমন আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর।

ব্যাধি বা পীড়া ছাড়াও উচ্চস্থান কিংবা বাহন থেকে পতন, চতুষ্পদ জন্তু থেকে আঘাতপ্রাপ্তি প্রভৃতি দুর্বিপত্তি সম্বন্ধে আপনার সতর্ক থাকা উচিত।

অন্যান্য ব্যাপার

পোষাক পরিচ্ছদ বা আসবাবপত্রে বেশী আড়ম্বর আপনি ভালবাসেন না। এগুলি কাজের উপযোগী হ'লেই এবং ব্যবহারে অসুবিধার সৃষ্টি না করলেই আপনি সন্তুষ্ট। এ বিষয়ে বরং আপনার একটা উদাসীনতাই প্রকাশ পেতে পারে। সাধারণতঃ সহজ ও সরল জীবন-ধারায় উচ্চতরভাবের বিকাশ আপনি শ্রেয় ব'লে মনে করেন।

আপনার বহু ভ্রমণ বা তীর্থাদি দর্শন হ'তে পারে। অনেক সময় হয়ত কর্মোপলক্ষে বা নিজের উন্নতির জন্য দূর ভ্রমণ আবশ্যক হবে। আবার কোন গোপনীয় কাজের ভার নিয়ে অথবা রাজনৈতিক বা ধর্ম সংক্রান্ত কোন ব্যাপারের সংশ্রবে দূর বিদেশ যাত্রা বা দীর্ঘ প্রবাসও অসম্ভব নয়। কিন্তু ভ্রমণ সব সময়ে সুখকর হবে না। কখনও কখনও ভ্রমণ বা বিদেশ বাসের সময় আপনার কোন রকম মনোকষ্ট বা শোক প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া ভ্রমণের সময় বা বিদেশে নিজের কোন দুর্বিপত্তি ঘটতে পারে।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ১০, ২২, ৩৪, ৪৬, ৫৮ এই সকল বর্ষ গুলিতে আপনার নিজের অথবা পরিবারস্থ কারো কোন রকম দুর্বিপত্তি ঘটতে পারে। ৪, ১৬, ২৮, ৪০, ৫২ প্রভৃতি বর্ষগুলিতে কোন সুখকর অভিজ্ঞতা সম্ভব।

বর্ণ

ধূসর রঙ্, পাঁশুটে রঙ্, ধোয়া রঙ্ এবং সব রকমের মেটে ও চাপা রঙ্ আপনার প্রিয় ও সৌভাগ্য বর্ধক হওয়া উচিত। চক্‌চকে রঙ্ বা পালিশ আপনার বর্জন করাই ভাল। অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু সাদা ও হাল্কা ধরণের রঙ্ ব্যবহার করা ভাল, তবে তাও খুব চক্‌চকে হওয়া উচিত নয়। ঘোর কাল কিম্বা খুব গাঢ় রঙ্—তা সে যে রঙ্ই হোক্—আপনার পক্ষে হানিকর হ'তে পারে।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন হ'চ্ছে বৈদুর্য (Cat's eye); বিশেষ করে ধূম্রক্ষেত্র বা গঙ্গাজলী বৈদুর্য আপনার বিশেষ সৌভাগ্য বর্ধক। অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু চন্দ্রকান্তমণি (Moon stone), শ্বেত প্রবাল বা মুক্তা ধারণ আপনার নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধারে সাহায্য করবে।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাঁদের জন কয়েকের নাম—শ্রীঅরবিন্দ, হের হিটলার, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার আর, জি কর, ডাক্তার শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রনাথ সেন (Indian mirror), প্রসিদ্ধ রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী, লন চ্যানী, র‍্যামন নোভারো, মারলিন ডিট্রিক, ম্যাদাম মেল্বা প্রভৃতি।

অভিনেত্রী

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

সাধারণ মধ্যবিত্তের সংসার অবনীবাবুর। অভাব অনটন সাধারণ গৃহস্থের মতো তারও ছিল বহু। কিন্তু তবুও একমাত্র কন্যা মায়ার বিবাহ দিলেন তিনি রীতিমত ঘটা ক'রেই এবং রীতিমত ধনীর ঘরে। শিমলার মুখুজ্জেরা ছিলেন শহরের প্রতিপত্তিশালী লোক। বার মাসে তের পার্বণ তাদের বাড়ীতে—দাস দাসা, গাড়ী ঘোড়া কিছুরই অপ্রাতুল্য ছিল না সংসারে! আধুনিক কেতাদুরস্ত বড়লোক শিমলার মুখুজ্জেরা। এমনি এক পরিবারে কন্যার বিবাহ দেওয়া অবনীবাবুর পক্ষে সত্যিই অভাবনীয়। মায়া সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। শিক্ষা দীক্ষায়, পোষাক পরিচ্ছদে আপ-টু-ডেট্। বড়লোকের ঘরের বউ বলে সব রকমেই মানিয়েছিল মায়াকে। মায়ার দাম্পত্য জীবন এক বছর চলেছিল বেশ আরামে—স্বাচ্ছন্দ্যে। কিন্তু তারপর?

তারপর হঠাৎ ঝড় উঠলো একদিন। ঝড়ের দাপটে কেঁপে উঠলো ধনী মুখুজ্জেদের প্রাচীন প্রাসাদ-প্রাচীরের ভিত্তিমূল। টলে গেল বনিয়াদ।

মায়ার স্বামীরা পাঁচ ভাই। মায়ার শ্বশুরের মৃত্যুর পর হঠাৎ কী এক অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য শুরু হ'ল। মনোমালিন্য ক্রমশ বিবাদে উপনীত হ'ল এবং শেষ পর্যন্ত মীমাংসার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল।

অবনী মুরুব্বি হ'য়ে সকলকেই বোঝালে। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে রক্ষে করলে মামলা মোকর্দমার হাত থেকে অবনী জামাই ও তার ভাইদের। একটা আপোষ করতে সকলেই রাজি হ'ল। বিষয় সম্পত্তি আপোষ বণ্টন হ'ল পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে। কিন্তু "মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" নিয়তির গতি কে রোধ করতে পারে?

বণ্টন-নামায় অধীর নগদ পেয়েছিল পঞ্চাশ হাজার টাকা। সেই টাকা পুঁজী ক'রে অধীর খুলল এক 'আপ্-টু-ডেট্' বৃহৎ কাপড় জামার দোকান। বেশ চলেছিল দোকান—বাজারে প্রতিষ্ঠানটি সুনাম অর্জন করেছিল। ত্যাগ করতে অবনী বার বার অনুরোধ করল জামাইকে। কিন্তু সেকথায় কর্ণপাত করলে না জামাই। এই সময় একদিন জামাইয়ের এক বন্ধুকে মত্ত অবস্থায় দেখে দোকান থেকে বের করে দিল অবনী। বললেঃ ব্যবসা-ক্ষেত্রে এইরকম অশিষ্টতা অমার্জনীয়। কিন্তু আশ্চর্য্য! জামাই অধীর একাজে শ্বশুর অবনীর ওপর বিরক্তই হ'ল। অন্য বন্ধুরা এই ব্যাপারে কোমর বেঁধে লেগে গেল অবনীর বিরুদ্ধে। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে শেষ পর্যন্ত অবনীর দোকানে আসা বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধুর দল সুযোগ বুঝে অধীরের উপর প্রভাব বিস্তার করল আরো। অধীর হল দুশ্চরিত্র। দোকানের দেখাশোনায় শৈথিল্য আসতে লাগলো। সেই সুযোগে অসাধু বন্ধুরা দোকানের অর্থ লুঠতে লাগল দু হাতে। তারপর বছর ঘুরলো না—পাওনাদারেরা প্রাপ্য না পাওয়ায় নালিশ করে দোকানের মালপত্র ক্রোক করল।

এদিকে অবনী তখন রোগশয্যায়। মায়া অকুলে পড়লো। ধার করে দেন-দারদের পাওনা মিটিয়ে দোকান উদ্ধার করবে তার রাস্তাই বা কোথায়? অধীরের স্বাক্ষর ছাড়া ত টাকা মিলবে না! অথচ অধীর নিরুদ্দেশ। দোকান নীলামে বিক্রী হয়ে গেল। মায়া কপালে করাঘাত করল। দু'টি শিশু পুত্র নিয়ে সে পড়ল বিপাকে। বাড়ী ভাড়া আদায় করতে লোক পাঠাল—কিন্তু সংবাদ এলো—ভেতরে ভেতরে বাড়িও বিক্রী হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সুতরাং বাড়ির ভাড়া আর অধীরের বা তার পরিবারের প্রাপ্য নয়। কি দুঃসংবাদ! একমাত্র এই ছোট বসতবাড়িটি ছাড়া আর কিছুই রইলো না।

এমনি ক'রে আরো অনেক দিন কেটে গেল। একদিন মায়ার এক পুরাতন বান্ধবী আরতি দেবী এল মায়ার বাড়ীতে। মায়ার অবস্থা দেখে সে মর্মাহত হল। মায়া বান্ধবীকে খুলে বলল তার দুঃখের পাঁচালী। আরতি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললঃ ভাই, এমনি করে শরীর

মরবি, ছেলে দুটোও মরবে। আমার কথা শোন—বিপদে ধৈর্য ও সাহস হচ্ছে একমাত্র সম্বল। শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে এমন অধীর হওয়া সাজে না তোর। নিজে বাঁচবার চেষ্টা কর, ছেলে দুটোকে বাঁচাবার চেষ্টা কর।

আরতির স্বামী একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী—স্বামীর সংগে সে প্রায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এসেছে। নিজে সে 'গ্রাজুয়েট'—প্রগতিশীলা মহিলা। নারী জাতির সর্ববিধ উন্নতিকল্পে সে একটি প্রগতিশীলা নারী সমিতি করেছে। শহরের অভিজাত বংশের মেয়েরা অনেকেই সভ্যা হয়েছে তার সমিতির। সে নৃত্যগীতপটীয়সী নারী—ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার থিয়েটার ও ষ্টুডিও পরিদর্শন করে তার মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জেগেছে—পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের নারীর ন্যায় প্রাচ্যের অভিজাত সমাজের শিক্ষিতা মেয়েরাও অবতীর্ণা হয় মঞ্চে ও পর্দায় শিল্পীরূপে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে আরতি এই বিষয়ে ঘোরতর আন্দোলন সুরু করেছে। দু' চারটি মেয়ে ইতিমধ্যে ষ্টুডিওতে যাতায়াত সুরু করেছে। আরতি নিজেও একখানি ছবিতে নামবার সংকল্প করেছে। এতদিন স্বামীর সংগে বাইরে বাইরে থেকে সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছে—স্বামী এখন কলিকাতায় বদলী হয়েছেন। মায়ার সংগে স্কুল থেকেই তার খুব ভাব ছিল। দু'জনে এক সংগে নেচেছে ও গান করেছে—মায়াকে সে খুব পছন্দ করে। কলিকাতায় এসেই মনে হল মায়ার কথা। তাই খোঁজ নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে মায়ার স্বামীর বাড়ী। হঠাৎ এসে মায়াকে অবাক করে দেওয়ার ইচ্ছাই ছিল তার। ইচ্ছা ছিল তারপর পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে কত হাস্য কৌতুক করবে, কিন্তু তার হরিষে বিষাদ হল! আরতি ঘরে ফিরল চিন্তাভারাক্রান্ত মনে—মায়ার দুঃখের কাহিনী তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ কাটল। সখীর দুঃখ ঘুচাবার জন্য মনে জাগল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। স্বামী মোটা বেতনের উচ্চ সরকারী-কর্মচারী হলেও তাদের আভিজাত্য বজায় রাখতে সে মোটা বেতনও যথেষ্ট নয়। তারপর বান্ধবী মায়া তার দান গ্রহণ করবে কি? সে তো জানে—মায়ার আত্মসম্মানজ্ঞান কতো। কি উপায়ে মায়াকে সাহায্য করা যায় তাই সে চিন্তা করতে লাগল—কি উপায়ে সে মায়াকে আর্থিক সাহায্য করবে মায়ার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে তাই ভাবতে লাগলো।

পাঁচ বছর পর। মায়ার খোঁজ করতে এল—গ্রে ষ্ট্রীট বাড়ীতে এক হৃতস্বাস্থ্য কুৎসিত পুরুষ। সে মায়াকে সেখানে না পেয়ে সেই বাড়ীর লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল তার ঠিকানা। কিন্তু তারা কেউ জানে না। আগন্তুক অসহায় ভাবে বাড়ীর দেউড়ীতে বসে পড়ল। হাঁপানীর টান সামলে নিয়ে ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: এ বাড়ীর কে আপনারা?

—ভাড়াটে।

আপনারা কাকে ভাড়া দেন?

—এই সব প্রশ্ন করাব আপনার কি অধিকার আছে?

রোগপাণ্ডুর মুখে একটি হাসির রেখা ফুটে উঠলো আগন্তুকের মুখে—আছে বলেই জিজ্ঞেস করছি, রাগ করবেন না। আমিই এই বাড়ীর মালিক।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আশ্চর্য কণ্ঠে প্রশ্ন করল: আপনিই কি অধীরবাবু?

আগন্তুক মাথা নেড়ে বলল: হ্যাঁ।

দেউড়ীতে ভীড় দেখে পাশের বাড়ীর পরেশবাবু ব্যাপার কি জানতে এল। ঘটনা শুনে সে অধীরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে তাকিয়ে সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বলল: এ কি চেহারা হয়েছে তোমার অধীর? এতদিন কোথায় ছিলে?

অধীর লজ্জায় অধোবদন হয়ে বলল: দাদা—সবই ত জানেন। আমায় আর লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আমি বাড়ীতে মরব বলে এসেছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আমার মৃত্যু হবে ফুটপাথে।

পরেশ অধীরের জ্ঞাতিভ্রাতা। পরেশের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করে তাকে আর কোন প্রশ্ন করল না। নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

পরেশবাবুর স্ত্রী কাত্যায়ণী অধীরকে স্নানাহার করিয়ে সুস্থ করে জানাল—মায়া অনেক চেষ্টা করেছে অধীরকে খুঁজে বের করতে। বেচারা বহু অভাব অনটনের মধ্যে কাটিয়েছে দুটি বছর স্বামীর ভিটায়। বাড়ী ভাড়ার পঞ্চাশটি টাকায় কি কখন কুলায় তিনটি প্রাণীর

খাওয়া-দাওয়া তারপর ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা! তার এক বান্ধবী—কোন উচ্চ সরকারী কর্মচারীর স্ত্রী আরতি দেবী—তিনি সাহায্য করেছেন যথেষ্ট। তাঁর স্বামী বদলী হলেন বোম্বে—যাবার সময় মায়াকে নিয়ে গেছেন তাঁদের সংগে—সে আজ প্রায় দুবছরের কথা। তারপর আর কোন খবর পায় নি মায়ার। কাত্যায়নী ঘর থেকে একটি চাবীর গোছা এনে বলল: এই নাও ভাই তোমার ঘরের চাবী—যাবার সময় আমাকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—দিদি, যদি কখনও ফেরে এই চাবীছড়া তাকে দিও। আজ আমি মুক্ত হলাম ভাই এক দায় থেকে।—

অধীর ভারাক্রান্ত চিত্তে নিজের ঘরে এসে ঢুকল। পরেশের বাড়ীর একটি চাকর সংগে ছিল, সে ঘরের ঝুল ময়লা পরিষ্কার করতে লাগল। অধীর দেখল, ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ সুন্দর ভাবে সাজান রয়েছে। তার বসবার ঘরে টেবিল ল্যাম্পটি, টেবিলের উপরের গ্লাশখানি, ফুলদানি, দোয়াত, প্যাড—সব কিছু তেমনি ভাবে সাজান—তবে সেগুলির উপরে জমেছে ধূলার পাহাড়। চাকর চেয়ার টেবিল ঝেড়ে দিলে অধীর উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বসে পড়ল চেয়ারে। "এ কি?" বলে অধীর অধীর ভাবে একখানি খামের চিঠি তুলে নিলে টেবিলের ওপর থেকে। খুলে পড়ল চিঠিখানি;

প্রিয়—যদি কখনো আসো, সেই আশায় লিখে যাচ্ছি—তোমার মায়া কায়া ত্যাগ করল। আমার খোঁজ করো না। সুখে থাক—সুবুদ্ধি হোক।

অভাগী—মায়া।

তারপর বহু অনুসন্ধান করেও অধীর স্ত্রীপুত্রদের সন্ধান পেল না। আরতি দেবীর স্বামীর নামও কেউ বলতে পারল না। বাড়ী ভাড়ার টাকা থেকে অধীরের একটা পেটের সংস্থান হয়ে গেল। ভাড়াটে নরেনবাবু এক সংগে তিন বছরের ভাড়া শোধ করায় অধীরের হাতে কিছু নগদ টাকা এল। কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটি বায়োস্কোপের পাশে অধীর খুলল একটি 'রেঁস্তোরা'—ঘরে তার প্রাণমন হাহাকার করে ওঠে একাকী থেকে। দোকানে লোকজন দেখে—তাদের সংগে কথাবার্তা বলে অন্যমনস্ক থাকে। বসে চা খেতে খেতে নিজ নিজ অভিরুচি মত সমালোচনা করে—কত ব্যঙ্গ—ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, অভিনেত্রীদের রূপের প্রশংসা—তাদের কুৎসা করে। অধীরের কানে কথাগুলি আসে, কিন্তু সে উৎসাহী শ্রোতা নয়। একদিন একটি যুবক অপর একটি যুবককে বলছিল—কি অভিনয়টা করেছে এই নন্দিতা! এই ক'বছরে কি নাম কিনলে?—যেমনি দেখতে তেমনি অভিনয় চাতুর্য।

একজন বললে—ঐ বন্দিতা মেয়েটাও বেশ। এরা নাকি দুই বোন।

অপর একজন বলল: বন্দিতা নাকি কোন আই-সি-এস এর বউ—আসল নাম আরতি।

একজন চায়ের পেয়ালা রেখে বলল: ভদ্রঘরের মেয়েরা ছায়াচিত্রে নেমে কায়া পালটায় নাম ভাঁড়িয়ে।

অধীর উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল যুবক দর্শকদের এই কথোপকথন। সিনেমা হাউসে দ্বিতীয় 'শো'র ঘণ্টা পড়ল। অধীর ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল—ক্যাশবাক্স থেকে কয়েকটি টাকা নিয়ে প্রধান কর্মচারী রসিককে বলল: আমি সিনেমা দেখতে চললাম। তুমি এসে ক্যাশে বস।...

ঘণ্টাখানেক পরে অধীর উত্তেজিত ভাবে দোকানে ফিরে এল। কর্মচারীরা বাবুর মুখচোখ ও ত্রস্ত ভাব দেখে হল বিস্মিত। ক্যাশবাক্স থেকে ৩০৲ টাকা নিয়ে অধীর পকেটে রাখতে রাখতে রসিককে বলল: আমি একটা জরুরী কাজে বেরুচ্ছি—আমার দেরী হ'লে তুমি দোকান বন্ধ করে আমার খাবার বাড়াতে নিয়ে যেও। রসিক অধীরের বাড়ীতে থাকে।

অধীর ট্যাক্সী করে ধর্মতলায় একটা ফিলম্ কোম্পানীর অফিসে গেল—সেখান থেকে কার ঠিকানা জেনে—ট্যাক্সীতে উঠে ড্রাইভারকে বলল: চলো রিজেণ্ট পার্ক। রিজেণ্ট পার্কের নানা গলি ঘুরে ৬৫৫নং বাড়ীর সন্ধান পেল মাঠের পূর্বপ্রান্তে। ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে তাকে বকশীস দিল এক টাকা। বাড়ীর ফটক পার হয়ে অধীর ঢুকলো বাগানে—তারপর বাঁদিকে গিয়ে উঠল একটি সুন্দর নূতন বাড়ীতে। একটা কুকুর চীৎকার করে উঠল অচেনা লোক দেখে। বৃদ্ধ দারোয়ান ছুটে এল।

অধীর আমতা আমতা করে বলল: নন্দিতা দেবীর সংগে দেখা করব একবার। দারোয়ান তার লম্বা গোঁফে তা দিয়ে বলল: তিনি ত রাত্রিবেলা কারু সংগে মোলাকাত করেন না।

অধীর অধীরভাবে দারোয়ানের দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে মিনতিভরা কণ্ঠে বলল: বাবা, একটিবার আমাকে তার কাছে নিয়ে চল, আমার বিশেষ জরুরী—

দারোয়ান বিস্মিত ভাবে অধীরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলল: আচ্ছা স্লিপে লিখে দিন—আপনার নাম আর কি জরুরী কাজ।

অধীর একখানি স্লিপ ছিঁড়ে লিখল: সাক্ষাৎ চাই—প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত—তোমারই হতভাগ্য—অ।

দারোয়ান আর আসে না! অধীর অস্থিরভাবে পায়-চারি করতে লাগল বারান্দায়। কিছুক্ষণ পরে একজন মহিলা বেরিয়ে গেল—পরক্ষণে বই হাতে একটি ফুটফুটে ছেলে বারান্দায় এসে অধীরকে জিজ্ঞাসা করল: আপনি এখানে কেন? অধীর এক দৃষ্টে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইল—কোন কথা বলতে পারলে না। ছেলেটি আবার প্রশ্ন করল: আপনি এখন কেন এলেন?

অধীর স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলল: আমি নন্দিতা দেবীর সংগে একবার দেখা করব বাবা?—বালক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল: মা রাত্রি বেলা কারো সংগে দেখা করেন না—আপনি তা জানেন না?

অধীর বালকের দিকে সস্নেহে বাহু প্রসারিত করে বলল: না বাবা, আমি কিছু জানি না। তুমি একবার আমার কোলে এস না বাবা। অধীরের দু'চোখে জল।

বালক অধীরের কান্না দেখে মোলায়েমকণ্ঠে বলল: বারে! আপনি মিছি মিছি কাঁদছেন কেন?

অধীর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল: তোমার দাদা মন্ত কোথায়?

বালক আশ্চর্য কণ্ঠে বলল: আরে! আপনি দাদাকে চিনলেন কি করে? দাদা উপরে গেছে। মিস মিত্তির আমাকে আঁক শেখাচ্ছিলেন কিনা?

সেই সময় দারোয়ান এসে বলল: মাইজি, আপনার কাগজ পড়ে বহুৎ গোসা হলেন বাবুজী। তিনি বললেন, এ লোকের সংগে আমি কখনও দেখা করব না।

বাইরে গাড়ীর হর্ণ বাজলো, দারোয়ান দ্রুতবেগে সেদিকে ছুটলো। বালক বলল: মাসী আসছেন। আপনি কি চান এঁকে বলুন। ইনি মা'কে সব বলবেন।

ভ্যানিটি ব্যাগ বাঁ হাতে—ডান হাতে সুগন্ধি সিল্কের রুমাল দিয়ে মুখ পুঁছতে পুঁছতে প্রবেশ করলেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা। অধীরকে দেখে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলল: কে আপনি? কি করে ঢুকলেন রাত্রিবেলা এখানে? দারোয়ান?—রক্তচক্ষু দেখে দারোয়ান ভড়কে গেল—হাতজোড় করে আমতা আমতা কণ্ঠে বলল: মাপ করুন মাইজি, বাবু ঘুস গিয়া—আদমি খারাপ নেই—

মহিলাটি তীক্ষ্ণভাবে অধীরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল—আবার দেখল বেশ করে চোখের চশমা পুঁছে রুমালে। দারোয়ানকে হুকুম দিল—সব আলো জ্বালতে। ছেলেটি বিস্ময়াবিষ্টভাবে দেখছিল মাসীর কার্যকলাপ। ধীরে এগিয়ে এসে মাসীর গা ঘেঁষে চুপি চুপি নিম্নকণ্ঠে বলল: মাসী, লোকটা কে? মায়ের সংগে দেখা করবার জন্ম কাঁদছিল? আমাকে কোলে করতে চাইছিল—আবার দাদার নাম করছিল! আমায় জিজ্ঞাসা করছিল, মন্ত কোথায়?

মাসী—আরতি দেবী—খোকনের কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনল। মুহূর্তে তার মুখের কঠোর ভাব কমনীয় হয়ে উঠল। মুখে ফুটে উঠল দুষ্টুমীভরা হাসি অথচ নির্বাক। দারোয়ান আরতির মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে বিস্মিত হল—খোকন মাসীকে নির্বাক দেখে তার অঞ্চল আকর্ষণ করে মধুর কণ্ঠে বলল: মাসী, উপরে চ—আরতি দেবী সস্নেহে খোকনকে বুকে টেনে নিয়ে তার মুখচুম্বন করল। তারপর গম্ভীরভাবে দারোয়ানকে লক্ষ্য করে বলল: পাঁড়েজি, এই বাবুকে নিয়ে বসাও 'ড্রইং রুমে'। দেখো যেন ইনি পালিয়ে না যান—লোকটি ভাল বলে মনে হচ্ছে না।

আরতি দেবী হাসি চেপে ক্ষিপ্রগতিতে খোকনের হাত ধরে এসে উপস্থিত হল নন্দিতা দেবীর সুসজ্জিত রুমে। নন্দিতা মুখ তুলে স্মিত হাস্যে আরতির দিকে তাকালে। আরতি গানের কলি ভাঁজতে লাগল—'ওগো প্রাণ বঁধুয়া এসেছে দ্বারে—

নন্দিতা মধুর হাস্তে বলল: এই অসময়ে সখীর মনে মদনতাপ কেন ?

আরতি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে টেবিলের উপর থেকে তুলি নিলে অধীরের য়্যালবাম্ খানি। বেশ নেড়ে চেড়ে সমুৎসুক সোৎকণ্ঠে বলে উঠল: হু! এই বটে!

নন্দিতা বলল: কি ব্যাপার—ও ছবির ভিতর আবার নূতন কি আবিষ্কার করলি ?

আরতি নাটকীয় ভংগীতে বলল: কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা, আমি আবিষ্কার করলাম একটি মানব!

নন্দিতা বিস্মিতকণ্ঠে বলল—মানে ?

আরতি দুষ্টুমীভরা হাসি হেসে বলল—তুই ত নেহাৎ বে-রসিক হচ্ছিস দিন দিন—একটা ভদ্রলোক তোর দ্বারে সত্যাগ্রহ করছে—আর তুই সোফায় বসে নভেল পড়ছিস ?

নন্দিতা গম্ভীরভাবে একখানি স্লিপ বের করে আরতির হাতে দিল। আরতি কাগজখানির উপর চোখ বুলিয়ে বলল—কি দোষ হয়েছে ? তোমার সেই প্রেমিকপ্রবর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছেন। তোমার সংগে পূর্বে প্রেম না থাকলে কি এই রাত্রিবেলা আসতে সাহস করতেন ?

নন্দিতা কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করে বলল: তোমার হেঁয়ালী বুঝতে পারছি না ?

আচ্ছা! বোঝাচ্ছি!—বলে আরতি বাইরে গিয়া পাঁড়েজীকে ডেকে চুপি চুপি কি বলল। আবার ঘরে ঢুকে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে কৌতুককণ্ঠে বলল: ম্যাজিক দেখাব—ভানুমতীর খেল, "বি, রেডি ?"

বাইরে লোকের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আরতি ঘর থেকে বেরিয়ে কাকে বলল—আপনি ভিতরে যান—সাক্ষাৎ পাবেন—

অধীরকে অপরাধীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরতি চটুল হাসি হেসে বলল: কি মশাই, দাঁড়িয়ে কেন ? নির্ভয়ে ভিতরে ঢুকুন—

কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে নন্দিতা সোফা ছেড়ে এল দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে অধীরের সংগে হল দৃষ্টি বিনিময়। নন্দিতার মুখ হতে বেরুল অস্ফুট ধ্বনি—তু-মি ?—

অধীর মোহাবিষ্টভাবে বলল: মায়া——। চোখে তার আনন্দাশ্রু।

আরতি নির্মল হাস্তে বলল: উঁ হুঁ! মায়া নয়—নন্দিতা বলুন মশাই!

প্রতীক্ষিত

শ্রীহাসিরাশি দেবী

সঙ্গি! শুনিছ—কালের ও পথে কাহাদের আগমন ?
কত পদরেখা অঙ্কিত হয়—স্বপ্নে দেখিছ তা কি ?
সুপ্ত-প্রাণের-পিঞ্জরে শুন' অ-শ্রুত ক্রন্দন।
কোন-রাত্রির শেষ গাওয়া তাই—আমাদের যায় ডাকি ?
ঝনন্! ঝনন্! শৃঙ্খল বাজে কাদের পদক্ষেপে ?
ক্ষুধিত, তৃষিত, অন্ধ, নয়ন পথের দুধারে জাগে!
চির-নিরুদ্ধ কণ্ঠে সহসা আদেশ উঠিল কেঁপে!
প্রস্তরীভূত কঙ্কাল আজ প্রাণের স্পর্শ মাগে ?

বুবুম্! বুবুম্!! গর্জ্জিয়া ওঠে যন্ত্র-দানব-দল!
জন্মান্তের প্রাণহীন দেহ আমাদেরই পড়ে লুটি'
লাল-লাক্ষীর স্রোত বয়ে চলে বেদনার হলাহল—
অগ্নিগিরির গহ্বরে রহে রক্ত কমল ফুটি!

সাথি! ঘুমায়োনা; আজিও প্রভাত হইতে অনেক দেরী,
অন্ধকারের শৈল-শিখরে সূর্য্য উদয় হবে,
পৃথিবীর প্রাণস্পন্দনে বাজে কালের বিজয় ভেরী—
আজি অতীতের কণ্ঠমুখর উন্মাদ কলরবে!

তবু জেগে রও, তন্দ্রাকাতর নয়নের ধারা মুছি,—
মাটির বক্ষে কান পেতে শোনো আলোর আমন্ত্রণ,
ঐ আসে নব-পূর্ব্বাশা রথে নতুন অতিথি বুঝি
রক্তে জেগেছে তারই উল্লাস! অশান্ত-নর্ত্তন!

সাথি! ঘুমায়ো না। জাগো! শোনো—
আজ জীবন মহোৎসবে,
শতাব্দীপরে সূর্য্য উদিছে; জয় হবে! জয় হবে!

সোপেনহরের দর্শন

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

জগৎ অমঙ্গল-স্বরূপ

জগৎ ইচ্ছা-স্বরূপ। ইচ্ছা অভাব হইতে উদ্‌ভূত, এবং যত চায় কখনই তত পায় না। একটা কামনা যদি পূর্ণ হয়, দশটা অপূর্ণ থাকে। কামনার শেষ নাই; কিন্তু তাহার পরিতৃপ্তি সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইচ্ছা দুঃখময়।

ইচ্ছা ভিক্ষুকের মতো। ভিক্ষাদ্বারা ভিক্ষুক প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু ভিক্ষাদ্বারা প্রাণ রক্ষার ফল দুঃখের স্থিতিকালের বৃদ্ধি। যতক্ষণ ইচ্ছা মন পূর্ণ করিয়া থাকে, কামনার দল চিত্ত অধিকার করিয়া থাকে, যতক্ষণ আশা ও ভয়ে অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে থাকে, ততক্ষণ আমরা ইচ্ছার বশীভূত থাকি, ততক্ষণ স্থায়ী সুখ অথবা শান্তি আমরা প্রাপ্ত হইতে পারি না। কামনার পরিতৃপ্তি হইতেও অনেক সময় সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখের উৎপত্তি হয়। কেননা এই পরিতৃপ্তি হইতে স্বাস্থ্যভঙ্গ অথবা অন্যবিধ দুঃখের উদ্‌ভব হয়।

যে কামনা পরিতৃপ্ত হয়, তাহা হইতে নূতন কামনার উৎপত্তি হয়, আবার এই নূতন কামনার পরিতৃপ্তি হইতে আরও কামনার উদ্‌ভব হয়। এইরূপে কামনার অন্তহীন স্রোত বহিতে থাকে।

ইচ্ছার বাহিরে কিছুই নাই। সুতরাং কামনার ক্ষুধায় আতুর ইচ্ছাকে আপনার দেহ ভক্ষণ করিয়াই বাঁচিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি দ্বারা তাহার দুঃখের মাত্রা নির্দিষ্ট হইয়া আছে। এই মাত্রা শূন্য থাকিতে পারে না। আবার যখন পূর্ণ থাকে, তখন অতিরিক্ত দুঃখও তথায় স্থান পায় না। যখন কোনও গুরুতর দুশ্চিন্তা মন হইতে বিদূরিত হয় তখন অন্য একটি দুশ্চিন্তা অবিলম্বে তাহার স্থান অধিকার করে। এই নূতন দুশ্চিন্তার উপকরণ অন্তঃকরণের মধ্যেই থাকে, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী দুশ্চিন্তা কর্ত্তৃক সংবিদ সম্পূর্ণ অধিকৃত থাকায় ইহা সংবিদের মধ্যে আবির্ভূত হইবার অবকাশ পায় না। অবকাশ-প্রাপ্তি-মাত্র ইহা আবির্ভূত হয়।

জীবনে দুঃখই সত্য পদার্থ; সুখ দুঃখের অভাব মাত্র। আরিষ্টটল বলিয়াছিলেন—জ্ঞানী সুখ চাহেন না; তিনি চাহেন দুঃখ এবং উদ্বেগ হইতে মুক্তি। যাহাকে সাধারণতঃ সুখ বলে, তাহা প্রকৃত পক্ষে ব্যতিরেকমূলক (Negative)। যে সকল সুখ ও সুবিধা আমরা প্রকৃত পক্ষে ভোগ করি, তাহাদের সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি না, তাহাদের যে কোনও মূল্য আছে, তাহা আমরা মনে করি না, তাহাদিগকে আবশ্যক বলিয়াই গণ্য করি। তাহাদের অভাবজনিত দুঃখের প্রতিরোধ করে বলিয়া, তাহারা ব্যতিরেক-মুখে আমাদের সুখবিধান করে। যখন সেই সকল সুখ ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হই, তখন তাহাদের মূল্য বুঝিতে পারি। কেননা তাহাদের অভাব ও অভাবজাত দুঃখই সত্য পদার্থ; তাহা অব্যবহিতভাবে আমাদিগকে আঘাত করে। Cynicগণ সকল জাতীয় সুখকেই বর্জন করিয়াছিল কেন? ইহার কারণ দুঃখ অল্পাধিক পরিমাণে সর্ব্বদাই সুখের সহিত মিশ্রিত থাকে।

যখন অভাবের তাড়না ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না, তখনও লোকের সুখ হয় না। কেননা তখন অবসাদ (Ennui) উপস্থিত হয়। এই অবসাদ দূর করিবার জন্য আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন হয়।

"সাম্যবাদিগণের কল্পিত Utopia ও যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও দুঃখের নিবৃত্তি হইবে না। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনের জন্য আবশ্যক, তাহা থাকিয়াই যাইবে। আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকাও যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে অবসাদ উপস্থিত হইবে। জীবন ঘড়ির দোলকের মত দুঃখ এবং অবসাদের মধ্যে দুলিতে থাকিবে। মানুষের কল্পনা যখন সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণার আবাসরূপে নরকের কল্পনা করিল, তখন স্বর্গে অবশিষ্ট রহিল অবসাদমাত্র। সাধারণ লোক সর্ব্বদাই অভাবপীড়িত; উচ্চ শ্রেণীর লোক অবসাদের ভারে ক্লান্ত। মধ্যশ্রেণীর মধ্যে রবিবার অবসাদের প্রতীক, অন্যান্য বার অভাবের প্রতীক।

"জীবদেহ যত উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহার দুঃখের ও তত বৃদ্ধি হয়। ইচ্ছার অভিব্যক্তি যত অধিক হয়, দুঃখবোধও ততই স্পষ্টতর হয়। উদ্ভিদে বোধশক্তি নাই, দুঃখও নাই। নিম্নতম শ্রেণীর প্রাণী-গণ (Infusoria and Radiata) অল্প পরিমাণ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। পতঙ্গদিগের মধ্যেও অনুভব এবং দুঃখবোধ করিবার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। মেরুদণ্ডবান্ জীবে স্নায়ু যন্ত্রের পূর্ণ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের আধিক্যও অনুভূত হয় এবং বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত এই আধিক্যেরও বৃদ্ধি হয়। জ্ঞান যতই স্পষ্টতর হইতে থাকে, সংবিদ্ যত উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ততই দুঃখ বাড়িতে থাকে। অবশেষে মানুষে দুঃখ পরিপূর্ণরূপে আবির্ভূত হয়। মানুষের মধ্যেও বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে দুঃখের পরিমাণ ভেদ হয়। বুদ্ধি যতই বেশী হয়, দুঃখের পরিমাণও ততই বেশী হয়। প্রতিভাবান ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করে। জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত দুঃখেরও বৃদ্ধি হয়। স্মৃতিশক্তি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি দ্বারাও দুঃখ-বৃদ্ধি হয়। অতীতের চিন্তা এবং ভবিষ্যতের ভাবনা হইতেই আমাদের অধিকাংশ কষ্টের উৎপত্তি। মৃত্যু অপেক্ষা মৃত্যুর চিন্তাই অধিক কষ্টদায়ক।

"জীবন সংগ্রাম-স্বরূপ। জগতের সর্ব্বত্রই কলহ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ। এই যুদ্ধে একবার জয়, একবার পরাজয়! প্রত্যেকেই অন্যকে স্থানচ্যুত করিতে চায়, তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে চায়, তাহার পরিশ্রমের ফল নিজে ভোগ করিতে চায়!! হাইড্রা-নামক জীবের সন্তান প্রথমে

ফুলের কুঁড়ির মত তাহার দেহ হইতে নির্গত হয়, পরে দেহ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র জীবে পরিণত হয়। মাতৃদেহে সংলগ্ন থাকিবার সময়ে যখন কোনও খাদ্য নিকটে উপস্থিত হয়, তখন তাহার জন্য মাতৃদেহের সহিত তাহার কলহ হয়, একে অন্যের মুখ হইতে সেই খাদ্য কাড়িয়া লয়। অষ্ট্রেলিয়ার বুলডগ পিপীলিকার (Bull dog ant) আচরণ এই প্রকার কলহের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাকে যখন কাটিয়া দুই খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, তখন মস্তক ও লাঙ্গুলের মধ্যে যুদ্ধ আরব্ধ হয়। মস্তক তাহার দন্ত দ্বারা লাঙ্গুলকে ধরিয়া ফেলে, লাঙ্গুল মস্তককে দংশন করিয়া আত্মরক্ষা করে; অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই যুদ্ধ চলিতে থাকে। যে পর্য্যন্ত না উভয় অংশের মৃত্যু হয় অথবা অন্য পিপীলিকা তাহাদিগকে গ্রাস করে, ততক্ষণ যুদ্ধ চলে। ইয়ংহাম বলেন, তিনি যবদ্বীপে এক বহুদূর-বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অসংখ্য কঙ্কাল দেখিয়া ইহাকে যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া প্রথমে মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা বৃহদাকার সমুদ্রকচ্ছপের কঙ্কাল। কচ্ছপেরা যখন ডিম পাড়িবার জন্য সমুদ্র হইতে উঠিয়া এই প্রান্তরে আসে, তখন বন্য কুক্কুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; কুক্কুরেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং তাহাদিগকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া পাকস্থলীর উপরিস্থ কঠিন আবরণ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় গ্রাস করে। তারপরে এই সকল কুকুর প্রায়ই ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই জন্যই—বনকুক্কুরের খাদ্য হইবার জন্যই—এই সকল কচ্ছপের জন্ম। এইরূপে (সাধক) ইচ্ছা আপনাকেই ভক্ষণ করে এবং বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরিয়া আপনার পুষ্টি সম্পাদন করে। অবশেষে মানুষ আবির্ভূত হইয়া অন্যান্য জন্তু পরাভূত করে এবং প্রকৃতিকে তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদনের কারখানা বলিয়া গণ্য করে। কিন্তু মানবজাতির মধ্যেও এই বিরোধ—ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার দ্বন্দ্ব—ভীষণ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মানুষকে আমরা মানুষের খাদক-রূপে দেখিতে পাই।

"জীবনের পরিপূর্ণরূপ অতিভীষণ! মানবজীবন সর্ব্বদা যে ভীষণ দুঃখ ও কষ্ট দ্বারা পরিবৃত, যদি স্পষ্টভাবে তাহার চিত্র তাহার সম্মুখে ধারণ করা যায়, তাহা হইলে তাহার ত্রাস উপস্থিত হইবে। যিনি জগৎকে মঙ্গলময় বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন, তাঁহাকে যদি রোগীনিবাস, হাসপাতাল, অস্ত্রচিকিৎসা-গৃহ, কারাগার, বন্দীদিগের যন্ত্রণা-দান-কক্ষ (torture chambers), ক্রীতদাসদিগের কদর্য্য বাসগৃহ, যুদ্ধ-ক্ষেত্র, হত্যাক্ষেত্র প্রভৃতি দেখানো যায়, উদাসীন কৌতুহলের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপনের জন্য যে সকল অন্ধকারময় আগারে দুঃখ বাস করে, তাহা-দের দ্বার যদি তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া যায়,...তাহা হইলে "যাবতীয় জগতের মধ্যে উৎকৃষ্টতম" এই জগতের স্বরূপ কি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। আমাদের এই বাস্তবজগৎ হইতেই দান্তে তাঁহার নরকের উপাদানরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই উপাদান দ্বারা তিনি যাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ঠিক নরকই হইয়াছে। কিন্তু স্বর্গ ও তাহার সুখের বর্ণনা করিতে গিয়া, তাহাকে দুরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কেননা স্বর্গের কোনও উপাদান আমাদের পৃথিবীতে নাই। মহাকাব্যে এবং নাটকে সুখের জন্য প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধই চিত্রিত হইতে পারে; স্থায়ী পূর্ণ সুখ চিত্রিত করা অসম্ভব। মহাকাব্য এবং নাটকের নায়ককে কবি ও নাট্যকার সহস্র বিঘ্ন ও বিপদের মধ্যে দিয়া লক্ষ্য স্থলে লইয়া যান, কিন্তু যখনই লক্ষ্যে অধিগত হয়, তখনি ত্বরিতে যবনিকা পতিত হয়। কেননা ইহার পরের ঘটনা দেখাইতে হইলে দেখাইতে হয় যে আশাসমুজ্জ্বল যে লক্ষ্যের দিকে সুখের আশায় নায়ক ধাবিত হইয়াছিল, তথায় উপনীত হইয়া সে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং পূর্ব্বেও তাহার যে অবস্থা ছিল, পরেও তাহাই হইয়াছিল।

"বিবাহ না করিয়াও আমরা সুখী নহি, বিবাহ করিয়াও সুখী হই না। একাকী যখন থাকি, তখন আমরা অসুখী, আবার সঙ্গীদিগের মধ্যেও সুখ পাই না। প্রত্যেক মানুষের জীবন যদি সমগ্রভাবে দেখা যায়, এবং প্রধান প্রধান ঘটনার উপর লক্ষ্য রাখা যায়, তাহা হইলে সে জীবন দুঃখপূর্ণ বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু জীবনের ঘটনাবলী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিলে হাস্যের উদ্রেক হইবে। পঞ্চমবর্ষ বয়সে কারখানায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে দৈনিক দশ ঘণ্টা, তারপরে বারো ঘণ্টা, অবশেষে পনের ঘণ্টা যান্ত্রিক কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য ব্যয় করার অর্থ অতিরিক্ত মূল্যে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার ক্রয় করা। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের ইহাই নিয়তি, এবং আর লক্ষ লক্ষ লোকের নিয়তিও এই প্রকার।...পৃথিবীর কঠিন আবরণের নিম্নদেশে প্রকৃতির অনেক বলবতী শক্তি সুপ্ত থাকে, আকস্মিক কারণে তাহারা জাগরিত হইয়া পৃথিবীর আবরণ ভেদ করিয়া পৃথিবীর উপরিস্থ যাবতীয় বস্তুর বিনাশ সাধন করে। অন্ততঃ তিন বার পৃথিবীতে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও সম্ভবতঃ এইরূপ আরও অনেক ঘটনা ঘটিবে। লিসবনের ভূমিকম্প, হাইটির ভূমিকম্প, পম্পি নগরীর ধ্বংস সম্ভাব্য ঘটনাবলীর সাবলীল ইঙ্গিত মাত্র। এই সমস্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনার সমক্ষে মঙ্গল-বাদ মানুষের দুঃখের প্রতি পরিহাস বলিয়াই প্রতীত হয় এবং লাইবনিব্‌জের Theodicy (যাহাতে মঙ্গল-বাদ বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) গ্রন্থের প্রতিবাদ স্বরূপেই পরবর্ত্তী কালে মহামনস্বী ভলটেয়ারের Candide রচিত হইয়াছিল—ইহা ভিন্ন উক্ত গ্রন্থের (Theodicy) অন্য কোনও গুণ স্বীকার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। লাইবনিটজ অমঙ্গলের পক্ষে প্রায়ই এই যুক্তির ব্যবহার করিয়াছেন যে অমঙ্গল হইতে সময়ে সময়ে মঙ্গলের উৎপত্তি হয়। তাহার প্রবন্ধের পরে ভলটেয়ারের প্রবন্ধের আবির্ভাব দ্বারা তাঁহার অচিন্তিত উপায়ে তাঁহার যুক্তি সমর্থিত হইয়াছে।" সর্ব্বত্রই জীবনের প্রকৃতি হইতে ইহাই ধারণা হয়, যে কোন বস্তুরই কোন মূল্য নাই। যাহাকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, তাহা অন্তঃসারহীন, সংসার সর্ব্বদিকেই দেউলিয়া, জীবন ব্যবসায়ে খরচা পোষায় না।"

"যৌবনের আনন্দ এবং উৎসাহের একটা কারণ এই, যে যখন আমরা জীবন-পর্ব্বতে আরোহণ করিতে থাকি, তখন মৃত্যু দৃষ্টি গোচর হয় না। মৃত্যু তখন পর্ব্বতের অন্য পার্শ্বে শায়িত থাকে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী ফাঁসী কাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইবার সময় তাহার যে অনুভূতি হয়, জীবনের শেষের দিকে আমাদেরও প্রতিদিন সেই অনুভূতি হয়।

জীবন যে কত অল্পস্থায়ী, তাহা বুঝিতে হইলে দীর্ঘজীবী হওয়া আবশ্যক। ছত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাদের জীবনশক্তির আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, তাহা বিবেচনা করিলে,যাহারা মূলধনের সুদের দ্বারা সংসার চালায়, তাহাদের সহিত আমাদের উপমা দেওয়া যায়। আজ যাহা ব্যয় হয়, আগামী কল্য তাহা সুদ হইতে আদায় হয়। কিন্তু ছত্রিশ বৎসরের পরে, যে মহাজন মূলধন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের তুলনা হয়। এই ভয়েই বয়োবৃদ্ধির সহিত সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যৌবন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর কাল তো নহেই, বরং প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থের প্রথমে যে বলিয়াছিলেন—বৃদ্ধাবস্থাই অধিকতর সুখকর, কেননা যে কামপ্রবৃত্তি মানুষকে বার্দ্ধক্য-কাল পর্য্যন্ত বিচলিত করিয়া আসিয়াছে, বার্দ্ধক্যে তাহার প্রভাব লুপ্ত হয়, ইহাতেই অধিকতর সত্য আছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা ও ভুলিলে চলিবে না যে যখন এই কামনার নিবৃত্তি হয়, তখন জীবনের শাঁস চলিয়া যায়, খোসা মাত্র পড়িয়া থাকে। ক্রমে দেহও মস্তিষ্কের ক্ষয় হইতে থাকে। পরে আসে মৃত্যু। প্রত্যেক বস্তুই অস্থায়ী, প্রত্যেক বস্তুই মৃত্যু-পথগামী। পায়ে হাঁটা যেমন পতনের প্রতিরোধ মাত্র, তেমনি জীবনও প্রতিক্ষণে মৃত্যুর প্রতিরোধ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। মৃত্যুভয় হইতেই দর্শনের আরম্ভ, ইহাই ধর্ম্মের ভিত্তি। মৃত্যুর ভয় যে কি ভীষণ, জীবনের অমরতায় বিশ্বাস দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়।

"মৃত্যু-ভয়ে লোক ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। দুঃখে ভীত মনের আশ্রয় উন্মত্ততা। অসুখকর কিছুই আমরা ভাবিতে চাহি না। ইচ্ছাই বুদ্ধির সমীপে অপ্রীতিকর বিষয়ের উত্থাপনে বাধা প্রদান করে। এই বাধার প্রবলতাবশতঃ যখন কোনও বিষয়ের সমস্ত দিক বুদ্ধির সমীপে উপস্থিত করা সম্ভবপর হয় না, তখন কল্পনা চিন্তার ফাঁকগুলি পূর্ণ করে। বুদ্ধি তখন ইচ্ছাকে তুষ্ট করিবার জন্য তাহার স্বরূপ বর্জন করে, এবং কল্পনা তখন যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার সৃষ্টি করে। কিন্তু এই উন্মত্ততাও অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিবার উপায় মাত্র। দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভের আরও একটি উপায় আছে। তাহা আত্মহত্যা। কথিত আছে Diogenes নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। বাঁচিবার ইচ্ছার উপর জয়লাভের ইহা একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই জয় ব্যক্তিগত। জাতির মধ্যে বাঁচিবার ইচ্ছা অপরাজেয়। ব্যক্তির আত্মহত্যা মূর্খতা-প্রসূত কর্ম্ম। জাতির মধ্যে যে ইচ্ছা বর্ত্তমান, এই আত্মহত্যায় তাহার কোনও ক্ষতি হয় না। একজন যদি সজ্ঞানে আত্মহত্যা করে, সহস্র জন অনিচ্ছায় জন্মগ্রহণ করে। ব্যক্তির মৃত্যুর পরে দুঃখকষ্ট অব্যাহত থাকে এবং যতদিন মানুষ ইচ্ছার শাসনের অধীন থাকিবে, ততদিন অব্যাহত থাকিবে। যতদিন ইচ্ছা জ্ঞান ও বুদ্ধির অধীনে আনীত না হয়, ততদিন জীবনের দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ অসম্ভব।"

মুক্তি মার্গ

"লোকে অর্থ কামনা করে এবং অন্য সকল পদার্থ হইতে অর্থকে অধিক ভালবাসে। অর্থ দ্বারা সমস্ত কামনায় পরিতৃপ্তি সম্ভবপর বলিয়াই অর্থ লোকের এত প্রিয়। কিন্তু জীবনকে কিরূপে সুখকর করা যায়, তাহা জানিতে না পারিলে অর্থোপার্জ্জন নিরর্থক। অর্থ উপার্জনের জন্য মানুষ যতটা পরিশ্রম করে, কৃষ্টির জন্য তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগও করে না। কিন্তু জীবনকে সুখকর করিতে হইলে কৃষ্টির এবং জ্ঞানের প্রয়োজন। একটির পর একটি ইন্দ্রিয়সুখ হইতে দীর্ঘকাল তৃপ্তি পাওয়া সম্ভবপর নয়। জীবনের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায় কি, তাহা না জানিতে পারিলে তৃপ্তিলাভ অসম্ভব। মানুষের যাহা আছে, তাহা অপেক্ষা, মানুষ যাহা হয়, তাহা হইতে তাহার অধিক সুখ সম্ভবপর। কোনও মানসিক অভাব যে অনুভব করে না, তাহাকে Philistine বলে। অবসর সময় লইয়া সে কি করিবে তাহা সে জানে না। সে নিত্য নূতন উত্তেজনার জন্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, অবশেষে অলস ধনী এবং অপরিণামদর্শী ইন্দ্রিয়বিলাসীর যাহা পরিণাম, সেই অবসাদ প্রাপ্ত হয়।

"অর্থ হইতে শান্তি নাই। জ্ঞানই শান্তির মার্গ। মানুষের মধ্যে বলবতী ইচ্ছার প্রচেষ্টা আছে, সত্য। কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানের সনাতন, স্বাধীন এবং শান্ত আধারও মানুষ। ইচ্ছার অধিশ্রয় জননেন্দ্রিয়, জ্ঞানের অধিশ্রয় মস্তিষ্ক। ইচ্ছা হইতে জ্ঞানের উদ্ভব হইলেও, জ্ঞান দ্বারা ইচ্ছাকে বশীভূত করা যায়। অনেক সময় বুদ্ধি যে ইচ্ছার আদেশ পালনে অসম্মত হয়, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন কোনও বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা বিফল হয়, অথবা যখন স্মৃতির ভাণ্ডারে রক্ষিত কোনও বিষয় স্মরণ করিতে পারি না, তখন বুদ্ধি ইচ্ছার অধীনতা অস্বীকার করে। এই অবাধ্যতা দেখিয়া ইচ্ছার ক্রোধ হয় এবং ইচ্ছার ক্রোধে বিরক্ত হইয়া বুদ্ধি সময়ে সময়ে বহুক্ষণ পরে অযাচিতভাবে ইচ্ছার আদিষ্ট বিষয় আনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করে। ইহা হইতে বোঝা যায় যে জ্ঞান ইচ্ছার অধীনতা হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ। যদি কেহ বিনা উত্তেজনায় বিশেষ বিবেচনার পরে আত্মহত্যা করে, অথবা বিপদসঙ্কুল অন্য এমন কার্য্যে লিপ্ত হয় যাহার বিরুদ্ধে মানুষের সমগ্র জান্তব প্রকৃতি বিদ্রোহ অবলম্বন করে, তখন তাহার বুদ্ধি যে তাহার জান্তব প্রকৃতিকে সম্যক জয় করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইচ্ছার উপর বুদ্ধির শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। জ্ঞান দ্বারা কামনার দমন অথবা শান্তি করা যায়। যদি বুঝিতে পারা যায়, যে প্রত্যেক ঘটনাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার অপরিহার্য্য ফল, তাহা হইলে কামনা দমন সহজ হয়। যে সকল বস্তু আমাদের অশান্তি উৎপাদন করে, তাহাদের দশটির মধ্যে নয়টি আমাদিগকে কোনওরূপে উদ্বেলিত করিতে পারিবে না—যদি আমরা তাহাদের কারণ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে পারি এবং তাহারা যে অপরিহার্য্য ইহা বুঝিতে সক্ষম হই। অশান্ত অশ্ব যেমন বল্গা দ্বারা সংযত হয়, তেমনি ইচ্ছা ও বুদ্ধি দ্বারা সংযত হয়। প্রবল মনোবৃত্তি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বেশী হয়, ততই আমাদের উপর তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমরা আমাদের অন্তঃকরণ যদি সংযত করিতে পারি, তাহা হইলে বাহ্য কোন বস্তুই আমাদিগকে অভিভূত

করিতে পারিবে না। যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন, যিনি সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষাও তিনি বড়। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীত আপনাকে জয় করা, ইচ্ছার মালিন্য দূর করা, সম্ভব হয় না।

যে জ্ঞান দ্বারা আত্মজয় সম্ভবপর হয়, তাহা কেবল পঠিত বিদ্যা নহে, স্বীয় মনে সংক্রামিত অপরের চিন্তা নহে। "অনবরত অন্যের চিন্তা পাঠ করিতে করিতে, নিজের চিন্তা পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। অধিকাংশ (তথাকথিত) বিদ্বান্ ব্যক্তির মন শূন্য। অপরের চিন্তা শোষণ করিয়া লওয়াই তাহাদের স্বভাব। কোনও বিষয় উত্তমরূপে চিন্তা না করিয়া, সে সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ বিপজ্জনক। যখন আমরা পাঠ করি, তখন অপরের মানসিকক্রিয়া আমাদের মনের মধ্যে পুনরাবর্ত্তিত হয়। সুতরাং সমস্ত দিন ধরিয়া যদি কেহ পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার চিন্তা শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যায়। সংসারের অভিজ্ঞতাকে মূলগ্রন্থ এবং পরিচিন্তন এবং জ্ঞানকে তাহার ভাষ্য বলিয়া গণ্য করা যায়। অল্পপরিমাণ অভিজ্ঞতার সহিত প্রচুর পরিচিন্তন এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানের সম্মিলন হইতে উদ্ভূত ফলের সহিত প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মাত্র দুই পংক্তি মূল এবং চল্লিশ পংক্তি ভাষ্য-সংবলিত গ্রন্থের উপমা দেওয়া যায়।

দার্শনিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভাষ্য বর্জ্জন করিয়া মূল গ্রন্থই পাঠ করা আবশ্যক। যিনিই দর্শনের আকর্ষণ অনুভব করেন, তাহারই কর্ত্তব্য দার্শনিকের স্বকীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থ পাঠ করা। যশের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে। যশঃ নির্ভর করে, অন্যের বুদ্ধির উপর। কিন্তু "অপরের মস্তক কাহারও সুখের উৎকৃষ্ট বাসস্থান হইতে পারে না। আমাদের পরিবেশ হইতে যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা অপেক্ষা আমাদের আত্মোদ্ভূত সুখ উৎকৃষ্ট। আরিস্তত্তল বলিয়াছেন "সুখী হওয়া অর্থ স্বয়ং-পর্য্যাপ্ত হওয়া।" সুখের জন্য পরের উপর নির্ভর করিলে সুখী হওয়া যায় না।

অধিকাংশ লোকই স্বীয় ইচ্ছার প্রভাবের অধীন থাকিয়া বস্তুর দোষগুণ বিচার করে। স্বকীয় ইচ্ছার পরিপূরণে সহায়ক বস্তু তাহাদের প্রীতিকর। যে সকল বস্তু ইচ্ছার পরিপূর্ত্তির পথে বিঘ্ন-স্বরূপ তাহারা অপ্রীতিকর। নির্লিপ্তভাবে সমস্ত বস্তু দর্শন করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অন্তহীন ইচ্ছার অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার উপায় জীবনকে জ্ঞানীর দৃষ্টিদ্বারা দেখা এবং সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যে সকল মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী চিন্তা করা।" স্বার্থহীন বুদ্ধি ইচ্ছার জগতের ক্রোধ ও মূর্খতার উর্দ্ধে সুগন্ধি দ্রব্যের মত উত্থিত হয়। "যখন কোনও বাহ্য কারণ অথবা বিশেষ মানসিক অবস্থা-বশতঃ আমরা ইচ্ছার অন্তহীন প্রবাহ হইতে অকস্মাৎ উত্থিত হই, এবং আমাদের জ্ঞান ইচ্ছার দাসত্ব হইতে মুক্ত হয়, তখন কামনার বিষয়ের দিকে আর দৃষ্টি থাকে না, সমস্ত বস্তু তখন আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ রূপে লক্ষিত হয়; তখন স্বার্থ-চিন্তা তাহাদের সহিত সংযুক্ত থাকে না, তাহাদের স্বকীয় রূপে তাহারা প্রতিভাত হয়।...তখন যে শান্তির আমরা অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু কামনার পথে যাহাকে প্রাপ্ত হই নাই, হঠাৎ তাহা আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয় এবং আমরা স্বস্তি লাভ করি। Epicures যাহাকে পরম মঙ্গল এবং দেবতা-দিগের অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহা সেই অবস্থা। তখন ইচ্ছার কষ্টদায়ক ব্যাপার হইতে আমরা অব্যাহতি লাভ করি। তাহার দাসত্ব হইতে মুক্ত হই। ঈক্সিয়নের (Texion) সদা ঘূর্ণ্যমান চক্র তখন স্থির হয়।"

ইচ্ছার দাসত্বমুক্ত জ্ঞানই ইচ্ছা-প্রসূত দুঃখ হইতে মুক্তির উপায়। এই জ্ঞানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় প্রতিভার মধ্যে। নিম্নতম প্রাণীর মধ্যে ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই নাই বলিলে চলে। সাধারণ মানুষের ইচ্ছাই বেশী, জ্ঞান কম; কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে ইচ্ছা অতি সামান্য, জ্ঞানই অধিক। ইচ্ছার প্রয়োজনে জ্ঞানবৃত্তির যতটুকু বিকাশ প্রয়োজন, প্রতিভাবান ব্যক্তির জ্ঞানবৃত্তি তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিকাশিত। এই বিকাশের জন্য বুদ্ধির অধিকতর শক্তির প্রয়োজন। এই প্রয়োজ সাধিত হয় প্রজনন-ক্রিয়া হইতে প্রজনন-শক্তির আংশিক প্রত্যাহার করিয়া বুদ্ধির কার্য্যে সেই শক্তির নিয়োগ দ্বারা। প্রতিভাবান ব্যক্তির মধ্যে প্রজনন শক্তি অপেক্ষা অনুভূতি এবং উত্তেজনা-প্রবণতার আধিক্য অত্যধিক। নারীজাতি প্রজননের প্রতীক। নারীর বুদ্ধি ইচ্ছা কর্ত্তৃক অভিভূত। এই জন্যই নারীও প্রতিভার মধ্যে শত্রুতা। স্ত্রীলোকের প্রচুর মানসিক শক্তি (talent) থাকিতে পারে, কিন্তু প্রতিভা থাকা সম্ভবপর নহে। স্ত্রীলোকে প্রত্যেক বস্তুই আপনার স্বার্থের দিক হইতে দেখে। কিন্তু প্রতিভার লক্ষণ স্বকীয় স্বার্থ, কামনা ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া, আপনার ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞাতারূপে জগতের সুস্পষ্ট রূপ দর্শন করা। ইচ্ছার বন্ধন হইতে মুক্ত বুদ্ধি জগতের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায়। প্রতিভা আমাদের সম্মুখে যে ম্যাজিক-দর্পণ ধারণ করে, তাহাতে যাহা কিছু সার-এবং-অর্থবৎ, তাহা সমবেতভাবে উজ্জ্বল আলোকে স্থাপিত হয়, এবং যাহা আপাতিক পরিত্যক্ত হয়। সূর্য্যালোক যেমন মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া বস্তুকে প্রকাশিত করে, তেমনি চিন্তা তাহার আবরক চিন্তাবেগ ভেদ করিয়া বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং তাহার স্বরূপ প্রকাশিত করে। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তু তাহার মধ্যস্থ সার্বিক 'প্রত্যয়ে'র বিশিষ্ট রূপ। চিত্রকর যখন কোনও ব্যক্তির চিত্র অঙ্কিত করে, তখন যেমন তাহার বিশিষ্ট রূপের নিম্নে তাহার সার্বিক গুণ ও স্থায়ী সত্য দর্শন করে, চিন্তাও তেমনি বিশিষ্ট বস্তুর অন্তরালে তাহার সার্বিক সত্তা দেখিতে পায়। বস্তুর যাহা সারভাগ, বিশেষের মধ্যে যাহা সার্বিক, স্বার্থ-নির্মুক্ত দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট ভাবে তাহা দর্শন করিবার সামর্থ্যই প্রতিভা। এই স্বার্থরাহিত্যের জন্য স্বার্থপর ব্যবহারিক জগতের সহিত প্রতিভার সামঞ্জস্য হয় না। প্রতিভার দৃষ্টি বহুদূরপ্রসারী হইলেও, নিকটে সে দেখিতে পায় না। আকাশের নক্ষত্রে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া সে সমীপস্থ কূপের মধ্যে পতিত হয়। ইহাই তাহার অসামাজিকতার কারণ। সাধারণ লোকে যখন ক্ষণস্থায়ী বিশেষ বিশেষ বস্তু লইয়া ব্যস্ত, তখন প্রতিভা সনাতন, সার্বিক ও মৌলিকের চিন্তায় নিবিষ্ট। সাধারণ

লোকের মনের সহিত তাহার মনের কোনও মিলন-ক্ষেত্র নাই। যে লোকের বুদ্ধি যত কম এবং অমার্জিত, সে তত বেশী সামাজিক হয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তির সঙ্গীর প্রয়োজন হয় না। সর্ব্ববিধ সৌন্দয্য হইতে তিনি যে সুখ প্রাপ্ত হন, কলা হইতে তিনি যে সান্ত্বনা লাভ করেন, কলার জন্য যে উৎসাহ তাহার মধ্যে বর্ত্তমান, তাহার ফলে জীবনের দুঃখকষ্ট তাঁহাকে স্পর্শ করে না। ইহা দ্বারাই তাহার সংবিদের স্পষ্টতা-জনিত দুঃখ-বৃদ্ধি এবং নিঃসঙ্গ জীবনের ক্ষতিপূরণ সাধিত হয়।

কিন্তু এই নিঃসঙ্গতার ফলে অনেক সময় প্রতিভাবান ব্যক্তির চিত্ত বৈকল্য উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতার কষ্টও কল্পনাপ্রবণতা, নির্জনতা ও পরিবেশের অসামঞ্জস্যতার সহিত মিলিত হইয়া, বাস্তবের সহিত তাহার মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। আরিস্ততল বলিয়াছেন "দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, কবিতা এবং কলার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ লোকেরা সকলেই বিষণ্ণপ্রকৃতিলোক। রুশো, বায়রণ, আলফিয়েরী প্রভৃতি বিখ্যাত লোকের জীবন-চরিত হইতে বাতুলতা এবং প্রতিভার মধ্যে সম্বন্ধের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকগণ এই উন্মাদ শ্রেণীরই অন্তর্গত।" বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রকৃতি অতিশয় আভিজাত্যপ্রিয়। বুদ্ধির তারতম্যের উপর প্রকৃতি মানবজাতির মধ্যে যে বিভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কোনও দেশেই জন্ম, পদ, ধন, অথবা জাতি দ্বারা তাহা সৃষ্ট হয় নাই। প্রকৃতি কেবল মুষ্টিমেয়-সংখ্যক লোককে যে প্রতিভা দিয়াছেন, তাহার কারণ প্রতিভা সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিবন্ধক। "পণ্ডিতলোকেও জমি চাষ করিবে, ইহাই ছিল প্রকৃতির অভিপ্রায়। এই কষ্টিপাথর দিয়া দর্শনের অধ্যাপকদিগেরও বিচার করিতে হইবে।"

সোপেনহরের মতে ইচ্ছার দাসত্ব হইতে জ্ঞানের মুক্তি এবং ব্যক্তিত্ব-ও-সাংসারিক-স্বার্থ-বিস্মৃত মনের ইচ্ছার প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া সত্যের দর্শনই কলার ধর্ম্ম। বিজ্ঞানের বিষয় সার্ব্বিক, কলার বিষয় বিশেষ। কিন্তু বিজ্ঞানের সার্ব্বিকের মধ্যে বহু বিশেষের সমাবেশ। কলার বিশেষের অভ্যন্তরে সার্ব্বিকের অবস্থান। "যে আদর্শে ব্যক্তির রূপ কল্পিত, তাহার চিত্রে সেই আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।" জন্তুর চিত্রে যেটুকু সেই জাতীয় জন্তুর সকলের মধ্যে বর্ত্তমান, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া গণ্য। কলার সৃষ্টির মধ্যে যতটা সার্ব্বিক প্রকাশিত হয়—চিত্রিত বস্তু যে—প্লেটনিক আই-ডিয়ার জড়ীয়রূপ, যতটা সেই আইডিয়া সেই চিত্রে অভিব্যক্ত হয়—ততটা তাহা সুন্দর বলিয়া অনুভূত হয়। কোনো মানুষের চিত্রের সফলতা কেবল চিত্রিতের সহিত তাহার ফটোগ্রাফিক আনুরূপ্যের উপর নির্ভর করে না; মানুষের কোনও সার্ব্বিক ধর্ম্মের তাহাতে প্রকাশ চাই। কলা বিজ্ঞান হইতে বড়, কেননা বিজ্ঞান অক্লান্ত পরিশ্রমে তথ্যের পরে তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর যুক্তির প্রয়োগ দ্বারা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়, কিন্তু কলা অব্যবহিত জ্ঞানে সত্যের সন্ধান পাইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহাকে রূপায়িত করে। বুদ্ধির প্রাখর্য্য (talent) দ্বারাই বিজ্ঞানের কাজ চলিতে পারে, কিন্তু কলার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক দৃশ্য, কবিতা অথবা চিত্র হইতে যে আনন্দ আমরা প্রাপ্ত হই, তাহা উদ্ভূত হয় ব্যক্তিগত ইচ্ছার সংস্রব-বিহীন চিন্তা হইতে। ব্যক্তিগত চিন্তা হইতে বিযুক্ত আর্টিষ্ট কারাগার হইতেই সূর্য্যাস্ত দর্শন করুন অথবা রাজপ্রাসাদ হইতে দর্শন করুন, সূর্য্যাস্ত তাহার নিকট সমান সুন্দর। ভয়বিমুক্ত ও উত্তেজনা-বিরহিত অবস্থায় ভীষণ বস্তুর মধ্যেও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। বিনশ্বর বিশিষ্ট বস্তুর অন্তরালে সনাতন সার্ব্বিকের প্রকাশ দ্বারা আর্ট আমাদের দুঃখ কষ্টের লাঘব করে ?

আমাদিগকে ইচ্ছার দ্বন্দের ঊর্দ্ধে তুলিবার ক্ষমতা সঙ্গীত-কলারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য কলার মত সঙ্গীত বস্তুর প্রত্যয় অথবা সারভাগের প্রতিরূপ নহে; ইহা ইচ্ছারই প্রতিরূপ। সদা সঞ্চরণশীল সংগ্রামরত' ভ্রাম্যমান ইচ্ছা সর্ব্বদা নূতন উদ্যম আরম্ভ করিবার জন্য আপনার নিকট ফিরিয়া আসিতেছে—ইহাই সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এই জন্যই অন্যান্য কলা অপেক্ষা সঙ্গীতের শক্তি অধিক। অন্যান্য কলায় বস্তুর ছায়া প্রদর্শিত হয়, কিন্তু সঙ্গীতে বস্তুর প্রকৃত রূপ ব্যক্ত হয়। সঙ্গীতের দ্বারা আমাদের অনুভূতি অব্যবহিত ভাবে উদ্রিক্ত হয়, তাহার জন্য "প্রত্যয়ের" প্রয়োজন হয় না; বুদ্ধি হইতেও সূক্ষ্মতর পদার্থের নিকট সঙ্গীতের আবেদন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য কলার সহিত সামঞ্জস্যের (symmetory) যে সম্বন্ধ, সঙ্গীতের সহিত ছন্দের সেই সম্বন্ধ। সেই জন্য সঙ্গীত ও স্থাপত্য কলা পরস্পরের বিপরীত—স্থাপত্য কলা জমাট সঙ্গীত, তাহার সামঞ্জস্য গতিহীন ছন্দ।

পুষ্পে তোমায় সাজিয়ে দেব

শ্রীশ্যামানন্দ গুপ্ত

অন্ধকারে লুকিয়ে আছ কোথায় তুমি স্বামী
ভক্তিভরে আজি তোমায় প্রণাম করি আমি।
পুষ্পভারে সাজায়ে ডালি
রাখব ঘরে প্রদীপ জ্বালি
সময় হলে আসবে তুমি আমার গৃহে নামি
পুষ্পে তোমায় সাজিয়ে দেব হে অন্তরযামী।

অরবিন্দ দর্শনের ভূমিকা

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

হস্ত-পদ-নখ-দংষ্ট্রা মাত্র সম্বল আদিমতম মানুষ হতে সুরু করে পঞ্চাশোত্তর বিংশ শতাব্দীর স্কাই-স্ক্রেপারনিবাসী এ্যাটম-বোমা-সজ্জিত সভ্য মানুষের ইতিহাস উন্নতি ও প্রগতির এক বিস্ময়কর বিচিত্র কাহিনী। জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে মানুষ আজ সভ্যতার একেবারে উপর-তলার অধিবাসী। কিন্তু একান্ত বিপদের সংগে একথাও তো স্বীকার না করে উপায় নাই যে, বহু ঢক্কা-নিনাদিত সভ্যতার এই ঝক্‌ঝকে পালিসের অন্তরালে আজও মানুষের অন্তরে বাসা বেঁধে আছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মনের সবগুলি ঘৃণিত ও কুৎসিৎ বৃত্তি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। এই ষড় রিপুর অক্টোপাশের হাত থেকে আজো তো মানুষ নিস্তার লাভ করতে পারে নাই। বরং বিজ্ঞানের দুর্বার শক্তির অধিকারী মানুষের হাতে এই সব নীচ বৃত্তির প্রকাশ আজ ভয়ংকর মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তারই প্রকাশ রাজায় রাজায় সংঘর্ষ, দেশে দেশে সংগ্রাম, আর আণবিক বোমার সর্বধ্বংসী প্রলয়-নর্তন। সভ্যতাগর্বী মানুষ আজ যেন স্বহস্ত-রচিত শ্মশান-শয্যায় দাঁড়িয়ে একান্ত হতাশ্বাসে উর্ধ্বপানে আতুর অঞ্জলী তুলে কাতর কণ্ঠে বলছে :

'করুণাঘন ধরণীতল কর কলংকশূন্য।'

কিন্তু মানব-ইতিহাসের স্বরূপ বিশ্লেষণে এই কলংকিত অধ্যায়ও তো 'এহ বাহ্য।' মানুষ পাথর কেটে অস্ত্র শানিয়েছে, দলগত গোষ্ঠিতে বিবাদ করেছে, মহাদেশের বিরুদ্ধে মহাদেশকে দিয়েছে লেলিয়ে। মিথ্যা নয়। আবার এও তো সত্য যে মানুষ আদর্শের জন্য ত্যাগকে বরণ করেছে। মহত্তের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে, ধূলির ধরণীতে সে দেবতার আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেছে। তেল-নুন-লকড়ির চিন্তায় বিব্রত অতি-গতানুগতিক জীবনের পথে চলতে চলতে হঠাৎ সে পেয়েছে কোন্ এক অদৃশ্যলোকের আলোর নির্দেশ, অকস্মাৎ তার কানে বেজেছে সুদূরের বাঁশরী। আর সেই অজানার হাতছানিতে—

"রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক। মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে
সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন, বিঁধিয়াছে পদতলে
প্রত্যহের কুশাংকুর।"

···"সর্বপ্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি' জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন—
হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্ত-পথ-অর্ঘ্য-উপচারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা করিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

এমনি করেই মানুষের অন্তরে চলেছে অবিরাম দেবাসুর সংগ্রাম। শতাব্দীর পর কত শতাব্দী কেটে গেলো, প্রেম-মৈত্রী-কল্যাণের বাণী নিয়ে কতো মহাপুরুষ এলো আর গেলো, মানব মনের এই চিরন্তন সংগ্রামের অবসান হলো না। কিন্তু কেন? ব্যথা, বেদনা ও নৈরাশ্যের কল্লোলিত সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ মানব-মন আজ এই প্রশ্ন বার বার করছে কাতর কণ্ঠে: কেন? কেন এই দেবাসুর সংগ্রামের আজো অবসান হলো না?

উত্তর দিলেন বর্তমান যুগের দার্শনিক। তিনি বলেন: এই বিশ্বপ্রকৃতি জুড়ে চলেছে এক বিরাট ক্রমবিবর্তনের পালা। প্রকৃতির মুহূর্তের বিশ্রাম নাই। 'চরৈবতি' তার একমাত্র ধর্ম। কিন্তু এই পথ-চলা শুধু পুরাতন পথ-পরিক্রমা নয়, নয় পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। প্রকৃতির এগিয়ে চলার ছন্দে ছন্দে প্রতিটি পদক্ষেপের সংগে সংগে ফুটে উঠছে নব নব লীলা কমল। এই বিবর্তনের পথ ধরেই জড় হতে উদ্ভূত হয়েছে প্রাণ, প্রাণ বিকশিত হয়েছে মনে, মনের অন্ধকার গুহায় পড়েছে চৈতন্যের আলো। সে আলো জড়, প্রাণ বা মন জগতের কোন রুদ্ধদ্বার কক্ষের নিভৃত প্রদীপ হতে আসে না। সে আলোর চিহ্নমাত্র পাওয়া যাবে না জড়, প্রাণ বা মনের ঘরে। সে আলো আসে উর্দ্ধতর কোন জগৎ হতে—যে জগৎ আজো আবির্ভাবের শুভ লগ্নের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

সেই উর্দ্ধতর লোকের আলো মানুষের মনের উপর নিকষ কনকলেখার মতো বিচ্ছুরিত হয় বলেই মানুষের জীবন পশুর জীবন হতে উন্নত, মানুষ প্রাণধর্মের দাসত্ব করতে করতেও বার বার বৃহতের সন্ধানে, মহতের সাধনায় মাথা তুলে চায়। তার পর একদিন প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথেই এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হবে অতি মানব শক্তি। সেই শক্তির আস্বাদন করে মানুষ সেদিন হবে পরম শক্তিমান, বর্তমানের নীচতা-হীনতা-ক্ষুদ্রতার বহু উর্ধ্বে হবে তার আসন। মানুষ সেদিন হবে দেব-জীবনের অংশীদার—অমৃতের পুত্র। আধুনিক দর্শন একেই বলে —সৃষ্টিশীল বিবর্তনবাদ বা Creative Evolution.

কাজেই দেখা যাচ্ছে: প্রাকৃতিক সমাজ-বিন্যাসে প্রাণ জড়কে নিয়ন্ত্রিত করে—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম থেকে সে শক্তি আহরণ করে। আবার জড় ও প্রাণকে নিয়ন্ত্রিত করে মন। মনের অধিকারী বলেই জীবন-লীলায় মানুষের এত বড় আধিপত্য। কিন্তু মনের শক্তি তো পূর্ণ নয়। জড়ের আকর্ষণে, প্রাণের অন্ধ আবেগে মন দিশেহারা হয়ে পড়ে। হারিয়ে ফেলে তার বিচার বুদ্ধি। তাই তো মানুষের ইতিহাসে চিরকাল সভ্যতা ও বর্বরতার দ্বন্দ্ব—দেবাসুরের সংগ্রাম। মানব-মনের এই চিরন্তন সংগ্রামের মর্ম-কথাটি অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে কবি-গুরুর 'সুদূর' কবিতায়:

> 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে
> বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী।
> কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার,
> সে-কথা-যে যাই পাশরি।'

মানুষের এই সংগ্রাম-বিক্ষুব্ধ জীবনে আধুনিক দর্শন শুনিয়েছে আশার বাণী:

> 'নাই, নাই ভয়
> হবে হবে জয়,
> খুলে যাবে এই দ্বার।'

প্রকৃতির যাত্রা-পথে একদিন আবির্ভাব হবে নতুন শক্তির। মানুষের জীবন লাভ করবে দিব্য রূপান্তর। জড় প্রাণ প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তার পূর্ণ কর্তৃত্ব। এ বাণীতে আধি-ব্যাধি-প্রপীড়িত-ঘৃণা-হিংসা-কণ্টকিত মানুষ আশায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। কিন্তু সংগে সংগে তার অসহিষ্ণু মন চীৎকার করে ওঠে: সে কবে হবে? আরো কতো যন্ত্রণা ভোগের পরে? এইখানে আমাদের কানে বাজে মানব-মুক্তিব্রতী যোগী শ্রীঅরবিন্দের কম্বুকণ্ঠ। তিনি পরম আশ্বাসে যেন বলেন: দিন আগত ঐ। সে দিনকে এগিয়ে আনবার জন্যই আমার এই কঠোর তপশ্চর্যা। তারি জন্য কল-কোলাহলমন্দ্রিত রাজনীতির সহস্র আহ্বানকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন অতিবাহিত করেছি পণ্ডিচেরীর সমুদ্রতীরে নির্জন যোগসাধনায়। তিনি নিজেও বলেছেন: What I want to achieve is the bringing down of the supramental to bear on this being of ours, so as to raise it to a level higher than the mental and from there change and sublimate the workings of mind, life and body. আমি চাই একটি অতি-মানব শক্তিকে এই জগতে টেনে আনতে, যার ফলে আমাদের স্বত্তা বর্তমানের মানব স্তর ছেড়ে কোন উচ্চতর লোকে উঠে যাবে এবং তার প্রভাবে মন, প্রাণ ও দেহের হবে রূপান্তর ও যুগান্তর।'

শ্রীঅরবিন্দ নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বলেছেন যে, যে-অতি-মানব প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথ ধরেই সুদূর ভবিষ্যতে একদিন আপনা হতেই আবির্ভূত হত মর্ত্য-মানব-মনে, যৌগিক সাধনার বলে সেই অতি মানবকে অবিলম্বেই আবির্ভূত করানো সম্ভব, আর সেইটেই তাঁর যোগ সাধনের লক্ষ্য। শ্রীঅরবিন্দের কথাই বলি: I know with absolute certitude that the Supramental is a truth and that its advent is in the very nature of things: the question is as to the when and the how.

শ্রীঅরবিন্দ একান্তভাবে বিশ্বাস করেন, এই অতি মানবের সাধনায় মানুষ সিদ্ধিলাভ যদি করে, তাহলে তার মধ্যে ভাগবত চেতনা বিকাশলাভ করবে, তার দেহের ধর্ম রূপান্তরিত হয়ে ভাগবত আনন্দের স্পর্শে জরাব্যাধিহীন হবে। মানুষের শাস্তি তখন প্রকৃতির উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। সে আর থাকবে না প্রকৃতির শক্তির হাতের খেলার পুতুল। অবশ্য তার অর্থ এই নয়

যে এই শক্তির অবতরণ হতে না হতেই এ জগৎটা হয়ে উঠবে অতি-মানব জগৎ বা সব মানুষের হবে পূর্ণ রূপান্তর। তা কখনো সম্ভব নয়। তবে কয়েকজন শক্তিশালী সাধকের মনকে আশ্রয় করে সেই অতি মানব শক্তি যদি একবার অবতরণ করতে পারে, তখন সে নিজের পথ নিজেই করে নিতে পারবে। সেই কতিপয় মানুষই হবেন অতি মানব সাধনার তীর্থংকর। একমাত্র তাঁরাই পারবেন বর্তমান কালের দিশেহারা পথহারা মানুষকে দিতে পথের নির্দেশ। তাঁদেরই পথ চেয়ে আছে আজকের আর্ত মানুষ। সেই সব দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিরাই হলেন দিব্য মানব জাতির অগ্রণী—পথ প্রদর্শক। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Psychology of Social Development গ্রন্থে লিখেছেন: The spiritual man who can guide human life towards its perfectiou is typified in the ancient Indian ideal of Rishi, who living the life of man has found the world of the Supra-intellectual, Supramental spiritual truth.

শ্রীঅরবিন্দের যোগ সাধনা ও দিব্যজ্ঞানের আদর্শ উপলব্ধির বস্তু, বুদ্ধিগত তত্ত্ব বিচারের বস্তু নয়। তিনি যাকে বলেছেন Supramental, বলেছেন life Divine, মন দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না বলেই ভাষণ দিয়ে তার কথাবলতে গেলেই জিনিষটা হেঁয়ালীর মত শোনাবে। বিংশ শতাব্দীর ইট-কাঠ-লোহায় গড়া যন্ত্র-সভ্যতার পোষ্যপুত্র আমরা, আধ্যাত্মিক সাধনা ও ভাগবত জীবনের এই নব রূপায়নের কাহিনী আমাদের কাছে হেঁয়ালীতর লাগাই হয়তো স্বাভাবিক। আর হয়তো সেই কারণেই ভাগবত চেতনার পূর্ণযোগী শ্রীঅরবিন্দ লোকালয় হতে বহু দূরে নির্জন সমুদ্রতীরেই বসে ছিলেন যোগ সাধনায়। তবু আমরা আশা করব—ধ্যান তাঁর একদিন ভাঙবেই। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তির জন্ম একদিন তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে। সে মুক্তি আজ অর্জিত হয়েছে। কিন্তু তিনি জানেন, রাষ্ট্রীয় মুক্তি অর্জনই ভারতবর্ষের শেষ কথা নয়। আর্ত পৃথিবীর মানুষকে নতুন মুক্তি-পথের সন্ধান দেবার দায়িত্ব রয়েছে ভারতবর্ষের স্কন্ধে। সেই দায়িত্ব তাকে গ্রহণ করতেই হবে। সেদিন আজ আগত। দিগদিগন্ত হতে তাই আজ ডাক এসেছে ভারতবর্ষের দুয়ারে,—'জাগো, পথ দেখাও।' সে ডাকে সাড়া শ্রীঅরবিন্দকে দিতেই হবে। মানুষের ক্রন্দনে যাঁর প্রাণ গলে, মানুষের ডাকে কর্ম-মুখর লোকালয়ের পথে তাঁকে আসতেই হবে। সেই শুভলগ্নের প্রত্যাশায় আজ আমরা 'স্বদেশ-আত্মার' মূর্ত বিগ্রহ পূর্ণ যোগী শ্রীঅরবিন্দকে জানাই আমাদের অন্তরের আহ্বান।

(শ্রীঅরবিন্দের মহাপ্রয়াণের কয়েকমাস পূর্বে লিখিত)

দিনান্তে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

দিনান্তের রক্তরাঙা আকাশের বক্ষ হতে ধীরে
নামিছে কুহেলী শুভ্রতা লাজনম্র নববধূ প্রায়—;
ধীরে আলিঙ্গন করে আলোক উজ্জ্বল ধরণীরে
শান্ত স্নিগ্ধ পরশেতে দিবসের যাতনা ভুলায়।
শীতল আঁধার আছে ওর পিছে জানি—চুপিসারে
দাবদগ্ধ ধরণীরে টেনে নেবে তার স্নিগ্ধ কোলে;
শান্তি আসে দেহ মনে—সুপ্তি নামে নয়ন মাঝারে
আধোসুপ্ত আধোজাগা মনে অতীতের স্মৃতি দোলে।
পিছনে যা পড়ে র'ল স্বপ্ন মাঝে তাই যায় দেখা,
সুখদুঃখ পর পর স্রোতের বুকেতে জেগে ওঠে,
ফেনায়িত সাগরের কুলে জাগে অতীতের লেখা,
বালুকারাশির বুকে লক্ষ লক্ষ অশ্রুবিন্দু ফোটে।

হাসির উচ্ছ্বাস কত—অকথিত কত কি যে কথা,
কত যে বেঁধেছে ঘর বালু দিয়ে সাগরের কূলে,
কত ঘর ভেঙ্গে গেছে—জমে আছে কি গভীর ব্যথা,
আধো স্বপনের বুকে মানুষ জাগিয়া রহে ভুলে।
মানুষের এই ভুল একদা ভাঙ্গিয়া যাবে জানি
সেদিনে স্মৃতির কোঠা বৃথাই করিবে অন্বেষণ,
রুদ্ধ দরজায় শুধু বার বার করাঘাত হানি
ফিরে পেতে চাহিবে সে হয় তো বা ফেলে আসা ক্ষণ।
যে ক্ষণ একদা এলো না চাহিতে তাহার দুয়ারে—
যে কল্যাণ এসেছিল, ভুল করে তারে লয় নাই,
আজি দিনান্তের ক্ষণে সেইক্ষণে চায় বারে বারে
সুপ্তি মাঝে নেমে আসে মরণের স্নেহস্পর্শ তাই।

এলফ্রেড নোবেল ও ১৯৫০ সালের নোবেল পুরস্কার

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

যে মহাত্মা জগতে শিক্ষা, সভ্যতা ও শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁর বিপুল ধনসম্পদ নিঃস্বার্থভাবে দান করে পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন—সেই এলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেলের নাম আমাদের চিরপরিচিত। নোবেল পুরস্কার প্রবর্ত্তন তাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তি।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সুইডেনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন সামান্য এঞ্জিনিয়ার। যুদ্ধ-জাহাজ নির্ম্মাণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি সাবমেরিণ ধ্বংস করবার উপযোগী বিস্ফোরক পদার্থ প্রভৃতি আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। পুত্র নোবেল ও পিতার এই সমস্ত সদ্গুণের অধিকারী হন। তাই তিনি যে ডিনামাইট আবিষ্কার করবেন এতে বিচিত্রতা কিছুই নেই। বাল্যকালে নোবেলের স্বাস্থ্য অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, সে জন্য তাঁর জননীর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না।

তাঁর জীবন ছিল যেমনি অদ্ভুত, তেমনি বিচিত্র। লোকে তাঁকে বলত —The richest vagabond of Europe. তাঁর বয়স যখন মাত্র একুশ বছর, তখন তিনি প্যারিসে একটি সুন্দরীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হন। তাঁদের উভয়ের বিবাহের কথাও স্থির হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বেই তরুণীটির মৃত্যু হয়। নোবেল তাঁর মৃত্যুতে যে আঘাত পান তা আর জীবনে বিস্মৃত হতে পারেননি—তিনি আর কখনও বিবাহের চেষ্টাও করেন নি। তাঁর মন এতই কোমল অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তারপর এই আঘাত ভুলবার জন্য তিনি তাঁর পিতার কারখানার কাজে ডুবে রইলেন।

তাঁর বয়স যখন মাত্র সতের বৎসর, তখন পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও শিল্প বিদ্যায় বালকের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখে তাঁর পিতা তাঁকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে পাঠিয়ে দেন। সেখানে এই সকল বিষয় শিক্ষা করবার সময় একদিন এত নতুন তথ্য আবিষ্কারের কথা তাঁর মনের মধ্যে জেগে ওঠে—সেই জন্য কিছুকাল পরে তিনি দেশে ফিরে এলেন এবং পিতার সাহায্যে সেই কাজে মন দিলেন। নাইট্রোগ্লিসারিণ নামে এক বিপদ্জনক বিস্ফোরক নিয়ে তিনি গবেষণায় মন দিলেন। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর গবেষণাগারের মধ্যে এক মারাত্মক বিস্ফোরণ হ'ল—ফলে তাঁর চারজন সহকর্ম্মীর মৃত্যু হ'ল—আর সেই সঙ্গেই মৃত্যু হল তাঁর কনিষ্ঠ সহোদরের। এই আঘাতের ফলে তাঁর বৃদ্ধ পিতা ইমানুয়েল শয্যা গ্রহণ করলেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে নরওয়েতে তাঁর অপর এক গবেষণাগারে আর এক বিরাট বিস্ফোরণ হ'ল—সমস্ত গবেষণাগার ধ্বংস হয়ে গেল। আবার কিছুদিন পরে সাইলেসিয়া থেকে সংবাদ এল—একজন শ্রমিক নাইট্রো-গ্লিসারিণের টিন কাটবার জন্য যেই কুড়ুল দিয়ে এক আঘাত করেছে—অমনি হ'ল এক বিরাট বিস্ফোরণ—ফলে তার দেহটা উড়ে গেল—কিন্তু তার একখানা পা খোয়া যায় নি—আধ মাইল দূরে সেই পা খানা পাওয়া গেল।

একখানি জাহাজে তাঁর নাইট্রোগ্লিসারিন পাঠান হচ্ছিল—পানামা খাল দিয়ে জাহাজখানি ষাট জন যাত্রী নিয়ে ধীরে ধীরে চলেছে। হঠাৎ এক বিস্ফোরণ হ'ল—কোথায় গেল সেই ষাট জন যাত্রী—কোথায় গেল সেই জাহাজ—খালের ধারে বাড়ীগুলিও ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু নোবেল দৃঢ়চিত্ত—এই নাইট্রোগ্লিসারিনকে তিনি নিরাপদ করবেনই।

লোকে তাঁর নাইট্রোগ্লিসারিনের মত তাঁকেও বিপজ্জনক মনে

ডাঃ এডোয়ার্ড সি কেণ্ডাল—ইনি এ বৎসর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন

করতে লাগল। তাঁর সঙ্গে কেউ সহযোগিতা করল না। তিনি লোকালয় থেকে দূরে—এক নিরাপদ স্থানে—একটি হ্রদের মাঝখানে—নৌকার ওপর তার গবেষণাগার স্থাপন করে সেখানে দিবারাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন—স্নান আহারের কথা তিনি ভুলে গেলেন—অনিয়মিত আহার বা অনাহারের ফলে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হ'ল।

নোবেল একবার আমেরিকা যান—সেখানে সানফ্রানসিস্কো শহরে তাঁর গবেষণার মধ্যে এক বিস্ফোরণ হয়। সুতরাং নিউইয়র্কে কেউ তাঁকে স্থান দিতে চাইল না—তিনি কোন হোটেলেও আশ্রয় পেলেন

না। এই অবস্থায় তিনি ঘোষণা করলেন—তিনি এক সভা আহ্বান করে সেখানে নাইট্রোগ্লিসারিনের শক্তি প্রমাণ করে দেখাবেন। সভায় কুড়ি জন মাত্র তাঁরই মত দুঃসাহসিকের সামনে তিনি প্রমান করলেন—যে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে—নাইট্রোগ্লিসারিণ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

পার্ব্বত্য নদী যেমন শত বাধা, সহস্র বিঘ্ন অতিক্রম করে সাগরের অভিমুখে ছুটে চলে, কিছুই তাকে ধরে রাখতে পারে না—নোবেলের সাধনাও সেইরকম বিফলতার ঘাতপ্রতিঘাত অতিক্রম করে সিদ্ধির পথে অগ্রসর হতে লাগল। ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে তিনি বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করে পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিলেন। তা ছাড়া তিনি আবিষ্কার করলেন—গ্যাস-পরিমাপক যন্ত্র, পদার্থ-পরিমাপক যন্ত্র ও উন্নত প্রণালীর বায়ুমান যন্ত্র।

ডাঃ ফিলিপ এস হেঞ্চ—ইনি এ বৎসর চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন

সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অসাধারণ আকর্ষণ ছিল—তিনি অবসর সময়ে গ্রন্থ রচনা করতেন। তিনি একখানি নাটক রচনা করেছিলেন। লণ্ডনে এক ব্যবসা-আলোচনার সভায় তিনি অলক্ষণ ব্যবসা আলোচনার পর তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন।

তাঁর নূতন আবিষ্কারের ফলে যখন তিনি বুঝলেন যে তাঁর আশাতীত ভাগ্য পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী তখন ডিনামাইট নির্ম্মাণ ও প্রচলন করবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহের চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু সব দেশেই সেই একই অবস্থা। প্রথমে কেউই এই অনিশ্চিত উদ্যমে অর্থ নিয়োগ করতে সম্মত হ'ল না। কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন না। অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি আমেরিকা যুক্তরাজ্যে গেলেন। সেখানে বিফল হয়ে তিনি কালিফোর্ণিয়ায় তাঁর এক বন্ধুর সাহায্যে ডিনামাইটের কারখানা স্থাপন করলেন।

তারপর তিনি ইউরোপের প্রায় সব বড় বড় সহরেই তাঁর কারখানা স্থাপন করেন। তাঁর আবিষ্কারের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'ল। তাঁর প্রচুর অর্থাগম হতে লাগল। এতদিনে ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন : তিনি বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেন।

বৈজ্ঞানিক পুস্তক ছাড়াও তিনি দর্শনশাস্ত্র ও কবিতা পাঠে অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। তিনি বহু ভাষা জানতেন এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

১৮৯৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর তিনি তাঁর গবেষণাগারে কাজ করতে করতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক উইল করে বিশ্বের কল্যাণে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি উৎসর্গ করেন।

রসায়ন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, শারীরতত্ত্ব অথবা ভেষজ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা—এই পাঁচটি বিষয়ে তিনি প্রতি বৎসর পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। প্রত্যেক পুরস্কারের পরিমাণ আট হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ ১ লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোক এই পুরস্কার পাবার প্রতিযোগিতা করতে পারেন। নোবেল কমিটির কাছে প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে প্রার্থিগণের নাম এবং তাদের যোগ্যতার প্রমাণ পাঠাতে হয়। এর ফল সাধারণতঃ নোবেলের মৃত্যুবার্ষিক অনুষ্ঠানের দিন ১০ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দ থেকে গত পঞ্চাশ বৎসর এই পুরস্কার দেওয়া হচ্চে। আমাদের ভারতবাসীদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এবং সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমণ ১৯৩০ সালে এই পুরস্কার লাভ করেন।

রসায়ন শাস্ত্রে

এ বৎসর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৪ বৎসর বয়স্ক অধ্যাপক এমারিটাস ওটো ডিয়েল্সকে এবং তাঁর ভূতপূর্ব্ব সহকারী ৪৮ বৎসর বয়স্ক ডাঃ কার্ট এলডেক্‌কে রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ডাঃ কার্ট বর্ত্তমানে কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁদের মধ্যে সমানভাগে এই পুরস্কার ভাগ করে দেওয়া হবে। "ডিয়েন সিনথেসিস্‌" আবিষ্কার এবং তার উন্নতি সাধনের জন্যই তাঁদের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যে (১৯৫০)

বিশ্ববিখ্যাত ইংরাজ দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড আর্থার উইলিয়ম রাসেল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ১৮ই মে ট্রেলেকে (মনমাউথ) জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং এখন তাঁর বয়স ৭৮ বৎসর।

তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কৃতী ছাত্র ছিলেন, পরে ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯০৮ সালে এফ, আর, এস মনোনীত হ'ন এবং ১৯৩১ সালে লর্ড সভার সদস্য হন।

তিন বৎসর বয়সে তিনি পিতামাতা—উভয়কেই হারাণ। লর্ড রাসেল—তাঁর পিতামহ ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একজন মন্ত্রী। ইংলণ্ডে এই রাসেল পরিবার এক অভিজাত পরিবার বলে খ্যাত। কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হ'তে তিনি সসম্মানে এবং বৃত্তি নিয়ে নীতি-বিজ্ঞান ও গণিত-শাস্ত্রে ডিগ্রীলাভ করেন। তারপর এই কলেজেই তর্ক শাস্ত্র ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন থেকেই তিনি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে গবর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হন। তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীক উক্তির জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি প্রতিবাদ পুস্তক রচনা করেন। তার জন্য তিনি আদালতে অভিযুক্ত হয়ে দণ্ডিত হন—তাঁর ১০ পাউণ্ড জরিমানা হয়; তিনি জরিমানা দিলেন না—তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল—তাঁর চাকরীও গেল। গবর্ণমেন্ট তাঁর ওপর এতই বিরূপ হলেন যে যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করল—কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদেশে যাবার অনুমতি দিলেন না। দেশেও তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হ'ল। ১৯১৭ সালে তিনি এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। সেই সময় ব্রিক্সটন জেলে বসে তিনি "Introduction to Mathematical Philosophy" লিখলেন।

প্রথম যুদ্ধের পর তিনি রাশিয়া গেলেন—ফিরে এসে লিখলেন—"দি প্র্যাক্‌টিস এণ্ড থিওরী অব বল্‌সেভিজম্।" ১৯২০ সালে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে চানে গেলেন—তারপর লিখলেন—"দি প্রব্লেম অব চায়না।" ১৯৩৪ সালে রয়েল সোসাইটি তাঁকে সিলভেষ্টার পদক দেয়, আর লণ্ডন ম্যাথম্যাটিকাল সোসাইটি দিল ডি মর্গান পদক। কালিফোর্ণিয়া ও নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে বক্তৃতা দেবার জন্য আহ্বান করেছিল।

এই মনীষী এই বৎসর গত আগষ্ট মাসে দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এসিয়া ভ্রমণে বার হয়ে ২৬শে আগষ্ট দমদম্ বিমান ঘাঁটিতে কিছুক্ষণের জন্য অবতরণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি যে সমস্ত উক্তি করেন সেগুলি যে শুধু তাঁর সূক্ষ্ম বিচারপ্রসূত তা নয়, তাদের মধ্যে নিহিত আছে ভাবী সঙ্কটের সমাধান সূত্র। তিনি বলেন—দক্ষিণ-পূর্ব্ব-এশিয়ার বহু অঞ্চলের এখনও বিদেশী ঔপনিবেশিক পোষণ বহাল রয়েছে। আর যে অঞ্চলগুলি অধীনতা মুক্ত হয়েছে, তার অনেকগুলিতেই দারিদ্র্য রুদ্র মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে—স্বভাবতঃ এই সমস্ত দেশেই অসন্তোষ ও বিপ্লবের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই অসন্তোষের পিঠে ভর করেই এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট সম্প্রসারণের বন্যা অগ্রসর হচ্ছে। এই বন্যাপ্রবাহ রোধ করতে হ'লে এশিয়াকে দুই শক্তিশিবিরের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং জীবন ধারণের ক্ষেত্রে মানুষের অধিকারকেও অধিকতর উদারতার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে।

এশিয়া যদি কম্যুনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিও রুশ-অধিকৃত পূর্ব্ব-ইউরোপের মত সোজা মস্কোর কর্তৃত্বে গিয়ে পড়ে সমাজ সংস্কৃতি, চিন্তা ও শিল্প বাণিজ্যের ব্যাপারে নিজেদের নিজত্ব হারিয়ে ফেলবে।

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ সম্বন্ধে মনীষী রাসেল বলেছেন—তৃতীয় মহাযুদ্ধ হবেই এবং আমেরিকাকে যদি রাশিয়া পর্য্যুদস্ত করতে পারে তা হ'লে এক ঠেলায় সে ডোভার পর্য্যন্ত এসে হাজির হ'বে। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপ তার কবলিত হবে।

রাসেল সুবক্তা ও শান্তিকামী। তিনি তাঁর মনীষা ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তার মধ্যে তাঁর দু'খানি পুস্তক সর্ব্বজন পরিচিত। একখানি হ'ল "দি কংকোয়েষ্ট অব হ্যাপিনেস", আর একখানি হ'ল—"দি হিষ্ট্রি অব ওয়েষ্টার্ণ ফিলজফি।"

উইলিয়ম ফক্‌নার—ইনি এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন

রাসেলের "প্রবলেমস্ অব ফিলজফি," "ফিলজফিক্যাল এশেজ", "এনালিসিস অব মাইণ্ড" প্রভৃতি পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি দুবার দার পরিগ্রহ করেন।

এই পরিণত বয়সে এই বিশ্ববিখ্যাত মনীষীকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হোল—এতে পৃথিবীর বিদগ্ধ সমাজ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন যে যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করা হয়েছে।

সাহিত্যে (১৯৪৯)

১৯৪৯ সালের সাহিত্যে পুরস্কার পেলেন—আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও কবি উইলিয়ম ফক্‌নার। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে

২৫শে সেপ্টেম্বর মিসিসিপির অন্তর্গত নিউ আলবেনিতে ফক্‌নার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিসিসিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। অধিকাংশ সাহিত্যিকের মত দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জন্ম—দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি লালিত পালিত, আর যৌবনেও দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তাঁকে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়। প্রথম জীবনে বার্নার্ড শর মতই তাঁকেও প্রকাশকের দ্বারে দ্বারেই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। তখন তাঁর রচনাকে তারা বলত দুর্ব্বোধ্য, মিষ্টিক। কিন্তু নিজের রচনার ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি রচনার পর রচনা লিখে চললেন। জীবিকার জন্য তিনি সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করেন। ১৯১৮ সালে তিনি ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁর প্রথম উপন্যাসে "সারটোরিস" ১৯২৯ সালের বসন্তকালে লেখা। তাঁর "সাউণ্ড এণ্ড ফিউরী" সারটোরিসের আগে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় তারপর। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয় "এজ আই লে ডাইয়িং।" "সাউণ্ড এণ্ড ফিউরী" প্রকাশিত হবার পর আমেরিকায় এক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। "সোলজার্স পে" (১৯২৬), মসকুইটো (১৯২৭), দি সাউণ্ড এণ্ড দি ফিয়োরী (১৯২৯), ইভল ইন দি ডেজার্ট (১৯৩১), গ্রীনবার্ড (কবিতা সংগ্রহ—১৯৩৩), ডাঃ মার্টিনো এণ্ড আদার ষ্টোরিজ (১৯৩৪), দি আন-ভ্যানকুইশড (১৯৩৮), দি হ্যামলেট ইত্যাদি। তাঁর প্রধান কীর্ত্তি তাঁর সতের খণ্ডে সমাপ্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ উপন্যাস।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে

ডাঃ ফিলিপ এস হেঞ্চ মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের রোচেষ্টারস্থিত মেয়ো ক্লিনিকের মেডিকেল শাখার প্রধান। ইনি এ বৎসর ডাঃ এডোয়ার্ড সি কেণ্ডাল (ইনিও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের) ও ডাঃ ট্যাডুয়েস রিকষ্টেনের (ইনি সুইজারল্যাণ্ডের) সহিত যুক্তভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

শান্তি পুরস্কার—রেফ্ বঞ্চ

আমেরিকা নিবাসী নিগ্রো ডাক্তার রেফ্ বঞ্চ রেলফ্ জনসন বাঞ্চ এ বৎসর শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান সহরে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অলিভ জনসন ও মাতার নাম ফ্রেড্। বঞ্চ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হতে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ডাক্তারী ডিগ্রীলাভের পর তিনি শরীরতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করেন। তারপর তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ইউরোপের বহু দেশের, দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব্ব আফ্রিকা, মালয়, নেদারল্যাণ্ড, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

বঞ্চ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২৬ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। তারপর তিনি আফ্রিকা ও আমেরিকায় কৃষ্ণকায় জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পরে তিনি আমেরিকার গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ইউ এন ও র সেক্রেটারী জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

ইউনাইটেড নেস্‌নাস অরগ্যানিজেসন তাঁহার উপর ১৯৪৮ সালে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের ভার দেন।

আমেরিকার ন্যাসনাল এসোসিয়েসন তাঁহাকে স্পিনগার্ন পদক দানে সম্মানিত করেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর নরওয়ের রাজা হাকণ ডাঃ বঞ্চকে এই শান্তি পুরস্কার দান করেছেন। সেই উপলক্ষে অনেক নেগ্রো অফিসার ও অন্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ বঞ্চ বলেছেন যে তাঁকে এই পুরস্কার দানের তাৎপর্য্য তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন। তাঁকে এই পুরস্কার দান ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকেই শুধু সম্মানিত করেনি—করেছে সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ জাতিকে।

অসমীয়া বীর লাচিত বড়ফুকন

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এই সময়ে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশেও আরঙ্গজেব-শিবাজীর যুদ্ধের কাহিনী আসিয়া পৌছিয়াছিল এবং প্রবলপরাক্রান্ত মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সাহায্য করিয়াছিল। ১৫৮৭ শকাব্দের (১৬৬৬ খৃঃ অব্দে) কোচবিহার রাজকে লিখিত চক্রধ্বজের এক পত্রে জানা যায় যে তিনি লিখিয়াছিলেন—"যে মুঘলদের সঙ্গে শিবার যে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে তাহা আমি শুনিয়াছি এবং শিবা যে মুঘলদের বিশদিনের পথ হটাইয়া দিয়াছেন তাহাও জানি—দাউদখাঁর মৃত্যু হইয়াছে, দিলির খাঁন আহত এবং স্বয়ং বাদশাহ দিল্লী হইতে আগ্রা আসিয়াছেন। যুদ্ধে কে হারে, কে জেতে বলা যায় না—কিন্তু আপনি দুর্গ ও পরিখাগুলি সংস্কার করিতেছেন জানিয়া আনন্দিত হইলাম। মুঘলরা একবার আমাদের পরাজিত করিয়াছে বলিয়া বারে বারে করিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই এবং পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করাই আমাদের কর্ত্তব্য" ইত্যাদি—

১৬৬৭ খৃঃ অব্দে লাচিত্ হিন্দু ও অহম মতে সেনাপতিপদে বৃত হন এবং কলিয়াবরে গিয়া তাঁহার সৈন্য সংস্থাপনা করেন এবং দুই মাসের মধ্যে গৌহাটির মুঘল ফৌজদার সৈয়দ ফিরোজখাঁনকে পরাজিত করিয়া গৌহাটি পুনরায় অহম্ অধিকারে আনেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ ভূইঞা শ্রীহেমচন্দ্র গোস্বামীর "বড়ফুকনের জয়স্তম্ভ আলোচনী" হইতে গৌহাটিতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর স্তম্ভ ও অনুশাসনের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে উৎকীর্ণ আছে যে ১৫৮৯ শকাব্দে জ্ঞানে বীর্য্যে শৌর্য্যে অতুলনীয় নামজানীর বড়ফুকন্ (Viceroy

and commander in chief) যখন জয় করিয়াছিলেন। সিমালুগড়ে প্রাপ্ত একটি কামানের উপরও অনুরূপ একটি অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে এবং পাহাড়ের গায়েও দুইটি প্রস্তর শাসন পাওয়া যায়। গুয়াহাটি বা গৌহাটি অধিকার করিয়া প্রধান মন্ত্রী আঁতা বড়গোহাইন্ ও সেনাপতি লাচিত বড়ফুকন্ গৌহাটিকে সুরক্ষিত ও কামরূপ জেলার শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে লাগিলেন—কারণ তাঁহারা জানিতেন যে মুঘলরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবে না। পর্ব্বতের শিখরে শিখরে অনলবর্ষী কামান স্থাপন হইতে লাগিল, প্রচুর সৈন্য সমাবেশ হইতে লাগিল, দৈবজ্ঞেরা যজ্ঞ করিতে লাগিলেন, অরিবধনিপুণা কামাখ্যা দেবীর সাড়ম্বরে পূজা হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। লাচিতের বিপুল ব্যক্তিত্বে তাঁর শৌর্য্য বীর্য্যে মুগ্ধ অহম্ জাতির মধ্যে 'আগে প্রাণ কে করিবে দান' লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। রাজা চক্রধ্বজ ও গুণীর মান রাখিতে জানিতেন এবং প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতির হস্তেই যুদ্ধের সব ভার ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বুরুঞ্জীতে লেখা আছে যে গৌহাটি পুনরধিকারের সংবাদে "৺দেরে বঙ্গাল খেদিবর বার্ত্তা পাই আনন্দ হুই বলে—'এতিয়াহে মঞি সুখে ভাত এক গবাহ খাঁও—এইবার আমি সুখে এক গ্রাস অন্ন মুখে দিব।

গৌহাটি পতনের সংবাদ আওরঙ্গজেবের কাছে পৌছিলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং আসাম দমনের জন্য অম্বরাধিপতি মীর্জা রাজ জয়সিংহের পুত্র রাম সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। বুরুঞ্জীর বিবরণ এইরূপ—"পাচে অরঙ্গজ পাৎশাত বঙ্গালে কলে, বোলে—'আচামে গুরাহাটা ললে, লোক লস্কর বহুত পরিল।" পাকে পাৎশা শুনি উজ্জীর নবাব সকলর সমালোচন হুই জয়সিংহর বেটা রাম সিংহক পঠালে, বোলে—"আচমক উপায়ে মন্ত্রণায়ে ধরগৈ। আরু বঙ্গলা মলুকত মামু চাস্তা খাঁ আছে, সুধি যাব। পাছে সাস্তা খাঁর ঠাঁই পালেহি বোলে "তোমাত সুদিহে যাবলৈ হুকুম করিছে।" চাস্তা খাঁ বোলে—আবামে গড় করিছে শুনিছো বর কুমন্ত্রী, চলাচল যাই যুদ্ধ করিবা' এইরূপ শিখাই পাঠালে" (অসম বুরুঞ্জী পৃঃ ১২২। অর্থাৎ আওরঙ্গজেব বাদশাহ বলিলেন—অহমরা গৌহাটি লইল, লোক লস্কর বহু মরিল—সেই জন্য মন্ত্রী ও অমাত্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাম সিংহকে পাঠাইলেন ও তাহাকে নির্দ্দেশ দিলেন যে মাতুল শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসামে যুদ্ধে যাইবে। শায়েস্তা খাঁও তাঁহাকে আসামের দুর্গ নির্ম্মাণ ও অন্যান্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল করিয়া রামসিংহকে শিখাইয়া দিলেন।

মহারাজ রামসিংহের আসাম অভিযানে মুঘল সেনাপতি হইয়া আসার কিছু মাত্র ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু বাদশাহের তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার গূঢ় অভিপ্রায় ছিল যে এই রাজপুতবীর আওরঙ্গজেবের কবল হইতে শিবাজীকে পলায়ন করিবার সাহায্য করিয়াছিলেন। মীর্জা রাজা জয়সিংহের নাম তখন সারা ভারতবর্ষে বিখ্যাত। শিখগুরু তেগবাহাদুরও মুঘল বিদ্বেষের বিরুদ্ধে রাম সিংহের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। রাম সিংহের সঙ্গে একুশজন রাজপুত সেনাপতি, পাঁচ হাজার সৈন্য, দেড় হাজার আহাদী, পাঁচশত গোলন্দাজ সৈন্য আসিয়াছিল। বাংলার আসিয়া সুবেদারের সাহায্যে এই সৈন্য বাহিনীতে ত্রিশ হাজার পদাতিক, আঠারো হাজার তুর্কী অশ্বারোহী, পনেরো হাজার কোক তীরন্দাজ নিযুক্ত হয়। বাংলার সুবেদার ও গৌহাটির পূর্ব্ব ফৌজদার রসিদ খাঁর উপর বাদশাহী পরওয়ানা আসিল—রাম সিংহকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার। স্যার যদুনাথ লিখিয়াছেন "Service in Assam was extremely unpopular and no soldier would go there unless compelled. Indeed there is reason to believe that Ram Singh was sent to Assam as a punishment for his having secretly helped Shivaji to escape from captivity at Agra." ইটালীয়ান মানুছিও তাই বলেন। রাম সিংহের সঙ্গে গুরু তেগবাহাদুর ও আরো পাঁচজন সাধু ফকির আসিয়াছিলেন, যাহাতে কামরূপী যাদুকররা ও মোহিনী স্ত্রীলোকরা সৈন্যদিগকে বিভ্রান্ত করিতে না পারে। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে কামরূপীর তন্ত্রমন্ত্র উচাটন-বশীকরণের বিভীষিকা ও কুখ্যাতি সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ধুবড়ীতে এখনও এই পঞ্চপীরের দরগা আছে।

১৬৬৯ খৃঃ অব্দের প্রথমে রাম সিংহ সৈন্য বাহিনীসহ রাঙামাটি পৌছিলেন। কামাখ্যা মাতার মন্দিরে পূজা দিয়া লাচিত বড় ফুকনের সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজা রাম সিংহ বড় ফুকনের কাছে প্রস্তাব পাঠাইলেন "আল্লাব খাঁয়ে (আল্লাইয়ার খাঁ) বরবরুয়া সহিতে ঝি নিবন্ধ অনুবালি, বর নদী যি সীমা করি গৈছে সেই নিবন্ধকে লৈ গুরাহাটা ছারি দিয়ক তেবে গো ব্রাহ্মণ রক্ষা পরিব। আমি রাজা মান্ধাতার নাতি রামসিংহ আহিছোঁ।" (অসম বুরুঞ্জী পৃঃ ১১৩) আল্লা ইয়ার খাঁর সহিত বরবরুয়া (অর্থাৎ লাচিতের পিতার) যে সন্ধি হইয়া সীমা নির্দ্দেশ হইয়াছিল সেই সন্ধি অনুযায়ী গৌহাটি ত্যাগ করিয়া আপনি চলিয়া যাইলে গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা পাইবে। আমি রাজা মান্ধাতার নাতি…ইত্যাদি।

লাচিত বড়ফুকনের নির্ভীক উত্তর আসিল—"অল্লাবখাঁ বরবরুয়াব প্রীতির কথা যি কৈছে, গুরাহাটা কামরূপ তাঞ্রিব না হয়। পূর্ব্বে কোঁচক্ খেদি লোরা গৈছে। দৈবগতিকে গোটা চারেক দিন আমার পরা লৈছিল। ইদানী ঈশ্বরে দিলত আমি পাইছোঁ……৺দেব কোন বস্তু অপ্রাপ্য আছে?……" আল্লাইয়ার খাঁ ও মোমাই বড়বরুয়া যে প্রীতির কথা বলিয়াছেন গৌহাটি কামরূপ তাহার ভিতর নয়। ইহা পূর্ব্বে কোচদের তাড়াইয়া লওয়া হইয়াছে। দৈবক্রমে কয়েকদিন হস্তচ্যুত —ইদানীং ঈশ্বরের কৃপায় আবার ফিরিয়া পাওয়া গিয়াছে—মহারাজ স্বর্গদেবের কি কোন বস্তু অপ্রাপ্য আছে—। রামসিংহ আরো অগ্রসর হইয়া আসিয়া গৌহাটি হইতে পনের মাইল দূরে নদীর অপর পারে হাজোর নিকট সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং লাচিতের কাছে পুনরায় দূত পাঠাইলেন—"গো-ব্রাহ্মণর কুশল চিন্তি গুরাহাটা ছারি দিয়ক্। নিদিবহে এই পোন্তর গুটি যিমান সৈন্য সেইমান আহিছে" (অসম্ বুরুঞ্জী পৃঃ ১১৪)। লাচিত দূতেদের (নিম্ ও রামচরণ) উত্তর দিলেন—"গুরাহাটা ছারি দিবর যি কথা কৈছে, রাজা পাৎশার যি আজ্ঞা হয় তাক আমে বাধিতে না পারি…আর পোস্তার গুটি ইয়াতে বাঁটিলে

পানী হব"। রামসিংহ বরাবরই গৌহাটি পাইবার জন্য উৎসুক্— গৌহাটি ছাড়িয়া দিলেই তিনি সন্তুষ্ট লাচিতকে তাই ভয় দেখাইলেন যে গো-ব্রাহ্মণের কুশল চিন্তা করিয়া গৌহাটি ছাড়িয়া দাও, না হইলে পোস্তর গুটির মত অগণিত সৈন্য আসিতেছে। লাচিত উত্তর দিলেন—গৌহাটি ছাড়িয়া দিবার কথা জানিনা, রাজা বাদশাহের যা আদেশ হয়—অর্থাৎ আপনিও যেমন আমিও তেমনি আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, আর পোস্তর দানার মত সৈন্যসমাবেশের কথা বলিতেছেন। পোস্তর দানাগুলিকে বাটিয়া জল করিয়া দেওয়া যায়। শান্তির কথা আর অগ্রসর হয় না, যুদ্ধ প্রস্তুতি আগাইয়া যায়। রামসিংহ অহমদের দুর্গ নির্ম্মাণ দেখিয়া রসিদখাঁকে বলিলেন—"পাহারার উপর গড় করিছে, আগত মৈদানো অল্প, ভালেতো আচামক্ যুদ্ধে নোরাবে। চক্রাকৃতি বেহ, একো ঠাইলে তিনি আলি মাইরে না পাই। তীর, কামায়ন, ঘোরা যুদ্ধ নাই, ধন্য মন্ত্রী, ধন্য সেনাপতি, ধন্য পদাতি, একে পর্ব্বত তাতে এনয় দুর্গম বেহ করিছে···" অর্থাৎ পাহাড়ের উপর দুর্গ, সামনে যুদ্ধের স্থল নাই, হঠাৎ আচমকা যুদ্ধ করা যাইবেনা, তাহার উপর চক্রব্যূহ, তীর, কামান, ঘোড়ার যুদ্ধ নয়—যিনি এই যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছেন সেই সেনাপতি ধন্য, ধন্য তার মন্ত্রী আর তার পদাতিক সৈন্যবাহিনী—একে পর্ব্বত তায় দুর্গমব্যূহ। রামসিংহ নিজে রাজপুত বীর, শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, মরাঠা বীরের বিক্রম দেখিয়াছেন, মুঘলদের রণকৌশল জানেন—তাহার মত বীরের প্রশংসার যে বিশেষ মূল্য আছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। এই সময়ে রামসিংহ ও রসিদখাঁর মধ্যে নহবতের বাজনা লইয়া বিরোধ হয় এবং এই মনোমালিন্যের ফলে মুঘল বাহিনীর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়।

সমস্ত বর্ষাকাল ধরিয়া অহম-মুঘল সংঘর্ষ চলে। কিন্তু কোন পক্ষই বিশেষ জয়ের দাবী করিতে পারেন না। অহমরা হঠাৎ পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া বা যুদ্ধতরী সাজাইয়া মুঘলদের পর্য্যুদস্ত করিত কিন্তু আলাবয়ের যুদ্ধে অসমীয়ারা শোচনীয়ভাবে রাজপুত অশ্বারোহীদের হস্তে পরাজিত হন এবং লাচিতের দশ হাজার সৈন্য প্রাণ হারায়। রামসিংহ যুদ্ধ জয়ের সংবাদে এখনই লাচিতের কাছে তীরযোগে এক সন্দেশ পাঠাইলেন—মই হেন রামসিংহক মৈদানত যুদ্ধ করে কত না লোক পরিল—ফুকন উত্তর দিলেন—দাতীয়াল রাজা অনেক আছিছে কোন জনে আমাত ন সুধি মৈদামত আনন্দ করিলে। একৈদ পরিছে সপ্তগুণ সাষ্টম হৈ আছে—অনেক রাজা এসেছিলেন আমাদের সাহায্যে, আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই হয়ত কেউ যুদ্ধ আরম্ভ করেছিলেন, একগুণ গেছে, সাত আট গুণ এখনও আছে—অতএব হে রামসিংহ অযথা গর্ব্ব করো না। রামসিংহ ভেদনীতিরও আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন। বহু অসমীয়াদের অর্থ ও যৌতুকদানে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। অনেকেই বড়ফুকনকে পরামর্শ দিতে লাগিল—গৌহাটি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার। রামসিংহও আর বহুদিন আসামের জঙ্গলে বসিয়া থাকিতে রাজী ছিলেন না। গৌহাটি ফিরিয়া পাইলেই তাহার মান-মর্য্যাদা থাকে। এই জন্য বারবার তিনি লাচিতকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কারণ একে তাঁহার রাজ্য হইতে দেড় হাজার মাইল দূরে অনিশ্চিত যুদ্ধজয়ের আশায় মাসের পর মাস বসিয়া থাকা দুর্ঘট, তা ছাড়া তিনি তাঁহার মাতা ও স্ত্রীর নিকট বাদশাহী অনুগ্রহের যে সব পত্র পাইতেছিলেন তাহাতে নিজের ও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। আওরঙ্গজেব নাকি তাঁহার পুত্রকে ব্যাঘ্রের সঙ্গে যুদ্ধে আহ্বান করেন ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে রাজপুতানা হইতে প্রেরিত জয়পুর মহিষীদের পত্র বিশেষ মূল্যবান। "কৃষ্ণসিংহকে পাৎশাই বাঘবে যুঁজাই মারিব খুঁজিলেম, এনে মিত্র পাৎশা···আরু শুনিছোঁ সি দেশত নামকীর্ত্তন অনেক প্রকাশ হৈ আছে, তাক মারি মাজুমখাঁ নবাব কতকাল বঞ্চিল···বাদশা এমনই মিত্র যে কৃষ্ণসিংহকে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নির্দ্দেশ দেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে সুদূর রাজপুতানাতেও আসাম যে নামকীর্ত্তনের দেশ এ খ্যাতি ছিল। মাধবদেবের "নাম ঘোষা" তখন যে আসামের বাহিরেও প্রভাব লাভ করেনি তাহা বলা যায় না—'মুক্তিত নিস্পৃহ থিঠো, সে হি ভকতক নমো, রসময়ী মাগোহা ওকতি'—

যাহা হউক এই সব সংবাদ পাইয়া রামসিংহ অত্যন্ত বিমনা ও হতউদ্যম হইয়া পড়েন, তাড়াতাড়ি কোন প্রকারে যুদ্ধ শেষ করিয়া অম্বরে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হন। গৌহাটি আক্রমণের একটা পরিকল্পনা তিনি করিয়া ফেলিলেন। মুঘল নৌবাহিনী অগ্রসর হইবে এবং নদীর উভয় তীর দিয়া পদাতিক ও অশ্বারোহী আক্রমণ করিবে?

কামাখ্যা, অশ্বাক্রান্তা ও ইটাখুলি এই ত্রিভুজের মধ্যে যুদ্ধ হইবে। লাচিত বড়ফুকন তখন অত্যন্ত অসুস্থ। অশ্বক্রান্তায় সেনাপতি হাজারিকা দ্রুত সৈন্য পাঠাইবার জন্য বড় ফুকনের কাছে আবেদন করিলেন। লাচিত বলিয়া পাঠাইলেন—আমি চিলাহ পর্ব্বতের উপরে চারকড়ার মাটি কিনিয়া রাখিয়াছি আমার মৃত্যু-শয্যার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, আমি আমার কর্ত্তব্য ছাড়িয়া কোথাও যাইব না—যদি যাই সবার শেষে যাইব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানিয়া রাখা দরকার। প্রত্যেক আসাম সেনাবাহিনীর সঙ্গে দৈবজ্ঞ বা গণক থাকিত। তাহাদের বলা হইত "দলই"। তাঁহারা গণনা করিয়া আক্রমণের শুভক্ষণ বলিয়া দিতেন এবং গ্রহনক্ষত্রদের সংস্থান বিচার করিয়া যুদ্ধের জয় পরাজয়ের ও সেনাপতিদের ভাগ্য বিচার করিতেন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ দলই—লাচিত বাহিনীর আচার্য্যগণক্ ছিলেন। অহম্ বাহিনীদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। চতুর্দ্দিকে মুঘলরা আক্রমণ করিতেছে, রামসিংহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অহম সেনাপতি অসুস্থ, দৈবজ্ঞের গণনানুসারে আক্রমণের শুভ মুহূর্ত্ত এখনও আসে নাই। লাচিত্ অস্থির হইয়া পড়িলেন—কুপিত হইয়া বলিলেন—দৈবজ্ঞ, তোমার মস্তক ছেদন করিব। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ও রাজকার্য্যের জন্য তিনি নিজের পিতৃব্যেরও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন। দৈবজ্ঞ উত্তর দিলেন—অনায়াসে, কিন্তু এখন আক্রমণ করিলে তোমার জয় হইবে না। লাচিত্ উত্তেজিত হইলেও

দৈবজ্ঞের পরামর্শ অমান্য করিতে পারিলেন না। পরে দৈবজ্ঞ মত দিলেন যে শুভ সময় আগত—ঠিক এই সময়েই রামচন্দ্র রাবণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

লাচিতের সাহস, বীরত্ব ও উদ্দীপনায় আসামী সৈন্যদের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হইল ও তাহারা ঘোর বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কামাখ্যা, অশ্বক্রান্তা ও ইটাখুলি এই ত্রিভুজের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের জল রক্ত রাঙা হইয়া উঠিল—অসমীয়ারা নৌকা সাজাইয়া ব্রহ্মপুত্রের উপর এক ভাসমান সেতু তৈয়ারী করিয়া ফেলিল। তাহাদের রণতরীগুলি ভীমবিক্রমে মুঘল সৈন্য ও পোতগুলি আক্রমণ করিল। মুঘলরা সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হইয়া পাণ্ডুতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। লাচিত তাহাদের আরো তাড়াইয়া লইয়া যাইবার কল্পনা করিতেছিলেন, কিন্তু দৈবজ্ঞ চূড়ামণি অচ্যুতানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করেন। সরাইঘাটের যুদ্ধে (মার্চ ১৬৭১ খৃঃ অঃ) মুঘলদের শোচনীয় পরাজয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে বিস্তৃতি-স্বপ্ন চিরকালের জন্য ধূলিসাৎ হইয়া গেল। স্বয়ং রাজা রামসিংহ বলিলেন—ধন্য রাজা, ধন্য মন্ত্রী, ধন্য সেনাপতি আমি রাজা রামসিংহ, "খলত থাকিও ছিদ্রক্ না পাও।"

মুঘল সৈন্য ও নৌবাহিনী গৌহাটি ত্যাগ করিয়া পশ্চাদপদ হইতে থাকিলে অন্য সৈন্যাধ্যক্ষেরা সকলেই উহাদের পিছন হইতে আক্রমণ করিয়া সমূলে ধ্বংস করিবার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু লাচিত ইহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি দেখিলেন মুঘলকে আর বেশী ঘাটাইলে আবার দু এক বৎসরের মধ্যেই তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ মনে হয় যে হিন্দু রাজা রাজপুত বীর বৈষ্ণব রামসিংহের উপর তাঁহার একটু শ্রদ্ধা ছিল, তৃতীয়তঃ তিনি পরাজিত শত্রুকে পিছন হইতে আক্রমণ করা নীতিবিরুদ্ধ মনে করিতেন কারণ তিনি বলিয়াছিলেন "এক বৎসর যুদ্ধে নোবাবি লাজ হই ভটীয়াই যায় ৮দেবেকো পাত্র মন্ত্রীরো যশস্যা এরি বস্তুক আনিল কি হব," এক বৎসরের উপর যুদ্ধ করিয়া হারিয়া লজ্জায় চলিয়া যাইতেছে তাহাকে আক্রমণ করিয়া স্বর্গদেবের ও তার পাত্র মিত্র সেনাপতির কি যশোবৃদ্ধি হইবে।

বুরুঞ্জীর মতে "১৫৯২ শকত চৈত্রর ২৩ গতে রামসিংহ ভটীয়াই গেল।"

কিন্তু যুদ্ধজয়ের গৌরব স্বদেশপ্রেমিক লাচিতকে বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না। অসুস্থ ও জ্বরাগ্রস্ত শরীর লইয়া শুধু মনের জোরে তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করিতেছিলেন। যেন যুদ্ধজয়ের জন্যই তিনি বাঁচিয়াছিলেন। Dr. Bhuyan বলেন—"Lachit Phukan like Lord Nelson, died in the lap of victory ; and the battle of Saraighat was Assam's Trafalgar." তাঁহার জীবন কথা পড়িলে মনে হয় তিনি তাঁহারই দেশের সুবিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক্ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার ভাষায় "অ মোর আপনার দেশ" এই চিন্তাতেই বিভোর ছিলেন।

অন্তিম শয়নে শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী

দিব্য-জ্যোঃতি অন্তরের অমর মৃত্যুর মাঝে চির-অম্লান,
অস্তমিত সূর্য্য তার রাঙা রশ্মি করে বিকীরণ,
দুশ্ছেদ্য তিমির জালে এখনি উঠিবে ভ'রে নিশীথগগন,
দিগন্তে এখনি বুঝি মিশে যাবে দিনান্তের গান!

স্তব্ধ বিশ্ব শোকাবেগে! নিথর রজনী নির্ব্বাক,
বিপ্লবীর মন্ত্রগুরু শান্ত আজি শেষ শয্যাতলে,
শতাব্দীর শেষ সূর্য্য মিলায়েছে ম্লান অস্তাচলে,—
অস্ফুট আঁধারে বাজে আলোকের বৈজয়ন্তী শাঁখ!

ধ্যানমগ্ন সে ঋষির মৃত্যু তার কতটুকু জানে,
স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাই চেয়ে রয় দূরে মহাকাল,
স্নিগ্ধ মূর্ত্তি সিদ্ধ যোগী এলায়িত শুভ্র জটাজাল,—
আপন মহিমা-মাঝে মৌন বুঝি মাধুরীর ধ্যানে॥

বিশ্ব-মুক্তি-কল্যাণের হে সাধক, ঋষি অরবিন্দ,
সারা পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্রের প্রবাহ 'পণ্ডিচেরী',
নব-জীবনের সাধন-স্বপ্নে বাজে যুগান্ত ভেরী,—
তোমার উদয়-আলো-সন্ধানে আকুল ভক্তবৃন্দ!!

শ্রীঅরবিন্দের দর্শন ও তাঁহার আশ্রম

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

"আলো চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই, চাই অমৃতের অধিকার,
চাই দিব্য জীবনের ভাস্বর মহিমা"

শ্রীঅরবিন্দ

নর দেহে দিব্য জীবনের আনন্দঘন রসাস্বাদনের জন্য যে নিরবচ্ছিন্ন তপস্যার প্রয়োজন তাহারই নির্দ্বিশঙ্ক আহ্বানে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার জন্ম-প্রদেশ বাঙ্গালা ছাড়িয়া চলিয়া আসেন—রাজরোষের রক্তচক্ষু ও রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রের কূটচক্রজালের অন্তরালে,—এই ফরাসী-অধিকৃত সমুদ্র-তীরবর্ত্তী পণ্ডিচেরী সহরে। সেই দিনটি হইল ১৯১০ সালের ৪ঠা এপ্রিল।

মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ ও সহকর্ম্মী লইয়া তিনি তথায় এক আশ্রম স্থাপন করেন। তখন কে ভাবিয়াছিল যে, ঐ ক্ষুদ্র আশ্রমটি একদিন সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে? তখন কে ভাবিতে পারিয়াছিল, সুদূর ফরাসী দেশ হইতে সাধুর অন্বেষণে আসিয়া মনীষী পল রিসার ও তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্ম্মিনী মাদাম মীরা রিসার শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন?

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পল রিসার পণ্ডিচেরীতে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখেন—

পৃথিবীর সর্ব্বত্র আমি সাধু সন্ন্যাসীর অন্বেষণে ঘুরিয়াছি—কিন্তু পণ্ডিচেরীতে গিয়া আমি প্রকৃত সাধু দর্শন করিলাম। এই সাধুর নাম শ্রীঅরবিন্দ। তাঁহাকে দেখিয়া—তাঁহার সান্নিধ্যে থাকিয়া, তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য এবং দিব্য জীবনের জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি কেবল ভারতের নহে, পরন্তু সমগ্র এশিয়ার ধর্ম্মগুরু।

মাদাম মীরা রিসার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল স্থায়ীভাবে পণ্ডি-চেরীতে অবস্থান করিতে থাকেন—এবং এই মাদাম মীরা রিসার—পরবর্ত্তী কালে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের "mother", শ্রীমা নামে আখ্যাত ও সর্ব্বাধিনায়িকার পদে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন।

শ্রীঅরবিন্দের "দর্শন" ও শ্রীমাদারের দৈনন্দিন কার্য্যধারার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈদেশিক দর্শনার্থীগণ নগ্নপদে আশ্রম-প্রাঙ্গণ-অতিক্রম করিতেছেন

শ্রীঅরবিন্দ ইদানীং বৎসরে চারিবার তাঁহার ভক্ত ও আশ্রিত-মণ্ডলীকে দর্শন দিতেন। এই দর্শনের তারিখ ও উপলক্ষ হইল (১) ২১শে ফেব্রুয়ারী—শ্রীমার জন্মদিন, (২) ২৪শে এপ্রিল শ্রীমার পণ্ডিচেরী আশ্রমে স্থায়ী-ভাবে আগমন (৩) ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন এবং (৪) ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের সিদ্ধি দিবস।

দর্শন দিবস-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক দিনই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত দর্শনার্থী শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে সমাগত হইতেন। ইহা-দিগের অবস্থান ও আহারাদির সুব্যবস্থা আশ্রম হইতে করিয়া দেওয়া হইত। তবে প্রতি দর্শনের জন্য দর্শনার্থিগণকে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমার লিখিত অনুমতি লইতে হয়। অনুমতি না পাইলে দর্শনের এবং তদুপলক্ষে আশ্রমে অবস্থানের কোনরূপ সুবিধা পাওয়া যাইত না।

আশ্রম বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম আদৌ সে ধরণের নহে। ইহার আশ্রমিকগণ কোন নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিধান করেন না, অথবা কোন সাম্প্রদায়িক মতবাদও প্রচার করেন না। ইহা এক বিরাট কর্ম্ম ও শক্তি-পরিবেশক কেন্দ্র। পণ্ডিচেরীর সমস্ত ছাই-রংএর বাড়ী এই আশ্রমভুক্ত এবং এই বাড়ীগুলির সংখ্যা

কয়েক শত। ইহার কতকগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষালয়, ব্যায়ামাগার, চিকিৎসালয় ও মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি আছে, কতকগুলিতে প্রায় ৮০০ স্থায়ী আশ্রমিক বাস করেন এবং অবশিষ্টগুলি নির্দ্ধারিত থাকে শ্রীমার অনুমতি প্রাপ্ত দর্শনার্থিগণের অবস্থানের জন্য। এতদ্ব্যতীত আশ্রমভুক্ত গোগৃহ, কৃষিশালা, ও বহু ধান্য-ক্ষেত্র আছে। সেই সকলের জন্য ইহা এক স্বয়ং সম্পূর্ণ মহা-প্রতিষ্ঠান হইয়াছে।

আশ্রমিক ও আশ্রমিকাগণের প্রত্যেকের নির্দ্ধারিত দৈনন্দিন কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং তাঁহারা প্রত্যেকে পরমাগ্রহ, নিষ্ঠা ও সুশৃঙ্খলার সহিত তাঁহাদের কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে থাকেন। প্রত্যেক বালকবালিকাটি হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই যেন কলের মত সুশৃঙ্খলায় ও নীরবে নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন করিতে থাকেন। তাহার মধ্যে কোথাও এতটুকু হৈ চৈ ও মতদ্বৈধতা থাকে না।

শ্রীমার আধ্যাত্মিক ও পরমার্থিক সাধনা ব্যতীত বহির্জগতে তাঁহার দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ কার্য্য অনেক। তিনি প্রত্যহ প্রায় সকাল ৭টায় প্রধান আশ্রমের পশ্চাদ্দিকের দ্বিতলের বারাণ্ডা (Balcony) হইতে তাঁহার ভক্ত ও আশ্রিতগণকে কিয়ৎক্ষণের জন্য দর্শন দেন। বারাণ্ডায় আসিয়াই তিনি পূর্ব্বদিকবর্ত্তী অসীম সমুদ্রের নীল প্রসার ও প্রভাত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখেন এবং পরে নিম্নদেশে দণ্ডায়মান শত শত ব্যক্তির প্রতি স্নেহ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার ভিতরে চলিয়া যান। ইহার পরেই আবার সকাল ৮টায় তাঁহার "বিশেষ আশীর্ব্বাদ" থাকে। তাঁহার ও শ্রীঅরবিন্দের সাধনাপূত পুষ্প প্রত্যেক আগন্তুককে তিনি স্বহস্তে বিতরণ করেন। ইহার জন্যও প্রত্যহ আশ্রমের মধ্যে একটি দীর্ঘসূত্রে লোক সমাগম হয়। মধ্যে প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্ন ভোজনের বিচিত্র ধরণের ব্যবস্থা। পাউরুটি, কফি ও কলা প্রাতরাশের—ভাত, একটি তরকারী, পাউরুটি, দধি ও কলা মধ্যাহ্ন ভোজনের এবং পাউরুটি, তরকারী, দুধ ও কলা সান্ধ্য ভোজনের আহার্য্য। এই খাবার লইতে হইলে ডাইনিংরুমে গিয়া লাইন দিয়া দাঁড়াইতে হয়। তথায় পরিবেষ্টাগণ আহার্য্য দ্রব্যাদি লইয়া পরিবেশন স্থানে "কাউনটারে" বসিয়া থাকেন। তথায় পৌঁছিয়া প্রথমে স্তূপীকৃত প্লেট্ হইতে একখানি লইতে হয়। প্লেট পাতিলেই একজন উহার উপর এক বাটি ভাত দিবেন। ভাত লইয়া দুই পা অগ্রসর হইলেই আর একজন একবাটি তরকারি ঐ প্লেটে বসাইয়া দেন—আর একটু অগ্রসর হইয়া একখানি চামচ লইতে হয়, তাহার পরে একজন দিবেন এক বাটি দধি—আর একজন দিবেন কলা ও রুটি। এইভাবে সমস্ত দ্রব্য লওয়া হইলে—সোজা হল ঘরে চলিয়া যাইতে হয়। তথায় কার্পেট পাতা আছে—এবং প্রত্যেকের জন্য সাদা চাদর পাতা ছোট ও নাতি-উচ্চ চৌকী আছে। জল গেলাসে পূর্ব্ব হইতেই ভর্ত্তি থাকে। বাঁ হাতে এক গেলাস জল লইয়া চৌকীতে প্লেট রাখিয়া খাইতে হয়। খাওয়া হইলে আবার অন্য মহলে আসিয়া স্বেচ্ছা-সেবক ও সেবিকাগণকে যিনি যেটি ধুইতেছেন বা মাজিতেছেন সেইটি দিয়া কলের জলে হাতমুখ ধুইয়া চলিয়া আসিতে হয়। কোন হৈ চৈ অথবা "দেহি" "দেহি" রব নাই। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই উক্ত নিয়মে প্রায় দুই হাজার লোকের খাওয়া হইয়া যায়।

আশ্রমের বারান্দায় দণ্ডায়মানা শ্রীমাকে শত শত আগন্তুক দর্শন করিতেছেন

শ্রীমায়ের বর্ত্তমান বয়স ৮৪ বৎসর। তিনি এখনও প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫টায় আশ্রমভুক্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী টেনিস্ কোর্টে আসেন এবং যুবকগণের সহিত টেনিস্ খেলেন। তৎপরে তিনি আশ্রমের ব্যায়াম কেন্দ্রে আসেন। এই স্থানে আশ্রমভুক্ত শত শত বালকবালিকা হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলকেই কিছু না কিছু ব্যায়াম করিতে হয়। কুচ্‌কাওয়াজ, দৌড়, হাউল্, পোল ভণ্ট্, ব্রড জাম্প, টাগ অব ওয়ার, সট্‌পুট্,

যোগ ব্যায়াম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ব্যায়ামাভ্যাস এখানে করান হয়। ব্যায়ামান্তে শ্রীমায়ের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া প্রত্যেককে প্রায় দশমিনিট কাল সমবেত প্রার্থনা করিতে হয়। পরে শ্রীমা স্বহস্তে সকলকে বাদাম, চকোলেট প্রভৃতি বিতরণ করেন। এইভাবে সারাদিন স্নেহে, আশীর্ব্বাদে, শিক্ষায়, বদান্যতায়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ঐ ৮৪ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার কার্য্যদক্ষতা দেখিলে মনে হয় ইনি একজন দৈব-শক্তিশালিনী মহীয়সী মহিলা।

এইবার উল্লেখ করিব ২৪শে নভেম্বরে—শ্রীঅরবিন্দের সর্ব্বশেষ "দর্শন" দানের কথা। পূর্ব্বরাত্রি ৯টায় শ্রীমা শ্রীঅরবিন্দের ছাপান এক বিশেষ বাণী বিতরণ করিলেন। ইংরাজীতে ছাপান ঐ বাণীর
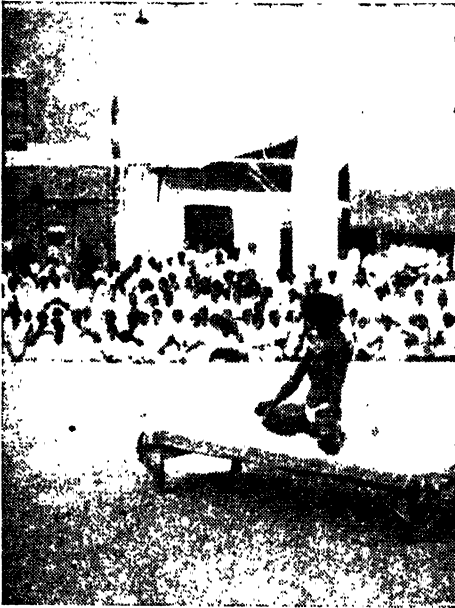
যোগ-ব্যায়াম শিক্ষারত আশ্রমবাসী

বঙ্গানুবাদ—ভাগবত সিদ্ধিই চরম সত্য এবং প্রাকৃতিক প্রবাহ-ধারার মধ্যে "আবির্ভাবও অবশ্যম্ভাবী"। ২৪শে নভেম্বরের প্রভাত হইতেই সারা পণ্ডিচেরী কর্ম্মচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর বহু দেশ হইতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বহু পরিব্রাজক, ভক্ত, ব্রহ্মচারী, আচার্য্য, দার্শনিক ও আশ্রিতগণ সমবেত হইয়াছেন। বেলা ২টা হইতে "দর্শন" আরম্ভ হইবার কথা। আশ্রমের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরে রাস্তার 'ফুটপাতে' বহুদূর পর্য্যন্ত কার্পেট, মাদুর প্রভৃতি পাতিয়া দেওয়া হইয়াছে। বহু পূর্ব্ব হইতেই লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। ধনী, নির্ধন, রাজামহারাজা, নারী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই একই লাইনভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও চীন প্রভৃতি দেশ হইতে আগত বহু দর্শনার্থী নগ্নপদে ও শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ঐ একই লাইনে প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পৌনে দুইটায় "দর্শন" আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে সকলে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। আশ্রমের প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া দ্বিতল কক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সাধন-গৃহে তাঁহার দর্শন মিলিবে। উপরে উঠিবার প্রত্যেক সিঁড়িটি তুলার প্যাড্ দিয়া মোড়া। নীরবতা রক্ষার জন্য ঐ প্যাডের উপর দিয়া চলিতে হয়। শেষ সিঁড়ির পর দক্ষিণদিকে বড় হলঘর। ঐ হলঘরের শেষ প্রান্তে আর একটি কক্ষ। ঐ কক্ষের সম্মুখে একখানি বড় কৌচে স্থির নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন জগদ্বিখ্যাত মনীষী শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁহার কিয়দ্দক্ষিণে অধোবদন ও সঙ্কুচিতা হইয়া উপবিষ্টা আছেন শ্রীমা।

সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পুষ্পপাত্রে রাখিলাম একটি পুষ্পমাল্য শ্রীঅরবিন্দকে উৎসর্গ করিয়া। তাহার পর চাহিয়া দেখিলাম শ্রীঅরবিন্দের প্রতি। কি দেখিলাম—কি অভিনব, অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি অপার্থিব ও অবর্ণনীয় দিব্য জ্যোতি! বদনমণ্ডলে কি প্রোজ্জ্বল প্রতিভা, কি দীপ্তি, কি আনন্দ-স্ফূর্ত্তি ও কি তপঃ প্রভাব। অমৃতত্বের নিগূঢ় চেতনায় সজাগ, সত্যোপলব্ধির অনির্ব্বাণ আলোকে উদ্ভাসিত, দিব্য-জীবনের রসাস্বাদনে সুপুষ্ট মুখচ্ছবি। দেব-বীর্য্য, দিব্য বিভা, স্থির গাম্ভীর্য্য ও যোগ-বিভূতি যেন তাঁহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির বিনিময় করিলাম। অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। যেন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রাইয়া আসিয়া আমার চক্ষুদ্বয় চকিতে বন্ধ করিয়া দিল—সারা দেহে তড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল। মনে হইল—"ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে, তদেব মে দর্শয় দেব রূপং, প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস" অর্থাৎ হে প্রভু! ভয়ে আমার মন বিচলিত হইতেছে—আর দেখিতে পারিতেছি না। তুমি প্রসন্ন হইয়া তোমার সাধারণ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে প্রকট হও"।

ঐ দিব্যজ্যোতিমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিলেই মনে হয় যেন নররূপী দেবতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ঐ নর-দেবতার সম্মুখে দাঁড়াইতে পাইয়াছিলাম মাত্র ১০।১৫ সেকেণ্ড, কিন্তু ঐ অত্যল্প সময়েই যেন অনুভব করিলাম এক মহাশক্তির রসাস্বাদন আপন অন্তরে। চকিতে মনে হইল, যেন সঞ্চিত যত পাপভার, যত কলুষতা, যত ইন্দ্রিয়-পীড়া ধৌত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। ঐ একটু দেখাতেই যেন পূর্ণ হইয়া গেলাম।

রস-মাধুর্য্য অনুভব করিবার আরও একটি দিক ছিল। তাহা অন্তকার শ্রীমায়ের অবস্থা। যে মাতাকে প্রতি প্রভাতে দেখিতে পাওয়া যায়—আশ্রম-কক্ষ হইতে দর্শন দিতে এক পরমা সাধিকা রূপে, যে মাতাকে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার কল্যাণময়ী হস্তে প্রত্যেক আগন্তুককে নির্ম্মাল্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে, যে মাতা যৌবনসুলভ শক্তিতে প্রত্যহ খেলেন 'টেনিস', করান্ ড্রিল, শেখান প্রার্থনা, চালান্ শত শত শরণাগতের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা! আবার সেই মহীয়সী মহিলা যখন শ্রীঅরবিন্দের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন তখন তিনি আপনাকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এত ক্ষুদ্রা ও এত নগণ্যা—যে ঐ অবস্থা দেখিলে মনে

হয় না যে, ইনিই সেই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সর্ব্বাধিনায়িকা, কল্যাণময়ী জননী।

শ্রীঅরবিন্দের মূর্ত্তির সহিত তাঁহার সর্ব্বত্র প্রচলিত ছবিখানির কোন সৌসাদৃশ্য নাই। ঐ ছবিখানি ১৯১০ খৃষ্টাব্দের। তাহার পর এই সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের সাধনাপূতঃ মূর্ত্তির যে কি আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা ধারণাতীত। শ্রীঅরবিন্দের দেহের বর্ত্তমান বর্ণ রক্তাভ শুভ্রোজ্জ্বল। তাঁহার গোঁফ দাড়ী ও মাথার চুল সমস্তই সাদা ও পাতলা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বদন-মণ্ডলের কোথাও কোনরূপ

আশ্রমের সকল সাধক ও সাধিকা শ্রীমায়ের সমক্ষে ব্যায়াম করিতেছেন। শ্রীমা মঞ্চোপরি দণ্ডায়মানা

সঙ্কুঞ্চন আসে নাই এবং ত্বকের চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য পূর্ণ-যৌবনে যেমন হয় তেমনিই। শ্রীমায়ের নিষেধক্রমে শ্রীঅরবিন্দের বর্ত্তমান এই মহাযোগীর অবস্থার কথাটা সাধারণে প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের "দর্শন" চলিয়াছিল দ্বিপ্রহর ১-৫০ মিনিট হইতে অপরাহ্ণ প্রায় ৩-৪৫ মিনিট পর্য্যন্ত—এই প্রায় এক ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট কাল। এই সামান্য সময়ের মধ্যেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়েন এবং ফলে তাঁহাকে কিছুক্ষণের জন্য লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিতে হয় ও "দর্শন" বন্ধ থাকে। এই অপূর্ব্ব সাধনা শক্তিই আজ আকর্ষণ করিয়াছে পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ মনীষীকে শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা ও তাঁহার আশ্রমের প্রতি। এই স্থানকে আশ্রম না বলিয়া শ্রীঅরবিন্দ-শক্তিকেন্দ্র বলিলেই উপযুক্ত হয়।

আজ নাকি শ্রীঅরবিন্দ আর ইহজীবনে নাই। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে? কিন্তু তাঁহার মৃত্যু নাই। যাহা ঘটিয়াছে উহাকে এক দীর্ঘ-স্থায়ী সমাধি বলা চলে। যে দীর্ঘ-স্থায়ী সমাধির দ্বারা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অপরের মৃত দেহে প্রবিষ্ট হইয়া জাগতিক সমস্ত শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের তথা-কথিত মৃত্যুও তাহাই। এমনও হইতে পারে যে তিনি ঐরূপ দীর্ঘস্থায়ী সমাধিতে অভ্যস্ত ছিলেন না—এবং স্বদেহে আত্মার ফিরিবার পথে সহায়তার যে সমশক্তিশালী "মিডিয়ম" অবলম্বনের তাঁহার প্রয়োজন হইতেছিল তাহা তিনি পাইলেন না বলিয়াই আর দেহস্থ ও প্রকৃতস্থ হইতে পারিলেন না। ইহাতেই ঘটিল তাঁহার দেহাবসান।

যে জ্যোতিষ্কমণ্ডল হইতে এক দিব্যালোক আসিয়া পৃথিবীর মানুষকে পথ দেখাইতেছিল—ও যাহার ফলে হইতেছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন প্রতিষ্ঠা—সেই "কসমিক্ রে" সেই মহা আলোকপ্রবাহ কোন মৃত্যু-মেঘের প্রতিরোধ গ্রাহ্য করে না—ইহাই শাশ্বত নীতি।

খাদ্য-সমস্যা—

ভারত-রাষ্ট্রে খাদ্য-সমস্যার সমাধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। প্রধান-মন্ত্রী যে আশা করিয়াছিলেন, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দেই রাষ্ট্র খাদ্যোপকরণে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হইবে, সে আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। খাদ্য-মন্ত্রী যে আশা প্রকাশ করিয়াছেন, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দেই তাহা হইবে, তাহা পূর্ণ হইবে না বলিয়াই অনেকে মনে করেন। সেই জন্য সরকারও বলিয়াছেন, যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবেই ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের পরে বিদেশ হইতে খাদ্য-দ্রব্য আমদানী করা হইবে, নহিলে নহে। পশ্চিমবঙ্গে কয় বৎসর হইতেই অন্নাভাব চলিতেছে। গত ৪ঠা পৌষ এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও কৃষি সচিব হিসাব করিয়া বলিয়াছেন—১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের পরিমান ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার টন হইবে। যদি পশ্চিম-বঙ্গের লোক-সংখ্যা ২ কোটি ৪৬ লক্ষ থাকে, তাহা হইলে ঘাটতির পরিমাণ ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন দাঁড়াইবে। এই বৎসরের আরম্ভে সরকারের সঞ্চিত খাদ্যশস্য থাকিবে না বলিলেই হয়। মোট ঘাটতি ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টন হইবে। বিদেশ হইতে যে খাদ্যশস্য আমদানী করা হইবে, তাহার পথেও বাধা অনিবার্য্য; কারণ, বর্ত্তমান অবস্থায় মালবাহী জাহাজ পাওয়া দুষ্কর। সুতরাং কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে যে সাহায্য পাওয়া যাইবে, তাহা লইয়া কোনরূপে বৎসর কাটাইতে হইবে; আমদানী মাল দিয়া লোককে সরবরাহ করিতে হইবে। জনগণ যদি সম্পূর্ণভাবে সহযোগ করেন, তবেই কোনরূপে বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে।

এইরূপ অবস্থা যে আতঙ্কজনক, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষ অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, কীটের উপদ্রব—এ সকল যে হইবে না, এমনও বলা যায় না। তদ্ভিন্ন পূর্ব্ব-বঙ্গের যে অবস্থা, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গে লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি যে হইবে তাহা মনে করা সঙ্গত, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

আমরা মনে করি, সরকারী ব্যবস্থা অব্যবস্থাশূন্য হয় নাই। প্রথমতঃ—সরকার যে হিসাবে নির্ভর করেন, তাহা যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা সরকারই স্বীকার করেন ও করিয়াছেন। সুতরাং গোড়ায় গলদ থাকিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ—সরকার যদি বলেন, অভাব ঘটিবেই, তবে লোক যেমন সঞ্চয় করিতে আগ্রহশীল হয়, চোরা-কারবারীরা তেমনই লাভবান হইবার আশায় অন্যায় উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করে। তৃতীয়তঃ—অপচয় নিবারণের আবশ্যক উপায় এখনও অবলম্বিত হয় নাই। চতুর্থতঃ—পরিপূরক খাদ্যোপকরণ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয় নাই। পঞ্চমতঃ—সরকারের "অধিক ফসল উৎপাদন" আন্দোলন ব্যবস্থার ত্রুটিতে ও লোকের সাগ্রহ সহযোগ আকৃষ্ট করিবার চেষ্টার অভাবে আবশ্যক ও ঈপ্সিত সাফল্যলাভ করে নাই। এই সকল কারণ দূর করা প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর একটি কথা বলিব—গত যুদ্ধের সময় বৃটেন যে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাতে লোকের স্বাস্থ্যের অবনতি না হইয়া উন্নতি হইয়াছিল। তাহার কারণ, সরকার খাদ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ দেশে তাহা করা হয় নাই। পরন্তু যে খাদ্যোপকরণ সরবরাহ করা হয়,

তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। খাদ্যোপকরণ কখন বিকৃত, কখন বা ভেজাল—ইত্যাদি জানা যায়।

উৎকৃষ্ট বীজ ও আবশ্যক সার সরবরাহ করা, সেচের ব্যবস্থা করা, পরিপূরক খাদ্যোপকরণ যাহাতে সহজে ক্ষেত্র হইতে বাজারে নীত হইতে পারে সে জন্য পথের ও যানের সুবিধা করা, লোককে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে আবশ্যক পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান—এ সকল বিষয়ে সরকারকে বিশেষরূপ অবহিত হইতে হইবে এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রচার করাইতে হইবে। এই প্রচার কার্য্য শিক্ষাসাপেক্ষ। রুশ-বিশেষজ্ঞ কালিনীল বলিয়াছেন, যদি প্রচারকের কার্য্যে বা ব্যবহারে লোকের মনে হয়, তিনি আপনাকে তাহাদিগের তুলনায় অধিক জ্ঞানগুণসম্পন্ন মনে করেন, তবে আর তাঁহার দ্বারা কোন কাজ হইবে না—"Then you are as good as lost." প্রচারের জন্য আবশ্যক উপদেশ পুস্তিকায় বা প্রবন্ধে দিতে হইবে। যে সকল দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ব্যাপক, সে সকল দেশে সংবাদপত্রের দ্বারা প্রচারকার্য্য যেরূপ পরিচালিত হইতে পারে, এ দেশে সেরূপ হয় না। কারণ, এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা এখনও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হয় নাই। যে দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি দুষ্প্রাপ্য, সে দেশে বেতারে প্রচারের আশা দুরাশা।

পরীক্ষাক্ষেত্রের ও গবেষণাগারের পরীক্ষাফল জনগণের মধ্যে অকাতরে প্রদান করিতে হইবে। উৎপাদন-বৃদ্ধির পথে কৃষকরা যে সকল বাধা পায়, সে সকল অতিক্রম করিবার উপায় করিতে হইবে। পরিপূরক খাদ্য যাহাতে সুলভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

যাঁহারা উৎপাদন-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা সাদরে গ্রহণ করিয়া কাজ না করিলে কাজ সহজসাধ্য হইবে না। আর কৃষকদিগকে সর্ব্বদা পরীক্ষারতদের সহিত যোগবদ্ধ রাখিতে হইবে।

সেচের ও সারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে গো-মহিষ-ছাগ ও হংসাদি পালনও শিক্ষা দিতে হইবে এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট জাতীয় বীজের ব্যবহারের মত উৎকৃষ্ট জাতীয় পশুপক্ষী পালিত হয় সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে। রুশিয়ার ও আয়ার্লণ্ডের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকর করা সঙ্গত। লোকের অন্নাভাব দূর না করিলে কোন বিষয়ে উন্নতিলাভের পন্থা সুগম হয় না।

পূর্ব্ববঙ্গের আশ্রয়প্রার্থী—

যদিও পাকিস্তানের বড়লাট খাজা নাজিমুদ্দীন মামুলী উক্তি করিয়াছেন, পাকিস্তান পূর্ব্ববঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতেছে, এমন কি পশ্চিম-বঙ্গের কোন কোন লোকের পাকিস্তানীদিগকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টাও ব্যর্থ করিতেছে, তথাপি দেখা যাইতেছে, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা এখনও প্রতিদিন সহস্রে সহস্রে ভারত রাষ্ট্রে আসিতেছেন। প্রকৃত কথা, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা মানসম্ভ্রম ও অধিকার লাভে বঞ্চিত। একান্ত পরিতাপের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে আগত হিন্দুদিগকে ভারত-সরকার নাগরিক অধিকার ও নির্ব্বাচনে ভোট ব্যবহারের অধিকার দিতে অসম্মত। ভারতীয় পার্লামেন্টের শতাধিক সদস্য তাঁহাদিগকে এই সকল প্রাথমিক অধিকার দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন এবং জওহরলাল নেহরু সে পক্ষে যে সকল বাধার উল্লেখ করিয়াছিলেন, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সে সকল লঙ্ঘন করিবার উপায় ব্যবহার-মন্ত্রী ডক্টর আম্বেদকারকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তথাপি প্রধান মন্ত্রী শতাধিক সদস্যের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া লোকমতের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন। যদিও ভারত সরকার সদস্য-নির্ব্বাচনকাল দুই বৎসরের পরেও আবার পিছাইয়া দিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা যে—যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া দুই বৎসরেরও অধিক কাল ভারত রাষ্ট্রে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে—প্রাথমিক অধিকার দিতে অসম্মত, ইহার রাজনীতিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য্য সামান্য নহে।

জওহরলাল শতাধিক সদস্যের পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন, তাঁহারা (অর্থাৎ মন্ত্রীরা) বিষয়টি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় সদস্যদিগের প্রস্তাব গ্রহণ করা অত্যন্ত অসুবিধাজনক। সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সদস্য নির্ব্বাচনের পদ্ধতিতে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইবে, এমন কি নির্ব্বাচনের সময়ও পরিবর্ত্তন

করা প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ, সে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে অবিলম্বে আগতদিগকে নাগরিকের অধিকার দানের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করিতে হয় এবং তাহার পরে বিনানুসন্ধানে লোকের কথায় নির্ভর করিতে হয়—তাহাদিগের দাবী অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থা জটিল; কারণ, নহিলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। সুতরাং প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না।

আমরা উদ্বাস্তুদিগের সম্বন্ধে দুর্নীতিপ্রবণতার সন্দেহের প্রতিবাদ করা প্রয়োজন মনে করি।

যে ভাবে, দুই বৎসর বিলম্ব করিবার পরেও, ভারত সরকার নির্ব্বাচনের সময় আরও ছয় মাস পিছাইয়া দিতে দ্বিধানুভব করেন নাই, তাহাতে তাঁহারা যে বিলম্বে অসম্মত—এ কথা কখনই তাঁহাদিগের মুখে শোভা পায় না। খাদ্যোপকরণ আমদানী বন্ধ করিবার সময় সম্বন্ধে জওহরলাল এবং নির্ব্বাচনের সময় সম্বন্ধে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ যে আপনাদিগের কথা রক্ষা করেন নাই, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগকে ভোট ব্যবহারের অধিকার-প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের কথা রক্ষা করিবার এই আগ্রহ যে অনেককেই তাঁহারা "protesteth too much" বলিতে প্ররোচিত করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রায় চল্লিশ লক্ষ লোককে নাগরিক ও ভোট ব্যবহারের অধিকারে বঞ্চিত করা যে গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে গৌরবজনক নহে, তাহা বলা বাহুল্য।

এদিকে ভারত সরকার পার্লামেণ্টের অধিবেশন স্থগিদ না-রাখিয়া আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অধিবেশন বন্ধ করিয়াছেন। ইহার ফলে—সরকার এই সময়ের মধ্যে কোন অর্ডিনান্স জারি করিতে পারিবেন না; দ্বিতীয়তঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাষ্ট্রপতির বক্তৃতা হইবে না; তৃতীয়তঃ প্রস্তাবিত আইনগুলির জন্য যে সকল সংশোধন প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে, সে সকল বলবৎ থাকিবে।

ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত হিন্দুদিগকে প্রাথমিক অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়া সাধারণ সদস্য-নির্ব্বাচন শেষ করিয়া লওয়াই ভারত সরকারের অভিপ্রেত এবং তাঁহারা সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেই বদ্ধপরিকর! লোক যে তাঁহাদিগের এই কার্য্যে উদ্দেশ্য আরোপ করিবে, তাহা তাঁহারাও জানেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান-সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন, তিনি যে নির্ব্বাচনের সময় পিছাইয়া দিতে বলিয়াছেন তাহার কারণ, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচনে ভোট ব্যবহারের অধিকার প্রদান তাঁহার অভিপ্রেত। যখন তাঁহার সে অভিপ্রায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না, তখন তিনি কি সেইজন্য পদত্যাগ করিবার সঙ্কল্প ভারত সরকারকে জ্ঞাপন করিবেন? তাঁহার অভিপ্রায় রক্ষিত না হওয়ায় যে পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, তাহা জানিয়াও ভারত সরকার এই কার্য্য করিয়াছেন।

ভারত সরকারের শতাধিক সদস্যের প্রস্তাব অবজ্ঞা সহকারে প্রত্যাখ্যান যে জটিল অবস্থার উদ্ভব করিয়াছে, তাহাতে দেশে অসন্তোষ-বৃদ্ধি অনিবার্য্য এবং তাহা লইয়া যে আন্দোলনের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের দলাদলিতে দুর্ব্বল সচিবসঙ্ঘের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, উদ্বাস্তু আগতদিগের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা লোকের আশানুরূপ হইতেছে না এবং নানা স্থান হইতে যে সকল অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে, তাহা উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সরকার পুনর্ব্বসতির জন্য যে সকল ব্যবস্থা করিতেছেন সে সকল নানারূপ ত্রুটিতে দুষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি সাধনের জন্য যে সকল উপায় বা সুযোগ অবলম্বিত হইতে পারে, সে সকল কেন যে অবজ্ঞা করা হইতেছে, লোক তাহাই বিস্ময়কর বলিয়া মনে করিতেছে। কে সে বিস্ময়ের অপনোদন করিবে?

অরবিন্দ ও বল্লভভাই পেটেল—

গত অগ্রহায়ণ মাসে ভারতের দুই দিকে দুই জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল। চিন্তাজগতে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কদিগের অন্যতম শ্রীঅরবিন্দ ১৯শে অগ্রহায়ণ এবং কর্ম্মী বল্লভভাই পেটেল ২৯শে অগ্রহায়ণ পরলোকগত হইয়াছেন। বল্লভভাই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বারদোলী সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব করিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি তথায় জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাজস্ব বিষয়ে আন্দোলনে জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি "লৌহ-মানব" অর্থাৎ অসাধারণ দৃঢ়তাসম্পন্ন বলিয়া

খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সেই সময় বারদোলী তালুকে তাঁহার কার্য্য বিবেচনা করিয়া পাঞ্জাবের নেতা ডক্টর সত্যপাল বলিয়াছিলেন :—

"বারদোলীর এই বীর নেতা অসাধারণ পুরুষ এবং অসাধারণ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার কার্য্যে শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার কথা এবং তাঁহার 'সামরিকপ্রায় শৃঙ্খলা' বাঙ্গালায়—বরিশালের মুকুটহীন রাজা অশ্বিনীকুমার দত্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অশ্বিনীবাবু আন্দোলন এত প্রবল করিয়াছিলেন যে, বরিশালে এক ছটাক বিদেশী লবণ বা চিনি পাওয়া যাইত না—বিদেশী কাপড় ত পরের কথা। বিশেষ কথা এই যে, বরিশালের য়ুরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটও ঐ সকল জিনিষ পাইতেন না।"

বল্লভভাই গান্ধীজীর পরম ভক্ত ছিলেন এবং যখন দেশ বিভক্ত হয়, তখন তিনি পাকিস্তানকে কয় কোটি টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলেও গান্ধীজীর নির্দ্দেশে তাহা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, পাকিস্তান সরকার যদি তথায় হিন্দুদিগকে সসম্মানে বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিতে না পারেন, তবে ঐ সকল লোকের বাসের জন্য তাঁহাদিগের নিকট আবশ্যক ভূমি দিবার দাবী করিতে হইবে। পাকিস্তানের কর্ত্তারা সেই স্পষ্ট উক্তিতে বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং পরে জওহরলাল নেহেরু বলেন—ঐ কথা ভীতিপ্রদর্শনের জন্য বলা হয় নাই।

ভারতে নূতন সরকার প্রতিষ্ঠার পরে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার প্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্য—সামন্ত রাজ্যগুলি ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার পরে তাহাতে বহু সামন্ত রাজ্য থাকায় শাসন-সাম্য রক্ষা করা অসম্ভব বুঝিয়া তিনি স্বৈরশাসনের কেন্দ্র ঐ সকল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সেগুলি ভারত রাষ্ট্রভুক্ত করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছিলেন। অবস্থা বিবেচনা করিয়া বরদা প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিরা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে তিনিও রাজাদিগের সম্বন্ধে উদার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কেবল হায়দ্রাবাদ জয় করিতে তাঁহাকে সেনাবল ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। মুসলমান শাসকের শাসনাধীন হায়দ্রাবাদ জয় করিলে যদি পাকিস্তানে বা অন্যত্র অশান্তির উদ্ভব হয়, সেই জন্য তিনি পূর্ব্বাহ্নে আবশ্যক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন, কাশ্মীরের কার্য্যে জওহরলাল যদি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের বিবেচনাধীন না করিতেন এবং বল্লভভাই সে কাজের ভার পাইতেন, তাহা হইলে ভারতীয় বাহিনী সপ্তাহকাল মধ্যেই কাশ্মীর অধিকার করিয়া তাহার পরে পাকিস্তানের সহিত মীমাংসার বিষয় বিবেচনা করিতে পারিত। মীমাংসার পথ সম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল—দুর্ব্বল যে পথ গ্রহণ করিলে তাহার অনিষ্ট অনিবার্য্য।

দিল্লীতে অসুস্থ হইয়া বোম্বাই যাত্রার প্রাক্কালে বল্লভভাই ভারত সরকারের শ্রমিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন ;—

"দেশের দীর্ঘ ইতিহাসে যখনই বিদেশী শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভ ঘটে, তখনই দেশের স্বাধীনতা বহিঃশত্রুর দ্বারা বিপন্ন হয় না—তাহার দৌর্ব্বল্যই তাহার বিপদের কারণ হয়। আমাদিগের এই সঙ্কটকালে বিশেষ সাবধান হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য।"

তিনি স্বয়ং স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী হইয়া সর্ব্বতোভাবে সতর্কতার সমর্থন ও অনুশীলন করিতেন। ভাবপ্রবণ জওহরলালের সঙ্গে বাস্তবানুরাগী বল্লভভাই পেটেলের সম্মিলনের বিশেষ কারণ ও উপযোগিতা ছিল।

সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ—

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব হইয়া ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য বিভাগ অন্য কোন বিভাগের সহিত যুক্ত করা হইলেও প্রতিদিন তিনি এই বিভাগের গুরুত্ব দেখিয়া আসিয়াছেন ; আমেরিকায় মৎস্য কেবল খাদ্যই নহে, পরন্তু অতিরিক্ত মৎস্য পশুখাদ্যে পরিণত করিবার চেষ্টা ও সাররূপে ব্যবহার করা হইতেছে। তিনি প্রধান-সচিব হইয়া মৎস্য বিভাগ স্বতন্ত্র করিয়া কেবল বনবিভাগের সহিত সংযুক্ত রাখেন—কৃষি বিভাগের সহিত তাহা সংযুক্ত রাখেন নাই।

ডক্টর রায় বলিয়াছিলেন বটে, প্রত্যেক লোকের পক্ষে ১৬ আউন্স খাদ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি সে বিষয়ে আবশ্যক

খাদ্য প্রদান করিতে পারেন নাই। তবে তিনি মৎস্য বিভাগের কথা ভুলেন নাই। তিনি একদিকে কলিকাতায় ভূগর্ভে রেল চালান সম্ভব কি না সে বিষয় পরীক্ষার জন্ম বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়াছিলেন, আর একদিকে বিদেশ হইতে জলযান ও বিশেষজ্ঞ আনিয়া সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত আয়োজন বহু বৎসর পূর্ব্বে একবার হইয়াছিল এবং তৎকালীন সরকার "গোল্ডেন ক্রাউন" নামক জাহাজ কিনিয়া সমুদ্র হইতে কলিকাতার বাজারে মৎস্য সরবরাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য, কৃষিকার্য্যের পরেই পশুপালন ও মৎস্য চাষ ও মৎস্য-সংগ্রহ বিশেষ প্রয়োজনীয় ভারতীয় ব্যবসা। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে ডক্টর চোপরা বলিয়াছিলেন, ভারতের (তখন অবিভক্ত) চিংড়ি মাছের ব্যবসা বৎসরে তিন কোটি টাকার। কিন্তু ভারতীয় মৎস্য ব্যবসায়ীরা সরকারের নিকট আবশ্যক সাহায্য লাভ করে না। এ বিষয়ে কেবল মাদ্রাজের মৎস্য বিভাগ অবহিত হইয়াছিলেন। ডক্টর চোপরা বলিয়াছিলেন—

(১) ধীবরদিগের মাছ ধরার পদ্ধতিতে আবশ্যক পরিবর্ত্তন হয় নাই।

(২) সংরক্ষণ-ব্যবস্থার অভাবে ধৃত মৎস্যের অনেকাংশ অব্যবহার্য্য হইয়া যায়।

(৩) আমরা কোন জাতীয় মাছের সম্বন্ধে আবশ্যক গবেষণা করি নাই।

তিনি সমুদ্রের মৎস্য-সম্পদ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতেও বলিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার লোকের খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির চেষ্টায় ডেনমার্ক হইতে দুইখানি মাছ-ধরা জাহাজ আনিয়াছেন। জাহাজের ধীবররাও সেই দেশীয়। জাহাজ দুইখানির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "সাগরিকা" ও "বরুণা" করা হইয়াছে। এই নামকরণ-কার্য্য গত ২৮শে অগ্রহায়ণ খিদিরপুরে হইয়া গিয়াছে। ঐ উপলক্ষে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি "কে, জি, গুপ্ত কমিটীর" উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, সে কমিটী বঙ্গোপসাগরে মৎস্য ধরার সুযোগের উল্লেখ করিয়াছিলেন। একান্ত পরিতাপের বিষয়, ডক্টর রায় লক্ষ্য করেন নাই যে, "কে, জি, গুপ্ত কমিটী" নামে কোন কমিটী কখন গঠিত হয় নাই; কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় একক ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার (তখন বিহার ও উড়িষ্যাও বাঙ্গলার অংশ) মৎস্য-সম্পদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্ম নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং ডক্টর বনওয়ারীলাল চৌধুরী তাঁহার সহকারী ছিলেন।

বিধানবাবু বলিয়াছেন—বর্ত্তমানে তাঁহারা মৎস্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করিতেই চাহেন—ব্যয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন না। কিন্তু ব্যয় যদি অত্যন্ত অধিক হয়, তবে কি সে ব্যবস্থা —সরকারের টাকায় স্থায়ী করা সঙ্গত হইবে?

পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণর ডক্টর কাটজু স্পষ্টই বলিয়াছেন, পরীক্ষার্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে; ফল কি হইবে—বলা যায় না।

আমরা পরীক্ষার সাফল্য কামনা করি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার সরকারের মত পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে রাষ্ট্রে নদী নালা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে "মিঠা জলের" মাছের চাষ সম্বন্ধে মনোযোগ দিতে বলি। এই সকল জলাশয়েও মৎস্যের চাষ বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করা সম্ভব।

ব্যয় ও অপব্যয়—

ভারত সরকার অনেকগুলি পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সে সকল সম্বন্ধে যেরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য ছিল, সেরূপ হয় নাই, এই মত "এষ্টিমেট্স কমিটী" তাঁহাদিগের রিপোর্টে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা (বিহারে) সিঁদরী সার প্রস্তুতের কারখানার দৃষ্টান্ত দিয়া সরকারকে সতর্কতাবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই কারখানা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন আনুমানিক ব্যয়ের পরিমাণ ১০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছিল; পরে তাহা ১২ কোটি করা হয়। তাহার পরে হিসাব সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হয়, ব্যয় ১৫ কোটি টাকা হইবে। ১৫ কোটি ক্রমে ১৮ কোটিতে পরিণত হইয়া এখন ২৩ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। কমিটী হিসাব পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতেই যে কায শেষ হইবে, এমন না-ও হইতে পারে! অর্থাৎ প্রায় ১১ কোটি ব্যয় দেখাইয়া কার্য্যারম্ভের পরে ব্যয় ২৩ কোটি দাঁড় করান হইয়াছে এবং হয়ত ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। এই ব্যবস্থা "অত্যন্ত অসন্তোষজনক"—

এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, অর্থ বিভাগ যে তখন হিসাব যথাযথরূপে বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট রূপ ব্যয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। দেখা যায়, ১২ জনের ব্যয় করিবার অধিকার আছে এবং ৮ জন হিসাব-রক্ষক আছেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেরই অধীনে কর্ম্মচারীর অভাব নাই। এই সকল বিভিন্ন বিভাগের ব্যয় একত্রিত করিয়া কখন প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার ব্যবস্থা করা হয় নাই। আবার পরিদর্শনের জন্য শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ব্যয় আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কমিটী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "এই ভাবে সরকারী পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা কি সঙ্গত?"

এই প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?

কমিটী ঠিকা দেওয়া সম্বন্ধেও সতর্কভাবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু যে টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি অপব্যয়িত হইয়া থাকে, তবে তাহার জন্য কি কাহাকেও দায়ী করা সম্ভব হইবে? ঠিকাদারের পরিচয় কি সন্ধানসহ হইবে?

দেখা যাইতেছে, ভারত সরকার কমিটীর বাহুল্যে বিলাস করিয়াছেন। তাঁহারা "মিতব্যয়িতা কমিটী"ও নিযুক্ত করিয়াছেন। গল্প আছে, জমীদারগৃহে যে দুগ্ধ যোগাইত, তাহার দুগ্ধে একদিন পানা পাইয়া—তাহা জল মিশানর প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলিয়া—তাহাকে দণ্ড দিলে সে বলিয়াছিল, যদি দেখিয়া লইবার লোকের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করা হয়, তবে হয়ত একদিন দুগ্ধে কুম্ভীরশিশু দেখা যাইবে। "মিতব্যয়িতা কমিটী" সতর্ক করিয়া দিলেও সরকার কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই, এই মতই "এষ্টিমেটস কমিটী" প্রকাশ করিয়াছেন। কমিটী কতকগুলি নিয়ম রচনা করিয়া সরকারকে সেই সকল নিয়মানুসারে কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু সরকার যে পরামর্শের অভাবেই ব্যয়ের মাত্রা বাড়াইয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে?

অপব্যয়ে যেমন দেশের ক্ষতি হয়—অপব্যয়ের মূলে দুর্নীতি থাকিলে তেমনই সমাজের সর্ব্বনাশ হয়।

সিঁদরীর কারখানা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা কতগুলি পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা যায়, তাহা কে স্থির করিবে? আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধকালে দুর্নীতি লক্ষ্য করিয়া কোন সেনাপতি দুর্নীতিপরায়ণ ঠিকাদারকে ফাঁসি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ দেশে জওহরলাল নেহরুও একদিন চোরাবাজারীদিগকে বিলম্বমাত্র না করিয়া ফাঁসি দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে কি হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং যাহা অনুভব করিতেছি, তাহা আর বলিতে হইবে না।

কমিটী যে সকল ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকলের জন্য দায়িত্ব কি মন্ত্রিমণ্ডলকেও স্পর্শ করিতে পারে না? পারে কি না, তাহা কি পার্লামেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন?

সভা, সমিতি, সম্মিলন—

ইংরেজের শাসনকালে ভারতে "বড়দিনের" দীর্ঘ-অবকাশে নানা সভা, সমিতি, সম্মিলন হইত। এখনও সেই প্রথা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কেবল কংগ্রেসের অধিবেশন-কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

এবার কলিকাতায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কোন অজ্ঞাত কারণে প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর অভিপ্রায়ে পশ্চিমবঙ্গকে সে সম্মানে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহা হইলেও কলিকাতায় সভা, সমিতি, সম্মিলন অল্প হয় নাই। নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মিলন হইতে আরম্ভ করিয়া দর্শন কংগ্রেস, রাজনীতি-বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রভৃতির বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় হইয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে চিত্র-প্রদর্শনীও উল্লেখযোগ্য। অন্য কোন প্রদেশে এখনও কলিকাতার মত চিত্র-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার উপায় হয় নাই। ভবিষ্যতে হয়ত দিল্লীতে তাহা হইবে। কিন্তু যতদিন তাহা না হয়, ততদিন চিত্র-রসিক-দিগকে প্রদর্শনীর জন্য কলিকাতায় আসিতে হইবে।

এই সময়ের মধ্যে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন এবং কলিকাতায় কাশ্মীর সরকারের শিল্পজ পণ্য বিক্রয়ের জন্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাশ্মীরের উটজ শিল্প সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সার জর্জ্জ বার্ডউড সে সকলের বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

সেখ আবদুল্লা বলিয়া গিয়াছেন, দেশ বিভাগে বাঙ্গালা

ও কাশ্মীর বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তিনি ভারতবাসী-দিগকে বাঙ্গালীর আদর্শ গ্রহণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কাশ্মীর ইতোমধ্যেই জমীদার-প্রথার বিলোপ সাধন করিয়াছে—সে বিষয়ে ভারতের মত বিলম্ব করে নাই এবং কাশ্মীর কখনই ভারত রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না। এ বিষয়ে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী কিন্তু এখনও বিদেশের নির্দ্দেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন ; আর পাকিস্তানের মিষ্টার লিয়াকৎ আলী আশা করিতেছেন—গণমতের দ্বারা পাকিস্তানই কাশ্মীর রাজ্য লাভ করিবে।

শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতি-রক্ষা—

শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুর পরে তাঁহার আশ্রমের "মা" যে বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—

"তুমি আমাদিগের প্রভুর জড় আবরণ ছিলে—তোমার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞতা অসীম। তুমি আমাদিগের জন্য বহু কাজ করিয়াছ, সংগ্রাম করিয়াছ, বহু সহ্য করিয়াছ, আশা করিয়াছ, ত্যাগ স্বীকার করিয়াছ, বহু সাধনা করিয়াছ, আমাদিগের জন্য বহু সাফল্য লাভ করিয়াছ, আমরা তোমাকে প্রণাম করি—অনুনয় করি, যেন আমরা তোমার নিকট আমাদিগের ঋণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত না হই।"

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম হইতে শ্রীঅনিলবরণ রায় এক বিবৃতিতে জানাইয়াছেন, শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতি-রক্ষার বিষয়ে অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন। পৃথিবীর আত্মজ্ঞান পরিবর্ত্তন ও মনুষ্য জাতিকে দেবত্বে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা স্থায়ী করাই তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। পণ্ডীচেরীকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ভারতে এবং ভারতকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাই অভিপ্রেত। "যাহাতে অর্থাভাবে এই কার্য্য কখন ক্ষুণ্ণ না হয়, সেই জন্য আমি এক কোটি টাকার এক ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিতেছি। ঐ ভাণ্ডার শ্রীঅরবিন্দ স্মৃতি-ভাণ্ডার নামে অভিহিত হইবে। যাঁহারা এই মহৎ কার্য্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন—'মা'—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী (দক্ষিণ ভারত)—এই ঠিকানায় তাঁহাদিগের অর্থ সাহায্য প্রেরণ করেন।"

সমগ্র সভ্য জগতে শ্রীঅরবিন্দের ভক্ত-সংখ্যা বিবেচনা করিলে মনে হয়, এই আবেদন সফল হইবে।

মন্ত্রিমণ্ডল—

সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের মৃত্যুর পরে ভারত রাষ্ট্রের মন্ত্রিমণ্ডল পুনর্গঠিত হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বেই চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারীকে—কোন বিশেষ বিভাগের ভার না দিয়া—"জিয়াইয়া রাখা" হইয়াছিল। তাঁহাকেই স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী করা হইয়াছে। সর্দ্দারজী ডেপুটী প্রধান মন্ত্রীও ছিলেন। সে নাকি তাঁহার বৈশিষ্ট হেতু বিশেষ সম্মান হিসাবে। তাঁহার মৃত্যুতে সে পদের বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। মন্ত্রীরাও দুই শ্রেণীর—খাস মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রের মন্ত্রী। নিম্নে নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বিবিধ মন্ত্রীর ও তাঁহা-দিগের অধীন বিভাগের নাম প্রদত্ত হইল :—

জওহরলাল নেহরু—প্রধান মন্ত্রী এবং বৈদেশিক ও কমনওয়েলথ বিভাগের।

চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী—স্বরাষ্ট্র বিভাগের।

চিন্তামন দেশমুখ—অর্থ বিভাগের।

গোপালস্বামী আয়েঙ্গার—যানবাহন ও রাষ্ট্রসমূহ বিভাগের।

হরেকৃষ্ণ মহতাব—বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের।

এন, ভি, গ্যাডগিল—উৎপাদন, সরবরাহ ও নির্ম্মাণাদি বিভাগের।

শ্রীপ্রকাশ—প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের।

বলদেব সিংহ—দেশ-রক্ষা বিভাগের।

কে, এম, মুন্সী—খাদ্য ও কৃষি বিভাগের।

রফী আমেদ কিদোয়াই—সংযোগ বিভাগের।

রাজকুমারী অমৃত কাউর—স্বাস্থ্য বিভাগের।

জগজীবন রাম—শ্রমিক বিভাগের।

ডক্টর আম্বেদকার—আইন বিভাগের।

আর, আর, দিবাকর—সংবাদ ও বেতার বিভাগের।

কে, সন্থানম—যান বিভাগের।

অজিতপ্রসাদ জৈন—পুনর্ব্বসতি বিভাগের।

সত্যনারায়ণ সিংহ—পার্লামেন্টের ব্যাপার বিভাগের।

চারুচন্দ্র বিশ্বাস—সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বিভাগের।

বিশ্বাসে বিপদ—

বিশ্বাস যখন বিচার-বিবেচনার সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাহা অনায়াসে মানুষের বিপদের কারণ হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে জনরব প্রচার করিতে থাকে—উড়িস্যায় রণতলাই নামক স্থানে এক বালক বনজ লতাগুল্ম দিয়া সকল রোগ আরোগ্য করিতেছে। কোন না কোন লোকের স্বার্থসন্ধান এই প্রচারের মূলে ছিল কি না, জানা যায় নাই। কোন কোন সংবাদপত্রও প্রচারে সহায়তা করেন। ফলে নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক আরোগ্য কামনায় রণতলাইএ যাইতে থাকে। এখন দেখা যাইতেছে, তাহাতে সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে—৪ শত ২৪ জন ভিন্ন ভিন্ন রেল ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মেই মরিয়াছে! এক হাজার ৬ শত ৫৩ জনকে হাসপাতালে দিতে হয়। পথিপার্শ্বে কত লোক মরিয়াছে, তাহার নির্ভরযোগ্য হিসাব নাই। সঙ্গে সঙ্গে কলেরাবিস্তার-লাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, বহু অসুস্থ নরনারী রণতলাইএ গিয়াছিল—তাহারা অনেকেই কলেরায় মরিয়াছে।

উড়িষ্যা সরকার যে প্রথমাবধি সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা অনেক বিলম্বে ঔষধ যে ফলপ্রদ নহে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন এবং অবস্থা যখন ভয়াবহ হয়, তখন যাত্রীদিগকে আর ঐ স্থানে যাইতে দেন নাই।

উড়িষ্যার অভিজ্ঞতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপকৃত হইয়াছেন। বীরভূমের শঙ্করঘাটে স্নান করিয়া একটি সেতুর ভগ্নাবশেষ-মধ্যে দৈব ঔষধ পাওয়া যায়, এই জনরবে হাজার হাজার লোক তথায় সমাগম হইতে থাকে। শত করা ৮০ জন সে "ঔষধে" কোন উপকার পায় নাই। পশ্চিম বঙ্গ সরকার ঘোষণার দ্বারা লোককে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন—লোক যদি শঙ্করঘাটে গমনে নিরস্ত না হয়, তবে তাঁহারা আইনের বলে তথায় জন-সমাগম নিষিদ্ধ করিবেন। রণতলাইএর অভিজ্ঞতা যেন লোক উপেক্ষা বা অবজ্ঞা না করেন।

সিংহলে ভারতীয়—

সিংহল সরকার ভারতীয়দিগের সিংহলে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে সিংহলী নিয়োগের যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তদনুসারে ভারতীয়দিগের প্রতিষ্ঠানে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখের পরে যে সকল ভারতীয় চাকরী পাইয়াছে, তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে। বিতাড়নের পরে তাহারা সিংহলে আর চাকরী পাইবে না। এমন কি যাহারা ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখের পূর্ব্বে চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদিগকেও যে পরে, চাকরী ত্যাগে বাধ্য করা হইবে না—এমন কোন লিখিত প্রতিশ্রুতি সিংহলের মন্ত্রী মিষ্টার গুণীসিংহ দেন নাই। বিস্ময়ের বিষয়, সিংহলে ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি এই ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা স্বার্থরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়াই সে কাজ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে জাতির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিষ্টার ব্যাঙ্কার বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের দ্বারা ভারতীয় ব্যবসায়ী সমিতি সিংহল সরকারের সহযোগ লাভ করিবেন! সিংহল সরকারের নীতি—যে কাজের জন্য উপযুক্ত সিংহলী পাওয়া যাইবে না, কেবল সেই কাজেই বিদেশীয় নিযুক্ত করা চলিবে। সিংহল-ভারতীয়-কংগ্রেস ব্যবসায়ী-সমিতির এই কাজের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং সিংহলের চা-কর সমিতি ও সিংহল বণিক সমিতি সিংহল সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই।

সিংহল সরকার ভারতীয়দিগের সম্বন্ধে—নাগরিকের অধিকার দানে, বাসের ছাড় প্রদানে, বাট্টার ব্যাপারে—যে নীতি পরিচালন করিতেছেন, তাহা ভারতীয়দিগের পক্ষে কেবল অসুবিধাজনকই নহে—অসম্মানজনকও বটে।

এই অবস্থায় ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখের পরে নিযুক্ত ভারতীয়-বিতাড়নে ভারত সরকার ভারতীয় প্রজার স্বার্থরক্ষার্থ কি করিবেন?

"বনবালা" বার্থা—

ইংরেজ কবি বায়রণ বলিয়াছেন—"ইহা বিস্ময়কর হইলেও সত্য; কারণ, সত্য বিস্ময়কর—উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর।" মালয়ে সংঘটিত একটি ঘটনায় এই কথাই মনে হয়। গত বিশ্ব যুদ্ধে যখন জাপানীরা মালয় আক্রমণ করে, তখন এক ওলন্দাজ দম্পতি তাঁহাদিগের সাত বৎসর বয়স্কা কন্যাকে ফেলিয়া পলায়ন করেন। মুসলমান মহিলা আমিনা সেই পিতৃমাতৃত্যক্ত বালিকাকে কন্যাবৎ

[পা]লন করেন এবং আবাদী নামক এক মুসলমান যুবকের [স]হিত তাহার বিবাহ হয়। প্রায় সাত বৎসর পরে আমিনা [মা]নবালা বার্থাকে লইয়া সিঙ্গাপুরে যাইলে ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূত বার্থাকে দেখিয়া সন্দেহবশে স্বদেশে সংবাদ দেন। তখন বার্থার জননী কন্যাকে পাইবার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আদালত বার্থাকে তাহার মাতাকে প্রদানের আদেশ দেন। মুসলমান যুবকের সহিত বার্থার বিবাহ অসিদ্ধ বলা হয়। আমিনা আদালতের বিচারে বার্থাকে পাইতে পারেন নাই। বার্থাকে তাহার স্বদেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইলে মুসলমানরা তাহার প্রতিবাদ করে এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত ও নরহত্যা পর্য্যন্ত হয়। আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হইয়াছে এবং বার্থাকে বিমানে তাহার স্বদেশে লইয়া যাইয়া তাহার মাতার নিকট প্রদান করাও হইয়াছে। যে মাতা বিপদকালে কন্যাকে ফেলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার পরে দীর্ঘ সাত বৎসর তাহার সন্ধান কিরূপ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই, তিনিই কন্যাকে পাইয়াছেন। যিনি মাতৃস্নেহ দিয়া তাহাকে রক্ষা ও পালন করিয়াছিলেন তিনি কোন অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। মুসলমানের সহিত বার্থার বিবাহও আইনতঃ অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহা যে করুণ রসাত্মক ঘটনা তাহা বলা বাহুল্য। এখন কথা—বাল্যাবধি বার্থা যে জীবন যাপন করিয়াছে সে জীবন, আমিনার স্নেহ ও আবাদীর প্রেম—এ সব বার্থার পক্ষে স্বপ্ন—দুঃস্বপ্ন হইয়া থাকিবে? না—সে সকলের জন্য সে বেদনা বোধ করিবে? সে তাহার জননীর ব্যবহারে এবং যদি তাহার আবার বিবাহ হয় তবে স্বামীর ভালবাসায় ও সন্তানের স্নেহে কি তাহার অতীত বিস্মৃত হইতে পারিবে?

কোরিয়া—

সাম্রাজ্যমদমত্ত ঔরঙ্গজেব নবজাগ্রত মহারাষ্ট্রশক্তিকে "পার্ব্বত্যমূষিক" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া যেমন বিব্রত হইয়াছিলেন, কোরিয়ার মত ক্ষুদ্র দেশের মাত্র একাংশের অধিবাসীদিগকে তেমনই তুচ্ছ মনে করিয়া কি আমেরিকার তেমনই হইল? আমেরিকা কোরিয়ার গৃহ-যুদ্ধে—জাতিসঙ্ঘ পরিষদের সম্মতিলাভেরও পূর্ব্বে—আপনাকে জড়িত করিয়া মনে করিয়াছিল, তাহার ধনবল তাহাকে জয়ী করিবে। বাধা পাইয়া সে আণবিক বোমা ব্যবহার করিবে—এমন ভয়ও দেখাইয়াছিল। কিন্তু ঈশপের উপকথার একচক্ষু হরিণ যেমন স্থলের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিল—জলপথ হইতে বিপদ লক্ষ্য করিতে না পারিয়া বিপন্ন হইয়াছিল, কার্য্যকালে আমেরিকার তাহাই হইয়াছে। চীনের বিপুল বল তাহার সম্মুখীন হইয়াছে।

দীর্ঘ একাদশ দিনের প্রাণান্ত চেষ্টায় সম্মিলিত জাতির বাহিনী গত ২৫শে ডিসেম্বর—"বড়দিনে" পশ্চাদপসরণ করিয়া যে স্থান হইতে যুদ্ধ যাত্রা হইয়াছিল, তথায় ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে। প্রকাশ—একাদশ দিনের চেষ্টায় এক লক্ষ ৫ হাজার সৈনিক, এক লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী, ১৭ হাজার ৫ শত যান, ৩ লক্ষ ৫০ হাজার সমরোপকরণ সরাইয়া আনা সম্ভব হইয়াছে। ইহাতে উল্লাস প্রকাশ করিয়া পরাজয়ের গ্লানি গোপন করার চেষ্টা হইতেছে। অবশ্য যুদ্ধে সময় সময় এমন হয় এবং ডানকার্কের পরেও বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার নিকট এই আঘাতপ্রাপ্তি যে আমেরিকার পক্ষে গৌরব-জনক বলা যায় না, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এদিকে মীমাংসার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য চীনের যে প্রতিনিধিরা আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা আমেরিকা ত্যাগের পূর্ব্বে তিন জনে গঠিত সমিতির দ্বারা "যুদ্ধ বিরতির" বিষয় স্থির করিবার প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, তাঁহারা চাহিয়াছেন:—

(১) কোরিয়া হইতে সকল বিদেশী বাহিনীর অপসারণ করিতে হইবে;

(২) সম্মিলিত জাতিসমূহকে চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে;

(৩) কায়রোয় ও পটসড্যামে যে বলা হইয়াছিল—ফরমোসা চীনা সরকারের, তাহারই সুস্পষ্ট পুনরুক্তি করিতে হইবে।

চীনা প্রতিনিধিরা বলিয়াছিলেন, তাঁহারা কোরিয়ার যুদ্ধে আমেরিকার হস্তক্ষেপ সম্পর্কে রুশিয়ার অভিযোগ আলোচনা করিবার জন্যই আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তাহা যখন হইল না, তখন তাঁহাদিগের আর আমেরিকায় থাকিয়া কোন ফল হইবে না। "যুদ্ধ-বিরতি" সম্বন্ধীয়

প্রস্তাব—চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল; কিন্তু তাহার শেষাংশ ত্যক্ত হওয়ায় চীন আর সে প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দিতে পারে না। চীনা-প্রতিনিধিরা বলিয়াছেন, এ অবস্থায় "যুদ্ধ বিরতির" প্রস্তাব কেবল আমেরিকাকে সুবিধাদানের চেষ্টায় ফাঁদ পাতা। চিয়াংকাই-শেক এইরূপ কার্য্য পূর্ব্বেও করিয়াছেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের সহিত বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রী এটলীর আলোচনাফলে জানা গিয়াছে, বৃটেন ও ভারত রাষ্ট্র যে বলিয়াছে—চীনা কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লওয়া হউক, আমেরিকা তাহাতে সম্মত নহে; কারণ তাহাতে ফরমোসায় চীনের অধিকার স্বীকার করিতে হয় এবং ম্যাকআর্থার বলিয়াছেন—প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার আত্মরক্ষার জন্ম ফরমোশায় তাহার ঘাঁটী প্রয়োজন।

এদিকে আমেরিকা চীনের সব টাকার লেনদেন বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং উভয় দেশে বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং কোরিয়ার যুদ্ধ হইতে বিশ্বযুদ্ধের নূতন আবির্ভাব ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আমেরিকান বাহিনীর সেনাপতি জেনারল ওয়াল্টন ওয়াকার যান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। সেনাদলের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মৃত্যু (২৩শে ডিসেম্বর) শোকাবহ ঘটনা।

তিব্বত ও নেপাল—

ভারত-রাষ্ট্রের সীমান্তে তিব্বতে ও নেপালে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। উভয় দেশের সংবাদই স্বল্প এবং বিভ্রান্তকর। প্রথমে জনরব যাহা প্রকাশ করিয়াছিল, শেষে তাহাই সত্য প্রতিপন্ন হইয়াছে—তিব্বতের দলাই-লামা নেপালের রাণা ত্রিভুবনের মত ভারত রাষ্ট্রে আসিয়া আশ্রয় লইতেছেন। দালাই-লামার মাতা পূর্ব্বেই ভারত যাত্রা করিয়াছিলেন। চীনা বাহিনী দ্রুত রাজধানী লাসার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং তাহাই দালাই-লামার রাজধানী ত্যাগের প্রত্যক্ষ কারণ।

তিব্বতে চীনের অধিকার ইংরেজ অস্বীকার করেন নাই—ইংরেজের রাজনীতিক উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান ভারত-সরকারও তাহা করেন নাই; তাঁহারা ইংরেজ সরকারের সন্ধি সর্ত্ত প্রভৃতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন—সুতরাং সে সকল মানিতে বাধ্য। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন—চীনে কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য-হেতু ঘটিয়াছে। তিব্বত ভারত ও কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্যে যাহাকে "বাফার" বলে তাহাই। তিব্বত যদি কম্যুনিষ্ট চীনের প্রত্যক্ষ অধীন হয়, তবে আর সে ব্যবধান থাকিবে না। চীন কোরিয়ার ব্যাপারে সম্মিলিত জাতিসমূহকে যেরূপ উত্তর দিয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায়—আপনার শক্তিতে তাহার আস্থা অল্প নহে। আর হয়ত সে মনে করিতেছে, মতবাদে সাম্যতাহেতু সে রুশিয়ার নিকট আবশ্যক সাহায্য, প্রয়োজন হইলেই, পাইতে পারিবে। রুশিয়ার মনোভাব কি, তাহা এখনও রহস্য হইয়া রহিয়াছে বলিলে তাহা অসঙ্গত হইবে না। তিব্বত যে চীনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভের কোন আশা করিতে পারে না, তাহা তিব্বতই স্বীকার করিয়াছে এবং সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নিকট সাহায্য বা বিচার চাহিয়াছে। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ সে বিষয়ে কি করিবেন, বলা যায় না। তাহার প্রধান কারণ, কোরিয়ায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে দূরবর্ত্তী—বিশেষ দুর্গম স্থানে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে বিশেষ বিবেচনা করিতে হইবে। বিশেষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে বৃটেনের স্বার্থ এখন আর প্রত্যক্ষ নহে—ভারতরাষ্ট্র কমনওয়েল্থভুক্ত বলিয়া সে স্বার্থ এখন পরোক্ষ।

নেপালের সংবাদও আশাপ্রদ নহে। রাণাগোষ্ঠীর মধ্যেও মতভেদ লক্ষিত হইতেছে এবং যে স্থলে গৃহেই মতভেদ থাকে, তথায় জয়ের আশা সুদূরপরাহত। নেপালে নেপালী কংগ্রেসের বাহিনী যে পরাভূত না হইয়া জয়ের পরিচয় দিতেছে, তাহাতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, রাণাগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত সরকার দেশের লোকের সহযোগ ও সাহায্য লাভের আশা করিতে পারিতেছে না।

ভারত সরকারের সহিত আলোচনার পরে নেপালী সরকারের প্রতিনিধিরা নেপালে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তথায় আলোচনার পরে নেপালের পররাষ্ট্র-সচিব বিজয় সমশের জং বাহাদুর রাণা নেপালে ভারত সরকারের

রাষ্ট্র-দূতের সহিত গত ২৫শে ডিসেম্বর (৯ই পৌষ) দিল্লীতে উপনীত হইয়াছিলেন।

প্রকাশ, রাণারা নেপালে শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে ১০ জন রাণা পদত্যাগ করিয়াছেন—ইঁহারা সরকারের নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শুনা যাইতেছে, রাণাগোষ্ঠী অর্থাৎ রাণাগোষ্ঠীর অধিকাংশ ভারত সরকারের প্রস্তাবানুসারে তথায় ক্রমে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু রাজা ত্রিভুবনকে রাজা স্বীকার করিয়া লইতে তাঁহারা সম্মত হইতে পারেন নাই। অথচ ভারত সরকার তাঁহাকেই নেপালের রাজা স্বীকার করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই প্রস্তাবেই মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে কি না, বলা যায় না। রাণারা সম্মত হইলেও রাজা ত্রিভুবন নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন নিরাপদ মনে করিবেন কি না, কে বলিবে? নেপালের ব্যাপার যখন আন্তর্জ্জাতিক, তখন ভারত সরকার একক তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না!

১৫ই পৌষ, ১৩৫৭

সাংবাদিক অরবিন্দ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিকের অধ্যাত্মসাধনার গৌরব যে তাঁহার সাংবাদিক-জীবনের কৃতিত্ব ম্লান করিয়াছে এবং উত্তরোত্তর আরও করিবে, তাহাতে

ধ্যানযোগী শ্রীঅরবিন্দের মহাসমাধি

সন্দেহ নাই। কারণ, সাংবাদিক তাঁহার সময়ের এবং সেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিস্মৃতির অতলতলে অদৃশ্য হইয়া থাকেন—শক্তিশালী সাংবাদিক অল্পদিনেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইয়া থাকেন। কিন্তু কবির, ঐতিহাসিকের, দার্শনিকের কথা জাতির আদরের। এই জন্য আজ অরবিন্দের সাংবাদিক জীবনের পরিচয় দিতেছি।

উড়িষ্যার সকল বিরাট মন্দিরের চারিটি ভাগ আছে—একটি হইতে আর একটিতে যাইতে হয়—ভোগ মন্দির, নাট মন্দির, জগমোহন ও দেউল। তেমনই বিদেশ হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অরবিন্দ এ দেশে আসিবার পরে তাঁহার কর্ম্ম-জীবন চারিভাগে বিভক্ত করা যায়—সাহিত্য-সাধনা ও শিক্ষাদান, রাজনীতি-চর্চ্চা, সংস্কৃতি পরিচয় ও আধ্যাত্মিক সাধনা—দর্শন।

অরবিন্দ যখন বরদার শিক্ষক তখন তাঁহার সাহিত্য-সাধনা কবিতায় ও সমালোচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাহার পরে তিনি যখন "স্বদেশী আন্দোলন" নামে পরিচিত স্বাধীনতা-আন্দোলনের সময় কলিকাতার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়া কলিকাতায় আসেন এবং লোক-শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া স্যাংবাদিকের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করেন, তখন তিনি প্রগতিপন্থী দলের মুখপত্র 'বন্দেমাতরমের' সম্পাদক-মণ্ডলীতে যোগ দেন এবং সেই মণ্ডলীর মণ্ডলেশ্বর হইয়া উঠেন।

কংগ্রেস তখন দেশে একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। যদিও ইংরেজ হিউম বৃটিশ শাসনে ভারতের অধিবাসীদিগের রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার উগ্রতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে—যাহাকে "সেফ্‌টি ভ্যাল্‌ভ" বলে সেইরূপে—কংগ্রেসের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তথাপি তাহা অল্পকালমধ্যেই শক্তিশালী হইয়া উঠে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে—ইলবার্ট বিলকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন হয় তাহার প্রত্যক্ষ ফলে—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দ কংগ্রেসের অবলম্বিত "নিবেদন ও আবেদন" নীতির বিরোধী হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রে প্রবন্ধ লিখিতে

আরম্ভ করেন। সে সকলে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন—তৎকালীন কংগ্রেসকে গণ-প্রতিষ্ঠান বলা যায় না, কংগ্রেসের নেতারা বৃটিশ ভক্তি করিয়া ভুল করিতেছিলেন এবং ভারতীয় দেশভক্তের পক্ষে রাজনীতিতে বৃটিশের নিকট শিক্ষালাভ না করিয়া ফরাসীদিগের নিকট শিক্ষালাভ করাই সঙ্গত। এই সকল প্রবন্ধের ভাষা ও যুক্তিতে মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা ভয় পাইয়া 'ইন্দুপ্রকাশ' সম্পাদককে প্রবন্ধগুলির সুর নামাইতে বলিলেন। অরবিন্দ তাহাতে বিরক্ত হইয়া শেষ প্রবন্ধগুলি আর লিখিলেন না। এই সময় তিনি ঐ পত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে সাতটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেগুলিও জাতীয়ভাবে পূর্ণ।

বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইল। বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। সন্ধিক্ষণের সন্ধান পাইয়া অরবিন্দ তাঁহার বন্ধু চারুচন্দ্র দত্ত ও সুবোধচন্দ্র মল্লিকের আমন্ত্রণে কলিকাতায় আসিলেন এবং বরদার মহারাজার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কলিকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইলেন।

বাঙ্গালায় তখন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব নবজাগরণের প্রচারপত্র 'সন্ধ্যা' প্রচারিত করিতেছেন। "ডন সোসাইটীর" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংস্কৃতির দিক হইতে সম্প্রদায় গঠন করিতেছেন। বাঙ্গালায় যাহাকে "ফিজিক্যাল ফোর্স মুভমেণ্ট" বলে তাহা আরম্ভ হইয়াছে। কংগ্রেসেও তখন দুই দল—পুরাতনপন্থী ও প্রগতিপন্থী। প্রগতিপন্থীরা কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহা জাতীয়তায় সঞ্জীবিত করিতে আগ্রহশীল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রের অধিবেশনে প্রগতিপন্থীদিগের অস্তিত্ব সপ্রকাশ হইয়াছিল। বাঙ্গালায় জাতীয় দলের—ভারতের সকল স্থানে প্রচারের জন্য—মুখপত্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া কয়জন বন্ধুর প্রয়োচনায় বিপিনচন্দ্র পাল পর বৎসর 'বন্দে মাতরম্' পত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যৎসামান্য অর্থ, অসীম উদ্যম ও অনন্যসাধারণ আশা লইয়া এই পত্র প্রচারিত হয় এবং প্রথমে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইহার পরিচালনদায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিপিনচন্দ্রের ও ব্রহ্মবান্ধবের আগ্রহে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও আমি বিপিনচন্দ্রের সহকর্ম্মী হই। পত্র-প্রকাশ করিয়াই বিপিনচন্দ্র শ্রীহট্টে গমন করেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে অরবিন্দকে তাঁহার স্থানে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। অরবিন্দের মতানুসারে 'বন্দেমাতরম' পত্র পরিচালনের ভার প্রগতিপন্থী দল গ্রহণ করেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাঁহাদিগের পুরোভাগে ছিলেন।

তখন 'বন্দেমাতরম' পত্রের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা হয়।

অরবিন্দ আশ্রম হইতে প্রকাশিত বিবরণে লিখিত হইয়াছে :—

"নূতন (রাজনীতিক) দল অচিরে সাফল্য লাভ করিল এবং 'বন্দেমাতরম' ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। 'বন্দেমাতরমের' লেখকদিগের মধ্যে কেবল বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীঅরবিন্দই থাকিলেন না—আরও কয় জন সুলেখক তাহাতে যোগ দিলেন—শ্যামসুন্দরচক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিজয় চট্টোপাধ্যায়।"

রমেশচন্দ্র দত্ত সম্বন্ধে 'কর্ম্মযোগিন' পত্রে লিখিতে যাইয়া অরবিন্দ সাংবাদিকের ধর্ম্ম কি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন :—
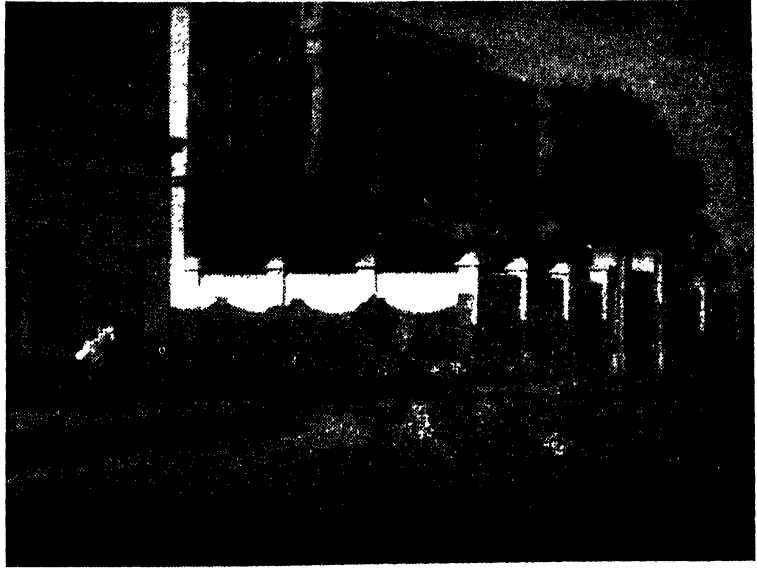
শ্রীঅরবিন্দের আশ্রম বাটী

"যে উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, তাহাই লইয়া—সে সকলের মধ্যে যাহা চিত্তাকর্ষক ও ফলপ্রদ হইবে তাহা অবলম্বন করিয়া সুস্পষ্টরূপে ও বলিষ্ঠভাবে মত ব্যক্ত করা সাংবাদিকের ধর্ম্ম।"

সাংবাদিকরূপে অরবিন্দ এই ধর্ম্ম নিষ্ঠাসহকারে অনুষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। 'বন্দে মাতরম' ও 'কর্ম্মযোগিন' পত্রদ্বয়ে তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে সেই ধর্ম্ম সর্ব্বত্র সপ্রকাশ।

সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার উপকরণের অভাব সেই বিক্ষোভের সময় কখনও হয় নাই; তাঁহার ভাব ও মত সুস্পষ্ট ও অকুণ্ঠিত; তাঁহার ভাষা শক্তিশালী ও অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক।

তাঁহার ভাষাপ্রয়োগকৌশল কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয়ের একটি দৃষ্টান্ত দিব। তিনি যখন বোমার মামলায় অভিযুক্ত, তখন সরকার-

পক্ষের ব্যবহারাজীব ব্যারিষ্টার নর্টন তাঁহার মনোভাব বুঝাইবার জন্ত 'বন্দেমাতরমে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করিলে বিচারক বীচক্রফট্ যখন জিজ্ঞাসা করেন, প্রবন্ধটি যে অরবিন্দের লেখনীপ্রসূত তাহার প্রমাণ কি—তখন নর্টন বলেন, "উহা পাঠ করিবার সময় আমাকেও অভিধান দেখিতে হইয়াছে।" নর্টন ইংরেজ—ইংরেজী তাঁহার মাতৃভাষা; অরবিন্দ বাঙ্গালী।

অরবিন্দের উদ্দেশ্য—দেশ স্বাধীন করা। সেজন্ত যে উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, তিনি তাহাই অবলম্বনের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্ত তিনি হিংসার পথ বর্জ্জন করিতেও বলেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতক যদি দণ্ডিত না হয়, তবে কর্ম্মীদিগের ঐক্য ও একাগ্রতা ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বাসঘাতক

চিহ্নিত বারাণ্ডাটির অন্তরালে শ্রীঅরবিন্দ নিয়মিত পদচারণ করিতেন

সম্বন্ধে তাঁহার মত কিরূপ ছিল, তাহা কারাগারে কানাইলাল দত্ত কর্ত্তৃক নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যা সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধে পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। সে প্রবন্ধ অরবিন্দের লিখিত নহে। তিনি তখন কারাগারে। তাহা তাঁহার অনুমোদনে বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

"কানাই নরেন্দ্রকে হত্যা করিয়াছে। যে হীন ভারতীয় তাহার দেশের শত্রুর হস্ত চুম্বন করিবে, সে আর আপনাকে প্রতিহিংসার আঘাত হইতে নিরাপদ মনে করিবে না। প্রতিশোধকারীর ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে কানাইএর নাম লিপিবদ্ধ করিবে। যে মুহূর্ত্তে কানাই (নরেন্দ্রকে হত্যা করিবার জন্ত) প্রথম গুলি ছুড়িয়াছিল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার দেশের আকাশে এই ধ্বনি ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে—'সাবধান! বিশ্বাসঘাতকের পরিণাম সম্বন্ধে সাবধান!'"

সেদিন ইহাই দেশের লোকের মনের ভাব ছিল। সেই ভাবের আবেগ "পঞ্চানন্দ"রূপী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার ব্যঙ্গ রচনায় কানাইকে দুষ্কৃতবিনাশকারী শ্রীকৃষ্ণের ও বিপ্লবীদিগের আশ্রমকে বৃন্দাবনের সহিত তুলিত করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল:—

"দ্বাপরে কানাই ছিল নন্দের নন্দন,
কলিতে তাঁতীর কুলে দিল দরশন।
তাহারে ছলিয়াছিল অক্রূর গোঁসাই;
গোঁসাইকে কানাই দিল বৃন্দাবনে ঠাঁই।
গোঁসাই হল গুলীখোর, কানাই নিল ফাঁসী—
কোন্ চোখে বা কাঁদি—বল কোন্ চোখে বা হাসি?"

সাংবাদিক অরবিন্দের বক্তব্যের অভাব কখন হয় নাই। কারণ, তিনি জাতিকে তাঁহার পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইতে দান করিবার জন্যই সাংবাদিকের কার্য্য সাগ্রহে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সংবাদপত্র তাঁহার প্রচারবেদী ও ভাব ব্যক্ত করিবার মঞ্চ ছিল। তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে বলিয়াছিলেন:—

"আজ ভারতে এক নূতন ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে—তাহা জাতীয়তা নামে অভিহিত—সে ধর্ম্ম তোমরা বাঙ্গলা হইতে পাইয়াছ।"

বাঙ্গালার গোমুখীমুখে যে জাতীয়তার পাবনী ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে বাঙ্গালার তরুণ প্রতিনিধিরা "বয়কট" কংগ্রেসের সমর্থন-ঘোষণা চাহিয়াছিলেন। "বয়কট" কথাটির উদ্ভব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আয়ার্লণ্ডে প্রজাদিগের দ্বারা জমীদারের কর্ম্মচারী ক্যাপ্টেন বয়কটকে "একঘরে" করায়। তাহারও পূর্ব্বে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী লেখক ভোলানাথ চন্দ্র এ দেশে বিদেশী পণ্যের প্রচলনাধিক্য লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—কোনরূপ বাহুবল প্রয়োগ না করিয়া, কোন আইন না চাহিয়া আমরা আবার শিল্পে সমৃদ্ধ হইতে পারি—আমরা বিলাতী পণ্য ব্যবহার করিব না, আমরা এই সঙ্কল্প করিতে পারি। কিন্তু সে "বয়কট" অর্থনীতিক কারণে। লর্ড কার্জ্জন যখন বাঙ্গালীর মত পদদলিত করিয়া বঙ্গবিভাগে কৃতসঙ্কল্প হ'ন, তখন 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র রাজনীতিক কারণে বৃটিশ পণ্য

বর্জনের প্রস্তাব করেন। বারাণসীতে বাঙ্গালী তরুণরা "বয়কটের" সমর্থন চাহিলে কংগ্রেসের কর্তারা তাহাতে অস্বীকৃত হ'ন এবং বাঙ্গালী তরুণরা কংগ্রেসে ইংলণ্ডের যুবরাজ ও তাঁহার পত্নীর আগমনে সম্বর্দ্ধনা-প্রকাশক প্রস্তাবে আপত্তি করিবার ভয় দেখাইলে একটা আপোষ হয়। পরবর্ত্তী অধিবেশন কলিকাতায়। তাহাতে বাঙ্গালার প্রগতিপন্থীদল বহুমতে "বয়কট", স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা ও স্বদেশী সম্বন্ধে মনোমত প্রস্তাব গ্রহণ করাইয়াছিলেন এবং সুরাটে প্রাচীনপন্থীরা সেই সকল প্রস্তাব ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টায় কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। অরবিন্দ সংবাদ-পত্রে নৈপুণ্যসহকারে যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া "বয়কট" সমর্থন করিয়াছিলেন—সে সকল সত্যই স্মরণীয়। দিনের পর দিন সমগ্র ভারতে পাঠকগণ অরবিন্দের সেই সকল প্রবন্ধের প্রকাশ প্রতীক্ষা করিতেন।

প্রতিবাদে অরবিন্দ যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। 'ইণ্ডিয়ান নেশান' পত্রের সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের তার্কিক ও ইংরেজী লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি জাতীয়তা সম্বন্ধে 'বন্দেমাতরম' পত্রে প্রচারিত মতের প্রতিবাদ করিলে অরবিন্দ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রনাথ শেষে নিরুত্তর হইয়াছিলেন।

এই স্থলে আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। তখন স্কচদিগের বার্ষিক ভোজে (সেণ্ট এণ্ড্রুজ ডিনার) বহু ইংরেজের রাজনীতিক মত প্রচারের সুযোগ ছিল। ভারতীয়গণ লর্ড রিপনকে যেরূপ সম্বর্দ্ধনায় সম্মানিত করিয়াছিলেন—বড়লাট লর্ড ডাফরিন সেইরূপ সম্বর্দ্ধনা লাভের অভিপ্রায়ে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোমোহন ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের নিকট গোপনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হতাশ হইয়া তিনি ঐ ভোজে কংগ্রেসকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষে ইংরেজ নর্টন সে আক্রমণের উত্তর দিয়াছিলেন। তেমনই বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য সার হার্ভি এডামশন ঐ ভোজে এ দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে অযথা আক্রমণ করেন—সেগুলি অর্থলাভের জন্য পরিচালিত হয় এবং যাঁহারা সে সকল পত্র পরিচালিত করেন, তাঁহাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি অধিক নহে। অরবিন্দ এই ধৃষ্ট উক্তির যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা কশাঘাতেরই মত। তিনি প্রথমে বলেন, যে সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে না, সে সকল কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করিয়া পরিচালিত করিতে হয়, তাহা বক্তা সেই শ্রেণীর যে কোন পত্রের কার্য্যালয়ে আসিলে বুঝিতে পারিবেন। আর—যাঁহারা ঐ সকল পত্র পরিচালনা করেন, তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের এক কোণে যে জ্ঞান-সম্পদ আছে, তাহা সার হার্ভির মস্তকের সমগ্র খুলির মধ্যে নাই।

মনে পড়ে, কোন কোন দিন তিনি আপনার টেবল ছাড়িয়া আসিয়া শ্যামসুন্দরের বা আমার টেবলের কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "সব লেখা কি হয়ে গিয়েছে?"—"কিছু লিখবেন?"—জিজ্ঞাসা করিলে, "হাঁ—লেখা পাচ্ছে" বলিয়া লিখিবার "প্যাড" তুলিয়া লইতেন—কলম লইয়া দণ্ডায়মান অবস্থায়ই হয়ত একটি "প্যারা" লিখিতেন। তাহার জ্বালায় হয়ত 'ইংলিশম্যান' দুই দিন জ্বলিতেন এবং আক্রমণ-চেষ্টায় সে জ্বালা প্রকাশ পাইত। 'ইংলিশম্যানের' মিষ্টার নিউম্যান পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরিয়া আসিয়া প্রবন্ধে "গুপ্তীর" (তরবারগর্ভ লাঠি) স্থানে "গুমটী" ও "বরিশাল কটাক্ষ" লিখিলে অরবিন্দ "নিউম্যানিয়া" শিরোনামায় ঐরূপ একটি "প্যারায়" লিখিয়াছিলেন—"From measles and maniacs good Lord deliver us."
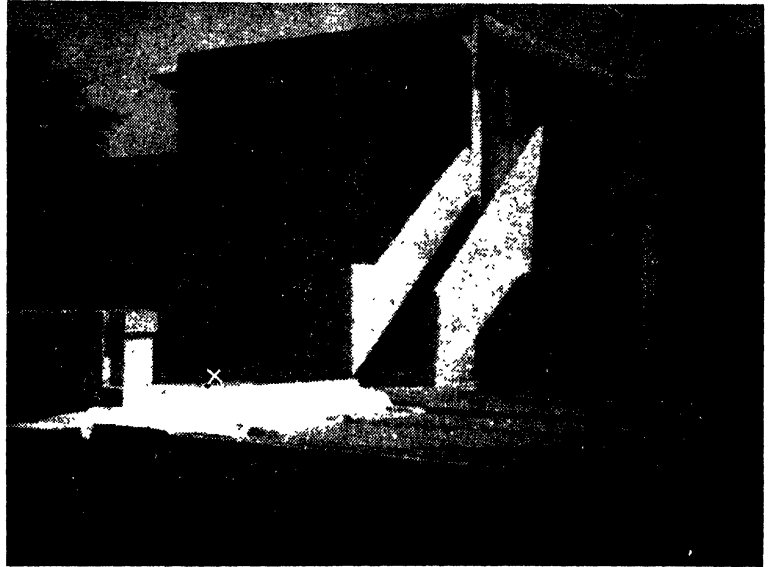
সম্মুখের ব্যালকনির সোপানশ্রেণী বাহিয়া শ্রীমা প্রতিদিন নামিয়া আসেন এবং তারকা চিহ্নিত স্থানটিতে দাঁড়াইয়া দর্শকগণকে দর্শনদান করেন

অরবিন্দ নানা দেশের ইতিহাসে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বা তুলনার জন্য সে সকলের ঘটনা ব্যবহার করিতেন। হিংসার দ্বারা হিংসা প্রহত করার সমর্থনে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"রুশিয়ার মত যে স্থানে হত্যা বা উৎকট অত্যাচারের দ্বারা লোককে

স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা হয় সে স্থানে যেমন, পূর্ব্বে আয়ার্লণ্ডে যে ভাবে বর্ব্বরোচিত চণ্ডনীতির দ্বারা লোকের স্বাধীনতাহানি করা হইত যে স্থানে সেইরূপ হয়; তথায়ও তেমনই হিংসার আক্রমণ হিংসার দ্বারা প্রহত করা সমর্থনীয় ও স্যায়সঙ্গত।"

অরবিন্দ সংবাদপত্রে পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছিলেন—রাজনীতি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য—ব্রাহ্মণের নহে এবং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তিনিই অস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন—যুদ্ধ পাপ নহে।

অরবিন্দের পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন—গৃহস্থের ধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম এক নহে, কেহ একটি চড় মারিলে তাহাকে দশটি চড় মারিবার ব্যবস্থা করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য, অন্যায় করিও না, কিন্তু অন্যায় সহ্য করিও না—তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে তারিখে পঞ্জাবে লালা লজপাত রায় ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে সরকার গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করেন। সেদিন কলিকাতায় একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা বৈশাখ-দিনান্তের আকাশে মেঘের মত বোধ হইতেছিল। পুলিস কলিকাতায় কতকগুলি লোকের বাড়ী চিহ্নিত করিয়াছিল: সেগুলিতে হাঙ্গামা করিবার অভিপ্রায় যে তাহাদিগের ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই, সে সংবাদ আমরা পরে পাইয়াছিলাম। নিশীথে পঞ্জাবে গ্রেপ্তারের সংবাদ 'বন্দেমাতরম' কার্য্যালয়ে আসিলে নৈশ-সম্পাদকের কার্য্যে রত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় টেলিগ্রাম লইয়া সুবোধচন্দ্র মল্লিকের গৃহে সুপ্ত অরবিন্দের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আলোক জ্বালিলে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। অরবিন্দ বিরক্ত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই বিনয় তাঁহার হস্তে টেলিগ্রাম দিলে তিনি কাগজ ও পেন্সিল চাহেন। বিনয় কাগজ পেন্সিল লইয়া গিয়াছিলেন। অরবিন্দ শয্যায় উপবিষ্ট অবস্থায় "প্যারা" লিখিয়া দিলেন। তাহার মর্ম্মানুবাদ:—

"লর্ড মর্লির সহানুভূতিপূর্ণ শাসন যতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহা হইল—কিন্তু সে কেবল সাময়িকভাবে। লালা লজপত রায় বৃটিশাধিকৃত ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। টেলি-গ্রামে প্রকাশ, চারি দিনের জন্য এই ঘটনায় রোষব্যঞ্জক সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে। রোষব্যঞ্জক সভা? বক্তৃতার ও সুষ্ঠু রচনার কাল অতীত হইয়াছে। আমলা-তন্ত্রের সমরাহ্বান ধ্বনিত হইয়াছে। আমরা সেই আহ্বানে (তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে) অগ্রসর হইব। পঞ্জাববাসী—সিংহের জাতি, এই যে সকল লোক তোমাদিগকে ধূলিসাৎ করিতে চাহে, ইহাদিগকে দেখাইয়া দাও যে, ইহারা একজন লজপত রায়কে লইয়া গিয়াছে তাঁহার স্থানে শত শত লজপতের আবির্ভাব হইবে। শতগুণ উচ্চৈঃস্বরে তোমাদিগের সমরাহ্বান তাহাদিগের কর্ণে ধ্বনিত হউক—'জয় হিন্দুস্থান'!"

শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমের ভিতর-প্রদেশ—তারকা চিহ্নিত স্থানটিতে মহাযোগীর মহাসমাধি রচিত হইয়াছে

অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রে (১৯০৭ খৃষ্টাব্দ) "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন- তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম" মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধ কি ভাবে লিখিত হইয়াছিল, তাহা বলিলে অরবিন্দের রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে। "বন্দেমাতরম সম্প্রদায়" বঙ্কিমোৎসবে কাঁটালপাড়ায় যাইবার আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষে অরবিন্দ প্রস্তাব করেন, 'বন্দে-মাতরম' পত্রের জন্য আমি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা ও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলে কেমন হয়? আমি ব্যবস্থার অনুমোদন করি এবং পরদিন আমার ও অরবিন্দের রচনা ছাপিতে দেওয়া হয়। অরবিন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ মনোজ্ঞ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে সরকার 'বন্দেমাতরম' পত্রে প্রকাশিত কোন রচনার জন্য মামলা রুজু করেন। মামলায় সম্পাদক বলিয়া অরবিন্দকে, মুদ্রাকর অপূর্ব্বকৃষ্ণ বসুকে ও কার্য্যাধ্যক্ষ বলিয়া হেমচন্দ্র বাগচীকে আসামী করা হয়। ১৬ই আগষ্ট অরবিন্দ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে ২৫০০ টাকার জন্য দুই জনের জামিনে মুক্তি দিবার আদেশ হয়

এবং পুলিস 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের ও 'কুন্তলীন' কেশ-তৈলের অধিকারী হেমেন্দ্রমোহন বসুর জামিন লইতে অস্বীকার করায় বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসুর ও নীরোদবিহারী মল্লিকের জামিনে তাঁহাকে মুক্তি দেয়।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর দ্বিতীয় পুত্র যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু 'বন্দেমাতরমের' সুহৃদ্ ছিলেন। তিনি একদিন—সকলের অজ্ঞাতে 'বন্দেমাতরমে' অরবিন্দের নাম প্রধান সম্পাদক বলিয়া প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অরবিন্দের নির্দ্দেশে আর কোন দিন তাহা প্রকাশিত হয় নাই। ঐ এক দিনের সুযোগ পুলিস লইয়া অরবিন্দকে সম্পাদক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। বিচারে অরবিন্দ প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন।

তখন অরবিন্দের খ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হয় এবং সেই সময় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার
বাণীমূর্ত্তি তুমি। তোমা লাগি' নহে মান,
নহে ধন, নহে সুখ ; কোন ক্ষুদ্র দান
চাহ নাই, কোন ক্ষুদ্র কৃপা ; ভিক্ষা লাগি'
বাড়াওনি আতুর অঞ্জলি। আছ জাগি'
পরিপূর্ণতার তরে সর্ব্ববাধাহীন,—
যার লাগি' নর-দেব চির রাত্রি দিন
তপোমগ্ন ; যার লাগি কবি বজ্ররবে
গেয়েছেন মহা গীত, মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট-যাত্রায় ; যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে ;
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয় ; সেই বিধাতার
শ্রেষ্ঠ দান আপনার পূর্ণ অধিকার—
চেয়েছ দেশের হ'য়ে অকুণ্ঠ আশায়,
সত্যের গৌরবদৃপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায়
অখণ্ড বিশ্বাসে।" * * *
* * *
শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝাসাথে সিন্ধুর গর্জ্জন
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্ত্তন
পাষাণ পিঞ্জরে টুটি',—বজ্র গর্জ্জরব
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" ইত্যাদি।

রাজনীতিক কার্য্যে রবীন্দ্রনাথের দান কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার্য্য। কিন্তু তিনি বহু বিষয়ে অরবিন্দের সহিত একমত ছিলেন না। সেই জন্য তিনি "বয়কট" ঘৃণাদ্যোতক বলিয়া নিন্দা করিলে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

"A poet of sweetness and love, who has done much to awaken Bengal, has written deprecating the boycott as an act of hate."

কিন্তু "বয়কট" ঘৃণা নহে—ইহাকে ঘৃণাদ্যোতক বলিলে বুঝায়—যে ব্যক্তিকে হত্যা করা হইতেছে তাহার হত্যাকারীকে আঘাত করিবার অধিকার নাই! "বয়কট"—আত্মরক্ষার্থ, আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য আক্রমণ। কিন্তু অরবিন্দের ত্যাগ, নিন্দা, দেশপ্রেম কবির প্রশংসা আকৃষ্ট করিয়াছিল। সাংবাদিক অরবিন্দের কার্য্য তিনি যে "স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্ত্তি" বলিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ এবং আমরা যেন অরবিন্দের দার্শনিক রচনায় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সাংবাদিক কার্য্য ভুলিয়া না যাই।

পণ্ডিচেরী—শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের আবাস

অরবিন্দ বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন—দেশের স্বাধীনতা লব্ধ না হইলে জাতির আধ্যাত্মিক সাধনাও সিদ্ধিলাভ করে না। সেই জন্য তিনি স্বাধীনতা অর্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার করেন নাই।

যাঁহারা বলেন, "প্রেমের দ্বারা ঘৃণা আরোগ্য কর"—"ন্যায়ের দ্বারা অন্যায় দূর কর"—"অপাপ দ্বারা পাপ বিনষ্ট কর"—অরবিন্দ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। কারণ, সেরূপ মনোভাব জনসাধারণ লাভ করিতে পারে না ; রাজনীতি ব্যক্তির জন্য নহে, জনগণের জন্য—তাহারা সাধুত্ব ভাবে ভাবিত হইতে পারে না। ঐরূপ ভাবের প্রেরণায় কাজ করিলে অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ের ও হিংসার আদর করা হয়—উদ্ধারকারীর হস্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। গীতার উপদেশ অন্যরূপ।

দীর্ঘকাল অত্যাচারে ও অনাচারে, উৎপীড়নে ও অভাবে যে জাতি ধ্বংসোন্মুখ, তাহার পক্ষে প্রয়োজন—বাঁচিবার উপায়, সাহস, আত্মরক্ষার সঙ্কল্প। তাহাই তাহার ধর্ম্ম এবং গীতার কথা—সে ধর্ম্ম স্বল্প হইলেও মানুষকে মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করে। অরবিন্দ সেই ধর্ম্মাচরণ করিবার

উপদেশ জাতিকে দিয়াছিলেন। তিনি বিপ্লব বর্জ্জন করা যখন অসম্ভব তখন বিপ্লবই বরণ করিতে আগ্রহশীল ছিলেন।

যখন কংগ্রেস অধিকার করিয়া প্রাচীনপন্থীরা তাহাতে প্রগতিপন্থী-দিগের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিলেন, তখন অরবিন্দ 'বন্দেমাতরম' পত্রে "নূতন অবস্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিলেন—"প্রগতিপন্থীদিগের সহিত পশ্চাদগামীদিগের সঙ্ঘর্ষে যত শীঘ্র ভারতের ভাগ্যনির্দ্ধারণ হয়, ততই ভাল।"—কেন না, আর তর্ক-বিতর্কে, সমস্যার অধ্যয়নে কাল হরণ করিবার সময় নাই। এখন যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হইবে, তাহাতে প্রথমে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব অনিবার্য্য। স্বায়ত্ত-শাসনের শান্তিপূর্ণপথে উদ্ভবের আশা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—

"Revolution, bare and grim, is preparing her battle-field, mowing down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty re-creation. We could have wished it otherwise, but God's will be done."
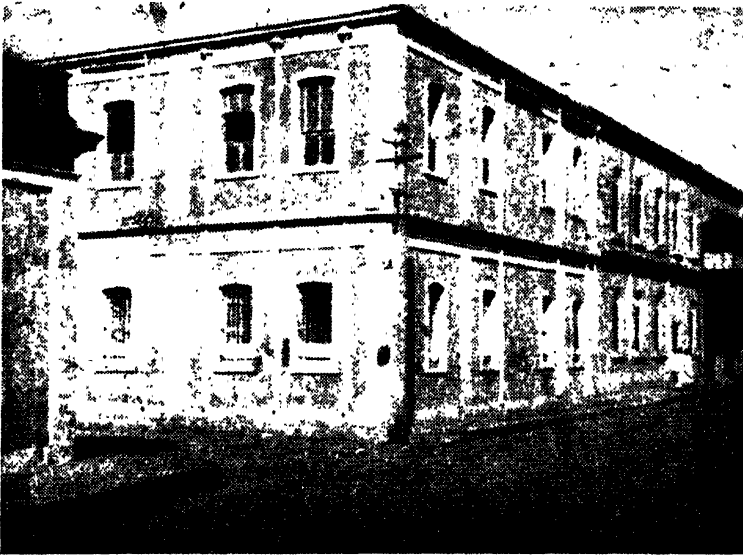
আশ্রম সংলগ্ন একটি গৃহের বহির্ভাগ

ইহাই 'বন্দেমাতরম' পত্রে তাঁহার শেষ প্রবন্ধ। পরদিনই তিনি বোমার মামলা সম্পর্কে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন।

মনে পড়িতেছে, যে দিন এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেই দিন—তাহা পাঠ করিয়াই—কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক, 'বন্দেমাতরম' পত্রের কল্যাণকামী সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, সরকার কিছুতেই এরূপ রচনা উপেক্ষা করিবেন না—সরকারের রোষ অনিবার্য্য; আমরা যেন সাবধান হই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পরদিনই অরবিন্দকে ধৃত করা হয়।

তাহার পরে বোমার মামলা চলিল। চিত্তরঞ্জন দাশ অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়া বন্ধু অরবিন্দের পক্ষাবলম্বন করিলেন—মামলার শেষে মন্তব্য করিলেন—অরবিন্দের বাণী ভবিষ্যতে এক দিন দেশে ও বিদেশে ধ্বনিত হইবে।

বিচারে মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়া অরবিন্দ দেখিলেন—অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তাঁহার সহকর্ম্মীরা কেহ বা নির্ব্বাসিত, কেহ বা কারাগারে; লোক যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—দেশ আর "বন্দেমাতরম" মন্ত্রে মুখরিত নহে। তিনি নূতন উদ্যমে কর্ম্মীদল গঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং সে জন্য প্রথমে ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র "কর্ম্মযোগিন্" ও পরে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র 'ধর্ম্ম' প্রকাশ করিলেন।

তাঁহার অনুরোধে আমাকে উভয় পত্রে যোগ দিতে হইল। তিনি বাঙ্গালা পত্র প্রচার করিবেন, শ্যামসুন্দরের ভ্রাতা গিরিজাসুন্দরকে দিয়া সেই সংবাদ পাঠাইলে আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি কিন্তু বলিলেন, "কেন? আপনি দেখিয়া দিবেন।" এই স্থানে বলা প্রয়োজন, আমি কোথাও ভাষাগত সংশোধন করিলে তিনি তাহার কারণ জানিয়া লইতেন। কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহের পরে আর সংশোধনের কোন প্রয়োজন হয় নাই। ইহা অবশ্য অসাধারণ মনীষার পরিচায়ক।

কারাগারে অরবিন্দ চিন্তার ও ধ্যানের সময় ও সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, সেই সময় তাঁহার ভগবদ্দর্শন হয়। বরদা হইতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার গুরু লেলে মহাশয়ের উপদেশ লইয়াছিলেন এবং গুরুও একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম। "বন্দেমাতরম" পত্রে যখন তিনি লিখিতেন, তখনও তিনি প্রতিদিন যোগ করিতেন—সংসারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়।

কারাগার হইতে আসিয়া তিনি 'কর্ম্মযোগিন্' ও 'ধর্ম্ম' পত্রদ্বয়ে যাহা লিখিতে লাগিলেন, তাহা আধ্যাত্মিকতায় সমুজ্জ্বল।

"বন্দেমাতরম" পত্রের বয়স এক বৎসর পূর্ণ হইলে লিখিত হইয়াছিল:—

"ইহা জাতির বিশেষ প্রয়োজনে আবির্ভূত হইয়াছিল—কাহারও উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা ব্যক্তিগত বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। সমগ্র জাতির দারুণ সঙ্কটকালে ইহার জন্ম এবং যে বাণী প্রচার ইহার কার্য্য

পৃথিবীর কোন শক্তিই তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারে না। * * ইহা বলিতে পারে যে, ইহা জাতির কামনা ব্যক্ত করিয়াছে, জাতির আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা চিত্রিত ও যে ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে তাহা যথাযথ।" ('বন্দেমাতরম'—১১ই আগষ্ট, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ।)

'কর্ম্মযোগিন' পত্রের আরম্ভে অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন :—

"ইহা সংবাদপত্র না হইয়া জাতীয় সমালোচনী হইবে। যে হিসাবে বর্ত্তমান ঘটনা জাতীয় জীবনের ও জাতির আত্মার পুষ্টি বা ক্ষতি করে সেই হিসাবেই আমরা সে সকলের উল্লেখ করিব। * * * যদি সৃষ্টি না হয়, তবে বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী ; যদি প্রগতি ও জয় না হয়, তবে পশ্চাদপসরণ ও পরাভব ঘটিবে।"

এই পত্রদ্বয় দলগত রাজনীতি প্রচারের জন্য প্রচারিত হয় নাই —সনাতন ধর্ম্মের মূলনীতি—বিশেষ গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ নিত্য-পালন-ব্রত—প্রচার ইহাদিগের কাম্য হইয়াছিল।

সে সময় অরবিন্দের মনোভাব আর পূর্ব্ববৎ নাই। যে শিক্ষা ও দীক্ষা প্রদান জন্য "বন্দেমাতরম" প্রচারিত হইয়াছিল, সে শিক্ষা তখন ব্যাপ্ত হইয়াছে, জাতি সেই দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছে।

অরবিন্দ বলিয়াছিলেন :—

"তোমরা আপনাদিগকে জাতীয়তাবাদী বল। জাতীয়তাবাদ কি? ইহা রাজনীতিক কার্য্য-পদ্ধতিমাত্র নহে। ইহা ভগবানের প্রদত্ত ধর্ম্ম—এই ধর্ম্মে তোমাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইবে। * * * বাঙ্গালায় জাতীয়তাবাদ ধর্ম্মরূপে আসিয়াছে—ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু বিরোধী কতকগুলি শক্তি ইহার শক্তিনাশের চেষ্টা করিতেছে। যখনই কোন নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হয়, যখনই ভগবান মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হ'ন ; তখনই এমন হয়—বিরোধী শক্তি ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হয়। * * জাতীয়তাবাদ চূর্ণ হয় নাই ; ইহা চূর্ণ হইবে না। ইহা ভগবানের শক্তিতে রক্ষিত —কোন অস্ত্রেই ইহার বিনাশ-সাধন সম্ভব নহে। ইহা অমর—ইহার বিনাশ নাই। ভগবানকে কেহ হত্যা করিতে পারে না। তাঁহাকে কেহ কারারুদ্ধ করিতে পারে না।"

তিনি ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করিয়াছিলেন।

অরবিন্দ "কর্ম্মযোগিনের আদর্শ"—প্রবন্ধে জাতীয়তাবাদীকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—যাহা কিছু ভারতীয় তাহাই অপরিহার্য্য মনে করা সঙ্গত নহে। অতীতে হিন্দু সেরূপ মনে করেন নাই—ভবিষ্যতে কেন করিবেন? জীবনের তিন অংশ আছে—নির্দ্দিষ্ট ও চিরন্তন ভাব, বর্দ্ধমান কিন্তু দৃঢ় আত্মা এবং পরিবর্ত্তনশীল ভঙ্গুর দেহ।" * * আমরা অকারণ পরিবর্ত্তনপ্রিয়তাহেতু পুরাতন রীতি বর্জ্জন করিব ন আবার জাতীয় ভাব—যাহার পরিবর্ত্তে জাতির আত্মার প্রকৃততর উৎকৃষ্টতর রীতির প্রবর্ত্তন করিতে চাহে, তাহা কখনই আঁকড়িয়া থাকিব না।"

সাংবাদিক অরবিন্দ যখন এই ভাবে—নবোদ্যমে মত প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন আবার ইংরেজ সরকার তাঁহার কার্য্য বন্ধ করিবার আয়োজন করেন। তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চন্দননগরে ও তথা হইতে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন। শ্রীঅরবিন্দ দার্শনিকের মনোভাব লইয়া—ভারতের ঋষিদিগের পথে আধ্যাত্মিক সাধনায় রত হইয়া মানবকে তাহার ফল দিতে থাকেন।

কিন্তু যে দেশকে তিনি মাতা বলিয়া বন্দনা করিয়াছিলেন সে দেশ যে কখন তাঁহার সাধনার সীমা হইতে দূরে যায় নাই তাহার প্রমাণ আমরা ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে শ্রীমান দিলীপকে লিখিত পত্রেও পাই।—

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বলিয়াছিলেন—স্বাধীন, এক অবিভাজ্য ভারত আমাদিগের সাধনা—তখন দেশ-বিভাগের কো কথা উঠে নাই। তবে কি তিনি দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ লক্ষ করিয়াছিলেন? তাহার পরে যখন দেশ-বিভাগ হয়, তখন (১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ) তিনি লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষ স্বাধী হইয়াছে ; কিন্তু তাহার ঐক্যার্জ্জন হয় নাই—সে কেবল বিভক্ত ভগ্ন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। * * * যে উপায়েই কেন হউক না, এই বিভাগ দূর হইবে।" তাহার পরে তিনি দিলীপকে লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। ভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জ তাহার স্বাধীনতালাভ প্রয়োজন ছিল। আজ যে সব সঙ্কট ভারতবর্ষকে বেষ্টিত করিয়া আছে এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে বর্দ্ধিত হইয়াছে- সে সকল ও সে সকলের দূরীকরণ অনিবার্য্য ছিল। যে সঙ্ক অনিবার্য্য তাহা রোধ করিবার জন্য নেহরুর চেষ্টা অধিক দি সফল হইতে পারে না। * * এস্থানেও সম্পূর্ণ অপনোদন হইবে —দুঃখের বিষয় সেই অপনোদনের সময় বহু মানব ক্লিষ্ট ও পি হইবে।"

এক্ষেত্রে সাংবাদিক অরবিন্দ—ভবিষ্যৎ-বক্তা শ্রীঅরবিন্দে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

আমরা আজ সাংবাদিক অরবিন্দকে যেন বিস্মৃত না হই।

[পূর্বানুবৃত্তি]

স্বর্ণকে দেখিয়াও রামভল্লা ওই একই কথা বলিল, অরুণাকে দেখিয়া সে যা বলিয়াছিল—তাই বলিল—নয়ন আমার সাথক হল তোকে দেখে! দেখালি বটে মা! চাষী ছিল তিনকড়ি দাদা, চাষীর ঘরের বেটী তুই—একবারে সাক্ষাৎ সরস্বতী হয়ে উঠেছিস মা!

স্বর্ণ খুব খুসী হয় নাই—সে তাহার কথা হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সে বলিল—আসলে তোমার নয়ন দুটিই ভাল রামকাকা। নয়নদুটি তোমার সার্থক হবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে!

রামভল্লা খাতির কাহাকেও করে না, করিত এক তিনকড়িকে, স্বর্ণ তাহারই কন্যা—ছেলেবেলায় তাহাকে কোলেপিঠে মানুষ করিয়াছে—সেই জন্য খানিকটা বটে এবং আজ তাহার মনটি পরম পরিতৃপ্তিতে মধুর হইয়া আছে সে জন্যও বটে—স্বর্ণের কথার সুরের মধ্য হইতে যে খোঁচাটুকু তাহাকে বিদ্ধ করিল সে টুকুর জন্য এক মুহূর্তে উদ্ধত হইয়া উঠিল না। স্বর্ণের কথার অর্থ সে বুঝিতে পারে নাই, শুধু খোঁচার বক্র তীক্ষ্ণাগ্রের স্পর্শ অনুভবই করিয়াছিল—সে সেটুকু উপেক্ষা করিয়াই বলিল—তা সাথক হবার জন্যেই তো নয়নের ছিষ্টিরে স্বন্ন। দুঃখু কি জানিস?—দুঃখু হ'ল—নয়ন সাথক হতে পায় না; সংসারের দুঃখু পাপী মানুষ—এই দেখেই কষ্ট পেতে হয়। আজ বিশুদাদার বউকে দেখলাম—তোকে দেখলাম—নয়ন আমার ভ'রে গেল।

—তাই তো বলছি রামকাকা—তোমার বিশুদাদার বউকে দেখে যে চোখ তোমার সার্থক হ'ল, আমাকে দেখে তোমার সেই চোখ সার্থক হ'ল কি ক'রে? তোমার বিশুদাদার বউ নতুন ক'রে তপস্বিনী সেজেছে দেখেই তো হ'ল। কিন্তু আমি বিধবা মেয়ে বিয়ে করেছি, আমাকে দেখে তো তোমার চোখ সার্থক হবার কথা নয় রামকাকা!

এবার রামভল্লা গম্ভীর হইয়া গেল—স্থির দৃষ্টিতে স্বর্ণের দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তাহার পর বলিল—কথা বটে কি না-হটে তা আমি জানি না স্বন্ন—তবে নয়ন আমার সাথক হয়েছে। যা হয়েছে তাই বলেছি। মাকে দেখে মনে হ'ল—মা আমার জলের বুকে ফোটা শ্বেতপদ্ম, তোকে দেখে মনে হ'ল ঘরের বাগানে ফোটা স্থলপদ্ম। দুই ভাল লাগল, চোখ জুড়িয়ে গেল।

হঠাৎ রাম উঠিয়া পড়িল, বলিল—আচ্ছা উঠলাম।

—উঠবে? জল খাবে না?

—না। জল খেয়েছি। এসেছিলাম থানাতে হাজরে দিতে। ফিরছিলাম—নদীর ঘাটে মুড়ি ভিজিয়ে খেতে খেতে শুনলাম—ক'জনাতে বলাবলি করছে ওই মায়ের কথা। গাঁয়ে এসে অবধি ওই কথাই শুনছি। তা' মনে হ'ল একবার নিজের চোখেই দেখে যাই। জল খেয়েছি। এখন দুপুরে মায়ের ঘরে পেসাদ পেয়ে বাড়ী যাব। যেচে নেমন্তন্ন নিয়েছি। চল্লাম।

—একেবারে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করেছ?

রাম ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল—হ্যাঁ।

রামের চোখের চাহনি দেখিয়া স্বর্ণ চমকিয়া উঠিল। সে জানে—বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদের মত এই দৃষ্টি রামকাকার চোখে ঝলসিয়া উঠিবার পরই ডাকাত রামভল্লা একটা চীৎকার করিয়া ওঠে। ভুরু দুইটা কুঞ্চিত হইয়া আসে, চওড়া কপালে শিরা ফুলিয়া ওঠে—একটা পাশবিক ভঙ্গিতে মুখ-বিবর হাঁ হইয়া যায়, তাহারই ভিতর হইতে একটা বর্ব্বর চীৎকার বাহির হইয়া আসে।

রাম কিন্তু চীৎকার করিল না। তাহার ভুরু দুইটা ঠিকই কুঁচকাইয়া উঠিল—নাকটাও ফুলিয়া উঠিল—কিন্তু মুখটা হাঁ হইল না। কয়েক মুহূর্ত এমনি তাকাইয়া

থাকিয়া বলিল—চোখ তোকে দেখে জুড়াল স্বর্ণ, কিন্তু কান জুড়াল না রে। লেকা-পড়ার কাঁটায় জিভখানা তোর বেজায় করকরে হয়ে উঠেছে। ইহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত সে নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল, ভুরুর কুঞ্চন, নাকের ডগার ফুলা মিশাইয়া গেল, রাম ঘাড় নাড়িয়া শান্ত স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল—না—না—না! এ ভাল নয় মা—এ ভাল নয়।

সে বাহির হইয়া গেল। দরজার ও-পাশ হইতে বলিল—দেবু খুড়োর সঙ্গে দেখা হ'ল না। তাকে বলিস। ও বেলাতে খেয়ে-দেয়ে যাবার সময় একবার না হয় হেঁকে যাব।

স্বর্ণ আর কথা বাড়াইল না। কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। বিশেষ করিয়া রামভল্লার মত মানুষের সঙ্গে।

* * *

অরুণার ঘরে খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া রাম খানিকটা অপ্রস্তুত হইল। খাইতে-খাইতে সে বুঝিতে পারিল যে অরুণার হেঁসেলের সমস্ত ভাতগুলি সে একাই শেষ করিয়াছে। অরুণার এ দেশে অবশ্য কম দিন হইল না, এ দেশের চাষীমজুরদের আহারের পরিমাণের কথা তার না-জানা নয়, তবুও সে এমন ধারণা করিতে পারে নাই। অরুণার নিজের খাওয়া কমই, কিন্তু নিজের ছাড়াও যে সে আরও দুই জনের আয়োজন করিয়াছিল, —তাহার বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে একজন মেয়ে, ওই রামভল্লাদেরই জাতের মেয়ে সে—সেও কম খায় না, অরুণার আহারের পরিমাণের তিনগুণ তো বটে;—তাহার ভাতটাও রাম দিব্য শেষ করিয়া দিয়া পরম পরিতৃপ্তি সহকারে একঘটি জল আলগোছে গল-গল করিয়া খাইয়া বলিল—একটুকুন বেশী হয়ে গেল খাওয়াটা। তা মা তুমি যা রেঁধেছিলে—ওই ঠাণ্ডাঠাণ্ডা শুকতো ব্যান্নটির মত এমন অমৃতি আমি খাই নাই। তবে ওই অড়রের ডালে খানিকটা অসুবিধে হল, আমরা মা চড়ামাটির দেশের মানুষ, মাস-কলাইয়ের ডাল একবারে ভাত ভাসিয়ে না-মেখে খেলে বাধো-বাধো লাগে।

ঝি মেয়েটি বলিল—তা ভালই হয়েছে গো মুরুব্বি। না-হলে মাকে আবার হাঁড়ি চড়াতে হ'ত। তিনজনার ভাত তুমি খেয়ে দিলে—আবার বলছ—অসুবিধে হ'ল!

অরুণা ব্যস্ত হইয়া উঠিল—না—না—না!

রাম অপ্রস্তুত হইয়া গেল প্রথমটা।—তাই তো! তবে তো—। পরমুহূর্ত্তেই সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বলিল—তা বেশ হয়েছে। ভালই হয়েছে। মা সীতে ঠাকরুণের হনুমান ভোজন হয়ে গেল।

হাত মুখ ধুইয়া আবার একদফা পায়ের ধুলা লইয়া রাম চলিয়া গেল।

এই রামভল্লাই সমস্ত জংসন শহরের আকাশ বাতাসকে চকিত করিয়া তুলিল। অরুণার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তাহার স্বভাব-উচ্চ কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়া দিল—নয়ন আমার সাথক হয়ে গেল, সাক্ষাৎ সাবিত্তি দর্শন করে এলাম, অন্নপূর্ণার প্রসাদ পেয়ে এলাম। যে বেটা মায়ের নিন্দে করে—সে বেটার নরকে ঠাঁই হবে না। আমার ছামনে বললে—বেটার মুখ ভেঙে দোব আমি এক কিলে। আমি রামভল্লা, ষোলবছর বয়সে ডাকাতিতে হাতে খড়ি নিয়েছি—আজ বয়েস ষাট সোত্তর আশী কে জানে কত হ'ল—অনেক দেখেছি আমি, নিজে অনেক পাপ করেছি—অনেক পাপী আমি দেখলাম—ঘাঁটলাম; পাপ রামভল্লাকে ফাঁকি দিতে পারে না। ওই জয়তারার থানে সাধু এসেছিল জটাধারী, বেটা ফেরারী আসামী, জটা রেখে—গন্ধবাবা সেজে আসর জমিয়ে বসেছিল—সবাই বেটার ধাপ্পায় ভুলেছিল, ভুলি নাই আমি। বেটার জট কেটে নিয়ে বিদেয় করেছিলাম। সে তখন লোকের কি রাগ রামভল্লার ওপর। তার মাসখানেক বাদেই বাবা পুলিশ তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে এল—সাত বছরের ফেরারী আসামী সে। রামভল্লার ভুল নাই।

ঠিক দিন দুই পরেই রামভল্লার ঘোষণাটা এমন চেহারা লইল যে একদিনেই গোটা দ্বারমণ্ডল এবং তাহার চারিপাশের গ্রামগুলি তোলপাড় হইয়া গেল।

রামভল্লা সেদিন আবার জংসনে আসিয়াছিল। আসিয়াছিল একটা বড় মাছ বেচিতে। রামভল্লার জাতীয় পেশা নাই, পেশার ধারও সে ধারে না। পেশা বলিতে সে-কালে ছিল ডাকাতি, দাঙ্গাবাজি—লাঠিয়ালি। নেশা কয়েকটাই ছিল, তাহার মধ্যে মাছ ধরার নেশাটা প্রবল ছিল। গ্রামে ফিরিয়া সে দশজনের সঙ্গে দেখা যেমন করিয়াছে, এখানকার ঠাকুরস্থানে যেমন প্রণাম করিয়াছে,

তেমনি সে ময়ূরাক্ষীর তীর ধরিয়া কোথায় নূতন দহ পড়িয়াছে—পুরাতন দহগুলির কোনটি আছে কোনটি মজিয়াছে—ঘুরিয়া সব দেখিয়া আসিয়াছে। পঞ্চগ্রামের শ্মশানের ধারের বড় দহটি দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল—দহটায় মাছ আছে। মাছও আছে, কুমীরও আছে। কিছুদিন আগেই নবীন ধীবরকে কুমীরে ধরিয়াছিল—এই দহে। নবীন জাল ফেলিয়াছিল, জাল টানিতেই বুঝিল—বড় মাছ পড়িয়াছে, মাছটা দহের তলার মাটিতে চাপিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছে, টানিতে গেলেই জালটা কাঁপিতেছে; নবীন বিলম্ব না করিয়া মাছটাকে ভাল করিয়া জড়াইয়া জলে ডুব মারিয়াছিল, জালের প্রান্তের লোহার কাঁটার ইসারা ধরিয়া মাছটার গায়ে হাত দিতেই—মাছটা ওখোল মারিয়া নবীনের কাঁধ কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। নবীন ধীবর কৌশলী বিচক্ষণ লোক এবং গায়ে তাহার শক্তিও আছে, মেছো কুমীরটাকে লইয়াই জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেটার দাঁত ছাড়াইয়া উঠিয়া আসিয়াছিল। সেই দহে রাম পর পর কয়েক রাত্রি—তগি এবং ছিপ লইয়া বসিয়া কাটাইয়া অবশেষে গতরাত্রে একটা প্রকাণ্ড চিতল শিকার করিয়াছে। ওজনে সাড়ে ষোল সের হইয়াছে। ও অঞ্চলের ধীবরেরা আসিয়াছিল তাহার কাছে—ভল্লা মশায় মাছটা দেন—'যা দাম হয় লেন। পেটী আধসের আপনাকে এমনই দোব।' আগের কাল হইলে রাম তাই দিত। রামভল্লা নিজে হাতে মাছ বিক্রী করিবে, এ সে নিজেই ভাবিতে পারিত না। কিন্তু রামভল্লা নিজেই জেলেদের বলিয়াছে—ওরে বাবা—দায়ে পড়ে বাবা কাঁকড়া খায়। জানিস তো—বাঘের যখন আহার মেলে না—তখন বাঘ দায়ে পড়ে নদীর ধারে এসে বসে—নদীর কিনারা থেকে কাঁকড়া বের হয়—তাই মেরে তখন খায়। আমার এখন সেই দশা। আমি ওটাকে জংসনে নিয়ে যাই, ভাগা দিয়ে বেচব। দশটা টাকা আমার হেসে-খেলে হবে। বুঝলি না ভাই—ও তে আর তোরা ভাগ বসাস না।

জংসনেও আবার সে হাটের পরিবর্ত্তে—মাছটা লইয়া আসিয়া বসিয়াছিল—একেবারে মহাজন-পটির গুদাম এলাকায়।

জংসনের মহাজন-পটি গোটা বাংলা দেশে বিখ্যাত। গোটা বার অঞ্চলে ধান চাল গম গুড় আলু কলাই লঙ্কা তামাক প্রভৃতি জিনিষের সব চেয়ে বড় বাজার। বহু লক্ষ টাকার কারবার। গঙ্গা ও পদ্মার মুখে ধুলিয়ান হইতে একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্রায় একশত মাইল ভাগীরথী তীরের উৎপন্ন ফসল এখানকার ব্যবসায়ীরা কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখে। ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই মাড়োয়ারী—বাঙালীও দুচারিজন আছে। বিচিত্র স্থান। ফুট পঁচিশেক চওড়া একটা রাস্তার দুধারে ব্যবসায়ীদের পাকা বাড়ী, সামনের অংশ অধিকাংশই দোতলা। নিচের তলায় গদী—পুরু তোষকের উপর চাদর বিছানো আসরে তাকিয়া, কাঠের বাক্স, মোটা মোটা খেরো-বাঁধা খাতা লইয়া কাগজে কলমে কারবার চলিতেছে। পিছনের দিকে বড় বড় গুদাম, প্রত্যেক গুদামেই বিশ পঁচিশখানা গাড়ী লাগিয়া আছে; হয় মাল বোঝাই হইতেছে, নয় খালাস হইয়া গুদাম বোঝাই হইতেছে। কতক গাড়ী আসিয়াছে গ্রামাঞ্চল হইতে—চাষী গৃহস্থদেরই গাড়ী, তাহারা মাল বোঝাই করিয়া বেচিতে আসিয়াছে, হাতছয়েক উঁচু বাঁশের তে-পায়ায় বড় বড় লোহার কাঁটা-যন্ত্র খাটাইয়া ওজন চলিতেছে, আর হাঁক চলিতেছে—রাম রাম, রাম রাম; রামে রাম—দুই দুই; দুই রামে—তিন-তিন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। গুদামের মুখে দুই মণি বস্তাগুলা পিঠে করিয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া মুটেগুলা চলিয়াছে—হট্-হট্-হট-হট্-হট-হট্! এ—এইয়া। ইহারই মধ্যে চলিতেছে কলহ। গাড়োয়ান মুটে গ্রাম্য কারবারী এখানে তো কম নয়! অন্ততপক্ষে দুশো-আড়াইশো। ইহা ছাড়া এমনি সংখ্যা লোক এই কারবারেই ষ্টেশন-গুদামে আলাদা খাটিতেছে। মানুষ ছাড়া আছে হাজার দরুণে পায়রা, তাহার সঙ্গে আছে কাক-শালিক-চড়ুই। গোটা রাস্তাটা ছাইয়া বসিয়া আছে, মানুষ গেলে—একটু সরিয়া পথ দেয়—উড়ে না। রাস্তার ধূলা—ধান চাল গম কলাইয়ে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলা ভিখারী ও ভিখারিণী কোথায় কখন কোন বস্তাটা ফাটিবে—সেই প্রত্যাশায় বসিয়া আছে। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ—অবিরাম কোমরে ঝুড়ি লইয়া গোবর কুড়াইয়া ফিরিতেছে। দুশো আড়াইশো গাড়ীর বলদ আছে—তাহার উপর ঘুরিতেছে—শেঠজীদের বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট দেহ গাই বাছুর।

রামভল্লা মাছটা লইয়া এইখানে আসিয়া হাজির হইল।

খরিদ্দার তাহার শেঠজীরা নয়, গদীর কর্ম্মচারীরাও নয়, খরিদ্দার ওই গাড়োয়ানেরা এবং মজুরেরা। গৃহস্থ ভদ্র-জনেরা কি খাইবার শখের জন্য পয়সা দিতে পারে? তাহাদের কি সে বুকের ছাতি আছে? শেঠজীরা মাছ খায় না, নহিলে উহারা ভাল খায়, খাঁটী ঘি, খাঁটী-খাঁটী দুধ নইলে উহারা স্পর্শ করে না। মাছ মাংস খাইতে জানে এই সব গাড়োয়ান ও মুটেরা। উহাদের মধ্যে আবার মুসলমানেরাই আমীর খরিদ্দার। দিনে চার পাঁচ টাকা কামাইবে। স্বচ্ছন্দে একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া একটা উঠাইয়া গামছায় বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে। পিঁয়াজ, রসুন, আদা বাড়ীতেই আছে, দু চার আনার গরম মসলা—কিনিয়া লইবে সঙ্গে সঙ্গে।

একটা গাছের তলায় আসিয়া বসিল রাম। তাহার সঙ্গে ছিল পতিপুত্রহীনা অনাথা ধীবর-প্রৌঢ়া সুখমণি জেলেনী; সুখো-অনেকদিন পর তাহার বঁটী ও তৌলদাঁড়ি বাটখারা বাহির করিয়াছে; যেমন দামেই বিক্রী হউক, রাম তাহাকে পুরা দেড় টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছে, সুখো মাছ কুটিয়া ভাগা সাজাইয়া দিবে। চব্বিশটা ভাগা সাজাইল, আট আনা করিয়া ভাগা। সুখো খুব হুঁসিয়ার মেয়ে-সে খুব হিসাবের উপর চুল-চেরা ভাগ করিয়া গাদা ও পেটী এক এক ভাগে সাজাইয়া দিয়াছে, তৌলদাঁড়িটা কাপড় চাপাই আছে।

মহাজন পটির গন্ধও অতিবিচিত্র। লঙ্কা তামাক গুড় কলাই ধান—গোবর চোনা—মসলা—নূতন-কাপড় সুতা—ঘি সরিষার-তৈল,নারিকেল-তৈল,কেরোসিন তৈল, সমস্ত কিছুর গন্ধ একত্র মিশাইয়া সে এক বিচিত্র গন্ধ! কোন এক-টাকে বাছিয়া স্বতন্ত্র করিবার উপায় নাই। ইহারই মধ্যে ষোল সের কাটা মাছের গন্ধ কতটুকু—কিন্তু তবু মজুরদের নাকে তাহা এড়াইল না। দেখিতে-দেখিতে তাহারা চারি-পাশে ভিড় জমাইয়া ফেলিল। এত বড় পাকা চিতল মাছ দেখিয়া তাহারা লোলুপ হইয়া টপ-টপ এক একটি ভাগা উঠাইয়া লইল। দাম দস্তর করিল না, ওজন দেখিল না, আট আনা হিসাবে পয়সা প্রায় সকলেই ফেলিয়া দিল—জন চারেক বলিল—পয়সাটা ভাই ওবেলা নইলে হবে না। গদী থেকে পয়সা নিয়েই দিয়ে দোব। তাহাদের মধ্যে কুসুমপুরের আশগড় সেখ একজন।

রামের একটা কথা মনে হইয়া গেল। দিন কয়েক আগে সে কুসুমপুর গিয়াছিল পুরানো বন্ধুলোকের সঙ্গে দেখা করিতে। দেখা করিতে নয় ভিখুকে দেখিতে। ভিখু শেখ একবার তাহাদের সঙ্গে একটা কারবারে গিয়া ধরা পড়িয়াছিল। ভিখুই ছিল কারবারটার মূলে। গরু বাছুরের পাইকারী করিত ভিখু—গ্রাম-গ্রামান্তরে ফিরিত, সেই একদিন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—তাহার একটা চেনা বাড়ীতে ধনী কুটুম্ব আসিয়াছে—মেয়েদের গায়ে অনেক গহনা। পরের দিন রাত্রেই তাহারা চলিয়া যাইবে। যাহা করিতে হয়—আজ রা[illegible] করিতে হইবে। সময় থাকিলে ভিখু তাহার কাছে [illegible]সিত না; তাহার বরাবরের কারবার ছিল—খড়বোনার [illegible]য়ের দলের সঙ্গে;—মাকা খাঁ-জাঁদরেল সর্দ্দার ছিল। কড়া হুকুম ছিল তার—ছুটা কুত্তার পাঁচ বাড়ীর এঁটো কাঁটা শুঁকিয়া বেড়ানোর মত যাহারা আজ এ-দলে কাজ করে তাহাদের ঠাঁই তাহার দলে নাই। দায়ে পড়িয়া ভিখু সে দিন রামের কাছে আসিয়া-ছিল; বেলা তখন তিন প্রহর গড়াইয়া গিয়াছে, সেই রাত্রেই কাজ শেষ করিতে হইবে; কুসুমপুর হইতে খড়বোনা কম-পক্ষে পাঁচ কোশ অর্থাৎ দশ মাইল পথ। রামের গ্রাম মাত্র তিন মাইল। রাম ভিখুকে লইয়া সেই রাত্রেই কাজ শেষ করিয়াছিল। প্রাতঃকালেই খবর পাইল—পুলিশ ভিখুকে ধরিয়াছে। বাড়ীর একটি মেয়ে ভিখুকে চিনিয়াছে। ভিখু তাহাকে সকলের অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া গিয়া ধর্ষণ করিয়াছিল। ভিখু ধরা পড়িল, কিন্তু আশ্চর্য্য পুলিশের মারপিট সত্ত্বেও মুখ খুলে নাই। মামলাটায় তাহার একা সাজা হইয়াছিল, আট বৎসর দ্বীপান্তর। সেই ভিখুর রোগ ধরিয়াছে—প্রায় শেষ অবস্থা শুনিয়া রাম তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল। ভিখুকে সে ঘৃণা করে—তাহার দলে কড়া হুকুম আছে—মেয়ে লোকের গলা কাটিয়া হার খুলিয়া লও, হাত কাটিয়া চুড়ি বালা লও—কিছু বলিব না—কিন্তু যে লোক মেয়েলোকের সতীত্ব নাশের জন্য হাত বাড়াইবে তাহার মুণ্ডটা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিবে। সেদিন ঘটনার সময় জানিতে পারিলে হয় তো তাই হইত—ভিখু তাহার হাতেই মরিত। ঘৃণা সত্ত্বেও—খানিকটা করুণা না করিয়া সে পারে নাই। ভিখু কাহারও নাম করে নাই। সে তো ধরা পড়িয়াইছিল, তাহাদের সহিত বাধ্যবাধকতা ছিল

না, খুব সম্ভাবও ছিল না, ওই কারবারই প্রথম কারবার—সে তাহাদের অনায়াসেই ধরাইয়া দিয়া রাজসাক্ষী সাজিয়া মাফ পাইতে পারিত। সে তাহা করে নাই। করুণা এই জন্যই। ভিখুর বাড়ির পাশেই আশগড়ের বাড়ী। রাম বলিল—দাঁড়া আশগড়। সুখো যা মাছ রেখেছিস—তিন ভাগ কর, এক ভাগ দে আশগড়কে। আশগড় তু গিয়ে যেন ভিখেকে দিস। হ্যাঁ—কিন্তু আল্লার কিরে। আর তোমার কাছে আমি ভাই মাছের দাম-পয়সা নেবো না।

—কেনে? আশগড় বিস্মিত হইয়া গেল।

—আমি সেদিন ভিখুর বাড়ী গিয়েছিলাম। তোমার ঘরের কলার কাঁদি আমি দেখে এসেছি। তখনই দেখেছিলাম—রঙ ধরেছে। আমাকে এক থড়ি—ওই ওপরকার থরিটে তোমাকে দিতে হবে। কাল নিয়ে এস।

মহেব সেখ গাড়োয়ান কুসুমপুরের পাশের গ্রামের লোক, কঙ্কনার বাবুদের অনুগত ব্যক্তি, মহলে কিস্তীর সময় ডাক হাঁকের কাজ করে, লাঠী ধরিতে জানে—সে একটু বক্র ব্যঙ্গ করিয়াই বলিয়া উঠিল—কি রকম, রামদাদার এইবার কলায় রুচি হ'ল নাকি? মদ মাংসের রুচি গেল! বুড়া হ'লে রামদাদা।

রাম হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বয়স তো হ'ল, বুড়োও হয়েছি। সে না-বলছে কে? তবে তু যে বুড়ো বলছিস মহেব, সে বুড়ো রাম হবে না। কলা আমি খাব নারে, দেবতার জন্যে। মা ঠাকরুণকে দোব। সাক্ষাৎ দেবতারে! নয়ন সাথক হয়ে গেল আমার!

'নয়ন সার্থক হয়ে গেল' কথাটা শুনিয়াই মহেব বুঝিয়া লইল; কথাটা সে শুনিয়াছে। মহেব গম্ভীর হইয়া গেল। বলিল—অ। তুমি ওই ইয়ার কথা বলছ! ওই মহাগেরামের ঠাকুরের লাত বউটার কথা! কিন্তু ঠাকুরের ছোট বিবিটার কথা!

মুহূর্তে রামের প্রসন্ন মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। 'লাত বউটা—ছোট বিবিটা' শব্দ দুইটা তাহার কানে যেন খোঁচা মারিয়া বিঁধিয়া গেল। গম্ভীর স্বরে সে বলিল—হ্যাঁ রে, তাঁরই কথা বলছি। সাক্ষাৎ দেবতা!

—হুঁ—হুঁ। জানি—জানি।

—কি জানিস্? কি বলছিস্?

—কি বুলত রামদাদা? বুলছি—মেয়েটিরে জানি গো! সঙ্গি করবার লেগে কলমা প'ড়ে মুসলমান হ'য়েছিল। ফের হিন্দু হ'ল। এখন আবার দেবতা হ'ল। তা—ভাল।

—ওরে বেকুব—দেবতার আবার জাত লাগে নাকি? দেবতা—দেবতা।

—আরে যাও যাও।

এবার রাম প্রচণ্ড জোরে হাঁক দিয়া উঠিল।—খবরদার!

মহেবও দমিল না—সে রুখিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল—এই—ও!

মহেব এবং রামের আচরণের পিছনে খানিকটা ইতিহাস আছে। বৎসর আষ্টেক আগে রাম একবার মহেবকে যৎপরোনাস্তি ঠ্যাঙাইয়াছিল। সে এক লাঠিখেলার প্রতিযোগিতার আসরে—রাম তাহার দলবল লইয়া খেলা দেখাইতেছিল। মহেব লাঠি ধরিতে জানে, তখন বয়স কম—রক্তের তেজ বেশী, রাম বুড়া—সে লাফ দিয়া আসরে পড়িয়া বলিয়াছিল—ই—হচ্ছে—আপোষের খেল। ই আবার খেল না কি? এস আমার সাথে এস।

রাম তখন মদে চুরচুরে হইয়া আছে—সে বাঁ হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—যা—যা।

মহেব যায় নাই—উপরন্তু রামের হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—না। এসো আমি খেল্‌বো লাঠি তুমার সাথে।

সঙ্গে সঙ্গে মের্জ্জা এনায়েত আসরে নামিয়া বলিয়াছিল—উ যখন খেলতে চাইছে—তখন কেনে খেলবে না তুমি?

—না। ওর সঙ্গে আমি লাঠি ধরি না।

—তবে তুমি হার মান।

—হার মানব?

—নিশ্চয়!

কয়েক মুহূর্ত্ত বিচিত্র স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া রাম বলিয়াছিল—আচ্ছা তবে আয়।

ছোট দুই হাত লাঠি লইয়া খেলা। রাম পাঁয়তারা করিল না, একেবারেই সোজা আসিয়া আক্রমণ করিল। মহেব লাঠি ভালই খেলে, সে রামের এতক্ষণের খেলা দেখিয়া ভাবিয়াছিল—বুড়া হইয়া রামের হাত পড়িয়া

গিয়াছে ; কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার ভুল ভাঙিল, সে দেখিল—এ সে রাম নয়—এ সেই পুরাণো রাম, বড় বড় চোখ দুইটা বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছে ; স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া—বন্য জানোয়ারের মত আগাইয়া আসিতেছে। তবু মহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া আত্ম-রক্ষার চেষ্টা করিল ; কিন্তু রামের কাছে সে নিতান্তই দুর্ব্বল, রাম অদ্ভুত ক্ষিপ্র হাতে লাঠির উপর লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল—মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাঁ হাতে মহেবের হাত চাপিয়া ধরিয়া আসরের ঠিক মাঝখানে টানিয়া আনিয়া মাষ্টার যেমন ছাত্রকে পেটে—তেমনি করিয়া পিটিতে সুরু করিল। সকলে হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিল। এনায়েৎ মির্জ্জা ছুটিয়া আসিল—কিন্তু এমন এক হাঁক দিল রাম, যে সে সভয়ে পিছাইয়া গেল। আরও ঘা-কয়েক পিটিয়ে মহেবকে ছাড়িয়া দিয়া রাম বলিয়াছিল—যা! ঘর যা!

রামের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইলেও কুসুমপুর বা স্থানীয় মুসলমানেরা কিছু বলিতে সাহস করে নাই। দলবল সমেত রাম এ অঞ্চলে অপরাজেয় ভয়াবহ ছিল। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে—রামের বয়স অনেক বাড়িয়াছে, দলবল নাই, সব চেয়ে বড়-কথা মুসলমানদের মধ্যে এ কালে একটা নূতন চাঞ্চল্য আসিয়াছে। তাই মহেব রামের সমান উঁচু গলায় হাঁক দিয়া উত্তর দিল—এই যো!

রাম গায়ের চাদরটা ফেলিয়া দিয়া হাতের লাঠিটা শক্ত করিয়া ধরিল। বলিল—একা লড়বি না—সবাই লড়বি?

বলিয়াই সে ডাকাতির সেই প্রচণ্ড কুক ডাক ছাড়িয়া উঠিল।—আ—ওয়া—ওয়া—ওয়া—ওয়া!

গোটা মহাজন পটি চমকিয়া উঠিল।

শেঠজীরা বাহির হইয়া আসিলেন। দারোয়ানেরা ছুটিয়া গেল বন্দুক বাহির করিতে। যে কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ গোবর কুড়াইয়া জড়ো করিতেছিল—তাহারা ভয়ে ছুটিয়া পটি হইতেই পলাইয়া গেল। যতদূর গেল—বলিতে বলিতে গেল—মার লেগে যেয়েচে। ওরে বানাশরে—সে কি হাঁক! বন্দুক মন্দুক বার করে সে যা-তা কাণ্ড!

খবরটা থানা পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

থানা হইতে দারোগা জন চারেক কনেষ্টবল লইয়া সভয়ে আসিয়া হাজির হইল। তখন অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। রাম তাহারই মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছে—মুখ আমি থুড়ে দোব। যে আমার মায়ের নামে অ-কথা কুকথা বলবে—তার দাঁত ভেঙে জিভ টেনে ছিঁড়ে নোব। সাক্ষাৎ দেবতা, আমি বলছি—সাক্ষাৎ দেবতা। আমার নয়ন সার্থক হয়েছে, বাক্যি শুনে পরাণ জুড়িয়েছে, কান ধন্য হয়েছে। আমি বলছি!

—কে?

—কে?

—কার কথা বল্‌ছে? কে?

—মেয়ে ইস্কুলের বড় দিদিমণি।

—ন্যায়রত্ন ঠাকুরের পৌত্রবধূ হে!

(ক্রমশঃ)

লহ নমস্কার

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-শাসিত যুগ—লুব্ধ জড়বাদ
আকাশে তুলেছে শির। মোহগ্রস্ত নর
অনিত্য বস্তুর পিছে ছুটেছে উন্মাদ ;
স্বার্থলাগি হানাহানি করে পরস্পর।
অজ্ঞানের কর্দ্দমাক্ত রুদ্ধ জলাশয়ে
অরবিন্দ! ফুটাইলে শ্বেতশতদল
বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার। জ্ঞান-গঙ্গা হিমালয়ে
বন্দী হ'য়ে ছিলো—তার তরঙ্গ উচ্ছল
আনিলে মরুর বক্ষে। গীতার ঝঙ্কারে
জাগালে জড়ের রাজ্যে প্রাণের স্পন্দন।
দুর্জ্জনের মহাত্রাস গাণ্ডীবধন্বারে
অনুরাগে তুমি দিলে পুষ্প ও চন্দন।
শাশ্বত ভারত—তুমি বাণীমূর্ত্তি তার।
বিংশশতাব্দীর ঋষি, লহ নমস্কার।

শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

সূর্য্য যখন ওঠে, পৃথিবী তখন সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে যায়। মোমবাতি জ্বেলে সেই উজ্জ্বলতাকে দেখানো যায় না। শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাবের অনন্ত বিভূতি তেমনি শুধু কথার মালা সাজিয়ে প্রকাশ করাও নিতান্ত অসম্ভব। গঙ্গোত্রীর উৎস হ'তে চলচঞ্চল এক ক্ষীণ ধারা পাহাড়ের বুক চিরে প্রবাহিত হ'য়ে, ক্রমে যেমন হরিদ্বারের তরঙ্গসঙ্কুল বেগবতী স্রোতস্বিনীরূপে মাটির বুকে ছড়িয়ে পড়েছে—প্রসারতা আর গতি লাভ করে, অবশেষে ওই বিশাল বারিধির নীল জলে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে, তেমনি ক'রে, শ্রীঅরবিন্দের বিরাট কর্ম্মময় জীবনের আবির্ভাব হ'য়েছিল এই বাংলার বুকে এবং বাংলা দেশ হ'তেই পণ্ডিচেরীর যোগাশ্রমে তাঁর অনুভূতিময় জীবনের মধ্য দিয়ে সেই কর্ম্মধারা সমগ্র ভারত এবং ক্রমে সমগ্র বিশ্বের প্রাণভূমিকে সঞ্জীবিত ক'রে, মহাকালের বিচিত্র কর্ম্মসংস্থায় মিশে গিয়েছে। এক কথায় মনে হয়, সেই অমলোজ্জ্বল মহাপুরুষ, অনন্তের পথচারী, আলোক-দীপ্তিমান্, যুগসারথি ঐশী করুণারূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন; তাঁর স্বপ্ন, তাঁর সাধনা, তাঁর অধ্যাত্ম-অনুভূতি আজ সমগ্র পৃথিবীর বিচিত্র সম্পদ্।

আমার মনে পড়ে, যখন আমার আট ন বছর বয়স, আমি আমার দাদামশায়, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের কাছে থাকতাম। তাঁর কাছ থেকেই অনেক মহাপুরুষের জীবনী শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু আমি দেখেছি, শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লবী-জীবন সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই তাঁর দীর্ঘায়ত প্রতিভাদীপ্ত চোখ দু'টি যেন আরও বিদ্যুতের মত জ্বলে উঠ্‌ত। সেই বিচিত্র, রহস্যময়, রোমাঞ্চকর কাহিনীগুলি তিনি একে একে বলে যেতেন, আর আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে সেই বিপ্লবীর অসাধারণ জীবনকাহিনী শুনে যেতাম—আর সেই সব কথা চিন্তা ক'রে আমার মধ্যেও একটা অশান্ত শিহরণ ব'য়ে যেত। আজ বুঝতে পারি, কেন এই জ্ঞানতপস্বী ত্রিবেদী মহাশয় এতখানি বিস্ময়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দের নাম করতেন। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে যোগজীবনে আবদ্ধ করে রাখার জন্য বাইরের জনসমাজ তাঁকে আর কাছে পায় নি, সমস্ত ভারতবর্ষ সর্ব্বদাই চেয়েছে তাঁর নেতৃত্ব; কয়েকবার সে প্রচেষ্টাও হয়েছে তাঁর কাছে আবেদন নিবেদন করে। কিন্তু তিনি সে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। তাঁর স্বপ্ন ছিল, অধ্যাত্ম ভারতের পূর্ণবিকাশ; ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করে, ভারত তার জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রেমধর্ম্মে বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করবে। অতীতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের ন্যায় তিনি সেই অমৃতের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই বিশ্ববাসীর কাছে খুলে দিয়েছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র মন্থন করে তিনি আমাদের মুক্তির নির্দ্দেশ দিয়েছেন—আর স্বীয় (
নিখিল বিশ্বে নামিয়ে এনেছেন সে
সেই দিব্য করুণা, যা' জড়ত্বের
আলোকের সন্ধান দেবে। আমার নিজস্ব একটা কথা আমি এখানে বল্‌ব। আমার প্রিয়বন্ধু, পণ্ডিচেরীর শ্রীদিলীপকুমার রায়কে আমার একটা অনুভূতির কথা লিখেছিলাম, "কখনও কখনও মনে হয়, যেন একটা আলো পৃথিবীর বুকে নেমে আসছে—এটা কি ভ্রান্তি, না আলেয়ার মত একটা কিছু?—তুমি শ্রীঅরবিন্দের কাছে এটা জিজ্ঞাসা করে জানাতে পারো?" দিলীপ উত্তর দিয়েছিল, "আমি গুরুদেবকে জানিয়েছি—তিনি বলেছেন—"It is real light that has reached earth; it is not a phantasy." এই আলোকের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর যোগসাধনায় তিনি এই আলোর উৎস খুঁজে বে'র করেছিলেন—আর সেই আলোকের ধারা এই মরজগতে নিয়ে আসবার সাধনাতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। কিন্তু এই দিব্যজীবনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও তিনি বলেছেন, "My speculation about an extreme form of divinisation are something in a far distance, and are no part of the pre-occupations of the spiritual life in the near future." তিনি বলেছেন, "Matter itself is secretly a form of the spirit and has to reveal itself as that, can be made to wake to consciousness and evolve and realise the spirit, the divine within it," এই দিব্যজীবনের স্বপ্ন শ্রীঅরবিন্দ সাধনায় আজ একান্ত বাস্তব সত্যরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে আমরা উন্মুখ হ'য়েছিলাম এই বিরাট পুরুষের বাণী স্মরণ করে, তাঁর বিপুল প্রতিভা, তাঁর অপরিসীম জ্ঞান, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে লক্ষ্য করে। ভারতে স্বাধীনতার ঋত্বিক, এই মহাযাজ্ঞিকের হোমানলে আমাদের স্বাধীনতার সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, "It is the spirit alone that saves, and only by becoming great and free in heart, can we become socially and politically great and free." এই যে মুক্তির সাধনা, এর জন্ম সূচিত হয়েছিল পনেরোই আগষ্টের এক শান্ত উষায়—এর প্রথম অধ্যায় রচিত হয়েছে এই পনেরোই আগষ্টেরই এক গৌরবময় মুহূর্ত্তে, তাই এই দিনটিকে জাতীয় জীবনের এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণরূপে আমরা পূজা করি।

তাই, সর্ব্বপ্রথম নিখিল ভারত শ্রীঅরবিন্দ আবির্ভাব মহোৎসব উদ্‌যাপন করবার জন্যে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে, আমরা যখন শ্রীঅরবিন্দের

মতামত সংগ্রহ করি, তখন শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, "The celebration and the force or the tendency which is trying to push it to the front is part of something that is trying to bring about a new turn in the country and its future ; its success depends upon the temper and the spirit of the people who have taken charge over there and also on the feeling in the Country and how for it is ready to break away or prepare to break away from the old moorings,"

শ্রীঅরবিন্দ নিজেকে যোগে নিবদ্ধ রাখ্‌লেও, তিনি পৃথিবীর ঘটনাবলী সম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকতেন। আমি জানি, তিনি সমস্ত কিছুকেই গ্রহণ করতেন এবং প্রয়োজনমত নির্দ্দেশ বাণী দিতেন। তিনি ছিলেন বিশ্ববন্ধু, উৎসাহ এবং আশ্বাস তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হয়ে থাক্‌ত, আর যে সেই করুণা লাভ করেছে, সেই ধন্য হয়েছে। আমি আমার নিজস্ব কথা বল্‌তে পারি। তাঁর সম্বন্ধে আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ্‌তাম। যা' আমি কখনও ভাব্‌তে পারি নি, সেইরূপ। একদিন আমার দৈনন্দিন পূজায় বসে আমি দেখ্‌লাম, আমার আরাধ্য দেবতার ছবির উপরে শ্রীঅরবিন্দের ছবি জেগে উঠেছে। আর তিনি তাঁর নিজের গলার মালা আমার গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন। আমি এই অনুভূতির কথা একখানা চিঠি লিখে, আর আমার লেখা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটা গান দিলীপের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। দিলীপ শ্রীঅরবিন্দের কাছে আমার সেই চিঠি ও গানটি পাঠিয়ে দিয়েছিল, শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন :

"I have been very much pleased by the account received of Dhiren of Lalgola and the Zeal and energy which he has put in the work for the August 15th celebration. Please let him know now highly I have appreciated the way in which he has opened to the consciousness and force and all the work he is doing and has done. I find his song a very fine poem, beautiful both in language and in bhava.

I suppose his experience about the garland was symbolic in its nature, and my action in it was expressive of my appreciation and indicated that it was my work he had done or was doing and that he had received my power and the credit and crown of the achievement belonged to him."

শ্রীঅরবিন্দের স্বহস্ত লিখিত এই পত্রখানি আমার কাছে আছে।

শ্রীঅরবিন্দ যে রাত্রে মহাপ্রয়াণ ক'রেছেন, সেদিন আমি ছিলাম বেনারসে। তার পরদিন ভোরেই আমার কলকাতায় ফেরবার কথা। মধ্য রাত্রে স্বপ্নে দেখ্‌ছি যেন একটা জ্বলন্ত হাউই অনেক উর্দ্ধে উঠে হঠাৎ ফেটে গেল, আর সেখানে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ প্রভায় শ্রীঅরবিন্দের অপরূপ উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠ্‌ল। আমি নিষ্পলক চোখে সেদিকে তাকিয়েছিলাম। ক্রমে সেই অপরূপ জ্যোতিঃ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেল। আমারও ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, এ কী দেখ্‌লাম। এ কী hallucination না অন্য কিছু। পরদিন ভোরে কাশী হ'তে কলকাতায় চলে এলাম। কিন্তু এরোপ্লেনে সমস্ত পথ সেই স্বপ্নের কথা ভেবে নিজের মনকে সুস্থির করতে পারি নি। ক'লকাতার বুকে পা' দিয়েই সংবাদ পেলাম—শ্রীঅরবিন্দ নেই—সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাজীবন অন্তহীন জ্যোতির্লোকে মহাপ্রয়াণ করেছেন। মনে হ'ল পূর্ব্ব রাত্রের সেই স্বপ্নের কথা। সেই স্বপ্ন অবাস্তব নয়, সত্যেরই রূপান্তর। এমনি ভাবেই, স্বপ্নের ভিতর দিয়ে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহাপ্রয়াণের ছবি আমাকে দেখিয়েছেন।

যদিও এই পার্থিব জগতে তাঁকে আমরা আর দেহী শ্রীঅরবিন্দরূপে দেখ্‌তে পাব না—কিন্তু তিনি ঠিক আগেও যেমন আমাদের মধ্যে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি আছেন ও চিরদিন আমাদের মধ্যেই থাকবেন। যুগে যুগে জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বিদ্যুতের ঝলকের মত পথ দেখাবার জন্যে আসেন—আবার চলে যান—রেখে যান তাঁর কর্ম্ম-বিভূতির ধারা, তাঁর মধুময় ছন্দ, তাঁর যোগের অপরূপ প্রভাব। আমাদের অন্তর্জগতে ধ্যানময় শ্রীঅরবিন্দ তেমনি ভাস্বর হয়ে দেখা দেবেন ; আমাদের কর্ম্মের ক্ষেত্রে, আমাদের জ্ঞানের তরঙ্গ মেলায়, আমাদের ভাবপ্রবাহে, শ্রীঅরবিন্দ বাণী, শ্রীঅরবিন্দ সাধনা, শ্রীঅরবিন্দ সিদ্ধি, শ্রীঅরবিন্দ জীবনদর্শন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে থাকবে, শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুহীন প্রাণ আমাদের সেই অমৃতলোকের সন্ধান দেবে। শ্রীঅরবিন্দ আজ আর শুধু দেহী শ্রীঅরবিন্দ নয়, আজ তিনি কর্ম্মময় সাধনা, জ্ঞানময় সিদ্ধি, ভাবময় ঐশ্বর্য্য। এই অনুভূতি আমাদের জাতীয় মহাশোকের দিনে একমাত্র সান্ত্বনা আর ভবিষ্যতের একমাত্র পাথেয়।

চিরানন্দময় শ্রীঅরবিন্দ চিরানন্দপুরে অবস্থিত হয়েছেন। আত্মা পরমাত্মার পূর্ণানন্দে বিভোর হয়ে উঠেছে।

আঠারো

সাপের ছোবলের মতো বৃষ্টি আর চাবুকের মতো হাওয়া। দানো-পাওয়া রাত্রিটা গোঙাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল মালিনী নদীর জল ফুলে ফুলে উঠছে অজগর-গর্জনে। বরিন্দের রাঙা মাটি ধুয়ে ধুয়ে কাঁকর-পাড়ি কেটে কেটে ঝর্ণার মতো নামছে ঘোলা জল—এক এক রাশ চাঁপা ফুলের মতো সোনালি ফেনা বয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ বেগে। বান আসছে নদীতে।

পাড়ির ধার দিয়ে দিয়ে, পিছল মাটির ওপর সন্তর্পণে পা টিপে টিপে চলল রঞ্জন। সঙ্গে ছাতা আছে বটে, কিন্তু সেটা একটা নিছক বিড়ম্বনা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এখন। এলো-মেলো হাওয়ায় ছাট আটকাচ্ছে না—বরং দমকার ঝাপটায় তাকে শুদ্ধ ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে নদীর ভেতর। বিরক্ত হয়ে ছাতাটা সে বন্ধ করে ফেলল।

এই বৃষ্টি ছাড়া কুমার বাহাদুরের বাড়ি থেকে পালাবার আর কোনো উপায় ছিল না তার। নইলে অনিবার্যভাবেই কাল সকালে এসে দাঁড়াত কুমার বাহাদুরের মোটর—কিছুই বলা যায় না, হয়তো স্বয়ং কুমারই তাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। কিন্তু মিথ্যে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই তাঁকে। নিজের পথ নিজে দেখাই ভালো।

এরই মধ্যে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। ওপরের সবটাই একখণ্ড মসৃণ কষ্টি পাথরের মতো। শুধু উত্তরের কোণায় একটা পিঙ্গল আভা ছড়িয়ে আছে তার ওপর—এই বৃষ্টিটার মধ্যে যেন সাইক্লোনের আভাস আছে কোথাও।

সারা গায়ে কোথাও এতটুকু শুকনো নেই আর। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের দাপট লেগে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে সর্বাঙ্গ। টর্চটাও আর জ্বলছে না—বাল্‌বটা খারাপ হয়ে গেছে খুব সম্ভব। ক্রমাগত পা পিছলে যাচ্ছে—ভয় হতে লাগল এক সময় নদীর মধ্যে গিয়ে না পড়ে।

কিন্তু আশে পাশে দাঁড়াবার জায়গা নেই কোথাও। ইতস্তত বাবলা গাছগুলি ধারাস্নান করছে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর—তলায় আশ্রয় নিলে ঝাঁঝরির মতো বর্ষণ করবে সর্বাঙ্গে। মাথার ওপরে অনবরত মেঘ শাসিয়ে চলেছে—বিদ্যুতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে নিঃসঙ্গ তালগাছদের। এমনি রাত্রে তালগাছ দেখলে ওর কেমন ভয় করতে থাকে, মনে হয় অপমৃত্যুর একটা থমথমে আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা—যে কোনো মুহূর্তে ওদের বুক চিরে বজ্র নেমে আসবে।

রঞ্জন দ্রুত পা চালাতে চেষ্টা করল।

হাঁটতে হবে—বেশ খানিকটা না হাঁটলে ঠাঁই মিলবেনা রাত্রের মতো। এই বৃষ্টি বাতাস ঠেলে সামনে এখনো পুরো তিন মাইল পথ। কালা পুখ্‌রিতে সোনাই মণ্ডলের বাড়ি। তারপর সকাল হলে সেখান থেকে জয়গড়ে।

সকালে তাকে না পেয়ে কুমার বাহাদুরের কী প্রতিক্রিয়া হবে সেটা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু ও নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই কিছু। এতদিন দুজনের মধ্যে একটা মস্‌লিনের পর্দা টাঙিয়ে যে অভিনয় চলছিল, সেটা যে এমন আচমকা শেষ হয়ে গেছে এর জন্যে মনের দিক থেকে বেশ খানিকটা স্বস্তিই বোধ করেছে রঞ্জন। ভালোই হল—একেবারে মুখোমুখি এর পর থেকে। স্পষ্ট, নগ্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দিনের পর দিন শত্রুতার কটুগ্রাস অম্ল গলাধঃকরণ করার হাত থেকে বহু-বাঞ্ছিত মুক্তি।

কিন্তু এই তিন মাইল পথ যে তিনশো মাইলের চাইতেও দুর্গম এখন।

ক্রমাগত চশমার কাচ মুছতে মুছতে এখন একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে! শুধু অকূল সমুদ্র পাড়ি দেবার মতো দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে সে। অন্ধ—নিঃসন্দেহে অন্ধ। বৃষ্টি আরো ঘন হয়ে জমছে তার

পাশে—কোন্ সময় সোজা নদীর জলে গিয়ে পড়ে ঠিক ঠিকানা নেই।

কী করা যায় ?

রঞ্জন দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু দূরে একটা বটগাছের আদল আসছে যেন। যাবে নাকি ওদিকেই ? নদীর ধার ছেড়ে নেবে মাঠের রাস্তা ? আপাতত সেটাই যেন যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে।

দু পা এগোতেই সে থমকে দাঁড়ালো। চশমাটা খুলে নেওয়াতে কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উপকারও হয়েছে খানিকটা। এখন চশমা থাকলে দুর্গতি ছিল কপালে।

এধারে প্রায় দশবারো ফুট গভীর একটা কাঁদড় আছে এবং তার মধ্য দিয়ে খরধারে ছুটছে জল। হাতের ছাতাটা সজোরে এটেল মাটিতে চেপে ধরে সে হুড়মুড় করে একটা বিরাট পতনকে সামলে নিলে।

—কে ? কে ?

বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে—ফাঁকা মাঠের এই দুর্যোগ-ভরা অন্ধকারে কোথা থেকে প্রেতকণ্ঠ বেজে উঠল। মুহূর্তের জন্যে রঞ্জনের শিরাগুলো চমকে থেমে গেল—তীব্র অস্বাভাবিক ভয়ে শির শির করে উঠল লোম-কূপগুলো। আর একবার জলের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ার ঝোঁকটা সামলে নিতে হল তাকে।

—কে দাঁড়িয়ে ওখানে ? কথা বলছ না কেন ?

মেয়ের গলা।

সীমাহীন বিস্ময়ে রঞ্জন দৃষ্টিটাকে বিস্ফারিত করতে চেষ্টা করল। এতক্ষণ পরে যেন একটু একটু করে ঘোর কাটছে। কাঁদড়ের ঠিক ওপারে যেটাকে সে বটগাছ বলে মনে করেছিল—সেখানে দুতিনটে গাছ দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে। আর তাদের অন্ধকার কোলের ভেতর ঘর আছে একখানা। সেই থান থেকেই প্রশ্ন আসছে।

জবাব দেবে কিনা ঠিক করে নেবার আগেই বিদ্যুৎ ঝলকালো। তালগাছের উদ্ধত মাথাগুলোর ওপর উদ্যত খড়্গের আভাস দিয়ে খানিকটা তীক্ষ্ণ শাদা আলো ছুঁয়ে গেল পৃথিবীকে। আর রঞ্জন সেই আলোয় মেটে ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কালোশশীকে।

কালোশশী ! এত কাছে—এই অন্ধকারে এমন করে লুকিয়ে ছিল !

—ঠাকুরবাবু ! তুই ওখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিস্।

চিনেছে—চকিত আলোতেও তা হলে চিনতে পেরেছে !

পা চালিয়ে চলে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতেই রঞ্জন দেখল কোন্ ফাঁকে সাড়া দিয়ে ফেলেছে সে।

—হাঁ, আমি।

বৃষ্টির ঝরঝরানি ছাপিয়ে উদ্বিগ্ন আকুল স্বর কানে এল কালোশশীর : এত রেতে অমন করে ভিজছিস কেন ! কোথায় যাবি ?

—একটু কাজে। কালা পুখ্‌রি।

—কালা পুখ্‌রি !—কালোশশীর স্বরে অপরিসীম বিস্ময় : নদী ফুলে উঠছে, হড়্‌পা নামছে। এখন তোকে কে খেয়া পার করে দেবে ? ঘরে ফিরে যা ঠাকুরবাবু।

—ঘরে ফিরবার জো নেই কালোশশী। আমায় যেতেই হবে—

হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত লজ্জিত আর অপরাধী বোধ করল রঞ্জন। কী দরকার ছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবার—কী প্রয়োজন ছিল প্রকাশ করবার যে এই দুর্যোগের রাতে সে কালা পুখুরিতে চলেছে ? আর কেই বা ভেবেছিল, ঠিক এম্‌নি সময়—এই বর্ষণ বায়ুর চঞ্চলতায় পথের মধ্যে এই ভাবে অপেক্ষা করবে কালোশশী ?

—তবে এইখানে একটু দাঁড়িয়ে যা ঠাকুরবাবু—

—না, আমায় এক্ষুণি যেতে হবে—

রঞ্জন টলতে টলতে আবার রাস্তার দিকে পা বাড়ালো।

—ঠাকুরবাবু—

কাঁদড়ের ওপার থেকে শোনা গেল কালোশশীর মিনতিভরা আহ্বান। কিন্তু আর দাঁড়াবেনা রঞ্জন। নিশ্চিত প্রতিজ্ঞায় কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ সচল হয়ে উঠল নিচের পৃথিবীটা। মাটিতে ছাতার বাঁট পুঁতে একাবর নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু আর সম্ভব হল না। দ্রুতবেগে হাত তিনেক পিছনে গিয়ে অসহায়ভাবে একবার সে ঘুরপাক খেল, তারপর সেখান থেকে ডিগ্‌বাজী খেয়ে সোজা কাঁদড়ের জলে।

ইতিমধ্যে বিদ্যুতের একটা উজ্জ্বল শুভ্রতায় সমস্ত

ব্যাপারটাই পুরোপুরি চোখে পড়েছে কালোশশীর। দুর্যোগের রাত্রিটা ছন্দোসুরভিত হয়ে উঠল হাসির উচ্ছল ঝঙ্কারে। অবগাহন স্নান শেষ করে, এক ঢোঁক জল গিলে রঞ্জন যখন দাঁড়াতে পারল তখন এপার-ওপারের ব্যবধানটা লোপ পেয়ে গেছে। হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে কালোশশী নেমে এসেছে একেবারে জলের কাছে—হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে: হল তো এবার? আমার ঘরে উঠে আয় ঠাকুরবাবু—

এক কোমর জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রঞ্জন বললে, কিন্তু আমাকে যে যেতেই হবে—

কালোশশী শুধু বললে, আমার হাত ধর্—

শেষ পর্যন্ত রাতটা কাটাতে হবে কালোশশীর ঘরে!

কিন্তু আর উপায় নেই। বাইরে সমানে বৃষ্টি আর হাওয়ার দাপট। সাইক্লোনই বটে। অন্ধকার রাত্রিটার গোঙানি চলেছে সমানে। এই প্রাকৃতিক শত্রুতা ঠেলে—অন্ধ দুচোখে পিছল পথের পতন-সম্ভাবনাকে সামলাতে সামলাতে কালা-পুখ্‌রি গিয়ে পৌঁছুনো শারীরিকভাবেই অসম্ভব এখন। তা ছাড়া খেয়াও একটা সমস্যা বটে। এমনিতেই রাত একটু বেশি হলে খেয়া ঘাটের মাঝি ওপারে নৌকো নিয়ে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম লাগায়—তাকে জাগিয়ে তোলা সমস্যা বেশি। তার পর এই রাতে সে এপারের ডাক শুনতে পাবে কিনা বলা শক্ত। আর শুনতে পেলেও এমনি বর্ষার একটি কোমল মসৃণ ঘুম এবং কম্বলের সুখলতা ছেড়ে সে যে কিছুতেই উঠবেনা এ প্রায় নিশ্চিত।

সুতরাং—

সুতরাং মেটে প্রদীপের কাঁপা কাঁপা আলোয় কালোশশীর ঘরটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখল রঞ্জন।

আশা করা যায়না, তবু একটা ভাঙা ছোট তক্তোপোষ আছে ঘরে। ওই তক্তোপোষের নিচেই বোধ হয় আছে কালোশশীর যা কিছু তৈজসপত্র। ঘরময় অনেকগুলি শিকে ঝুলছে, তাতে কিছু রঙবেরঙের হাঁড়ি। এককোণে মেলায়-কেনা একখানা মনসার সরা—তার ওপর বিষহরির মূর্তিটা প্রদীপের ম্লান আলোয় একটা অদ্ভুত হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

—এই তোর ঘর?

—হ্যাঁ, এই আমার ঘর।

—পরশুরাম কোথায়?

—সে তো এখানে থাকে না।

—থাকে না? তবে কোথায় সে?

—আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।

—চলে গেছে?—রঞ্জন চকিত চোখে তাকালো ঘরের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকা কালোশশীর দিকে। কিন্তু বেদনার কোনো চিহ্ন নেই কালোশশীর মুখে—কোনো ছাপ পড়েনি বিরহ-জর্জরতার। স্রোতের জলে আরো অনেকের মতোই ভেসে এসেছিল পরশুরাম—তেমনি স্রোতের বেগেই আর একদিন বিদায় নিয়ে গেছে কালোশশীর জীবন থেকে। বাঁধা ঘাটে একটি রেখাও কোথাও এঁকে রেখে যায়নি।

কালোশশী নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বললে, হাঁ, ভিন্ গাঁয়ে গিয়ে সাঙ্গা করেছে আবার।

—তা হলে তুই একা?

—কে আর থাকবে?

তীক্ষ্ণ অর্থভরা ভঙ্গিতে কালোশশী হাসল। অস্বস্তিতে রঞ্জন চমকে উঠল হঠাৎ। মনে হল, এই হাসিটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। সাইক্লোনের এই রাতটার মতো এ হাসিটাও হয়তো যে কোনো মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসতে পারে।

প্রসঙ্গ বদলানো উচিত। আরো মনে পড়ল: একদিন অন্ধকার পথে আচমকা তাকে পথে ছেড়ে দিয়ে কালো রাত্রির আড়ালে রহস্যময়ীর মতো মিশিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা। সেদিন পাশাপাশি খোলা আকাশের তলায় পথ চলতে চলতে যে কথাটা শুধু ইঙ্গিতের মধ্যেই ঝলক দিয়েছিল—এই বিচিত্র রাত্রির নিঃসঙ্গ ঘরটির অন্তরঙ্গ নিবিড় অবকাশে তার স্পষ্ট হয়ে উঠতে কতক্ষণ? বনের সাপ নিয়ে যার কারবার, তার মনের সাপটার সময় আর সুযোগ বুঝে ফণা তুলে আত্মপ্রকাশ করতে কতটুকু দেরী হতে পারে?

অস্বস্তিতে রঞ্জন নড়ে উঠল।

—এত রাত অবধি জেগেছিলি কেন কালোশশী?

—সাপ ধরছিলাম।

—সাপ।

—হাঁ, শুয়েছিলাম—গায়ের ওপর দিয়ে হল্ হল্ করে চলে গেল। বর্ষার জল পেয়ে কোন ফোকর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। চেপে ধরতে গেলাম—ফোঁস্ করে উঠল, পালালো বারান্দায়। আমার কাছ থেকে পালাবে? খপ্ করে ধরে হাঁড়িতে পুরেছি।

—কী সাপ?

—শামুক ভাঙা আলাদ। খুব তেজী। একটু হলেই কেটে দিত। দেখবি?

রঞ্জন শিউরে উঠল: না, না থাক।

—ভয় পাচ্ছিস? আমার ঘরটাই তো ভরা। যত হাঁড়ি দেখছিস, সব ওরাই আছে। একবার খুলে দিলে কিল্‌বিল্ করে ঘুরে বেড়াবে ঘরময়।

—থাক, থাক—রঞ্জন সভয়ে বললে।

কালোশশী আবার খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল: আমার আর কেউ নেই—ওরাই থাকে সঙ্গে। মানুষের মতো নিমকহারাম নয়—পোষ মানে।

—পোষ মানে! সাপ আবার পোষ মানে! যেদিন ছোবল মারবে ফস্ করে—বুঝবি সেদিন।

—একবারই মারবে—ব্যাস্ ফুরিয়ে যাবে তারপরে। মানুষের মতো বারে বারে ছোবল দিয়ে জ্বালিয়ে মারবে না।

গলার স্বর কি গভীর হয়ে উঠল কালোশশীর? কখনো কি গভীর হয়? কেমন যেন বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভয় করে। কালোশশীর রূপোর কাঁকন-পরা হাত দুটোয় যেন কালনাগের ছন্দ—তার বাহুর ভঙ্গিতে ওই কাঁকনের দীপ্তি যেন চমক খেয়ে ওঠে সাপের মাথার চক্রের মতো।

বাইরে বৃষ্টি চলছে—চলছে বাতাসের পাগলামি। জলের কল-গর্জন আসছে। নদীর, না কাঁদড়ের? সর্বাঙ্গে ভিজে একাকার হয়ে গেছে—কাপড় বদলাবার মতো শুকনো কিছু কালোশশীর ঘরে প্রত্যাশা করাও বিড়ম্বনা। সাইক্লোন বাড়ছে। এই রাত্রিকে বিশ্বাস নেই—বিশ্বাস করতে সাহস হয় না কালোশশীকেও।

এর চাইতে পথই ছিল ভালো। আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তেও কোথাও না কোথাও, একটা না একটা গাছের আশ্রয় মিলতই। তারপর ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেয়া পার হয়ে—

নাঃ, আর এখানে থাকার মানে হয় না। যেতেই হবে।

—আমি যাই কালোশশী—

—ঠাকুরবাবু—হঠাৎ বিচিত্র গলার একটা ডাক এল।

প্রদীপের আলোয় ভুল দেখল নাকি আজো? আজো কি সেদিনের সন্ধ্যার মতো একটা কিছুর অস্ফুট আভাস পেল সে? কালোশশীর চোখে কি জলের রেখা চকচক করছে?

—আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরবাবু—

—কোথায়?

—তোমার ঘরে।

পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল মেয়েটা। প্রস্তুত হওয়ার এক বিন্দু সময় না দিয়ে হাওয়ার একটা দমকার মতোই এগিয়ে এল রঞ্জনের দিকে। তারপর দু-হাতে তার পা জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে বসে পড়ল সেখানে: আমায় নিয়ে চলো ঠাকুরবাবু।

—পা ছাড়, পা ছাড়। কী পাগলামি হচ্ছে এসব?—রঞ্জন প্রাণপণে পা ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল। আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ এক মুহূর্তে পাথর হয়ে গেছে।

—আর আমি সাপ নিয়ে ঘর করতে পারি না। আমি জ্বলে মরছি ঠাকুরবাবু—জ্বলে মরছি সাপের বিষে। আমাকে তুমি নিয়ে যাও—তোমার যেখানে খুসি নিয়ে যাও। আর আমি সইতে পারছি না।

একটা নির্জীব পুতুলের মতো স্থির হয়ে বসে রইল রঞ্জন। তার পা দুখানা বুকের মধ্যে সজোরে আঁকড়ে ধরে অর্থহীন আকুলতায় ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল কালোশশী—যেন বাইরের এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ রাতটার মতো তার সে কান্না আর কোনো দিন থামবে না।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতায় নূতন চিকিৎসালয়—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা শিয়ালদহে সার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজে একটি সুবৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তথায় বহিরাগত রোগীদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদান করা হইবে। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় অস্ত্র-চিকিৎসা, সাধারণ চিকিৎসা ও চক্ষু চিকিৎসার আয়োজন থাকিবে। কলিকাতায় কোন একটি গৃহে

হায়দ্রাবাদের নিজাম সহ ভারতের সহকারী প্রধান মন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল

এরূপ সর্বপ্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থার আয়োজন পূর্বে ছিল না। প্রত্যহ তথায় দেড় হাজার রোগী দেখা চলিবে। ইহা শুধু কলিকাতার বৃহত্তম চিকিৎসালয় হইবে না—সমগ্র ভারতের বৃহত্তম চিকিৎসা-কেন্দ্র হইবে। আমাদের বিশ্বাস, কলিকাতার লোকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে এই নূতন চিকিৎসালয় খোলার পরও সকল রোগীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সম্ভব হইবে না।

কলিকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থা—

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম মাত্র ৫০টি গৃহের সহিত সংযুক্ত করিয়া টেলিফোন ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯০২ সালে ৬৯০টি গৃহে টেলিফোন হয় ও ১৯২১ সালে ৭৪০০ গৃহে টেলিফোন দিয়া হেয়ার ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান টেলিফোন গৃহ নির্মিত হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতায় ১০টি পৃথক একস্‌চেঞ্জ হইতে ২০ হাজার ৩শত গৃহে টেলিফোন দেওয়া হইয়াছে। এ ব্যবস্থাও পর্য্যাপ্ত নহে—সেজন্য গত ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা লালদিঘীর দক্ষিণে একটি নূতন টেলিফোন গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ও সরকার কর্ত্তৃক শাসন ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পরে টেলিফোন ব্যবস্থার যে অবনতি হইয়াছে তাহা সর্বজন-বিদিত। শুধু সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া কোন লাভ হইবে না—টেলিফোন ব্যবহারকারীরা যাহাতে ঠিক সময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, সেজন্য সুপরিচালনার ব্যবস্থা হইলে লোক উপকৃত হইবে।

ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন—

গত ১লা জানুয়ারী রেঙ্গুনে রামকৃষ্ণ মিশন হলে নিখি ব্রহ্ম বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মে নিযুক্ত ভারতীয় দূত ডাঃ এম-এ-রউফ সম্মিলনের উদ্বোধন করেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতিত্ব করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও লক্ষ্ণৌয়ের অধ্যাপক ডা নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সম্মিলনে যোগদান করিয়াছেন। ব্রহ্ম প্রবাসী রায়বাহাদুর শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু অভ্যর্থনা সমিতি সভাপতিরূপে সকলকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীরা একত্র হইয়া এই সম্মিলনের মধ্য দিয়া বাঙ্গলা কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকেন। দ্বিতী মহাযুদ্ধের পূর্বে এই সম্মিলন সোৎসাহে সম্পাদিত হইত আবার এই সম্মিলনের দ্বারা বাঙ্গালীদের সহি

বঙ্গবাসীদের সম্প্রীতি স্থায়ী ও দৃঢ় করা হউক, সকলে ইহাই প্রার্থনা করে।

বিহার হইতে রপ্তানী বন্ধ—

গত ২৭শে ডিসেম্বর বিহার সরকার আদেশজারি করিয়াছেন, বিহার হইতে বিহারের বাহিরে মাছ, আম, কলা, ঘি, মাখন, শাকসব্জী, রাঙ্গাআলু, খোল প্রভৃতি রপ্তানী করা চলিবে না; ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কারণ বিহার হইতে বাংলায় ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হইত। এ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের খাদ্যসঙ্কট আরও বাড়িবে এবং তাহাদিগকে খাদ্য-উৎপাদন বিষয়ে অধিক মনোযোগী হইতে হইবে। বর্তমান খাদ্যসঙ্কটের দিনে বিহার-সরকারের এই ব্যবস্থা বাঙ্গালীর চিন্তার বিষয় হইয়াছে।

অধ্যাপক বিমান-বিহারী মজুমদার—

আরা (বিহার) কলেজের প্রিন্সিপাল খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিত শ্রীবিমান-বিহারী মজুমদার ১৯৫১ সালের জন্য ভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি ইতিহাস ও অর্থনীতিশাস্ত্রে এম-এ এবং রাজনীতিতে পি-আর-এস; বাংলা ও হিন্দী সাহিত্যে তাঁহার দানও অল্প নহে। ডাঃ মজুমদার দীর্ঘকাল প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তাঁহার বয়স মাত্র ৫১ বৎসর।

ভারত সংস্কৃতি পরিষদ—

গত ১১ই পৌষ কলিকাতা ভারত সভা হলে খ্যাতনামা দার্শনিক ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের সভাপতিত্বে ভারত সংস্কৃতি পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মতিলাল দাশ জানান যে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে পরিষদের ২৬টি শাখা কেন্দ্র স্থাপিত ও ১০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে এবং পরিষদের পক্ষ হইতে ৩খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। কলিকাতা ছোট আদালতের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গাঙ্গুলী সভায় পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরিষদ পুস্তকপ্রকাশ, যাত্রা, সিনেমা, পাঠাগার, বক্তৃতামালা, প্রচারক-প্রেরণ প্রভৃতি দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারের ব্যবস্থা করিবে।

পাটনার বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন বক্তৃতায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল—
দক্ষিণে এবং বামে বিহারেরগভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—

গত ৩১শে ডিসেম্বর রবিবার মধ্যাহ্নে কলিকাতাস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি হলে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষা দান কেন্দ্রের অঙ্গস্বরূপ ১৪৮টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—তাহা ছাড়া জেলা ও মহকুমা সহরগুলির

গ্রন্থাগারগুলিকেও সাহায্য দান করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্ত্তমানে ৮৮টি কলেজ ও ১১ শত হাই স্কুল আছে—সে গুলির সঙ্গেও ভাল গ্রন্থাগার রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে—এইভাবে যে দেশে ক্রমশঃ গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে—শিক্ষা-মন্ত্রী তাঁহার ভাষণে তাহা বিবৃত করেন। গ্রন্থাগার সমিতির চেষ্টার ফলেও বহু নূতন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও বহু লোক গ্রন্থাগার পরিচালন বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া ঐ সকল পাঠাগার সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতেছেন। সম্মিলনে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের বহু প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন। দেশে অধিকসংখ্যক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইলে শুধু জনসাধারণের পুস্তক পাঠ দ্বারা সময় কাটাইবার ব্যবস্থা হইবে না—জ্ঞান বিস্তারের ফলে দেশবাসী উপকৃত হইবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত প্রভৃতির চেষ্টায় সম্মিলন ও তাহার সঙ্গে অনুষ্ঠিত গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র-প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

যক্ষ্মা নিবারণে সাহায্য দান—

পশ্চিম বঙ্গে যক্ষ্মা রোগের বিস্তৃতি এত অধিক দেখা যাইতেছে যে তাহা নিবারণ ব্যবস্থার প্রচার বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়াছে। সে জন্য বাঙ্গলার রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু সর্ব্বত্র টি-বি-শীল নামক টিকিট বিক্রয়ের দ্বারা ঐ কার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সকলেই জানেন, যক্ষ্মা চিকিৎসার হাসপাতাল গুলিতে এত স্থানাভাব যে প্রায়ই দরিদ্র রোগীসমূহ সে জন্য চিকিৎসা-ভাবে মারা যায়। শুধু সরকারী চেষ্টায় ইহার প্রতীকার হওয়া সম্ভব নহে। সে জন্য সর্ব্বত্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে চিকিৎসা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার আয়োজন হইবে। আমাদের বিশ্বাস, সকলে যথাশক্তি এ বিষয়ে অর্থ সাহায্য করিয়া এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

বিগত '৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলালের ইউ-এস-এ যাত্রার প্রাক্কালে সর্দারজীর বিদায় অভিনন্দন

সার যদুনাথ সরকার—

গত ১০ই ডিসেম্বর খ্যাত-নামা ঐতিহাসিক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার অধ্যাপক সার যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ৮০ বৎসর বয়স হওয়ায় তাহাকে কলিকাতাস্থ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী হলে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। উক্ত সোসাইটি ও বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন করিয়াছিলেন। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বহু সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সরকারকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া বাণী প্রেরিত হইয়াছিল। অভিনন্দনের উত্তরে অধ্যাপক সরকার দেশবাসী সকলকে ইতিহাস চর্চ্চায় ও ইতিহাস রক্ষার জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইতে নির্দ্দেশ দান করেন। অধ্যাপক যদুনাথ বাংলার অন্যতম গৌরব—তিনি শতায়ু হইয়া শান্তিতে জীবন যাপন করুন, আমরাও তাহাই প্রার্থনা করি।

পরলোকে রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত—

ভারতীয় কৃষি বিভাগের সুপ্রসিদ্ধ কর্মী রাজেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রমেশচন্দ্র গত ১৯শে ডিসেম্বর মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনিও কৃষি বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়া দুই খণ্ড কৃষিবিজ্ঞান, গোপালন প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত

রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

হইয়া এম-এ ক্লাসের পাঠ্য হইয়াছে। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উৎসাহী কর্মী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ও নট হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার—

পশ্চিম বঙ্গ পুলিসের আই-বি বিভাগের ডেপুটী ইন্‌সপেক্টর জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ পুলিসের ইন্‌সপেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। তিনি ২২ বৎসর কাল পুলিস বিভাগে কাজ করিয়া বহু কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর তিনি কলিকাতা পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটী কমিশনার ছিলেন ও তাহার পর বিলাতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দ্বারা পুলিসের দুর্ণাম দূর হইয়া পুলিস

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

প্রকৃত জনসেবায় উদ্বুদ্ধ হউক, সর্বান্তঃকরণে আমরা ইহাই কামনা করি।

পরলোকে প্রবোধচন্দ্র পালিত—

আসামের অবসরপ্রাপ্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রবোধচন্দ্র পালিত মহাশয় সম্প্রতি ৬৮ বৎসর বয়সে বোম্বায়ে

প্রবোধচন্দ্র পালিত

পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী ছিলেন ও শ্রীহট্ট হিন্দু মহাসভার সহ-সভাপতি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীঅমৃতরঞ্জন পালিত আমেরিকায় ভারত গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ বিভাগের প্রধান কর্তা ও দ্বিতীয় পুত্র ইন্দুভূষণ বোম্বাই প্রকাশ কটন মিলের ম্যানেজার।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ভারত—কমনওয়েলথ তৃতীয় টেষ্ট

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারত ভ্রমণকারী ২য় কমনওয়েলথ দল এ পর্য্যন্ত তিনটে টেষ্ট ম্যাচ সমেত ২১টি খেলা শেষ করেছেন। এই ২১টি খেলার মধ্যে দশটি খেলায় কমনওয়েলথ দল জয়লাভ করেছেন এবং বাকি এগারটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে ও ভারতীয় দলের শক্তির তুলনা করলে দেখা যায় যে ভারতীয় দল ব্যাটিং ও বোলিংএর দিক দিয়ে কমনওয়েলথ দলের চেয়ে কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়। তবুও বোম্বেতে দ্বিতীয় টেষ্টে ভারতীয় দল শোচনায়ভাবে দশ উইকেটে পরাজিত হয়েছে।
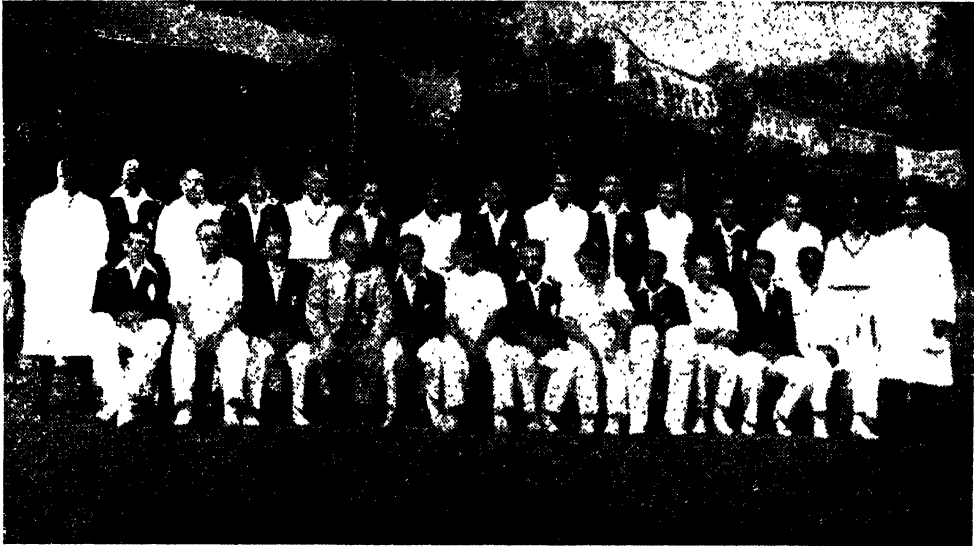
তৃতীয় টেষ্টে সর্ব্ব-ভারতীয় ও দ্বিতীয় কমনওয়েলথ্ দলের খেলোয়াড়গণ ফটো—ডি, রতন

মনওয়েলথ দল এখনও অপরাজিত আছেন, উপরন্তু াম্বেতে দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে জয়লাভ করে টেষ্ট 'রাবার' াভের পথ প্রশস্ত করে রেখেছেন। অথচ কমনওয়েলথ্

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় টেষ্ট খেলার সূচনায় মনে হয়েছিল ভারতীয় দল গত বৎসরের মতন এবারও এই ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের মাটিতে কমনওয়েলথ্ দলকে

পরাজিত করে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে ও টেষ্ট বিজয়ের পাল্লাও সমান রাখবে। কিন্তু আমাদের সে

ভারতের অধিনায়ক বিজয় মাধবজী মার্চ্চেণ্ট ফটো—রমেন চট্টোপাধ্যায়

আশা খেলার শেষদিন অবধি পোষণ করেও দুরাশাই রয়ে গেল খেলাটির ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যাওয়ায়।

ওয়ারেল, লেসলী এম্‌স, ব্রুস্‌ ডুল্যাণ্ডস্‌, জর্জ্জ এমেট্‌, জর্জ্জ ট্রাইব প্রমুখ দুর্জ্জয় কমনওয়েলথ্‌ ব্যাটস্‌ম্যানদের পর্য্যুদস্ত করে, অল্পসংখ্যক রানের মধ্যে কমনওয়েলথ্‌ দলকে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করতে বাধ্য করে, ভারতের জয়লাভের পক্ষে যে সুবর্ণ সুযোগের অবতারণা করেছিলেন, ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানেরা তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিতে সক্ষম হন নি—তাঁদের দ্রুত রান তোলার শক্তির অভাবে। দলের পতনের মুখে দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং কৌশলের পরিচয় ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা বহুবার দিয়েছেন। কিন্তু দলের জয়লাভের জন্য শঙ্কাবিহীনভাবে পিটিয়ে খেলে দ্রুত রান্‌ তোলার শক্তির পরিচয় ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানরা দিতে পারছেন না—অবশ্য দুই একজন ছাড়া। এই দুই একজনের

কমনওয়েলথ্‌ অধিনায়ক লেসলী এম্‌স

টস্‌

ভারত অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট ও কমনওয়েলথ্‌ অধিনায়ক লেসলী এম্‌স উদগ্রীব নেত্রে টসের ফলাফল নিরীক্ষণ করছেন। কমনওয়েলথ্‌ দলের ম্যানেজার ও ইংলণ্ডের ভূতপুর্ব্ব প্রসিদ্ধ উইকেট রক্ষক জর্জ্জ ডাক্‌ওয়ার্থকেও, টসের ফলাফল জানবার জন্য মার্চ্চেণ্টের হস্তনিক্ষিপ্ত মুদ্রার দিকে, স্মিত মুখে চেয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।

ফটো—রমেন চট্টোপাধ্যায়

খেলার প্রথম দিনে, কমনওয়েলথ দলের প্রথম ইনিংসে ভারতীয় বোলাররা নরম উইকেটের সহায়তায় ক্র্যাক মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয়, পলি উমরিগড়ের। ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংসে উমরিগড় উইকেটের

চারিদিকে প্রচণ্ড মার মেরে ও সর্ট রানের সাহায্যে দ্রুত রান্ তুলে কমনওয়েলথ্ বোলার ও ফিল্ডারদের যে ভাবে বিপর্য্যস্ত করে তুলেছিলেন, তা সত্যই দর্শনীয় ও

বিজয় মার্চ্চেন্টের অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন।

উপভোগ্য হয়েউঠেছিল এবং মনে হয়েছিল তাঁর এই মরসুমের দ্বিতীয় টেষ্ট সেঞ্চুরী করবার পক্ষে কোনও কমনওয়েলথ্ বোলারই বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ ৯৩ রানের মাথায় তিনি আউট হয়ে যান এবং তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় দলের রান্ ওঠাও মন্দীভূত হয়ে পড়ে। পরে সি, এস, নাইডুও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পিটিয়ে খেলার দ্বারা দ্রুত রান্ তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু এই দুইজন ব্যাটস্‌ম্যান্ ছাড়া দ্রুত-গতিতে রান্ তোলবার শক্তি আর কোনও ব্যাটস্‌ম্যান্ই দেখাতে পারেন নি। বিজয় হাজারেও তাঁর স্বাভাবিক ধৈর্য্যপূর্ণ খেলা ছেড়ে পিটিয়ে খেলবার চেষ্টা যে করেছিলেন তা তাঁর অ-হাজারে সুলভ একটি 'ওভার বাউণ্ডারী'মার থেকেই বোঝাযায়। কিন্তু দ্রুত রান্ তোলাতে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তবে দ্রুতগতিতে রান তোলা ছাড়া বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যানের এ

মরসুমের এই দ্বিতীয় টেষ্ট সেঞ্চুরী সত্যই দর্শনীয় ও সুন্দর হয়েছিল। কিন্তু হাজারে, উমরিগড়, মার্চ্চেন্ট প্রভৃতির মতন ব্যাটস্‌ম্যান্ এবং মানকাদ, চৌধুরী, সি, এস, ফাদকারের মত বোলারদের পেয়েও, ভারতবর্ষ যে কেন টেষ্ট ম্যাচে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারছে না, তা সত্যই ভাববার কথা।

টেষ্ট ম্যাচের ফলাফলের জন্য খেলোয়াড়দের চেয়ে খেলোয়াড় নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্বই বেশী। নির্ব্বাচকদের দূরদর্শিতার উপরই নির্ভর করছে দলের জয়পরাজয়। কিন্তু এই তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচে নির্ব্বাচক মণ্ডলী মাস্তাক আলিকে বাদ দিয়ে অপরিণামদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন মাস্তাকের বদলে রেগেকে মার্চ্চেন্টের সঙ্গে 'ওপন্' করানতে কিছু ভুল হয়নি। কিন্তু মোদীর বদলে মাস্তাককে দলে রাখা উচিত ছিল। মাস্তাকের মতন একজন বেপরোয়া পিটিয়ে

কমনওয়েলথ দল ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন।

খেলার মতন ব্যাটস্‌ম্যানের অভাব এই তৃতীয় টেষ্টে বেশ ভালভাবেই বোধ করা গেছে। উমরিগড় ও সি, এসএর সঙ্গে যোগ দিয়ে মাস্তাক অতি দ্রুত রান তুলে দিতে পারলে মার্চ্চেন্ট অনেক আগেই ভারতীয় দলের প্রথ

ইনিংসের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করতে পারতেন এবং সময় হাতে থাকলে ভারতের পক্ষে জয়লাভ করাও হয়ত অসম্ভব হত না। অবশ্য চতুর্থ টেষ্টে মান্তাককে দলভুক্ত করা

ভারতের ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যানদ্বয়
মধুসূদন রেগে ও বিজয় মার্চ্চেণ্ট ব্যাট করতে মাঠে নামছেন।

কমনওয়েলথ্‌ ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যানদ্বয়
আইকিন্‌ ও গিম্‌লেট ব্যাট করতে মাঠে নামছেন। ল্যাঙ্কশায়ার কাউণ্টির ওপনিং ব্যাটস্‌ম্যান্‌ আইকিন এই তৃতীয় টেষ্টে কমনওয়েলথের প্রথম ইনিংসে দলের পতনের মুখেও অপূর্ব্ব দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে, অপরাজিত থেকে ৯৬ রান করেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসেও শতাধিক রান করে অনবদ্য ব্যাটিং সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন।

ভারত অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট ২৯ রান করে কমনওয়েলথ্‌ ফাষ্ট বোলার রিজ্‌ওয়ের বলে ষ্টিফেনসনের হাতে ধরা পড়ে, প্যাভিলিয়ানে ফিরে আসছেন।

কমনওয়েলথ্‌ অধিনায়ক লেসলী এম্‌স এন্‌. চৌধুরীর বলে আউট হয়ে ফিরে আসছেন। চৌধুরী উভয় ইনিংসেই এমস্‌কে • ও ৫ রানে প্যাভিলিয়ানে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

হয়েছে। কিন্তু ওপন্ ব্যাট ও ফিল্ডার হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখান সত্ত্বেও রেগেকে যে কি যুক্তিতে বাদ দেওয়া হ'ল তা বোঝা গেল না। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গোপীনাথকে একটি টেষ্ট ম্যাচে সুযোগ দেওয়া
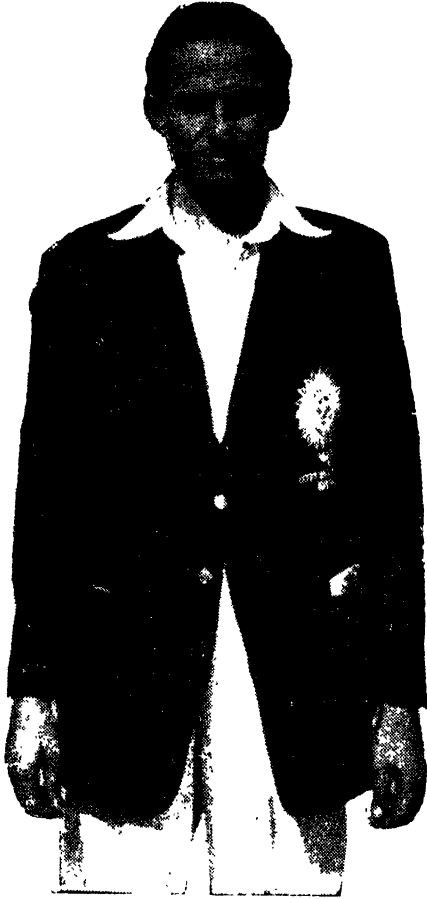
বাংলার মিডিয়াম-ফাষ্ট অফ্ ব্রেক বোলার নীরোদ চৌধুরী। এই তৃতীয় টেষ্টে ইনি তিন জন প্রসিদ্ধ কমনওয়েলথ্ ব্যাটস্‌ম্যান্ জর্জ্জ এমেট্, অধিনায়ক লেসলী এমস্, ও অষ্ট্রেলিয়ান জর্জ্জ ট্রাইব্‌কে উভয় ইনিংসেই আউট করে তাঁর বোলিং চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। মাদ্রাজে চতুর্থ টেষ্টেও তাঁর সাফল্য লাভের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

উচিত বলে মনে হয়। কমনওয়েলথ্ দলের বিপক্ষে সর্ব্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়ে গোপীনাথ যে ভাবে

কমনওয়েলথ্ দলের সহ-অধিনায়ক বিশ্বখ্যাত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ অল-রাউণ্ডার ফ্র্যাঙ্ক ওয়ারেল।
এঁর সাবলীল ব্যাটিং ভঙ্গিমা ও চাতুর্য্যপূর্ণ বোলিং ও তৎপর ফিল্ডিং ক্রিকেট খেলোয়াড় মাত্রেরই অনুকরণীয়।
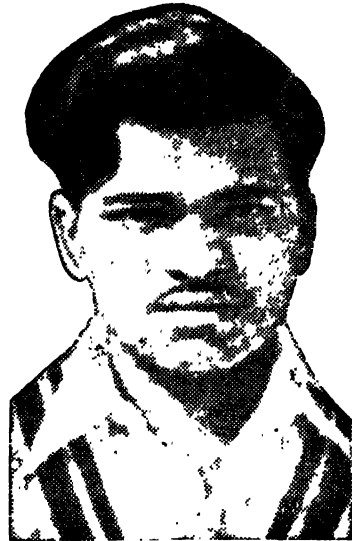
সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ স্পিন্ বোলার সনি রামাধিন্।
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ইংলণ্ড সফরের সময় ইনি দুর্জ্জয় এম্. সি. সি. ব্যাটস্‌ম্যান্‌দের পর্য্যুদস্ত করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের জন্মভূমি এই ভারতের মাটিতে তাঁর খ্যাতি অনুযায়ী সাফল্য লাভ করতে না পারলেও, তাঁর অনবদ্য বোলিং কৌশল সব সময়েই ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যান্‌দের চিন্তার কারণ হয়ে আছে।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটস্‌ম্যান্
ভারতের সহ-অধিনায়ক বিজয় হ্যামলী হাজারে।

এঁরই অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল গত মরশুমে প্রথম কমনওয়েলথ্ দলকে এই ইডেন উদ্যানে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ মরশুমেও দ্বিতীয় ও এই তৃতীয় টেষ্টে শতাধিক রান করে হাজারে পুনরায় তাঁর অপূর্ব্ব ব্যাটিং শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তবে প্রয়োজনের সময় আরও দ্রুতগতিতে রান তোলার অভ্যাস তাঁর মতন ব্যাটস্‌ম্যানের থাকা উচিত।

ফটো—রমেন চট্টোপাধ্যায়

উইকেটের চতুর্দ্দিকে পিটিয়ে খেলেছিলেন তা টেষ্ট দলে স্থান পাবার যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় বলেই মনে হয়। মাত্র সাত রানের জন্য গোপীনাথ শতাধিক রান পূর্ণ করার সম্মান থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁর ভবিষ্যৎ যে খুবই আশাপ্রদ তাতে কোনও সন্দেহই নাই। সম্প্রতি মাদ্রাজ গভর্ণরের দলের হয়ে কমনওয়েলথ্ দলের বিপক্ষে তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ ও চমকপ্রদ ৮৫ রানও উল্লেখযোগ্য। এই সময়েই গোপীনাথের পক্ষে অনুশীলন ও উপযুক্ত কোচিং—যার অভাবে আজ আমাদের দেশের বহু উদীয়মান ও প্রতিভাশালী খেলোয়াড়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—বিশেষ প্রয়োজন।

এই সঙ্গে ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক ও বিখ্যাত 'অল-রাউণ্ডার' লালা অমরনাথের কথাও নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ভুলে থাকা উচিত নয়। অমরনাথের ব্যাটিং ও বোলিং শক্তির অভাব ভারতীয় দল আজ বিশেষ করেই বোধ করছে; কিন্তু কন্‌ট্রোল বোর্ডের সভাপতি ও নির্ব্বাচক-মণ্ডলী কি তা বোধ করছেন?

ফাদকরের বোলিং শক্তির উপরও আর বিশেষ নির্ভর করা যাচ্ছে না। ফাষ্ট্‌বোলার একজন টিমে থাকা দরকার ও নির্ভরশীল ব্যাটস্‌ম্যান্ বলে ফাদকারকে দলে রাখার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আর একজন ফাষ্ট্ বোলারের দরকার হয়ে পড়েছে—যাঁর বল বিশেষ কার্য্যকরী হবে।

যাই হোক, আশা করি পঞ্চম টেষ্টে নির্ব্বাচকমণ্ডলী দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে সুনির্ব্বাচনই করবেন এবং ভারতীয় দলও দ্বিতীয় টেষ্টের ক্ষতি চতুর্থ ও পঞ্চম টেষ্টে পূরণ করে নিয়ে টেষ্ট "রাবার" বিজয়ী হতে পারবে।

পলি উমরিগড় ব্যাট করতে যাচ্ছেন।

এই তৃতীয় টেষ্টে ইনি রামাধিন, ওয়ারেল, ট্রাইব প্রমুখ দুর্জ্জয় কমনওয়েলথ্ বোলারদের পর্য্যুদস্ত করে, উইকেটের চতুর্দ্দিকে চমৎকার ভাবে পিটিয়ে খেলে অতি দ্রুত ৯৩ রান করে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় টেষ্টেও উমরিগড় শতাধিক রান করে তাঁর ব্যাটিং শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন।

ফটো—রমেন চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়া টেষ্ট ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ১৯৪ (৩৭ রানে বেডসার ৪ এবং ৪০ রানে বেলী ৪ উইকেট) ও **১৮১** (হার্ভে ৩১। ৪৭ রানে বেলী ২ এবং ৪৩ রানে বেডসার ২ উইকেট)

ইংলণ্ড ঃ ১৯৭ (ব্রাউন ৬২। ৩৭ রানে ইভারসন ৪ উইকেট) ও **১৫০** (এল হাটন ৪০ রান। জনষ্টোন ২৬ রানে ৪ এবং লিণ্ডওয়াল ২৯ রানে ৩ উইকেট পান)।

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ২৮ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে।

ডুরাণ্ড কাপ ঃ

ভারতীয় ফুটবল মহলে সিমলার বিখ্যাত ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার সূচনা ১৮৮৮ সালে। মিলিটারী ফুটবল দলই পর্য্যায়ক্রমে সুদীর্ঘ বছর ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী হয়। প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে ডুরাণ্ড বিজয়ী হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৪০ সালে। ১৯৪১-১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা স্থগিত ছিল। ১৯৫০ সালের ডুরাণ্ড কাপ ফাইনালের দ্বিতীয় দিনের অতিরিক্ত সময়ে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দল ১-০ গোলে মোহনবাগান ক্লাবকে হারিয়ে দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করেছে। মোহনবাগানের উপর ভাগ্যদেবী যে বিমুখ প্রথম দিনের ফাইনাল খেলার ফলাফলই তার উজ্জল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। প্রথম দিনের ফাইনাল খেলার এক সময়ে মোহনবাগান ২-০ গোলে অগ্রগামী ছিল। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৩ মিনিটে মোহনবাগান দলের গোল রক্ষক এম সরকার গুরুতর আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেণ্টার হাফ আও গোল রক্ষার কাজে পিছিয়ে আসেন। এই সময় থেকেই হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের দশজন খেলোয়াড় মোহনবাগানের গোলে উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালায়। গোল রক্ষায় আওয়ের কাছ থেকে বেশী কিছু আশা করা যায় না, বিশেষ ক'রে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের মত শক্তিশালী দলের সঙ্গে খেলায়। খেলার ১৮ মিনিটে হায়দ্রাবাদ দল একটা গোল শোধ করলো (২-১)। খেলার নির্দ্ধারিত সময়ের ৫ মিনিট আগে উভয় পক্ষেই সমান ২-২ গোল দাঁড়ালো। খেলার এই নাটকীয় সমাপ্তিতে হায়দ্রাবাদ পুলিশ দলের মনোবল বহুগুণ বৃদ্ধি পেল মোহনবাগান দলের তুলনায়। একেই তো হায়দ্রাবাদ শক্তিশালী ফুটবল দল—এ বছরের আন্তঃ প্রাদেশিক সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতার রানার্স আপ এবং রোভার্স কাপ বিজয়ী। সর্ব্বোপরি ভাগ্যদেবী ছিলেন এই দলের প্রতি সুপ্রসন্ন। প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালে হায়দ্রাবাদ পুলিশ ১-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। অন্যদিকে মোহনবাগান ক্লাব ফাইনালে যায় ক'লকাতার রাজস্থান ক্লাবকে হারিয়ে।

দ্রষ্টব্য ঃ—স্থানাভাব হেতু খেলার বিভিন্ন খবর এবারে দেওয়া সম্ভব হ'ল না, আগামী সংখ্যায় বের হবে।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল প্রণীত "অপরাধ-বিজ্ঞান" (৫ম খণ্ড)—৪৲
শ্রীকরুণাসিন্ধু পালিত এম-এ প্রণীত গল্প-গ্রন্থ "রূপলোক"—২৷০
শক্তিপদ রাজগুরু প্রণীত উপন্যাস "সতী-সীমন্তিনী"—১৸০
সতীন্দ্রনাথ লাহা প্রণীত উপাখ্যান "শকুন্তলা"—২৷০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী "মাতঙ্গিনী হাজরা"—৷০
"ভাই" প্রণীত "শ্রীবৃন্দাবন-লীলা"—১৲, "গীতা-লিপি"—১৷০
শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অষ্টাবক্র"—৩৸০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীসতীন্দ্রনাথ লাহা এম, এ

অশোক বনে সীতা

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ফাল্গুন—১৩৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

জাতীয় পরিকল্পনা

ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

১৯৩৮ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। ঐ কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। দেশের বিত্তশালী ও অর্থনীতিবিদদের লইয়া উক্ত কমিশন গঠিত হইয়াছিল। কমিশন কয়েক বৎসর বেশ ভাল ভাবেই কাজ চালান, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠায় আর ভাল ভাবে কাজ চালান সম্ভব হইয়া উঠে নাই। কারণ নেতৃবৃন্দকে কারাবরণ করিতে হয়। তবুও ঐ কমিশনের সেক্রেটারী অধ্যাপক কে টি-সাহ যথাসম্ভব কাজ চালাইয়া যান। তিনি ঐ সময়ে সংগৃহীত তথ্যাদি-দ্বারা কয়েক খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানি একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

যাহা হউক দেশ স্বাধীন হইবার পর পণ্ডিত নেহরুর পরিচালনায় আবার প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হইয়াছে। ভারতের অর্থসচিব শ্রীযুত চিন্তামণি দেশমুখ, শ্রীযুত জি-এল-মেহতা, শ্রীযুত কৃষ্ণমচারী প্রমুখ পাঁচজন বিশেষজ্ঞ লইয়া এই কমিশন গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই বিজ্ঞ ও সুদক্ষ। এই কমিশনের উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইয়াছে আরও ১৭ জন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া। এই প্রবন্ধের লেখকও উক্ত উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য।

ভারত স্বাধীন হইবার পর কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারসমূহ এই তিন বৎসরে যে সমস্ত পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন সেইগুলি বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে আগামী ছয় বৎসরে ৩৬৭০ কোটী টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছিলেন তাঁহার মতে কৃষির উন্নতি, জল সেচ প্রভৃতির জন্য আগামী ছয় বৎসরে ৪০০ কোটী টাকা এবং বিদেশ হইতে অভিজ্ঞ

লোক আনয়ন ও যন্ত্রপাতির আমদানীর জন্য ১১২ কোটী টাকা—অর্থাৎ মোট ৫১২ কোটী টাকা খরচ করিবেন কৃষিখাতে। কৃষির উন্নতির জন্য এই বিপুল অর্থ হয়তো প্রয়োজন হয় না যদি জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়। হিমালয়ের পাদদেশে হস্তিনাপুরে সরকারের সহিত জনসাধারণের সহযোগিতায় যে ৮০ হাজার একর পতিত জমি উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে এবং তাহাতে যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা ভাবিতেও বিস্ময় লাগে। এই ভাবে সহযোগিতা পাওয়া যাইলে আগামী পাঁচ ছয় বৎসরে ১০ লক্ষ একর পতিত জমি অল্প অর্থব্যয়ে ও অল্পশ্রমে চাষ করা সম্ভব হইবে।

কৃষির পরে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য পরিকল্পনা গুলির মধ্যে কেন্দ্রের পরিচালনাধীন—রেল, যানবাহন, পোতাশ্রয়, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিস্তারের জন্য ১০০০ কোটী টাকা এবং উপরোক্ত ব্যবস্থার জন্য যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য খরচ হইবে ১১৪ কোটী টাকা। অর্থাৎ মোট যানবাহন, রেল, টেলিফোন ইত্যাদির জন্য খরচ হইবে ১১১৪ কোটী টাকা। ইহা ছাড়া বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতির জন্য ও কয়লা শিল্পের উন্নতির জন্য ২০০ কোটী টাকা খরচ করিতে হইবে। ভারতের প্রাক্তন শিল্প-সচিব শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভারতের শিল্প প্রসারণের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন তাহার মতে এই উদ্দেশ্যে ৫৮০ কোটী টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন। অন্যদিকে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রীরা যে পরিকল্পনা দিয়াছিলেন তাহা কার্য্যকরী করিতে আগামী ছয় বৎসরে ২০০ কোটী টাকা প্রয়োজন—আর উদ্বাস্তু পুনর্বসতির জন্য প্রয়োজন ১০০ কোটী টাকা।

শুধু রাজস্ব-আয়ের উপর নির্ভর করিয়া ভারত সরকারের পক্ষে এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা একেবারেই অসম্ভব। কারণ ভারতের রাজস্ব বাবদ আয় হয় ৩৮০ কোটী টাকা, আর পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে প্রয়োজন হইবে ৩৬৫০ কোটী টাকা। অর্থাৎ এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হইলে ১০ গুণ অর্থ প্রয়োজন। এদিকে রাজস্বের অর্দ্ধেকের বেশী টাকা ব্যয় হয় দেশরক্ষায়। প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে একা পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন তাহা ছয় বৎসরে কার্য্যকরী করিতে হইলে ৫০০ কোটী টাকার প্রয়োজন। মোটামুটি ভাবে ঐ টাকা ব্যয়িত হইবে—কৃষিখাতে ১০০ কোটী টাকা, স্বাস্থ্যখাতে ২৬০ কোটী টাকা, আর শিক্ষাখাতে ১৪০ কোটী টাকা। অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বার্ষিক আয় ৩৮ কোটী টাকা। কাজেই রাজস্বের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া কি কেন্দ্রীয়, কি প্রাদেশিক—কোন সরকারের পক্ষেই কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

অপর দিকে অর্থের অভাবে দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাও বন্ধ রাখা সম্ভব নহে। এই দেশের লোকই এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ঋণ দান করিয়া দেশ ও জাতি গঠনের সহায়তা করিতে পারে। আমি অবশ্য এখানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি না। কারণ তাহাদের দুরবস্থার কথা, সকলেই জ্ঞাত আছেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের চাইতে ব্যয় বেশী। তাহাদের সঞ্চয়ের কোন কথাই আসে না। কাজেই ঋণ দানেরও প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু এদেশে এমন লোকও তো আছেন—যাহাদের অর্থ অকেজো হইয়া পড়িয়া সঞ্চিত আছে; তাহারা ইচ্ছা করিলে সরকারকে ঋণ দিয়া এই পরিকল্পনা গুলিকে কার্য্যকরী করিতে ও সেই সঙ্গে দেশের সেবা করিতে পারেন, এই বিরাট পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করিতে বহু অর্থের প্রয়োজন। অল্প সুদে বেশী অর্থ যাহাতে সংগৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩৬৫০ কোটী টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনাগুলিকে সার্থক রূপ দেওয়ার ক্ষমতা ভারত সরকারের নাই, তাই ১৮০০ কোটী টাকা ব্যয়ে আগামী ছয় বৎসরের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। জাতির মান উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখিলে প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর অর্থ জমাইতে পারেন। আর সরকারও হয়তো দেশের লোকের নিকট হইতেই ঐ অর্থ ঋণরূপে পাইতে পারেন। ঐ ১৮০০ কোটী টাকার মধ্যে ৮০০ কোটী টাকা ব্যয়ে বিদেশ হইতে কারিগর ও যন্ত্রপাতি আনিতে হইবে। কাজেই ঐ পরিমাণ অর্থ যাহাতে ন্যায্য সুদে বিদেশ হইতে ঋণ পাওয়া যায় ও তার বিনিময়ে কারিগর ও যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়—তাহা হইলে আপাতত ভারতে ১০০০ কোটী টাকা সংগ্রহ করিলেই চলিবে। আন্তর্জাতিক তহবিল হইতে ঋণ পাওয়ার জন্য ভারত সরকার চেষ্টা করিতেছেন। অর্থসচিব শ্রীযুত চিন্তামণি দেশমুখ বিদেশ যাইয়া সম্প্রতি ঋণ সংগ্রহের

চেষ্টা করিতেছেন। অবশ্য ভারতের বৈদেশিক নীতির উপরই ঋণ পাওয়া যাইবে কি না তাহা নির্ভর করিতেছে। ভারত প্রয়োজন হইলে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা আমেরিকা বুঝিতে না পারার ফলেই তাহাদের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া সম্ভব হইতেছে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, বিদেশ হইতে যদি ঋণ না পাওয়া যায় তবুও এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বন্ধ থাকিবে না বা ব্যর্থ হইবে না।

প্রতি বৎসর খাদ্যশস্য আমদানি করিতে যে কোটী কোটী টাকা খরচ হয় তাহার ফলেই দেশের উন্নতির চেষ্টা অনেকখানি ব্যাহত হয়। অথচ খাদ্যশস্য অভাবে না খাইয়াও কেহ বাঁচিতে পারে না। সেই কারণে বৎসরে প্রায় ৩০।৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। এই খাদ্য ঘাটতি হইতে দেশকে বাঁচাইতেই হইবে। কাজেই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা প্রয়োজন। ভারতে শতকরা ৭০ জন কৃষিজীবী, অথচ ভারতের খাদ্যে ঘাটতি পড়ে। কিন্তু আমেরিকায় যেখানে শতকরা ২০ জন কৃষিজীবী, সেখানে সমস্ত আমেরিকাবাসী খাইয়া ছাড়াইয়া থাইয়া উদ্বৃত্ত কিছু অংশ কোন কোন দেশকে বিক্রয় করিয়া, বাকী লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে। কৃষির উন্নতির ফলেই সেখানে এইরূপ সম্ভব হইয়াছে।

ভারতেও নদীর, সেচকার্যের ও জমির উন্নতির দ্বারা অন্ততঃ দেড়গুণ ফসল ফলান সম্ভব হইতে পারে। ইহা পরীক্ষিত সত্য। দেশে খাদ্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হইলে বহু টাকা আমরা সঞ্চয় করিতে পারিব। সেই অর্থে ও বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত আয় হইতে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যকরী করিতে সমর্থ হইব।

উপরোক্ত ১৩০০ কোটী টাকার মধ্যে আগামী ছয় বৎসরে মোটামুটি ভাবে রেল, পোষ্টাফিস, টেলিফোন, বেতার প্রভৃতির উন্নতির জন্য ৭০০ কোটী টাকা, শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২০০ কোটী টাকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বসতির জন্য ৩০০ কোটী টাকা, কৃষির উন্নতির জন্য ৩০০ কোটী টাকা এবং অন্যান্য বহুবিধ পরিকল্পনার জন্য ৩০০ কোটী টাকা খরচ করা হইবে। তন্মধ্যে যানবাহন ব্যবস্থা, সেচ পরিকল্পনা ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা পুরাপুরি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে। ছোটনাগপুর হইতে বিন্ধ্যপর্বতমালা পর্য্যন্ত একটী রেলপথ নির্মাণে প্রায় ৫০০ কোটী টাকা ব্যয় হইবে। এদেশে শিল্পোন্নতি, রেলপথ নির্মাণ বা যুদ্ধ অস্ত্র নির্মাণের জন্য বৎসরে ২৫ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়, কিন্তু উৎপন্ন হয় মাত্র ১২ লক্ষ টন। লৌহের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও বিদেশ হইতে লৌহ আমদানী করিয়া আমরা এই ঘাটতি মিটাই। প্রয়োজনীয় শিল্প ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলে দেশে ঐ ১০ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইতে পারিবে।

সমবেত চেষ্টায় গঠনমূলক কাজে অগ্রসর না হইলে এই সকল পরিকল্পনা স্বপ্নেই থাকিয়া যাইবে। সরকারের সংহতি ও চেষ্টাই আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সরকার পথ প্রদর্শক মাত্র, কাজ করিতে হইবে জনসাধারণকে। আজিকার অন্নসংকট, বস্ত্রসংকট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্পের বাধা দূর করিবার জন্য চাই জনজাগরণ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্য ভারতবাসীকে অনেক বিষয়ে ত্যাগ স্বীকার করিতেই হইবে।

আজ দেশে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার প্রতি আস্থা স্থাপনে জনসাধারণের ইতস্ততঃ ভাব থাকা উচিত নয়। সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে যদি ব্যবধান থাকে, তবে কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনাকেই রূপ দেওয়া যাইবে না। আজ দেশবাসীকে সরকারকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। জাতি আত্মনির্ভরশীল হইলেই দুঃখ দূর হওয়া সম্ভব। জনসাধারণ ও সরকারের সমবেত চেষ্টায় জাতির ও দেশের মান উন্নয়ন সম্ভব। বহুলোকের একমুখীন চেষ্টার ফলেই দেশের উন্নতি নিশ্চিত।

ব্যর্থ-শবরী

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী

সুকান্ত আর একবার সেই গলিটার মধ্যে প্রবেশ করলো। এই কিছুক্ষণ আগেমাত্র সন্ধ্যা হয়েছে। গ্যাসপোষ্টের ক্ষীণ আলোকে গলির ভেতরটা অস্বচ্ছ থেকে গেছে। একপাশে রাস্তার ওপরেই জড়ো করা ছাইয়ের স্তূপে বসে একটা লোম-ওঠা বেড়ালছানা গলা ঘসছিলো। একটি বুড়ো মত লোক আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। আর সুকান্ত সেই নির্জন গলিটার মধ্যে থেকে পনেরো বছর আগের পরিচিত একটি বাড়ীকে খুঁজে বার করবার জন্যে এ'মুড়ো থেকে ও'মুড়ো পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

অবশেষে সাদা তিনতলা বাড়ীটার তলায় দাঁড়িয়ে আপনমনে বিড়বিড় করে সে বললো—হাঁ। এই বাড়ীটাই; এই ত' এই লাইটপোষ্টটার তলায় দাঁড়িয়ে পনেরো বছর আগের একরাত্রে সে আধঘণ্টা ধরে শুধু সিগারেট টেনে গিয়েছে। সেদিন বাড়ীটাকে ত' এমন অপরিচিত ব'লে মনে হ'তো না!

আর একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো সুকান্ত। নিশ্চয়ই এই তেতলাটা নতুন উঠেছে। বাড়ীটারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে। হয়ত যুদ্ধের বাজারে হরিসাধনবাবুও নিজের অবস্থাকে একটু ফিরিয়ে নিতে পেরেছেন। সেই আগেকার দারিদ্র্য নিশ্চয়ই আর তার নেই। ব্যবসাকে ফাঁপিয়ে তুলে অনেক টাকার মালিক হ'য়ে বসেছেন এবার। আর সুভদ্রাও

সুকান্তর চিন্তাধারা হঠাৎ একটু হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়ালো যেন। না সুভদ্রা বিয়ে করেনি। এ' খবর সে কিছুদিন আগে তার এক কলেজ-আমলের বন্ধুর কাছ থেকেই পেয়েছিলো। এ' খবর না পেলে সে সেই সুদূর বম্বে থেকে কলকাতায় ছুটে আসতো কিনা সন্দেহ। আর এই স্বল্প-অন্ধকার গলির মধ্যে বিগত স্মৃতির কোঠা হাতড়ে হাতড়ে সেই পরিবেশকে খুঁজে বার করা—না, সুভদ্রাকে চেষ্টা ক'রে মনে করতে হয় না। স্বপ্নের মত দীপ্ত হ'য়ে রয়েছে সে আজও। সেই তন্বী গৌরাঙ্গী মেয়েটার ছবি আজও সুস্পষ্ট হ'য়ে রয়েছে মনের মধ্যে। তার হাঁটু ছোঁওয়া ঘনকৃষ্ণ চুল, আর অতল আয়ত চোখ যেন গভীর রাত্রির নক্ষত্রের মতই আজও জ্বল জ্বল করছে। এই সুদীর্ঘ পনেরো বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও তাকে ভুলতে পারেনি সুকান্ত। তার চুলের অর্দ্ধেক আজ পেকে সাদা হ'য়ে এসেছে। সমস্ত মুখে জেগে উঠেছে বয়েসের বলিরেখা। পনেরো বছর আগের এক সুদর্শন তরুণ যুবক আজ প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পা দিয়েছে। কিন্তু মনের অনুভূতি তার আজও হারিয়ে যায়নি। আজও সে অতীতের কাছে ফুরিয়ে যায়নি একেবারে।

গ্যাসের ক্ষীণ আলোতে ঘড়িটা একবার দেখে নিলো সে। পকেট থেকে সিল্কের রুমালটা বার ক'রে মুখটা আর একবার মুছে নিলো। তারপর দরজায় এসে অনুচ্চ কণ্ঠে ডাক দিলো—হরিসাধনবাবু

বাইরের ঘরের একটা জানলার একপাট খুলে গেলো। এক বৃদ্ধ মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো—কাকে খুঁজছেন?

আলোতে মুখটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে সে বললো—হরিসাধনবাবুকে।

—না, ও নামের কেউ এখানে নেই।

বৃদ্ধ জানলাটা বন্ধ ক'রে দিতে যাচ্ছিলো কিন্তু বাধা দিয়ে সুকান্ত ব্যগ্রকণ্ঠে বললো—পনেরো বছর আগে তাঁরা থাকতেন। আমি এই পনেরো বছরের মধ্যে আর আসিনি। একটু দয়া ক'রে তাদের খোঁজ দেবেন? আমি অনেকক্ষণ ধ'রে খুঁজছি।

—ওঃ সেই ভদ্রলোক? না, তিনি বেঁচে নেই ত'। আমরাই ত' এই সাত বছর হ'য়ে গেলো বাড়ীটা কিনেছি। ভদ্রলোকের মেয়ে নাকি ওই ওদিকের একতলা একটা বাড়ীতে থাকে।

—হাঁ হাঁ—সেই মেয়েকেই খুঁজছি আমি। কোন্ বাড়ীটা বললেন?

—ওই সাতের ডি। সিধে গিয়ে ডানপাশে একটা বাই লেন পাবেন, ওইখানটায়।

জান্‌লাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

আবার সেই অন্ধকার গলি দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলো সুকান্ত। নির্দ্দিষ্ট বাই লেনটার মুখে গিয়ে বাড়ীটাকেও আবিষ্কার করলো সে। একটা নোনাধরা সেকালের পুরোনো বাড়ীর অংশবিশেষ। নীচের ঘরে আলো জ্বলছে। দরজার অর্দ্ধেক উঠে-যাওয়া নম্বরটা দেশলাই জ্বেলে দেখে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। বারবার চেষ্টা করতে লাগলো এক বহু উচ্চারিত নাম ধরে ডাকতে। মনের মধ্যে কতবার আবৃত্তি করলো সে—সুভদ্রা সুভদ্রা ...

কিন্তু গলা থেকে স্বর বেরোলো না তার। দরজার সামনে একটা ডাষ্টবিন, তারই পাশাপাশি দেয়ালে হেলান দিয়ে সে বোধহয় ভাবতে চেষ্টা করলো বহুদিন আগের দিনগুলিকে। যখন সে আসতো বলে উন্মুখ আগ্রহে মুখর হয়ে থাকতো একটি মেয়ে। অষ্টাদশী সে মেয়ের তাকানো ভুরুতে জল-ভরা মেঘের বিদ্যুৎ আটকে থেকেছে সেই ছিপছিপে পাতলা মেয়ের স্মৃতিগুচ্ছে বোধহয় নিমেষেই হারিয়ে গেলো সুকান্ত।

তার সাড়া ফিরে এলো দরজা খোলার শব্দে। প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে মেয়েলি কণ্ঠের প্রশ্ন ভেসে এলো—কে, কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুকান্ত এগিয়ে এলো। দরজার মুখে দাঁড়িয়ে মধ্যবয়সী অতিশীর্ণা এক নারী। তার ঘন শ্যামবর্ণ দেহের পরুষ কাঠিন্যে নারীর লাবণ্যের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। ছোট ছোট ক'রে মাথার চুল ছাঁটা; কিম্বা মাথায় মোটেই চুল নেই—তাও বোঝা যায় না। ছোট গোল গোল চোখের সন্দিগ্ধ তীব্র চাহনির সম্মুখে সুকান্ত নুইয়ে পড়লো। অতি বিবর্ণ ও জীর্ণ শাড়ীর দারিদ্র্যে সেই নারী আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে চোখের সামনে।

সকুণ্ঠ ভঙ্গীতে সুকান্ত উত্তর দিলো—সুভদ্রা সেন এখানে থাকেন কি? হরিসাধনবাবুর মেয়ে সুভদ্রা?

হঠাৎ যেন কেমন একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেলো চারদিকে। সেই দারিদ্র্যশীর্ণা ভাবলেশহীনা নারীর বিশীর্ণ গণ্ড—অকস্মাৎ যেন এক ঔৎসুক্যভরা লালিমার আভা জেগে উঠলো। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন—আপনি কোথা থেকে আসছেন?

—বোম্বে থেকে।

—ভেতরে আসুন।

একটা শতছিন্ন ও ময়লা মাদুর মেঝের ওপর বিছিয়ে দিলেন তিনি। সঙ্কুচিতভাবে তার একপাশে ব'সে প'ড়ে সুকান্ত বলে চললো—আপনি কে তা জানিনা। কিন্তু আজ পনেরো বছর ধ'রে আমি ভারতের বাইরে বাইরে ঘুরেছি। বোম্বেতে নেমেই ছুটে এসেছি এখানে। আমার বড় দরকার সুভদ্রাকে—বড় দরকার ...

স্পষ্টস্বরে অথচ আস্তে আস্তে সেই মহিলা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলেন—আপনি কে, তা বুঝতে পেরেছি। আমি সুভদ্রারই এক বোন। তার সমস্ত কথাই আমি জানি। আমার কাছে সে কিছুই গোপন করেনি। শুধু আপনি ফিরে আসবেন বলেই সে এই গলি ছেড়ে যেতে চায়নি। এতদিন ধ'রে এইখানেই দারিদ্র্য অনশন আর অমানুষদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বেঁচেছিলো। কিন্তু আপনি ত' ফিরে আসেন নি।

নিমেষে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো সুকান্ত—কিন্তু আমি যে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। এর আগে ফেরবার যে কোন উপায় ছিলো না আমার।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ হ'য়ে রইলো দুজনেই। হঠাৎ সেই নারী প্রশ্ন করলেন—আপনি যে ডিগ্রীর জন্যে জার্মান গিয়েছিলেন তা কি পেয়েছেন?

—না, আমি আবার

—কিন্তু তার জন্যেই ত' সুভদ্রা তার মায়ের গয়না চুরি ক'রে আপনার হাতে তুলে দিয়েছিলো, আর

সুকান্ত সচকিতভাবে তাকালো তার দিকে। কিন্তু কেরোসিনের আবিল আলোতে তার মুখের ভাব বোঝবার উপায় ছিলোনা। তিনি তখন বলে চলেছেন—সে জন্যে যে কত লাঞ্ছনা সইতে হয়েছিলো সুভদ্রাকে ... শুধু সে জানতো সুকান্ত ফিরে আসবে বড় হ'য়ে। তখন তার সমস্ত কলঙ্ক অমৃত হ'য়ে জ্বলে উঠবে। তার সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন...সমস্ত কিছু নির্ভর করছিলো সেই ফিরে আসার ওপরে। রাত্রির পর রাত্রি সে বিনিদ্র চোখে চেয়ে থেকেছে পথের দিকে। দিনের পর দিন গুণেছে প্রতীক্ষায় কিন্তু সে আসেনি।

সুকান্ত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো আবেগে। বললো

—আমার অন্যায়ের সীমা নেই। কিন্তু ফিরবার মুখো-মুখী সময়েই যুদ্ধের ভেরী বেজে উঠলো। জার্ম্মানে তখন বিদেশীরা স্পাইয়ের পর্য্যায়ে পড়েছে। আমি ফিরে আসার উপায় পেলাম না।

—মিছে কথা। জার্ম্মান মেয়ে ক্লারা হেডভিগের কথাও সুভদ্রা শুনেছিলো। কিন্তু এমনই নির্বোধ সে—তার পরেও ... কিন্তু এমন কেন করলো সুকান্ত?

সুকান্ত কি যেন বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করলেন তিনি। সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের আবছায়ায় বসে তিনি তখন সুভদ্রার কথাই বলে চলেছেন—সুভদ্রা আমায় বলেছে তার অন্তরের কথা। আমি যে জানি তার সব। শুনেছি এক যুগের কালো রাতে সুকান্ত আসবে বলে সে সারারাত ঘুমোয়নি। জার্ম্মান যাবার আগেকার কথা বলছি। সেই অন্ধ আকুল সুকান্ত তাকে কত না আশাই দিয়েছিলো। দিনের পর দিন কত মধুর আশ্বাসের আলোতে ভরিয়ে রেখেছিলো—তার নির্বোধ সারল্যকে। সে তো বলেছিলো—আমি যেখানেই থাকি আমি শুধু তোমারই শুধু তোমারই

—আমি তার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো। সেই জন্যেই ছুটে এসেছি আমি। আপনি বিশ্বাস করুন। সে কোথায়—ডেকে দিন তাকে; বলুন, আমি অনুতপ্ত।

একটা ম্লান হাসি আর একবিন্দু অশ্রু পাশাপাশি ফুটে উঠলো নারীর গণ্ডে। বারবার তিনি কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু গলায় আটকে গেলো বোধ হয়। এক সময়ে ছুটে এসে দুহাতে সুকান্তকে আঁকড়ে ধরে চিৎকার ক'রে উঠতে চাইলেন। কিন্তু শুধু নিঃশব্দে উঠে সেই কেরোসিনের ল্যাম্পটাকে আরও উজ্জ্বল ক'রে সামনে রাখলেন। তারপর সুকান্তর চোখে চোখে চেয়ে অ[illegible] করুণ ও মর্ম্মভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন—আপনি কি আর তা[illegible] খুঁজে পাবেন? সে ...

—সে কোথায়, বলুন সে কোথায়?

ব্যাকুল সুকান্ত সেই নারীর চোখে চোখে চেয়েই অ[illegible] হঠাৎ চিৎকার ক'রে উঠলো। আর দৃষ্টি নামিয়ে অন্ধকা[illegible] ঘন গভীরতায় মুখ লুকোবার চেষ্টা করতে করতে অস্ফুটস্বরে বললেন—সুভদ্রা মারা গেছে।

কেরোসিনের বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে আচমকা [illegible] হ'য়ে এলো। অস্পষ্ট অন্ধকারে দুজনের মুখ দুজ[illegible] কাছে অদৃশ্য হ'য়ে উঠলো। সেই নির্জ্জন গলিপ[illegible] নৈঃশব্দে ভরে উঠলো ছোট্ট ঘরটা। শুধু কোথা [illegible] এক [illegible] বালক দেয়ালে দেয়ালে [illegible] হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লো।

অন্ধকারের সাথে সাথে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গে[illegible] সুকান্ত। নারী অনুভব করলো, এতক্ষণে সে গলি পেরিয়েছে। এবার সে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তার [illegible] বড় রাস্তা, কলকাতা [illegible] জার্ম্মান ক্লা[illegible] হেডভিগ।

হঠাৎ সেই কঠিন মেঝের উপরে সেই পক্ক[illegible] লাবণ্যা নারী লুটিয়ে পড়ে আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলো ওগো, পারলে না পারলে না, আমায় চিনতে পারলে ন[illegible]

শব্দ-সিন্ধু

শ্রীসুধীর গুপ্ত

কথার তরঙ্গ ওঠে মনের নিভৃতে ;—
রঙ্গ-ভরা তরঙ্গের কল্লোল-হিল্লোল,
ফেন-শুভ্র সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব মাধুরী,
বুদ্বুদ্-বৈচিত্র্যরাশি ; বিপুল সঙ্গীতে
সৈকতে ভাঙিয়া পড়ে, সেই কলরোল—
তরঙ্গে তরঙ্গ-ভঙ্গ মরে ঝুরি' ঝুরি',
অন্ত হ'তে অনন্তের বিপুল বিস্তারে ;

ঠিকরে সূর্য্যের শোভা শীকর-নিকরে,
বেলা-বালু তীরে তীরে, তরঙ্গ-চূড়ায় ;
কথার ক্ষীরদ-সিন্ধু মথি' বারে বারে
অমৃত লভিতে চাই, আনন্দের ভারে
মরিয়া বাঁচিতে চাই অনিন্দ্য ধরায় ;
শব্দ-সিন্ধু সুধা-লাভে, নিভৃত মথনে,
শব্দাতীত ধ্বনি-লোক চাই পেতে মনে।

উপনিষদে জীবন-বেদ

শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়

আমরা প্রায়ই শুনি যে হিন্দুদের কৃষ্টি ও সভ্যতা যখন সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন তাহারা জগতের জীবনকে ঘৃণা করিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল। এক কথায়, এই সমস্ত পণ্ডিতদের অভিমত এই যে বেদ, উপনিষদ, গীতা, হিন্দুদের ধর্ম্মশাস্ত্রসকল শুধু মুমুক্ষুর জন্য এবং সংসার ত্যাগী, কৌপিনধারী সন্ন্যাসীর শাস্ত্র। সংসারে যাহারা বাস করিতে চান, জীবনকে যাহারা অবলম্বন করিয়া পথ চলিতে চান, তাহাদের পক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কোনও উপায়ই নাই। তাঁহাদের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষাই জীবনের মানকে উচ্চ হইতে উচ্চতর করিয়াছে। এই শিক্ষাই জীবনকে সুষমামণ্ডিত করিয়াছে। এই অভিযোগ সত্যসত্যই ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত কি-না এবং আমাদের শাস্ত্রের প্রতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য-হেতুই বছরের পর বছর আমরা এই মত পোষণ করিতেছি কি-না ইহাই আলোচ্য বিষয়।

এ কথা সত্য যে প্রত্যেক জাতিই এই পৃথিবীর জীবনকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীর দ্বারা দেখিয়াছে। তাই পাশ্চাত্যে যাহা জীবনের একমাত্র অবলম্বনীয় লক্ষ্য, আমাদের এদেশে তাহার মূল্য খুব কমই দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হেতুই এইরূপ ভুল ধারণার প্রচার হইয়াছে। সুতরাং আমাদের বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে যে ভারতে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কি ছিল এবং তাহাই কি জীবনকে সুখের, শান্তির আধার করিতে সমর্থ? জীবন কি বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রের মতন গতির একটি প্রবাহ মাত্র —না জীবনের লক্ষ্য পৃথিবীতে প্রকৃত সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা। স্থূল-গতিই যদি মানব জীবনের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে যন্ত্র-শিল্পের উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। আদিকালের গো-যান, অশ্ব-যান, জল-যান হইতে বর্ত্তমানে কয়েক শতাব্দীতে বাষ্প-যান ক্রমে খ-যানে উন্নীত হইয়াছে। এই গতির প্রতিযোগিতায় দেশের ব্যবধান ঘুচিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি ভিন্ন ভিন্ন দেশ-বাসীর অন্তরের ব্যবধান দূর হইয়াছে? এখনও আমেরিকাতে নিগ্রো জাতির উপর Lynching প্রচলিত। বর্ণ-সমস্যা দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং আমেরিকায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত আদর্শের বিভিন্নতা সমস্ত মানব-গোষ্ঠীকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছে। রাশিয়া এবং তাহার অনুসরণকারী দেশসমূহ বলিতেছে যে, তাহাদের অনুসৃত সাম্যবাদই জগতে আদর্শ-শিক্ষা এবং সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। ইঙ্গ-আমেরিকা এবং তাহাদের আদর্শ-পন্থীরা বলিতেছে, ধনতান্ত্রিকবাদের একটু সামান্য পরিবর্ত্তন সাধন করিলেই জগতে প্রকৃত শান্তিপূর্ণ সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে। এইরূপ দুইটী ভিন্নমতানুলম্বী প্রবল মতবাদের মাঝে, ভারত-বিনাযুদ্ধে বিজেতার নিকট হইতে তাহার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপভাবে স্বাধীনতা পাইবার দৃষ্টান্ত নাই। সুতরাং আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করিতে হইবে—ভারতের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এবং ঈশ্বরের অভিপ্রেত কি? ১৮৯৮ খৃঃ অঃ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন "ভারতের স্বাধীনতার ডিক্রী হইয়া গিয়াছে, আমাদের শুধু তৈয়ারী হইতে হইবে।" সেই তৈয়ারী কোন দিক হইতে হইবে। আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত সুস্পষ্ট দুইটী মতবাদের একটিই লইব, না আমরা একটী তৃতীয় মতবাদ-সৃষ্টি করিব? এই প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তর দিতে হইলে আমাদের ভারতের অতীত কৃষ্টি এবং ঐতিহ্যের বেদীমূলে গমন করিতে হইবে। সমস্ত ভারত যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহ্য-চাকচিক্যে নিমগ্ন ছিল, তখন আমাদেরই বাংলা দেশে একজনের পরে একজন মহাপুরুষের আগমন হইয়াছিল।—শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং বর্ত্তমানে বেদ-বেদান্ত, গীতা-উপনিষদের প্রতীক "দিব্য জীবনের" রচয়িতা শ্রীঅরবিন্দ। এই মহাপুরুষদের মতে জীবনের মান এবং লক্ষ্যই হইতেছে সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠা এবং শেষোক্ত মহাপুরুষ বলিয়াছেন তাহার চাবিকাঠি আছে উপনিষদ, বেদ এবং গীতাতে। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় হইবে—উপনিষদে জীবনের মান এবং কি লক্ষ্য ছিল ও তাহার সহিত বর্ত্তমান যন্ত্র যুগের কোনও সামঞ্জস্য করা সম্ভবপর কি না।

জীবনের মধ্যে সত্যকে ফোটাইয়া তুলিতে হইলে, শুধু মানুষের মাঝে দেবতাকে ফোটাইয়া তোলার যেমন প্রয়োজন, তেমনি বাহির বিশ্বে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমস্ত বিশ্বের সর্ব্বপ্রকার প্রাণীদের মধ্যে তাহাকে প্রকট করার প্রয়োজন। মানুষকে পরিত্যাগ করিয়া যদি জড়কে, যন্ত্রকে বহির্বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করা হয়—যাহা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য-সভ্যতা বহুল পরিমাণে করিয়াছে—তাহাতে মানুষের মাঝে দেবতা হইয়াছেন নিষ্পিষ্ট, পঙ্গু এবং অকেজো। পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের মাঝে দেবতাকে ছাড়িয়া জড়-বিজ্ঞানের প্রসার করিয়াছে এমনভাবে যে, হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যে যখন মানুষের করণীয় সমস্ত কাজই যন্ত্র-দ্বারা হইবে চালিত। ফলে, তথাকথিত সভ্যতা একটী যন্ত্র-সভ্যতায় পরিণত হইতে পারে। কিন্তু জড়-বিজ্ঞানের এই পূজা, এই উপাসনা—মানুষের মাঝে আনিয়াছে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার এবং নিজ জাতি ও গোষ্ঠীর উপর অসম্ভব মমতা। তাহারা আর কোনও জাতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে স্বীকার করে না। ফলে, বর্ত্তমানে শ্বেত ও অশ্বেতকায়দের মাঝে আরম্ভ হইয়াছে বাদ-বিসম্বাদ। ভবিষ্যতে ইহার উপরে ভিত্তি করিয়া হয়ত এক তৃতীয় মহা-যুদ্ধ হইবে। তেমনি প্রত্যেক জাতির মধ্যে "অহং সর্ব্বস্ব" মনোভাবের ফলে যাহার ধন আছে সে নির্ধনকে করে অনুকম্পা এবং সেই "অহং"কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যেটুকু দান করিবার

প্রয়োজন তাহাই করেন, ফলে যাহারা নির্ধন তাহারা ধনীদের করেন হিংসা। একই জাতির মধ্যে এই মনোভাবের প্রসারে জগতে বহিয়াছে সহিংস সাম্যবাদের সৃষ্টি। যেমন সহিংস সাম্যবাদ, তেমনি বর্ণ বিদ্বেষ এই দুইয়ের মূলে আছে, মানুষের ভিতরে জন্মমৃত্যুর পথিক যিনি তাঁহাকে অবহেলা করিয়া চলার অভিযান। উপনিষদের ঋষিরা এই পরম সত্যের অনুভূতি পাইয়াছিলেন, তাই তাঁহারা পৃথিবীকে, জড়কে, জীবনকে উপেক্ষা না করিয়া জীবনে সেই পথিক অর্থাৎ আত্মাকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রয়াস করিয়াছিলেন। "অন্নং ন নিন্দ্যাৎ তদ্ ব্রতম্। প্রাণো বা অন্নম্। শরীরমন্নাদম্। প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। আপো বা অন্নম্। জ্যোতিরন্নাদম্। অপ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্।" (তৈত্তরীয়—ভৃগুবল্লী) তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন মানুষের দেহ, প্রাণ এবং মনের অস্তিত্ব আছে বটে, কিন্তু ইহারাই মানুষের শেষ কথা নহে। ইহাদের পিছনে আছেন যিনি, তিনিই প্রকৃত কর্ত্তা এবং ভোক্তা—তাঁহার অনুসরণ এবং তাঁহার আলোকে জীবনকে আলোকিত করা মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য। তাঁহারা আত্মাকে করিয়াছিলেন উপলব্ধি, তাঁহারা আলোকে করিয়াছিলেন জীবনকে উদ্ভাসিত এবং এই পরম সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই জীবনকে গড়িয়া তুলিতেন বাল্যকাল হইতে। কারণ প্রকৃতপক্ষে জীবনের মান উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কোনও নীতিবাদ দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। যীশু খৃষ্টের উচ্চ আদর্শের প্রচার হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার আদর্শ-অনুসরণকারীরা পৃথিবীতে দুইটী প্রবল মহাযুদ্ধের নায়ক হইলেন। ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত অহিংসবাদকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া সম্রাট্ অশোকের রাজত্ব অকালেই মহাপ্রয়াণ করিল। ইতিহাসের পাতায় এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত মিলিবে। সুতরাং নীতিবাদ যতই উচ্চ হউক্ না কেন, মানুষের মন তাহাতে যতই সাড়া দিক্ না কেন, আত্মার শান্ত-রশ্মির অভাবে কালক্রমে সেই সমস্ত নীতি এবং উপ-ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে। বুদ্ধের প্রসূতি ভারতে অতি সামান্য কয়েক হাজার লোক মাত্র তাঁহার মতবাদকে অনুসরণ করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, বেদ-উপনিষদের উদার ধর্ম্মের মাঝে এমন নমনীয়তা আছে যে কালের আবর্ত্তে তাহারা প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের উদরে আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই ভারতে বহু জাতির উত্থান পতন হইয়াছে। বহু ধর্ম্মের এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রচার হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য ফুরাইয়া যাওয়া মাত্রই তাহারা একে একে শাশ্বত ধর্ম্মের মাঝে আপনাদের বিস্মৃত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইতেছে প্রত্যেক জাতিরই মাঝে তাহাদের নিজেদের আপন আপন নিজস্ব ধর্ম্মকে ফোটাইয়া তোলা। "ভারত-আত্মার জাগরণ" নামক প্রবন্ধে ১৯০৯ খৃঃ অঃ শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, "প্রত্যেক জীবনেই আছে তিনটী সত্তা—স্থায়ী একটী আত্মা, উন্নতশীল অথচ চিরস্থায়ী একটী আত্মা এবং ভঙ্গুর পরিবর্ত্তনশীল দেহ। এই আত্মাকে আমরা পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা তাহাকে তমসাচ্ছন্ন করিতে পারি; হঠকারিতার দ্বারা এই আত্মাকে তাহার প্রকৃতির বিপরীত ভাবে পরিচালিত করার অর্থই হইতেছে তাহাকে নিষ্পেষিত করা এবং তাহার স্বতস্ফূর্ত্ত ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশের দ্বার রুদ্ধ করা। দেহকে শুধু আত্মার প্রকাশের আধার বলিয়া মনে করা উচিত এবং দেহকে শুধু দেহের জন্যই যদি মূল্যবান মনে করা হয়, তাহা হইলে অত্যন্ত ভুল করা হইবে। "মানুষের দেহে যেমন আত্মা এবং জীবাত্মা আছে, তেমনি জাতির জীবনে আছে এক ক্রম-বিবর্ত্তনশীল জীবনমৃত্যুর যাত্রী আত্মা এবং অপরটী জাতির স্ব-ধর্ম্ম সঞ্চয়ী জীবন মৃত্যুর উপরে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটীর বিবর্ত্তনের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম করিলে অপরটী তাহার স্ব-ধর্ম্মকে দেয় দেখাইয়া। বর্ত্তমান ভারতের এখন সেইদিন সমুপস্থিত, সুতরাং আমাদের অনুধাবন করিতে হইবে ভারতের নিজস্ব আত্ম-ধর্ম্ম কি—তাহার প্রকৃত লক্ষ্য কি, কারণ এই দুইটী বিষয়ই হইতেছে মানুষের এবং জাতীর জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান।"

কিন্তু এখনই প্রশ্ন উঠিবে যে, এই কথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই বিংশশতাব্দীর মানুষ—যিনি জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিদ্যুৎকে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, যিনি নানা প্রকার যান-বাহন আবিষ্কার করিয়া দূরত্বকে করিয়াছেন সঙ্কুচিত, যিনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া টেলিগ্রাফ্, টেলিভিসন ইত্যাদি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কি পুনরায় তাঁহার বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও জড়জ্ঞানকে জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় আদিম মানুষের পর্য্যায়ভুক্ত হইবেন? কিন্তু মানুষ যতই জড়-বিজ্ঞানে উন্নত হউক না কেন, তাহার মনুষত্ব আছে অক্ষত। আত্মার আলোকে যাঁহার জীবন উদ্ভাসিত তিনি তাঁহার বুদ্ধি, বৃত্তি, মনঃপ্রসূত শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবেন এমন কথা ত নহে, তবে বর্ত্তমান জীবনের মাপকাঠি স্বরূপ বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্ককে যেরূপ বড় করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাকে তখন সেইরূপ মুখ্যস্থান না দিয়া আত্মার বাণী, ইঙ্গিতকে দিতে হইবে তাহার স্থান। কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক, মনঃপ্রসূত বলিয়া তাহা সত্যকে খণ্ডভাবে অবলোকন করে এবং তাহা মানুষের "অহং" এর সহিত মিশ্রিত হইয়া নিজেকে অপর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া উপলব্ধি করে। এই—উপলব্ধির মূলেই আছে অপরকে না বোঝার অক্ষমতা। সুতরাং মানুষের জীবনের মানকে প্রকৃতপক্ষে উচ্চ করিতে হইলে চাই এই—"অহং," বুদ্ধি ও মন প্রসূত তর্ক এবং যুক্তির উপরে যে চেতনা আছে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। কিন্তু কি প্রকারে ইহার সম্ভাবনা এবং একজন মানুষে তাহা হয়তঃ সম্ভব, কিন্তু একটা জাতিকে সেই চেতনায় প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব? বেদের ঋষিরা এইরূপ সম্ভাবনাকেই তাঁহাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ মান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন :—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং (১) যৎ কিঞ্চজগত্যাং জগৎ। (২)
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জী থা (৩) মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥ (৪)
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি (৫) জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥ (৬)

এই সমস্ত বিশ্বই হইতেছে ঈশ্বরের আবাসস্থল। এই বিশ্বের—সমস্ত বস্তুই এক বিশ্বব্যাপী গতির এক একটী ছন্দমাত্র। যদি পরিপূর্ণভাবে

উপভোগ করিতে চাও, তবে তাহা একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই সম্ভবপর। অন্যের অধিকৃত পদার্থে লোভ করিও না। এইরূপ যে লোক, যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কার্য্য করেন, (কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই) তিনি একশত বৎসর বাঁচিতে সক্ষম এবং এইরূপ মানুষকে কর্ম্মের দুঃখময় ফল লিপ্ত করিতে সক্ষম নয়। (শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে) (১) বিশ্বচরাচরে সমস্ত পদার্থেই ঐশ্বরিক চেতনা আছে। অগ্নি, বিদ্যুৎ এবং মানুষের মাঝে যে বহ্নিশিখা জ্বলে, এই সবই সে পরম চেতনার এক একটী কেন্দ্র বিশেষ এবং বস্তু বিশেষে তাহার তারতম্য দেখা যায় মাত্র। এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে দেখিলে দেখা যাইবে যে, মগ্নচেতন আপাতঃ জড়পদার্থ-শিলা, কাষ্ঠ ইত্যাদিতে এবং অবচেতন বৃক্ষ-গুল্ম লতাদিতে এবং পূর্ণ-চেতন প্রাণীতে শুধু এই চেতনার ইতর বিশেষ আছে মাত্র। এই ভিন্ন ভিন্ন চেতনাকে সংযুক্ত করিয়া দেখিতে যিনি সক্ষম, তিনিই এই সৃষ্টির বিভিন্নতার রহস্য ধরিতে পারেন। (২) এই বিশ্ব একটী গতির পরিবাহক মাত্র। সুতরাং এই পৃথিবী-জাত সমস্ত পদার্থই গমনশীল-নশ্বর অর্থাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে বাধ্য, কিন্তু এই সমস্তই পদার্থ আবার বিশ্বব্যাপী যে বিরাট গতি-প্রবাহ চলিতেছে তাহার এক একটী ছন্দ বিশেষ। সুতরাং যে মানুষ তাহার জীবনকে এই ছন্দের সুরে গাঁথিতে সক্ষম, তিনি অপরের সুরের অসংগতি, বাধা বুঝিতে সক্ষম। (৩) এবং এইরূপ মানুষ যে কর্ম্ম করেন তাহাতে কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মজীবনের বিপত্তি, বাধা অর্থাৎ সুখ ও দুঃখ, ক্রোধ ও অনুরাগ, শীত ও গ্রীষ্ম প্রভৃতি যতপ্রকারের দ্বন্দ্ব আছে তাহা তাহার জীবনকে কলুষিত করিতে পারে না। আর সমস্ত বিশ্বে, চরাচরে যখন তিনি বিরাজিত, তখন এই জীবন পরিত্যাগ করিবার কোনও কারণই দেখা যায় না। কন্যা, বধূ, মাতারূপে একই স্ত্রীলোক শুধু নিজেকে প্রসার করিয়াই আসিতেছে, সেইরূপ নিজের আত্মীয়-গোষ্ঠী ব্যতিরেকেও নিজের মনোবৃত্তিকে প্রসারিত করা সম্ভবপর এবং এই ভাবে যিনি যতটা নিজেকে প্রসারিত করিয়াছেন তিনি ততটা পরের জন্য অনুভব করেন। এখন এই প্রসার কতকটা নীতিবাদের দ্বারা হইতে পারে, কিন্তু নীতিবাদ মনঃকল্পিত জন্য তাহার পক্ষে অগণ্ডতা অর্জ্জন করা কিংবা নিস্পৃহ ভাবে দেখা সম্ভবপর নহে। ব্যষ্টির জীবনে যেমন, সমষ্টির জীবনেও সেইরূপ, সুতরাং আত্মার আলোক যাঁহার মধ্যে যত বেশী, তাঁহার শরীর মন ও প্রাণেও হয় তত বেশী পরের সুখ ও দুঃখে প্রভাবান্বিত। সুতরাং আত্মার আলোক, ইঙ্গিত যতক্ষণ ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে নিয়ন্ত্রণ না করে ততদিন পর্য্যন্ত সেই মানুষ এই বিশ্বব্যাপী সুরের প্রবাহ ধরিতে সক্ষম হন না। বেদ ও উপনিষদের ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাদের জীবনে তাহা প্রকট করিয়াছিলেন।

মহাভারতীয় সাবিত্রী

অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্-এ

এ চিত্র বর্ত্তমান বাঙ্গালী বৃদ্ধজন কর্ত্তৃক কুলবধূরূপে আকাঙ্ক্ষিত স্থিরা, ধীরা, কুসুমকোমলা, ব্রীড়া-কুণ্ঠিতা ললনার নহে।

এ যেন বর্ত্তমান যুগের প্রখরগামিনী, প্রচুরভাষিণী, ব্যায়াম-কুশলিনী, কোন আধুনিকা কলেজ-ললনার চিত্র।

যদি ভবিষ্যৎ যুগের কোনও লেখক বলেন বার্নার্ড 'শ তাহার Man and Superman গ্রন্থের প্রধানা নায়িকার স্বামী মৃগয়া বিবরণ মহাভারতের সাবিত্রীর কাহিনী হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার কথা অনভিজ্ঞ লোক সত্য বলিয়া মনে করিবে।

মদ্ররাজ অশ্বপতি, অতিক্রান্ত বয়সেও যখন তাঁহার সন্ততি জন্মিল না, তখন অপত্যার্থে তীব্র নিয়ম গ্রহণ করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রত্যহ শত সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া হোম করিতেন এবং আহার বিহারেও বিশেষ সংযত হইলেন।

গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা কাম্য-কর্ম্মের জন্য উপাসনা পদ্ধতির এই দৃষ্টান্তটি মহাভারতে পাইতেছি। বহ্নি পুরাণে গায়ত্রী দ্বারা উপাসনা হইতে সর্ব্ব-কামফল প্রাপ্তি হয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি অভিচার ক্রিয়াতেও গায়ত্রীর প্রয়োগ-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। কেবল বলা হইয়াছে নিরপরাধ ভগবদ্ভক্তের প্রতি প্রযুক্ত অভিচার ফলবতী হয় না। উহা অভিচারকারীরই অনিষ্টকর হইয়া উঠে। কিন্তু অভিচার ক্রিয়া দ্বারা লোক কণ্টক দুর্ব্বৃত্ত জনকে ধ্বংস করিলে কর্ত্তার অশেষ কল্যাণ হয়।

> বহূনাং কণ্টকঃ যস্তু পাপাত্মানং সুদুর্ম্মতিম্।
> হন্যাৎ প্রাপ্তাপরাধস্তু তস্য পুণ্যফলং মহৎ॥

(বিশ্বকোষে উদ্ধৃত বহ্নিপুরাণ শ্লোক—ব্যাখ্যা সহ) কয়েক বর্ষ সাধনার পর অশ্বপতির সিদ্ধিলাভ হইল। তাঁহার উপাসনায় তুষ্টা সাবিত্রী-রূপিণী হইয়া সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। রাজাকে বর লইতে বলিলেন। তিনি বহু পুত্র প্রার্থনা করিলেন। দেবী বলিলেন আমি পূর্ব্বেই স্বয়ম্ভুকে তোমার প্রার্থনার কথা বলিয়াছি; তিনি যথা সময়ে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আপাততঃ তোমার এক মহাগুণান্বিতা কন্যা প্রাপ্তি হইবে; ইহাতেই সন্তুষ্ট হও। রাজা আনন্দিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

যথাসময়ে রাজগৃহে রাজীবলোচনা কন্যার আবির্ভাব হইল। সাবিত্রী-

মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা সাবিত্রী দেবীর প্রসাদে তাঁহার জন্ম হইল বলিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন।

মহাভারতকার বালিকা ও কিশোরী সাবিত্রীর কথা কিছু বলেন নাই। একেবারে যুবতী সাবিত্রীকে আনয়ন করিয়াছেন। ঐ দুই অবস্থার সম্বন্ধে আমরা একটু কল্পনার চিত্র অঙ্কিত করিবার প্রয়াস পাইব।

বালিকা ও কিশোরী সাবিত্রীর শিক্ষা তৎকালীন রাজকন্যাদিগের মতই হইয়াছিল। নৃত্য, গীত ও বিবিধ কলাবিদ্যার শিক্ষা। বৃহন্নলা-রূপী অর্জুন বিরাট-রাজগৃহে রাজকুমারী ও তৎসঙ্গিনীবর্গের নৃত্য-গীতাদির শিক্ষক ছিলেন। একমাত্র আদরে কন্যাকে রাজা ও মহিষী পুত্রের মত অনেক শিক্ষা দিয়াছিলেন। সখীগণসহ অশ্বারোহণ ও বিবিধ ব্যায়াম ক্রীড়া, অসি ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা, পিতার সহ অশ্বারোহণে মৃগয়া, সখীগণসহ অশ্বারোহণে নগরোপকণ্ঠস্থ বনভ্রমণ, নদী ও তড়াগাদিতে সন্তরণ—ক্ষত্রিয় রাজকন্যার পক্ষে এ সকল বিগর্হিত কার্য্য ছিল না। পরবর্ত্তী সাবিত্রীতে যে শারীর ও চরিত্র-দার্ঢ্যের পরিচয় পাই তাহাতে ঐ চিত্র সম্পূর্ণ সঙ্গত মনে হয়।

সাবিত্রী ক্রমশঃ যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। মহাভারতে তাঁহার রূপ বর্ণনা—বিগ্রহবতী শ্রীর ন্যায়, কাঞ্চনী প্রতিমার ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া লোকে আবির্ভূতা দেবকন্যা ভাবিয়া সম্মান করিত।

কিন্তু :—

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্বরয়ামাস তেজসা পরিবারিতঃ॥

জ্বলন্ত শিখা সদৃশ তাঁহার তেজের দ্বারা বারিত হইয়া কোনও রাজপুত্র তাঁহাকে ভার্য্যার্থে বরণ করিতে আসিতেছেন না।

মহাভারতে ইহার আর ব্যাখ্যা নাই। আমরা এজন্য কল্পনার সাহায্যে নিম্নে দু'টি চিত্র নির্ম্মাণ করিব।

রাজপুত্র ভূরিভারের প্রাদুর্ভাব

ভূরিভার আসিয়া সাবিত্রীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কে না হইবে? রাজাকে গিয়া বলিলেন, আমি আপনার কন্যা সাবিত্রীর পাণিপ্রার্থী। অশ্বপতি ভূরিভারের বিপুলায়তন দেখিয়া বিশঙ্কিত হইলেন। বলিলেন, কন্যা বয়স্থা। তাহার সহ পরামর্শ করিয়া আপনাকে বলিব। রাজপুত্র নিজের দৈহিক প্রাচুর্য্য বশতঃ কন্যামনোহারিত্ব গুণ সম্বন্ধে পূর্ব্বাভিজ্ঞতা হইতে সন্দিহান ছিলেন। বলিলেন, তাড়াতাড়ি কথাটা সাবিত্রীর কাছে পাড়িয়া কাজ নাই। আমি কয়েকদিন এখানে বাস করি, আমার সম্বন্ধে আপনারা আরও পরিচিত হইবার পর প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবেন। রাজা উপস্থিত একটা সঙ্কট অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া তুষ্ট হইলেন। ভূরিভারের থাকিবার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

ভূরিভার কিন্তু সোজা রাস্তা না ধরিয়া বাঁকা পথ ধরিলেন। মন্ত্রী-পুত্র কৌশলী তাঁহাকে পরামর্শ দিল। সাবিত্রীকে পাইবার নিশ্চিত উপায়—উহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাওয়া। আর রাজপুত্রদের পক্ষে এরূপ রাক্ষস বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। অতএব ভূরিভার ও কৌশলী নিজেদের নিযুক্ত চর ও দূতী সাহায্যে রাজকুমারীর গমনাগমন সম্বন্ধীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করিল। মাঝে মাঝে রাজকুমারী সখীগণ সঙ্গে অশ্বারোহণে নগরোপকণ্ঠে বনভোজনে যাইতেন। রাজার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ; প্রজারা সুখে বাস করিতেছে, এজন্য রাজকন্যা স্বেচ্ছামত বেড়াইতেন, প্রহরী পাহারার প্রয়োজন হইত না।

রাজকন্যা একদিন অরণ্যবিহারে যাইতেছেন। ভূরিভার ও তাঁহার অনুচরবর্গ দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল এবং বনমধ্যে ভিন্ন স্থানে লুক্কায়িত রহিল। কন্যাগণ নদীসংলগ্ন জলাশয়ের সন্নিকটে শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড দেখিয়া এক বৃক্ষতলে নিজেদের শিবির সন্নিবেশ করিয়া অশ্বদিগকে তৃণভোজনের জন্য ছাড়িয়া দিল এবং আহারাদি ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। সখীদিগের মধ্যে কার্য্যবিভাগ করিয়া দিয়া সাবিত্রী বনের বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে দলভ্রষ্ট হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেন। সমস্ত বনই তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যটিত হইয়াছে। পথ-ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সংবাদ চর মুখে ভূরিভার ও কৌশলীর নিকট পৌঁছিল।

রাজপুত্র বলবান্, মল্লবিদ্যা ও শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত। একটি মেয়ে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য অন্য সাহায্যের প্রয়োজন নাই। অতএব স্থির হইল কৌশলী অনুচরবর্গ ও অশ্বদিগকে লইয়া কিছু দূরে লুক্কায়িত থাকিবে। ভূরিভার সাবিত্রীকে গ্রহণ করিয়া সেখানে পৌঁছিলে, সকলে দেশমুখে প্রস্থান করিবে।

দূর হইতে রাজপুত্র দেখিলেন সাবিত্রী ফিরিতেছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য তিনি আক্রমণ করিবার পক্ষে উপযোগী স্থান সংগ্রহ করিলেন। এ স্থানে পথটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, একটি লোক মাত্র চলিতে পারে। দুই পার্শ্বে কণ্টক-বন; উহার পর নিবিড় অরণ্য। তিনি একটি বাঁকের প্রায় সামনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সাবিত্রী বাঁক ফিরিয়াই এই বিশালকায় পুরুষকে পথরোধ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিলেন। ভূরিভার একটু প্রেম নিবেদনের প্রয়াস পাইলেন। আরম্ভ করিলেন "হে সুন্দরী—" কথাটা শেষ হইল না। সাবিত্রী রোষকষায়িত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন, "এই নির্জন বনে অসহায়া স্ত্রীলোককে অবমাননা করিতে আপনার লজ্জা হয় না? দর্পণে একবার নিজের মুখখানা দেখুন, কি বিশ্রীই আপনাকে দেখাইতেছে! সত্বর পথ ছাড়িয়া দিন।" সাবিত্রীর রোষদীপ্ত কমনীয় মুখ ভূরিভারকে আরও বিহ্বল করিল। তাঁহার অন্তরস্থ পশু জাগ্রত হইল। তিনি সাবিত্রীকে ধরিতে গেলেন। ইহার পর যাহা হইল তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এবং প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়াই তাঁহার পরাজয় হইল।

ভূরিভারের মুখের উপর একটি মুষ্ট্যাঘাত হইল। সে মুষ্টি বজ্র-মুষ্টি নহে। ভূরিভারকে দমিত করিতে সম্পূর্ণ অপর্য্যাপ্ত। কিন্তু রাজপুত্রের দেহের ভারকেন্দ্র মোহ বশতঃই হউক, আর গ্রহণ প্রচেষ্টা

জনিত দেহসংস্থানের জন্যই হউক, অথবা সাবিত্রীর উপযুক্ত দিক্ হইতে মুষ্ট্যাঘাত করিবার জ্ঞান ও তাহার প্রয়োগপ্রণালী জানার জন্যই হউক—ভূরিভার পড়িয়া গেলেন। পড়িয়া গেলেন আবার বিকণ্টক বনের উপরে। উঠিলেন বিক্ষতাঙ্গ হইয়া। সাবিত্রী ইত্যবসরে তাঁহার পাশ দিয়া লাফ দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ভূরিভার তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তখন মেয়ে ও মল্লের দৌড় আরম্ভ হইল। একের জীবন-মরণের দৌড়। অপর দুষ্কপুরুষের আশাভঙ্গ-জনিত অবমাননার প্রতিশোধের জন্য দৌড়। সাবিত্রী ধাবনপটু ছিলেন। ভূরিভারের বিপুল দেহ যাহাকে অমিত বল দিলেও তাঁহার গতিবেগের অন্তরায় ছিল; অতএব মৃগ ও শিকারীর দূরত্ব ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতে থাকিল। সাবিত্রীর আর একটা সুযোগ হইল। ক্রমশঃ পার্শ্বের জঙ্গল বিরল হইয়া পড়িল। তিনি পথ ছাড়িয়া বনে প্রবেশ করিলেন। চড়ুই কাক দ্বারা তাড়িত হইয়া যেরূপ ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করে; কাকের বৃহত্তর দেহ সে ঝোপে যাইতে পারে না। স্বল্পকায়া সাবিত্রী বৃক্ষসংঘাতের মধ্য দিয়া সহজেই পলাইতে লাগিলেন। বৃহৎকায় কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া যাইতে পারিলেন না। ঘুরিয়া বড় ফাঁক বাহির করিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল। ক্রমশঃ আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর দূরত্ব বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

নিরাপদ দূরত্ব লাভ হইয়াছে ভাবিয়া সাবিত্রী একবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ভূরিভারকে তখনও আক্রমণপ্রয়াসী দেখিয়া তাঁহার অন্তরের ক্ষত্রিয়ানী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অপমানের প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা উগ্র হইয়া উঠিল। তিনি মুখ ভেঙ্গাইয়া রাজপুত্রকে ব্যঙ্গ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সুন্দর মুখের ব্যঙ্গও যেন উহাকে আরও উন্মাদিত করিয়া তুলিল। তিনি আরও বিক্রমের সহিত আক্রমণার্থ ধাবমান হইলেন।

সাবিত্রী আবার ছুটিলেন। প্রতিশোধের উপায় তাহার মনোমধ্যে স্থির হইয়াছে। ক্রমশঃ তাঁহারা সে বনের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া এক তৃণশ্যামল প্রান্তরে উপনীত হইলেন। প্রান্তরের পরই আর এক বন। সাবিত্রী সেইদিকে ছুটিলেন। বাধাহীন প্রান্তর দেখিয়া ভূরিভারের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। তিনি বেগে দৌড়াইতে লাগিলেন। উভয়ের দূরত্ব কমিয়া আসিতে লাগিল। সাবিত্রী যখন নূতন বনে প্রবেশ করিয়াছেন তখন দূরত্ব খুব কমিয়া গিয়াছে। ভূরিভারের আশাপ্রদীপ বর্দ্ধমান। এমন সময়ে সাবিত্রী পড়িয়া গেলেন। আক্রমণকারী ভাবিলেন কি সৌভাগ্য। বনের সমস্ত অংশ সাবিত্রীর নখদর্পণের ন্যায় জ্ঞাত। পড়িয়া সাবিত্রী একখণ্ড কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। ভূরিভার তখন একটা প্রকাণ্ড গাছের সমীপস্থ। সেই গাছে এক প্রকাণ্ড মৌমাছির চাক ছিল। সাবিত্রী তাহা জানিতেন। তাঁহার হস্তনিক্ষিপ্ত কাষ্ঠখণ্ড অব্যর্থ লক্ষ্যে চাকের কিয়দংশ ভঙ্গ করিল। তিনি প্রচণ্ড বেগে আরও খানিকটা ছুটিয়া গেলেন এবং এক বংশী বাহির করিয়া তূর্য্যধ্বনি করিলেন। অবিলম্বে শস্ত্রধারিণী সখীর দল আসিয়া পৌঁছিল। কিন্তু তাহাদের কিছু করিতে হইল না। যুদ্ধ জয় হইয়াছে। শত্রু প্রাণপণে, অসংখ্য মৌমাছি কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অনুধাবিত হইয়া, পলায়ন করিতেছে।

ভূরিভারের প্রকাণ্ড মুখ স্ফীতীভূত হইয়া আরও কত বড় হইয়াছিল তাহা দেখিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য সে দেশবাসীর হয় নাই। আর তাহাকে দেখা যায় নাই।

রাজপুত্র অমিতস্পর্দ্ধীর আবির্ভাব

ভূরিভার তাহার বন্ধু অমিতস্পর্দ্ধীর সহ সাক্ষাৎ করিয়া সাবিত্রীর রূপের কথা এবং নিজের পরাভব-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন এবং অপমানের প্রতিশোধের পরামর্শ চাহিলেন। অমিতস্পর্দ্ধীর স্পর্দ্ধার অভাব ছিল না, সে বলিল, "তুই একটা সামান্য মেয়েমানুষকে বশে আনিতে পারিলি না! দেখিবি, আমি তাহাকে সত্বরই লইয়া আসিতেছি।"

অমিতস্পর্দ্ধী যখন অশ্বপতির নিকট নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছে ঠিক সেই সময়ে সাবিত্রী সেখানে উপনীত হইল। রাজা তাহাকে রাজপুত্রের অভিপ্রায়ের কথা জানাইলেন। সাবিত্রী বলিল, "আমরা এখন বনভ্রমণে বাহির হইতেছি। যদি উনি ইচ্ছা করেন আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন।" অমিত এই প্রস্তাবে বিশেষ আপ্যায়িত হইল। এমন সময় সাবিত্রীর রাজপুত্রের সুন্দর অশ্বটির প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি অশ্বটির প্রশংসা করিয়া উহার মাথায় ও গলায় হাত বুলাইলেন। অশ্ব যেন বিশেষ তৃপ্তির সহিত এই আদর গ্রহণ করিল। অশ্বটি সাবিত্রীর পছন্দ হইয়াছে ভাবিয়া এবং নিজের বদান্যতা দেখাইবার জন্য অমিতস্পর্দ্ধী বলিল, "এই অশ্বটি আমি আপনাকে উপহার দিতেছি; গ্রহণ করুন। আমি অন্য অশ্বে যাইতেছি।" সাবিত্রী বলিল, "ইহা আমার উপযোগী হইবে কিনা আজ দেখি; আপনি আমার অশ্বে আরোহণ করিয়া আসুন।" তাহাই হইল।

সাবিত্রীকে বহন করিয়া অমিতস্পর্দ্ধীর অশ্ব বেগে ধাবমান হইল। অশ্বারোহিণী সখিগণ তাহার অনুসরণ করিল। অমিত রাজকন্যার অশ্বে আরোহণ করিল। সে কড়া মেজাজের লোক। উৎকৃষ্ট যন্ত্রীসকল তাহার অশ্বদিগকে নিয়ন্ত্রিত ও শিক্ষিত করে। সে অশ্বে আরোহণ করে। কিন্তু জন্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করা তাহার অভ্যাস নহে। সাবিত্রীর অশ্ব প্রাত্যহিক আপ্যায়নে বঞ্চিত হইয়া ক্ষুব্ধ হইল। আর রাজপুত্রের গুরুভারও তাহার মনোনীত হইল না। সে রাজপুত্রের তাড়না সত্ত্বেও ধীরগতিতে পূর্ব্বের দলকে অনুসরণ করিল। অমিত ভাবিল, রাজকন্যার অশ্ব নিশ্চয়ই শান্ত ও নিস্তেজ। সে তাহাকে উত্তেজিত করিবার জন্য পৃষ্ঠে তীব্র কশাঘাত করিল। তেজস্বী অশ্ব হঠাৎ উগ্রবেগে ছুটিল। এই অতর্কিত বেগের জন্য রাজপুত্রের হস্তস্থ সংযমন-রজ্জুর ব্যবহার বিফল হইল। অশ্ব বিপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ লম্ফ দিয়া এক খানা পার হইল। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রও সেই খানার মধ্যে পড়িয়া গেল। আহত রাজপুত্রকে তাহার সঙ্গীগণ অন্য অশ্বে আরোহণ করিতে সাহায্য করিল। সে অশ্বারূঢ় হইয়া সঙ্গীদিগকে স্বদেশের পথ ধরিতে আদেশ দিল।

অমিতস্পর্দ্ধী মনে করিল সাবিত্রী ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে দুষ্ট অশ্বে আরোহণ করাইয়াছিল। সে ভূরিভাষের সহিত মিলিত হইয়া সাবিত্রী সম্বন্ধে এমন সব গল্প রটনা করিয়া দিল যাহার ফলে আর কোনও রাজপুত্র সাবিত্রীর পাণিগ্রহণার্থ আগমন করিল না।

ভ্রমণ

সাধারণ ঘরের মেয়ে বয়স্থা হইবার উপক্রম করিলে, তাহার পিতামাতার নিকট আত্মীয় ও অনাত্মীয়দিগের কন্যার জন্য উদ্বেগ এমনই প্রকটিত হইতে থাকে যে পিতামাতা আর কন্যাকে পাত্রস্থ করা সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না। তবে সাবিত্রী রাজকন্যা বলিয়া কেহ তাহার পিতামাতার নিকট তাহার বয়সের কথা উত্থাপিত করিতে ভরসা করে নাই। তাই সাবিত্রীর বয়স বেশ বেশীই হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ সাবিত্রীকে দেখিয়া অশ্বপতির হুঁশ হইল। সত্যই ত মেয়েটার বিবাহের বয়স অতিক্রান্তপ্রায় হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে বর্দ্ধিষ্ণু কিশোর-কিশোরীদিগকে বিজ্ঞানসম্মত কিছু কিছু যৌন-জ্ঞান দেওয়া উচিত কিনা এতৎ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মত চলিতেছে। একদল বলেন (তাঁহারা রক্ষণশীল) এরূপ করিলে ছেলেমেয়েগুলি অকালপক্ক হইয়া উঠিবে এবং তাহাদের ক্ষতি হইবে। অপর নব্য দল বলেন, এ সম্বন্ধে লোকের জানিবার ইচ্ছা এতই প্রবল যে শুদ্ধভাবে যথার্থ জ্ঞান না দিলে ছেলেমেয়েরা ইতর লোকের নিকট হইতে ঐ জ্ঞান (অনেকটা বিকৃতিভাবাপন্ন) আহরণ করিবে।

মহাভারতকার কিন্তু নব্যভাবাপন্ন। পিতাপুত্রীর কথাবার্ত্তায়ও তাঁহার যৌন ব্যাপারের আলোচনায় কোনওরূপ ঢাকাঢাকি নাই।

অশ্বপতি কন্যাকে বলিলেন, "পুত্রি, তোমার প্রদান কাল উপস্থিত। অথচ কোনও রাজপুত্রই ত আর তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়া আসিতেছে না। অতএব তুমি নিজেই নিজ গুণানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ কর। শাস্ত্রে বলে যে পিতা কন্যাদান করে না এবং যে ভর্ত্তা ঋতুকালে পত্নীগমন করে না উভয়েই নিন্দ্য। (অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যে শ্চানুযন্ পতি)। অতএব যাহাতে তুমি দেবতাদিগের নিকট নিন্দনীয় না হও এজন্য ত্বরা পতি অন্বেষণ কর।" এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধ সচিবগণকে সাবিত্রীর দেশ-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। ব্রীড়িতা সাবিত্রী অবিচারে পিতার আদেশ গ্রহণ করিলেন। স্থবির সচিবগণবৃতা সাবিত্রী হৈম রথে করিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

অশ্বপতি পরাক্রান্ত নৃপতি হইলেও যেন তাঁহার বুদ্ধিটা একটু মোটা ছিল। সাবিত্রী কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। ভ্রমণ ব্যাপারে তিনি কোনও রাজার রাজধানীতে যান নাই। তিনি ঋষি ও রাজর্ষিগণের রম্য তপোবন সকল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং তীর্থ সকলে গমন করিয়া দানাদি কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে দেশে ফিরিলেন।

নারদ

নারদ অশ্বপতির নিকট আসিয়াছেন। সভামধ্যে উভয়ের কথাবার্ত্তা হইতেছে। এমন সময় সাবিত্রী সচিবগণের সহিত তীর্থ ও আশ্রম সকল ভ্রমণ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিলেন। ঋষিকে পিতার সহিত আসীন দেখিয়া তিনি শির দ্বারা উভয়ের পাদবন্দনা করিলেন। নারদ বলিলেন, "হে নৃপ, তোমার কন্যা কোথা গিয়াছিল, কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? এই যুবতীকে কি জন্যই বা ভর্ত্তাকে সম্প্রদান কর নাই।" অশ্বপতি বলিলেন, "ঐ কার্য্যের জন্যই উহাকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। আজই ফিরিয়াছে। কাহাকে ভর্ত্তৃত্বে বরণ করিল তাহা উহার নিকট হইতেই শুনা যাক।" এই বলিয়া তিনি দুহিতাকে সকল কথা বলিতে আদেশ দিলেন।

সাবিত্রী বলিলেন, "শাল্বদেশে দ্যুমৎসেন নামক ধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন (সাবিত্রীর শ্বশুর ও স্বামীর নাম গ্রহণে বাধা ছিল না)। পরে তিনি অন্ধ হন। তাঁহার বালপুত্র এবং বিনষ্টচক্ষুত্ব রূপ ছিদ্রের সাহায্যে পূর্ব্বের বৈরীগণ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিল। তিনি বালপুত্র ও ভার্য্যা সহ বনগমন করিয়া মহাতপানুষ্ঠান করিলেন। পুত্র তাঁহার নগরে জাত, কিন্তু তপোবনে সংবর্দ্ধিত। এই সত্যবান্ই আমার অনুরূপ বর। আমি তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

নারদ :—"সাবিত্রী না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্কে বরণ করিয়া মহা পাপ করিয়াছে। তাহার মাতা সত্য বলে, পিতা সত্য বলে, এজন্য ব্রাহ্মণগণ তাহার সত্যবান্ নামকরণ করিয়াছেন। বালকের অশ্ব অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ করিত এবং চিত্রেও অশ্ব লিখিত।"

অশ্বপতি :—"সেই নৃপাত্মজ কি এখন তেজস্বী ও বুদ্ধিমান্ হইয়াছেন? তিনি কি ক্ষমাবান্, সত্যবাদী, শূর ও পিতৃবৎসল?"

নারদ :—"সে বিবস্বানের মত তেজস্বী। বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্। মহেন্দ্রের মত বীর। বসুধার মত ক্ষমাশীল।"

অশ্বপতি :—"রাজপুত্র কি দাতা, ব্রহ্মবিৎ, রূপবান্, উদার বা প্রিয়দর্শন?"

নারদ :—"সে সশক্তিমত দানে রন্তিদেবের সম। শিবি ও উশীনরের মত ব্রহ্মবিৎ ও সত্যবাদী। যযাতির মত উদার। সোমের মত প্রিয়দর্শন। অশ্বিনীকুমারের মত রূপবান্। সে দান্ত, মৃদু, শূরঃ, সত্য, ও সংযতেন্দ্রিয়। সে মৈত্র, অনসূয়, হ্রীমান্ ও দ্যুতিমান্।"

অশ্বপতি :—"ভগবন্, তাহাকে ত সর্ব্বগুণযুক্তই বলিলেন। যদি তাহার কিছু দোষ থাকে তাহাও বলুন।"

নারদ :—"তাহার একটিমাত্র দোষ গুণসকলকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। কোন যত্নের দ্বারাও তাহার প্রতিরোধ সম্ভব নহে। আজ হইতে সম্বৎসর পরেই ক্ষীণায়ু সত্যবান্ দেহত্যাগ করিবে।"

অশ্বপতি :—"দেখ সাবিত্রী তুমি আবার গমন কর। অন্য কাহাকেও বরণ কর। সত্যবানের এক দোষ সকল গুণকে নষ্ট করিয়াছে। দেব সৎকৃত ভগবান নারদ বলিতেছেন সম্বৎসরে সে দেহন্যাস করিবে।"

সাবিত্রী :—"একবার মাত্র পাথর ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেয় না। একবার মাত্রই লোকে কন্যা প্রদান করে। একবার মাত্র লোকে কোন দ্রব্য দিলাম বলিয়া থাকে।"

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ু সগুণো নির্গুণোঽপি বা ।
সকৃৎ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।

দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন, সগুণ হউন বা নির্গুণ হউন, আমি একবার মাত্র ভর্ত্তা বরণ করিয়াছি। দ্বিতীয় বরণ করিব না। মনের মধ্যে নিশ্চয় করিয়াই তবে বাক্য বলিয়াছি।"

নারদ :—"হে নরশ্রেষ্ঠ, তোমার দুহিতার বুদ্ধি স্থির। ইহাকে ধর্ম্মপথ হইতে নিবারিত করিতে পারিবে না। সত্যবানের মত গুণ অন্য পুরুষে নাই। তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করা আমার রুচিসঙ্গত মনে হইতেছে।"

রাজা :—"সাবিত্রী বলিতেছে তাহার মত অবিচাল্য; আপনিও তাহার অনুমোদন করিতেছেন। আপনি আমার গুরু। অতএব এই মতই কার্য্য করিব।"

নারদ :—"তোমার দুহিতা প্রদানে অবিঘ্ন হউক। তোমাদের সকলের ভদ্র হউক। আমি এখন যাইতেছি।"

নারদ উঠিয়া ত্রিদিবে গমন করিলেন। অশ্বপতি দুহিতার বিবাহ-সজ্জার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত হইলেন।

সাবিত্রীর পর্য্যটন

সাবিত্রী যে কিছুকাল দেশ পর্য্যটন করিলেন, মহাভারতকার তাহার কোনও বর্ণনা দেন নাই। আমরা কল্পনার সাহায্যে তাহার এক অধ্যায় নির্ম্মাণ করিবার প্রয়াস করিব।

সাবিত্রী রাজধানীতে না যাইয়া তীর্থসকল ও ঋষিগণের আশ্রম সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে বহু দেশের লোক আসে, রাজা, রাজকুমার ও অন্যান্য রাজপরিবারবর্গও আসে। এ কারণ তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজা ও রাজপুত্র সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আহরণ করিতে পারিয়াছিলেন। দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবান্‌ই তাঁহার মনোযোগ অত্যধিক আকর্ষণ করে, নানা কারণে। তাঁহাদের করুণ কাহিনী। সত্যবানের রূপ ও গুণ। আর বোধ হয় নিজ অপুত্রক পিতার রাজ্যহীন রাজপুত্র জামাতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রিয়তর হইবে, এ কথাও সূক্ষ্মভাবে তাঁহার মনের অন্তরালে স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

সাবিত্রী যথাকালে দ্যুমৎসেন-আশ্রমে উপনীতা হইলেন। তরুতলে আসীন রাজা ও রাজমহিষী এবং তপস্বীগণকে পাদ-বন্দনাদি দ্বারা অভিবাদন করিলেন। নবাগত মান্য অতিথির আগমনে আশ্রমে একটা ঔৎসুক্যভাব আসিল। আশ্রমবাসিগণ উপস্থিত হইয়া নানা ভাবে স্থান পরিগ্রহণ করিল। বৃদ্ধ সচিব সাবিত্রীর পরিচয় ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলিলেন। রাজরাণী রাজকন্যাকে অত্যন্ত সাদরে গ্রহণ করিলেন। আসনে উপবিষ্টা সাবিত্রী তাঁহাদের বিবিধ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। কথোপকথনের মধ্যে সাবিত্রীর চঞ্চল চক্ষু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। যেন সে সমবেত জনগণের মধ্যে কাহার সন্ধান করিতেছে। সত্যবান্ ইত্যবসরে—অতিথি আসিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আহার ও ইন্ধন সংগ্রহ প্রয়োজন ভাবিয়া বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু নূতন অতিথিকে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া অদূরে দণ্ডায়মান হইলেন। সাবিত্রীকে দেখিলেন। দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

সাবিত্রীর মৃগায়মান নেত্র চকিতে সত্যবান্‌কে দেখিয়া লইল। সে অন্তরে অনুভব করিল এই সেই—যাহার জন্য সে এতকাল অপেক্ষা করিয়া আছে—যাহার জন্য যুগযুগান্তর ধরিয়া তপস্যা করিয়াছে। কি সুন্দর কমনীয় মূর্ত্তি! দীর্ঘাকার বলবান যুবা। শুভ্র গৌর কান্তি। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মুখ। অনাবৃত সুবিশাল বক্ষস্থল। পরিধানে বল্কল। স্কন্ধে কুঠার। সুদৃঢ়, সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত বাহু ও পদযুগল।

সত্যবান্ বনের দিকে গমন করিলেন। সাবিত্রীর চক্ষু অনেক দূর হইতে মাঝে মাঝে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। মান্যগণের প্রশ্নোত্তরদান সমাধা হইলে সাবিত্রী উঠিলেন। সচিবগণকে বলিলেন, আপনারা বিশ্রাম করুন। এই আশ্রম প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণ। এখানে কোনও ভয় নাই। আমি একবার আশ্রম পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসি। সচিবগণ তাঁহার এরূপ ব্যাপারে অভ্যস্ত ছিল। সাবিত্রী বনের দিকে প্রস্থান করিলেন।

সত্যবান্ যেদিকে গিয়াছিলেন, সাবিত্রী সেই দিকে চলিলেন। খানিকক্ষণ দ্রুত চলিয়া তিনি সুদূরে গম্যমান্ সত্যবান্‌কে দেখিলেন এবং আরও দ্রুত চলিয়া দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করিলেন। আরও কিছুদূর চলিয়া তিনি এক দ্বিধা পথ দেখিতে পাইলেন। স্থানটি বিরল জঙ্গল। পথের সংস্থান-প্রণালী দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন এ পথটি দিয়া গেলে তিনি ঘুরিয়া সত্যবানের ঠিক সম্মুখেই উপনীত হইতে পারিবেন। সেই পথ ধরিয়া তিনি আরও দ্রুত চলিলেন।

সাবিত্রী-সত্যবান্

রম্য বনপথ। দুই ধারে বিরল গুল্মলতা ও বৃক্ষ। কতকগুলি গুল্মে সবুজ, হলদে ও লাল ফল শোভিতেছে। সপুষ্প লতা-সকল বৃক্ষের শিরোদেশে আরোহণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া দুলিতেছে। কুটজ-পুষ্পের সুঘ্রাণে বন আমোদিত। মাঝে মাঝে শুভ্র পুষ্পের রাশিতে গাছ ঢাকিয়া গিয়াছে। অদূরে পুষ্পশোভিত ধব গাছ বনাগ্নির মত শোভা পাইতেছে। পাখীর কাকলী ও মধুমক্ষিকার গুঞ্জনে বনস্থলী মুখরিত। মাঝে মাঝে ময়ূর বিচিত্র পেখমের সৌন্দর্য্য বাহির করিয়া বৃক্ষডালে শোভিতেছে। অদূরে এখানে ওখানে মৃগ ও মৃগশিশু তৃণ ভোজনে নিবিষ্ট।

এই বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে সহসা সত্যবানের সম্মুখে যেন বনদেবী আবির্ভূতা হইলেন। পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাপস-জীবনে অভ্যস্ত যুবকের মুখমণ্ডল, নগরবাসিনী এই মহিমাময়ী রাজপুত্রীকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে তাহা ভাবিয়া সংশয়াকুল ভাব ধারণ করিল। সাবিত্রী তাঁহার অবস্থা বুঝিলেন। দেখিলেন কথাবার্ত্তা

তাঁহাকেই চালাইতে হইবে। তিনি হাত তুলিয়া বলিলেন, "নমস্কার।" সত্যবান্ আবিষ্টভাবে বলিলেন, "নমস্কার।"

সাবিত্রী :—"মহাশয়, আপনাদের দেশে আসিলাম। অতিথি। একটা কথা কহিয়াও ত' অভ্যর্থনা করিলেন না !"

সত্যবান :—(শুষ্ক কণ্ঠ বিশেষ চেষ্টায় সংযত করিয়া) "এই আপনাদের জন্য কিছু আহার ও ইন্ধন সংগ্রহার্থে বনে আসিয়াছি।"

সাবিত্রী :—"তাই বুঝি আপনার স্কন্ধে কুঠার? কাঠ কাটিবার জন্য ?"

সত্য :—"হাঁ।"

সাবিত্রী :—"আর হাতে যে প্রকাণ্ড ঝুড়িটা ঝুলিতেছে ওটা কি জন্য ?"

সত্য :—"এখানে ইহাকে কঠিন বলে। ফল-মূল ও শাক আহরণ করিয়া ইহাতে করিয়া লইয়া যাই।"

সাবিত্রী :—"কিছু ফলটল পাইয়াছেন নাকি ?"

সত্য :—(পাত্র দেখাইয়া) "এখন অল্প পাইয়াছি। পরে আরও সংগ্রহ ক'রব।"

সাবিত্রী :—"এগুলি কি রকম খাইতে ?"

সত্য :—"দেখুন না খাইয়া" (কিছু হাতে দিলেন)।

সাবিত্রী :—(কয়েকটি মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিলেন। মুখ বিকৃত হইল। কিন্তু বলিলেন) "চমৎকার।"

এবার সত্যবান্ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আপনার মুখভঙ্গী দেখিয়া উহা যে চমৎকার লাগিল তাহা মনে হয় না। আর উহা চমৎকারও নহে। কতকগুলা ডাঁশা সেয়াকুল—খাইতে কষা ও টক। এই বইচগুলা দেখুন।"

সাবিত্রী :—(মুখে দিয়া) "এগুলা খাইতে মিষ্ট কিন্তু বড় বীচি।"

সত্যবান :—"সামনের বনে আমরা ভাল ফল পাইব। আম্র ও পনস। আপনি কি অতদূর যাইতে পারিবেন ?"

সাবিত্রী :—"চলুন না। আমার এ বন বড় ভাল লাগিতেছে।"

সামনে একটা শুষ্ক গাছ দেখিয়া সত্যবান্ বলিলেন, "আমি ঐ গাছটা কাটিয়া রাখি। এই বলিয়া কুঠার হস্তে লইলেন। সাবিত্রী কুঠার দেখিতে চাহিলেন। উহা গ্রহণ করিয়া দেখিলেন—উহা বেশ ভারী এবং তীক্ষ্ণধার। প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন, "আপনার কোমরে ঝুলিতেছে ওটা কি ছুরিকা ?"

সত্যবান্ ছুরিকা খুলিয়া সাবিত্রীর হাতে দিলেন। সাবিত্রী বলিলেন, "এটি বেশ দৃঢ়, ধারাল, একটু বেশী ভারি।"

সাবিত্রী নিজ কটিতট হইতে কোষমুক্ত ছুরিকা লইয়া সত্যবানের হাতে দিলেন। উহা লঘুতর, খুব ধারাল, আর উহার হাতল বিচিত্র রত্ন খচিত।

ছুরিকা গ্রহণ করিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "আমাদের নগর অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে আজকাল নানাবিধ ব্যায়াম চর্চ্চার প্রচলন হইয়াছে। আপনার কুঠারটা দেখি, গাছটা কাটিতে পারি কিনা।"

সত্যবান্ ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার হাতে কুঠার দিলেন। সাবিত্রী গাছটিকে কাটিবার কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া বিষণ্ণভাবে ফিরিয়া আসিয়া সত্যবানের হস্তে কুঠার প্রত্যর্পণ করিলেন। বলিলেন, "গাছটা বড় শক্ত।"

সত্যবান্ বলিলেন, "শুষ্ক গাছগুলা বড় শক্ত হয়। তবে আশ্রমসীমার মধ্যে অশুষ্ক গাছ কাটিবার নিয়ম নাই। শুষ্ক গাছের সুবিধাও আছে। সহজে জ্বলে, আর বহিয়া লইবার পরিশ্রমও অনেক কম।" সত্যবান্ গাছটির নিকট গিয়া বলিলেন: "আপনার কাঠ কাটা অভ্যাস নাই বলিয়াই এতটা শ্রম ব্যর্থ হইয়াছে। অনভ্যস্ত কোপগুলা একস্থানে পড়ে না, নানা স্থানে পড়ে, কাজেই কার্য্যকরী হয় না।" সত্যবান্ অল্পক্ষণের মধ্যেই গাছটিকে কাটিয়া ফেলিলেন। তাহার ডালপালাগুলিকে কতক কাটিয়া কতক ভাঙ্গিয়া একরাশি কাঠ প্রস্তুত করিলেন।

সাবিত্রী বলিলেন, "এত আলগা কাঠ বহিয়া লইবেন কিরূপে।"

সত্যবান্ "একটু দাড় প্রস্তুত করি" এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী ঘাসের ঝোপ হইতে ছুরিকা দ্বারা কতকগুলি ঘাস কাটিয়া আনিলেন। বলিলেন, "এই ঘাসগুলি বড় শক্ত, ভাল দড়ি হয়।" অতঃপর তিনি কতকগুলি ঘাস পাকাইয়া একমুখ একটা গাছের ডালে বাঁধিলেন। পরে অন্য মুখ পাকাইতে লাগিলেন ও উহার মধ্যে নূতন ঘাস গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। সাবিত্রী নিবিষ্টভাবে দেখিয়া দড়ি নির্ম্মাণ কৌশল আয়ত্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, "ডাল বাঁধা মুখ আমি লইতেছি। দু'জনা দু'দিক্ হইতে পাক দিলে কাজটা শীঘ্র হইয়া যাইবে।"

এইরূপে অনেকটা দড়ি হইলে সত্যবান্ কাঠগুলি তাহার উপর সাজাইয়া দৃঢ় করিয়া বাঁধিলেন। বলিলেন, "চলুন আমরা ঐ বনে ফল আহরণ করিতে যাই, ফিরিবার সময় কাঠ লইয়া যাইব।"

সাবিত্রী বলিলেন, "এগুলি কি কেহ লইয়া যাইবে না ?"

সত্যবান্ বলিলেন, "তপোবনে কোনও চোর নাই।"

(ক্রমশঃ)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

রমণীর মন

অন্ধকার তখনও জাগে নাই, পূর্বদিকের পর্বতরেখা আকাশের গায়ে পরিস্ফুট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চিত্রক ও গুলিকবর্মা একশত সশস্ত্র অশ্বারোহী লইয়া যাত্রা করিল। চতুর্দিকের সুবিপুল নিস্তব্ধতার মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি ও অস্ত্রের ঝণৎকার প্রতিধ্বনি তুলিল।

স্কন্দের অধিকৃত এই উপত্যকা হইতে নির্গমনের একটি পথ উত্তর দিকে, দুই গিরিশ্রেণীর মধ্যস্থলে প্রণালীর ন্যায় সংকীর্ণ সঙ্কট পথ। এই সঙ্কট প্রায় দুই ক্রোশ দূর পর্যন্ত এক সহস্র সতর্ক প্রহরী দ্বারা রক্ষিত; পাছে শত্রু অতর্কিতে অন্ধকার আক্রমণ করে তাই দিবারাত্র প্রহরার ব্যবস্থা। গুলিকবর্মা ও চিত্রক এই সঙ্কটমার্গ দিয়া চলিল। প্রহরীরা সংবাদ জানিত, তাহারা নিঃশব্দে পথ ছাড়িয়া দিল। ক্রমে সূর্য উঠিল, বেলা বাড়িতে লাগিল। সঙ্কট কখনও প্রশস্ত হইতেছে, আবার শীর্ণ হইতেছে; কদাচ বক্র হইয়া অন্য উপত্যকায় মিশিতেছে। মাঝে মাঝে স্কন্দের গুপ্তচরেরা প্রচ্ছন্ন গুল্ম রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নিকট পথের সন্ধান জানিয়া লইয়া গুলিকবর্মার দল অগ্রসর হইল।

গুলিক ও চিত্রকের অশ্ব অগ্রে চলিয়াছে; পশ্চাতে শত যোদ্ধা। গুলিক স্বভাবত একটু বহুভাষী, এক রাত্রির পরিচয়ে চিত্রকের প্রতি তাহার সদ্ভাব জন্মিয়াছে; দুজনেই সমপদস্থ সমবয়স্ক এবং যুদ্ধজীবী। গুলিক নানাবিধ প্রগল্‌ভ জল্পনা করিতে করিতে যাইতেছে, কোন রাজ্যের যোদ্ধারা কেমন যুদ্ধ করে, কোন্ দেশের যুবতীদের কিরূপ প্রণয়রীতি, আপন অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল কাহিনী শুনাইতে শুনাইতে ধূমকেতুর ন্যায় গুম্ফ আমর্শন করিয়া অট্টহাস্য করিতে করিতে চলিয়াছে। গুলিকের সরল চিত্তে যুদ্ধ ও যুবতী ভিন্ন অন্য কোনও চিন্তার স্থান নাই।

চিত্রক গুলিকের কথা শুনিতেছে, তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া উচ্চ হাস্য করিতেছে, কদাচিৎ নিজেও দুই একটি সরস কাহিনী শুনাইতেছে। কিন্তু তাহার হৃদয়ের মর্মস্থলে একটি ভাবনা লূতা-কীটের ন্যায় নিভৃতে জাল বুনিতেছে। রট্টা মন বদলাইয়াছে রট্টা আর তাহার হইবে না। বিদ্যুৎ-শিখার মত অকস্মাৎ সে তাহার অন্তরে আসিয়াছিল, আবার বিদ্যুৎ শিখার মতই অন্তর্হিত হইল, শুধু তাহার শূন্য অন্তর্লোকের অন্ধকার বাড়াইয়া দিয়া গেল। কাল রাত্রে সে বলিয়াছিল—ইহাতে ভালই হইবে। স্কন্দগুপ্ত রট্টার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন ইহাতে ভালই হইবে।... কাহার ভাল হইবে?

কিন্তু রট্টার দোষ নাই। নব-যৌবনের স্বভাববশে সে চিত্রকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল; দুই দিনের নিত্য-সাহচর্য প্রীতির সৃজন করিয়াছিল। রাত্রে গুহার অন্ধকারে ভয়াকুল চিত্তে রট্টা যে-কথা বলিয়াছিল, যে-রূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা যায় না, ক্ষণিকের আবেগ বিহ্বলতাকে স্থায়ী মনোভাব মনে করা অন্যায়। রমণীর মন কোমল ও তরল—অল্প তাপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই সময় চিত্রক গুলিকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল; গুলিক একটি গল্প শেষ করিয়া বলিতেছে, ‘বন্ধু চিত্রক বর্মা, নারী যতক্ষণ তোমার বাহু মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ তোমার, বাহুমুক্ত হইলে আর কেহ নয়। অনেক দেশের অনেক নারী দেখিলাম; সকলে সমান, কোনও প্রভেদ নাই।’

চিত্রক হাসিয়া বলিল—‘আমারও তাহাই অভিজ্ঞতা।’

গুলিক আবার নূতন কাহিনী আরম্ভ করিল।

না, চিত্রক রট্টাকে মন্দ ভাবিবে না। রট্টা রাজকন্যা; স্কন্দকে দেখিয়া সে যদি মনে মনে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া থাকে ইহাতে বিচিত্র কি? স্কন্দের ন্যায় অনুরাগের

যোগ্য পাত্র আর্যাবর্তে আর কে আছে? ইহাতে ভালই হইবে মণিকাঞ্চন যোগ হইবে।

জল নিম্নে অবতরণ করে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। রট্টা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ এত রূপ এত গুণ কি সাধারণ মানুষের ভোগ্য হইতে পারে?

কিন্তু—

চিত্রকের এখন কী হইবে? সাতদিনের মধ্যে তাহার জীবন সম্পূর্ণ ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। সাতদিন আগে সে যে-মানুষ ছিল, এখন আর সে-মানুষ নাই। সে রাজপুত্র; কিন্তু নিঃস্ব অজ্ঞাত রাজপুত্র, যতদিন সে নিজেকে সামান্য সৈনিক বলিয়া জানিত ততদিন তাহার চরিত্র অন্যরূপ ছিল আর কি সে সামান্য সৈনিক সাজিয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে? তবে তাহার কী দশা হইবে? কী লইয়া সে জীবন কাটাইবে? লক্ষ্যহীন নিরালম্ব জীবন সে আশাতীত আকাঙ্ক্ষার বস্তু অনাহূত তাহার হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রবলতর স্রোতের টানে সে দূরে ভাসিয়া যাইতেছে—

এখন সে কী করিবে? তাহার জীবনে আর কিছু অবশিষ্ট আছে কি?

গুলিক বর্মার হাস্য কণ্টকিত কণ্ঠস্বর চিত্রকের কর্ণে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। গুলিক বলিতেছে—'তিন বৎসর পরে সেই শত্রুর সাক্ষাৎ পাইলাম। বন্ধু, ভাবিয়া দেখ, পুরাতন শত্রুকে তরবারির অগ্রে পাওয়ার সমান আনন্দ আর আছে কি?'

চিত্রক বলিল—'না, এমন আনন্দ আর নাই।'

গুলিক বলিল—'সেদিন শত্রুর রক্তে তরবারির তর্পণ করিয়াছিলাম, সেকথা স্মরণ করিলে আজিও আমার হৃদয় হর্ষোৎফুল্ল হয়। ইহার তুলনায় রমণীর আলিঙ্গনও তুচ্ছ।'

চিত্রকের মনে পড়িয়া গেল। পুরাতন শত্রুর উপর প্রতিহিংসা সাধন। এই কার্যটি বাকি আছে। যে তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছিল তাহাকে বধ করিয়া ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য পালন এখনও বাকি আছে। নিয়তি কুটিল পথে তাহাকে সেইদিকেই লইয়া যাইতেছে। রোট্ট ধর্মাদিত্যকে হত্যা করিয়া সে পিতৃঋণ মুক্ত হইবে।

তারপর? তারপর কি হইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। সকল পথের শেষেই তো মৃত্যু।

চিত্রক চষ্টনদুর্গ অভিমুখে চলুক, আমরা স্কন্দের শিবিরে ফিরিয়া যাই।

প্রাতঃকালে স্কন্দ বহিঃকক্ষে আসিয়া বসিলে পিপ্পলী মিশ্র তাঁহাকে স্বস্তিবাচন করিয়া বলিলেন—'বয়স্য, কাল রাত্রে বড় বিপদ গিয়াছে।'

স্কন্দ অন্যমনস্ক ছিলেন, বলিলেন—'বিপদ!'

পিপ্পলী বলিলেন—'শত্রু আমাদের সন্ধান পাইয়াছে। বয়স্য, এ স্থান আর নিরাপদ নয়।'

স্কন্দ তাঁহার বয়স্যকে চিনিতেন, তাই উদ্বিগ্ন হইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—'কাল রাত্রে কি ঘটিয়াছিল?'

পিপ্পলী বলিলেন—'কাল পরম সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, মধ্য রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অনুভব করিলাম, মেরুদণ্ডের অধোভাগে কি কিলবিল করিতেছে। ভারি আনন্দ হইল, বুঝিলাম কুলকুণ্ডলিনী জাগিতেছেন। জপ-তপ ধ্যানধারণা অধিক করি না বটে কিন্তু গোত্রফল কোথায় যাইবে? অতঃপর সহসা অনুভব করিলাম, কুণ্ডলিনী আমাকে দংশন করিতেছেন—দারুণ জ্বালা। দ্রুত উঠিয়া অনুসন্ধান করিলাম। কি বলিব বয়স্য, কুণ্ডলিনী নয়—পরম-ঘোর কাষ্ঠ-পিপীলিকা। তদবধি আর ঘুমাইতে পারি নাই।'

স্কন্দ ঈষৎ বিমনাভাবে বলিলেন—'কাল আমিও ঘুমাইতে পারি নাই।'

পিপ্পলী বলিলেন—'অ্যাঁ? তোমারও কাষ্ঠ-পিপীলিকা?'

স্কন্দ উত্তর দিলেন না, মনে মনে বলিলেন—'প্রায়।'

এই সময় মহাবলাধিকৃত ও কয়েকজন সেনাপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন যুদ্ধ সংক্রান্ত মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। শত্রুপক্ষ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা তর্কবিচার চলিল। পরিশেষে স্থির হইল, শত্রুর অভিপ্রায় যতক্ষণ না স্পষ্ট হইতেছে ততক্ষণ তাহাদের আক্রমণ করা হইবে না; শত্রু যদি আক্রমণ করে তখন তাহাদের প্রতিরোধ করা হইবে। বর্তমানে স্কন্দের স্কন্ধাবার এই উপত্যকাতেই থাকিবে, স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। এখান হইতে, শত্রু যে-পথেই যাক তাহার উপর দৃষ্টি রাখা চলিবে।

মন্ত্রণা সমাপ্ত হইতে দ্বিপ্রহর হইল। আহারাদি সম্পন্ন

করিয়া স্কন্দ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। লহরী আজ রট্টার সেবায় নিযুক্ত ছিল, একজন ভৃত্য স্কন্দকে ব্যজন করিল।

বিশ্রামান্তে স্কন্দ গাত্রোত্থান করিলে লহরী আসিয়া বলিল—'কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরা আসিতেছেন।'

রট্টা আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। সর্বাঙ্গে স্বর্ণভূষা ঝলমল করিতেছে, পরিধানে জবাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ চীনপট্ট; সীমন্তে মুক্তাফলের ললাম। লহরী অতি যত্নে কবরী বাঁধিয়া দিয়াছে। রাজা মুগ্ধ বিস্ফারিত নেত্রে এই কন্দর্প-বিজয়িনী মূর্তির পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকের জন্য তিনি নিজ অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন, ভাবিলেন, জীবন ভঙ্গুর, সুখ চঞ্চল, সারা জীবন যাহা খুঁজিয়া পাই নাই, তাহা যখন আপনি কাছে আসিয়াছে তখন আর বিলম্ব করিব না—

রট্টা রাজাকে প্রণাম করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—'দেব, এই সকল উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিব কি, বিস্ময়ে আমি হতবাক হইয়াছি। আপনি কি ইন্দ্রজাল জানেন? নারী-বর্জিত সৈন্য-শিবিরে এই সকল অপূর্ব নূতন বস্ত্র অলংকার কোথায় পাইলেন?'

স্মিতহাস্য করিয়া স্কন্দ বলিলেন—'সুচরিতে, চেষ্টা এবং পুরুষকার দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়।'

রট্টা নম্রকণ্ঠে বলিল—'তাহাই হইবে। আমি নারী, পুরুষকারের শক্তি কি করিয়া বুঝিব? প্রার্থনা করি আপনার সর্বজয়ী পুরুষকার চিরদিন অক্ষয় থাকুক। উপহারের জন্য আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, আর্য।'

স্কন্দ বলিলেন—'ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই। তোমাকে উপহার দিয়া এবং সেই উপহার তোমার অঙ্গে শোভিত দেখিয়া আমি তোমার অপেক্ষা অধিক আনন্দ উপভোগ করিতেছি।'

স্কন্দের প্রশংসাদীপ্ত নেত্রতলে রট্টা সলজ্জ নতমুখে রহিল। স্কন্দ তখন বলিলেন—'যুদ্ধের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন আছি, তোমার চিত্তবিনোদনের কোনও চেষ্টাই করিতে পারি নাই। এই সৈন্য-শিবিরে একাকিনী থাকিয়া তোমার মন নিশ্চয় উচাটন হইয়াছে! এস পাশা খেলি। খেলিবে?'

স্মিতমুখ তুলিয়া রট্টা বলিল—'খেলিব মহারাজ।'

স্কন্দের আদেশে লহরী পাশক্রীড়ার উপকরণ অক্ষবাট প্রভৃতি আনিয়া পাতিয়া দিল। রট্টা ও স্কন্দ অক্ষবাটের দুইদিকে বসিলেন।

রাজা পাশাগুলি দুই হস্তে ঘষিতে ঘষিতে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—'কি পণ রাখিবে?'

রট্টা দীনভাবে বলিল—'আমার তো এমন কিছুই নাই মহারাজ, যাহা আপনার সম্মুখে পণ রাখিতে পারি।'

স্কন্দ প্রীতকণ্ঠে বলিলেন—'উত্তম, পণ এখন উহ্য থাক। যদি জয়ী হই তখন দাবী করিব।'

রট্টা বলিল—'কিন্তু আর্য, যে পণ আমার সাধ্যাতীত তাহা যদি আপনি আদেশ করেন, কী করিয়া দিব? পণ দিতে না পারিলে আমার যে কলঙ্ক হইবে।'

স্কন্দ বলিলেন—'তোমার সাধ্যাতীত পণ চাহিব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

'ভাল মহারাজ।—আপনি কি পণ রাখিবেন?'

'তুমি কী পণ চাও?'

রট্টা বলিল—'যদি বলি দণ্ড-মুকুট—ছত্র-সিংহাসন? মহারাজ পণ রাখিবেন কি?'

অনুরাগপূর্ণ চক্ষে রট্টার দিকে অবনত হইয়া স্কন্দ গাঢ়স্বরে বলিলেন—'এই পণ কি তুমি সত্যই চাও?'

অনেক ক্ষণ নীরব থাকিয়া রট্টা ধীরস্বরে বলিল—'আপনার পণও এখন উহ্য থাক, যদি জিতিতে পারি তখন চাহিয়া লইব।'

'ভাল।' বলিয়া স্কন্দ রুদ্ধশ্বাস মোচন করিলেন।

অতঃপর অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হইল। মহারাজ স্কন্দগুপ্ত নবযুবকের ন্যায় উৎসাহ ও উত্তেজনা লইয়া নানা প্রকার রঙ্গ পরিহাস করিতে করিতে খেলিতে লাগিলেন। রট্টাও হাস্যকৌতুকে যোগ দিয়া পরম আনন্দে খেলিতে লাগিল। উভয়ে খেলায় মগ্ন হইয়া গেলেন।

এতক্ষণ লহরী ও পিপ্পলী মিশ্র এই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পিপ্পলী অদূরে বসিয়া খেলা দেখিতেছিলেন, কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর মুখ তুলিয়া দেখিলেন, লহরী তাঁহাকে চোখের ইঙ্গিত করিতেছে। পিপ্পলী মিশ্র ইঙ্গিত বুঝিলেন। তারপর লহরী যখন লঘুপদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন পিপ্পলীও নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রট্টা ও স্কন্দ ভিন্ন কক্ষে আর কেহ রহিল

না। তাহারাও খেলায় এমনই নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন যে তাহাদের অলক্ষ্য অন্তর্ধান জানিতে পারিলেন না।

প্রায় তিন ঘটিকা মহা উৎসাহে খেলা চলিবার পর বাজি শেষ হইল। পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দ পরাজিত হইলেন।

বট্টা করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। স্কন্দ বলিলেন—'বট্টা যশোধরা, আমি তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। এখন কী পণ লইবে লও। দণ্ড-মুকুট ছত্র-সিংহাসন সমস্তই লইতে পার।'

বট্টা বলিল—'না মহারাজ, অত স্পর্ধা আমার নাই। আমার ক্ষুদ্র পণ যথাসময় যাচনা করিব।'

স্কন্দ কিয়ৎকাল বট্টার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—'ভাবিয়াছিলাম, পাশার বাজিতে তোমার নিকট হইতে এক অমূল্য বস্তু জিতিয়া লইব। কিন্তু তাহা হইল না। এখন নিতান্ত দীনভাবে তোমার নিকট ভিক্ষা চাওয়া ছাড়া অন্য পথ নাই। তুমি ভিক্ষা দিবে কি?'

স্কন্দ যে-কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন তাহা বট্টার অপ্রত্যাশিত নয়, তবু তাহার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—'আদেশ করুন আর্য।'

স্কন্দ বলিলেন—'আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর, কিন্তু আমি বিবাহ করি নাই। বিবাহের প্রয়োজন কোনও দিন অনুভব করি নাই। এইরূপ নিঃসঙ্গভাবেই জীবন কাটিয়া যাইবে ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া, তোমার পরিচয় পাইয়া তোমাকে জীবনসঙ্গিনী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে।'

স্কন্দ এইটুকু বলিয়া নীরব হইলেন। বট্টাও দীর্ঘকাল নতমুখে নির্বাক রহিল। তারপর অতি কষ্টে স্খলিত বাক্ সংযত করিয়া বলিল—'দেব, আমি এ সৌভাগ্যের যোগ্য নই। আমাকে ক্ষমা করুন।'

স্কন্দের চোখে ব্যথাবিদ্ধ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল—'তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছ?'

সজল চক্ষু তুলিয়া বট্টা বলিল—'মহারাজ, আপনি অসীম শক্তিধর, সমুদ্রমেখলা আর্যভূমির অধীশ্বর; কেবল এই তুচ্ছ নারীদেহ লইয়া সন্তুষ্ট হইবেন?'

তীক্ষ্ণচক্ষে বট্টার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া স্কন্দ বলিলেন—'না, তোমার দেহ-মন দুই-ই আমার কাম্য। যদি হৃদয় না পাই, দেহে আমার প্রয়োজন নাই। এই বয়সে প্রা নারীদেহ বহন করিয়া বেড়াইতে পারিব না।'

গলদশ্রুনেত্রা বট্টা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল—'রাজাধি তবে মার্জনা করুন। হৃদয় দিবার অধিকার আমার নাই

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া স্কন্দ বলিলেন—'অন্যকে অর্পণ করিয়াছ?'

বট্টা মুখ অবনত করিল, পুষ্পের মধ্যকোষে সঞ্চিত শি বিন্দুর ন্যায় কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া তাহার বক্ষে পড়ি

দীর্ঘকাল উভয়ে নীরব। স্কন্দ ভূমিতে এক হস্ত রা অক্ষবাটের দিকে চাহিয়া আছেন, তাহার মুখে বিচিত্র ভ ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়া আবার মিলাইয়া যাইতেছে। তিনি একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিলেন, তাহার অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'কিছুক্ষণ আমি বলিয়াছিলাম, পরাক্রমের দ্বারা অপ্রাপ্য বস্তুও করা যায়। ভুল বলিয়াছিলাম। ভাগ্যই বলবান। তুমি বশ্য, নহে তোমার প্রেম। তোমার প্রেম পাই না, এ ক্ষোভ মরিলেও যাইবে না।'

বট্টা সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া রহিল, কথা বলিতে পা না। স্কন্দ আবার বলিলেন—'যাহাকে তুমি হৃদয় করিয়াছ সে সেই লোক—আমা অপেক্ষা ভাগ্যবান। বুদ্ধিমত্তা, তোমাকে প্রলোভন দেখাইব না, বলপ তোমাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টাও করিব না। দীর্ঘ বলের চর্চা করিয়া দেখিয়াছি, বলের দ্বারা হৃদয় জয় যায় না। তুমি কাঁদিও না। আমি কখনও পরস্ব হরণ নাই, আজও তাহা করিব না।—তোমার নিকট এ প্রার্থনা—আমাকে ভুলিও না, আমি যখন ইহলোকে থা না তখনও আমাকে মনে রাখিও।'

স্কন্দের পদস্পর্শ করিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে বট্টা বলিল 'দেব, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, আমার হৃদয় মন্দিরে আপ মূর্তি দেবতার ন্যায় পূজা পাইবে।'

স্কন্দ বট্টার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'সুখী হও।'

স্কন্দের শিবিরে যখন এই দৃশ্যের অভিনয় হইতেছি সেই সময় চিত্রক ও গুলিকবর্মা দলবল লইয়া চষ্টন দু সম্মুখে উপস্থিত হইল। দিবা তখন একপাদ অবশিষ্ট আ

(ক্রমশঃ

হিন্দুধর্ম্মে অস্পৃশ্যতা

অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত এম-এ, পিএচ্-ডি

মানে যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে পৃথ্ শ্রেণী আছে। ইহার জন্ম কি দেশী, কি বিদেশী, হিন্দু, কি অহিন্দু কেহই হিন্দুসমাজ তথা হিন্দুধর্ম্মকে লাগালি দিতে ছাড়ে নাই।

আমার কিন্তু মনে হয়, ইহাতে না হিন্দু, না তার সমাজ, তার ধর্ম্মের প্রতি সুবিচার করা হইয়াছে। কেন বলিতেছি।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি দোষ দেওয়া হয়, মুসলমানেরা র করিয়া বিধর্ম্মীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে মনে করে। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিও এই দোষারোপ করা। এই দুইটি ধর্মই বর্ত্তমান প্রচার-ধর্ম্মী। আমি টি ভাল মনে করি, অপরকে সেটা দিতে যাওয়া, থাইতে যাওয়ায় দোষ কি? কিন্তু তাহার পদ্ধতি ছে। লোককে যুক্তিতর্ক দিয়া বুঝান এক কথা, আর র করিয়া গোমাংস খাওয়াইয়া দেওয়া, কলমা পড়ান র এক কথা। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে পশুবৎ জ্ঞান করাও র এক কথা। নানা প্রলোভনে ফেলিয়া ধর্ম্মভুক্ত করাও ই কথা। পরধর্ম্মকে নিন্দা করাও সমান দোষাবহ। ন কিছুর দোষত্রুটি দেখান—আর তাহার নিন্দা করা নহে। একটার ভিত্তি যুক্তি, পদ্ধতি—সমালোচনা; রটার ভিত্তি ঘৃণা, অশ্রদ্ধা, পদ্ধতি—গালাগালি।

খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম যে রকম প্রচার-প্রয়াসী, হিন্দুধর্ম্ম ই রকম নহে। জোর করিয়া হিন্দু কখনও কোন র্ম্মী বা ম্লেচ্ছকে হিন্দু করে নাই। হিন্দুধর্ম্ম কখনও গ অনুমোদন করে নাই। পরধর্ম্মের নিন্দাতেও হিন্দু- উৎসাহ দেয় নাই। ইহার কারণও আছে। হিন্দুদের শাস্ত্রের দুই ভাগ—একটি দর্শন বিভাগ, যার প্রামাণ্য —উপনিষদ, সাংখ্য প্রভৃতি, অপরটি ধর্ম্মবিভাগ, যার মাণ্য গ্রন্থ—গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্র। ধর্ম্ম তে Law বা আইন বুঝায়। সংসার, সমাজের স্থিতি তিকল্পে প্রণীত বিধিব্যবস্থাই ধর্ম্ম। একটা Theory আর একটা practiceও বলা যায়—একটি Philosophy বা metaphysics আর একটি social procedure code. আইন নৈর্ব্যক্তিক—সকলের সঙ্গেই সমান। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আইন বলবৎ থাকে, তার উল্লঙ্ঘন চলে না। আইনমাত্রই স্বাধীনতার সীমারেখা, স্বাতন্ত্র্যের রশ্মি-রজ্জু। বর্ত্তমান কালের আইনেও যুক্তিতর্ক আলোচনা লিখিত থাকে না। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রেও কোথাও বিচার নাই, যুক্তিতর্ক নাই। এইটা করিতে হইবে, এইটা করিতে পারিবে না—ইত্যাকার বিধিনিষেধ আদেশাকারে প্রণীত আছে। একদেশের আইন অন্যদেশের আইনের নিন্দা করে না, আবশ্যকতাও নাই। হিন্দুশাস্ত্রেরও ধারা ঠিক এই রকম। বড় জোর ভিন্ন সমাজকে ম্লেচ্ছ বলিয়া স্বসমাজের সীমানির্দ্দেশ করিয়াছে মাত্র। দর্শন বিষয়ে চুলচেরা বিচার আছে। যার যেমন ইচ্ছা বলিতে পারে, কোন ধারা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। এই বিষয়ে নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য। চার্ব্বাক মুনি, বুদ্ধ, মহাবীরও অবতার, কপিলদেবও ঋষি। এই দর্শন আলোচনায় কত তর্ক, কত যুক্তি, কত বাদ-প্রতিবাদ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, গ্রন্থের পর গ্রন্থে অনন্ত প্রবাহে চলিয়াছে। কিন্তু সামাজিক, গার্হস্থ্য বিধি বা ধর্ম্মে কোন যুক্তি নাই, তর্ক নাই, একেবারে আদেশ। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। ভগবানকে যে যেমন ভাবেই ভাবুক না কেন, তিনি তাহাতে ঠিক তেমন ভাবেই প্রতিভাত হন, অনুগ্রহ করেন। ইহার পর আর বিবাদের অবসর কোথায়? হিন্দুশাস্ত্রে ধর্ম্ম এবং দর্শন এই দুইটিকে অনেকটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—সম্পূর্ণ এক করিয়া ভাবে নাই। আবার যার যেই রকম দর্শন, তার ধর্ম্মে তার দর্শনের সেইরূপ ছায়া পড়িয়াছে। তবুও দুইটিকে একেবারে মিশাইয়া ফেলে নাই। মুসলমান এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম বলিলে ধর্ম্ম এবং দর্শন দুইই বুঝায় এবং একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বোঝায় না। কাজেই হিন্দুধর্ম্মের উদারতা এই সমস্ত ধর্ম্মে

নাই। অনন্ত ধারা ইহার বিশাল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। হিন্দুরা সকলকে এক patternএ ঢালিয়া সাজাইতে চাহে নাই। যাহারাই হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তাহাদের কাহাকেও না বলিয়া নিষেধ করে নাই।

বর্ত্তমানে যাহারা অস্পৃশ্য হিন্দু, তাহারা আদৌ হিন্দু ছিল না। তাহারা ভারতের আর্য্যপূর্ব্ব আদিম অধিবাসী বা outochthons। 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'—উচ্চজনেরা (superiors) যেই রকম আচরণ করিয়া থাকে, অধমজনেরা (inferiors) ঠিক সেই রকমই অনুকরণ করিয়া থাকে—এই নীতি অনুসারে আদিম আর্য্যপুত্র অধিবাসীগণ হিন্দু হইয়া যাইতেছে। হিন্দুদের উচিত ছিল, তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজেদের গণ্ডী বা foldএর মধ্যে স্থান দেওয়া। কিন্তু করে নাই দুই কারণে—এক হইল—অন্যান্য ধর্ম্মের মত হিন্দুধর্ম্ম সাড়ম্বর প্রচারী নহে। এইটা হিন্দুধর্ম্মের গুণ, দোষ নহে। আজ কিন্তু এই গুণকেই দোষ বলিয়া প্রচারিত করা হইতেছে। দ্বিতীয় কারণ হইল, হিন্দুদের স্বাধীনতা-লোপ। রাজ-শক্তি ভিন্নধর্ম্মীর হাতে গেলে হিন্দুকে ঘর সামলাইতে, আত্মরক্ষা করিতে কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। অচলায়তনে যে আত্মরক্ষা করে, তার নূতন রাজ্য আত্মসাৎ করিবার মত শক্তি বা আত্মবিশ্বাস কোথায়।

অস্পৃশ্যরা যে এককালে অহিন্দু ছিল তার প্রমাণ কি? প্রমাণ এক মনুস্মৃতি পাঠ করিলেই পাওয়া যাইবে।

> ব্রাহ্মণ্যঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
> চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।
>
> ৪ শ্লোক ১০ অঃ মনু

অর্থাৎ হিন্দুসমাজে চারি বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। পঞ্চম বর্ণ কিন্তু নাই। তু এর ব্যঞ্জনা এবং forceটা লক্ষ্য করা আবশ্যক। এই চতুর্ব্বর্ণ ব্যতিরেকে আর যত হিন্দু আছে, তাহারা 'সঙ্কীর্ণ', 'অন্তরপ্রভব', 'অন্তরাল'—অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর জাতি। এই চতুর্ব্বর্ণের অন্তরে অন্তরালে তাহাদের স্থান—intermediate, তাহাদেরও ধর্ম্ম আছে, তাহাদের ধর্ম্মের প্রবক্তাও মনু। 'অন্তরপ্রভাবাণাঞ্চ ধর্ম্মান্ নো বক্তুমর্হসি'॥ ২ শ্লোক ১ম অঃ মনু। অ প্রভবদিগের ধর্ম্ম ও আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায় আলোচনা করিলে দে যাইবে এই অন্তরপ্রভবণের মধ্যে নিষাদ, চণ্ডাল, পুক্ক দাশ বা কৈবর্ত্ত, অন্ত্যাবসায়ী (বা মুদ্দফরাস), ধিগ্‌ণ চামার জাতিও আছে। ইহাদের মধ্যে অনুলোমজ প্রতিলোমজ সন্তান আছে। প্রতিলোম বিবাহের নিন্দা করা হইয়াছে এবং প্রতিলোম বিবাহের সন্তান সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ সুস্পষ্ট। কন্যা বিবাহ হইলে পতিগৃহে যায়, প গৃহের আচার ব্যবহার অনুসারেই তাহাকে চলি হয়। এক কথায় পতির ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে হ শিক্ষায়, আচারে, সংস্কৃতিতে শ্রেয়সী কন্যার য অবর বা নীচ জাতির পুরুষের সহিত বিব হয়, কন্যার culture বা সংস্কৃতির degradation অবনতি সাধন হইয়া থাকে—শ্রদ্ধার সহিত এই অব আচার সে গ্রহণ করিতে পারে না। যেইখানে এই র অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞার ভাব, সেইখানে সন্তানের অধোগ অনিবার্য্য। দ্বিতীয় কারণ eugenicsএর কথা। বীজো কর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ। অনুলোম বিবাহের সুফল এখন সমাজে দেখা যায়।

> তপোবীজ প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
> উৎকর্ষঞ্চাপকর্ষঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥
>
> ৪২ শ্লোঃ ১০ অঃ মনু।

তাহা ছাড়া এই রকম বিবাহের প্রেরণা আসে কাম হইতে হিন্দুর বিবাহে মদনের ঘটকালি বা মাতলামির স্থান বিশে দেওয়া হয় নাই।

অনুলোমজই হউক আর প্রতিলোমজই হোক, এই সম জাতিই অন্তরপ্রবভ বা অন্তরাল অর্থাৎ intermediat কাজেই ব্রাহ্মণশূদ্রের অন্তবর্ত্তী। মনুও ইহাদের জ পৃথক ধর্ম্ম বিধান করে নাই। যদিও মনুসংহিত 'সান্তরাল' চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মবর্ণিত হইবে বলিয়া আরম্ভে ব হইয়াছিল। তথাপি চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম বর্ণনা ব্যতিরেকে 'অন্তরাল' জাতির পৃথক ধর্ম্ম বর্ণিত নাই। কাজেই বুঝিতে হইবে এই অন্তরালদিগকে চতুর্ব্বর্ণের কোন না কোন ধর্

পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণের বেলা ইহারা এই চারিটি cotegoryর কোন category ভুক্ত।

শুধু তাই নহে, হিন্দুস্থানের বহির্ভূত অন্যান্য জাতিকেও এই চারিবর্ণে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস মনুসংহিতায় দেখা যায়। তাহাদিগকেও হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, অবন্ত্য, শৈখ, অন্ধ্র, প্রভৃতিকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া বলা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই কয়েক দেশোদ্ভব লোকেরা ক্ষত্রিয়, কিন্তু কর্ম্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিল (মনু ১০ অঃ ৪৪ শ্লোঃ)। যাহারা দস্যু বলিয়া পরিচিত তাহারাও ব্রাহ্মণাদি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত—ক্রিয়ালোপাদি কারণে তাহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহাদের সামনে ব্রাহ্মণের আদর্শও ছিল না। তাহারা আর্য্যভাষীই হোক, আর ম্লেচ্ছভাষীই হোক তাহাদিগকে দস্যু বলা হইত। ইহাও শূদ্রবর্ণান্তর্গত।

ইহার পরও পঞ্চম অস্পৃশ্য জাতি কোথা হইতে আসিবে? উপরের আলোচনায় বেশ বুঝা গেল, যাহারাই হিন্দুর আচার ব্যবহার স্বীকার করিয়াছে, নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, তাহারা চণ্ডালই হউক আর বিদেশী বিজাতিই হউক, তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া বর্ণচতুষ্টয়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তখন ভারত স্বাধীন ছিল, আত্মস্থ ছিল—তাহার শক্তি ছিল—সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছে, হজম করিয়াছে। পরে স্বাধীনতা হারাইবার পরে, তত বেশী হজম করিতে না পারিলেও হিন্দুদের এই বিশিষ্ট হিন্দুকরণ প্রণালী একেবারে স্থগিত ছিল না। আধুনিক কালেও বহু বিধর্ম্মীকে হিন্দু করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যজাতিকেও ব্রাহ্মণেরা হিন্দুভাবাপন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। মুসলমানদেরও সত্যপীর ইত্যাদি গ্রাম্য অবতারের সহায়তায় হিন্দু করিবার চেষ্টা এই যুগেও চলিয়াছে। ইংরেজ আসিয়া ভেদনীতি না চালাইলে হয়ত মুসলমানেরা হিন্দুদ্বেষী না হইয়া হিন্দুশ্লেষী হইয়া পড়িত।

যাউক, আমার উদ্দেশ্য অস্পৃশ্যতার সমর্থন নহে। অস্পৃশ্যতার ঐতিহাসিক ভিত্তি আলোচনা করিলাম মাত্র। আমার কথা, অস্পৃশ্যেরা আদৌ হিন্দু ছিল না, তাহাদিগকে কেহই হিন্দুধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত বা দাক্ষিত করে নাই। তাহারা হিন্দুর উৎকৃষ্টতর সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ, তার অগৌরবের নিদর্শন নহে। হিন্দুদের কোন প্রকার প্ররোচনা, প্রলোভন, প্রপীড়ন না থাকিলেও লক্ষ লক্ষ অহিন্দু স্বেচ্ছায় আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। অন্য ধর্ম্ম হইলে জোর করিয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিত। হিন্দুরা এই অধর্ম্মের পথে ধর্ম্মবিস্তার পাপ বলিয়া মনে করে।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর কি অত্যাচারই না হইল। হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মনাশ ইত্যাদি হিন্দুদের উপর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারই হইল। মুসলমানেরা যদি হিন্দুদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিত, তাহা হইলে ত এই উৎপাত হইত না। হিন্দুমাত্রেরই প্রাণহানি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তার কারণ থাকিত না। শাসকেরা অধৃস্য জাতি, শাসিতেরা অস্পৃশ্য জাতি। শাসিতজাতি যদি স্পৃশ্য এবং ধৃস্য হয়, তাহা হইলেই শাসিতের পক্ষে বিপদ। তবে হিন্দুত্বের এই গুণ কি তার দোষ হইল।

আমি বলছি না যে, এই অস্পৃশ্যতা থাকুক। অস্পৃশ্যতা দূর করা এখন হিন্দুদের দায়। কথায়, propagandaতে তাহা হইবে না। এই অস্পৃশ্যগণকে শিক্ষিত করিতে হইবে। শিক্ষিতের মধ্যে অস্পৃশ্যতা নাই। এখনও যদি হিন্দু তাহার এই দায়কে ধর্ম্মজ্ঞানে পরিপালন না করে, তাহা হইলে মহাপাপ হইবে।

সন্ন্যাসী ও নারী

অধ্যাপক শ্রীবিমলেন্দু কয়াল এম-এ

কম্যুনিষ্ট চীন তিব্বত আক্রমণ করায় তিব্বত ও তিব্বতীয় কাহিনী আজকাল সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা দৈনন্দিন উদ্ভাসিত করছে। হিমালয় যেমন চিরকালই তুষারে আবৃত, তেমনি হিমালয় ও কৈলাস পরপারের এই ঐতিহাসিক দেশটী স্মরণাতীত কাল থেকে রহস্যে সমাকীর্ণ হয়ে আছে। এর রীতিনীতি আদব-কায়দা পোষাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা পূজা-পার্বণ সমস্তই ইন্দ্রজালের মত রহস্যসঙ্কুল বলে সাধারণের মনে একটা ধারণা সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য পর্যটকরা এই রহস্যজাল ভেদ করতে পারেন নি বলে তাঁরা তিব্বতকে বলেন "land of mystic rites and rituals"। এটা যে কত নিগূঢ় সত্য তা কাউকে বলে দিতে হবে না।

ভূপৃষ্ঠ ও সাগরবক্ষ হতে বহু উর্দ্ধে পাহাড়ের শীর্ষভাগে পাহাড়-ঘেরা এই দেশ—পাহাড়গুলি অধিকাংশ সময়ই তুষার-শুভ্র। এখানে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য পরিবেশনের এক অপূর্ব সমারোহ। চারিদিকে নিরবচ্ছিন্ন নীরবতা—এই নীরবতা ভংগ হয় অশ্বেতর জন্তুগুলির কণ্ঠে দোলায়িত ঘণ্টার ঝুনঝুন্ শব্দে এবং কখনও বা খর বাতাসে বিগলিত তুষারের পতন শব্দে।

এই রহস্যঘন তিব্বতের বহু-কাহিনী আমরা পাঠ করি পর্যটকদের দেওয়া বৃত্তান্তে। বিখ্যাত জার্মান পর্যটক ডক্টর এড্‌গার ফন হার্টম্যান এশিয়ার বহু স্থানে এবং দীর্ঘকাল ধরে মংগোলিয়া ও তিব্বতে অবস্থান করেছিলেন। সেখানকার বহু বিষয়ে তিনি জার্মান ভাষায় অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি লিখেছেন। এই সব বিষয় জার্মান ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় অদ্যাবধি অনেকেই এই বিষয়ে বিশেষ কিছু জানতে পারেন নি। শ্রীযুক্ত পি, কে, ব্যানার্জী এন-কে-আই (সুইডেন) হার্টম্যানের গ্রন্থাংশ থেকে কিছু কিছু ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ তাঁর প্রদত্ত বিবরণী থেকে সংগৃহীত হলো।

প্রায় ১৫ দিন ধরে অবিশ্রান্ত গর্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ করে চলার পর তিনি তাঁর গন্তব্য স্থলে এসেছিলেন। হার্টম্যানের এই গন্তব্য স্থলের নাম লাভরঙ গম্বা মঠ বা বিহার। ইহা উক্ত তিব্বতের উত্তরাংশে অবস্থিত। বহু তিব্বতীয় লামা বা ধর্মযাজক তাঁকে তাঁর অভিসন্ধি পরিত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলেন, কেউ বা তাঁর কথা শুধু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু ও কয়েকজন চাইনীর প্রচেষ্টায় হার্টম্যানের বাসনা চরিতার্থ হয়। যে পুণ্যক্ষেত্র লাভরঙ বিহারের মন্দিরে লামাদের শেষ শিক্ষা সমাপ্ত হয় তিনি অবশেষে বহুকষ্টে সেই মন্দির দর্শন করতে সক্ষম হন। এই মন্দিরকে 'কাম মন্দির' নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে কোনও বিদেশী এই কাম-মন্দিরের দ্বারদেশে আসার সৌভাগ্য অর্জন করেন নি। সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী লামারা কেমন করে চিত্ত জয়করতে হবে, কেমন করে ইন্দ্রিয় জয় করতে হয় তা এখানে শিক্ষা করেন। এই তাঁদের শেষ এবং চূড়ান্ত শিক্ষা। এই শিক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তাঁরা লামা পদবাচ্য হন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জন্যে এরূপ নির্দেশ আছে যে মাত্র ক্ষুধার্ত হলে তবেই তাঁরা আহার করবেন, তৎপূর্বে নয়; তৃষ্ণার্ত হলে তবেই তাঁরা জলপান করবেন, অন্যথা নয়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কামনাগুলিকে ও তাঁরা সর্বদাই দূরে রাখবেন। সুতরাং যাতে তাঁরা সেই কামনাগুলিকে অনায়াসে পদানত করে তার উপরে বিজয় লাভ করতে পারেন তাঁদের সর্বশিক্ষা সেই দিকেই কেন্দ্রীভূত করা হয়। কাজেই সন্ন্যাসী যখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পরাজিত করেছেন—এমন কি সর্বইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ কামকেও পরাভূত করার শক্তি অর্জন করেছেন—মাত্র তখনই তিনি লাভরঙ গম বা বিহার-মন্দিরে সন্ন্যাসের শেষ শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করেন।

হার্টম্যান লিখেছেন—যেদিন শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে আমি তার পূর্বদিন সন্ধ্যায় এই পবিত্র-বিহারে উপনীত হয়েছিলাম, দুইজন মশালধারী সন্ন্যাসী লামা আমাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে রাত্রি যাপনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। 'আমি অর্ধজাগরণে প্রায় স্পষ্টই বহুবার শুনেছিলাম সন্ন্যাসী কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ "ওম মণিপদ্মে হুম্"। শেষ শিক্ষার্থী লামাগণ আগামী দিনের মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্য সারা রাত ধ'রে আকুলভাবে বুদ্ধের চরণে এই ভাবে তাঁদের মিনতি জানাচ্ছিলেন।"

পরদিন প্রভাত হতেই একজন সন্ন্যাসী আগন্তুককে বহু আঁকাবাঁকা পথ উত্তীর্ণ করে পরীক্ষা মন্দিরের দ্বারে এনে উপনীত করলেন। ইহাই কাম-মন্দির। মন্দির দ্বার উন্মুক্ত হলে তাঁকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। মন্দিরে প্রবেশ করার সংগে সংগেই বোঝা গেল কাম-মন্দির নামটী সার্থক হয়েছে, কেননা কাম জাগ্রত করার যাবতীয় অশ্লীল ব্যবস্থা সেখানে পরিপূর্ণ আছে।

প্রকোষ্ঠটী প্রকাণ্ড হল-ঘরের মত···অন্ধকারাচ্ছন্ন, কোনও জানালা নেই, মাত্র একটী দরজা আছে। দেওয়ালে সংলগ্ন মশালের আলোকে কক্ষটী আলোকিত। ধূপ ধুনা ও অন্যান্য বহু গন্ধদ্রব্য পোড়ানোর উগ্র ধোঁয়ার গন্ধ নাসিকায় প্রবেশ করে একটা মদির আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেছিল। মনে হবে এ যেন মোগল সম্রাটদের বিলাস প্রাসাদের 'হারেম'। চারিদিকের দেওয়ালে সম্পূর্ণ উলংগ যুবতী নারীদের বিচিত্র ভংগিমার কদর্য মূর্তি শোভা পাচ্ছে। প্রথমে মনে হলো এগুলি জীবন্ত, কিন্তু মনোনিবেশ সহকারে দেখার পর বোধহলো এগুলি মোমের মূর্তি এবং পরম প্রাণবন্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলি এত কামোত্তেজক যে, যে কোনও ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে এক মুহূর্তে নিতান্ত চঞ্চল করে তুলতে

পারে। ইউরোপের বিভিন্ন বন্দরে চঞ্চলমতি আগন্তুকদের মধ্যে বিক্রি করার জন্য নর-নারী মিলনের বিভিন্ন ভংগীর যে সব অশ্লীল চিত্র পোষ্টকার্ডে বিক্রয় হয় এগুলি ঠিক তারই অনুরূপ। কামের এই বিচিত্র মূর্ত্তিগুলি হার্টম্যানের অনুভূতিতে ভৈরব স্পন্দন সুরু করে দিয়েছিল। তাঁর মেরুমজ্জায় একটা কলরোল উঠেছিল।

এমন সময় অদূরে এক অস্পষ্ট ঘণ্টা ধ্বনি কানে গেল। এবারে যে শিক্ষা সুরু হবে তা বেশ বোঝা গেল। সম্মুখে প্রধান যাজক—পশ্চাতে নয় জন সন্ন্যাসী একে একে প্রবেশ করলেন। তাঁরাও ছিলেন সম্পূর্ণ উলংগ। দীর্ঘদিন অনশন-ক্লিষ্ট ক্ষীণতনু কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে—বুকের পাঁজরগুলো একে একে গণনা করা যায়। অস্থি-চর্ম্মসার মূর্তিগুলি প্রেতলোকের সৃষ্টি করেছিল। প্রথম পরীক্ষায় তাঁরা অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

তারপর সন্ন্যাসীরা আসন পরিগ্রহ করলেন এবং তাঁদের পরম লোভনীয় ভোজ্যদ্রব্য ও পানীয়ে পরিতুষ্ট করা হলো। পৃথিবীতে যত প্রকারের ভাল ভাল ভোজ্য দ্রব্য পাওয়া যেতে পারে, তার সমস্তই তাঁদের সামনে সমাবেশ করা হলো। এই অপূর্ব ভোজ্য দ্রব্য বা পানীয় কিছুই তাঁদের মনকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারলে না। তাঁরা নিবাত নিষ্কম্পভাবে তার সম্মুখে বসে রইলেন—যেন তাঁরা ক্ষুধা-তৃষ্ণার সম্পূর্ণ বাইরে চলে গেছেন।

অতঃপর তাঁদের এক এক জনকে আসন ত্যাগ করে উঠতে হলো—প্রধান লামা একে একে তাঁদের উলংগ বীভৎস নারীমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াতে বললেন। উদ্দেশ্য তাঁরা কামকে জয় করেছেন কিনা তার পরীক্ষা করা। নারীর সংগ বাসনাকে জয় করা পুরুষের পক্ষে নিতান্ত কঠিন বলে তিব্বতীয়দের ধারণা। তাই সন্ন্যাসীদের একে একে এই পরীক্ষায় সম্মুখীন করা হলো। বিভিন্ন ভংগিমার কামোত্তেজক নারী মূর্ত্তিগুলি দেখে সন্ন্যাসীদের বিন্দুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য হলো না।

সুতরাং তদূর্দ্ধ পরীক্ষা গ্রহণের আয়োজন হলো। প্রবীণ সন্ন্যাসী যাজক আর সকলে কক্ষের বাহিরে গেলেন। হার্টম্যানকে তখন একটা চিকের পেছনে আসন গ্রহণ করতে বলা হলো। পাছে তাঁর উপস্থিতিতে কক্ষে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর কিছু বিঘ্ন হয় বলে তাঁকে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হলো। সহসা কানে এলো সুর সংযোজিত বহু বাদ্যযন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনি। মনে হলো এই ভৌতিক আবেষ্টনীর মাঝে প্রেতলোকের সঞ্চার হলো। ঘটনাস্থলের আবহাওয়া মর্ম্মান্তিক বলে মনে হলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে চঞ্চলা তটিনীর মত চঞ্চলচরণে প্রবেশ করলেন এক তরুণী—চক্ষে তাঁর বিলোল-বিলাস, পীন পয়োধরে দুর্দ্দমনীয় বাসনা-বহ্নি জাগ্রত রেখেছেন। তিনি সম্পূর্ণ উলংগ, নিরাবরণা। কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি চঞ্চল ভংগিমায় নৃত্য করে চলেছেন। তাঁর প্রতি চটুল পাদক্ষেপে পঞ্চশরের বিজয়তূর্য্য বেজে উঠছে। পুরুষকে কামোদ্রিক্ত করার জন্য তিব্বতের কামিনীরা যে মোহিনী নৃত্য করে থাকেন, এই মোহিনীর নৃত্যে তার চরম বিকাশ প্রকাশ পেলো। তাঁর কামলাস্যে পরিপূর্ণ দেহভার দোলায়িত করে তিনি একে একে সমস্ত সন্ন্যাসীর সামনে বিলাস-নৃত্য করলেন। নিয়ম, সন্ন্যাসীদের প্রত্যেককে তাঁর দিকে সমান দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। সবাই অবলীলাক্রমে এই মোহিনী মায়ার নৃত্য দেখলেন—কিন্তু কারুর চক্ষে বিন্দুমাত্র পলক পড়লো না—সবাই স্থির ও অবিচলিত রইলেন। বিদেশী দর্শক এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি লিখেছেন—"যতক্ষণ এই নৃত্য চলেছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে সব সময়ে এই স্তনিতা রমণীর দিকে সমান ভাবে চেয়ে থাকতে হয়েছিল, কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে কেমন করে তাঁরা এতক্ষণ ধরে তাঁদের মানসিক ধৈর্য্য অটুট রেখেছিলেন—তাঁদের চক্ষে বিন্দুমাত্র পলক পড়ে নি, মুখের শিরা-উপশিরায় বিন্দুমাত্রের চাঞ্চল্যের স্পন্দন দেখা দেয় নি। অথচ আমার মত একজন খাস ইউরোপীয়ের কাছে এই চটুলা নর্ত্তকী পরম মোহিনী সুন্দরী বলে বোধ হয়েছিল।...তাকে দেখে বোধ হয়েছিল—সে তার বিদ্যায় সম্পূর্ণ কুশলী, তাকে শ্রেষ্ঠতম রাজনর্তকী পদবাচ্য বলে অনায়াসে ঘোষণা করা যেতে পারে। রাজসভার আদবকায়দা সে খুব ভাল ভাবেই জানে। কেমন করে পুরুষকে পংগু করা যাবে সে বিষয়ে তার খুব গভীর জ্ঞান ছিল বলে বোধ হলো। তার মুখ দেখে বোধ হয়েছিল সে কামনার জাগ্রত প্রতিমূর্তি—সে মুখে তাকালে অচঞ্চল থাকা যায় না; তার বিলাস-চক্ষের দৃষ্টি ছিল অভ্রান্ত—তা হৃদয় ভেদ করবেই করবে; তার বক্ষ ছিল আকর্ষণের বিদ্যুদ্বিন্যাস..."

তিব্বতীয় লামারা এই ভাবে মার-জয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করার পর আর মাত্র সন্ন্যাসের একটীমাত্র শিক্ষা তাঁদের বাকী থাকে। সেটা নির্বাণের শিক্ষা। হিমশীতল জলে সম্পূর্ণ অবগাহন করে দিনের পর দিন ধরে আকাশপানে দুটী বাহু প্রসারিত করে দিয়ে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাঁরা আকুল কণ্ঠে বলেন,—

"এসো, এসো, আকাশ পথের অজানা আলোক আমায় গ্রহণ করো; আমার এই জড়দেহের মাংসপিণ্ড তোমার খাদ্য হোক, আমার এই উষ্ণ রক্তধারা তোমার পেয় হোক, আমার এই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তোমাকেই নিবেদন করছি; আমার মনের ও দেহের তেজ বলবীর্য্য সমস্ত তোমারই—তুমি, হে জীবন-শরণ, তুমি তা যে ভাবে হোক গ্রহণ করে আমায় চরিতার্থ করো।..."

অশ্বিনীকুমার ও প্রেম

শ্রীগুণদাচরণ সেন

শ্বিনীকুমারের সাধনা প্রেমের, সিদ্ধিও এই প্রেমে, ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-ম নামে প্রেমের দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণী তিনি কখনও মানেন নাই। বাল্যে স্কুলের স্কুলে একটি ছোট্ট সুহৃদকে লইয়া ক্ষুদ্র একটু সঙ্গত বসাইলেন, একটু উপাসনা, বাল্য-প্রেমের অনাবিল ধারায় অভিষিক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটু ভাবের বিনিময়। কলিকাতায় পড়িতে আসিয়া কেশবচন্দ্রের মন্ত্রে দীক্ষা লইলেন। এখানেও দুই চারিটী প্রিয় বয়স্য লইয়া একটী প্রার্থনা ও আত্মপরীক্ষার সঙ্গত গড়িয়া তুলিলেন। সত্যের ধরিয়া এই প্রেমের আগুন তখন তাঁহাকে ঘিরিল। প্রায় চার বছরের কলেজ-ত্যাগের সঙ্কল্প যখন মনে উঠিল, তখন তিনি এই প্রেমেরই পাইলেন। ঐ সঙ্গতের এক প্রিয়তম বয়স্য কর্ত্তৃক গীত এক সঙ্গীতের নায়—'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে, কি ভয় সংসার ক ঘোর বিপদ শাসনে!' কয়েকদিনের নিঃসম্বলপ্রায় ভ্রমণ শেষ য়া যশোহরে পিতৃভবনে যখন ফিরিলেন, তখন একটী গাছের তলায় অজাতশ্মশ্রু যুবক সমবেত যুবকবৃন্দের নিকট 'প্রেমেই সর্ব্বধর্ম্মের য়' এই সত্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। য় এই যশোহরেই অশ্বিনীকুমার তাঁর জীবন ও কর্ম্মের চিরসঙ্গী শ মুখোপাধ্যায়কে পাইলেন। কি গভীর প্রেমে তিনি সেই দেব-র হৃদয় গড়িয়া তুলিলেন। 'অজ্ঞাতবাস অবসানে যখন কৃষ্ণনগর শ করিলেন, তখন সত্যের সচল বিগ্রহ রামতনু লাহিড়ী তাঁহার প্রেমকে কর্ম্মের 'নির্ম্মানমোহ' পথে প্রবাহিত করার আদর্শ ইলেন। সেখান হইতে একদিন প্রেমের লীলাভূমি, বাংলায় ত শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া 'নবদ্বীপ ও হরির নাম' ক একটী বক্তৃতা দিয়া সেখানকার বিদ্বৎসমাজের আবেগপূর্ণ র্ব্বাদ লইয়া আসিলেন।

ঘটনার ক্রম কিঞ্চিৎ ভঙ্গ করিয়া বলি, অশ্বিনীকুমারের এই প্রেমের ধারা শেষে আসিয়া মহাপ্রেমের সাগরে শেষ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কৃষ্ণনগরে থাকিতেই কর্ম্ম তাঁহার এই প্রেমকে ডাকিল। শ্রীরামপুর য় ক্ষুদ্র স্কুলঘরে, ঐ সহরের প্রতি রাস্তায় ও উপকণ্ঠে যে দুর্ব্বার শক্তির পরিচয় ফুটিয়া উঠিল, তাহার কতটুকু আমরা লিখিতে, তে বা বুঝিতে পারিয়াছি?

শ্রীরামপুর হইতে শক্তি-পরীক্ষার জয়-পত্র লইয়া এই যুবক এক ক্ষণে আইনব্যবসায়ীর বেশে নিজ জন্মভূমি নগণ্য বরিশালের সহরে র্ণ হইলেন। 'প্রেয়'-কে তুচ্ছ করিলেন, 'শ্রেয়'-কে বরণ করিয়া লন। ব্রাহ্মসমাজগৃহে ইংরেজী বাঙ্গলায় ঈশ্বরীয় ভাবমূলক নানা তা হইত, আর মনোমত সঙ্গীত বা কীর্ত্তন হইলেই কিসের আবেশে পা দুখানা টলিয়া উঠিত।

কিন্তু ভাব তাঁহাকে কর্ম্মের কর্কশ পথ হইতে স্খলিত করিতে পারিল না। শিক্ষিত সমাজকে লইয়া 'জনসভা' নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়া জিলার গ্রামগুলির রাস্তা ঘাট পুকুর শিক্ষা স্বাস্থ্য সমাজ-নীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থার নানা তথ্যসংগ্রহ করিয়া সহরের চিত্ত ও হৃদয় গ্রামের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নদীর তীরে, খালের ধারে, বাজারের মোড়ে দাঁড়াইয়া পথচারী দোকানদার ও নৌকার মাঝিদিগকে ডাকিয়া তাহাদেরই ভাষায় ধর্ম্ম, সমাজ ও ব্যবহারনীতির কথাগুলি সেই সরলপ্রাণ অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিতদের মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া দিলেন। 'ভারত-গীতি' নামে অতি ক্ষুদ্র একটী পুস্তিকা ছাপাইয়া ক্ষুদ্র একটী গায়কদল গঠন করিয়া সেই সকল সঙ্গীত-যোগে রাজনীতি ও অর্থনীতির তখনকার মূল সমস্যাগুলি জনসাধারণের অন্তশ্চক্ষুর সমক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। 'প্রেমের নিশান' হাতে লইয়া ধর্ম্ম ও জাতিগত সকল বৈষম্য ভুলিয়া, হিন্দু সাধু ও মুসলমান ফকীরের দেহাবশেষপূত এই দেশের কল্যাণ-সাধনব্রতে হিন্দুমুসলমান সকলকে সমভাবে আহ্বান করিলেন।

তারপর যখন স্কুল খুলিলেন, ছেলে মাষ্টার নিয়া সে কি প্রেমের লীলা—Little Brothers of the Poor, Band of Mercy, fire Brigade, Friendly Union. অশ্বিনীকুমারের ছেলেরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যেমন একাধিকবার উত্তীর্ণ-সংখ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুপাত ও সর্ব্বোত্তম শ্রেণী লাভ করিয়াছে, তেমনি আবার কি গভীর প্রেমের সহিত জীব-সেবা, সততা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার এক মহান আদর্শ পালন করিয়া গিয়াছে। ইংরেজ শাসক, ইংরেজ পাদরী, স্থানীয় ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, শিক্ষাবিভাগের প্রধানগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতনামা রেজিষ্ট্রার তাহার আন্তরিক সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আসিয়া কোন শক্তির বলে তিনি হিন্দু-মুসলমান নিরক্ষর কৃষকগণকে নিজ আসনে বসাইয়া কংগ্রেসের কথাগুলি তাদেরই গ্রাম্য কথায় বুঝাইয়া দিয়া বরিশালের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পঞ্চাশহাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করিলেন। "স্বার্থৈষণা ও সঙ্কীর্ণতার অন্ধকার যখন রাজনীতির আকাশে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল," অশ্বিনীকুমার তখন "ভগবৎপ্রেমের আলোকে সেই অন্ধকার বিদূরিত করিয়া, হাতে ঐ প্রেমের আলোকবর্ত্তিকা ও প্রাণে অটুট সঙ্কল্প লইয়া, বুক পাতিয়া গুলির আঘাত লইতে প্রস্তুত থাকিয়া এই পবিত্র যুদ্ধে অগ্রসর হইতে" বাঙ্গলার প্রৌঢ় ও যুবকসমাজকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

তখনকার দিনে একটা মস্ত জজের ছেলে উদীয়মান উকীল অশ্বিনী-কুমার কি মোহের বলে আদালত হইতে আসিয়া পোষাকটা খুলিয়া

ফেলিয়াই রাস্তার পাশ হইতে একটা দুঃস্থ রোগী কুড়াইয়া কাঁধে তুলিয়া হাসপাতালে বহন করিয়া নিয়া গেলেন, তারপর একটা ক্ষুদ্র সঙ্ঘ গড়িয়া রাত জাগিয়া কত কলেরা রোগীর শয্যায় বসিয়া তাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেন, আর রাত দুপুরে মুমূর্ষু রোগীর জন্য ডাক্তারের সন্ধানে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতেন? পরিণত বয়সে, বাঙ্গলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে যখন অনাহারের বিভীষিকা আসিয়া মুখ বাড়াইল, তখন কোন্ মোহন বলে সহস্র সহস্র বুভুক্ষু ও আবরণহীনের অন্নবস্ত্র সংগ্রহে তিনি নিজ রোগক্লিষ্ট দেহকে জর্জ্জরিত করিলেন, আর কিসের আকর্ষণে বরিশাল হইতে শেষ বিদায়ের প্রাক্কালেও ষ্টীমার-ধর্ম্মঘটীদের জন্য অপূর্ব ভিক্ষাপাত্র লইয়া শিথিলপদে সহরের দ্বারে দ্বারে ঘুরিলেন?

সহরে, গ্রামে, ক্রমে প্রায় অর্দ্ধ বাঙ্গালায়, জীবনের সকল ক্ষেত্রের সকল কর্ম্মে 'সত্য-প্রেম—পবিত্রতা'র কি একটা হাওয়া ছুটিয়া অবশেষে স্বদেশীর যুগে কি দুর্নিবার বন্যার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। কত ভয় তাপ রোগ দুর্ভিক্ষ, কত পুঞ্জীভূত দুনীতি, কত স্তূপীকৃত 'আবর্জ্জনার রাশি, কোথায় ভাসাইয়া নিয়া গেল।

জাতি বর্ণ বয়স,সাধু পাপী ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে এই প্রেমমধু অশ্বিনীকুমার সর্ব্বজীবে বর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। কত অনুতপ্ত যুবকের কুসঙ্গজনিত মহাপাপ, কত বর্ষীয়ান্ পিতার শোকদগ্ধ হৃদয়, কত দুঃস্থ রোগীর দুঃসহ রোগযন্ত্রণা, কত বুভুক্ষুর হৃদয়বিদারী আর্ত্তনাদ তিনি ও তাঁহার মন্ত্রপূত কর্ম্মিগণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছেন। কাশীধামে ভাস্করানন্দ, দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু, নিজপ্রকোষ্ঠে অর্দ্ধনগ্ন বৃদ্ধ 'হরিজন', কলিকাতার কলেজ স্কোয়ারে পথের ধারে গলিতকুষ্ঠী, নিজ বাড়ীর মেথর গোপাল—সকলকে তিনি এই এক মধুময় প্রেমের সূত্রে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। মুসলমান নবাবের মুসলমান মৌলবীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, নিরক্ষর কৃষকপত্নী দুরারোগ্য ছেলের মাথায় 'বাবুর' পায়ের ধুলা দেওয়ার জন্য করুণ ক্রন্দন করিয়াছে, ডাকাত 'বাবু'র নাম শুনিয়া দস্যুতার প্রলোভন জয় করিয়াছে।

'হরিপ্রেমরসকা পিয়ালা' আকণ্ঠ পান করিয়া সেই রসধারায় বরিশালের সহর ও গ্রাম প্লাবিত করিলেন। 'প্রেম-গিরি-কন্দরে আনন্দ-নির্ঝর পাশে' বসিয়া কত 'হাসিলেন কাঁদিলেন আর গাইলেন', 'প্রেম-সাগরের জলে ডুবিয়া' কত 'লুকোনো মাণিক' তুলিলেন, গিরি-কন্দর খুঁড়িয়া আর সাগরতল ছেঁচিয়া তিনি তাঁর কর্ম্মের ভাণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া 'মধু' তুলিয়া 'জলস্থল মধুময়' করিয়া ছিলেন। 'ভক্তিযোগে' লিখিয়াছেন, "প্রেমজলধি কেবল 'আরও প্রেম' 'আরও প্রেম' বলিয়া অবিরাম গভীর তরঙ্গনাদ তুলিতেছেন", "না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতে তার মন ওঠে না", "যে দেয় প্রেম করে ওজন, সে ত প্রেমিক নয় কখন, সংসারের বণিক্ সে জন, থাকে সংসারে।"

শেষে যখন ওপারের ডাক আসিল, শেষ শয্যায় শুইয়া কতবার বলিয়াছেন 'শিবম্' ও 'আনন্দম্'। ক্ষণ-লুপ্ত সংজ্ঞা যখন ফিরিয়া আসিত, বলিতেন, 'ঠাকুর আমাকে নিয়া লুকোচুরি খেলিতেছেন। শেষ যাত্রার পূর্ব্বদিন বিছানা হইতে নামিয়া একটু 'নাচিতে' চাহিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় অন্ধকার এই পুণ্য তিথিতে দীপান্বিতার দীপমালায় উদ্ভাসিতা কলিকাতার এক প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া আমরা তাঁর নশ্বর জীবদেহকে আদিগঙ্গার তীরভূমিতে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলাম। তিনি ত 'ভব-জলধির পরপারে অপূর্ব্ব শোভন জ্যোতির্ম্ময় আনন্দধামে কোটীচন্দ্রতারার অবিরাম উল্লসিত নৃত্য' সম্ভোগ করিতেছেন, কিন্তু আমরা অশ্বিনীকুমারের শ্মশানভস্ম হইতে কি সংগ্রহ করিয়া আনিলাম? তথাপি, আজিকার জগতের এই অপ্রেমের তাণ্ডবলীলায় তাঁর অযোগ্য উত্তর-পুরুষগণ যে যেখানে যেভাবে আছি, তাঁর এই প্রেমলীলার কীর্ত্তন করি, এই প্রেমই তাঁর অমর আত্মার অমোঘ বাণী।

"জয়তু জয়তু জগন্মঙ্গলং হরিণাম্—হরি ওঁ।

দেয়ালী

শ্রীকালিদাস রায়

আঁধারেই আছি বেশ আছি ভাই
হতভাগ্যের এইত ভালো।
চোখ ঝলসাতে আঁধার বাড়াতে
জ্বেল না দেয়ালী তোমার আলো।
বালিকার খেলা প্রদীপের মেলা
বালকের খেলা আতশ বাজি,
ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলে' যায়
অই দেখ যত কাজের কাজী।
দেশভরা ঘোর তিমির বিরাজে
ঝিল্লী-করাতে চিরিছে বুক,
জোনাক জ্বালায়ে না জানি মিলিবে
কতটুকু তার তৃপ্তি সুখ?

ভূতল গগন আঁধারে মগন,
কোথা যেন প্রেত প্রেতিনী কাঁদে,
ডাকিছে পেচক ভরে পদভূমি
চক্রবাকীর আর্ত্তনাদে।
এই থমথমে বিভীষিকা মাঝে
দেওয়ালী তোমার আলেয়ামালা
যেন শ্মশানের পিঙ্গল শিখা
উল্কামুখীর কণ্ঠজ্বালা।
দেয়ালী তোমার খেয়াল পারে কি
ঘুচাতে দেশের অন্ধকার?
তা যদি না হয় কী হবে বাড়ায়ে
দীপ-পতঙ্গ ভস্ম তার?

বর্ত্তমান দুয়ার্স ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

শ্রীমতী প্রতিমা দেবী এম-এ

জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব্বাঞ্চলে ভুটানের বিভিন্ন প্রবেশ দ্বার বা দুয়ারগুলি অবস্থিত থাকায় এ অঞ্চলটি দুয়ার্স নামে খ্যাত। সাধারণতঃ দুয়ার্সের উল্লেখ শুনলেই আমাদের মনে আসে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ঘনজঙ্গলময়, অস্বাস্থ্যকর ও শ্বাপদসঙ্কুল জায়গার কথা। সেজন্য অপরিচিতের কাছে দুয়ার্স আজও ভয়াবহ। অথচ এই অঞ্চলের মাঝে কত সম্পদ, কত সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তা আমরা অনেকেই জানিনা।

সুপরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টায় দুয়ার্স আজ অনেক উন্নত, সুসংস্কৃত ও রোগমুক্ত। কৃতিত্বের সবটুকু পাওনা চা-বাগানগুলির। সরকারী আইনের চাপে আজ বাগানে বাগানে প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সুচিকিৎসক, খেলাধূলার সরঞ্জাম, পুস্তকাগার, ক্লাব ও ভ্রাম্যমান সিনেমার বন্দোবস্ত থাকায় দুয়ার্সের জীবনের মান ও রুচি হয়েছে উন্নত, মনে এসেছে শক্তি। অনেকগুলি বাগানে বৈদ্যুতিক আলো, পানীয় জলের কল, রেডিও ও টেলিফোন যোগাযোগ পর্য্যন্ত রয়েছে। বাগানগুলি সুচিন্তিত পরিকল্পনায় প্রতিষেধক-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ায় দুয়ার্সের কুখ্যাতির কারণ প্রায় দূরীভূত হয়।

শীলতুষার উপর মোটর চালিত খেয়া নৌকা

তিস্তা নদী

এখানেই রয়েছে বাংলার অতুলনীয় অরণ্য-সম্পদ ও চা-শিল্প। বাণিজ্যের প্রসারতায় ও দেশের স্বার্থের জন্য আজ এ অঞ্চলে সরকারী দৃষ্টি প্রখর। কেবলমাত্র দুয়ার্সের চা-বাগান থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার ২।৩ কোটী টাকা শুল্ক আদায় করেন—তামাক ও খয়েরর চাষও মন্দ নয়। এখানে একটি খয়েরর তৈরী করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানও আছে। সেজন্য এ অঞ্চলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

*　　*　　*

জলপাইগুড়ির সদরমহকুমার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, মাল ও মেটেলী থানা ও আলিপুরদুয়ার মহকুমার ফালাকাটা ও মাদারীহাট থানা লইয়া গঠিত অঞ্চলকে বলা হয় পশ্চিম দুয়ার্স এবং কালচিনি আলিপুরদুয়ার ও কুমারগ্রাম থানা লইয়া গঠিত অঞ্চলকে বলা হয় পূর্ব্বদুয়ার্স। এক দুটী অঞ্চলের সীমারেখা নির্দ্দেশ করে প্রবলবেগে প্রবাহিতা অতি খরস্রোতা শীলতুরষা।

পূর্ব্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চল অনেক উন্নত ও পরিচ্ছন্ন। বিস্তৃত প্রান্তরের মাঝ দিয়ে শত স্রোতস্বিনীর উপর দিয়ে, পাহাড়ের উপর এঁকে বেঁকে চলে গেছে সুদৃশ্য পিচবাঁধানো সরকারী সড়ক শিলিগুড়ি হ'তে কুচবিহার ও ধুবড়ী (আসাম)—দুধারে বিরাট গিরিরাজ; তারই মাঝ দিয়ে গম্ভীর কলনাদে সুবিস্তৃতা নদী তিস্তা বয়ে যায়—অসীম বারিরাশি পাহাড়স্তূপে আঘাত খেয়ে নানা আবর্ত্ত সৃষ্টি করে।

তারই উপর অতি মনোরমপুল সেবক—দূর হ'তে যেন মনে হয় দড়ির দোদুল্যমান ঝোলা—ইহাই এই সড়কের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্যস্থান।

দুপাশে চা-বাগানের সার ও সিরীষগাছের বীথি—ইহাই প্রধান বাণিজ্য ও যাত্রীপথ। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুর দুয়ার ও লঙ্কাপাড়ার মধ্যে যাত্রীবাহী বাস যাতায়াত করে—নির্জ্জন

নিস্তব্ধতাকে চকিত করে রাত্রে ছুটে চলে অতি তীব্র বেগে মালবাহী লরী। সম্প্রতি ডুয়ার্স রেলওয়েটি উভয়দিকে প্রসারিত হ'য়ে বাংলা, আসাম ও বিহার—প্রধান বাণিজ্যপথ সৃষ্টি করায় ডুয়ার্সের গুরুত্ব আজ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসিমারার সুবৃহৎ বিমানক্ষেত্রটীও আজ যাত্রী ও মাল চলাচলের কেন্দ্রস্থান হয়ে উঠেছে। কিন্তু ডুয়ার্সের পূর্ব্বাঞ্চল আজও দুর্গম অরণ্যানীতে পরিবৃত—প্রকৃতির পার্ব্বত্য ও বন্যসৌন্দর্য্য এখানে তাই অটুট রয়েছে।

* * *

ডুয়ার্সে প্রধানতঃ দুই ঋতু—শীত ও বর্ষা। বর্ষার অবিরাম ধারায় পথঘাট সব দুর্গম হয়ে পড়ে—পাহাড়ে ঝোরাতে ভেসে আসে শত শত গাছ ও বড় বড় পাথরের স্তূপ। বিভিন্ন অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—বর্ষণ আসলে কয়েকঘণ্টার মধ্যে জল নেমে যায়। তখন এরই মাঝে

সেবকপুল

পথ করে চলে চা-বাগানের মালবাহী গাড়ীগুলি। সমতলে অবস্থিত অনেক বাগানে সেজন্য ট্রলী লাইন পাতা হয়েছে—এটাই ডুয়ার্সের সত্যকার দুর্ভোগের সময়। ডুয়ার্সের প্রধান প্রধান নদীগুলি ভীষণ আকার ধারণ করে। রায়ডাক, সঙ্কোষ, শীলতোরষা ও তিস্তা পারাপার করা অসম্ভব হয়ে উঠে। রাত্রের অবিরাম বর্ষণের পর দিনের প্রখর সূর্য্যালোক আনে বৈচিত্র্য—শ্যামল বনরাজি শোভিত পাহাড়ের কোলে কোলে চা-বাগানগুলো অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়—শিরীষ গাছগুলি সবুজ পাতায় ভরে যায়—এই সবুজের মেলার মাঝে সুদৃশ্য বাংলোগুলি সত্যই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে।

জলনিষ্কাষণের সুব্যবস্থা থাকায় ও প্রতিষেধক ঔষধ নিয়মমত ব্যবহৃত হওয়ায় ম্যালেরিয়া প্রায় দূরীভূত। বর্ষার প্রকোপ শেষ হয়ে আসে—শীতের আমেজ সুরু হয়—দিকে দিকে উৎসব ও আনন্দের সুর জেগে উঠে। বাগানে বাগানে সুরু হয় কালীপূজার মহা ধুমধাম। দেওয়ালীই এখানে বড় উৎসব। এ সময় চা-বাগানের কাজ কম—শুধু গাছ ছাঁটাই চলে; সেজন্য নানারূপ ক্রীড়া, আমোদ ও যাত্রাগানে বাগানগুলো মুখর হয়ে উঠে। ফাওয়ার দিনও (দোল) এগিয়ে আসে—উচ্ছলতার দিনও শেষ হয়ে যায়।

শীতকালে ডুয়ার্সের আবহাওয়া বেশ ভাল, খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যায়—কমলার পাহাড় জমে উঠে। জলের উপাদানে লৌহের ভাগ বেশী থাকায় প্রায় পেটের পীড়া হয়। অত্যধিক চা-পান না করলে ও মাছমাংসের বিশেষ ভক্ত না হলে শরীর ভাল থাকে।

* * *

ডুয়ার্সের আদিম অধিবাসী এক অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ সভ্য জাতি। তাহাদের বলা হয় 'মেচে'। সাধারণতঃ তারা কৃষিজীবী এবং সংখ্যায় অতি মুষ্টিমেয়। ব্যবসা ও চা-বাগানগুলোর কর্ম্মোপলক্ষে নানাজায়গা

পাহাড়ে নদী

থেকে এসেছে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক ও মাড়োয়ারী ব্যবসাদার। চা-বাগানের শ্রমিকরূপে এসেছে লক্ষাধিক সাঁওতাল ও মঙ্গোলীয়—পাহাড়ী-শ্রমিকের সংখ্যাও নগণ্য নয়—কর্ম্মের অবসরে সকলেই এরা বাগানের দেওয়া জমিতে চাষবাস করে।

* * *

দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে এলো অভূতপূর্ব্ব জাগরণ—তারা হয়ে উঠল অতি সচেতন—বাগানে বাগানে দেখা গেলো উন্মত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল শ্রমিক বিদ্রোহ—কর্ম্মচারী ও পরিচালকবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। ইউরোপীয় অনেক পরিচালকই এখনও তাঁহাদের মনোভাব বদলাতে পারেন নি—সেজন্য প্রায়ই গোলমাল লেগে আছে বাগানগুলোতে—শিক্ষিত কর্ম্মচারীবৃন্দ সুদৃঢ় সংঘ গড়ে তুলেছেন। আজ বাগানে বাগানে প্রসূতি-মঙ্গল ও

বিনা মূল্যে সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়েছে—ছুটি ও নানা সুবিধা দেওয়া হয়েছে। কয়েকটী বাগানে শ্রমিকদের ক্লাব ও ক্রেসী তৈয়ারী করা হয়েছে। এবিষয়ে মধুয়া ও নিমতিঝোরা বাগানের নাম উল্লেখযোগ্য।

* * *

ভারত বিভাগের পর অসংখ্য পরিবার পূর্ব্ববঙ্গ হ'তে এদিকে চলে আসে—ছোট ঘনবসতিবিরল ও অতি অপরিচ্ছন্ন মহাকুমা সহরটি আজ লোকে লোকারণ্য—রাস্তার দুধার ভরে গেছে দোকানে—লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে—বাস্তুত্যাগী ধনী ও দরিদ্র সবাই আজ এখানে নূতন করে ঘর বাঁধছে।

সারা মহকুমাটি সরকারী খাসে—সরকারী ভবনগুলি ছাড়া পাকা বাড়ী নাই। কিন্তু নানা বৈচিত্র্যের কাঠের বাড়ীতে সহরটি আজ ভরে উঠেছে। এই মহকুমাটি ভুটানের অংশ—ভারতসরকার বার্ষিক খাজনা দিয়া এই অংশটি শাসনাধীনে রেখেছেন।

মহকুমা সহর হতে তিনমাইল দূরে আলিপুর দুয়ার জংসনের সুবিস্তৃত প্রান্তরটি আজ বড় রেলওয়ে কলোনীতে পরিণত হয়েছে—

দুয়ারপাড়া চা-বাগান

এরূপ সুদৃশ্য ও সুপরিকল্পিত রেলওয়ে কলোনী খুব কমই দেখা যায়। একই প্যাটানের মতো নানারঙের বাংলোগুলি অপরূপ হয়ে উঠেছে—কংক্রিটের দেওয়ালের উপর আসবেসটসের চারচালা—পরিষ্কার বাঁধানো পথ—স্কুলবাজার সমন্বয়ে একটী সম্পূর্ণ সহর!

আলিপুর হ'তে সোজা কোর্টের দিকে চলে গেছে পিচ বাঁধানো রাস্তা—দুপাশে কৃষ্ণচূড়ার সার—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রান্তরের মাঝে এখানে নূতন পরিকল্পনায় নূতন সহরটি গড়ে উঠছে—শিক্ষিত, অবস্থা-সম্পন্ন ও অভিজাত সম্প্রদায় এখানে একটি নূতন কলোনী তৈরী করেছেন। স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, সিনেমা হাউস সহরোপযোগী কিছুরই অভাব নেই।

* * * *

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য

দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের শ্রেণী শ্যামলবনরাজিতে সুশোভিত—দূর হ'তে মনে হয় যন মেঘে ঢাকা ধরণীর দিকচক্রবাল—গা বেয়ে নেমে আসে শত স্রোতস্বিনী—অতি সর্পিল—অতি খরস্রোতা! কখনও বা সম্পূর্ণ বিশীর্ণা, কখনও বা উদ্বেল কল্লোলময়। ঘন অরণ্যানীর মাঝে ধ্বনিত হয় অবিরাম ঝিল্লীরনাদ—সুদীর্ঘ, শাল, শিশু ও জারুলের সার গম্ভীর রক্ষিত বনাঞ্চলকে করে রেখেছে দুর্ভেদ্য ও দুর্গম—এরই মাঝে কোথাও চলে গেছে সরকারী সড়ক, কোথাও বা বনবিভাগের পথ। রাত্রে এই পথে ছুটে চলে কত উৎসাহী যুবকের গাড়ী—যাওয়ার মাঝে আছে উত্তেজনা, আনন্দ ও ভয়। জ্যোৎস্নারাতে এরই মাঝে ফুটে উঠে অপরূপ সৌন্দর্য্য—বনযুঁইয়ের তীব্র গন্ধ সারাবন আমোদিত করে তোলে—মাটী ও লজ্জাবতীর গোলাপী ফুলে রাত্রের ঘনান্ধকারকেও করে তোলে শোভনীয়।

বনপথ

রায়ডাক, রাজাভাতখাওয়া, বক্সার, জয়ন্তী, চিলাপাতা, ভুতড়ী, রায়মাঠঙ্, নীলপাড়া প্রভৃতি সুবিস্তৃত অরণ্যানীর মাঝে ভোরের ম্লান আলোয় ও সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারে নানা জীবজন্তুর সমাবেশ দেখা যায়। কোথাও হরিণের বুনো-মহিষের শূকরের দল, কোথাও বা হাতীর পাল—গভীর রাত্রে ব্যাধের শিকার অন্বেষণের ছবিও চোখে পড়ে। চিলাপাতার রক্ষিত অঞ্চলে গণ্ডারের দল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে—মাঝে মাঝে বিরাট ময়াল সাপকে গাছের গুঁড়ি বলে ভ্রম হয়।

কালচিনি হ'তে রায়মাঠঙ্ অরণ্যানীর মাঝ দিয়ে জয়ন্তী যাবার একটা সংক্ষেপ পথ আছে—উঁচুনীচু আঁকাবাঁকা পাহাড়ে পথ—পাহাড়ী চালক নিয়ে একদিন রওনা হলুম। বাইরেকার প্রখর সূর্য্যালোক এখানে অল্পই প্রবেশ করে—চতুর্দ্দিকে ঝিঁ-ঝিঁ পোকার শব্দ—অস্পষ্ট জংলী পথ চারিদিকে বুনোফুল ও সুদীর্ঘ গাছের সারি—অতি শীতল পরিবেশ—পথটা সহজেই হারিয়েছিলুম—চালকের প্রাণপণ চীৎকার শুধু দ্বিগুণভাবে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল, তবু মেলেনা সাড়া। হঠাৎ পাহাড়ী কাঠুরের মিলল দেখা—পাশেই দেখা গেল রয়েছে পথ। সে আনন্দ ও উত্তেজনার অভিজ্ঞতাটুকু ভালই লেগেছিল। চাঁদনীরাতে এমনি অরণ্যানীর মাঝে কতদিন সদলবলে বেড়িয়েছি—নূতন একটা জীবনের স্বাদ পেয়ে অকারণ পুলকে মেতে উঠেছি।

* * * *

তুরষার কলনাদে মুখরিত এ বনাঞ্চল—ওদিকে পাহাড়ের শ্রেণী গগনচুম্বী দীর্ঘ শুভ্র বরফে ঢাকা—পাদদেশে প্রবাহিত শত ঝোরার ক্ষীণপ্রবাহ—ঝর্ ঝর্ শব্দে নেমে আসে পাহাড় হ'তে। আরও এগিয়ে পাহাড়ের কোলে মাকরাপাড়ার চা-বাগান—তারই পাশ দিয়ে চলে গেছে পথ সোজা পাহাড়ের উপর। সম্মুখে পাহাড়ের বুকে শুভ্র কালীমন্দির—দু'পাশে কমলার বাগান—তারই মাঝদিয়ে উঠে গেছে শ্বেতমর্ম্মর সোপান—মাকরাপাড়ার এ সৌন্দর্য্য অতি লোভনীয়।

* * * *

সুবিস্তৃত পানা নদীর উপর দিয়ে, ভুতড়ী ফরেষ্টের মাঝ দিয়ে চলে গেছে উঁচু নীচু পাহাড়ী পথ রাঙামাটির দিকে—পাশেই শ্যামল

বনরাজিভূষিত পাহাড়ের শ্রেণী—তারই—মাঝে দেখা যায় ভুটানীদের ছোট কুটীরগুলি ও ভুট্টার ক্ষেত—সরু পাহাড়ে পথ—নদীর ধারে রাঙামাটিহাট ভুটানীদের কলরোলে মুখরিত।

*　　*　　*　　*

অরণ্যের মাঝ দিয়ে, জয়ন্তী নদীর ধার দিয়ে দিয়ে চলে গেছে রেললাইন—নির্জ্জন নিস্তব্ধ অরণ্যের মাঝে ছোট ষ্টেসন বক্সার—তারই কোল থেকে উঠে গেছে সাদা পাথরের রাস্তা—দুপাশে শাল গাছের সার—সাস্তালবাড়ির রক্ষীগিরির পর্য্যন্ত গাড়ী উঠে থামল—তারপর সুরু হয় আড়াইমাইলব্যাপী পায়ে চলার রাস্তা। চারিদিকে পাথরের বড় বড় স্তূপ—দুপাশে ঝরণার কল কল শব্দ। দূর থেকে মনে হয় যেন বর্ষণ সুরু হয়েছে। পাহাড় হ'তে পাহাড়ান্তরে যাবার পথে ছোট ছোট পুল। নীচে ঝর্ণার অবিরাম কলধ্বনি।—পাহাড়ের গা কেটে রাস্তা তৈরী হয়েছে—কখনও সামনে, কখনও বা পাশে, কখনও বা সোজা খাড়াই পথ চলে গেছে। বক্সার এই পথে জড়ানো আছে বহু স্মৃতি, বহু দীর্ঘশ্বাস—বক্সা যাবার পথে প্রিয়জনবিরহে ম্লান বাংলার কত মুক্তিকামী সৈনিক হ'ত শঙ্কিত ও ব্যাকুল—লোকালয় হ'তে বহুদূরে পাহাড়ের তিনহাজার ফুট সুউচ্চস্তরে সুদূর প্রসারিত দুর্ভেদ্য বেষ্টনীর মাঝে রয়েছে বক্সা ফোর্ট। কঠিন পাথরের ঘর ও প্রাচীর—চারিদিকে উচ্চ মঞ্চের উপর সতর্ক প্রহরী—প্রাচীরস্তম্ভে প্রদীপ্ত আলোকমালা—বাংলার এই নির্জ্জন কারাগার। নীচে কাঁট-তার-ঘেরা খেলার মাঠ—তারই উপর কারাধ্যক্ষের বাংলো। আরও উপরে বনবিভাগের বিভাগীয় দপ্তর। পাহাড়ের উপর মেঘ ও রৌদ্রের লুকোচুরি—সত্যই সুন্দর পরিবেশ।

বক্সাফোর্ট

জোন্ত ষ্টেসন হ'তে পাহাড়ের কোলদিয়ে শত স্রোতস্বিনী অতিক্রম করে চলে গেছে পি, ডব্লিউ, ডির পাথুরে রাস্তা—তারই পাশে কাস খাওয়া চা-বাগান। ওদিকে পাহাড়ের শ্রেণী সুদূর শিলং পর্য্যন্ত বিস্তৃত তারই অস্পষ্ট ছবি এখান হ'তে পাওয়া যায়। মাঝখানে সুগভীর খাদ—কলধ্বনিতে মুখরিত করে বয়ে যায় নীল জলরাশি। এপারে ম্যানেজারের বাংলো—বাংলোর বারান্দায় বসে যে সৌন্দর্য্য দেখা যায় তা সত্যই অতুলনীয়। তৃষ্ণার্ত্ত কত হরিণ, ব্যাঘ্রশাবক ও হাতীর পাল এই খাদে আসে পিপাসা মেটাতে। এই বাংলোর বর্ত্তমান অধিকারী একজন ক্যানাডিয়ান ম্যানেজার। শিল্পী মন তাঁর আছে।

*　　*　　*　　*

বক্সার গভীর অরণ্যানী শেষ হয়ে আসে পাহাড়ের কোলে জয়ন্তী—চারিদিকে ঝর্ণার অবিরাম কলধ্বনি। সম্মুখে পর্ব্বতমালা শ্যামল কোমলতায় ভরা। সর্পিল দুর্গমপথ উঠে গেছে পর্ব্বতচূড়ায়—তারই একপাশে গভীর নিস্তব্ধ আঁধারময় গুহায় অবস্থিত "মহাকাল"—শিবরাত্রির দিন এই দুর্গম পাহাড়ীপথ বেয়ে উঠে আসে অগণিত নরনারী মহাকাল দর্শন আকাঙ্ক্ষায়। শুভ্র প্রস্তরীভূত বৃক্ষের মূলগুলি মনে হয় মহাদেবের জটা—পাহাড়ীদের পরম শ্রদ্ধার সম্পদ।

*　　*　　*　　*

তুড়তুড়ি চা-বাগানের কিছু আগে জয়ন্তীর বড় রাস্তার বামদিকে পড়ে ভুটানঘাট ফরেষ্ট যাবার সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তা। উন্মুক্ত প্রান্তরের পর সুরু হয় অরণ্যানী। সবুজ পাতায় ভরা ছোট ছোট শালগাছগুলির ফাঁকে প্রায়ই চোখে পড়ে হরিণের দল। পথের দুপাশে কচি দুর্ব্বাদল ও শটীগাছ—বুনো যুঁই ও টগর। জনবিরল প্রান্তরে রয়েছে একটী সুদৃশ্য দ্বিতল বাংলো (বনবিভাগের)। পথটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে—বাংলোর নীচে থেকে নেমে গেছে একা চলার মত সঙ্কীর্ণ পায়ে চলার পথ ঘনজঙ্গলের মাঝে। তারই শেষে রয়েছে রায়ডাকনদীর কোলে ভুটানঘাট। বাংলাদেশে লছমনঝোলার একটা অনুরূপ দৃশ্য দেখে সত্যই গর্ব্ববোধ করেছিলুম। পাহাড়ের বুক থেকে নেমে আসছে

বনপথ

সুবিস্তৃত পাহাড়ে নদী রায়ডাক—গম্ভীর কলনাদে বনভূমি প্রকম্পিত—নীল স্বচ্ছ জলরাশি উন্মত্ত আবেগে বয়ে যায়—অঙ্গদেশে শুভ্র পাথরের স্তূপগুলো কমনীয় নীলাভায় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠছে—সম্মুখে ভুটানের শ্যামল পর্ব্বতমালা—সূর্য্যের সোনালি আলোয় নানাবর্ণ প্রতিফলিত করছে—সেজন্য কথিত আছে পাহাড়টি নাকি প্রতি ঘণ্টায় রূপ পাল্টায়। একটী সুদৃশ্য ভারী ডিঙি ওপারের ঘাটে বাঁধা। দূর হ'তে হাতীর পাল দেখা যায়—লবণের সন্ধানে তারা এ পাহাড়ে প্রায়ই বিচরণ করে। সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে। আমাদের দল আসছে ফিরে। সকলের মুখে রয়েছে আতঙ্ক অথচ আনন্দের ছাপ। মনে হচ্ছিল আফ্রিকান জঙ্গলের ছায়াচিত্রের বোধহয় আমরা সত্যকার নায়ক ও নায়িকা।

*　　*　　*　　*

দুর্গম ও দুঃসাধ্য যা কিছু প্রাণবন্ত পুরুষের বুকে জয়ের অভিলাষ জাগায়—সেদিন জোগাড় হোল একটি মিলিটারী অস্ত্রবাহী গাড়ী—

দলটা ছিল ভারী—সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী ও তাঁদের আত্মীয় পরিজন। জয়ন্তীর ডাকবাংলো ছাড়িয়ে রায়ডাক ফরেষ্টের ভেতর ছুটলো গাড়ী দ্রুত বেগে—সর্ব্বত্র সবুজের মেলা—মাঝে মাঝে শুকনো নদীর পাথুরে তটভূমি—পিছনে পাহাড়ের উপর শ্যামল বৃক্ষরাজি—গাছে গাছে মৌমাছির গুণগুণ—ভালুকের আবাসস্থল—ক্রমশঃ অরণ্যানীর নিবিড়তা কমে আসে—প্রান্তদেশে দেখা যায় ফরেষ্ট অফিস ও বাংলো —তারই গা বেয়ে বেয়ে যায় প্রবল রায়ডাক নদী। এখান হতে রায়ডাকের উপর শালের খুঁটি ও পাথরের স্তূপজড় করে বানানো

ফাসখাওয়া চা বাগান

হয় শীতকালে অস্থায়ী পুল—তারই উপর দিয়ে চলাচল করে মালবাহী লরী ও কুমারগ্রাম-জয়ন্তীর বাস। নদীটি বিভিন্ন স্রোত ধারায় বয়ে যায়—মাঝে মাঝে সরুফালি দ্বীপের মত পাথরের স্তূপ—অতি স্বচ্ছ নীল জল—শুকনো তটের উপর ছড়ানো রয়েছে অসংখ্য বৃক্ষের গুঁড়ি। বর্ষার দিনে পাহাড় থেকে এগুলো ভেসে এসেছে—সুন্দর পরিবেশ। মেয়েরা এমনি একটী পাথরের স্তূপের উপর বসে গেলো রান্নার আয়োজনে—ফরেষ্টের শুকনো কাঠ হোল জ্বালানী, আর পাথর জড় করে তৈরী হ'লো উনান। সকলে এক সাথে সেই সুন্দর উন্মুক্ত নদী তটে বসে গেল আহারে—মেয়েদের আবেগময় কল্লোল, ছুটাছুটি, নদীর হিমশীতল জল নিয়ে খেলা, পাথর ছুঁড়াছুঁড়িতে সারা নদীতট আনন্দমুখর হয়ে উঠল—এতগুলো প্রাণময়ী নারীকে শিক্ষার চাপে, কলিকাতার বদ্ধ আবহাওয়ায় যেন পঙ্গু করে রাখা হয়েছিল—আজ নদীর মতন বাঁধন-হারা হয়ে যেন তারা সব মেতে উঠল—ইতিমধ্যে পুলের সামান্য মেরামত কাজটা শেষ হয়ে গেল। গাড়ী চলল তীরবেগে। নিউল্যাণ্ডস্‌, কুমারগ্রাম, সঙ্কোষ চা-বাগানগুলো ছাড়িয়ে সোজা ফরেষ্টের ভেতর। পাহাড়ে ঝোরাটা অতিক্রম করে দেখা গেল •ভুটানের সীমারেখা নির্দ্দেশক শ্বেতস্তূপ। ভুটানী পল্লী পেরিয়ে আরও দেড় মাইল দূরে কালিখোলা।

ফরেষ্ট বাংলোর সামনে সুন্দর সাজানো বাগান—তারই শেষে ফুল দিয়ে সাজানো একটি কুটীর। নদীর তীরে এখান থেকে বসে সঙ্কোষ নদীর সৌন্দর্য্য ও বিরাটত্ব উপলব্ধি করে মন এক অদ্ভুত উন্মাদনায় মেতে উঠে। ঠিক প্রায় ২০০ ফিট নীচে অতি বিশাল সঙ্কোষ নদী বয়ে যায়। দূরে ওপারে ঘন সবুজের মাঝখানে আসামের বনবিভাগের ছোট্ট লাল বাংলোটি ছবির মতন দেখা যায়। ওধারে বাংলার প্রান্তভূমি। এখানে ভুটান। দু পাশে পাথর ছড়ানো তটভূমি —মাঝখানে ভৈরব গর্জ্জনে নীল জলরাশি বয়ে যায়—মনে হয় কোন এক অজানা স্বপ্নরাজ্যে এসে গেছি।

* * *

এখান হ'তে সুদূর চারমাইল ব্যাপী চলে গেছে সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথ। চারি পাশে ঘনবন, সম্মুখে বৃক্ষরাজিপূর্ণ গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা। মাঝে মাঝে ভুটানীদের খামার। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত যমদুয়ার —চারিদিকে সবুজে রঙীণ। মাঝখানে পাথরের দিগন্ত রেখা—তারই উপর দিয়ে বয়ে চলে নীল স্বচ্ছ অতি শীতল জলধারা।

বড়-দিন

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

আজ যারা যিশু, ঘণ্টা বাজায়—গির্জ্জায় গির্জ্জায়,
উৎসবে করে তোমার জন্মদিনে,
তোমার শিষ্য-পরিচয়ে যারা মনে উল্লাস পায়,
তোমারে বন্দে তোমার মন্ত্র-বিনে,
হাতে নিয়ে তারা আণবিক বোমা পিশাচের মত হাসে,
প্রেমের বদলে বুকের রক্ত চায়,—
নিত্য তাহারা বিশ্ব-মানবে শংকিত করে ত্রাসে,
ভণ্ড ভক্ত নমিছে তোমার পা'য়!

গগন-সিন্ধু-বসুন্ধরারে—মারণ-যন্ত্র-জালে
আবরিয়া তারা হিংস্র-নয়নে চায়—
যুদ্ধ-ইচ্ছা-মদিরা নিয়ত মানুষের মনে ঢালে
তৃষ্ণা জাগায়ে লোভ আর হিংসায়।
তুমি যে আনিলে প্রেমের বার্ত্তা খণ্ডিত করি তারে
নিখিল-বিশ্বে ছড়ায় বিষের বাণী
ব্যথিত কি তুমি প্রেমের দেবতা, তাদের কপটাচারে
খ্রীষ্ট-বিহীন যাদের খ্রীষ্টিয়ানি?

কলিকাতায় ললিতকলা প্রদর্শনী

শ্রীসন্তোষকুমার দে

জাতীয় জীবনের সকল দিকে যখন জাগরণের সাড়া পড়েছে তখন আমাদের দেশের শিল্পীরাও যে বসে নেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এবারের ললিতকলা প্রদর্শনীগুলিতে। বিশেষ করে একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর পঞ্চদশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে যে আয়োজন হয়েছিল, তা আকারে প্রকারে সব দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য।

এই প্রদর্শনীতে ভারতের সকল প্রদেশের ছোট বড়ো অনেক চিত্রকর তাঁদের চিত্র পাঠিয়েছিলেন, সেগুলির সংখ্যা কয়েক সহস্র হবে, তার মধ্য হতে বাছাই করে ছ'শোর কিছু বেশী ছবি প্রদর্শনীতে দেখানো হয়।

চিত্রকর, ভাস্কর, মৃৎশিল্পী সবরকম মিলিয়ে ১৫৩ জন শিল্পীর মোট ৬৩৬টি শিল্পকর্ম দেখানো হয়। তার মধ্যে নন্দলাল বসু, সতীশ সিংহ, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পূর্ণ চক্রবর্তী, এল-এম-সেন, গোপাল ঘোষ, ধীরেন দে, ইন্দ্র দুগার, মাখন দত্তগুপ্ত, রথীন্দ্র মৈত্র, অনিল ভট্টাচার্য, শৈলজ মুখার্জি, শম্ভু মজুমদার, ডব্লু-ল্যাঙ্গহামার কিশোর রায়, কমলারঞ্জন ঠাকুর, কনওয়াল কৃষ্ণ, কল্যাণ সেন, অবনী সেন, অমূল্যগোপাল সেনগুপ্ত, জ্যোতিষ সিংহ, প্রভৃতি বহু বিখ্যাত ও সুপরিচিত শিল্পী প্রদর্শনীতে ছবি মূর্তি প্রভৃতি পাঠিয়েছিলেন। বিক্রয়ের জন্য নয়, এমন কি প্রতিযোগিতার জন্যও নয়—এমন চিত্রাদির সংগ্রহে আরো কিছু যত্ন নেওয়া সম্ভব হলে এই জাতীয় প্রদর্শনীর সার্থকতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। এই সব শিল্পপ্রদর্শনীতে যেয়ে যদি রবি বর্মাপ্রমুখ পুরাতন ও অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ যুগপ্রবর্তকদের চিত্র দেখবার সৌভাগ্য হয় তাতে জনসাধারণের রুচি আরো বিকশিত হতে পারে, প্রদর্শনীর আকর্ষণও যে বহুগুণে বৃদ্ধি পায় সে কথা বলাই বাহুল্য। যামিনী রায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, হেমেন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ কর, ক্ষিতীন্দ্র মজুমদার, উকিল ভ্রাতারা প্রভৃতি এমন কি রোরিক (পিতা-পুত্র উভয়ের) ও রবীন্দ্রনাথের

শ্রীনগরে সকাল — শিল্পী—বীরেন দে

অঙ্কিত চিত্রের কিছু কিছু সংগ্রহ থাকলে কতই না আনন্দের হত। সুখের বিষয়, আচার্য নন্দলালের চারখানি চিত্র এবারের প্রদর্শনীর গৌরব বর্ধন করেছে। অসিতকুমার হালদার এবং সুধীর খাস্তগীরও ছবি পাঠিয়েছেন।

ধনরাজ ভগত এবার প্রদর্শনীর সেরা পুরস্কার প্রদেশপালের সুবর্ণ পদক পেয়েছেন—তাঁর একটি কাঠ খোদাই করা মূর্তির জন্য। মূর্তিতে একটি লোক একটি পশুশাবককে কোলে তুলে স্নেহ প্রকাশ করছে।

তৈলচিত্রে প্রথম পুরস্কার স্যার আবদুল হালিম গজনবী সুবর্ণ পদক পেয়েছেন ভি-ডি-চিঞ্চলকর। ছবির নাম—শিল্পীর ভ্রান্তি। কিশোরী রায় জে-পি-গাঙ্গুলী রৌপ্য পদকটি তৈলচিত্রে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

জলরঙের চিত্রে প্রথম পুরস্কার কানাইলাল জাঠিয়া সুবর্ণ পদক পান অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় পুরস্কার—বি-কে রায়চৌধুরী (গৌরীপুর) রৌপ্য পদক পেয়েছেন কল্যাণ সেন।

গ্রাফিক আর্টে প্রথম পুরস্কার কুমার জগদীশ সিংহ সুবর্ণ পদক পেয়েছেন কুশলী উডকাট শিল্পী হরেন দাস। দ্বিতীয় পুরস্কার এস্-পি ঘোষাল রৌপ্য পদক পান সাবিত্রী সেনগুপ্ত।

এতদ্ব্যতীত নিম্নোক্ত শিল্পীদের নগদ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে :—

গোপাল ঘোষ	২০০৲
সতীশ চক্রবর্তী	২০০৲
শ্রীমতী ইন্দুমতী লাঘেট	২০০৲
কৃপাল সিং শেখাওয়াত	২০০৲

রঙিন উডকাঠ শিল্পী—হরেন দাস

পেয়েছেন কনওয়াল কৃষ্ণ—'শিপকি গিরিবর্ত্ম' ছবির জন্য। দ্বিতীয় পুরস্কার এন-সি ঘোষ রৌপ্য পদক পেয়েছেন জি-ডি গলরাজ।

প্রাচ্য কলা চিত্রে প্রথম পুরস্কার কুমার পি এন টেগোর সুবর্ণ পদক পান কমলারঞ্জন ঠাকুর। বিষয়—'তপোবন।' দ্বিতীয় পুরস্কার রাজা বিশ্বেশ্বর সিং বাহাদুর (দ্বারভাঙ্গা) রৌপ্য পদক পেয়েছেন—কৃপাল সিং শেখাওয়াত।

ভাস্কর্যে প্রথম পুরস্কার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর স্যার কামেশ্বর (দ্বারভাঙ্গা) সুবর্ণ পদক পেয়েছেন ধনরাজ ভগৎ। দ্বিতীয় পুরস্কার রায় বাহাদুর এন-আর মুখার্জি রৌপ্য পদক পেয়েছেন শ্রীদাম সাহা।

অন্য যে কোন মাধ্যমে কাজের জন্য প্রথম পুরস্কার নরেশনাথ মুখার্জি

প্রমোদগোপাল চট্টোপাধ্যায়	২০০৲
পরেশনাথ চৌধুরী	১০০৲
জ্যোতিরিন্দ্র রায়	১০০৲
সোলে গাওকর	১০০৲
দেবকুমার রায়চৌধুরী	১০০৲
শিলা শবরওয়াল	১০০৲

লোটাস ট্রাস্ট পুরস্কার রূপে গিরীশ মণ্ডল ২৫০৲ এবং জিতেন্দ্রনাথ নাগ ১২৫৲ পেয়েছেন।

প্রদর্শনীর অনেকগুলি সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু শিল্পীদের এই স্বীকৃতি উল্লিখিত হয় নি, হওয়া উচিত—যাতে জনসাধারণ ও

সাঁওতাল পরিবার		শিল্পী—রামকিঙ্কর

ন		শিল্পী—কমলারঞ্জন ঠাকুর

শিল্পীদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয় ও তারা অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হন।

সমগ্র প্রদর্শনীর মূল সুরটি লক্ষ্য করলে ধরা যায়, প্রাচ্য চিত্রকলার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে যত্নের অবধি নেই। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালের ধারা অনেক চিত্রকর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট। বিশেষ করে প্রাচ্য চিত্রকলা পদ্ধতিতে অঙ্কিত 'তপোবন' চিত্রটি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিত্রটি ৮'×৪' প্রাকারের মেসোনাইট বোর্ডের উপর টেম্পারায় আঁকা। শিল্পী কমলারঞ্জন ঠাকুর এই বিশেষ পদ্ধতির চিত্রে বিশেষ পারদর্শী, বস্তুত তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ইতিমধ্যেই তাঁকে যশস্বী করে তুলেছে। 'তপোবন' চিত্রটির ছোট নক্সা গত বৎসর দিল্লী প্রদর্শনীতে পুরস্কার পায়। মূল নক্সার অনুকরণে বিশাল পটভূমিকায় আঁকা এই বৃহৎ চিত্রটি আকৃতিতেও প্রদর্শনীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছবি।

বহু নয়নানন্দকর চিত্রের ভিড়ের মধ্যে অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কাজ বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

মূর্তিশিল্পে দুটি ভিন্ন টেক্‌নিকের কাজ বিপ্রচরণ মহান্তীর—'পাঠ',* এবং 'জননী ও সন্তান, আর বিভূতিভূষণ সেনের 'ঢাকেশ্বরী দুর্গা'। মহান্তী উড়িষ্যার মূর্তিশিল্পের সার্থক অনুকরণ করেছেন, সেন ঢাকেশ্বরীর অনুকরণেও কম পারদর্শিতা দেখান নি। রমেশচন্দ্র পালের ডক্টর কার্তিক বসুর আবক্ষ মূর্তিটি ভালো হয়েছে। শ্যামাপদ ভাস্করের হাতীর দাঁতের কাজ আশ্চর্য সুন্দর।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারের প্রদর্শনীতে ভাস্কর্যের নমুনার সংখ্যা ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে উচ্চ-শ্রেণীর কাজও প্রচুর সংখ্যায় এসেছে, প্রত্যেকটির পৃথক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা বৃথা। শুধু মনে হয়—কেবল বড়দিন ও নববর্ষের কাছা-কাছি মাসাধিক কালমাত্র এই জাতীয় প্রদর্শনীর মেয়াদ না করে এর একটা স্থায়ী ব্যবস্থার প্রয়োজন। ন্যাশানাল আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন হচ্ছে সেটি স্থাপিত হলে আমাদের এই অভাব পূর্ণ হতে পারবে।

সোপেনহরের ধর্ম্মমত

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

"Religion"-শীর্ষক প্রবন্ধে সোপেনহর ধর্ম্মকে সাধারণ লোকের দর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মে তিনি গভীর দুঃখবাদ দর্শন করিয়াছিলেন, আদিম পাপ (Original sin)-বাদের মধ্যে ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা এবং পরিত্রাণ-বাদের (Salvation) মধ্যে ইচ্ছার অপলাপ (denial) দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে সকল কামনা হইতে সুখের উৎপত্তি হয় না, তাহাদের দমনের জন্যে উপবাসের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। য়িহুদী ধর্ম্ম এবং ইয়োরোপের প্রাচীন ধর্ম্ম উভয়ই ছিল মঙ্গলবাদী (optimistic), কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম ছিল দুঃখবাদী। এই দুঃখবাদের ফলে খৃষ্টধর্ম্ম জয়লাভ করিয়াছিল। য়িহুদী ধর্ম্ম ও প্রাচীন ধর্ম্ম কর্ম্মকে দেবতাদের কৃপা লাভের উপায়-স্বরূপ উৎকোচ বলিয়া মনে করিত। খৃষ্টধর্ম্ম পার্থিব সুখের জন্য বৃথা চেষ্টা হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিলাস ও প্রভুত্বের সম্মুখে খৃষ্টধর্ম্ম সন্ন্যাসের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছিল। খৃষ্ট যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়াছিলেন।

সোপেনহর বৌদ্ধ ধর্ম্মকে খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে উৎকৃষ্টতর মনে করিতেন। ইচ্ছার বিনাশই বুদ্ধের মতে ধর্ম্ম। নির্বাণ প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনার লক্ষ্য। ইয়োরোপের দার্শনিকদিগের অপেক্ষা হিন্দুগণ অধিকতর গূঢ়-দর্শী ছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধিদ্বারা জগতের ব্যাখ্যা করেন নাই। বুদ্ধি প্রত্যেক বস্তুকে নানাভাগে বিভক্ত করে ; অব্যবহিত জ্ঞান (Intuition) যাবতীয় বস্তু একত্র দর্শন করে। হিন্দুগণ এই অব্যবহিত জ্ঞানে জগতের একত্ব দর্শন করিয়াছিলেন। তাহারা দেখিয়াছিলেন "অহং" মায়ামাত্র ; ব্যক্তি প্রতিভাসমাত্র ; অসীমই একমাত্র সৎ বস্তু। "তৎ ত্বমসি"। সোপেনহরের বিশ্বাস ছিল যে ভারতীয় দর্শনদ্বারা পাশ্চাত্য জ্ঞান ও চিন্তা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইবে এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রীক সাহিত্য দ্বারা ইয়োরোপীয় সাহিত্য যেরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল, সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবও তদনুরূপ হইবে।

সোপেনহর ব্যক্তির অমরতায় বিশ্বাস করিতেন না। নির্বাণ অর্থে যতদূর সম্ভব ইচ্ছা শক্তির হ্রাস বুঝিতেন। মৃত্যুর পরে তো চিরনির্বাণ নিশ্চিত। যতদিন বাঁচিয়া থাকা, ততদিন দুঃখ এড়াইবার উপায় হইতেছে ইচ্ছাকে দমন করা, কামনার নিবৃত্তি করা। জগৎ আমাদিগের অপেক্ষা বলবত্তর। তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার কর, কিছুই চাহিও না, কিছুই কামনা করিও না ; তাহা হইলে ইচ্ছার সহিত ইচ্ছার বিরোধ সংঘটিত হইবে না। ইচ্ছার প্রভুত্ব হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিতে পারিলেই ইচ্ছা দমিত হইবে, শান্তিলাভ করিবে।

কিন্তু একের শান্তিলাভদ্বারা জগদ্ব্যাপী সমস্যার সমাধান হইবে না। নির্বাণ সকলের জন্যই প্রয়োজনীয়। প্রত্যেকেই দুঃখভোগ করিতেছে, হতাশায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রত্যেককেই ইচ্ছার দমন করিতে হইবে। সমগ্র মানবজাতিকে নির্বাণ লাভ করিতে হইবে। কিরূপে তাহা সম্ভব হয় ?

তাহার একমাত্র উপায় জীবনের উৎস বন্ধ করা। সন্তান উৎপাদনের ইচ্ছাই জীবনের উৎস। এই ইচ্ছার বিলোপ সাধন দ্বারাই সমগ্র মানব-জাতির নির্বাণ লাভ সম্ভবপর হয়। সন্তান-উৎপাদন-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন সোপেনহরের মতে নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। কেননা ইহাতেই জীবন-লিপ্‌সা প্রবলতমরূপে অভিব্যক্ত। হতভাগ্য সন্তানেরা এমন কি অপরাধ করিয়াছে, যে তাহাদিগকে অস্তিত্বের পাশে বাঁধিয়া ফেলিতে হইবে?" জীব-জগতে অনবরত যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, সকলেই অভাব ও দুঃখের মধ্যে কালাতিপাত করিতেছে। প্রাণের অসংখ্য অভাব পূরণের জন্য, তাহার বহুবিধ দুঃখ-কষ্ট এড়াইবার জন্য, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও মাত্র কিয়ৎকালের জন্য এই যন্ত্রণাপীড়িত অস্তিত্ব রক্ষা করিবার সম্ভাবনা ভিন্ন অন্য কিছুই তাহারা আশা করিতে পারিতেছে না। এই সংগ্রামের মধ্যে দুই প্রেমিক পরস্পরের দিকে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে? কিন্তু এত গোপনে, এত ভয়ে ভয়ে কেন? ইহার কারণ, এই প্রেমিকেরা বিশ্বাসঘাতক, ইহারা মানুষের অভাব ও নীরস কর্মভার চিরস্থায়ী করিবার কল্পনা করিতেছে। তাহা না করিলে সত্বরই তাহার শেষ হইয়া যাইত।··· যৌন সম্বন্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট লজ্জার ইহাই গূঢ় কারণ। নারীই এ বিষয়ে প্রধান অপরাধী। পুরুষের জ্ঞান যখন ইচ্ছার অধীনতা-মুক্ত হয়, তখন নারীর সৌন্দর্য্য তাহাকে বংশ রক্ষা কার্য্যে প্রলুব্ধ করে। নারীর সৌন্দর্য্য যে কত অল্পক্ষণ স্থায়ী, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যুবকের থাকে না; যখন বুঝিতে পারে তখন বুঝিয়াও লাভ নাই। যুবকের ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আজ যাহাকে দেখিয়া তাহার কবিত্ব উথলিয়া উঠিতেছে, সে যদি আরও আঠারো বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে তাহার দিকে সে ফিরিয়াও তাকাইত না। পুরুষেরা স্ত্রীদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর। কবিতাই বল, সঙ্গীতই বল, অথবা সুকুমার-কলাই বল, কিছুতেই নারীর স্বাভাবিক প্রবণতা নাই। পুরুষকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা এই সকল বিষয়ে অনুরাগের ভাণ করে। সমগ্র স্ত্রীজাতির মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী, তাহারাও এপর্য্যন্ত সুকুমার কলায় কোনও মৌলিক কার্য্য করিতে, অথবা কোনও ক্ষেত্রেই জগৎকে চিরস্থায়ী কিছু দান করিতে সক্ষম হয় নাই। নারীর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন খৃষ্টধর্ম্ম এবং জার্মাণ-ভাবপ্রবণতা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্রদ্ধা-বশতই রোমাণ্টিক আন্দোলনে অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছাকে বুদ্ধির উপর স্থান দান করা হইয়াছে। এশিয়াবাসিগণ আমাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। স্ত্রী যে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহা তাহারা স্পষ্টই স্বীকার করে। "যখন আইন দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষের সহিত সমান অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহাদিগকে পুরুষের সমান বুদ্ধি দেওয়াও উচিত ছিল। বিবাহ-ব্যাপারেও এসিয়াবাসিগণ আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর সাধুতা প্রদর্শন করিয়াছে। বহু-বিবাহ-প্রথা তাহারা স্বাভাবিক এবং আইন-সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। বহু বিবাহ আমাদের মধ্যে বিস্তৃত ভাবেই প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহা গোপনে অনুষ্ঠিত হয়।"

স্ত্রীলোকদিগকে সম্পত্তিতে অধিকার-দান করা অসঙ্গত। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অমিতব্যয়ী। তাহারা কেবল বর্ত্তমানেই বাস করে এবং গৃহের বাহিরে তাহাদের প্রধান ক্রীড়া দোকানে যাওয়া। তাহারা ভাবে অর্থ উপার্জন পুরুষের কাজ; তাহাদের কাজ সেই অর্থ ব্যয় করা। শ্রমবিভাগ সম্বন্ধে ইহাই তাহাদের মত। এইজন্য স্ত্রীলোকদিগের স্বকীয় ব্যাপারেও কোনও কর্তৃত্ব থাকা উচিত নহে। পিতা, স্বামী, পুত্র অথবা রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে তাহাদের সর্ব্বদা থাকা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষে ইহাই রীতি। তাহারা নিজেরা যে সম্পত্তি অর্জন করে নাই, তাহার দান-বিক্রয়েও তাহাদের কোনও অধিকার থাকা উচিত নহে। স্ত্রীলোকদিগের সংস্রব সযত্নে পরিহার করা উচিত। "পুরুষ যদি স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের ফাঁদ হইতে দূরে থাকিবার জন্য সচেষ্ট হয়, তাহা হইলে নিত্য নূতন মানুষ-সৃষ্টি বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং অবশেষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মানব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।' অশান্ত ইচ্ছার উন্মত্ত আচরণের ইহাই প্রকৃষ্ট পরিণাম। যুদ্ধে পরাজিত এবং মৃত্যুগ্রস্ত এক জীবন নাট্যের উপর এইরূপে যে যবনিকা পতিত হইবে, তাহা নূতন জীবন, নূতন যুদ্ধ, নূতন পরাজয়ে ও মৃত্যু-নাট্যের অভিনয়ে কেন অনন্তকাল ধরিয়া পুনরায় উত্তোলিত হইবে? এই বৃথারম্ভ-লঘুক্রিয়া-ব্যাপারে অন্তহীন যন্ত্রণার ক্লেশদায়ক পরিণামে আর কতদিন ধরিয়া আমরা প্রলুব্ধ হইতে থাকিব? কবে "ইচ্ছা"কে অবজ্ঞাভরে যুদ্ধে আহ্বান করিতে আমাদের সাহস হইবে? কবে তাহাকে বলিতে পারিব যে জীবনের মনোহারিত্বের কথা মিথ্যা এবং মৃত্যু বরং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বর?"

সমালোচনা

সোপেনহরের দার্শনিক প্রস্থান—কলার এক মনোরম সৃষ্টি। তাহা প্রতিভা, কলা-কৌশল, ললিত রচনা শৈলী ও সুসম্বদ্ধ চিন্তা রাজির সমবায়ে যে দার্শনিক সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্যে বিলসিত। প্লেটোর পরে এরূপ উজ্জ্বল পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ইতিপূর্বে দর্শন কখনও প্রকাশিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু সোপেনহরের দর্শনের সৌন্দর্য্য কোমল নহে, ভীষণ। ভীষণ বস্তুকে মনোহারী রূপে প্রকাশিত করিবার জন্য যে কলা-কৌশলের প্রয়োজন হয়, সোপেনহরের মধ্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। তাই তিনি "বাঁচিবার ইচ্ছায়" যে নগ্নমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার ভীষণতার উপলব্ধির সঙ্গে পাঠকের মনে এক প্রকার তৃপ্তির উদ্ভব হয়। তিনি যাহা চাহিয়াছিলেন, সোপেনহরের রচনায় তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ একটা অনুভূতির উদ্রেক হয়।

সোপেনহরের দর্শনের কঠোর সমালোচনা অনেক হইয়াছে। তাঁহার অবিমিশ্র দুঃখবাদের জন্য তাহার আবির্ভাব কাল ও তাঁহার মানসিক প্রকৃতিকে দায়ী করা হইয়াছে। আলেকজান্দারের পরে গ্রীসে প্রাচ্য ভাবের প্রবর্ত্তনের ফলে ষ্টোয়িক দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রাচ্যদেশে প্রাকৃতিক শক্তি মানবীয় শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর বলিয়া পরিগণিত হয়; বাহ্যজগতের অন্তবর্ত্তী ইচ্ছাকে (External Will) মানবের ইচ্ছা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী মনে করা হয়। ইহার ফল নিরাশা ও

প্রাকৃতিক শক্তির, বশ্যতা-স্বীকার। ইয়োরোপেও নেপোলিয়নের পরে যে নিরাশার সৃষ্টি হইয়াছিল, সোপেনহরের দর্শনে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সোপেনহর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে মানুষের সুখ বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা তাহার নিজের স্বভাবের উপরই অধিকতর নির্ভর করে। স্নায়বিক পীড়াগ্রস্ত, কর্ম্মহীন অলস লোকের মন হইতেই সোপেনহরের দর্শনের আবির্ভাব সম্ভবপর। কর্ম্মব্যস্ত জীবনে দুঃখবাদের বিলাস-সম্ভোগের অবকাশ থাকে না। দুঃখবাদের জন্য অবসরের প্রয়োজন। সোপেনহরের জীবনে এই অবসর প্রচুর পরিমাণে ছিল। নির্বাণ নিষ্ক্রিয় ও অনবহিত লোকের আদর্শ। সোপেনহরের দর্শন পীড়াগ্রস্ত অলস মনের পরিচায়ক। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার ফলে তিনি নারী-বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুরুষ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাও মানবপ্রীতির অনুকূল ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন "আপদকালের বন্ধুই যে প্রকৃত বন্ধু, তাহা নহে। তিনি অধমর্ণ মাত্র। শত্রুর নিকট হইতে যাহা গোপন করা প্রয়োজন, বন্ধুকেও তাহা বলিও না।" সোপেনহর সামাজিক জীবন ভালবাসিতেন না। উত্তেজনা ও বৈচিত্র্যহীন সন্ন্যাস-জীবনই তাঁহার প্রিয় ছিল। মানুষের সংসর্গ হইতে যে আনন্দ লাভ হয়, তাঁহার নিকট তাহার কোনও মূল্য ছিল না।

দুঃখবাদের মধ্যে আত্মম্ভরিতা বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান। আপনার সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা থাকিলে জগৎকে আপনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে হয়, জগৎ আমার মত লোকের বাসের স্থান নহে, এইরূপ ধারণার উদ্ভব হয়। সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা অনেক সময় নিজের প্রতি ঘৃণা হইতেও উদ্ভূত হয়। বুদ্ধির দোষে স্বীয় জীবন ব্যর্থ করিয়া তাহার দায়িত্ব সংসারের উপর চাপাইবার একটা ঝোঁক হয়। সংসার প্রকৃত পক্ষে আমাদের বন্ধুও নহে, শত্রুও নহে। সংসারের উপাদান আমরা ইচ্ছামত স্বর্গ অথবা নরকে পরিণত করিতে পারি। সোপেনহর এবং তাঁহার সমসাময়িকদিগের রোমান্টিক মনোভাবও অনেক পরিমাণে তাহাদের দুঃখবাদের জন্য দায়ী। সংসারের নিকট তাঁহারা অত্যধিক আশা করিয়াছিলেন। অনুভূতি, সহজাত প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছার জয়গান, এবং বুদ্ধি, সংযম এবং সামাজিক শৃঙ্খলার প্রতি অবজ্ঞার শাস্তি দুঃখবাদ। চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট জগৎ হাস্যরসের আধার, কিন্তু অনুভূতি যাহাদের প্রবল, তাহাদের নিকট জগৎ একটি বিয়োগান্ত নাটক।" "অনুভূতি-প্রধান রোমান্টিক আন্দোলন হইতে যত বিষাদের উৎপত্তি হইয়াছে, অন্য কোনও আন্দোলন হইতে তাহা হয় নাই। রোমান্টিক যখন দেখিতে পান, তাহার সুখের যাহা আদর্শ, তাহা হইতে সুখ উৎপন্ন না হইয়া দুঃখের উৎপত্তি হয়, তখন তিনি তাহার আদর্শের কোনও দোষ দেখিতে পান না। তিনি সমস্ত দোষ সংসারের উপর অর্পণ করেন।

উপরি বর্ণিত ভাবে সোপেনহরের অনেক সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক সমালোচনা হিসাবে উক্ত সমালোচনা সুন্দর হইলেও উহা দার্শনিক সমালোচনা নহে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সোপেনহরের "ইচ্ছা" ফিক্‌টের "অহমের" মধ্যে অস্পষ্টভাবে ছিল। ফিক্‌টের অহমের স্বরূপ ক্রিয়া-পরতা। সোপেনহরের "ইচ্ছা"ও ক্রিয়াপরশক্তি। কিন্তু ফিক্‌টের দর্শনে অহমের ক্রিয়াপর রূপ সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই। সোপেনহর যখন গটিন্‌জেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন, তখন তাঁহার অধ্যাপক বৌটারবেক (Bouterwek) ক্যান্টের স্বয়ং-সৎ-বস্তু সম্বন্ধীয় মতের প্রতিবাদে ইচ্ছাকেই প্রথমে স্বয়ং সৎ-বস্তু বলিয়াছিলেন। সোপেনহর তাঁহার মতের জন্য বৌটারবেকের নিকট ঋণী। বৌটারবেক বলিয়াছিলেন "আমরা বিষয়ীকে জানি, যখন বিষয় আমাদের ইচ্ছাকে বাধা দেয়। শক্তি এবং তাহার বাধা, এই উভয়ের জ্ঞান হইতে, আমাদের নিজের এবং অন্য বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বের (reality) জ্ঞান-"অহম" এবং অনহমের জ্ঞান-উৎপন্ন হয়। এই মতকে বৌটারবেক "Virtualism" আখ্যা দিয়াছিলেন। আমরা যে ইচ্ছা করি, ইহা হইতেই আমাদের বাস্তবতার জ্ঞান হয় এবং বাহ্যবস্তুর মধ্যে আমাদের ইচ্ছা যে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ইহা হইতে বাহ্যবস্তুর বাস্তবতার জ্ঞান হয়। ইচ্ছার পথে বাধার জ্ঞান-দ্বারাই বাহ্যবস্তুর যে বুদ্ধির বাহিরেও অস্তিত্ব আছে, তাহা প্রমাণিত হয়। সোপেনহর এই মত গ্রহণ করিয়া, আমাদের ইচ্ছা এবং বাহিরের বাধা উভয়ের একত্ব সাধন করিয়া উভয়কেই "ইচ্ছা" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অন্তরে বাহিরে ইচ্ছাই একমাত্র স্বয়ং-সৎ-বস্তু বলিয়াছিলেন। কিন্তু এই বাহ্য ইচ্ছা যেরূপে আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়, (দেশ ও কালে অবস্থিত রূপ) তাহা প্রত্যয়মাত্র, তাহা ইচ্ছার স্বরূপ নহে, তাহা সংসার (সংসরতি ইতি সংসারঃ), তাহা অবভাস, তাহা তাহার প্রতীয়মানরূপ। (Phenomenal world)। তাহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ "কারণ" Category রূপে বোধগম্য হয়। সোপেনহর "কারণ" কেই একমাত্র Category বলিয়া গণ্য করিয়াছেন, এবং তাহাকে অবভাসের জগতেই আবদ্ধ রাখিয়াছেন। কিন্তু বাহ্য ও আন্তর "ইচ্ছা" যে বাস্তব বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা অব্যবহিত জ্ঞান হইলেও, বাস্তবতার জ্ঞান, আর বাস্তবতা (reality) ও জ্ঞানের একটা রূপ। সোপেনহর তাহাকে স্বতন্ত্র Category বলিয়া গণ্য না করিলেও, তাহা বোধমাত্র, বোধের বাহিরে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রতীয়মান বাহ্য জগতের কারণ-রূপে এই ইচ্ছা জ্ঞানে আবির্ভূত হয় না। সোপেনহর বলিয়াছেন, আপনার স্বরূপই শক্তি-রূপে আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই শক্তি ও বাস্তবতা (reality) অভিন্ন। বাস্তবতাকে সোপেনহর Category বলিয়া স্বীকার না করিলেও Categoryর ধর্ম্ম তাহাতে বর্ত্তমান। সুতরাং ইচ্ছাকে স্বয়ং-সৎ-বস্তু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলা যায় না।

সোপেনহরের মতে অচেতন ইচ্ছা হইতে সংবিদের উদ্ভব হইয়াছে। ইচ্ছা সংবিদ এবং বুদ্ধির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ইচ্ছার কার্য্যে যন্ত্র-স্বরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই বুদ্ধির উদ্ভব। ইচ্ছা নিজে যে যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা দ্বারাই সোপেনহর তাহাকে পরাভূত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধির পরবর্ত্তী আবির্ভাব হইতে প্রমাণিত হয় যে সোপেনহর যাহাকে ইচ্ছা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যেই বুদ্ধির বীজ নিহিত ছিল এবং

বুদ্ধির বিকাশের জন্যই ইচ্ছার অস্তিত্ব। বটবৃক্ষের প্রত্যয় (idea) যেমন বটবীজের মধ্যে শায়িত থাকে এবং বটবৃক্ষকে প্রকাশিত করাতেই যেমন বটবীজের সার্থকতা, তেমনি জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রকাশেই তথাকথিত ইচ্ছার সার্থকতা। অঙ্কুরোদ্‌গমের আরম্ভ হইতে যেমন বীজের মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং সমগ্র বৃক্ষ বীজের মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়িলে যেমন খোসামাত্র পড়িয়া থাকে, তেমনি বুদ্ধির বিকাশের প্রারম্ভ হইতে "ইচ্ছার" প্রয়োজনের হ্রাস হইতে থাকে এবং বুদ্ধি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে ইচ্ছা তাহার দাসে পরিণত হয়। ইচ্ছা যতই বুদ্ধির বশীভূত হইবে, তাহার অনিষ্টকারিতাও ততই কমিতে থাকিবে, এবং তাহা হইতে মঙ্গলই উদ্‌ভূত হইবে। সুতরাং ইচ্ছাকে ঐকান্তিক অমঙ্গল বলিবার যথেষ্ট কারণের অভাব এবং ইচ্ছারূপী জগৎকে (World as will) প্রত্যয়রূপী জগতের (World as idea) ঊর্দ্ধে স্থান দিবার এবং তাহাকে অধিকতর সত্য বলিবার কারণ নাই।

সোপেনহরের দর্শন নিরীশ্বর। যে ইচ্ছা হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অন্ধ, জ্ঞানহীন, সংবিদহীন। তাহা irrational। এই বাঁচিবার ইচ্ছার কোনও পরিজ্ঞাত লক্ষ্য নাই। ইহার বাহিরেও কিছু নাই, সুতরাং এই ক্রিয়াপর ইচ্ছার গতি নিজের দিকে। ফিক্‌টের ক্রিয়াপর "অহং"ও অন্তহীন ক্রিয়ামাত্র, তাহার বাহিরেও কিছু নাই, তাহার ক্রিয়ার গতিও নিজের দিকে। কিন্তু ফিক্‌টের দর্শনে এই "নিজের দিকে গতি" নৈতিক আত্মসংযম হইতে অভিন্ন। সোপেনহরের ইচ্ছার ক্রিয়া সম্পূর্ণ যুক্তিহীন, লক্ষ্যহীন। তবুও তাহা হইতে যে বুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা আকস্মিক বলিতে হইবে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে এই ইচ্ছার গতি একটি নির্দ্দিষ্ট দিকেই চলিয়াছে, নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে চলিয়াছে। অচেতন ইচ্ছা হইতে বুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে, ইচ্ছার প্রভাবমুক্ত বুদ্ধি হইতে প্রতিভা এবং কলার আবির্ভাব হইয়াছে। এই ক্রম-বিকাশ নির্দ্দিষ্টদিকে প্রজ্ঞার নিয়মানুসারেই হইয়াছে। সুতরাং প্রজ্ঞা, সংবিদ ও বুদ্ধিকে অচেতন ইচ্ছার সৃষ্টি বলিবার যথেষ্ট কারণের অভাব। দেশ ও কালে আমরা যে প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ পাই, তাহা দেশ ও কালাতীত প্রজ্ঞার দেশ ও কালে প্রকাশ। সৃষ্টির ইতিহাসে তাহা সৃষ্টির পরবর্ত্তী হইলেও দেশ-কালাতীত রূপে তাহা সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী।

শেলিং বলিয়াছিলেন নির্বিশেষ স্বয়ংসৎ-বস্তুর জ্ঞান বুদ্ধিতে (understanding) সম্ভবপর না হইলেও প্রজ্ঞায় (Reason) তাহার জ্ঞান সম্ভবপর। এই জ্ঞানকে তিনি Intellectual Intuition নাম দিয়াছিলেন। হেগেলও নির্বিশেষ জ্ঞান (absolute knowledge) সম্ভবপর বলিয়াছিলেন। Intellectual Intuition এবং absolute knowledgeকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া সোপেনহর যাহা লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু সোপেনহর নিজেও স্বয়ং-সৎবস্তুরূপী ইচ্ছার জ্ঞান যে আমাদের আছে, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের সংবিদে তাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়াছেন। আমাদের দেহ আমাদের ইন্দ্রিয়ে যেমন দেশকালে বিস্তৃত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি আমাদের সংবিদের মধ্যে কর্ত্তারূপে—ইচ্ছারূপে—প্রতীত হয় এবং এই ইচ্ছাকেই তিনি স্বয়ং-সৎবস্তু বলিয়াছেন। কিন্তু সংবিদের মধ্যে ইচ্ছার জ্ঞান কালেই প্রকাশিত হয়। তাহাও অবভাস মাত্র। সুতরাং তাহাকেও স্বয়ং-সৎবস্তু বলিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

কিন্তু ইচ্ছাই যে সকল পদার্থের মূল, তাহাও সোপেনহর প্রমাণ করিতে পারেন নাই। স্পিনোজা মানুষের মধ্যেও ইচ্ছাকে বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র কিছু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। যে অব্যবহিত জ্ঞান হইতে সোপেনহর ইচ্ছার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন, সেই অব্যবহিত জ্ঞানে জ্ঞাতারূপেই আত্ম-জ্ঞান হয়, বুদ্ধিকে স্বকীয় স্বরূপ বলিয়া যে গ্রহণ করে, সে জ্ঞাতা। সুতরাং 'ইচ্ছা' রূপী অহংকে জ্ঞাতারূপী অহমের ঊর্দ্ধে স্থাপিত করিবার যথেষ্ট কারণ নাই। বাঁচিবার ইচ্ছাই যদি জগতে একমাত্র জীবন্তশক্তি হইত, তাহা হইলে আত্মহত্যা অসম্ভব হইত। ইচ্ছা যে বুদ্ধির অনুগত হইতে পারে, ইহা হইতেই বুদ্ধির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। বুদ্ধি চিরকাল ইচ্ছার ওকালতি করে না। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ইচ্ছার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

সোপেনহর ইচ্ছা হইতে উদ্‌ভূত দুঃখকষ্টের দিকেই স্বকীয় দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্বের বিকাশ হইয়াছে, তাহার দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। যে মহৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় মরণোন্মুখ পিপাসার্ত্ত সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার জন্য বহু কষ্টে আহৃত দুষ্প্রাপ্য জলপাত্র অধীনস্থ সৈনিককে দান করিয়া মরণ আলিঙ্গন করে, যাহার উত্তেজনায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে মরণাপন্ন ঝাড়ুদারের প্রাণরক্ষার জন্য নফর কুণ্ডু সেই পুরীষ কুণ্ডে লম্ফ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহার দিকে সোপেনহরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যে বাঁচিবার ইচ্ছা এইরূপে আত্মবিসর্জ্জনে রূপান্তরিত হইতে সক্ষম, তাহাকে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল বলিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে কেবল যে দুঃখের বৃদ্ধিই হয়, ইহা সত্য নহে। সুখ-বৃদ্ধিও যে হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুখ কেবল দুঃখের অভাবরূপ ব্যতিরেকী পদার্থ নহে। ইতর জীবশিশুর সোল্লাস কুর্দ্দন এবং মানবশিশুর হাস্য যিনি দেখিয়াছেন, পক্ষীর সুধাবর্ষী সঙ্গীত যিনি শুনিয়াছেন, আর্টের সৌন্দর্য্যে যিনি বিমুগ্ধ হইয়াছেন, তিনি সুখকে দুঃখের অভাবমাত্র বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন।

সোপেনহরের হস্তে তুলিকা থাকায় দুঃখবাদের সমর্থনের জন্য তিনি নারী চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাঁহারই মতো দুঃখবাদিনী কোনও নারী জন্মপ্রবাহ-নিরোধের আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া এবং স্বহস্ত-ধৃত তুলিকাদ্বারা পুরুষ চরিত্র জঘন্যতররূপে অঙ্কিত করিয়া পুরুষ-সংসর্গ পরিহারে নারী-জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারেন। নারী চরিত্রের দুর্ব্বলতা যে তাঁহার পরাধীনতার ফল, সে কথা সোপেনহরের মনে হয় নাই।

ইহা সত্ত্বেও সোপেনহরের দর্শন দর্শনের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে। তিনিই প্রথমে সহজাত প্রবৃত্তির শক্তির দিকে দার্শনিকদিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মানুষ যে সর্ব্বদা বুদ্ধিকর্ত্তৃক চালিত হয়, সোপেনহরের পরে সে মত, পরিত্যক্ত হইয়াছে। নিৎসের মত সোপেনহরের দর্শনের প্রতিগামী হইলেও তাহাদ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। ফ্রয়েড ও তাঁহার মনোবিকলন-বিজ্ঞান সোপেনহরের "বাঁচিবার ইচ্ছার" ফল। কলার মূল্য ও প্রতিভার গৌরবও সোপেনহরের পূর্ব্বে কেহই তাঁহার মতো ব্যাখ্যা করেন নাই। পরিশেষে ইচ্ছার দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি মানবজাতিকে যে ত্যাগের পথে আহ্বান করিয়াছেন, ক্ষমতালুব্ধ বর্ত্তমান atom bomb-এর যুগে, সভ্যতাকে রক্ষা করিবার জন্য সেই পথ অবলম্বনের আবশ্যকতা দার্শনিকদিগের বিবেচ্য।

জমাখরচ

শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ

টাকা আছে কিন্তু মান মর্য্যাদা নাই এর একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনোরঞ্জন দোকানদার। সামাজিক অবস্থা যাহার যেমনই থাকুক না কেন, নামের শেষে রায়, দাস ইত্যাদি সকলেরই যুক্ত থাকে—ওটা পৈতৃক। কিন্তু মনোরঞ্জনের নামের শেষে সে পদবীটীও নাই; সেখানে আসন করিয়া বসিয়াছে 'দোকানদার'।

এই দুঃখটা মনোরঞ্জন ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটা বারোয়ারী উৎসবের সময় আর একবার নূতন করিয়া অনুভব করে। অথচ কাহার কত চাঁদা সভার মধ্যে ঘোষণা করিবার সময় মনোরঞ্জনের অলঙ্কার বিহীন নামটার সঙ্গেই যুক্ত থাকে সবচেয়ে বেশী টাকার অঙ্কটা। মনোরঞ্জন ভাবে, যাহাকে লোকে ঘৃণা করে তাহার কাছ হইতেই সবচেয়ে বেশী টাকা আদায় করিয়া নেওয়া যেন সমাজের কর্ত্তাদের একটা চালাকি।

বাণীর ত্যজ্যপুত্র মনোরঞ্জন আশ্রয় পাইয়াছে লক্ষ্মীর কাছে। ছোট বেলাকার কথা আবছা আবছা মনে ভাসিয়া ওঠে তা'র। বই খাতা নিয়া সে পাড়ার আর দশজন ছেলের সঙ্গে স্কুলে যাইত। মাস মাস স্কুলের বেতন যোগাড় করিয়া দিতে পারিত না মনোরঞ্জনের বাবা। একদিন তাই মাষ্টার মহাশয় স্কুল হইতে নাম কাটিয়া বাহির করিয়া দিলেন মনোরঞ্জনকে। ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় টস্ টস্ করিয়া চোখের জল পড়িতেছিল মনোরঞ্জনের, ফিরিয়া ফিরিয়া কয়েকবার মনোরঞ্জন তাকাইয়াছিল ক্লাশের দিকে—সে এক করুণ দৃশ্য!

তারপর বারো বছর কাটিয়া গিয়াছে। এই বারো বছর তাহাকে দিয়াছে পূর্ণ যৌবনের আস্বাদ, আর কাপড়ের দোকানের মারফৎ কিছু টাকা। তাহার জীবনের এই পরিবর্ত্তনেও স্কুল হইতে চিরদিনের জন্ম বাহির হইয়া আসার সেই করুণ দৃশ্য আজও তাহার মনে জীবিত রহিয়াছে, মনে উঠিলেই নিজের অজ্ঞাতসারে মনোরঞ্জন তাহার একখানি হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে যায়। এই দীর্ঘ বারো বছরে মনোরঞ্জন তাই একবারও স্কুলের সীমানার মধ্যে পা বাড়ায় নাই, কিন্তু তাহারই সাহায্যের টাকায় কয়েকটী গরীব ছেলে আজ ঐ স্কুলে বছরের পর বছর পড়াশুনা করিতেছে। আথিক অস্বচ্ছলতার জন্ম নিজের পড়াশুনায় অতৃপ্ত মনকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্ম মনোরঞ্জনের এই চেষ্টা তাহারই স্বেচ্ছা-প্রণোদিত।

কাপড়ের দোকানখানা চলিয়াছে পুরাদমে। দোকানের সাম্‌নে শো-কেসে সাজান দামী রংবেরংয়ের কাপড় মনোরঞ্জনের দোকানের আভিজাত্য প্রকাশ করিয়া পাইকারী ও খুচরা খরিদ্দারকে প্রলুব্ধ করে অন্ম দোকানের চেয়ে অনেক বেশী। কি হাটের দিন, কি অন্য দিন, মনোরঞ্জনের গদিতে খরিদ্দার লক্ষ্মীতে পরিপূর্ণ, টাকার ঝন্ ঝন্ অবিরত। খরিদ্দারকে তুষ্ট করিতে একজোড়ার স্থলে পাঁচ জোড়া কাপড় দেখাইয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে কাপড় কেনাইতে মনোরঞ্জন যেভাবে পারে, তেমন পারে না আর কেউ; অথচ ইহাতে এতটুকু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে না মনোরঞ্জন। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটী ফোটা-ফুলের মতো স্বচ্ছ হাসি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে।—যেন পরিশ্রমেই ওর বিশ্রাম।

মফঃস্বলের দোকানদারদের যতগুলি অসুবিধা আছে তাহার মধ্যে প্রধান অসুবিধা হইতেছে ধারে বিক্রয় করা। মনোরঞ্জনও ধারে বিক্রয় করে, কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা বোধ করে না এতটুকু। ধারের খরিদ্দার মনোরঞ্জনের বেশী নয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে কাপড় বিক্রয় করিয়া সঙ্গে সঙ্গে দাম চাওয়া যায় না, চাওয়া যায় না জমিদারবাবুর কাছেও। তা ছাড়া হাটের মালিক এবং বাজার সরকার ইহাদিগকেও সন্তুষ্ট রাখিতে হয়।

কলিকাতা হইতে নূতন কাপড়ের গাঁইট্ দোকানে আসিয়া পৌঁছিলে বাছাই বাছাই কয়েকখানা শাড়ী নিয়া

মনোরঞ্জন যায় ঐ ধার-বাকীর খরিদ্দারদের বাড়ী। কন্ট্রোলের বাজারে এদিক-ওদিক করিয়া তাহাদের সাহায্যেই দু'পয়সা আয় করিয়াছে; কাজেই ঘুষ না দিয়া ধার দেওয়া যে অনেক ভাল, সে হিসাব ভালভাবেই জানে মনোরঞ্জন। আজ হউক, কাল হউক—একদিন ও টাকা পাওয়া যাবেই। কিন্তু এই বাছাই-করা শাড়ীর মধ্যে আর একবার বাছাই করিতে হয় মনোরঞ্জনের সবচেয়ে ভাল কাপড়খানা প্রেসিডেণ্টবাবুর মেয়ে শ্যামলীর জন্য।

সেদিনও শ্যামলীকে মনোরঞ্জন দেখিয়াছে ফ্রক্ পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে, আর আজ সে বড় হইয়াছে। ক্লাশ নাইনে পড়ে শ্যামলী।

অন্দরমহলে যাইয়া শ্যামলীর হাতেই কাপড়খানি দিয়া মনোরঞ্জন বলে, "আজই কলকাতা থেকে এই কাপড় দোকানে এসেছে, আশা করি তোমার পছন্দ হবে।"

বাবা টাকা দেবে কিনা বা ইহার দাম কত হইতে পারে কিছুই বিবেচনা না করিয়া নূতন কাপড়ের আনন্দ পাইয়া বসিল শ্যামলীকে। আনন্দে আত্মহারা বন্য হরিণীর মতো সে ছুটিতে ছুটিতে গিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। শ্যামলীর আগ্রহে মা বাধা দিতে পারিলেন না।

এই ধারে বিক্রয়ে মনোরঞ্জনের মনের খোরাকী আছে অনেক। বারে বারে তাগাদায় আসে, তাহাতেও তাহার মুখে বিরক্তির ছোঁয়া লাগে না, আসে না তাহার দোকানদারী জীবনের উপর ধিক্কার; বরং প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে ধারেও কাপড় না রাখিলে মনোরঞ্জনের দুঃখ হওয়ারই কথা।

পরিবর্ত্তনশীল জগতে কালের রথ চলিয়াছে বছরের চাকা ঘুরাইয়া। দুইটী বছর কাটিয়া গেল। এই দুই বছরে মনোরঞ্জনের যত বাড়িল আশা, তত বাড়িল নিরাশা। শ্যামলীর শুভ্র দুইখানি হাতের উপর নানা সময়ে নানা রংয়ের কাপড় দিতে দিতে কখন কোন্ কাপড়খানার সঙ্গে যে সে নিজের মনের অনেক বাসনাও যুক্ত করিয়া দিয়াছে তাহার পরিমাণও কম নয়। আবার শ্যামলীর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর সে যে ক্রমশঃ অনেক উচ্চস্তরে উঠিতেছে তাহাতেও তাহার নৈরাশ্যের জাল ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া মনোরঞ্জনের মনের কোণে একখানা কালোমেঘ জমায়িত করিয়াছে।

দোকান বন্ধের পর দৈনিক জমা-খরচ শেষ করিয়া মনোরঞ্জন ভাবনা নিয়া বসিল। তাহার মনে এ কালো মেঘের উদয় কেন? এটা কি তাহার দুরাশার পরিণাম নয়? শ্যামলী স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের মেয়ে, উপরন্তু সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে। তাহার উপযুক্ত বর হইবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবক। তবুও তাহার মনে শ্যামলীকে নিয়া এমন একটা বিরাট আলোড়ন কেন, কিসের জন্য?

কয়েকমাস কাটিয়া গিয়াছে, মনোরঞ্জন আর শ্যামলীদের বাড়ীতে যায় নাই। প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী তাই খবর পাঠাইয়াছেন মনোরঞ্জনকে—নূতন ডিজাইনের কয়েকখানি শাড়ী নিয়া যাইতে। তাঁহার ইচ্ছা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রুচির কাপড় তিনি মেয়ের বিবাহের জন্য আগে হইতেই কিনিয়া রাখেন।

এইরূপ খবর পাঠান মনোরঞ্জনের কাছে নূতন নয়, তবুও এইবারকার এই খবরে মনোরঞ্জন একটু বিহ্বল হইয়া পড়িল। বৈকালের দিকে সদ্য কলিকাতা হইতে আমদানী নূতন ডিজাইনের তিনখানি শাড়ী বড় অক্ষরে নিজের দোকানের নাম লেখা কাগজের বাক্সে করিয়া শ্যামলীদের বাড়ী গেল। শ্যামলী বৈঠকখানা ঘরে তাহার বাবার টেবিল গুছাইতেছিল। মনোরঞ্জনকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এসো মনোদা! অনেকদিন তুমি এদিকে আসনি যে?"

"দোকানদার মানুষ, দোকান নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম—" হাসিয়া জানায় মনোরঞ্জন।

শ্যামলী মনোরঞ্জনের হাত হইতে তাড়াতাড়ি কাপড়ের বাক্স নিয়া খুলিয়া ফেলিল। "বাঃ কেমন চমৎকার কাপড়। ইচ্ছে হয় সবগুলিই রেখেদি।"

"রেখে দিলেই তো পারো! তোমরা যদি না রাখ তবে আমাদের মত মূর্খ এবং গরীব দোকানদার বাঁচবে কি করে?"

"গরীব তুমি মোটেই নও—তোমার কোন খবর বুঝি আমি রাখি না—না? তবে—হ্যাঁ—আচ্ছা মনোদা! তুমি লেখা পড়া লাইনে গেলে না কেন?"

জবাব দিবার পরিবর্তে মনোরঞ্জন শুধু হাসিল, সে হাসি পরিতৃপ্তির হাসি নয়—সে হাসি লজ্জার নামান্তর।

শ্যামলী তখনও কাপড়গুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল, আর সেই কাপড়ের রং প্রতিফলিত হইতেছিল তাহার মুখমণ্ডলে। মনোরঞ্জন চোরের মত তাকাইল শ্যামলীর সেই অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত মুখের দিকে। সে সৌন্দর্য্য কোনদিন ভুলিবার নয়।

প্রেসিডেণ্টবাবুর বাড়ী হইতে মনোরঞ্জন ফিরিল রিক্ত হস্তে, কিন্তু শূন্য হৃদয়ে নয়। কাপড় তিনখানিই শ্যামলী রাখিয়া দিয়াছে কিন্তু প্রতিদানে সে দিয়াছে তা'র চটুল চাহনি, মিষ্টি সুরের কথা—যাহা সে অনেকদিন নিজের মনে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কৃপণের টাকার সুদের মত সময়ে অসময়ে ভাঙ্গাইতে পারিবে। তা'ছাড়া শ্যামলী বলিয়াছে 'তাহার বউ নূতন কাপড় পরিয়া সখ মিটাইতে পারিবে, নূতন নূতন কাপড় পরিতে নাকি মেয়েরা ভারী আনন্দ পায়'—এই কথাগুলি মনোরঞ্জনের কাছে যেন কেমন একটু দ্ব্যর্থ-বোধক বলিয়া মনে হওয়ায় তাহাকে আরও ভাবাইয়া তুলিল।

সময় পাইলেই মনোরঞ্জন তাই ভাবে শ্যামলীর এই কথাগুলি। কিছুদিন আগেও কি করিলে দোকানের উন্নতি হইবে উহাই ছিল মনোরঞ্জনের একমাত্র চিন্তা, কিন্তু আজ মনোরঞ্জনের সমস্ত মন জুড়িয়া শ্যামলীর কথাগুলির এক নিরবচ্ছিন্ন অভিযান চলিয়াছে। সে অভিযানে শেষ পর্য্যন্ত মনোরঞ্জন বিজীত। বিজীতের সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শ্রোতার অভাবে নিজের মনে মনেই আবৃত্তি করিতে থাকে মনোরঞ্জন।

মানসিক এই বিশৃঙ্খলার যবনিকাপাত হইতে অবশ্য বেশী সময় লাগিল। মনোরঞ্জন দোকানে বসিয়া আছে এমন সময় প্রেসিডেণ্টবাবু আসিয়া সোনার জলে প্রজাপতি-আঁকা একখানি চিঠি তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "পরশু শ্যামলীর বিয়ে—এই হঠাৎ ঠিক হ'য়ে গেল। তুমি অবশ্যই যাবে কিন্তু মনোরঞ্জন। আর—হ্যাঁ, আজই বৈকালে শ্যামলী আর তা'র মা তোমার এখানে এসে বিয়ের যাবতীয় কাপড় নিয়ে যাবে।—তুমি দোকানে থেক।"

বিবাহের আগের দিন দোকানের সব চেয়ে মূল্যবান বেনারসী শাড়ীখানি নিয়া মনোরঞ্জন শ্যামলীদের বাড়ী গেল। বিবাহের আয়োজন চলিতেছে বাড়ীময়। লোকজনের আসা-যাওয়া এবং কথাবার্ত্তায় একটা গুঞ্জরণ উঠিয়াছে প্রেসিডেণ্টের বাড়ীকে কেন্দ্র করিয়া। মনোরঞ্জনের ইচ্ছা সে নিজ হাতে কাপড়খানি শ্যামলীর হাতে তুলিয়া দেয়।

দূর হইতেই শ্যামলী দেখিয়াছিল মনোরঞ্জনকে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া শ্যামলী বলিল, "তুমি এসেছ মনোদা! বস, যেওনা যেন আবার। তোমার জন্যে চা করে নিয়ে আস্‌ছি।"

চা ও খাবার নিয়া শ্যামলী ফিরিয়া আসিলে মনোরঞ্জন তাহার হাতের কাপড়খানি শ্যামলীর হাতে দিয়া বলিল, "তোমার বিয়েতে এটা আমি তোমাকে দিচ্ছি।"

—তা' আজ্‌কে কেন?

—আমি দোকানদার মানুষ। কখন সময় করে উঠতে পারি ঠিক বলা যায় না—তাই আগে থেকেই এটা দিয়ে যাচ্ছি। বিয়ের আসরে কালকে সাজিয়ে রাখলে মানাবে ভাল।

—কিন্তু তা' থাক্। তুমি কিন্তু কাল্‌কে আসবে—আসবে তো মনোদা!

* * * *

বিবাহের দিন মনোরঞ্জন দোকানের কাজে মন দিল অনেক বেশী, এমন মন সে বিগত কয়েক মাসের মধ্যে দিতে পারে নাই। শ্যামলীদের বাড়ী মনোরঞ্জনের দোকান হইতে খানিকটা দূরে, কিন্তু তবুও মনোরঞ্জন তাহার দোকানে দৈনিক জমাখরচ লিখিবার সময় যেন নহবতের পরিষ্কার সুর শুনিতে পাইতেছিল। আর শুনিতে পাইতেছিল বিবাহ বাড়ীর হৈ-চৈ, মেয়েকে বিবাহ বাসরে আনিবার জন্য হাকডাক্। দোকানের জমাখরচ লেখা শেষ হইলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনোরঞ্জন তাহার হৃদয়ের জমাখরচ করিতে বসিলে দেখিল, প্রেসিডেণ্টবাবুর এই জামাতা, প্রফেসর অমিয় রায়, আজ তাহার যাহা খরচ করাইল এমন খরচ মনোরঞ্জনের জীবনের দোকানদারীতে আর কোন দিনই হয় নাই।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আন্দামানে বাস্তুহারা পুনর্ব্বসতি

দেড়লক্ষ কৃষিজীবী বাস্তুহারাকে বর্ত্তমানে আন্দামান দ্বীপে কিরূপে পুনর্ব্বসতি করানো যায় এবং কেবলমাত্র কৃষির সাহায্যে কিরূপে ধান, কড়াই ও তরী-তরকারীর দ্বারা তাহারা বিত্তশালী হইয়া প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সরকারী বিবরণ ও বাস্তব বাবস্থাপনা হইতে গত সংখ্যায় বিশদ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। আন্দামানের উর্ব্বর জমীতে বিঘা প্রতি গড়ে দশ মণ ধান জন্মায় এবং ডাল, কড়াই, রাঙা আলু, মৌ-আলু, সুপারি, নারিকেল ও কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবি লেবু ইত্যাদি যাবতীয় লেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। গোল-আলু, ইক্ষু, লম্বা আঁশের তুলা, রবার, ইত্যাদির আবাদ করিয়া ভালো ফল পাওয়া গিয়াছে। এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থা দেখিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে চা, পাট, কফি ও তামাক চাষও সম্ভব। তবে এ বিষয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা এখনও বাস্তবে করিয়া দেখা হয় নাই। এ ছাড়া এখানে মাছের কারবার এবং নারিকেল তেল, দড়ি ও ছোবড়ার (choir) শিল্প ঘরে ঘরে প্রবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনাও প্রচুর। নরম কাঠ (soft wood) প্রচুর পরিমাণে থাকার জন্য পেন্সিল, কলম, সস্তা দর বাক্স ইত্যাদি এবং বাঁশ, বেত ও মাদুর কাঠির প্রাচুর্য্যের জন্য বাঁশের ও বেতের জিনিষ এবং মাদুর তৈয়ারী করারও বিশেষ সুবিধা আছে। ২২ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটি মোটামুটি ভূতাত্ত্বিক পর্য্যবেক্ষণ হইয়াছিল এবং তাহাতে দেখা গিয়াছে যে এখানকার ভূস্তরে সোনা, কিছু পরিমাণ কয়লা, চুণা পাথর এবং অভ্র খনিও আছে। তবে এ বিষয়ে আরও গভীর ভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজনীয়। আন্দামানের চিফ কমিশনার শ্রী এ. কে. ঘোষ মহাশয়কে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫০-এ কলিকাতার আউটরাম ঘাটে যে চা পার্টি দেওয়া হইয়াছিল সেইখানে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ আন্দামানের ভূস্তরে পেট্রল আছে। তিনি ইহার প্রাথমিক পরিচয় পাইয়াছেন এবং শীঘ্রই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করিয়া বিশদ অনুসন্ধান চালাইয়া দেখা হইবে যে, এই দিক দিয়া আন্দামানের সম্ভাবনা কিরূপ আছে। এ-ছাড়া এখানকার সামুদ্রিক অংশে Mother of Pearl মুক্তা, প্রবাল এবং পাখীর বাসা (Bird's Nest) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। খাদ্য হিসাবে পাখীর বাসার মূল্য এবং চাহিদা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধেই ইতঃপূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

ধান এবং অন্যান্য তরি-তরকারীর আবাদ সম্বন্ধে আন্দামানের ভূমিতে পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট পরীক্ষা করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে ২,৪৯১ একর জমীতে ধান চাষ হইয়াছিল এবং উহা হইতে ৩৭,৬৬৫ মণ চাউল পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৪৯ সালে ৪,১০৯ একর জমীতে ধান বুনিয়া ৬৫,২৭০ মণ চাউল উৎপাদিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহা ছাড়াও আরও ১৪৪০ মণ চাউল এবং ৯০০ টন গম ঐ বৎসর বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। এই পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করার মূল কারণ এই যে, এখানকার অধিবাসীগণ কৃষি অপেক্ষা শ্রমিকের চাকুরী করাকেই অধিক লাভজনক বলিয়া মনে করে এবং জমীর দিকে ইহারা তেমন নজর দেয় না। অন্যথায় ৪,১০৯ একর জমী হইতে ৬৫,২৭০ মণ চাউল উৎপাদন একেবারেই কম নহে। তরি-তরকারী ও ফলের দিক হইতে দেখা যায় যে, একমাত্র গোল আলুই কিছু পরিমাণ বাহির হইতে আমদানী করা হয়, বাকী সমস্তই এখানে উৎপন্ন হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ্চ মাসে পোর্টব্লেয়ারে যে কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে আলু, কপি, টোমাটো, বীট ইত্যাদি খুব সুন্দরভাবে জন্মিয়াছে। অবশ্য এগুলি এই প্রথম এখানে উৎপাদিত হইল, কিন্তু প্রথম চেষ্টাতেই ইহা সবিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। এ ছাড়া এখানে নারিকেল, সুপারী, পেঁপে, কলা, ডালিম, লেবু ইত্যাদি অযত্নেই প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এখানকার রাঙা আলু ও মৌ-আলুর চাষ জাপানী আমলে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছিল এবং জাপানী অধিকারের শেষ দিকে যখন খাদ্যশস্যের নিদারুণ অভাব হইয়াছিল, তখন স্থানীয় মৌ-আলু এবং নারিকেলই এদেশের লোকের প্রাণ বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত বাস্তুহারা এখানে আসিয়া চাষ আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের ক্ষেতের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সম্ভবতঃ আগামী বৎসর হইতে আন্দামানে আর কোন খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইবে না।

ইক্ষু চাষ সম্বন্ধে আন্দামানের সুবিধা বিশেষ ভাবেই আছে। এখানকার জলবায়ু ও মাটীর অবস্থা অনেকটা জাভা ও মরিশাসেরই মত। কোয়েম্বাটোর ধরণের আখ (Suger Cane of Coimbatore type) এখানে অযত্নেই প্রচুর পরিমাণে জন্মায় এবং ঐ আখ হইতে বর্ত্তমানে গুড় তৈয়ারী হয়। তবে এখানকার স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় গুড় খুব বেশীদিন রক্ষা করা যায় না এবং এখানকার লোকেরা ঐ গুড় হইতে লুকাইয়া মদ চোলাই করিতেই অভ্যস্ত। উপযুক্তভাবে চিনির কলের ব্যবস্থা করিলে এখানকার আখ হইতে প্রচুর চিনি উৎপাদন করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞগণের মতে মধ্য আন্দামানে একটি চিনির কল বসাইলে ইক্ষু চাষ ও চিনি উৎপাদন বেশ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইবে।

রবার চাষ এদেশের মাটীতে বেশ ভালো ভাবেই হইবে এবং এই বিষয়ে আন্দামান—মালয় বা সিংহলের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেও পারে। বর্ত্তমানে আমরা কতকগুলি রবারের বাগান দেখিলাম। গাছগুলি ভালো ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলি সমস্তই Bamboo Flat হইতে

নরনারীতে প্রাধান্য দিয়াছেন ও সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গতিই যদি সত্য হয়, তবে সত্য অবিকল হইতে পারে কিরূপে? শরৎচন্দ্র গতিকেই সত্যরূপে দেখিয়া বলিতেছেন—"এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া নিত্য কোন বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যুগে যুগে মানুষের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্ত্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

তোমরা বল চরমসত্য, পরমসত্য—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান।...তোমরা ভাব মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত সনাতন অপৌরুষেয়! মিছে কথা। মিথ্যার মতোই মানব জাতি একে অহরহ সৃষ্টি ক'রে চলে। শাশ্বত সনাতন নয়—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।"

এই মতবাদ তিনি রচনায় প্রচার করিয়াছেন। তিনি 'মিথ্যা ভক্তির মোহে' বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব ধরণধারণ চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি ত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার বস্তুতে আবদ্ধ না হইয়া বিনাদ্বিধায় সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া নূতন সৃষ্টির আনন্দে নূতন পথ ধরিলেন—ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

তাহার সমস্ত রচনা এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে বিষয়টা অনেক সহজ হইয়া যায়।

সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তী থাকিলেও রসসৃষ্টিতে মৌলিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'পরিচয়' পত্রে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের মাত্রা' প্রবন্ধের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র বলিতেছেন—

"কবি বলছেন—উপন্যাস সাহিত্যে মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে উপন্যাস সাহিত্যে মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে'—তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজীর দিয়ে?

... * গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না, কিম্বা বিশুদ্ধ কাব্য লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জ্জন দেবার প্রয়োজনও নেই।'

কথাসাহিত্যের ক্ষমতা অসীম, একটু ইঙ্গিত একটা বিজ্ঞ প্রবন্ধের অপেক্ষা অনেকসময় কার্য্যকরী, যেমন ইটের টুকরো আর থান ইট। কথাসাহিত্যিককে তাই আমরা শিল্পী বলি। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত যে রিয়ালিষ্টিক যুগের মধ্য দিয়া চলিয়াছি, তাহার প্রথম প্রভাত বঙ্কিমচন্দ্র সূচনা করিলেও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে রূপ দিয়াছেন ছোট গল্প ও উপন্যাসের দ্বারা—এবং ইহাই শতদলে বিকশিত হইয়াছে শরৎ-সাহিত্যে। জাতিভেদ ও গোঁড়াসমাজের এবং ভণ্ডামিরও নির্ম্মম অর্থহীন সামাজিক সংস্কার ও শাসনের বিরুদ্ধে অভিযানে শরৎচন্দ্র কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে (Type) সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহাদিগকে সমাজে, গৃহকোণে, পথে বিপথে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই হিসাবে তাহার কয়েকটি রচনা classic হইয়া গিয়াছে। তাঁহার Style তাঁহার শ্রেষ্ঠ বিভূতি। 'Style is the man" তাঁহার টেক্‌নিক্ তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

তাঁহার 'কবিচিত্ত'কে তাঁহার সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদানত করেন নাই; কথাগুলি আসিল তাঁহারই রচনা হইতে—যেখানে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র রোহিণীর শোচনীয় পরিণামের প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"হিন্দুত্বের দিক দিয়ে পাপের পরিণামের বাকী আর কিছুই রইল না। ভালই হ'ল। হিন্দুসমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লো। কিন্তু আর একটা দিক? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন—নরনারীর হৃদয়ের গভীরতম গূঢ়তম প্রেম?—আমার আজও মনে হয়, দুঃখ সমবেদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুই চোখ অশ্রু পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, মনে হয়, তাঁর কবিচিত্ত যেন সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির পদতলে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে"

গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর প্রেম 'গভীরতম গূঢ়তম' হইলে কি অত অকস্মাৎ নিশাকরের প্রতি transfer হইত? বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

চিরপ্রেম নিত্য যেন একটি বন্ধন লয়ে
ফেলে দিলে কালস্রোতে অনন্তে চলিল বহে
ধরণী কল্পনা বধির মেহ, সতীপ্রেমে পূর্ণ দেহ
শত ফুটে এ দুহার পাশ।

নবীন সেন বলিয়াছেন—"প্রেম শিব প্রেম শক্তি প্রেম নিরবাণ"।

শরৎচন্দ্র জননীর স্নেহ, সতীর প্রেম অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তিনি Genius—তিনি মানবত্বের পূজারী। Swinburne-এর Hymn to Man 'glory to man in the highest' 'for man is the master of things"—

Milton-এর "Human face divine" মানব বন্দনায় যে অর্ঘ্য রচিয়াছিল, শরৎচন্দ্র তাহার সাহিত্যে সেই অর্ঘ্য শত উপচারে সাজাইয়া বলাইয়াছেন 'সবার উপর মানুষ সত্য—তাহার উপরে নাই'। বহুবিধ অভিজ্ঞতার ফলে জীবনকে একটা নূতনদিক হইতে দেখিয়াছেন; যাত্রাপথে অন্ধকার আবর্জ্জনাসংকুল কুটিল পথরেখা তাহার চোখে পড়িয়াছে। সমাজের ক্ষতস্থান দেখিয়া মুখ না ফিরাইয়া সহানুভূতির প্রলেপ দিয়া পরে ক্ষতের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। জীবনকে বিস্তীর্ণভাবে দেখেন নাই, ছোট করিয়া দেখিয়াছেন—গভীরভাবে সমগ্র হৃদয় মন দিয়া বুঝিবার জন্য। অনুভূতি বিনাসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। দুঃখই বেশীর ভাগ দেখিয়াছেন—কিন্তু ইহার দার্শনিক মীমাংসার দিকে যান নাই, কিম্বা দুঃখকে তিরস্কার করেন নাই। নারী চরিত্রে দেখাইয়াছেন সজীবতা, সাহস ও সত্যশক্তির সহিত মাধুর্য্য ও কোমলতার অপূর্ব্ব সমন্বয়—পতিতার মধ্যেও দেখাইয়াছেন তাহাদের অন্তরের ঐশ্বর্য্য, সুকুমার বৃত্তি নিচয়ের লীলা, নৈতিক উন্নতির অভিলাষ। সমাজের নিম্নস্তরের নরনারী তাঁহার করুণা ও সহানুভূতিকে প্রবল আকর্ষণ করিয়াছিল; তাই তিনি আত্মভোলা যৌবনের প্রাণ প্রাচুর্য্যে যাহা একান্ত বাস্তবরূপে অনুভব করিয়াছিলেন তাহাই রূপায়িত করিলেন সাহিত্যে। তখন তিনি

বিচার করিয়া দেখেন নাই ইহাতে 'মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হইবে কিনা'। এ সম্পর্কে তিনি নিজে লিখিয়াছেন—(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংগ্রহ।

"নানা অবস্থাবিপর্যায়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল * * * তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্ম্ম মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়—আমার লেখা কোন দিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তা আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হ'য়ে উঠেছে আমার বিরুদ্ধে তাদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।"

"এ ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার করেও দেখিনি, শুধু যেদিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম, তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা, এ চিন্তা আমার নয়।"

অন্যত্র—'চরিত্র সৃষ্টি কি এতই সহজ?···আমি ত জানি, কি ক'রে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করিনে কিন্তু বাস্তব অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত বাধা, কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হ'য়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে, আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই—ও বস্তু এদের অনেক নীচে। এদের গণ্ডগোল করতে দিলে···নীতিপুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।"

এই সূত্রে একটি পত্রের বিষয় সামান্য উল্লেখ করিব। "চরিত্রহীনে" মেসের ঝি লইয়া প্রেম সম্বন্ধে রচনাটির পাণ্ডুলিপি তাহার বন্ধুমহলে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন পাইতে না দেখিয়া শরৎচন্দ্র তাহার মাতুল (মাতা ঠাকুরানীর খুড়তুত ভাই। প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক 'বিচিত্রা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী মহাশয়কে রেঙ্গুন হইতে ১৩১৯ সালের ১০ই মে লিখিয়াছিলেন—* * * * তাহারা বোধ করি manuscript পড়িয়া কিছু ভয় পাইয়াছে। তাহারা সাবিত্রীকে 'মেসের ঝি' বলিয়াই দেখিয়াছে। যদি চোখ থাকিত এবং কি গল্প কি চরিত্র কোথায় কি ভাবে শেষ হয়, কোন্ কয়লার খনি থেকে কি অমূল্য হীরা মাণিক ওঠে তা যদি বুঝিত, তাহা হইলে অত সহজে ওখানা ছাড়িতে চাহিত না··· লোকে যতই কেন নিন্দা করুক না, যারা যত নিন্দা করিবে, তারা তত বেশী পড়িবে। ওটা ভাল হোক মন্দ হোক, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে পড়িতেই হইবে। যারা বোঝে না, যারা Art এর ধার ধারে না তারা হয়ত নিন্দা করবে। কিন্তু নিন্দা করলেও কায হবে। তবে ওটা Psychology এবং Analysis সম্বন্ধে যে খুব ভাল তাতে সন্দেহ নেই। এবং এটা ("চরিত্রহীন") একটা সম্পূর্ণ Scientific Ethical novel, এখন টের পাওয়া যাচ্ছে না।" পরে শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীনের' ভূমিকায় বলিয়াছেন "চরিত্রহীনের" গোড়ার অর্দ্ধেকটা লিখেছিলাম অল্পবয়সে, তারপরে ওটা ছিল প'ড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিলনা প্রয়োজনও হয়নি। প্রয়োজন হ'ল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখ্‌তে পেলাম বাল্যরচনার আতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ সংস্কারের সময় ছিল না—

—ওটা ঐ ভাবেই রয়ে গেল।

বর্ত্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্ত্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।"

ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে লিখেন :—

"··· অনেকে এইটুকু কেন ভুলে যান যে, সাবিত্রী সত্যই ঝি-class এর মেয়ে নয়। পুরাণে আছে একবার লক্ষ্মীদেবীও দায়ে পড়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করেছিলেন। সকল সম্প্রদায়ের মত গণিকাদের মধ্যেও উঁচু নীচু আছে। গণিকার কাছে যে গণিকা দামী হয়ে আছে, তার চালচলন এক না হতেও পারে। এদের দেখা পাওয়া সহজ, কিন্তু এদের জানার পথে অনেক বাধা"

এই প্রকার defence এ case টা দুর্ব্বল হইল কিনা ভাবিবার বিষয়। শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সাহসী ও sensitive ছিলেন, তার উপর ছিলেন অকপট। এজন্য অনেক কিছু সহ্য করিতে হইয়াছিল।

পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে সতীত্বের চেয়ে বড় করিয়া শুধু দেখেন নাই—স্পষ্ট ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—'সতীত্বের ধারণা চিরদিন এক নয়, পূর্ব্বেও ছিল না, পরেও হয়ত একদিন থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব ঠিক একই বস্তু নয়, এ কথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি না স্থান পায় ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়?···এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে রুশসাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখদুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে"। ["সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি"]

পাশ্চাত্য সাহিত্যের একাংশে বিবাহিত জীবনকে Sex slavery বলা হইয়াছে—এবং সাপ তাহার খোলস পরিত্যাগ করিতে না পারিলে মরিয়া যায় সেইরূপ সমাজ তাহার জীর্ণ বন্ধন ত্যাগ না করিলে শুকাইয়া মরিবে এবং বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা সুপ্রাচীন ক্রিশ্চান ধর্ম্মযাজক দলের বাণী হইতে প্রচার করা হইয়াছে। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে বিবাহিত জীবনের (সুতরাং সমাজের) বন্ধন ইহা সভ্য সমাজে এখনও স্বীকৃত হইতেছে। Lawrence এর পুস্তক পাঠ করিয়াও কোন সমাজ কল্যাণকামী সাপের খোলস পরিত্যাগের কথায় আমল দিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। শরৎ সমিতি কর্ত্তৃক আহূত এক স্মৃতিসভায় বাংলার প্রদেশপাল মাননীয় ডাঃ কাটজু মহোদয় বলিয়াছেন যে ১৯৪১ সালে

অতিবাহিত করতে হবে আকাশে। ভোর সাতটায় কলিকাতা হতে যাত্রা করে পরদিন বেলা একটার সময় লণ্ডন বাতাসবন্দরে পৌঁছিব। কী কাণ্ড! একশো বৎসর পূর্বে মানুষ উইল করে কাশী যাত্রা করত। আর আজ সাড়ে ত্রিশ ঘণ্টায় মানুষ প্রায় সাত হাজার মাইল দূরে পৌঁছে মধ্যাহ্ন ভোজন করে। মানুষের কৃতিত্বে শ্রদ্ধা বাড়লো। এর মধ্যে একটা প্যাঁচ ছিল, প্রথম উত্তেজনায় সেটা হৃদয়ঙ্গম করিনি। বিলাতের বেলা একটা—কলিকাতায় বেলা সাড়ে ছটার সময়। পশ্চিমে যেতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় পিছিয়ে পেয়েছি। মানে, কারণ লণ্ডনে সূর্য উদয় হবেন কলিকাতা হতে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পরে।

দেখলাম অন্ততঃ আধ-ঘণ্টা করে ভূমিস্পর্শ করতে পারব— পাকিস্তানের করাচীতে, ইরাকের বাসরায়, মিশরের কায়রোয় এবং ইটালীর রোমে। আকাশ-পোত নামবার সময় নীচে উড়ে পাক খেয়ে নামে। সে সময় ঐ সব সহরের আকৃতি দেখবার আশা ছিল প্রাণে।

এই ব্যাপারগুলো ঘটবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। এ ব্যাপারে যদি কল্পনা—আরব্য উপন্যাস, মিশরের ইতিহাস, রোমের ঐতিহাসিক শিল্প স্থাপত্য গৌরব ও সৌন্দর্য মিলিয়ে চিত্রপটে নানা চিত্র অঙ্কিত করে, মনকে দোষী করা যায় না। যাত্রার পূর্বে পর্যটক ভাবনায় যে চিত্তাকাশে নিশার স্বপন বপন করেন, পরে আকাশ-কুসুম চয়ন করতে হয়। সে আকাশ কুসুম কোনোদিন হয় কল্পিত পুষ্প হ'তে মনোরম, কোনোদিন হয় একেবারে গন্ধহীন, সৌন্দর্য্য-বিহীন।

কিন্তু আমার এ যাত্রায় বাস্তব অনেক ক্ষেত্রে কল্পিত রূপের অনুরূপ না হলেও, ভাগ্য বিরূপ হ'য়ে আমাকে বদ্-খেয়ালী প্রতিপন্ন করেনি। পূর্বের অভিজ্ঞতা ছিল ৬০০০, ৭০০০ ফুট উপরের পথের। এক একবার এদেশের প্লেন দশ হাজার ফুট অবধি ওঠে। আকাশের সে উচ্চতা হতে পাহাড়ের উপরে পরেশনাথ মন্দিরকে ছোট একটি শিশুর কাগজের খেলা-ঘর রূপে দেখা যায়। রেলপথে খেলা-ঘরের গাড়িও দৃষ্টিপথে পড়ে। জলাশয়, নদী, সাগরের ঢেউ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু চৌদ্দ, পনেরো হাজার ফুট হ'তে ছোটনাগপুরের কেন, রাজপুতানার আরাবল্লী পাহাড়ও অসমতল মাটির ঢিপির মতো দেখায়। অবশ্য রাজপুতানার মরুভূমির বিস্তৃত রূপ বেশ উপলব্ধি করা যায়। উপর হতে যেমন মসৃণ ও সমতল দেখায়, প্রকৃত পক্ষে মরুভূমি তেমন সমতল নয়। কারণ বাতাস উড়িয়ে বালুরাশি নিয়ে কোথাও স্তূপ নির্মাণ করে, কোথাও গর্ত খোঁড়ে। মরুভূমি একেবারে বৃক্ষহীন নয়। কারণ মনসাগাছ প্রচুর জন্মে বালির উপর। পুরীর সাগর তীরে ফণি মনসার জঙ্গল শ্রীক্ষেত্রের সকল যাত্রীকেই অল্প বিস্তর কণ্টকবিদ্ধ করে।

যাবার পথে আরবের মরুভূমি পার হ'য়েছিলাম রাত্রে। কিন্তু ফেরার পথে তার স্পষ্ট রূপ দৃষ্টে উঠেছিল। মনে হয় মরুভূমির মাঝে কোনো দুষ্ট ছেলে বালির পাহাড়, উপত্যকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। সূর্যের আলোয় চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করছে বর্ণহীন অবিরাম বালির অফুরন্ত বিস্তৃতি। বালির গিরিশৃঙ্গ—পূর্বদিক সূর্য্য কিরণে তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণ, পশ্চিম দিকে ঘন ছায়া। এক এক স্থলে মনে হয় যেন মানুষ বালি জড় করে বড় বড় গাছের আকৃতি গড়েছে বালিয়াড়ির উপর। এক এক স্থলে অতি ক্ষুদ্র নগণ্য একটু সবুজের জোট বাঁধা ক্ষেত্র। মাঝে জল চিক্ চিক্ করছে। সেগুলো মরীচিকা, কি প্রকৃত ওয়েসিস্—তা নিশ্চিত-রূপে বলা যায় না। কিন্তু অফুরন্ত বালিয়াড়ির মাঝে ক্ষুদ্র সবুজ ছবি মনোরম। তার পর কল্পনা করতে হয়, তার মাঝে আছে বেদুইনের তাঁবু, তার ঘোড়ার পাল, কুব্জপৃষ্ঠ উট, খেজুরের চাটাই, উটের চামড়ায় বাঁধা জলের মুষক। চকচকে বিস্তৃত বালুকা-ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই তে-কাটা মনসা, ফণিমনসা প্রভৃতি ক্যাকটাস আছে। যে আকাশ-পথিকের ভ্রমণ-পথ চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চে, তার দৃষ্টিপথে আত্ম-প্রকাশ করবার মত কোনো গাছেরই আকৃতি বা আয়তন নয়। মনসা বৃক্ষ তো উদ্ভিদ জগতের শ্রেষ্ঠ বা ভীমকায় অধিবাসী নয়।

আকাশ পথ হতে পাহাড়ের দৃশ্য বড় মনোরম। আমরা সমতল ভূমি হতে পাহাড়ের অতি সামান্য অংশই দেখতে পাই। কারণ অদ্রির উপর অদ্রি, অদ্রি তদুপর দৃষ্টি শক্তিকে রোধ করে। কিন্তু আল্‌প্স পর্বতের যে সব শিখর দশ বা বারো হাজার ফুট ঊর্দ্ধে তার দুই বা তিন হাজার ফুট উপর ওড়বার সময় আল্‌প্‌স্ গিরির সমস্ত আয়তনটি দেখতে পাওয়া যায়। গিরি শৃঙ্গ

বরফে ঢাকা—সাম্নেদেশ হ'তে উপরে ঘাড় তুলে দেখা নয়, উর্দ্ধপথ হ'তে মাথা নীচু ক'রে নিচে দেখা—এক অভিনব অভিজ্ঞতা। সেই বরফের পাহাড় হ'তে ঝরণারা একত্র হয়ে ক্ষুদ্র গিরিনদী সৃষ্টি করছে। আবার পাহাড়ী নদী একত্র হয়ে উপত্যকায় বহিছে স্রোতস্বতী রূপে। এ সব দৃশ্য সত্যই কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায়। সমগ্র পশ্চিম সুইটজারল্যাণ্ডের আকৃতি—তার গিরি, নদী, হ্রদ, সহর বেশ বোঝা যায়। মনে হয় একখানা বড় পটে আঁকা মধুর এক চিত্র দেখছি নিচে।

এ অভিজ্ঞতা কতক লাভ হয় পাহাড়ের উপর হতে নিম্নে সমতল ভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। পরেশনাথ পাহাড়ের উপর হতে এ দৃশ্য যেমন দেখা যায়, ঘুমের স্টেসনের নিকট হতে বা খরসাং হতে তেমন দেখা যায় না। কারণ হিমালয়ের উচ্চাংশ হ'তে মাত্র একদিকের দেশ দেখা যায়। তিনদিক পাহাড়-চাপা। মুশৌরী হ'তে রাত্রে দেরাডুনের আলো চমৎকার দেখায়। কিন্তু অন্যদিকে পাহাড় ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। চেরাপুঞ্জি হ'তে একেবারে পায়ের নিচে একদিক দিয়ে আসামের কতক অংশ দেখা যায়। কিন্তু এরোপ্লেন সমগ পর্বতের উপর দিয়ে চলে তাই আরোহীর দৃষ্টির পরিধি বহুদূর বিস্তৃত হয়।

এবার ফেরবার পথে আমাদের উড়ো জাহাজ করাচী হ'তে দিল্লী গেল এবং দিল্লী হ'তে এলো কলিকাতা। দিল্লী পৌছিলাম সকালে। করাচী ছাড়লাম অতি প্রত্যূষে। প্রভাত ছিল উজ্জ্বল। সাদা কালো মেঘের টুক্‌রা উত্তর ভারতের নীল আকাশকে স্থানে স্থানে আবৃত ক'রে দৃষ্টিকে বিব্রত করেনি। বি ও এ সির আরগোনট প্লেন প্রায় পনেরো হাজার ফুট উপরে উঠ্‌লো—উচ্চাশা তিন ঘণ্টায় দমদম পৌছে দেবে। দেশে ফেরার উত্তেজনা বেগবান করলে মনোরথকে। দেশের কথা, দশের কথা, বিলাত ভ্রমণের গল্পের শ্রোতাদের কথা মনে হ'ল। একান্ত নিবিড় নিজস্ব আনন্দের প্রতীক্ষা আলোড়িত করলে চিত্তকে। ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলনের রঙিন ছবি ছায়া বাজির মত মনের পটে ভাসতে লাগলো সচল ভঙ্গিতে। একজন এখানকার বড় কারখানার বড় সাহেব দিল্লী হ'তে যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বল্লেন—হোম্ এট লাষ্ট।

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। বল্লাম—ঠিক্ বলেছেন মশায়, আপনাদের যেমন বিদেশের অস্বোয়াস্তি, আমার তেমনি দেশে ফেরার স্ফূর্ত্তি।

ভদ্রলোক বল্লেন—কার হোম ? আমি মোটেই আপনার কথা ভাবছি না। নিজের কথা ভাবছি। যদি বারো বছর ভারতবর্ষ জলবায়ু রুটি মাখম খাইয়ে আমার হোম না হয়, তা হ'লে তার মাধুরী কোথায় ?

গল্পে যোগ দিলেন এক স্কচ্ সাহেব। তিনি বল্লেন—এই লোকের বাইশ বছরের হোম। তোমরা তাড়িয়ে না দিলে এ দেশ ছাড়ব না।

তিনি এক প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্কের উর্দ্ধতন কর্মচারী। আমাদের গল্প শুনছিল দুটি ইংরাজ যুবক আর একটি যুবতী। নর দুটি চা বাগানে কাজ পেয়েছে। নারীটির বড় ভাই থাকে এক চা বাগানে। এরা তিন জন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। অথচ প্রত্যেকে আমার সঙ্গে ভাব ক'রে ভারতবাসের সুখদুঃখের সম্ভাবনার কথা যাচাই করেছে। আমি আরবের বহরিনে তাদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলাম। তখন ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশ্‌লো।

আমাদের দিল্লীর গল্প এরা শুনছিল এবং হাসছিল। আমার সেই সহযাত্রীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করে দিলাম।—কোম্পানীর বড় সাহেব বল্লেন—ইয়ং মেন। যদি জীবনকে মধুর করতে চাও ভারতবর্ষকে হোম ভেবো। তোমাদের বয়সে আমরা ভারতীয় ভৃত্যদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করেছি—এঁরাও করতেন। এখন তাদের প্রতি ব্যবহার করবে ইংরাজ ভৃত্যদের অনুরূপ। থ্যাঙ্ক ইউ এরা বুঝবে না। প্রতি কাজে বলবে—ঠিক হায়।

যুবতী মুখস্থ করলে—টিক্ আয়। আমরা হাসলাম।

আকাশে ওড়বার আধঘণ্টা পরে সেই ইংরাজ তরুণী উত্তরদিকে তাকিয়ে বল্লে—ঐ কি হিমালয় ! কী সুন্দর !

সুন্দরের উপলব্ধি নর হ'তে নারীর অধিক। কিন্তু কোনো পাঠিকা যদি ভাবেন যে দেখিয়ে দিলে আমরা তুষার-শুভ্র পক্কশির হিমালয়ের বিশ্ব-বিমোহন রূপে মুগ্ধ না হই, আমি তাঁর মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার প্রশংসা করব না। ত্বরায় ভুলে গেলাম বাড়ি ফেরা, নাতি-নাতিনীর হাসি-মুখ, তাদের বিলাত হ'তে আনা উপহারের কে কোন্‌টা নেবে তার ঝগড়া। চিরজন্ম ছুটি

পেলেই পাহাড়ে গিয়ে যাদের দেখতাম—ফুটে উঠলো তারা নয়নপথে। প্রভাত-রবির উজ্জ্বল করে তাদের শ্বেত অঙ্গ ঝলসাতে লাগল। কেদার, বদ্রী, ত্রিশূল, চৌখাম্বা, নন্দাদেবী, কামেতের-চূড়া, সারা উত্তর জুড়ে মনকে সমৃদ্ধ করলে। আমাদের পরিচিত শৈলপুরীরা দৃষ্টিপথে পড়লো—অবশ্য তাদের স্পষ্ট রূপ ফুটলো না। যাত্রা শেষের আনন্দ।

ক্রমশঃ পাহাড় হারিয়ে গেল। ফুটে উঠলো সরু ফিতার মত গঙ্গা যমুনা, আর অতি ক্ষুদ্র শিশুর খেলাঘরের মতো সহরগুলা।

আকাশ-রথে পাহাড়ের যে রূপ দেখা যায় সে রূপ ধরার পথে দেখা যায় না। আবার মাটির পথে নদী, নালা, খাদ ও বনানীর যে দৃশ্য দেখা যায় আকাশ পথে সে সৌন্দর্য্যের পরিচয় লাভ হয় না। মহীশূর হ'তে উটি যাবার রাস্তায় কত বন্য হরিণের পাল জঙ্গলের এক অংশ হ'তে অপরদিকে ছুটে যায়। সে উত্তেজনা বড় কম নয়।

যখন আল্‌প্‌সের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন আকাশ-পোতের কাপ্তারেরা জানালে যে বাহিরের বায়ুর উত্তাপ শূন্য ডিগ্রী হতে তিন ডিগ্রী কম, কিন্তু জাহাজের ভিতরের তাপ সমান থাকে ৬০ থেকে ৭০।

আকাশ-রথ যে সহরে নামে তার সম্যক আকৃতি বিশেষভাবে দেখা যায়। চৌদ্দ হাজার ফুট নামতে এরোপ্লেনকে ঘোর পাক খেতে হয়। অনেক সময় বাতাস বন্দরের সঙ্কেত যথাসময় পাওয়া যায় না, অন্য পোতের নামা ওঠার জন্য। তখন আকাশ-রথ সহরের উপর ঘোরে। এসময় সমস্ত সহর এবং তার চারিদিকের জমি অতি মধুর চিত্ররূপে আত্ম-সমর্পণ করে আকাশ-যাত্রীর কাছে। রাত্রে সহরের বিজলিবাতির সারি স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় সহরের আকৃতি ও আয়তন। মানচিত্রের মত দৃষ্টি পথে থাকে দেশ, যখন প্লেন নিম্নস্তরের হাওয়ার ভিতর দিয়ে চলে। সমুদ্রতটে তরঙ্গের আছড়ানো, পথের মাঝে লরি ও মোটরগাড়ির দৌড়, উজ্জ্বল তটিনীর সৈকত ও নৌকা—এসব দৃশ্য মনোরম।

প্রাণের ভয়? হ্যাঁ কতকগুলা আকাশ-পোতে ঐ সময় ফ্রান্স ও সুইটজারল্যাণ্ডের পাহাড়ে অপঘাত মৃত্যু ঘটিয়েছে যাত্রীর। যেদিন আমি প্যারিস বেড়িয়ে লণ্ডনে ফিরি—৩১ অক্টোবর—সেদিন সন্ধ্যার পর প্যারিস হ'তে লণ্ডনগামী একখানি বাতাস-পোত নর্থহোল্ট বন্দরে চূর্ণ হয়েছিল।

আমি বেলাবেলি ফেরবার অভিপ্রায়ে প্রাতরাশের পর বেলা দশটায় প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে মধ্যাহ্ন ভোজন করেছিলাম। ফরাসীরা ইংরাজের মত গম্ভীর নয়। ইংরাজ হোটেলওয়ালা মাত্র কাজের কথা কহে। ফরাসী আদর আপ্যায়নে বেশ দক্ষ। প্রভাতে আমার হোটেলের অধ্যক্ষ মহিলা বল্লেন—আপনার আজ সকালের প্লেনে যাওয়া হবে না। আমি এখনি টেলিফোন ক'রে বন্দোবস্ত করছি সন্ধ্যার জাহাজে যাবার। আজ আপনাকে এক নতুন ঐতিহাসিক গির্জা দেখিয়ে আনব। আজ দুপুরে আমার ছুটি আছে।

আমি অবশ্য ইংরাজিতে বল্লাম—করুণা তোমার হৃদয়ে রহিল গাঁথা—কিন্তু—

বলা বাহুল্য তার আপ্যায়নে বিলম্ব করলে—আরও কিছু দিতে হত—বোধার সহিত মাথা।

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

আমার ৩১ তারিখে ফেরবার কথা। সেদিন প্লেন-ক্র্যাশ। পরদিন লণ্ডনের সাংবাদিকের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়লো। কে জানে সে সমাচার কলিকাতায় উপ্‌চে পড়ে মুদ্রিত হ'য়ে বিক্ষোভ তুলবে। তার পরদিন বার্ণাড শ' দেহ রাখলেন। জানি সেই সমাচার ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করবে।

কিন্তু ২রা নভেম্বর ভোরে হোটেলের তুর্কী ভৃত্য দরজায় খট্ খট্ করলে। আমি তাকে প্রবেশাধিকার দিলাম। সে হাতে তার দিলে—পুত্রের তার। স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করতে পারেনি—আমার অপমৃত্যু ঘটেছে কিনা। জানিয়েছে সমাচারের অভাবে বড় উদ্বিগ্ন।

আমি স্বয়ং প্রভাতে পোষ্ট অফিসে গিয়ে তার মুসাবিদা করলাম—বার্ণাড শ' মৃত, আমি জীবিত—চিয়ারিও।

কী ব্যাপার স্যার—জিজ্ঞাসা করলে পোষ্ট অফিসের সাহেব।

আমি তাকে ব্যাপারটা বোঝালাম। ইংরাজ রসিকতা ভালোবাসে। সে তার সহকর্মিণীকে ডাকলে, হাসি হল। শেষে তাদের অনুরোধে তারের কথা পরিবর্ত্তন করলাম। নূতন কাগজে শ্রীমান জয়দেবকে জানালাম যে সুস্থ দেহে স্বচ্ছন্দে আছি।

অপমৃত্যু রেলপথে এমন কি গরুর গাড়িতেও হওয়া সম্ভব। তাই ভারতের সনাতন তুষ্টির কথাই ভালো—ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্রম্।

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

মকর রাশি

আপনার জন্মরাশি যদি মকর হয়, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশের মকর নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন সেই সময় যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে এই রকম ফল হবে।

প্রকৃতি

আপনি চান—যে কোন ব্যাপারে হোক নিজেকে সত্য সত্যই বড় ক'রে তুলতে। নিজের গুণপনা বা কৃতিত্বের জোরে বড় হব, এই হবে আপনার কাম্য। বংশ-পরিচয়ের চেয়ে নিজের নামে পরিচিত হওয়ার উচ্চাভিলাষই আপনার মধ্যে প্রবল।

আপনার ইচ্ছাশক্তি বেশ দৃঢ় হ'লেও, ঠিক একভাবে একই কাজে লেগে থাকতে আপনি ভালবাসেন না, মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন চান। কিন্তু যখন যেদিকেই আপনি আকৃষ্ট হোন, তার মধ্যে আপনার দো মনা ভাব কিছু থাকে না—একান্ত নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে তাতে আত্মনিয়োগ ক'রে থাকেন। বস্তুতঃ একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আপনার স্বভাবসিদ্ধ। এই গুণগুলি সম্যক অনুশীলিত হ'লে, আপনার দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অনেক দুষ্কর কর্ম আপনি সিদ্ধ করতে পারবেন।

দায়িত্ববোধ ও সময়নিষ্ঠার সংস্কার আপনার মধ্যে বেশ পরিণত। যে কাজের ভার আপনি গ্রহণ করেন তা যথাসময়ে শেষ করতে না পারলে, আপনি যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভব ক'রে থাকেন। কিন্তু কাজ যেমন তেমন ক'রে শেষ করতে পারলেই আপনি সন্তুষ্ট হন না, আপনি চান তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তুলতে। আপনার এই মনোভাবের জন্য আপনার মধ্যে একটা খুঁতখুঁতে ভাব প্রকাশ পেতে পারে এবং অনেক সময় সহকর্মীর বা অধীনস্থ ব্যক্তির কাজের সামান্য ভুল-ত্রুটিরও আপনি এমন তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন যে, তাদের কাছে অপ্রিয় হ'য়ে ওঠেন। আপনার এই প্রবৃত্তি একটু সংযত করা উচিত। নইলে সমাজে অপরের সঙ্গে ব্যবহারে আপনার ভাব অনাবশ্যক রকম রূঢ় ও খিটখিটে হ'য়ে পড়তে পারে, যা আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে।

প্রত্যেক জিনিষের বাস্তব উপযোগিতার দিকে আপনার লক্ষ্য খুব বেশী। কাজেই আপনার মধ্যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকলে, গোঁড়ামি না থাকাই সম্ভব। আবেষ্টনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মত বা পথ পরিবর্তন করতে আপনি নারাজ নন, যদি তা যথার্থই শ্রেয়স্কর ব'লে আপনার মনে হয়। কিন্তু কোন হুজুগে মেতে অথবা বিবেকের বিরুদ্ধে নিজের নীতি আপনি ছাড়তে চান না।

নিজের সম্বন্ধে আপনার ধারণা বেশ স্পষ্ট। নিজের শক্তি ও তার সীমা আপনি জানেন। কিন্তু তবুও সময়ে সময়ে আপনার মধ্যে একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, নৈরাশ্য ও বিষাদখিন্নতা লক্ষিত হ'তে পারে। একে বেশী প্রশ্রয় দিলে কিন্তু আপনি লোকভীরু ও কর্মভীরু হ'য়ে উঠতে পারেন, সে সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত।

আপনার আত্মাভিমান প্রবল। নিজের ব্যক্তিগত সম্মান সম্বন্ধে আপনি বেশ সজাগ ও সতর্ক। আপনার আত্মাভিমান একটুও আহত হ'লে আপনি সহজে তা ভুলতে পারেন না এবং বহুদিন পর্যন্ত তার স্মৃতি আপনাকে পীড়িত করে। অনাচারীকেও আপনি সহজে ক্ষমা করেন না, যদিও নীচ প্রতিশোধস্পৃহা আপনার মনে কখনই স্থান পায় না।

আপনার কাছে আদর্শের কোন মূল্য নেই, যদি না তাকে একটা ব্যবহারযোগ্য নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায়। যা কিছু শিথিল বিশৃঙ্খল ও অনির্দিষ্ট, তা আপনার পীড়াকর ঠেকে এবং তাকে ধ্বংস করার একটা প্রবৃত্তি মনে জাগে। সমাজেই হোক, ধর্মেই হোক, রাষ্ট্রেই হোক, সর্বত্রই আপনি চান একটা নির্দিষ্ট আকার একটা সুদৃঢ় গঠন। কাজেই আপনার মধ্যে সংস্কারপ্রিয়তা অর্থাৎ পুরাণোকে ভেঙ্গে ফেলে তাকে নতুন রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেখা যেতে পারে। কিন্তু তার জন্য অনেক সময় আপনার জনপ্রিয়তা হ্রাস অথবা বহু শত্রু সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়।

আপনার প্রকৃতির একটা বিশেষত্ব এই যে, আপনার নিজের কাজে আপনি যত বাধাপ্রাপ্ত হন, ততই আপনার জেদ বা ঝোঁক বাড়ে। বাধা জয় করার মধ্যে আপনি একটা আনন্দ পান বলে অনেক সময় আপনি সেই সব কাজের দিকে আকৃষ্ট হন যা অপরে দুঃসাধ্য বলে মনে করে। অবশ্য আপনার মধ্যে সাবধানতা ও হিসাবজ্ঞানও যথেষ্ট আছে, সুতরাং আপনি যে কাজেই অগ্রসর হোন, তার মধ্যে প্রায়ই একটা সুচিন্তিত কর্মধারা থাকে।

আপনি বুদ্ধিমান ও অবস্থাভিজ্ঞ। সাধারণতঃ সাধুতা ও সত্যনিষ্ঠার পক্ষপাতী হ'লেও আপনাকে ঠিক সরল বলা চলে না। অপর পক্ষের চাতুর্যপূর্ণ কৌশল আপনিও কূটনীতি দিয়ে প্রতিরোধ করতে জানেন।

বাইরে থেকে আপনাকে ধীর ও গম্ভীর মনে হ'লেও কাজকর্মে আপনার প্রায়ই বেশ তৎপরতা দেখা যায়। তার কারণ কাজ করার আগে আপনি তার সহজ প্রণালী চিন্তা ক'রে ঠিক ক'রে নিতে পারেন, যাতে ক'রে কাজের সময় ইতস্ততঃ করার প্রয়োজন হয় না।

আপনি সাধারণের মধ্যে খ্যাতি চান বটে, কিন্তু সস্তা জনপ্রিয়তা আপনার কাম্য নয়। আপনি চান আপনার গুণবত্তা বা কর্মে কৃতিত্বের জোরে দশজনের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। সাধারণের সংস্রবে এলেও, নিজের স্বাতন্ত্র্য ছাড়তে আপনি নারাজ। আপনার এই আত্মকেন্দ্রিকতা অনেক সময় আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। তা ছাড়া এই আত্মকেন্দ্রিকতাকে বেশী প্রশ্রয় দিলে

আপনি অত্যন্ত স্বার্থপর ও অপরের সুখ-দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত।

আপনার মধ্যে ভোগপ্রিয়তা আছে বটে, কিন্তু আপনি অমিতাচার ভালবাসেন না। সব বিষয়ে গুরুত্ব ও গাম্ভীর্যই আপনার পছন্দ। পোষাকে, আসবাবে আপনি পছন্দ করেন গম্ভীর ধরণের রঙ, সঙ্গীতে মিহির চেয়ে মোটা আওয়াজই আপনার ভাল লাগে, এমন কি বন্ধুত্ব বা হৃদয়ের ব্যাপারেও চটুল তরুণ-তরুণীর চেয়ে একটু বেশী বয়সের ধীর-প্রকৃতি স্ত্রী বা পুরুষের দিকে আপনি আকৃষ্ট হন বেশী। মোট কথা বাক্যে বা আচরণে লঘুতা ও চাপল্য আপনার রুচিকর নয়। হাস্যপরিহাস বা রঙ্গ ব্যঙ্গের ব্যাপারেও আপনার মধ্যে একটা গাম্ভীর্যের আভাস পাওয়া যায়।

ছোটখাট জিনিসের চেয়ে বড় বড় ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য বেশী ব'লে অপরের ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট আপনাকে তত বিচলিত করে না, যত করে বহুজনের সমষ্টিগত দুঃখ-দুর্দশা। যাতে দেশের ও দশের স্বার্থ উপকার আছে সেই সব ব্যাপারের দিকে আপনার সহানুভূতি স্বতঃ আকৃষ্ট হয়, এবং সেই সব ব্যাপারে বড় অংশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আপনার মধ্যে লক্ষিত হ'তে পারে।

স্নেহ প্রীতির ব্যাপারে আপনার বেশ গভীরতা ও আন্তরিকতা আছে, কিন্তু প্রীতির পাত্রের কাছে আপনি প্রতিদান প্রত্যাশা করেন খুব বেশী এবং তাদের সামান্য একটু অবহেলা বা বিচ্যুতিও আপনাকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত ক'রে তোলে। এই ব্যাপারে ভুল বোঝার জন্য অনেক সময় আপনি অনর্থক দুঃখ ও অশান্তি টেনে আনেন যা আপনার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হ'তে পারে। তা ছাড়া এর প্রতিক্রিয়ায় আপনি দুঃখবাদী, কর্মভীরু বা মনুষ্যদ্বেষী হ'য়ে উঠতে পারেন। এ বিষয়ে নিজে একটু সংযত হওয়া উচিত।

আপনার মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ খুব বেশী জাগ্রত, সেইজন্য আপনি সব সময় আবেষ্টনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না, অনেকক্ষেত্রে বরং আবেষ্টনের সঙ্গে সংঘাত উপস্থিত হয়। নিজের ব্যক্তিগত কাজে অপরের হস্তক্ষেপ আপনি সহ্য করতে পারেন না, অবশ্য অপরের কাজেও আপনি কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে চান না। পাঁচ জনের সঙ্গে মিলে মিশে বা দল বেঁধে কোনকিছু করা আপনার পোষায় না। কাজেই আপনার আচরণ অনেক সময় অপরের কাছে অদ্ভুত বেখাপ্পা বা রূঢ় ঠেকতে পারে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বহুজনের হিতকর কোন ব্যাপারে আত্ম-নিয়োগ করার সুযোগ যদি আপনি পান, তাহ'লেই আপনার জীবন সার্থক হ'তে পারে।

অর্থভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনাকে নির্ভর করতে হবে নিজের উপরই বেশী। উপার্জনের ক্ষেত্রে অপরের সাহায্য আপনি কমই পাবেন, নিজের গুণপনা ও কর্মশক্তি দিয়েই আপনাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য অর্থ সংগ্রহের কুশলতা ও যোগ্যতা এবং মিতব্যয়িতার সংস্কার আপনার আছে ব'লে, চেষ্টার দ্বারা আপনি নিজের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ক'রে তুলতে পারবেন। কিন্তু তবু মধ্যে মধ্যে আর্থিক বিপর্যয় বা উপার্জনের ব্যাপারে কমবেশী দুশ্চিন্তা উপস্থিত হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে বা দান হিসাবে উল্লেখযোগ্য কোন প্রাপ্তি না হওয়াই সম্ভব এবং টাকা লগ্নী করলে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতি হ'তে পারে। ঋণদান বা ঋণ-গ্রহণ এ উভয়ই আপনার যথাসম্ভব বর্জন করা উচিত ; কেন-না, ঋণের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট অশান্তি ও ক্ষতি এ যোগের একটা ফল। অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে আপনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে এবং অনেক সময়ে পরিশ্রমের অনুপাতে আপনি পারিশ্রমিক পাবেন কম, তা সত্ত্বেও সাবধানতা ও মিতব্যয়িতা দ্বারা শেষ জীবনে আপনি যথেষ্ট সঞ্চয় করতে পারেন।

কর্মজীবন

আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগে যাতে গভীর অভিনিবেশ ও ঐকান্তিকতা প্রয়োজন এবং যাতে শৃঙ্খলা বিধান ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিতে হয়। আপনার পরিশ্রম করার শক্তি অসাধারণ এবং মনের মত কাজ পেলে আপনি তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য দীর্ঘ একটানা পরিশ্রম করতে পারেন। কিন্তু নেহাৎ এক ঘেঁয়ে বা বৈচিত্র্যহীন কাজও আপনার ভাল লাগবে না, আপনার কাজের মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যাতে বাইরের দিক দিয়েই হোক বা ভিতরের দিক দিয়েই হোক একটা অগ্রগতির ধারণা জন্মায়। রাষ্ট্রেই হোক সমাজেই হোক, সাহিত্যেই হোক বিজ্ঞানেই হোক, সব রকম গঠনমূলক কাজে আপনি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। আপনার উচ্চাভিলাষ যথেষ্ট আছে এবং দায়িত্বপূর্ণ বড় বড় ব্যাপারে আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে পারে। ভূমি সংক্রান্ত কাজ—জমিদারী পরিচালনা, বড় বড় কন্ট্রাক্ট, সাধারণ সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজ প্রভৃতিতে এবং সাহিত্য বা বিজ্ঞানে গবেষণামূলক কাজে আপনার কৃতিত্বের জন্য খ্যাতি হ'তে পারে। কিন্তু যে কাজই আপনি করুন তাতে স্বাধীন কর্তৃত্ব না পেলে আপনার যোগ্যতার পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে না। কাজ কর্মের ব্যাপারে আপনাকে কিন্তু বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হবে এবং বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। পিতা মাতা বা অভিভাবক অথবা আত্মীয়স্বজনের তরফ থেকে কর্মজীবনে উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য তো পাবেনই না, বরং তাঁদের জন্য অনেক সময় উন্নতির বিঘ্ন হ'তে পারে। তা ছাড়া কর্মস্থানেও আপনার বহু শত্রু থাকবে যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে আপনার অনেক প্রতিষ্ঠাহানির চেষ্টা করবে। কর্মজীবনের গোড়াতে আপনার অনেক ওঠাপড়া চলবে, ৩৫ বছর বয়সের আগে কর্মে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠালাভ করা কঠিন হবে। কর্মজীবনে আপনার উন্নতির প্রধান বাধা হ'চ্ছে আপনার আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব, সংশয়বাদ ও লোকভীরুতা। এইগুলি যদি ত্যাগ করতে পারেন, তাহ'লে কর্মক্ষেত্রে যে কোন বিভাগে হোক উচ্চ প্রতিষ্ঠা আপনার করায়ত্ত হবে।

পারিবারিক

আপনার পারিবারিক জীবন খুব স্বচ্ছন্দ হবে না। পিতামাতার তরফ থেকে কম-বেশী দুঃখ আসা সম্ভব। তাদের বিষয়ে আপনার কোন না কোন রকম অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা হ'তে পারে—অল্পবয়সে তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু, তাঁদের সঙ্গে বিচ্ছেদ, মতবিরোধ প্রভৃতি অশুভ ফলের আশঙ্কা আছে। আত্মীয়স্বজন বা ভ্রাতাভগ্নীর সংশ্রবেও আপনার কোনরকম মনোকষ্টের আশঙ্কা আছে। তাদের সঙ্গে স্নেহের সম্বন্ধ ক্রমশঃ উদাসীনতায় পরিণত হ'তে পারে। আপনার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি থাকতে পারেন, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আপনি তাঁদের দ্বারা উপেক্ষিত হবেন। সন্তানের ব্যাপারেও আপনাকে কম বেশী ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি ভোগ করতে হবে। আপনার অবহেলা বা উদাসীনতার জন্যই হোক্ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যই হোক্, সন্তানের শিক্ষা ও উন্নতির বিঘ্ন ঘটতে পারে। অথবা সন্তানের আচরণ বা সন্তানের সংশ্রবে কোন বিচিত্র ঘটনার জন্য আপনার নিজের উন্নতির বিঘ্ন বা প্রতিষ্ঠাহানি হ'তে পারে। অনেক সময় পারিবারিক আবেষ্টন অথবা পরিবারস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধতা আপনার উন্নতির অন্তরায় হ'যে দাঁড়াতে পারে।

বিবাহ

বিবাহ বা দাম্পত্য জীবনের পক্ষে আপনার অথবা আপনার স্ত্রীর পারিবারিক আবেষ্টন খুব অনুকূল না হওয়াই সম্ভব। বিবাহের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আপনার পিতামাতা বা গুরুজনদের মতের মিল না হ'তে পারে, কিম্বা আপনার গুরুজনদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হাওয়াও অসম্ভব নয়। আপনার শ্বশুর বা শাশুড়ীর মধ্যে কারো অমত থাকাও সম্ভব। একটু অধিকবয়স্ক স্ত্রীলোকের (বা পুরুষের) দিকে আপনি আকৃষ্ট হন ব'লে বিবাহের সময় আপনার স্ত্রীর (বা স্বামীর) বয়স বেশী হ'লে, আপনার জীবন সুখকর হ'তে পারে। আপনার মধ্যে একনিষ্ঠতাও আছে, কিন্তু স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) দিক থেকে সামান্য একটু অবহেলাও আপনাকে অত্যন্ত ব্যথিত ক'রে তোলে এবং সে ক্ষেত্রে আপনার প্রীতি আপনি অন্যত্রও অর্পণ করতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীর (বা স্বামীর) সঙ্গে যদি মিল হয় তাহ'লে আপনার দাম্পত্য জীবন আদর্শস্থানীয় হ'তে পারে এবং অনেক সময় পরস্পরের সাহচর্যে আপনাকে উন্নতির পথে, তা সে সাংসারিকই হোক্ বা পারমার্থিকই হোক্, এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। যাঁর জন্ম মাস জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন অথবা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের পঞ্চমী অথবা কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হ'লে আপনার দাম্পত্য জীবন বিশেষ সুখকর হওয়া সম্ভব।

বন্ধুত্ব

বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আপনি খুব ভাগ্যশালী নন। আত্মীয় স্বজনের বিশেষ সৌহার্দ্য যেমন আপনি পাবেন না, বাইরেও তেমনি পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্ধু আপনার কমই থাকবে। যাঁদের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা হবে, অনেক সময় তাঁদেরই মধ্যে কারো কারো বিশ্বাস-ঘাতকতায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। তথাকথিত বন্ধুর দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা, মিথ্যা অপবাদ প্রচার, কুৎসা রটনা প্রভৃতি প্রায়ই ঘটবে। তা ছাড়া প্রবল শত্রু ও আপনার অনেক থাকবে—যাঁরা আপনার বন্ধুদের উপর প্রভাব স্থাপন ক'রে, আপনার ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে। বন্ধুদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আপনাকে শেষ পর্যন্ত সমাজদ্বেষী করে তুলতেও পারে। যার জন্ম মাস জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন অথবা মাঘ, কিম্বা যাঁর জন্ম তিথি শুক্লপক্ষের পঞ্চমী অথবা কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী এমন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'লে তা খুব ক্ষতিকর নাও হ'তে পারে, কিন্তু বন্ধুর তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য সাহায্য আপনি কখনও পাবেন না।

স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার কম-বেশী চিন্তা থাকা সম্ভব। শৈশবে কঠিন পীড়া, শ্লেষ্মাজনিত কষ্ট, আঘাত, অস্ত্রোপচার প্রভৃতির আশঙ্কা আছে। কিন্তু মধ্য বয়সে সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল হ'তে পারে। আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখতে ঔষধের চেয়ে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ পরিবেশ এবং সুনিয়ন্ত্রিত আহার বিহার কাজ করবে ঢের বেশী। অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, অধিক উদ্বেগ বা উত্তেজনা,—আপনি মোটে সহ্য করতে পারেন না। কোনরকম আশাভঙ্গ বা মনস্তাপ আপনার স্বাস্থ্যহানির কারণ হ'তে পারে। আপনার মনে একটা বিষাদখিন্নতা ও হীনমন্যতা বা আত্মানুশোচনার ভাব থাকতে পারে, যা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকর। যথাসময়ে যথা-নিয়মে স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে আহার বিহার ও বিশ্রাম যেমন আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার, তেমনি দরকার বা তার চেয়েও বেশী দরকার—আশা ও উৎসাহযুক্ত মনোভাব এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ শান্ত পরিবেশ। আপনার স্বাস্থ্যের উপর আপনার মনের প্রভাব খুব বেশী। মনে আশা, উৎসাহ ও প্রফুল্লতা নিয়ে আসতে পারলে, অনেক ক্ষেত্রে বিনা চিকিৎসায় আপনি নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারেন। আপনার মধ্যে রক্তসঞ্চালনে ব্যাঘাত, বাত ও অজীর্ণতা রোগের প্রবণতা আছে। বিশেষতঃ হাতের গাঁটগুলিতে, হাঁটুতে ও পায়ে বাতজনিত বেদনা বা স্নায়ুশূল সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত। চর্মরোগ ও রক্তদুষ্টির সম্ভাবনা এবং স্নায়বিক দুর্বলতা ও রাগোন্মাদ বা হিষ্টিরিয়ার আশঙ্কাও আপনার আছে। অনেক সময় বাস্তবিক কোন ব্যাধি না থাকলেও মানসিক কল্পনায় নিজেকে অসুস্থ মনে ক'রে আপনি অনর্থক ব্যস্ত হ'য়ে উঠতে পারেন। বাস্তবিক অসুস্থ হ'লেও বেশী ঔষধ আপনার ব্যবহার না করাই ভাল। ঠাণ্ডা লাগান এবং বেশী জলের ব্যবহারও আপনার পক্ষে হিতকর নয়। শুষ্ক আবহাওয়া, স্বচ্ছন্দ পরিবেশ এবং চিত্তের প্রফুল্লতা এই হচ্ছে আপনার সব চেয়ে বড় ঔষধ।

অন্যান্য ব্যাপার

ভ্রমণ অথবা স্থান পরিবর্তন আপনি খুব বেশী পছন্দ করেন না, তবুও মাঝে মাঝে আপনাকে বাধ্য হ'য়ে ভ্রমণ বা স্থান পরিবর্তন করতে হবে। অনেক সময় বিবাদ বিসম্বাদ, শত্রুর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অথবা আর্থিক ঝঞ্ঝাট বা বিপর্যয়, আপনার ভ্রমণের কারণ হ'তে পারে। বেশী দূর ভ্রমণ,

সমুদ্র ভ্রমণ অথবা তীর্থ যাত্রা আপনার পক্ষে সুখকর বা শুভজনক না হওয়াই সম্ভব। সে রকম ভ্রমণে কোন রকম ক্ষতি বা বিপত্তি হ'তে পারে।

ধর্মের ব্যাপারে আপনার বিশেষ গোঁড়ামি না থাকাই সম্ভব। কিন্তু সে বিষয়ে আপনার একটা নিজস্ব মতামত থাকতে পারে যার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধ ঘটাও বিচিত্র নয়। সাধনার ক্ষেত্রে গুরুর সঙ্গে মতভেদ হ'তে পারে এবং আপনার মতবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে নিন্দিত হওয়াও অসম্ভব নয়। ধর্মের ব্যাপারে অনেক সময় গোঁড়া ধার্মিকেরা আপনার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াতে পারে এবং নানা রকমে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত বা অপদস্থ করার চেষ্টা করতে পারে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূল্য আপনার কাছে ঢের বেশী। সে ক্ষেত্রেও আপনি চান ব্যক্তি স্বাধীনতা।

স্বজনদের ঘটন

[illegible] এই সকল বর্ষগুলিতে আপনার নিজের অথবা পরিবারের মধ্যে কারো, সংসারে কোন কষ্টকর বা দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হ'তে পারে। ৭, ১৯, ৩১, ৪৩, ৫৫ এই সকল বর্ষগুলিতে কোন সুখকর ঘটনা ঘটা সম্ভব।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্দ্ধক বর্ণ হচ্ছে সবুজ ও সবুজের সব রকম প্রকার ভেদ। লাল রঙও ভাগ্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। নীল রং যতদূর সম্ভব বর্জন করাই ভাল।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন পান্না ও ফিরোজা পাথর (turquoise)। সাথে এগেট (agate) এবং ক্ষেত্রবিশেষে বৈদুর্য্য (cat's eye) আপনি ধারণ করতে পারেন।

সম্রাট আকবর, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, কর্ণেল ওয়েটস, আভলক এলিস, বাট্রাণ্ড রাসেল, ডারউইন, স্যার উইলিয়ম ক্রুকস, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নট ও নাট্যকার অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির জন্মরাশি মকর।

ভগবান কি প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় ?

শ্রীচারুচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মানুষ দৃষ্ট বস্তু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এটা তার চিরন্তন স্বভাব। জ্ঞান আকাঙ্ক্ষা তার দুর্দ্দমনীয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা কেউ আছেন কিনা এবং যদি তিনি থাকেন তাহলে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায় কিনা? এই প্রশ্ন শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষে মানুষে আলোড়িত করছে। প্রতি যুগেই ঋষিরা এর জবাব দিয়েছেন কিন্তু তথাপি মনে সংশয়ের অবসান হয় না।

১৯২৫ সালে একদিন এইরূপ প্রশ্নের সমাধান না করতে পেরে আমার মনে শান্তি নাই। শ্রীঅরবিন্দকে কখনও দেখিনি। তাঁর বই কিছু পড়েছিলাম এবং সেই ত্যাগী ঋষির প্রতি ছিল আমার প্রগাঢ় ভক্তি। মনে হলো তিনি আমার সংশয় দূর করতে পারবেন। তাঁহাকে লিখলাম "আপনার উত্তরপাড়া বক্তৃতায় আপনি লিখেছেন 'নারায়ণকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া" এটা কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, অতিশয়োক্তি বা শ্রোতাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস? আমি যদি আপনার ঘরে যাই তাহলে আমাকে যেমন প্রত্যক্ষ করেন, নারায়ণকে কি ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ করে ঐ কথা বলেছিলেন।" এরকম প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা উপনিষদে পাই। পরমহংস দেবও ঐরূপ কথা বলতেন। কিন্তু তাঁরা সব জগতে নাই। আপনাদের শ্রদ্ধা করি। সেজন্য আমার সংশয়াকুল চিত্ত তার প্রশ্নের সমাধান চাহিতেছে।"

৭ই নভেম্বর ১৯২৫ পণ্ডিচারী থেকে শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ আমাকে লিখলেন "আপনার পত্রখানি শ্রীঅরবিন্দ পাইয়াছেন। তাহার উত্তর নিম্নে লিখিলাম।—ভগবান আছেন ইহা খুবই সত্য এবং তাহার অস্তিত্ব অনুভূতিগম্য। অবশ্য বিশ্বাস ভগবানের পথের সহায় কিন্তু ভগবান যদি শুধুই বিশ্বাসের বস্তু হইতেন তাহা হইলে তাঁহার কোনই বিশেষ মূল্য থাকিত না। ভগবান একটা মানসিক সিদ্ধান্ত বা থিওরিতে পরিণত হইতেন। অরবিন্দের পুস্তকাদি আপনি পড়িয়াছেন লিখিয়াছেন, তাহা হইতে তো সহজেই অনুমিত হয় যে যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা।"

এই চিঠি অনেক বার পড়লাম। ভাবে মনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলো। সংশয়ের উদ্দাম তরঙ্গমালায় দোদুল্যমান মন থেকে সন্দেহের হলো অবসান। প্রাণে পেলাম অপার আনন্দ ও অনির্ব্বচনীয় শান্তি।

(পূর্বানুবৃত্তি)

রামভল্লা নরকুলে যাহাকে বলে শার্দ্দূল—সেই জাতের মানুষ, ময়েব সেখও তাই—তবে রামের মত ঢোরাদার নয়, গুলছাপ মারা চতুর চিতা! এ ক্ষেত্রে হয় ময়েবকে পলাইতে হয়—নয় লড়াইটা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। হইয়া উঠিয়াছিলও তাই। ময়েব পশ্চাদপসরণ করে নাই—সে বেশ জানিত—কঙ্কনায় লাঠিখেলার প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রাম যে-দিন তাহার লাঠিশুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিয়া ঠ্যাঙাইয়াছিল—সে-দিন আর নাই। তাহাদের অর্থাৎ মুসলমানদের একতা চিরদিনই আছে—বর্ত্তমানে সে একতা আরও শক্ত এবং আরও জোরালো হইয়া উঠিয়াছে এবং এই যে ক্ষেত্রটি—এ ক্ষেত্রটির সঙ্গেও কোথায় যেন মুসলমান সমাজের সঙ্গে একটি ক্ষীণ যোগসূত্র আছে। বিশ্বনাথ এবং অরুণা ইসলামকে অবজ্ঞা করিয়াছে, উপেক্ষা করিয়াছে—ইহার জন্য ক্ষোভ সকল মুসলমানই অনুভব করে এ কথা ময়েব জানে। তাই সে পলাইবার কথা ভাবে নাই। তাহার পিছনে মুসলমান গাড়োয়ানেরা মুখ চোখ কঠিন করিয়া দাঁড়াইয়া গেল। যুদ্ধটা প্রলয় যুদ্ধ হইবারই কথা, কিন্তু লোকজন—পুলিশ ও সমাজ-মাতব্বরেরা এমন ভাবে আসিয়া পড়িল যে—ব্যাপারটা প্রায় অজাযুদ্ধে পরিণত হইল। দুই পক্ষকেই তাহারা পৃথক করিয়া দিল।

রাম কিন্তু চীৎকার করিয়া সেই এক কথাই ঘোষণা করিল। সে উচ্চ ঘোষণা লোকে চুপ করিয়া শুনিল। শুনিবারই কথা, যে বিশ্বাসের জন্য মানুষ এমনভাবে জীবনপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে—সে বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করিবার মত ব্যঙ্গ রস-রসিকতায় দখল সহজ কথা নয় এবং ও জিনিষটা ওখানে অচলও বটে।

রামের ঘোষণা—লোকে স্তম্ভিত হইয়া শুনিল। এতগুলি মুসলমানের সঙ্গে একা বিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাহা বলিল—অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করিয়া ফিরিয়া গেল।

কথাটা শুনিয়া অরুণা কেমন হইয়া গেল।

সংকোচ আসিয়া তাহাকে যেন প্রথমটা অভিভূত করিয়া ফেলিল। তাহার পর কি জানি কেন—কান্নার আবেগে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অতিবাস্তবপন্থী বিদ্যার মার্জ্জনায় এবং শান ঘর্ষণে মার্জ্জিতবুদ্ধি মেয়েটি কোন মতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। সে স্কুলে গেল না, শরীর অসুস্থ বলিয়া একখানা দরখাস্ত দিয়া ঘরেই শুইয়া রহিল। কাঁদিল—আর ভাবিল, ভাবিল—আর কাঁদিল।

সারাটা দিন এমনি করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার মুখে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সে জয়তারা আশ্রমে দাদু অর্থাৎ ন্যায়রত্নের কাছে একবার যাইবে। তাহার সমস্ত অন্তর তাহার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে। একবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল, নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিল—এ কি তাহার প্রশংসালিপ্সা নয়? রামভল্লার এই ঘোষণায়—সারা জংসন শহরে এই যে তাহার জয়ধ্বনি উঠিয়াছে—তাহার ক্রিয়াটা সেই কঠিন কঠোর মায়াবাদী বৃদ্ধের উপর কি হইয়াছে—তাহাই দেখিবার জন্যই কি সে যাইতেছে না? আজ তিন পুরুষ এই বৃদ্ধ তাহার উত্তর-পুরুষগণের সঙ্গে বিরোধ করিয়া নিজের জীবনের ধ্বজা উচু করিয়া ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—আজ সেই ধ্বজাটি ঈষৎ নত হইয়া পড়িয়াছে কি না—দেখিবার জন্যই কি তাহার এ আগ্রহ নয়?

না।

সে দৃঢ়কণ্ঠেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দিল—না। সঙ্গে সঙ্গেই সে পা বাড়াইল।

সাধারণ রাস্তা ছাড়িয়া সে রেলওয়ে ইয়ার্ডের ভিতর দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ ধরিল। জংসনের রেল-ইয়ার্ড

—সুবিস্তীর্ণ এবং ক্রমবর্দ্ধমান। ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আগে যখন ইয়ার্ড ছোট ছিল, মাত্র চার জোড়া লাইনে কাজ চলিত—তখনকার দিনে—লোকে ওভার-ব্রিজ পার হইয়া যাওয়ার হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য, রেল আইন অমান্য করিয়া ইয়ার্ডের লাইন পার হইয়া এই পথটি রচনা করিয়াছিল। প্রথম পথিকৃৎ ছিল রেলওয়েবাসীরা। প্লাটফর্মের পর ইয়ার্ড, ইয়ার্ডের গায়ে মালগুদাম, গুদামের ও পাশে ছিল খানকয়েক কুলীব্যারাক। রেলের লোক—রেলের আইন অমান্য করিয়া যাতায়াত করিত, তাহাদের দেখাদেখি—স্থানীয় দুঃসাহসীরা চলিত ফিরিত। ক্রমে ইয়ার্ড বাড়িতে সুরু করিল, দ্বারমণ্ডল জংসনে পরিণত হওয়ার পর হইতেই পাশে পাশে—লাইনের পর লাইন পড়িতে আরম্ভ করিল, যে গুদাম ছিল ইয়ার্ডের সীমানার একপ্রান্তে, সেই গুদাম এখন মাঝখানে পড়িয়াছে। কুলী-ব্যারাক ভাঙিয়া অন্যত্র সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেখানে লাইন বসিয়াছে, সিগনাল-কেবিন তৈয়ারী হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের যাওয়া আসাও বাড়িয়াছে। কুলীরা যায় আসে। পয়েন্টসম্যান—জমাদার—গার্ড—গুদামবাবুদের ঘুরিতে ফিরিতে হয়, ব্যবসায়ী শেঠেরা মালগুদামে যাওয়া-আসা করেন, কুলীদের মেয়েরা ছেলেরা ঝুড়ি হাতে অনবরত ইঞ্জিন ঝাড়া কয়লা কুড়াইয়া ফেরে, তাহাদের পায়ে পায়ে অনেক পথ-চিহ্ন—আঁকা হইয়া গিয়াছে। এ পথ অরুণার বিশেষ পরিচিত পথ। এই সে দিন পর্যন্ত এই পথে রাত্রির অন্ধকারে প্রায় নিয়মিত আনাগোনা করিত। তখন তাহার জীবনে রাজনীতির নেশাটাই ছিল বড়। জমাদার রামভরোসা এই সাইডিংয়েরই ওই পাশে আড্ডা বসায়, সেই আড্ডায় আসিত। দেবু স্বর্ণ গৌর সঙ্গে থাকিত। কখনও কখনও বিশেষ প্রয়োজনে সে একাই যাওয়া-আসা করিয়াছে। আজও সে এই পথ ধরিল। এ পথে লোকজন কম। লাইনের উপর সারি সারি গাড়ী—তাহারই মধ্য দিয়া পথ। বিচিত্র গন্ধ। তেল গুড় ঘি-তামাক চামড়া লঙ্কা ও নানা মসলার গন্ধ একসঙ্গে মিশিয়া বিচিত্র গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে, মাড়োয়ারী ও দেশী ব্যবসায়ীদের গুদামের এলাকায় যে গন্ধ তাহা অপেক্ষাও এ গন্ধ তীব্র এবং জটিল। এই গন্ধই যেন জংশন সহরের গায়ের গন্ধ।

আগেকার দিনে এমনই অনেক কথাই তাহার মনে হইত। আজও কথাটা মনে হইল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। একটা বেদনাদায়ক কথা মনে জাগিয়া উঠিল।

সে তো—সেই-ই আছে। এই জংসন শহর সম্পর্কে তাহার ধারণা-ভাবনা সবই তো সেইই আছে। শুধু নিজের জীবনের এক অজানা তৃষ্ণাকে সে জানিয়াছে। সে জানিয়াছে—বিশ্বনাথকেই সে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকেই সে আজও ভালবাসে, তাহারই প্রতিবিম্বের মত তাহার আত্মজ—অজয়কে না পাইলে এ পৃথিবীতে কোনদিন তাহার তৃষ্ণা মিটিবে না। এই লইয়া গোটা শহরটায় এ কি আন্দোলন হইয়া গেল? যাহারা বন্ধু ছিল, কর্ম্মজীবনের সঙ্গী ছিল—তাহারা পর হইয়া গেল!

—মাইজী! কে যেন তাহাকে ডাকিল। কণ্ঠস্বর পরিচিত, অরুণা ফিরিয়া দেখিল। দুই পাশে গাড়ীর সারি, কিন্তু সে সারির ফাঁকের মধ্যে কেহ কোথাও নাই। বোধ হয়—সারির ওপাশ হইতে কেহ ডাকিতেছে।

—কে?

—হামি রামভরোসা।

ওপাশ হইতেই সে ডাকিয়াছিল। দুইখানা মালগাড়ীর সংযোগ স্থলে রামভরোসা তলা দিয়া পার হইয়া এ পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

—রামভরোসা!

—হাঁ—মাইজী! প্রণাম!

রামভরোসার কথার মধ্যে যেন খানিকটা অপরিচিত—নূতন কিছু রহিয়াছে! ঠিক ঠাওর করিতে পারিল না অরুণা।

—ভাল আছ রামভরোসা।

—হাঁ মাইজী, ভাল আছি!

—তোমাদের ব্যারাকের সকলে—ভাল আছে?

—সব—সব ভাল মাইজী!

ইহার পর অরুণা কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে সংকোচ বোধ করিতেছিল। সে তো দেবু স্বর্ণ এবং অন্য কর্ম্মীদের মনোভাব জানে এবং সেই মনোভাব যে রামভরোসাদের মনেও সংক্রামিত হইয়াছে—ইহাতেও সে নিঃসন্দেহ। সংকোচ সেই জন্য।

রামভরোসাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল;—সেও প্রশ্ন

করিতে সংকোচ বোধ করিতেছিল। কিছুক্ষণ পর অরুণা বলিল—আমি যাই রামভরোসা!

—কাঁহা যাবেন মাইজী?

—যাব একবার জয়তারা আশ্রমে। দাদুর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আবার কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া অরুণা অগ্রসর হইল। এ যেন সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

—মাইজী।

—কি? বল রামভরোসা।

—আপনি হামলোকে ছাড়িয়ে দিলেন মাইজী?

অরুণা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—না রামভরোসা —তোমাদের কি ছাড়তে পারি? কিন্তু—

—কি মাইজী?

—দেবুবাবু স্বর্ণ এরা সকলে আমাকে বাদ দিয়েছে।

—বাদ দিয়েছে? তব্ কেও উলোক বোলা কি—আপ আপনা ইচ্ছাসে—ছোড় দিয়েছেন?

—তাই বলেছেন ওঁরা?

—হাঁ—মাইজী!

না—না—না। এই কথা তোমাকে কে বললে? আমি তোমাদের ছাড়ি নি। কোন দিন ছাড়ব না। তবে—। একটু বোধ হয় একটি মুহূর্ত্তের জন্য চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—তবে ওঁদের সঙ্গে বোধ হয় আর আসব না। ওঁরা বোধ হয় আমাকে ছাড়বেন।

—উন লোক—ছাড়বেন আপনাকে?

—হাঁ। ওঁদের সঙ্গে আমার মিল হচ্ছে না আর।

রামভরোসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—স্বর্ণ দিদিজী বললেন কি, অরুণাদিদি তো সন্ন্যাসিনী মাতাজী বনে গেলেন। আব তো আর আসবেন না। কাশী চল্ যাবেন—কি—দেওতা অওতা নিয়ে বইঠ যাবেন। তুম লোগকে আশ্রামে আসবেন না—তুম লোগকে ছুঁবেন না। অপবিত্র হো যাবেন।

রামভরোসা কথা বলিয়াই চলিয়াছিল। অরুণা কিন্তু ঠিক শুনিতেছিল না, সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমেই রামভরোসার বাক্য এবং আচরণের মধ্যে যে খানিকটা কিছু অপরিচিত নূতন মনে হইয়াছিল, যাহা সঠিক কি বুঝিতে পারিতেছিল না—সেইটুকু সে অকস্মাৎ আবিষ্কার করিয়াছে। ওই—"স্বর্ণ দিদিজী বললেন কি অরুণা দিদি তো সন্ন্যাসিনী মাতাজী বনে গেলেন" —ওই কথাটুকু শুনিবামাত্র চকিতের মত সব পরিষ্কার হইয়া গেল। রামভরোসা আগে তাহাকেও 'দিদিজী' বলিত, আজ সে তাহাকে মাতাজী বলিয়াছে। সম্ভ্রমের দিক হইতেও তাহার আচরণ অনেক বেশী সম্ভ্রমপূর্ণ।

রামভরোসা বলিতেছিল—মাইজী যখন শুনলাম—আপনি কাশীসে কলকাত্তা হো-কে এখানে লৌটকে এসেছেন—আব এসেছেন একেবারে তপস্বিনী বনে গিয়েছেন, রঙিলা কাপড় ছেড়ে পিহিনেছেন সফেদ কাপড়া, ধরমকে নিয়েছেন শিরপর, তখনই বললাম মনে মনে—হাঁ—এহি তো—এহি তো—ঠিক হইয়েছে! হামলোগের ভিতর কত বাতচিজ হল। হামলোগ—পথ চেয়ে থাকলম কি—আপনি আসবেন—হামলোগের আস্থানা ধন্ হোবে। আপ আইলেন না, তখন ভাবলম কি—হম যায়েগা এক রোজ—মাইজীকে দেখে আসব। তো আপলোকের দলের আদমী বললে—ওই বাত। স্বর্ণ দিদিজীকে পুছলাম—উ ভি বললে—ওই বাত। মনমে ডর হো গেল। বললম—কি—হাঁ, মাইজী ধেয়ান করছেন—কি—পূজা-উজা কুছু করছেন—হামি যাব তো—উসমে গড়বড় হোগা, মাইজীর হয় তো গোসা হো যাবে!

অরুণার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। আনন্দ এবং বেদনা—এমন করিয়া অনুচ্ছ্বসিত সংঘর্ষহীন সঙ্গমে মিশিয়া এমন অপরূপ মুক্তবেণীর সৃষ্টি আর কখনও হয় নাই; অন্তত তাহার জীবনে হয় নাই। চোখের জল তাহার বাধ মানিল না; চোখের কোণ হইতে গড়াইয়া আসিল; রামভরোসার সামনে এ চোখের জলের জন্য সে কোন সংকোচও অনুভব করিল না।

—মাইজী! রামভরোসা খানিকটা সমস্যায় পড়িল। মাইজী—কাঁদিলেন কেন?

অরুণা হাত বাড়াইয়া রামভরোসার হাত ধরিল—রামভরোসা।

—মাইজী!

—ও সব—মিথ্যে কথা। ওদের মন-গড়া কথা। আমি সেই আছি বাবা, কোনখানে আমি বদলাই নি।

আমি বিধবা, শুধু আমি বিধবার ধরম—তার নিয়ম আগে মানতাম না—আজ সে নিয়ম মেনেছি।

রামভরোসা এবার সাহস পাইয়া অরুণার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মানতে যে হবে মাইজী—না-মানলে দুনিয়াতে থাকবে কি বল? দুনিয়া যে ধরম হারিয়ে একদম নরক বনে যাবে। একদম ছারখার হো যাবে! হামার বাপজী বলতেন, এক সত্য মাইর কথা—

রামভরোসার কথা ডুবাইয়া দিয়া ইঞ্জিনের তীক্ষ্ণ উচ্চ বাঁশী বাজিয়া উঠিল। গোটা ইয়ার্ডটা যেন সচেতন হইয়া উঠিল। কোথা হইতে কে হাঁক মারিল—হো—হো—পয়েণ্টসম্যান! এ—রামভরোসা!

রামভরোসা—হাঁক দিল—[illegible]!

তারপর—ব্যস্ত হইয়া বলিল—হাম যাতি যাই মাইজী! শান্টিং শুরু হোগা। গাড়ী বোঝাই হো গেয়া।

—হাঁ,—হাঁ! যাও যাও।

রামভরোসা—দুইটা মালগাড়ীর সংযোগস্থলে লাইন পার হইতে হইতে বলিল—আমি যাব মাইজী—হামি যাব—আপনার বাড়ী! এক রোজ আপকে—আসতে হবে মা—হামলোগকে ডিরা! সব কোই—বালবাচ্চা—বুড়া—জেনানা—আপকে দর্শন চাহতে হায়!

আবার ইঞ্জিনের বাঁশী দিল। গাড়ী শেষ হইয়াছে—এইবার ছুটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে যেন দানব। ছুটিবে—জংসন হইতে চাড়নে ছুটিবে—চলিবে হাওড়া—সেখান হইতে পোর্ট রেলের লাইন ধরিয়া—শহরের প্রান্তে। রাঢ় অঞ্চলের শস্য পণ্য—জাহাজে বোঝাই হইয়া চলিবে—কোন দেশান্তরে!—আপ-লাইনে গেলে কত দূর যাইবে—? পেশোয়ার পর্যন্ত!

গাড়ীর সারিটা একটা ঘট-ঘট শব্দ তুলিয়া নড়িয়া উঠিল—তার পর চলিতে শুরু করিল। লাইনের জোড়ের মুখে ঘটাং ঘটাং শব্দ তুলিয়া মন্থর গতিতে চলিয়াছে। অরুণাও চলিতে শুরু করিল। তাহার মন গভীর তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল—রামভরোসারাও তাহার উপর স্বর্ণ এবং দলের অন্য সকলের মতই বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সে অনুমান মিথ্যা জানিয়া শুধু সে আশ্বস্তই হয় নাই, সে আজ অনুভব করিয়াছে—স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে জানিয়াছে যে, রামভরোসারা আগের চেয়ে আরও অনেক বেশী ভালবাসিয়াছে তাহাকে। আরও একটা কথা মনে হইল—আজিকার আগে কোনদিন কখনও রামভরোসা তাহার সঙ্গে এমনভাবে একান্ত আপনজনের মত কথা বলে নাই।

সে চলিতে শুরু করিল।

পাশে পাশে দীর্ঘ মালগাড়ীটা তাহার উল্টা দিকে চলিয়াছে।

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

মনে হইল সে কি উল্টা মুখে চলিয়াছে?

না।

সে আবার চলিতে শুরু করিল। সারি সারি লাইন—গাড়ীর ফাঁক দিয়া পার হইয়া সে একেবারে সাইডিং-এর শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখেই কয়েকটা পতিত পল্লী। এখানকার প্রতিটি পল্লীই তাহার পরিচিত। চারিদিকের পল্লীর পতিত পল্লী। বাবেরচাক একটা বিচিত্র বসতি। খড়ে ছাওয়া, পাকা-ছাদ কতকগুলা বাড়ী, এ সব বাড়ীতে স্থায়ী বাসিন্দা বড় কেহ নাই। দেশ-বিদেশের নানা বিচিত্র ধরণের মানুষ আসিয়া বাসা লইয়া থাকে, কিছুদিন থাকিয়া আবার চলিয়া যায়। কাবলীওয়ালারা আসে, শীতভর থাকে, গরম পড়িলেই টাকা আদায় শেষ করিয়া দেশে চলিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে দু চারজন শিখ আসে। আরও নানান দেশের, নানান জাতের মানুষ আসে। ইরাণী জিপসীরা আসে। আগে তারা গাড়িতে, এখন বাসা লইয়া থাকে।

সে থমকিয়া দাঁড়াইল। এ পথ ধরিয়া যাইবার কথা তাহার নয়। আরও খানিকটা বাঁয়ে এই বিদেশীদের আস্তানাটাকে ডাহিনে রাখিয়া যে পথ—সেই পথের কথা মনে করিয়া সে আসিয়াছে। গাড়ীর সারির মধ্যে চলিতে গিয়া নিশানা ও আন্দাজ হারাইয়া সে অনেকটা বেশী চলিয়া আসিয়াছে।

—আপনি? আপনি এখানে?

অরুণা চমকিয়া উঠিল। সামনে খানিকটা দূরে দেবকী সেন, হন-হন করিয়া আগাইয়া আসিতেছে। সেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মৃদুস্বরে বলিল—আপনাকে কে খবর দিলে?

সবিস্ময়ে অরুণা বলিল—কি খবর?

—তবে আপনি এখানে এ সময়ে ?

—আমি জয়তারা আশ্রমে যাব। দাদুর কাছে যাব।

—অ। কিন্তু এ পথে এলেন কেন ?

—এ পথে তো অনেকবার যাওয়া আসা করেছি। পথ আমার জানা। তবু ভুল হয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম—এর পরেরটা ধ'রে যাব।

—অ! আসুন আমার সঙ্গে।

অরুণা নিশ্চিন্ত মনে সেনকে অনুসরণ করিল।

—অজয়ের মা আজ এসেছেন—জানেন ?

—অজয়ের মা ?

—হ্যাঁ বিশ্বনাথবাবুর প্রথম স্ত্রী—আপনার—।

—দিদি ? দিদি এসেছেন ?

—হ্যাঁ।

—অজয় ? সে ?

—তারই খোঁজে এসেছেন।

—মানে ? অজয় কি—? অজয় কোথায় ?

দেবকী সেন মুহূর্ত্তের জন্য ফিরিয়া অরুণার দিকে চাহিয়া দেখিল।

—দেবকীবাবু!

—এ্যাঁ!

—বলুন। কি হয়েছে ? অজয়—? কোথায় গেল।

আর সে বলিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল, ক্রন্দনের আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, দর দর ধারায় তাহার মুখ ভাসিয়া গেল।

—কাঁদবেন না আসুন। ওখানেই সব শুনবেন।

বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া ধরা গলায় অরুণা বলিল—সে কি—? সে কি আমার জন্যে এমন ক'রে—?

আবার তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। কান্নার স্রোত আবার বাঁধ ভাঙিয়া বহিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

কৃষ্ণ বিরহ

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস এম-এ, ব্যারিষ্টার-এট-ল

(শ্রীশুক)

বৃষ্ণি কুলের মন্ত্রীপ্রবর
কৃষ্ণ সখা সুবুদ্ধিমান
বৃহস্পতির শিষ্য যিনি
স্মরেন তারে শ্রীভগবান্।
দয়িত-সখা সে উদ্ধবের
আপন করে করটি টানি
পরম-শরণ দুঃখ-হরণ
একান্তে কন মধুর বাণী :
হে সৌম্য, যাও নন্দপুরে—
পিতামাতার সন্নিধানে,
আমার কথা ব'লে প্রীতির
ঝর্ণা ঝরাও তাদের প্রাণে।
মোর বিরহে ব্যথায় কাতর
ব্রজাঙ্গনার মনের ভার

নামাও তুমি, কমাও তুমি,
বাস্তা কহি একটি বার।
লজ্জা সরম ধরম করম,
মন সঁপেছে আমায় তারা,
পুত্রপতি সব তেয়াগি'
আমার তরে আত্মহারা।
আমার তরে ত্যাগ করেছে
সকলকালের সকল সুখ,
কিসে তাদের ক'রব সুখী
ভরবে তাদের কোমল বুক ?
গোকুল বধূ সবার চেয়ে
আমায় অধিক জানায় প্রেম,
তাদের আঁখির জলের মালা
আমার বুকে তুলে নিলেম।

মোর বিরহে পাগল তারা
ব্যথায় অতি মূহ্যমান
পিঞ্জরেরই পাখীর মত
ধুকছে তাদের কোমল প্রাণ।

আবার ফিরে আসব আমি,
বিদায়কালের এ আশ্বাস,
গোপন জপের মালা গোপীর
তাইতে বুকে বইছে শ্বাস।

আত্মা আমি তাইতে তারা
রইল কৃচ্ছ্র-সাধন বলে,
আপন দেহে আত্মা চ'লে
দগ্ধ হ'ত দুঃখানলে। (ক্রমশঃ)

[শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষট্-চত্বারিংশ ও সপ্ত-চত্বারিংশ অধ্যায়ে উদ্ধবের ব্রজে আগমন ও তাঁহার মথুরায় প্রস্থান বর্ণিত আছে। সেই মধুর বিরহ-কাহিনী যুগে যুগে নরনারী চিত্তে আনন্দ-রস সিঞ্চন করিয়াছে। শ্রীভগবানের বৃন্দাবনের জন্য চির-আকুলতা, মাতাপিতা, গোপ-গোপিনীদের সংবাদ জানিবার জন্য এই আগ্রহ, প্রত্যেক নরনারীচিত্তে সান্ত্বনার বাণী-বহন করিয়া আনিবে এই ভরসায় ভাগবতী কথামৃতের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ইতি—ভাঃ-সঃ]

নিরুপমা দেবী—

গত ২৫শে পৌষ শ্রীবৃন্দাবনে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী লেখিকা নিরুপমা দেবী লোকান্তরিতা হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস বাঙ্গালীর গৌরবের ইতিহাস। তাহাতে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি যে সকল মহিলার অবদান চিরস্থায়ী, নিরুপমা দেবী তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার বৈশিষ্ট্য—ভাবের ও ভাষার সংযমে। তিনি অল্পবয়সে বিবাহিতা হইয়া বিধবা হইয়া দীর্ঘ জীবন হিন্দু বিধবার আদর্শে যাপন করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার শুচিতার প্রভাব তাঁহার রচনা সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। তিনি মনীষার অনুশীলন-মার্জিত পুষ্পপাত্র হিন্দু সংস্কৃতির কুসুমে পূর্ণ করিয়া বাণীর পূজায় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমাদৃত রচনার অধিকাংশই সাংসারিক কার্য্যের ও ধর্ম্মচর্চ্চার অবসরকালে লিখিত হইয়াছিল।

তিনি সমসাময়িক প্রভাব বর্জ্জন করেন নাই এবং যেমন রচনায় বর্ত্তমান সমাজের সমস্যার সমাধানকল্পে সে সকলের কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনই শিক্ষা, দেশহিত প্রভৃতি ক্ষেত্রেও আপনার যথাসাধ্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পিতা নফরচন্দ্র ভট্ট বহরমপুর নিবাসী ও ইংরেজ সরকারের কর্ম্মচারী ছিলেন—সদরওয়ালা হইয়াছিলেন। নিরুপমা দেবী বৃন্দাবনবাসিনী হইবার পূর্ব্বে অগ্রজ শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্টের সহিত বহরমপুরে পৈতৃক গৃহেই বাস করিতেন। বিভূতিবাবুই তাঁহার সহোদর ভ্রাতা। তাঁহার 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি', 'শ্যামলী' প্রভৃতি বঙ্গসাহিত্যে সমাদৃত। তিনি 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্রা' প্রভৃতি মাসিক পত্রে বহু রচনা দিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিরুপমা দেবীর সাহিত্য-সাধনার জন্য তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদের কোন স্থানীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—

"শেষ জীবনে আর্থিক সংকটে পড়িয়া বাংলার সাহিত্য-সেবকদের মতই তাঁহাকে কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহার সমগ্র সঞ্চয় স্থানীয় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় ডুবিয়া যায়। শেষ সময়ে রোগ-শয্যায় তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত জগত্তারিণী ও ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক দুইখানিও মৃত্যুর কয়দিন পূর্ব্বে চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সংগ্রহার্থ বন্ধক দিতে হয়। * * * মৃত্যুর আহ্বানে তিনি চিরশান্তি লাভ করিলেন।"

আমরা একটিমাত্র কারণে এই ব্যক্তিগত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ইহাতে নিরুপমা দেবীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই সপ্রকাশ ও সুপ্রকাশ। তাঁহার পুস্তকগুলি হইতে তাঁহার আয় ছিল ও আছে। তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানকে জানাইলে তাঁহারা যে সাগ্রহে ও সানন্দে তাঁহার চিকিৎসার ব্যয়-নির্ব্বাহজন্য আবশ্যক অর্থ প্রেরণ করিতেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের আছে। কিন্তু তিনি যে তাহা করেন নাই, তাহাতেই মনে হয়, মৃত্যু-শয্যায়ও তিনি হিন্দু বিধবার স্বাভাবিক সংযম ও ভগবানের বিধানে বিশ্বাস হারান নাই। সেই বিশ্বাস-বশেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া মাধুর্য্যের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনে বাস করিতে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই কার্য্যই তাঁহার সমগ্র জীবনের সহিত সামঞ্জস্য-সুন্দর।—

"While resignation gently slopes the way—
And all the prospects brightening to the last,

Her heaven commences ere the world is past."
বৃন্দাবনের "রজে" তাঁহার দেহাবসান হিন্দু নারীর চিরাগত সংস্কারের ও সাধনার পূর্ণ পরিণতি বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

তিনি দেশের কল্যাণকর নানা কার্য্যে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন—কিন্তু যে সাহিত্য তাঁহার অবদানে সমৃদ্ধ হইয়াছে, সেই সাহিত্যই লোকসমাজে তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিবে—তিনি বাঙ্গালী পাঠকের "স্মৃতি-জলে" প্রতিভার শতদলরূপে বিরাজিত থাকিবেন। বাঙ্গালী এই বাঙ্গালী মহিলার রচনা সাদরে পাঠ করিয়া আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিবে—মনুষ্যত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তুচ্ছ সুখসুবিধার জন্য অকারণ আগ্রহ ত্যাগ করিবার পথের সন্ধানও লাভ করিবে।

বিদেশে ভারতীয় উটজ-শিল্প—

বিদেশে—বিশেষ যে সকল দেশ দরিদ্র নহে সেই সকল দেশে যে ভারতের উটজ শিল্পের পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে "বাণিজ্যের স্রোতে" এদেশে অর্থাগম হইতে পারে, ইহা সকলেই জানেন। বহুদিন পূর্ব্বে টেলেরী প্রভৃতি য়ুরোপীয়রা এই ব্যবসা করিতেন। এখনও কোন কোন ব্যবসায়ী সে কাজ করেন বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ হয় বলিয়া মনে করা যায় না। ভারত সরকারের একটি কুটীর শিল্প রপ্তানী কমিটী নামক কমিটী আছে এবং কয়মাস পূর্ব্বে সেই কমিটীর ও আমেরিকায় তাঁহার প্রতিনিধি মহিলাদ্বয়ের উদ্যোগে ভারতবর্ষ হইতে তথায় কুটীর-শিল্পজ পণ্য প্রেরিত হইয়াছিল। সে সকল পণ্য বিক্রয় হইতে বিলম্ব হয় নাই এবং সরবরাহ করা সম্ভব হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহহেতু বহু পণ্যের চাহিদা থাকিলেও সরবরাহ করিবার ভার লওয়া সম্ভব হয় নাই। দেখা গিয়াছে, আমেরিকায় অল্প-মূল্যের ও অপেক্ষাকৃত অল্প-মূল্যের ভারতীয় কুটীর-শিল্পজ পণ্যের বাজার বিস্তৃত এবং সুব্যবস্থা করিতে পারিলে সেই বাজারে ভারতবর্ষ পণ্য বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারে। আমেরিকা "ডলার এরিয়া"—তথায় পণ্য বিক্রয়ে লাভ সমধিক। আমেরিকার ক্রেতারা নূতন নূতন পণ্য চাহে এবং তাহা সরবরাহ করাই প্রয়োজন।

আমরা আমেরিকা হইতে প্রেরিত বিবরণে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, পণ্য-নির্ব্বাচনে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে এবং একদেশদর্শিতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। যে সকল পণ্য আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছিল এবং বিক্রয় হইয়াছে, সে সকলের তালিকা এইরূপ—শাড়ী ও ব্রোকেড, উড়িষ্যার পর্দ্দা ও কাপড় প্রভৃতি; ত্রিবাঙ্কুরের হস্তিদন্তের এবং মহীশূরের কাঠের খোদাই করা দ্রব্য, দক্ষিণ ভারতের শঙ্খের জিনিস, কাশ্মীরের কাঠের কাজ, পেপিয়ারমাশীর দ্রব্য ও শাল ইত্যাদি, বোম্বাইএর চটী-জুতা ও ধূপ, মহিলাদিগের জন্য জরীর কাজ-করা মকমলের হাতব্যাগ, বোম্বাই ও দিল্লী হইতে প্রেরিত অলঙ্কার এবং মাদ্রাজের তিরুনেলভেলী জিলার রেশমের মত ঘাসের মাদুর।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কমিটীর পক্ষ হইতে এক জন প্রতিনিধি ভারত ভ্রমণ করিয়া পণ্য মনোনীত করিলেও তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের কোন পণ্যের নাম নাই। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কতকগুলি পণ্যের বিদেশে আদর অবশ্যম্ভাবী। আমরা নিম্নে কয়টি পণ্যের নাম দিতেছি:—

(১) কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকার পুতুল প্রভৃতি। অনেকে হয়ত জানেন না, অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণনগরের পুতুল প্রভৃতি দেখিয়া বহু দেশের লোক সে সকল সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং সে সকল সর্ব্বত্র আদর লাভ করিয়াছিল।

(২) মেদিনীপুরের মাদুর। আমেরিকায় তিরুনেলভেলীর মাদুরের অত্যন্ত আদর হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, সে মাদুর অপেক্ষা মেদিনীপুরের মাদুরের উৎকর্ষ অধিক।

(৩) বীরভূমের গালার কাজ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধনে সহায় হইয়াছিলেন।

(৪) মুর্শিদাবাদের গজদন্তের খেলানা প্রভৃতি।

(৫) মুর্শিদাবাদের ও বীরভূমের (তাঁতীপাড়ার) রেশমী কাপড়।

(৬) বাঁকুড়ার চাদর (পর্দ্দা ও শয্যাস্তরণ)।

(৭) মুর্শিদাবাদের বালাপোশ।

(৮) ঢাকার (এখন কলিকাতার) শঙ্খের নানারূপ দ্রব্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি।

(৯) মুর্শিদাবাদের (খাগড়ার) বাসন (ফুলদানী, ফিঙ্গার বোল প্রভৃতি)।

(১০) ঢাকার (এখন কলিকাতার) নানারূপ অলঙ্কার।

(১১) শ্রীরামপুরের ছাপা পর্দা প্রভৃতি।

আরও নাম করা যায়। কিন্তু বাহুল্যবোধে আমরা তাহা করিলাম না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি শিল্প বিভাগ আছে। সে বিভাগকে কি ভারত সরকারের কমিটী পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে বলেন নাই বা কমিটীর প্রতিনিধি পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া পণ্য বাছাই করা প্রয়োজন মনে করেন নাই? পশ্চিমবঙ্গের লোকের এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

আমরা যে সকল পণ্যের নামোল্লেখ করিলাম, সে সকলই স্বল্পমূল্যের বা অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যের। সেই শ্রেণীর পণ্যই যে আমেরিকায় সমধিক আদৃত, তাহা বলা হইয়াছে। তবে কেন যে পশ্চিমবঙ্গের পণ্য পাঠাইয়া বিনিময়ে অর্থ আনয়নের ব্যবস্থা করা হয় নাই, তাহা কে বলিবে?

প্রকাশ, আমেরিকায় একখানি বড় দোকান—ভারতীয় কুটীর-শিল্পজ পণ্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া "বড় দিনের" বাজারে লাভবান হইয়াছেন এবং শিকাগোর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতেও এইরূপ পণ্য বিক্রীত হইয়াছিল। তথায় যে পণ্য ছিল, তাহার অর্দ্ধাংশ নমুনা হিসাবেই বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। এমন কি শৃঙ্গের জিনিষ ও মাদুর সরবরাহের চাহিদা মিটান সম্ভব হয় নাই। সেজন্য ভারতে ঐ সকল পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

এবার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হইয়াছে, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে যে ভারতীয় শিল্পের অর্থার্জ্জনের নূতন পথ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। এ বিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশের শিল্প বিভাগ শিল্পানুরাগীদিগের ও শিল্পীদিগের সহিত পরামর্শ করিলে যে সুফল ফলিতে পারে, তাহা বহু দিন পূর্ব্বে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় "বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রীজ এসোসিয়েশনে" প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প বিভাগ যদি—আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ মনে না করিয়া—লোকের সহযোগ গ্রহণ করিয়া আন্তরিকভাবে শিল্পের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন এবং বিভাগের কার্য্যভার উপযুক্ত লোকের হস্তে ন্যস্ত ও কাজ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে যে সাফল্যলাভে বিলম্ব ঘটে না, তাহা অনায়াসে মনে করা যায়।

আমেরিকার ও য়ুরোপের নানা স্থানে পশ্চিমবঙ্গের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কুটীর-শিল্পজ পণ্য প্রেরণের কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তাহাদিগের বিভাগের দ্বারা দেশের লোককে জানাইয়া লোকের পরামর্শ ও প্রস্তাব আহ্বান করিবেন?

ব্যাঙ্ক বিভ্রাট—

সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা নিরুপমা দেবীর মৃত্যু-সংবাদ প্রসঙ্গে বাঙ্গালার একটি ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। অল্পদিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। কারণ, ধনীরা সাধারণতঃ বড় বড় ব্যাঙ্কের সহিতই কাজ করেন।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ৪টি ব্যাঙ্ক সম্মিলিত হইয়া যে ভাবে আক্রমণ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। য়ুরোপে—বিশেষ ইংলণ্ডে—এইরূপ সম্মিলিত চেষ্টায় অনেক ক্ষেত্রেই সুফল ফলিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা কেন্দ্রী সরকার যদি এই সকল ব্যাঙ্কের অসাফল্যের কারণ অনুসন্ধান করিতেন তবে অনুসন্ধান ফলে, ভবিষ্যতে বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস হইতে পারিত। ব্যাঙ্ক বন্ধ হইবার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ—অসাধুতা ও অসতর্কতা। কি উপায়ে অসাধুতা ও অসতর্কতা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়, তাহা বিবেচনা প্রয়োজন।

গত ২ই জানুয়ারী বন্ধ ব্যাঙ্কগুলির একটির ম্যানেজিং ডিরেক্টার আদালতে বলিয়াছেন, যে ভাবে তাঁহাকে, দেখা হইতেছে—তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে ও ভ্রাতাকে দিনের পর দিন লাঞ্ছিত অবস্থায় কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইতেছে, তাহারা নিরপরাধ—তাহাতে তাঁহার প্রথমে মনে হইয়াছিল, আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ, কিন্তু তিনি পরিবারের কলঙ্ক প্রক্ষালন করিবার জন্যই তাহা করেন নাই। তিনি ১০ হইতে ... বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুরাতন কর্ম্মচারীদিগের

কার্য্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন এবং কল্পনাই করিতে পারেন নাই যে, সেই সকল কর্ম্মচারী সর্ব্ববিধ কুকার্য্য করিতেছিলেন—ইত্যাদি।

যদি এই কথাই সত্য হয়, তবে বক্তব্য, যে স্থলে পরের টাকা লইয়া কাজ, সে স্থলে তাঁহার স্বীকৃত ব্যবস্থা কি সঙ্গত হইয়াছিল? ডেভেনাণ্টের উক্তি এইরূপ—জয়েণ্ট ষ্টক ব্যবসার দ্বারা—"The wealth and strength of many are guided by the care and wisdom of a few."

অর্থাৎ বহু লোকের অর্থ ও ক্ষমতা অল্পসংখ্যক লোকের যত্ন ও বিজ্ঞতার দ্বারা পরিচালিত হয়; সুতরাং পরিচালকের ত্রুটি যখন যত্নের ও বিজ্ঞতার অভাবের পরিচয় দেয়, তখনই দুর্নীতির প্রবেশপথ পরিষ্কৃত হয়। পরিচালকের দায়িত্ব যে অসাধারণ, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পরিচালক অসাধু না হইয়া যদি অসতর্ক হ'ন, তাহা হইলেও পদে পদে বিপদ ঘটিতে পারে।

একান্ত পরিতাপের বিষয়, পশ্চিম বঙ্গে যে বহু ব্যাঙ্ক বন্ধ হইয়াছে, সে সকলই বাঙ্গালীর পরিচালনাধীন ছিল এবং অনেকগুলির সহিত প্রদেশে সুপরিচিত কোন কোন লোকের সমস্ত কর্ম্মজীবনের সুনাম জড়িত ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গালার নানা জিলায়—উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতির পরিচালনায় যে সকল "লোন আফিস" উদ্ভূত হইয়াছিল, সে সকলের পতনে বহু লোকের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছিল। তাহার পরে মসলেম লীগের প্রাধান্যকালে বহু সমবায় ঋণদান সমিতির পতনেও বহু লোকের আর্থিক সর্ব্বনাশ হয়। তৃতীয় আঘাত এই সকল ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় পতিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার আর্থিক মেরুদণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে।

যাহাতে ব্যাঙ্কের মত প্রতিষ্ঠানে অসাধুতার দণ্ড কঠোর হয় এবং অসতর্কতার অবকাশ না থাকে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া সরকারেরও কর্ত্তব্য। "রিজার্ভ ব্যাঙ্কের" যে পরিদর্শন-ক্ষমতা আছে, তাহা যাহাতে যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখাও সরকারের কর্ত্তব্য।

যে অভিজ্ঞতা লব্ধ হইল, যাহাতে তাহার পর আমরা ভবিষ্যতে ভ্রান্তির পথে চালিত না হই, তাহাই আজ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন।

ব্যয় ও অপব্যয়—

গত মাসে আমরা সিন্দ্রী সার প্রস্তুত করার কারখানায় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের সহিত বৰ্দ্ধিত ব্যয়ের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে প্রতিপন্ন হয়, ভারত-সরকারের অনুষ্ঠানে হিসাব করিবার যোগ্যতায় ত্রুটি আছে, অথবা তাঁহারা আবশ্যক হিসাব না করিয়াই অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া শেষে দেশের লোকের অর্থের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া থাকেন। আমরা দেখিতেছি, যে দামোদর পরিকল্পনা দেখাইয়া লোককে নানারূপ উপকারের আশা দেওয়া হইতেছে, তাহাতেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

এই পরিকল্পনা যখন আরম্ভ হয়, তখন হিসাব ছিল—ব্যয় ৫৫ কোটি টাকা হইবে। ইহামধ্যেই বলা হইতেছে, ব্যয় প্রায় শত করা ৬০ টাকা বাড়িবে—অর্থাৎ মোট ব্যয় প্রায় ৮৮ কোটি টাকা পড়িবে; হয়ত ইহাতেও ব্যয়-সঙ্কুলান হইবে না। পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীকমলপ্রসাদ বর্ম্মা বলিয়াছেন, ব্যয়-বৃদ্ধির কারণ—

(১) মুদ্রামূল্য হ্রাস,

(২) ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের পর উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি,

(৩) শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি,

(৪) পরিকল্পনার প্রসার বৃদ্ধি।

চতুর্থ দফা সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, বোখারোর (কয়লার খনিসমূহের) জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এক শত ২৫ মাইল পর্য্যন্ত হইবার কথা ছিল, এখন তাহা ৮ শত ৭৫ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইতেছে।

এই চতুর্থ দফা সম্বন্ধে স্বতঃই বলিতে হয়, হিসাবে ব্যয় কম দেখাইবার জন্যই কি প্রথমে ধরা হইয়াছিল, এক শত ২৫ মাইল পর্য্যন্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে? কারণ, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের পরে নিশ্চয়ই ঐ অঞ্চলের কোন প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, হয় বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, নহে ত পরিকল্পনা যাহারা প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও যাঁহারা তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন—উভয় পক্ষই অযোগ্যতাহেতু বর্জ্জনীয়। যে ব্যবস্থা অব্যবস্থা, তাহা কখনই সহ্য করা সঙ্গত নহে।

অবশিষ্ট তিন দফা সম্বন্ধে বক্তব্য—মুদ্রা-মূল্য হ্রাস ভারতের প্রধান মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সম্মতি না লইয়াই করিয়াছিলেন। তাহাতে অবশ্য ইংলণ্ডের অনেক সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এই একটি দৃষ্টান্ত হইতেই সহজে অনুমান করা যায়। কমনওয়েলথে থাকিলেই যে, ইংলণ্ডের সুবিধার জন্য মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিতে হইবে, এমন নহে। পাকিস্থানও তাহা করে নাই এবং সেই কারণে তাহার লাভ হইয়াছে ও হইতেছে। দেখা যাইতেছে, দামোদর পরিকল্পনার জন্যও ভারতকে আমেরিকার উপর নির্ভর করিতে হইতেছে—মাইথন বাঁধের প্রকৃতি একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান স্থির করিতেছেন, সে জন্য তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই আমেরিকার মুদ্রা ডলারে প্রাপ্য দিতে হইবে—ইংলণ্ডের ষ্টার্লিংএ নহে। কেবল তাহাই নহে—১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে যে ২৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় ৪ কোটি টাকা আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক হইতে গৃহীত ঋণ হইতে ডলারে দিতে হইবে। তাহাতেও ভারতের প্রভূত ক্ষতি হইবে।

আমরা আশা করি, জওহরলাল নেহরু যখন মুদ্রা-মূল্য হ্রাসে সম্মত হইয়াছিলেন এবং পার্লামেণ্ট যখন সে জন্য তাঁহার প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপন করেন নাই—তখন তাঁহারা এই সকল বিষয় বিবেচনা করিতে ভুলেন নাই।

আগামী বৎসর যে ১৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সরকারের মধ্যে এইরূপে বিভক্ত হইবে—

পশ্চিমবঙ্গ—৬ কোটি ৭১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭ শত ৭০ টাকা

ভারত সরকার—৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩ শত ২৭ টাকা

বিহার সরকার—৩ কোটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ২ শত ৩ টাকা

এবার বিহারে খাদ্যাভাব অতি তীব্র। আর পশ্চিম বঙ্গ? পশ্চিম বঙ্গ বিহারকে বলিতে পারে—

"তুমি খাও ভাঁড়ে জল, আমি খাই ঘাটে,
দেখিয়া তোমার দুঃখ মোর বুক ফাটে।"

এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে ব্যয় বিহারের ব্যয়ের হিসাবের দ্বিগুণ! অথচ এবার বরাদ্দ-ব্যয়ের শতকরা ৭০ ভাগই বোগারোর জন্য ব্যয়িত হইবে এবং পশ্চিমবঙ্গ তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ যে ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইবে, তাহার এখনও বিলম্ব আছে।

১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দের বাজেট অর্থাৎ আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব গত ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে দাখিল করিবার কথা ছিল। সে নিয়ম রক্ষিত হয় নাই। অর্থাৎ সে বিষয়েও আইনের বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে! তাহার কৈফিয়ৎ, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ যথাকালে হিসাব পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল অধিক হওয়ায় কমাইবার জন্য বলা হয়। সংশোধিত হিসাবে ব্যয়—৯ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ছিল, কিন্তু বরাদ্দ মাত্র ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার হওয়ায় আবার বিবেচনা করিয়া ব্যয়-হ্রাস করিতে বিলম্ব হইয়াছে।

এই কৈফিয়ৎ কি সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? আয়ের পরিমাণ না জানিয়া কি ব্যয়ের হিসাব করিতে বলা হইয়াছিল? পরে যে ব্যয়-হ্রাস করা হইয়াছে তাহাতে কাযের ক্ষতি হইবে কি না এবং কি জন্য ব্যয় অধিক হইয়াছিল, সে সকল জানিবার উপায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, বাজেট দাখিলে বিলম্ব ঘটিলে আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথরূপে পরীক্ষা করিতে অসুবিধা অনিবার্য হয় এবং সেই জন্য ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী হইতেও পারে।

দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে যে এখন অনেক বিলম্ব অনিবার্য, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। যে ভাবে হিসাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং যে ভাবে সমরোপকরণ প্রস্তুতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভারতকে আবশ্যক উপকরণ যথাসময়ে সরবরাহ করিবে না, তাহাতে আশঙ্কার কারণ আরও অধিক হয়। যে ক্ষেত্রে উপকরণের—এমন কি নক্সার জন্যও বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে সময় সম্বন্ধে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

কিন্তু যতদিনে দামোদর পরিকল্পনা ও সেইরূপ অন্য পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে না, ততদিন দেশে খাদ্যোপকরণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে অবহিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বিচার ও শাসন—

শাসনের প্রয়োজন প্রত্যক্ষ হইলেও বিচারের স্থান শাসনের তুলনায় উচ্চে। যে স্থানে শাসন-ব্যবস্থা বিচারের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন না হয়, তথায় অসন্তোষের উদ্ভব যেমন অনিবার্য্য হয়, বিপদের কারণও তেমনই প্রবল হয়। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্ট—ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিষয় বিবেচনা করিয়া যে বলিয়াছেন, ভারতীয় ফৌজদারী আইন সংশোধিত বিধির ১৬ ধারা অসিদ্ধ তাহাতে এই বিষয় বিশেষভাবে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। ৮৮ জন লোককে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সন্দেহে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টদিগের মতবাদ নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং মাদ্রাজ সরকার যখন—মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারফলে—সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, তখনও পশ্চিমবঙ্গের প্রধান-সচিব বলিয়াছিলেন, মাদ্রাজ যাহাই কেন করুক না, তিনি সে আজ্ঞা প্রত্যাহার করিবেন না। কলিকাতা হাইকোর্ট যে মাদ্রাজ হাইকোর্টের সহিত একমত হইয়াছেন, তাহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিবেন? হয়ত তাঁহারা কলিকাতা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করিবেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যদি হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন, তবে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে আর পদাসীন থাকা সম্ভব বা সমীচীন হইবে?

কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী প্রাদেশিক সচিবদিগকে উক্তি সম্বন্ধে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন—প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে না পারায় অন্যান্য দেশে সচিবদিগকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে অবস্থা আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রধান-সচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত যদি প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের মতভেদ ঘটে, তবে বিচারের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া শাসন-বিভাগ কাজ করিতে পারিবেন না।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক সেন মহাশয় বলিয়াছেন—

ভারতীয় গণতন্ত্রের বিচারক হিসাবে, তাহাদিগের ইহাই দেখা কর্ত্তব্য যে, ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যফলে কোন রাষ্ট্রবাসী যেন অযথা অন্যায় ব্যবহার ভোগ না করেন।

কারণ—

বিচারকগণ ব্যবস্থা পরিষদের বিধিশাসন-পদ্ধতির নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে বিচার করিবেন।

বিচারকদিগের বিশ্বাস, কোন লোক পাছে কোন বিপজ্জনক কাজ করে সেই সন্দেহে তাহাকে স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া আটক করিয়া রাখা শাসনতন্ত্রের নীতিবিরোধী।

আইনের আবরণে অনাচার সমর্থিত হইতে পারে না—ইহাই ভারতীয় শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রেত—বিচারকগণ এই মত প্রকাশ করিয়া লোককে, সন্দেহে নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা সম্ভোগে বঞ্চিত করা যে আইনে সম্ভব তাহা অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—আবেদনকারী আসামীদিগকে অপ্রমাণিত অপরাধের অভিযোগে আটক না রাখিয়া মুক্তি দিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

যদি স্বায়ত্ত শাসনশীল ভারতের নূতন শাসন-পদ্ধতি রচিত ও গৃহীত হইবার পরে বিদেশী আমলাতন্ত্রের শাসনকালীন আইনের পরিবর্ত্তন করা না হইয়া থাকে, তবে সে ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। নূতন অবস্থার সহিত নূতন ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। বিনা বিচারে—শাসন বিভাগের সন্দেহে লোকের স্বাধীনতাহরণ পরাধীন ভারতেও ভারতীয়দিগের দ্বারা নিন্দিত হইয়া আসিয়াছে। তখন যাহারা সেই প্রথার নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন, আজ যদি তাহারাই তাহার সমর্থন ও পরিচালন করেন, তবে তাহা একান্তই পরিতাপের বিষয় হয়।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছিলেন—

"The authers of the Declaration of Independence meant it to be a stumbling block to those who in after times might seek to turn a free people back into the paths of despotism."

আমরা আশা করি, ভারতীয় রাজনীতিকরা এই কথা স্মরণ রাখিবেন।

সামন্ত রাজ্য ও ভারত রাষ্ট্র—

ইংরেজ কবি বাটলার লিখিয়াছেন—

"He that camplies against his will
Is of his own opinion still."

কিছুদিন পূর্ব্বে বরদার মহারাজা বরদা-রাজ্যের ভারত-রাষ্ট্রভুক্তিতে যে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে সেই কথাই অনেকের মনে হইবে। রাষ্ট্রমধ্যে বহু সামন্ত রাজ্যের অবস্থিতি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে অসুবিধাজনক এবং ভিন্নভিন্নরূপ শাসন-পদ্ধতির পরিপোষক বুঝিয়া ভারত সরকার সামন্ত রাজ্যগুলি রাষ্ট্রভুক্ত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। সেই কার্যই পরলোকগত সর্দার বল্লভভাই পেটেলের সর্বপ্রধান কীর্ত্তি। হায়দ্রাবাদ রাজ্য সম্বন্ধেই কেবল ভারত সরকারকে বলপ্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। যে সকল রাজ্যের শাসকরা নূতন ব্যবস্থায় সম্মতি দিয়াছিলেন, বরদার গাইকবাড় তাঁহাদিগের অন্যতম; এবং প্রকাশ, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রভাবে তিনি সম্মতিদানে সম্মত হইয়াছিলেন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর দিল্লী হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, বরদার মহারাজা বোম্বাই প্রদেশের সহিত বরদা রাজ্যের সম্পূর্ণ সম্মিলনে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া ভারত-রাষ্ট্রের সভাপতিকে এক পত্র লিখিয়াছেন। ঐ ২ পৃষ্ঠাব্যাপী পত্র ৭ই ডিসেম্বর লিখিত হয় এবং তাহাতে বলা হয়, মহারাজা ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কেবল বরদা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ভারত সরকারের অধীনে হইবে, ইহাই বলিয়াছিলেন।

শুনা যায়, ভারত সরকার মহারাজার আবেদন গ্রহণ করিতে অসম্মতি জানান।

তাহার পরে ২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাই নগরে সামন্ত শাসকদিগের যে সম্মিলন হয়, তাহার সভাপতিরূপে বরদার মহারাজা বলেন, ভারতবর্ষের লোককে সেবা করিবার যে আশা তাঁহারা পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে। তাঁহাদিগের ও প্রজাবৃন্দের মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে, তাহাতে উভয়পক্ষই কৃত্রিম অবস্থায় রহিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারত সরকারের কোন কোন কর্ম্মচারী সামন্ত রাজ্যে জমীর মত ব্যবহার করিতেছেন এবং হীনতার পরিচয় দিতেও দ্বিধানুভব করেন না!

ক্ষমতাভ্রষ্ট সামন্ত-রাজা-শাসকদিগের সম্মিলনে যে সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, যদিও তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য ভারত সরকার তাঁহাদিগকে প্রভূত বৃত্তির অধিকারী করিয়াছেন, তথাপি ক্ষমতালোপ তাঁহাদিগের অসন্তোষের কারণ হইয়া আছে। জাপানের অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্ষমতা ত্যাগের সহিত এই সকল শাসকের ক্ষমতা ত্যাগের তুলনা করা সঙ্গত নহে। ভারতীয় সামন্ত নৃপতিরা যে সাগ্রহে ক্ষমতা ত্যাগ করেন নাই, অনন্যোপায় হইয়াই তাহা করিয়াছিলেন, তাহা বরদার মহারাজার উক্তিতে বুঝিতে পারা যায়।

কিন্তু যে সকল রাজ্য রাষ্ট্রভুক্ত করা হইয়াছে, সে সকলের প্রজারা কি চাহেন, তাহাই বিবেচ্য। আমরা জানি, যখন হায়দ্রাবাদের নিজাম বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে বেরার প্রত্যর্পণের দাবী উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দে বেরারবাসীদিগের পক্ষ হইতে তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করায় ভারত সরকার নিজামের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে "প্রিন্স অব বেরার" উপাধি দিয়া বেরারে নিজামের অধিকার স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেরারের শাসন-ভার ত্যাগ করিতে সম্মত হ'ন নাই—বেরার ভারতভুক্ত থাকিয়া বৃটিশ শাসনাধীন ছিল।

বরদার মহারাজা ই লণ্ড যাত্রার পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি রাজ্য পাইতে বা ক্ষমতা পাইতে চাহেন না—বরদার প্রজাপুঞ্জের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি রাজ্য—ভারত সরকারের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা প্রতিনিধির দ্বারা—স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে শাসন করিতে বলেন।

দুই বৎসর পরে কেন আজ তিনি একথা বলিতেছেন, সে সম্বন্ধে মহারাজা বলেন—

স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল, ভারত-রাষ্ট্রভুক্তির ফলে বরদা রাজ্যের শাসন-পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হইবে এবং প্রজারাও অধিক সুখ-সুবিধা লাভ করিবে। কিন্তু গত দুই বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, সে আশার অবকাশ নাই। কেবল তাহাই নহে, রাজ্যে করের পরিমাণ-বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক ও অর্থনীতিক ব্যাপার—এ সকলে প্রজারা পূর্ব্বে যে সকল সুবিধা সম্ভোগ করিত, সে সকল হ্রাস করা হইয়াছে!

সামন্ত রাজ্যের সুবিধা ও অসুবিধা উভয়ই ছিল। সে সকলে সংস্কার প্রবর্ত্তন যেমন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য

ছিল—অত্যাচার ও অনাচার তেমনই অনায়াসে প্রবল হইতে পারিত। সে সবই শাসকের উপর নির্ভর করিত। বরদায় ও ময়ূরভঞ্জে যেমন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তেমনই পাতিয়ালার মহারাজার, ইন্দোরের মহারাজার, উড়িষ্যার অনেকগুলি সামন্ত রাজ্যের শাসকের সম্বন্ধে অতি ঘৃণ্য অত্যাচারের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। কোন কোন সামন্ত রাজা যে অত্যাচারের ও অনাচারের দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য রাজপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই। বরদার বর্ত্তমান মহারাজা বিদেশে কিরূপ অমিতব্যয়িতার পরিচয় দেন, কাশ্মীরের বর্ত্তমান মহারাজা ইংলণ্ডে যাইয়া রবিনশন-ঘটিত কিরূপ মামলায় বিজড়িত হইয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

আবার কুচবিহারের মত ক্ষুদ্র রাজ্যের আয়ে ব্যয়-সঙ্কুলান করাও কষ্টসাধ্য হইতে পারে—রাজ্যের আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতিসাধন ত পরের কথা। রাজ্য-রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিশেষ সমগ্র রাষ্ট্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচ, শিল্প, শাসন প্রভৃতি সম্বন্ধে একই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে জাতির উন্নতির গতি দ্রুত হয়। সেই জন্য সমগ্র রাষ্ট্রে একই পদ্ধতির প্রসার প্রয়োজন। সে সকল বিষয় বিবেচনা করিলে সামন্ত-রাজাগুলির বিলোপের প্রয়োজন বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু বরদার মহারাজা যে ভারত সরকারের সম্বন্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহাদিগের ব্যবস্থায় প্রজার করভার বর্দ্ধিত হইয়াছে অথচ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রজার সুবিধা সঙ্কুচিত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভারত সরকার কি বলিবেন? তাঁহারা যদি সে অভিযোগের উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারেন, তবে যে তাঁহারা ত্রুটিপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য দায়ী বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাহা তাঁহারাও অবশ্য স্বীকার করিবেন।

খাদ্য-সমস্যা—

খাদ্য-সমস্যা সমাধানে ভারত সরকারের অক্ষমতা কেহ কেহ তাঁহাদিগের অযোগ্যতারই পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতেছেন। দীর্ঘ তিন বৎসর শাসনকার্য্য পরিচালিত করিয়াও তাঁহারা এই প্রাথমিক সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না; কবে পারিবেন, তাহাও বলা যায় না। খাদ্য-শস্যের মূল্য হ্রাস করা ত পরের কথা, তাঁহারা লোককে আবশ্যক পরিমাণ খাদ্যোপকরণে বঞ্চিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গত ১৮ই জানুয়ারী ভারত সরকার বেসরকারীভাবে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, যদিও শস্য সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ—এই তিন মাস সঙ্কটসঙ্কুল—সুতরাং ভারত সরকার খাদ্য-নিয়ন্ত্রণে যে উপকরণ প্রদত্ত হয়, তাহার এক-চতুর্থাংশ হ্রাস করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। পরদিনই সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

অবশ্য কৈফিয়ৎ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে কৈফিয়ৎ বিচারসহ কি না, তাহাই বিবেচ্য। বলা হইয়াছে:—

(১) প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে দেশে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ হ্রাস হইয়াছে। গত বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে সরকারের যে পরিমাণ শস্য-সঞ্চয় ছিল, এ বৎসর ঐ তারিখে তাহা ৯লক্ষ টন কম। সেইজন্য স্থানে স্থানে "রেশনিং" অচল হইতেছে।

(২) যদিও বিচার-বিবেচনা না করিয়া জওহরলাল নেহরু অবিমৃষ্যকারিতা সহকারে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে ভারতবর্ষ আর বিদেশ হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী করিবে না, তথাপি প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের প্রথম তিন মাসে যে স্থানে ৩লক্ষ ৫৩হাজার ২শত ২৯ টন শস্য আমদানী করা হইয়াছে এ বৎসর সেই তিন মাসে সে স্থানে ৯লক্ষ ১৮হাজার টন আমদানী করিতে হইতেছে এবং তাহাতেও অবস্থা শোচনীয়!

ভারত সরকারের বিশ্বাস, তাঁহারা মাত্র তিন মাস "রেশনের" পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ কমাইলে যে শস্য রাখিতে পারিবেন, তাহার পরিমাণ ২লক্ষ টন এবং পরবর্ত্তী ৯ মাসে তাহা ব্যবহৃত হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিয়াছেন:—

"প্রায় ৩ সপ্তাহ পূর্ব্বে (খাদ্য-মন্ত্রী) মিষ্টার মুন্সী কলিকাতায় বলিয়াছিলেন, আগামী ২ বা ৩ মাসে তিনি ভারত রাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থানে খাদ্যের অভাব আশঙ্কা

করেন না এবং বিদেশ হইতে নিয়মিত ভাবে খাদ্যশস্য আমদানীও হইতেছে। তিন সপ্তাহ যাইতে না যাইতেই তিনি 'রেশনে' খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়াছেন! প্রথমে আমদানী গমের মূল্য শতকরা ১৫ টাকা বৃদ্ধিহেতু ২০টি সহরে কেন্দ্রী সরকারের সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করা হয়; তাহার পরে সর্ব্বত্র 'রেশনের' পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস করা হইল। তরা জানুয়ারী যে ২ বা ৩ মাসে ভয়ের কোন কারণ ছিল না, ১৯শে জানুয়ারী সেই কয় মাসই বিপদসঙ্কুল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এ অবস্থায় লোক কিরূপে বিশ্বাস করিবে যে, পরবর্ত্তী ৯ মাসে অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে?

দেখা গিয়াছে, গত বৎসর ভারত সরকার হিসাবে ভুল করিয়াছিলেন এবং সেই ভুলের জন্য দেশের লোককে বিশেষ-রূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হয়ত আসন্ন—যে কোন দিন হয়ত আমরা দেখিব, আমেরিকার অনুসরণ করিয়া বৃটেনও চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছে এবং একদিকে যেমন "কমনওয়েলথের" সহিত সংযুক্ত ভারত নিরপেক্ষ থাকিতে পারে নাই, অপর দিকে তেমনই মতবাদ রক্ষার্থ রুশিয়া চীনের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে। সে অবস্থায় বিদেশ হইতে ভারতে খাদ্যশস্য আমদানীর জন্য জাহাজ পাওয়া কষ্টসাধ্য হইবে। সুতরাং দেশের লোক আরও অন্নাভাবে পীড়িত হইবে।

আমরা বার বার বলিয়াছি, খাদ্য-সমস্যার সমাধানের সর্ব্বপ্রধান উপায় উপেক্ষিত হইতেছে এবং আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে ৩ বৎসরে খাদ্য বিষয়ে লোককে স্বাবলম্বী করা অসম্ভব হইত না। আমরা দেখিতেছি, যেভাবে রাশিয়া খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে, সেভাবে কাজ ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ করেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা যাউক। এই প্রদেশে জমীও পতিত আছে, লোকেরও অভাব নাই, অথচ "পতিত" জমীতে চাষ হইতেছে না! সেচ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ত্রুটি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ দেখাইয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় কোন এক ব্যক্তির বাগানে "নবান্ন" ভোজনের উৎসবে বলা হইয়াছে, যখন এক ব্যক্তি এক একর জমীতে ৪০ মণ ধান্য ফলাইয়াছেন তখন আর ভাবনা নাই। অথচ তিনি ফলাইয়াছেন ৪০ নহে ২৪ মণ অর্থাৎ বিঘায় ৮ মণ মাত্র! ধন্যাত্মক ভুলে হয়ত ২৪ কোনরূপে ৪০ হইতে পারে। কিন্তু সেই ভুলের জন্য সে অঞ্চলে কৃষকদিগের জমীতে ফলন অধিক ধরিয়া ধান্য আদায়ের চেষ্টা হইবে না ত?

দেশের লোক অল্পাহারে যে দিন দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিলে কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। কলিকাতায় নাকি পরিপূরক খাদ্য সুলভ হইয়াছে! এ সময়—প্রতি বৎসরই তরকারী অধিক পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে, উদ্বাস্তরা তরকারীর ও হাঁস-মুর্গীর চাষ করিয়া সফল হইতেছে। কিন্তু তাহারা কি পরিমাণ উৎপাদন-বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আগন্তুকদিগের সংখ্যার তুলনায় তাহা কিরূপ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইয়াছে কি?

সরকার যতদিন দেশের লোকের সহযোগিতায় খাদ্য-শস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি করিতে না পারিবেন, ততদিন কেবল হিসাবের অঙ্ক লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া দেশের লোকের ক্ষুধা নিবারণ করা সম্ভব হইতে পারে না।

অমৃতলাল ঠক্কর—

প্রসিদ্ধ সমাজসেবক অমৃতলাল ঠক্কর গত ৫ই মাঘ ৮২ বৎসর বয়সে ভবনগরে স্বীয় ভ্রাতার গৃহে লোকান্তরিত হইয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভবনগরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এঞ্জিনিয়ার হইয়া নানা স্থানে কাজ করেন এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় উগাণ্ডা রেলেও চাকরী করিয়াছিলেন।

তিনি ভারতভৃত্য সমিতির সদস্য ছিলেন এবং লোক-সেবা এবং অনুন্নত ও অস্পৃশ্যদিগের উন্নতিসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি জনসাধারণের নিকট "ঠক্কর বাপা" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন— ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! আর তাহাদিগকে ঘৃণা করা "জঘন্য নিষ্ঠুরতা"। গান্ধীজী ইহাদিগের উন্নতিসাধনের আগ্রহে অসহযোগ আন্দোলন-কালে কারারুদ্ধ হইয়া অসহযোগ নীতি ক্ষুণ্ণ করিয়াও

কারাগার হইতে "হরিজন আন্দোলন" পরিচালন জন্য ইংরেজ সরকারের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

অমৃতলাল সেই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে "হরিজন সেবকসঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠাবধি তাহার সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে "ভারতীয় আদিমজাতি সেবকসঙ্ঘ" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গান্ধীজী তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছিলেন—"ঠক্কর বাপা অসাধারণ কর্ম্মী। তিনি প্রশংসা চাহেন না। তিনি স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান।"

অমৃতলালজী অনুন্নত জাতিসমূহকে বলিতে শিখাইয়াছিলেন—"ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—আমার যৌবনের উপবন—আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী * * ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"

জাতির কল্যাণসাধনে অমৃতলালজীর চেষ্টা কখন ব্যর্থ হইতে পারে না।

সভ্য ও অসভ্য—

এখনও যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে প্রতিদিন বহু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা আপনাদিগের বাস নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছেন না।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের নিকট লিখিয়াছেন—পূর্ব্ববঙ্গে এক সম্প্রদায়ের সংবাদপত্র ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া নানারূপ মিথ্যা প্রচার করিতেছেন। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে পাকিস্তানের প্রধান-মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হইয়া লঙ্ঘিতই হইতেছে। 'মর্ণিং নিউজ' ঢাকা হইতে প্রচার করিতেছেন, গত ঈদ পর্ব্বের সময় ভারতরাষ্ট্রে নানা স্থানে মুসলমানরা ঈদ পালন করিতে পারে নাই—বহু মুসলমান নিহত হইয়াছে।

যদিও পাকিস্তানের পক্ষ হইতে প্রচার করা হইতেছে—যে সকল হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে, তাহারা পুনর্ব্বসতির সকল সুযোগ পাইতেছে, তথাপি—অতি অল্প প্রত্যাবৃত্তকেই তাহাদিগের গৃহ ও সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে; তাহারা নানারূপ অসুবিধাই ভোগ করিতেছে। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে হিন্দুদিগের ধান্য, চাউল, কাপড়, অলঙ্কার প্রভৃতি লুণ্ঠিত হইয়াছিল—সে সকল প্রত্যর্পিত হয় নাই; কেবল কোন কোন স্থানে তাহাদিগকে স্তূপীকৃত ভগ্ন দ্রব্যাদির মধ্য হইতে স্ব স্ব জিনিস বাছিয়া লইতে বলা হইতেছে। ইহা ব্যঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত হইতে পারে। হিন্দুদিগকে চাকরী দেওয়া হইতেছে না। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রম-কমিশনার অল্পদিন পূর্ব্বেও ইস্তাহার জারি করিয়াছেন—ভবিষ্যতে চাকরীতে যেন মুসলমানাতিরিক্ত কাহাকেও নিযুক্ত করা না হয়।

অথচ পশ্চিমবঙ্গে—নদীয়া, মালদহ ও হুগলী জিলাত্রয়ে প্রত্যাবৃত্ত ৬১ হাজার মুসলমানকে পুনর্ব্বসতির সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, প্রায় ৩০ হাজার পলায়িত মুসলমান শ্রমিকের মধ্যে ২০ হাজার প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রত্যাবৃত্ত মুসলমানদিগের জন্য ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩ শত ১০ টাকা সরকার ব্যয় করিয়াছেন।

আর ১৯৫০-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত মোট ৩৮ লক্ষ ১৫ হাজার একশত ৫ জন হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছেন—

পশ্চিমবঙ্গে	৩০,৭৫,৪৪৫ জন
আসামে	৪,৬৮,৭২৪ "
ত্রিপুরায়	২,২০,৫১৬ "
বিহারে	৫০,৪১১ "

কেবল তাহাই নহে, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে নানা স্থানে মুসলমানরা নানারূপ উপদ্রব করিতেছে—লুণ্ঠন ও অত্যাচার তাহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে। সেজন্য পুনঃ পুনঃ বৈঠক করিয়াও কোন ফল ফলিতেছে না। মুসলমানদিগের ঐরূপ ব্যবহার যে সরকারের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে, এমন না-ও হইতে পারে বটে; কিন্তু উহা যে পাকিস্তানের মুসলমানদিগের সদ্ভাব রক্ষার নিদর্শন এমন বলিতে পারা যায় না। এমন কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সীমান্তে কয় মাইল স্থান শূন্য রাখিবার প্রস্তাবও বিবেচনা করিতেছেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী, শিক্ষকতা, ব্যবসায়ী, জমীদারী, মহাজনী—এ সকলেই হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখায় যদি মুসলমানদিগের আপত্তি না থাকিত, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কোন

কারণই থাকিতে পারিত না। সুতরাং ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্তানে যে হিন্দুরা উপযুক্ত স্থান পাইবেন, এমন মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

পাকিস্তান-সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুদিগকে ক্ষতিপূরণ দিতে চাহেন নাই এবং অপহৃত হিন্দু তরুণীদিগকে উদ্ধার করিয়া প্রত্যর্পণেও তাঁহাদিগের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় নাই।

ভারত সরকারের উদারতা যে পাকিস্তানে কোন কোন লোক দৌর্ব্বল্য বলিয়া মনে করিতেছে তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই।

ভারত সরকারকে এই সকল বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।

নেপাল ও তিব্বত—

নেপালের ঘটনার অথ মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু সে পথে বিঘ্নও যে নাই এমন বলা যায় না। রাজা ত্রিভুবন নেপালে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং তিনি নেপালের অধিবাসীদিগকে শান্ত হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। দেখা গিয়াছে, তাহার পরে নেপালী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কৈরালা মহাশয়ও সেইরূপ নির্দ্দেশ প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু নেপালী কংগ্রেসের কোন কোন সম্প্রদায় সে নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে অসম্মত। তাঁহারা বলেন—তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া যে নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহারা তাহাতে বাধ্য হইতে পারেন না।

তবে আশা করা যায়, অল্পদিনের মধ্যেই মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং রাণাগোষ্ঠীর প্রতাপ ও প্রভাব নষ্ট হইলে নেপালে গণমত প্রবল হইয়া সর্ব্ববিধ উন্নতির উপায় করিতে পারিবে।

অবশ্য বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে গণতন্ত্রানুমোদিত হইবে না। তবে—উন্নতির গতি একবার আরম্ভ হইলে, তাহা কেহ কখন রোধ করিতে পারে না—তাহা চলিতেই থাকিবে।

তিব্বতের সংবাদ অতি অল্প এবং অস্পষ্ট। দালাই লামা তিব্বত ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করিয়াছেন এবং তাহাতেই প্রতিপন্ন হয়, তিব্বতে যে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াছে, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। দালাই লামা যদিও বলিয়াছেন, তিব্বত চীনের অধীনতা স্বীকার করে না—তথাপি সে অধীনতা ইংরেজ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—এবং সেই জন্য ভারত সরকারও তাহা অস্বীকার করেন না। সে অবস্থায় চীন যদি তিব্বতে শাসন-ব্যবস্থাদিতে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভারত সরকার তাহাতে বাধা দিতে অগ্রসর হইবেন, এমন মনে হয় না।

কাশ্মীর—

কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পাকিস্তানের পক্ষ হইতে বিদেশে কিরূপ প্রচার-কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহার পরিচয় গত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে লণ্ডনে প্রকাশিত 'ইভনিং নিউজ' পত্রের মন্তব্য পাঠ করিলে পাওয়া যায়। ঐ পত্রে বলা হইয়াছে—জওহরলাল নেহরু এসিয়া সম্বন্ধে প্রতীচীর কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের উপদেশ বিতরণের পূর্ব্বে কাশ্মীর সমস্যায় মনোযোগ দিলে ভাল হয়! সে ব্যাপারে নেহরু সদা-পরিবর্ত্তনশীল। "কমনওয়েলথের" দুই অংশে অর্থাৎ ভারতে ও পাকিস্তানে যে বিবাদ চলিতেছে, তাহা যেমন অশোভন তেমনই বিপদজনক। মিষ্টার লিয়াকৎ আলী বার বার যে সকল প্রস্তাব করিতেছেন, নেহরু সে সকলে সম্মত হ'ন নাই। মনে রাখিতে হইবে, কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা শতকরা ৮০ হইতে ৯০জন মুসলমান এবং যে সম্প্রদায় হিন্দু এতকাল তাহাদিগকে পীড়িত করিয়া আসিয়াছে—নেহরু তাহাদিগেরই সম্প্রদায়ের লোক—তিনি কাশ্মীরে সেই হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে চাহেন না।

এইরূপ প্রচারকার্য্যের অনিবার্য্য ফল অন্যান্য দেশে কি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভারত সরকার সম্মিলিত জাতি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কি করিতেছেন এবং সেখ আবদুল্লার প্রতিশ্রুতি কি ভাবে পালিত হইবে, তাহা এখন বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়াছে।

এদিকে কাশ্মীরের সমস্যা লইয়া যে পাকিস্তানে বিশেষরূপ উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টাও চলিতেছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

কাশ্মীরের অধিবাসীরা যে অস্বস্তির মধ্যে কালযাপন করিতেছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। সুতরাং এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক।

কোরিয়া ও বিশ্বযুদ্ধ—

যখন পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসে পৃথিবীর জাতিসকল যুদ্ধের আয়োজন বর্দ্ধিত করিতে ব্যস্ত, তখন যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে বারুদের স্তূপে বিস্ফোরণ অনিবার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। সেই জন্যই বিশেষ আশঙ্কার কারণ আছে যে, কোরিয়ার গৃহযুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হইতে পারে। চীনকে পরস্বাপহরণলোলুপ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আমেরিকার আগ্রহে বুঝিতে পারা যায়—আমেরিকা যুদ্ধের পক্ষপাতী। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অনেক দেশ এখনও—দ্বিতীয় যুদ্ধের ক্ষত দূর হইবার পূর্ব্বেই—আবার যুদ্ধ চাহে না। কিন্তু ইংলণ্ডের এক সম্প্রদায় যে যুদ্ধের পক্ষপাতী তাহার প্রমাণ—জওহরলাল নেহরু কোরিয়ার যুদ্ধের শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের চেষ্টা করায় ইংলণ্ডের 'নিউজ ক্রনিকল" ও 'ইভনিং নিউজ' প্রমুখ পত্রের আক্রমণের বিষয় হইয়াছেন। সে সকল পত্রে বলা হইয়াছে—তিনি আপনার মতই প্রবল মনে করেন—তিনি কাহারও প্রতিনিধি বলা যায় না। এমন কি যে নেহরু এতদিন অ্যাংলো-আমেরিকান দলের অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনিই সোভিয়েট রুশিয়ার দালাল বলিয়া অভিহিত হইতেছেন! অবশ্য—

"বড়র পীরিতি বালির বাঁধ—
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

কিন্তু নেহরু প্রথমাবধিই—ভারতের লোকমতের প্রভাবে—বলিয়াছেন—কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকার করিয়া লওয়া বিশ্ব-শান্তির জন্য প্রয়োজন। আজ যুদ্ধ-বিরতিতে সম্মত হইবার জন্য চীন চাহিতেছে— ১৫ই মাঘ—১৩৫৭

(১) কোরিয়া হইতে বিদেশী বাহিনীর অপসারণ;
(২) ফরমোশায় চীনের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার।

এই সর্ত্তদ্বয় অসঙ্গত বলা যায় না। অথচ প্রতীচ্য শক্তিপুঞ্জ এই সর্ত্তদ্বয়ে সম্মত হইতেছেন না। আবার রটনা করা হইতেছে, রুশিয়া তিন মাসের মধ্যেই যুদ্ধ করিবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিতেছে। এই রটনা সত্য কি না, বলা যায় না। তবে ইহা মনে করাও অসঙ্গত নহে যে, কোরিয়া লইয়া চীন যদি অ্যাংলো-আমেরিকান দলের সহিত জড়িত হয় তবে, মতবাদের জন্য, রুসিয়া চীনের পক্ষাবলম্বন করিতে পারে। মনে হয়, আমেরিকা মনে করিতেছে, এখনও বিমানে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে—এই সময় যুদ্ধ হইলে সে রুশিয়াকে পরাভূত করিতে পারিবে, বিলম্ব হইলে সে আশা দুরাশা হইতে পারে। রুশিয়ার মতবাদই সাম্রাজ্যবাদীর ও ধনিকবাদীর ভয়ের কারণ। কাজেই আমেরিকা যদি রুশিয়ার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে আগ্রহানুভব করে, তবে তাহার পক্ষে যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টার কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু যে সকল দেশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে—আর্থিক বা অন্য কারণে আমেরিকার তাবে থাকিতে বাধ্য নহে সে সকল দেশ কেন যুদ্ধের বিরোধী হইবে না? যুদ্ধে যদি আমেরিকার উপকার অর্থাৎ লাভ হয়, তাহাতে সে সকল দেশের ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব নহে। কারণ, আমেরিকার শোষণ কখনও কোন দেশের পক্ষে লাভজনক হইতে পারে না।

কাজিনস নামক একজন আমেরিকান সাংবাদিক ভারতে আসিয়াছেন। তিনি আমেরিকার সহিত ভারতের সম্প্রীতি সম্প্রসারণের কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা কি তাহার বর্ণগত কুসংস্কার ও শোষণাভিলাষ ত্যাগ করিতে পারিবে? সে যদি তাহা করিতে না পারে, তবে কিরূপে পৃথিবীর নানা দেশ গণতন্ত্রের মূল-নীতির সূত্রে বদ্ধ হইবে?

উনিশ

খবরটা নিয়ে এল হোসেন।

শাহুর ঘর ছেড়ে পরদিন সকালেই এসে ধাওয়া পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছেন মাস্টার। শাহু তাঁকে বরখাস্ত করেছেন, তাঁকে ঘোষণা করেছেন প্রত্যক্ষ শত্রু বলে। এ অবস্থায় কাউকে বিব্রত করা উচিত হবে কিনা সেইটেই ঠিক করতে পারছিলেন না আলিমুদ্দিন। তবে কি গ্রাম ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হবে? যে পাকিস্তান তার জীবনের ব্রত— যে পাকিস্তান তামাম দুনিয়ার গরীবের দেশ, সেখানে 'বখিলে'র হাতে মানুষের রক্ত মুঠো মুঠো সোনা হয়ে সঞ্চিত হবেনা, তার সেই আজাদী প্রতিষ্ঠার সূচনাতেই এমন করে পিছিয়ে পড়বেন তিনি? একটা খুনী শয়তান জমিদারের ভয়ে গ্রাম থেকে পালাবেন? সভার সামনে হাজার মানুষের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন শুধু এইটুকু বিরোধিতার চাপেই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে তাঁকে?

'সারে জাঁহা সে আচ্ছা পাকিস্তান হামারা—'

একটা অনিশ্চয়ের মধ্যবিন্দুতে মন যখন টলমল করছিল তখন তাঁকে ঘরে টেনে নিয়ে গেল জলিল ধাওয়া।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ভয় করবেনা?

আজ আর সেদিনের মতো মদ খায়নি, তবু মাতালের হাসি হেসেছিল জলিল। জীবনটাকে ভুলতে গিয়ে যে নেশার মধ্যে ওরা ডুব দিয়েছে, সে নেশার ঘোর ওদের আর ভাঙেনা। মদ না খেলেও না। ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়।—সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল।

যথেষ্ট। এর পরে বলবার আর কিছুই নেই। ভাঙন-ধরা খাড়া পাড়ির গায়ে যে-মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একটু পরে আপনিই সে ঝরে পড়বে স্রোতের মধ্যে, ভেসে যাবে কুটোর মতো। পেছন থেকে কেউ ধাক্কা দেবে কি দেবেনা, দুর্ভাবনার সে-স্তরটা সে পেরিয়ে এসেছে অনেক আগেই।

সুতরাং হোগলার বেড়া আর খড়ের চালে ছাওয়া, মাছ আর জালের পচা আঁশটে গন্ধে আকীর্ণ এই ঘরে আলিমুদ্দিন আশ্রয় নিয়েছেন॥ তেতো পাটশাক, মাছের ঝোল, আর রাঙা চালের ভাত দিয়ে যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করছে জলিল।

বলেছে, খোদার কাছে দোয়া করুন মাস্টার সাহেব, জাল ভরে যেন মাছ পাই। তা হলেই হবে।

সকালে মাস্টার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নমাজ পড়ছিলেন, আর একটু দূরে একটা চাল্‌তে গাছের তলায় বসে পাঁচ বছরের ন্যাংটা ছেলেটাকে নিয়ে জালে গাব দিচ্ছিল জলিল। মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিল মাস্টারের নমাজের দিকে। ধর্মকর্মের বালাই খুব বেশি নেই সম্প্রদায়টার—দু চার জন ছাড়া 'রোজা'ও বড় কেউ রাখেনা। অবশ্য প্রকাশ্যে সেটা কেউ স্বীকার করেনা, আর আড়ালে হাসাহাসি করে বলে: "যে হয় খোজা, সে করে রোজা—"

সুতরাং মাস্টারের নমাজ দেখতে দেখতে জলিল যেন আকস্মিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে উঠছিল এবং জালে রঙ্‌ লাগানোর কাজেও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় ঘটনাস্থলে প্রবেশ করল কালু বাদিয়ার ছেলে হোসেন।

—কী খবর ভাই সাহেব? এত ব্যস্ত যে?

হোসেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মাস্টারকে একনিষ্ঠভাবে নমাজ পড়তে দেখে নিজেকে সামলে নিলে।

জলিলের দিকে তাকিয়ে বললে, একটু পানি খাওয়াতে পারো মিঞা, এক ঘটি ঠাণ্ডা পানি?

—এই সকালেই এমন করে পানি? হয়েছে কী?

—বলছি পরে। বড় পিয়াস লেগেছে ভাই—ঢের দূর থেকে দৌড়ে আসছি।

জলিল ব্যস্ত হয়ে জালের কাঠি ছেড়ে দিলে। তার পর তাড়া দিলে ছেলেটাকে।

—যাতো দেলোয়ার। তোর আম্মার কাছ থেকে লোটা ভরে পানি আর গুড় নিয়ে আয় একটু।

—গুড় লাগবেনা, পানি হলেই চলবে।

দেলোয়ার দৌড়ে চলে গেল।

জলিল বললে, ব্যাপার কী মিঞা?

—সাংঘাতিক।

—কী রকম সাংঘাতিক?

—খুব দাঙ্গা লাগবে আজ।

—দাঙ্গা? কোথায় দাঙ্গা?

—পালনগরের টিলায়।

—সেতো সাঁওতালের আড্ডা। আবার শাহুর লোক-লস্কর যাচ্ছে নাকি তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে? ওদের তীরের কথা বুঝি ভুলে গেছে এর মধ্যে?

হোসেন মাস্টারের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিলে। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে 'শেজ্‌দা' করছেন মাস্টার—সমস্ত মন তাঁর তন্ময় হয়ে আছে। জবাব দেবার আগে ইতস্তত করতে লাগল সে।

এক থাবা ভেলি গুড়, আর এক ঘটি জল নিয়ে ফিরল দেলোয়ার। এক চুমুকে জলটা নিঃশেষ করলে হোসেন—যেন বুকের ভেতরে একটা মরুভূমি বয়ে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ।

জলিল অধৈর্য হয়ে উঠল।

—কিসের দাঙ্গা?

হোসেন বললে, যা এ তল্লাটে কোনোদিন হয়নি, তাই।

—খোল্‌সা করে বলো—জলিল আরো উত্যক্ত হয়ে উঠল।

—হিন্দু-মোছলমানে।

হিন্দু-মোছলমানে। জলিল হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাটি ছেড়ে তীরের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন আলিমুদ্দিন।

—কী নিয়ে দাঙ্গা হবে হিন্দু-মোছলমানে? মেঘের মতো গভীর গলায় মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন।

হোসেন বললে, ব্যাপার এর মধ্যেই ঢের দূর গড়িয়েছে মাস্টার সাহেব। সাঁওতালদের কিছুতে জব্দ না করতে পেরে এবার নতুন রাস্তা নিয়েছেন শাহু। লীগের ঢোল পিটিয়ে লোক জুটিয়েছেন সব, তারপর তাদের নিয়ে মস্‌জিদ বসাতে যাচ্ছেন পাল গাঁয়ের টিলার ওপর। সাঁওতালদের কালীর থান যেখানে আছে ঠিক তার গায়ে। বলছেন, অনেককাল আগে ওখানে নাকি মসজিদ ছিল।

—ছিল নাকি?

—কই, আমরা তো কখনো শুনিনি। এসব ইসমাইল সাহেবের কারসাজী বলে মনে হচ্ছে। ইসমাইল সাহেবই সকলকে ডেকে বলেছে আমাদের মসজিদ গড়ার কাজে কেউ বাধা দিলে তার মাথা আগে ভেঙে দিতে হবে। পাকিস্তান গড়তে গেলে এইটেই পয়লা কানুন—আগে আমার ধর্ম রাখতে হবে।

—কত লোক নিয়ে যাচ্ছে? ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস্ করলেন মাস্টার।

—তা প্রায় শ'খানিক হবে। লাঠি শড়কিও যাচ্ছে।

মাস্টার নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরলেন একবার।

—সত্যিই তা হলে ওখানে মস্‌জিদ কখনো ছিল না?—

—না।—হোসেন বললে, মতলব বুঝতে পারছেন না? যে প্রজার সঙ্গে এম্‌নিতে এঁটে ওঠা যাবে না, তাকে জব্দ করতে গেলে এই রকম কিছু একটা তো চাই।

মাস্টারের সমস্ত মুখটা ক্রোধে ঘৃণায় হিংস্র হয়ে উঠল।

—মতলব বুঝতে পারছি বই কি। আরো বুঝতে পারছি, এইখানেই এর শেষ নয়। ফতেশা পাঠানের মতো লোকের হাতে যদি কোনোদিন পাকিস্থান পড়ে, তা হলে এই নিয়মেই তা চলতে থাকবে। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে দেবে ধর্মের দোহাই, কোরাণ আর খোদাতালার পবিত্র নামের অমর্যাদা করে নিজেদের কাজ হাসিল করবে ইস্‌লামী জিগির তুলে। দেশ জুড়ে আনবে হাঙ্গামা—ঝরবে নিরীহ সরল মানুষের কল্‌জের রক্ত।

হোসেন বললে, খবর পেয়েই তো ছুটে এলাম মাস্টার সাহেব। কী করা যায়? চোখের সামনে মিছিমিছি খুন খারাপী হবে—দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলবে!

—শুধু চোখের সামনে নয়, সারা দেশেও ছড়িয়ে পড়বে। তারপরে—ঝড়ের আকাশের মতো কী একটা ঘন হয়ে এল আলিমুদ্দিনের মুখে: ধর্মের জন্যে জান্ কোর্‌বান করলে মুসলমানের বেহেস্ত। মস্‌জিদের একখানা ইট তাকে রাখতে হবে পাঁজরার একখানা হাড় দিয়ে। কিন্তু ধর্মের নাম নিয়ে এই শয়তানী বরদাস্ত করা যাবে না। হোসেন, জলিল—যেমন করে হোক এ দাঙ্গা রুখতে হবে। জলিল দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে আধখানা বাঁশ কুড়িয়ে নিলে সে।

—হাঁ মাস্টার সাহেব, দাঙ্গা রুখে দেব আমরা।

—তোমার দলবল তৈরী আছে হোসেন?

—ডাকলেই এসে পড়বে।

—চলো তা হলে, একটু দেরী নয় আর—মাস্টার পা বাড়ালেন।

—আমিও যাব বা-জান?—কী বুঝেছে কে জানে, উৎসুক মিনতিভরা গলায় হঠাৎ অনুমতি চাইল দেলোয়ার।

মাস্টার ফিরে তাকালেন দেলোয়ারের দিকে। অযত্ন-মলিন ক্ষুধাশীর্ণ শিশু মুখখানা এই মুহূর্তে যেন আশ্চর্য সুন্দর মনে হল তাঁর।

গভীর স্নেহে দেলোয়ারের মাথার ওপর হাত রাখলেন আলিমুদ্দিন।

—আগে আমরাই চেষ্টা করে দেখি বাপ। যদি না পারি, আমাদের কাজের ভার তোমাদের ওপরেই রইল। আমাদের যা বাকী থাকবে, তা তোমাদেরই শেষ করতে হবে যে!

* * *

যেমন আচমকা পা জড়িয়ে ধরে কান্না আরম্ভ করেছিল কালোশশী, তেমনি আকস্মিকভাবেই পা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ উঠে চলে গেল বাইরে।

রঞ্জন একান্ত নির্বোধের মতো খাটের ওপরেই বসে রইল কিছুক্ষণ।

আরো কিছুক্ষণ পরে খোলা ঝাঁপের ভেতর দিয়ে এল সাইক্লোনের এক ঝলক উদ্দাম বাতাস। যে কেরোসিনের ডিবাটা একটা রক্তশিখা তুলে জলছিল এতক্ষণ, দপ্ করে নিবে গিয়ে যেন অন্ধকারের ঘূর্ণিতে ভেসে চলে গেল।

আর সেই অন্ধকারে চকিত হয়ে উঠল রঞ্জন—যেন এতক্ষণের ঘোরটা কেটে গেল তার। মনে হল এই ঘরের সর্বত্র অসংখ্য মাটির পাত্রে সংখ্যাতীত সাপ আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে—বিষাক্ত জ্বালা নিয়ে একটা দুঃসহ বন্দিত্বে। আছে গোখরো, আছে কেউটে, আছে চিতি, আছে চন্দ্রবোড়া, আছে আলাদ, আছে নাম-না-জানা অগণিত মৃত্যুর অনুচর। এই অন্ধকারে হঠাৎ যদি মুক্তি পায়? রঞ্জনের চতুর্দিক মুহূর্তে যেন রাশি রাশি সরীসৃপে [illegible]বিল হয়ে উঠল—বাইরের গর্জিত রাত্রি লক্ষ লক্ষ সাপের মতো ক্রুদ্ধ গর্জনে যেন ছোবল মারতে লাগল, চারদিকের ঘনীভূত কালোর ভেতর থেকে বিষ-জর্জর মৃত্যু যেন তাকেই লক্ষ্য করে আবর্তিত হয়ে উঠল।

আর নয়! আর এখানে থাকলে বিষের জ্বালায় সে ঢলে পড়বে। সে বিষক্রিয়ার প্রথম পর্বটুকু নাগিনী কালোশশীই শুরু করে দিয়েছে। পালাও—এখনো পালাও! এখনো সময় আছে।

কিন্তু কোথায় গেল কালোশশী?

যে চুলোয় খুশি যাক। সেজন্যে ভাবনা করার সময় নেই এখন। রঞ্জন অন্ধকারেই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্যের মতো ঝাঁপের দিকে লাফিয়ে পড়ল। কালোশশীর জন্যে মনোবিলাস করবার মতো অপর্যাপ্ত সময় তার হাতে নেই। আকাশ গর্জাচ্ছে, বাতাস গর্জাচ্ছে—নদী গর্জাচ্ছে। বহুদিনের অবরোধ ভেঙে ফেলে ক্ষুব্ধ আক্রোশে পৃথিবী গর্জন তুলছে আজ। এইবারে জল নামবে কালাপুখ্‌রির 'চাঁড়া' দিয়ে। তারপর—

এই মুহূর্তে তাকে যেতে হবে জয়গড়ে। খেয়া না থাক, সাঁতার দিয়ে পার হতে হবে নদী।

বৃষ্টির জোরটা মন্দা হয়ে এসেছে। কোমরভাঙা গোখরোর অন্তিম ছোবলের মতো ঝোড়ো হাওয়া। আর একবার বিদ্যুতের আলোয় রঞ্জন দেখল—কাঁদড়ের ধারে কে যেন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে। বাতাসে তার রুক্ষ চুলগুলো উড়ে যাচ্ছে।

থাকুক দাঁড়িয়ে। ওর কান্না আজ রাত্রির এই কান্নার সঙ্গে একাকার হয়ে যাক।

জয়গড়ে এসে পৌছুল একটা ভূতুড়ে চেহারা নিয়ে।

—কী হয়েছিল?—হতবাক হয়ে জানতে চাইল নগেন।

—সে অনেক কথা—পরে হবে। আপাতত কুমার বাহাদুরের ওখান থেকে চম্পট দিয়েছি। কিন্তু উত্তমা কোথায়—উত্তমা? সকলের আগে এক পেয়ালা গরম চা চাই আমার।

ঘটনাটা ঘটল তার দুদিন পরে।

নগেন ডাক্তার সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল রোগী দেখতে। পনেরো মিনিট যেতে না যেতেই ফিরল। দড়াম করে সাইকেলটা আছড়ে ফেলল, হুড়মুড় করে টেনে খুলল ডিস্‌পেন্‌সারীর দরজা—ঝড়ের গতিতে এসে হাজির হল রঞ্জনের কাছে।

রঞ্জন তলিয়েছিল একরাশ কাগজপত্রের মধ্যে। চমকে উঠল।

—একেবারে ভগ্নদূতের অবস্থা দেখছি ডাক্তার।

—ব্যাপার সাংঘাতিক। সাঁওতালদের সঙ্গে শাহু দাঙ্গা বাধিয়েছে পালনগরে।

—আবার সেই টুলকু মাঝিদের সঙ্গে ?

—না, শ্রাদ্ধ গড়িয়েছে অনেকদূর। দাঙ্গা লেগেছে হিন্দু-মুসলমানে।

হিন্দু-মুসলমানে! রঞ্জন লাফিয়ে নেমে পড়ল খাট থেকে।

—একটা বাড়্তি সাইকেল জোটাতে পারো ডাক্তার ?

—এক্ষুণি।

রাতারাতি কালীর থানের পাশে কে কখন টিনের চালা তুলে ফেলল—টেরও পায়নি সাঁওতালেরা। এমনিতেই কালীর থান গাঁ থেকে একটু দূরে—একটা অন্ধকার অশথ্ গাছের তলায়। তার ওপর সারাদিনের খাটনির পরে যখন ওরা গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে—তখন রাতে ওদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলা সাধারণ শব্দ সাড়ার কাজ নয়।

ওদের খেয়াল হল সকালে—আজানের শব্দে।

কালীর থানের কাছে টিনের চালা ঘরের সামনে আজান দিচ্ছেন হাজী সাহেব। চারপাশে দলে দলে জড়ো হয়েছে ভক্ত মুসলমানের দল—সেই আজানের আকর্ষণে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে রইল সাঁওতালেরা। তারপর দুচারজন করে এগোল সেদিকে।

—কী এসব ?

জনতার একজন গম্ভীর গলায় জবাব দিলে, কী এসব জানো না ? মস্‌জিদে আজান দেওয়া হচ্ছে।

—মসজিদ ?

—হাঁ, মসজিদ।

—কবে হল মসজিদ ?

—বরাবরের।

বরাবরের! সাঁওতালেরা একবার এ ওর দিকে তাকালো।

—কই, আমরা তো কিছু জানতাম না।

—তোমাদের না জানলেও চলবে।

—আমাদের কালীর থানের গায়ে মস্‌জিদ। কোনোদিন তো কেউ নমাজ পড়েনি এখানে।

—কোনোদিন না পড়লেও আজ পড়বে না, এমন কোনো কথা নেই। যাও—সরে পড়ো সব এখান থেকে —জবাব দিলে ইস্‌মাইল।

—তা হলে আমাদের কালীপূজোর কী হবে ?—সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ সাঁওতাল জানতে চাইল: আমরা এখানে পূজো করতে পারব না, ঢোল বাজাতে পারব না—

—তোমাদের ওই ভূতুড়ে কালীকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিলের জলে ফেলে দাও। খোদাতালার মসজিদের কাছে ও সব আর চলবে না।

বুড়োর চোখ দুটো ধক্ ধক্ জ্বলে উঠল। কিন্তু আর কোনো উচ্চবাচ্য করলনা। আস্তে আস্তে সরে এল গাঁয়ের দিকে। একশো লোক পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে নমাজ পড়তে লাগল।

গাঁয়ে ফিরেই নাকড়া বাজিয়ে দিলে মোড়ল। পঞ্চায়েৎ। ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে নাকাড়ার শব্দ দিকে দিকে রণ-আহ্বান ঘোষণা করল।

যারা নমাজ পড়ছিল, তারা নমাজ শেষ করেই উঠে গেলনা। তারা জানে, এ শুধু আরম্ভ—শেষ নয়। এর পরে আসবে সত্যিকারের কাজ। গোল হয়ে মসজিদের চারপাশে বসে রইল তারা।

ঘণ্টা দুই পরে ফিরল মোড়ল। একা নয়—সঙ্গে আরো জন-তিনেক অনুচর।

—এখানে কোনোদিন মস্‌জিদ ছিলনা—মোড়ল জানালো।

—বরাবর ছিল—তেজালো গলায় জবাব দিলে ইসমাইল।

—এইখানে মস্‌জিদ থাকবেনা—মোড়ল আবার বললে।

—আলবৎ থাকবে।

—তা হলে আমাদের পূজো হবেনা।—মোড়ল ধীর কঠিন স্বরে বললে, আমরা এখানে থাকতে দেবনা মস্‌জিদ।

—কী করবে তবে ?—বুক চিতিয়ে জানতে চাইল ইস্‌মাইল। মাথার বিশৃঙ্খল চুলগুলো দু পাশ দিয়ে বন্য আকারে নেমে এসেছে। হাতের মুঠি দুটো বদ্ধ হয়ে এসেছে আপনা থেকেই।

—ভেঙে দেব।—মোড়লের স্বর তেম্‌নি শান্ত আর কঠিন!

—ভেঙে দেবে—মস্‌জিদ ভেঙে দেবে!—আকাশ ফাটানো চীৎকার করে উঠল ইস্‌মাইল: ভাই সব, মোছলমানের বাচ্চা হয়েও এর পর চুপ করে আছো তোমরা?

—আল্লা-হো-আকবর—

একটা পৈশাচিক ধ্বনি উঠল করুণাময় ঈশ্বরের নাম নিয়ে। কোথা থেকে একখানা তরোয়াল কে ইস্‌মাইলের হাতে বাগিয়ে দিলে—হিংস্র উল্লাসে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে উন্মত্তের মতো ইস্‌মাইল বললে, চলে আয়—কে মসজিদ ভাঙবি চলে আয়—

এমন সময় পেছনের টিলার ওপর ডুম্‌ ডুম্‌ শব্দে নাকাড়া বেজে উঠল।

মন্ত্রবলে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠেছে ষাট-সত্তর জন সাঁওতাল কারো হাতে তীর ধনুক, কারো বল্লম, কারো লাঠি। বুড়ো থেকে দশ বছরের বাচ্চা—বাদ নেই কেউ। এমন কি, টুল্‌কু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়াও আছে তাদের মধ্যে। পেছনে মেয়েরা—তাদেরও হাতে তীর-ধনুক।

তার পরে মুহূর্ত মাত্র।

একটা লাঠি উঠে এল মোড়লের মাথা লক্ষ্য করে—আর একটা টাঙ্গি চট্‌ করে রুখে দিলে তাকে। মোড়ল তার সঙ্গীদের নিয়ে ছুটে চলে এল নিজের দলের মধ্যে। আকাশে বাহু তুলে রক্ত চোখে গর্জন করে বললে, মার্‌—

ত্রিশজন সাঁওতাল হাঁটু গেড়ে বসে ধনুকে তীর জুড়ল। ধারালো ইস্পাতের ফলাগুলো রোদে ঝক ঝক করে উঠল।

—থামো, থামো সব—বহু কণ্ঠে একটা চীৎকার উঠল। মুহূর্তের জন্যে যুযুৎসু দুই দল তাকালো সেই শব্দের দিকে। চীৎকার করতে করতে পঞ্চাশ ষাট জন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে মাঠের ভেতর দিয়ে: থামাও—দাঙ্গা থামাও—

কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে রইল দু দল। সন্দেহে ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালো ইস্‌মাইল—মোড়ল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল। দু দলের মধ্যে গুঞ্জনের ঢেউ বয়ে যেতে লাগল।

যুযুৎসু দুটি বাহিনীর মাঝখানটিতে—সংগ্রাম ক্ষেত্রে দু হাত তুলে দাঁড়ালেন আলিমুদ্দিন মাস্টার। পেছনে পেছনে তারও জনত্রিশেক লোক। কিছু ধাওয়া—কিছু বাদিয়া হোসেনের দল।

আলিমুদ্দিন রুদ্ধশ্বাসে বললেন, মিথ্যে খুন-খারাপীর মধ্যে কেন যাচ্ছ ভাই সব? মাতব্বরদের নিয়ে বৈঠক হোক—মস্‌জিদ এখানে আদৌ ছিল কিনা সেটা ঠিক হোক—তার পরে যা হয় হবে।

ইসমাইলের চোখ দুটো ক্রোধের জ্বালায় ঠিকরে পড়তে লাগল।

—আলবৎ ছিল মস্‌জিদ, হাজার বার ছিল। তুমি কাফের—এ সব ব্যাপারে কেন মাথা গলাতে এসেছো মাস্টার?

কিন্তু ইস্‌মাইলের কথার শেষটা কেউ শুনতে পেলনা। তার আগেই ধাওয়া আর হোসেনের দল সমস্বরে গর্জন তুলল: কাফের! মুখ সামাল্‌ ইস্‌মাইল সাহেব!

ইস্‌মাইল থর থর করে কাঁপতে লাগল: নিশ্চয় কাফের!

হোসেন বললে, ইসমাইল সাহেব, এ শাশুর বৈঠকখানা নয়। ইজ্জৎ বাঁচাতে হলে জবান সামলাও। নইলে এখান থেকে মাথা নিয়ে ফিরতে পারবেনা।

ইসমাইল একবার তাকালো চারদিকে। তার অপমানে তার দলবলের মধ্যে তো চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি! এতগুলো মুখ তো প্রতিহিংসায় কালো হয়ে ওঠেনি। হঠাৎ মনে হল কোনো শক্ত মাটির ওপরে পা দিয়ে সে দাঁড়িয়ে নেই। সেখানেও টলমল করছে চোরাবালি। আরো অনুভব করল—সকলের দৃষ্টি একান্তভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে আলিমুদ্দিনের প্রতি—তার দিকে নয়!

অবস্থাটা অনুমান করে হাজী সাহেবই এগিয়ে এলেন সম্মুখে।

—কী হচ্ছে এসব? মোছলমানে মোছলমানে দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বাধাবার কী মানে হয়? মাস্টার সাহেব কী বলছেন—শোনা যাক।

—মাস্টার আবার—ইস্‌মাইল বলতে গেল।

—আপনি চুপ করুন—চীৎকার করে উঠল জনতার মধ্য থেকে: আমরা মাস্টার সাহেবের কথাই শুনতে চাই।

পায়ের তলায় যে চোরাবালির শিথিল ভিত্তি অনুভব

করছিল, এবার যেন তারই মধ্যে মিলিয়ে গেল ইস্‌মাইল। শাহুর বৈঠকখানা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া যায় মাস্টার কে, বরখাস্ত করা যায় চাকরী থেকে—কিন্তু—

ওই কিন্তুই সর্বনেশে! মাটির গভীরে যেখানে আলিমুদ্দিনের অলক্ষ্যে শিকড় গিয়ে পৌঁচেছে, সেখান থেকে কে তাকে উৎপাটন করবে?

বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ইস্‌মাইল দাঁড়িয়ে রইল।

আলিমুদ্দিন সাঁওতালদের দিকে ফিরে তাকালেন।

—এগিয়ে এসো, এগিয়ে এসো তোমরা। মিছি মিছি তোমাদের ধর্মে কর্মে কেউ ব্যাঘাত করবে না।

তীরগতিতে এই সময় আরো দুটো সাইকেল এসে পৌঁছুল। নগেন আর রঞ্জন। কলস্বরে সম্বর্ধনা করে উঠল সাঁওতালেরা। এতক্ষণে যেন নিজেদের লোক পেয়েছে নির্ভর করবার মতো।

আলিমুদ্দিন হেসে অভ্যর্থনা করলেন।

—আসুন আসুন। বড় ভালো হয়েছে। সকলে মিলে একটা মীমাংসা করে ফেলা যাক।

কালো মুখে, ক্ষিপ্ত চোখের অগ্নিবর্ষণ করতে করতে ইস্‌মাইল ক্রমশ ভিড়ের পেছন দিকে হটে যেতে লাগল। অবিলম্বে খবর দিতে হবে শাহুকে—অন্য উপায় দেখতে হবে এইবার।

আলিমুদ্দিন ততক্ষণে বক্তৃতা দিতে সুরু করেছেন।

—ভাই সব, আশেপাশের গাঁয়ে অনেক প্রবীণ মাতব্বর আছেন। তাঁরাই ভালো জানেন—এখানে কোনোদিন মসজিদ ছিল কিনা, অথবা কবে ছিল। যদি থাকে—

হাজী সাহেবের একটা টাট্টু ঘোড়া বাঁধা ছিল হিজল গাছের সঙ্গে। ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়াটা খুলে নিলে ইস্‌মাইল—তারপর দ্রুতবেগে সেটাকে হাঁকিয়ে দিলে পালনগরের উদ্দেশ্যে। (ক্রমশ)

গৃহং তপোবনং

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ছিল তারা দুটি ভাই,
বড়—সংসারী দারুণ বিষয়ী, তুলনা তাহার নাই।
ছোট ভাই ছিল ত্যাগী—
গেল গৃহ ছাড়ি সন্ন্যাস লয়ে, উদাসীন বৈরাগী।
কঠিন তপস্যায়,
হ'ল হঠযোগী—বহু সম্মান যেথা যায় সেথা পায়।
দ্বাদশ বরষ পর
গৃহ দেবতারে প্রণাম করিতে বারেক ফিরিল ঘর।
বড় ভাই সংসারী।
গ্রামকে করেছে সম্পদশালী, বাড়ায়েছে জমিদারী।
গ্রামের সকল লোক,
উন্নততর সুখী সুন্দর জীবন করিছে ভোগ।
বাঁধানো নদীর ঘাট—
সুদূরের সব পণ্য তরণী আসিয়া দিতেছে আঁট।
ভবন বিশাল অতি
প্রাসাদ তুল্য বিরাজ করিছে লক্ষ্মী সরস্বতী।
সাধু হাত দিয়া গালে—
ভাবে, অগ্রজ জড়িত হয়েছে কি জটিল মায়া জালে!
মানুষ এমনি বোকা—
মোহের রেশমী গুটি পাকাইতে নিজে হল 'পলু পোকা!

দাদার নিকটে গেলে
সুধালেন তিনি গৃহ ছাড়ি ভাই বল কি বস্তু পেলে?
ভ্রাতা গর্ব্বিত হিয়া,
কাষ্ঠ-পাদুকা পরি' খর নদী হাঁটি গেল উতরিয়া।
রঙিন পান্‌সী চড়ি'
বড় ভাই ত্বরা চার দাঁড় বাহি' ওপারে ভিড়ালো তরী।
কহে কনিষ্ঠে ডাকি—
এতদিনে ভাই এই বিদ্যাই শিখিয়া এসেছ নাকি?
ইহাতে কি আছে আর—
সাধনায় তুমি লাভ করিয়াছ সিদ্ধি দুপয়সার।
একি ক্ষীণ সঞ্চয়!
পরপার লাগি পাটনী যা চায়—ইহার বেশী তো নয়!
বৃথায় বরষ গেল।
ও তব ইন্দ্রজালের চেয়ে যে মোর মায়া জাল ভাল।
নহ তুমি অজ্ঞান
কোনো যুগে ভাই ভেল্‌কীতে কেহ পেয়েছে কি ভগবান?
বাড়ানু দেশের শ্রী—
ক্ষুদ্র সিদ্ধি লভেছি, মূল্য কিছু তার নাহি কি?
সংসারী বটি আমি—
তাঁর সংসার, যা কিছু করেছি হয়ে তাঁর প্রীতিকামী।

হোক শোক তাপ ভরা
প্রেম, সংযম, সাধুতায় যায় গৃহ তপোবন করা।

আন্তর্জাতিক অতিথি ভবন—

রামকৃষ্ণ মহামণ্ডলের চেষ্টায় কলিকাতার নিকটস্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর দক্ষিণ পাশে গত ২১শে জানুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কাটজু একটি আন্তর্জাতিক অতিথি ভবনের উদ্বোধন করিয়াছেন। যে গৃহে অতিথি ভবন হইল তথায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন ও নির্জন বলিয়া ধ্যান করিতেন। গৃহটি পূর্বে স্বর্গত যদুনাথ মল্লিকের ছিল—বালী পুল নির্মাণের সময় রেল কর্তৃপক্ষ তাহা ক্রয় করেন। তিন বিঘা জমী, একটি পুকুর ও গৃহটি সম্প্রতি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে রামকৃষ্ণ মহামণ্ডল ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ভারত ও বাংলার বাহিরের রামকৃষ্ণ ভক্তগণ কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদের ঐ গৃহে থাকিতে দেওয়া হইবে। মহামণ্ডলের সভাপতি কলিকাতা পুলিসের শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ একদল কর্মীর অক্লান্ত চেষ্টায় এই অতিথি ভবন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। ঐ ভবন হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হইবে। দক্ষিণেশ্বরগামী ভক্তবৃন্দকে আমরা এই পবিত্র গৃহটিও দর্শন করিতে ও উহার উদ্দেশ্য সম্পাদনে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি।

খাদ্য বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস—

১৯৫১ সালের ২২শে জানুয়ারী হইতে কলিকাতা ও শিল্প এলাকায় এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রেশন এলাকায় রেশনের খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া জনপ্রতি ২ সের ১০ ছটাকের পরিবর্তে ২ সের করা হইয়াছে। পূর্বে চাল ও গম মিলিয়া সকালে ৩ ছটাক ও বিকালে ৩ ছটাক জনপ্রতি বরাদ্দ ছিল—এখন তাহাও আর রহিল না। ২ সের ১০ ছটাক বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও লোককে কালো-বাজারে চাল কিনিতে হইত—এখন কি হইবে তাহা ভাবিয়া লোক চিন্তিত হইয়াছে। এখন মাঘ মাস—ধান উঠার সময়—এই সময়েই খাদ্যাভাব আরম্ভ হইল—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের কথা এখন চিন্তার বাহিরে। সহরে ধনী লোকরা চাল-আটার পরিবর্তে মূল্যবান অন্য খাদ্য খাইতে পারিবে—কিন্তু যে সকল দরিদ্র লোক শুধু ভাত বা রুটি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে—তাহাদের অর্দ্ধাহারে থাকিয়া তিলে তিলে

স্টকহলম্ শহরে ভারতীয় বয়ন এবং কারিগরী শিল্পের সর্বপ্রথম বিরাট প্রদর্শনী। সুইডেনের মহামান্য রাজা গশ্টভ আডল্‌ফ্ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। সুইডেনস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীআর-কে নেহরুর পত্নী শ্রীমতী রাজেন নেহরু এই বিখ্যাত প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা

মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে। দরিদ্র পরিবারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও পেট ভরিয়া ভাত রুটি খাইতে পাইবে না। অথচ খাদ্য-ব্যবস্থার জন্য গত কয় বৎসর যাবৎ মোটা-বেতনে কত যে মন্ত্রী, উপমন্ত্রী ও কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহারা শুধু বেতনই গ্রহণ করেন, নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিলে আজ দেশে বর্তমান দুরবস্থার উদ্ভব হইত না। দেখিতে পান না—তাই কোটি কোটি দরিদ্র নরনারীর দুঃখ দেখিয়াও তাঁহারা বিচলিত হন না—বিচলিত হইলে অবশ্যই তাহার প্রতিবিধানে যত্নবান হইতেন।

ঠাকুর আইন অধ্যাপক—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালের জন্য শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন। ১ বৎসরের জন্য কোন বিশিষ্ট আইনজ্ঞকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয় ও তাঁহাকে বার্ষিক ৯ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তাঁহারা আইন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

স্টকহলম্ শহরে ভারতীয় বয়ন এবং কারিগরী শিল্প-প্রদর্শনী দর্শনাকাঙ্ক্ষী বিরাট জনতা

কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি—

১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাস হইতে মোটা ও মিহি কাপড়ের মূল্য ও সুতার দাম বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে যে কাপড়ের জোড়া ছিল দেড় টাকা—এখন তাহা হইয়াছে ১২ টাকা—অর্থাৎ ৮ গুণ। সুতার অভাবে মফঃস্বলে সর্বত্র তাঁত অচল হইয়া পড়িয়া আছে—এ অবস্থায় আবার নূতন করিয়া মূল্য বৃদ্ধির ফলে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা কিরূপ বাড়িবে, তাহা বোধ হয় বর্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের বুঝিবার শক্তি নাই। দারুণ শীতে গ্রামে মানুষকে আমরা বস্ত্রাভাবে দারুণ কষ্ট পাইতে দেখিয়া থাকি—সে দৃশ্য যদি মন্ত্রীদের চক্ষুতে পড়িত, তাহাদের মন অবশ্যই দরিদ্র জনগণের বস্ত্র-সমস্যা সমাধানের জন্য আকুল হইত। কাঠের পুতুলের মত মন্ত্রীরা বোধ হয় চক্ষু থাকিতেও

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ—

বাংলার বিপ্লব যুগের অন্যতম নেতা শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৪ই জানুয়ারী রবিবার হাওড়া টাউন হলে এক জনসভায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে এক রৌপ্য তরবারী উপহার দেওয়া হইয়াছে। সভার পূর্ব্বে বারীন্দ্রকুমার ও তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীউল্লাসকর দত্তকে লইয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহরের পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিক

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল জনগণের পক্ষ হইতে ঐ সভায় বারীন্দ্রকুমারকে মানপত্র দান করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতে বিপ্লব যুগের নেতৃবৃন্দের সম্বর্দ্ধনা তরুণদের মনে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ জাগাইয়া তুলিবে।

মিশর ও ভারত—

ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিদলের নেতারূপে অমৃত-বাজার-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ সম্প্রতি মিশর দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি গত ১৪ই জানুয়ারী এলাহাবাদে এক বেতার ভাষণে

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

বলিয়াছেন—"মিশর মুসলেম রাষ্ট্র নহে। মিশরের অধিকাংশ লোক ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ধর্ম্মকে তাহারা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া মনে করে এবং ধর্ম্মকে তাহারা রাষ্ট্রের নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেয় না। মিশরে প্রচার কার্য্যের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিলেও পাকিস্তানীদের প্রচার কার্য্যে তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। মিশর ভারতকে অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়াই মনে করে।" তুষারবাবুর এই উক্তি ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করিবে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় সংবাদপত্র সেবী সংঘ—

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সংঘের বার্ষিক সভায় যুগান্তর-সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতি, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্পাদক ও দৈনিক বসুমতীর শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। এই

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সংঘের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক-বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। সাংবাদিকগণের অন্যান্য অভাব অভিযোগগুলিও যাহাতে দূরীভূত হয়—নূতন কার্য্য-নির্বাহক সমিতি সে বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলেই তাঁহাদের নির্বাচন সার্থক হইবে। কার্য্য নির্বাহক সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪০জন।

শ্রীমতিলাল রায়—

চন্দননগর নিবাসী শ্রীমতিলাল রায় সারাজীবন দেশের মঙ্গলজনক কার্য্য করিয়া বাংলার সকলের নিকট বরেণ্য হইয়াছেন। গত ৬ই ও ৭ই জানুয়ারী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত প্রবর্ত্তক আশ্রমে তাঁহার ৬৯তম জন্মোৎসব আড়ম্বরের সহিত পালিত হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু ঐ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রী শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ঐ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত জনসভায় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। মতিবাবু ধর্ম্মজীবনের

মধ্য দিয়া দেশের গঠনমূলক কার্য্যের এক অভিনব প্রণালী দ্বারা দেশকে বিস্মিত ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। প্রবর্ত্তক সংঘের একদল ত্যাগী কর্ম্মী বাঙ্গালায় গঠনমূলক দেশোহিতকর কার্য্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, দেশবাসী সকলের তাহা অনুকরণের জিনিষ।

উদয়শঙ্কর সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৬ই জানুয়ারী সকালে কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ রূপমঞ্চ কার্য্যালয়ে নিখিলবঙ্গ সাময়িক পত্র সংঘ ও সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ হইতে এক সভায় খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর ও তাঁহার পত্নী শ্রীমতী অমলাশঙ্করকে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছিল। সম্বর্দ্ধনা সভায় যুগান্তর সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। বহু সাংবাদিক ও শিল্পী সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। নৃত্য-শিল্পীর এরূপ জন-সম্বর্দ্ধনা কলিকাতায় প্রায় নূতন। উদয়শঙ্কর সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করিতেছেন, সে জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শঙ্কর ও শ্রীঅমলাশঙ্কর

পরলোকে যতীন্দ্রমোহন রায়—

বগুড়ার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন রায় দীর্ঘকাল রোগভোগের পর গত ১৮ই জানুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা ট্রপিকাল স্কুল হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন। রাজসাহী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া তিনি স্বদেশী যুগেই দেশসেবাব্রত গ্রহণ করেন ও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চট্টগ্রামে ও ২৪ পরগণায় আটক ছিলেন। ১৯২০ সালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনেও যোগদান করেন। ১৯৩৮ সালে বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে তিনি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি যশোহর জেলার বোয়ালীতে জন্মগ্রহণ করিলেও সারাজীবন উত্তর ব অতিবাহিত করেন। বগুড়ায় তিনি সকল সদনুষ্ঠানে প্রেরণা দিতেন।

পরলোকে ঠক্কর বাপা—

খ্যাতনামা সমাজ-সেবক, গান্ধীজির সহকর্ম্মী অমৃতলা ঠক্কর (ঠক্কর বাপা নামে সুপরিচিত) গত ১৯শে জানুয়া ভবনগরে ৮২ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন

১৮৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ১৮৯০ সালে এঞ্জিনিয়ার হন ও ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত নানা স্থানে কাজ করেন। পরে ভারত সেবক সমিতিতে যোগদান করিয়া সমাজ সেবার ব্রত গ্রহণ করেন। সারাজীবন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে দুঃস্থ মানবের সেবা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। তিনি কস্তুরবা গান্ধী জাতীয় স্মারক নিধির সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি গান্ধীজির সহিত দাঙ্গাবিধ্বস্ত নোয়াখালিতে কাজ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ শিল্পী—শ্রীমুকুল দে

পরলোকে হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত—

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল হীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে গত ২২শে জানুয়ারী তাঁহার টালিগঞ্জস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৪ সালে পুলিশ বিভাগে যোগদান করিয়া গত ২৭ বৎসর দক্ষতা ও সততার সহিত তিনি কাজ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

লোকান্তরিতা বাংলার স্বনামধন্য মহিলা সাহিত্যিক নিরুপমা দেবী

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ—

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এস্‌সি পাশ করিয়া শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ কিছুকাল বাঙ্গালোরে ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঘোষের সহকারীরূপে কাজ করেন। তাহার পর ইংলণ্ডে যাইয়া লীড্‌স ও ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের

বিভিন্ন বিষয় শিক্ষালাভ করেন ও লীড্‌স হইতে পি-এচ্‌ডি উপাধি লাভ করেন। তাহার পর তিনি আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্র ঘুরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রীএন-এন-ঘোষ খ্যাতনামা আবহাওয়া-বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত।

ভারতে ডেনমার্ক ও গ্রীসের রাজকুমারদ্বয়—ইঁহারা সম্প্রতি দিল্লীতে আগমন করেন এবং তথা হইতে রাজঘাটে গিয়া মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ক্ষেত্রে মাল্য প্রদান করেন

আঞ্চলিক বাহিনী সপ্তাহ—

১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাস হইতে দেশের সর্বত্র যুবকগণকে সামরিক শিক্ষা প্রদানের জন্য আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। বড় বড় সহরে নির্দিষ্ট সংখ্যার শতকরা ৭০জন লোক আঞ্চলিক বাহিনীতে গৃহীত হইয়া অনেকে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে ও অনেকে এখনও শিক্ষালাভ করিতেছে। সকল সুস্থদেহ ভারতীয় নাগরিকেরই এই বাহিনীতে যোগদানের অধিকার আছে। যাহাতে সকলে এই বাহিনী গঠনের উপকারিতার কথা জানিয়া এ বিষয়ে কাজ করেন, সেজন্য ৬ই জানুয়ারী হইতে এক সপ্তাহকাল এ বিষয়ে প্রচার কার্য্য চালানো হইয়াছে। বিপদের সময় এই বাহিনীকে দেশরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। এই বাহিনীতে চাকুরীর জন্য যোগদান করা যায় না—সাময়িকভাবে সামরিক বৃত্তি-শিক্ষাদানের জন্য এই বাহিনী গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছে। সকলের এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া দেশরক্ষার ব্যাপারে আমরা যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

পশ্চিমবাংলার অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীসাধনরঞ্জন সরকার সম্প্রতি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ব্যবসায় পরিচালন বিষয়ে এম-এ ডিগ্রী

শ্রীসাধনরঞ্জন সরকার

লাভ করিয়াছেন। তিনি উৎপাদনপদ্ধতি, শ্রমিক-মালিক-সম্পর্ক, দাদন-নীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের পর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। তিনি বোষ্টনের বেদান্ত সমিতির সহিতও নিবিড় যোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা দ্বারা দেশ উপকৃত হউক—ইহাই আমরা কামনা করি।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বাঙ্গালোর অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন কলিকাতায় হইবে এবং ডক্টর (অধ্যাপক) শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহাতে সভাপতিত্ব করিবেন। জ্ঞানবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার পর

দিল্লীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণা মন্দিরের পরিচালক হইয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি রুড়কীতে গৃহনির্মাণ গবেষণা-মন্দিরের পরিচালক। তিনি সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় বাঙ্গালী মাত্রই গৌরব অনুভব করিবেন।

শ্রীপ্রশান্তশঙ্কর মজুমদার—

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের শ্রীপ্রশান্তশঙ্কর মজুমদার সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের পুনর্বসতি বিভাগের কৃষি বিভাগে কাজ পাইয়া ফুলিয়ায় কৃষিক্ষেত্রসমূহের উন্নতি
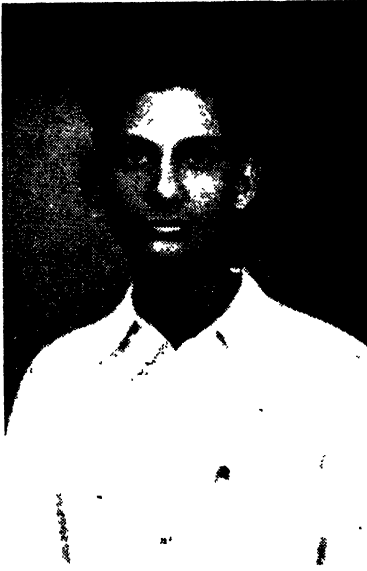
শ্রীপ্রশান্তশঙ্কর মজুমদার

বিধান-কর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ও রাষ্ট্রের কৃষি বিভাগে কাজ করার সময় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সমস্যা—

গত কয়েক মাস যাবৎ প্রতিদিনই সংবাদপত্রে সংবাদ দেখা যায় যে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীরা কোন কোন স্থানে সীমান্ত পার হইয়া পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া জিনিষপত্র লুঠ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এরূপও সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে আসাম সীমান্তে ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে ও স্থানে স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিয়া যুদ্ধের আয়োজন চলিতেছে। সীমান্তের নিকটস্থ হাজার হাজার বিঘা চাষের জমী পতিত পড়িয়া আছে—কারণ ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীরা পাকিস্তানী অনাচারের ভয়ে ঐ সকল স্থানের নিকটে যাইতে সাহস করে না—চাষ করিলেও ফসল পাকিস্তানীরাই কাটিয়া লইয়া যায়, ভারত রাষ্ট্রের লোকের কাজে লাগে না। ফসল কাটা লইয়া বহু স্থানে উভয়পক্ষে গুলীবর্ষণও হইয়া গিয়াছে। পাকিস্তানীরা ফসল চুরি করিবার সময় সঙ্গে সশস্ত্র পুলিসবাহিনী আনয়ন করে—কাজেই ভারত-রাষ্ট্রের সীমান্তস্থিত অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পুলিস তাহাদের কার্যে বাধাদান করিতে যাইয়াও সফল হয় না। গত ৫।৬ মাস ধরিয়া এই কাজ চলিলেও ইহার স্থায়ী প্রতীকারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। গত ২০শে পৌষ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় নদীয়া জেলার ভাটুপাড়া গ্রাম সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্যই শঙ্কাজনক। আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি। যুদ্ধ না হইলেও এইভাবে অত্যাচারের হাত হইতে সীমান্তবাসীদিগকে রক্ষা করা কি তাহাদের কর্তব্য নয়?

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাট্জু

নারীর অঙ্গরাগ—

গত ২৭শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে এক সভায় ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন—ভারতীয় নারীগণকে লিপ্‌ষ্টিকের পরিবর্ত তাম্বুল, নেল-পলিসের পরিবর্তে মেদী ও সুবাসিত কেশ তৈলের পরিবর্তে তিল

বা চামেলী তৈল ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ পরামর্শ গ্রহণ করিলে নারীরা যে শুধু তাঁহাদের দেহ সুষমাই বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন তাহা নহে, দেশের

পরলোকে সুকুমার গুপ্ত—

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল সুকুমার গুপ্ত সম্প্রতি ৫২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ১৯৪৮ সালে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁর দিল্লীর বাস-ভবনে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজপ্রমুখ ও মন্ত্রীদের সহিত এক ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদও এই সভায় যোগদান করেন। ছবিতে সর্দার প্যাটেলের সহিত ডাঃ প্রসাদ ভবনগরের মহারাজা, ঢোলপুরের মহারাজা, মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত রামস্বামী রেড্ডিয়ার প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে

নিখিল ভারত সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু

বহু অর্থও তাঁহারা বাঁচাইবেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশের এই উপদেশে কেহ কর্ণপাত করিবে কি?

তিনি উত্তর গিরিশ পার্কের প্রসিদ্ধ গুপ্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং এম-এ পাশ করিয়া ১৯২২ সালে প্রথম ভারতীয়

পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন—তাঁহার সরল জীবনযাত্রা প্রণালী সকলকে মুগ্ধ করিত। তিনি অধ্যাপক বিপিনবিহারী সেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—তাঁহার একমাত্র পুত্র মুকুল পিতার মৃত্যুকালে এম-এস্-সি পরীক্ষা দিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব সপ্তাহে সুকুমার বসু 'রবিবাসরে' যোগদান করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

পরলোকে দুর্গাপ্রসন্ন বসু—

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র, খ্যাতনামা অভিনেতা দুর্গাপ্রসন্ন বসু গত ২০শে ডিসেম্বর ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। বহু নাটকে তিনি তাঁহার মাতুল দানীবাবুর সহিত অভিনয় করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর কলিকাতার বহু ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের নাট্য-শিক্ষক ছিলেন।

পরলোকে পরিমল মুখোপাধ্যায়—

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও সুপরিচিত কথা-সাহিত্যিক পরিমল মুখোপাধ্যায় গত ১২ই পৌষ বৃহস্পতিবার মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাশ করিয়া তিনি শিক্ষকতা ও সাহিত্য সেবা করিতেছিলেন, তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্পের বই প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৪ বৎসর কাল তিনি শিক্ষক সমিতির সহিত সংযুক্ত ছিলেন।

জীবনমৃত্যু মাঝখানে তারা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যার পথে নীরবতা নামে গিরিকন্যার মত,
ধ্যান সমাহিত মহীরুহ শিরে ঘন ছায়া অবনত।
দীপ জ্বেলে দিতে তটিনীর তীরে, দূরপানে চেয়ে নয়নের নীরে—
ভুলে যাই সব ; কথা শুধাবার সময় হোলো কি গত ?
মহাসিন্ধুর প্রাণ কল্লোলে, যারা তরী নিয়ে দূরে গেল চলে
তারা কি এখন ভিড়ায়েছে তরী স্মৃতি সাথে শত শত ?
এখন তারা কি মহাগায়নের সুরবন্দনা রত ?

মোরে দিয়ে গেছে মণিকার মত চেতনার শেষ দান,
তাই নিয়ে মোর দিনে দিনে ওঠে অবুঝ ব্যথার গান।
তন্দ্রাজড়িত আশা-শতদল, সন্ধ্যা এসেছে মেঘ কজ্জল
আমি যে তাদের বার্ত্তা লভিতে মিছে করি সন্ধান।
তারা চলে গেল, তাদের কথাটী কেহ নাহি মনে রাখে
প্রেম জানে নাই সে কত গভীর, বিদায়ের ক্ষণে সে হোলো অধীর
আলাপে বিলাপে সে বুঝেছে শেষে সেই শাশ্বত থাকে।

যৌবন দিয়ে তারা ফুটায়েছে মোর স্বপনের বাণী
প্রতিদিবসের জীবনেরে নিয়ে গেঁথেছে যে মালাখানি
সে মালা তাদের বিদায় লগনে তুলে ধরেছিনু হেথা ক্ষণে ক্ষণে
হৃদয় গগনে চলেছে তখন বজ্রের হানাহানি।
তিমিরের তলে ফেলে রেখে গেল আমার যা কিছু দেওয়া
মালার কুসুম ঝরে ঝরে যায়, জানিনা তাহারা গিয়েছে কোথায়।
তারা বলে গেল মহাযাত্রায় যায় নাক কিছু নেওয়া।

তবুও আমার কোনো ভালোবাসা কোন ক্ষণ প্রয়োজন
তাদের যাত্রা পথের বাধার করেনি সঙ্কোচন,
মোর মিনতির অশ্রুবাদল, শোনে নাই কোন যাত্রা পাগল
তাদের উদাস দৃষ্টির সাথে দেখেছি ভগ্ন মন—
কুহেলি কণ্ঠ গুঞ্জনে যেন বেদনার ক্ষতরাজে।
জীবন মৃত্যু মাঝখানে তারা দিল কি ধরার বুকে বসুধারা
তাদের নবীন উষার জনম হোলো কি এমন সাঁঝে ?

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

কমনওয়েলথ : ২২৭ (আইকিন ৯৬ এবং রেল ৬১। ফাদকার ৬০ রানে ৪ এবং চৌধুরী ৩৭ রানে ৩ উইকেট) **ও ৪৫৭** (আইকিন ১১১, ডুল্যাণ্ড ১০৬, ওরেল ৫৮, ষ্টিফেনসন ৬০ এবং গিম্বলেট ৪০। মানকড় ১০২ রানে ২, চৌধুরী ৭৬ রানে ৩।

ভারতবর্ষ : ৪৬৭ (৭ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হাজারে ১৩৪ উমড়িগড় ৯৩, নাইডু ৫৪, রেগে ৪৮। রিজওয়ে ১৩২ রানে ৪। ও **৩৯** (১ উইকেটে।)

চতুর্থ টেষ্ট ঃ

ভারতবর্ষ ঃ ৩৬১ (উমরিগড় ১১০, হাজারে ৮০। ওরেল ৫০ রানে ৩ উইকেট)ও **৩০২** (৫ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। হাজারে ৭৫, মার্চ্চেণ্ট ৭২ এবং ফাদকার ৬১। সাক্‌লটন ১৫৩ রানে ৪ উইকেট)।

কমনওয়েলথ ঃ ৩৯৩ (জে আইকিন ১১০, জর্জ্জ এমেট ৯৬। ফাদকার ৯৯ রানে ৫ এবং মানকড় ৯০ রানে ৪ উইকেট।) ও **২২৫** (৬ উইকেটে। আইকিন ৮৬ এবং এমেট ৫৩। মানকড় ৭৫ রানে ৩ এবং চৌধুরী ৫৮ রানে ২ উইকেট।)

মাদ্রাজের চীপক মাঠে অনুষ্ঠিত বে-সরকারী ৪র্থ টেষ্ট ম্যাচও ড্র যায়। শেষ দিনের খেলা বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করে। খেলার ৫ম দিনে ভারতবর্ষের পক্ষে লাঞ্চের সময় ৫ উইকেটে ৩০২ রান উঠলে অধিনায়ক মার্চ্চেণ্ট ২ ইনিংসের খেলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কমনওয়েলথ দলের হাতে তখন তিন ঘণ্টা সময়, জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংখ্যা ২৭১। অর্থাৎ প্রতি দুমিনিটে ৩টে রান তুলতে হবে। ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা মার্চ্চেণ্টের খুবই খেলোয়াড়সুলভ হয়েছে। খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে কমনওয়েলথ দলের ২য় ইনিংসের ৬ উইকেটে ২২৫ রান উঠে। ফলে খেলাটা ড্র যায়। চতুর্থ টেষ্টে উভয় দলেই একটা ক'রে সেঞ্চুরী, রান সংখ্যাও ১১০ ক'রে। এ বছরের বে-সরকারী টেষ্ট সিরিজে উমরীগড়ের এই নিয়ে ২য় সেঞ্চুরী, ১ম সেঞ্চুরী ১৩০ রান করেন ২য় টেষ্টে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, গত বছর ইংলণ্ডের বিখ্যাত সেণ্ট াল ল্যাঙ্কাসায়ার লীগের ব্যাটিং এভারেজ তালিকায় পলি উমরিগড় অধিক রান ক'রে শীর্ষস্থান পান। ক্রিকেট খেলার জন্মভূমি ইংলণ্ডের মাটিতে খ্যাতনামা পেশাদার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ভারতীয় তরুণ খেলোয়াড় পলি উমরিগড়ের এ কৃতিত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে গর্ব্বের কারণ। আইকিনও এ নিয়ে ২টো সেঞ্চুরী করেন, ১ম সেঞ্চুরী ১১১, ৩য় টেষ্টে।

৪র্থ টেষ্ট পর্য্যন্ত উভয় দলে মোট ১০টা সেঞ্চুরী হয়েছে। দুই দলেই ৫টা ক'রে।

ভারতীয় দলের পক্ষে সেঞ্চুরী করেছেন হাজারে এবং উমরিগড়—এই দু'জনে। হাজারে একাই ক'রেছেন ৩টে, ১৪৪ (১ম টেষ্ট) ১১৫ (২য় টেষ্ট) এবং ১৩৪ (৩য় টেষ্ট)। উভয় দলের মধ্যে এক হাজারেই তিনটে সেঞ্চুরী করেছেন। আবার বিশেষত্ব এই যে, পর পর ৩টে টেষ্টে। কমনওয়েলথ-দলের পক্ষে ডুলাণ্ড এবং আইকিন ২টো ক'রে এবং আইকিন ১টা ক'রেছেন। উভয় দলের মধ্যে এক ইনিংসে বেশী রান তুলেছে ভারতীয় দল ৪৬৭ (৭ উইকেট) ক'লকাতার ৩য় টেষ্টে। এ পর্য্যন্ত এক ইনিংসে চার শতাধিক রান উভয় দলেই ২বার ক'রে উঠেছে। ভারতীয় দলের পক্ষে

এক ইনিংসে কম হ'ল ৮২ রান, ২য় টেষ্টে। অপরদিকে কমনওয়েলথ দলের কম রান ২২৭, তৃতীয় টেষ্ট, ক'লকাতা।

কমনওয়েলথদলের সঙ্গে কানপুরের শেষ ৫ম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হবে ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। ৪টে টেষ্টের মধ্যে ৩টে টেষ্ট ড্র গেছে; বোম্বাইয়ের ২য় টেষ্টে কমনওয়েলথদল ১০ উইকেটে জয়লাভ করায় 'রাবার' পাওয়ার সম্ভাবনায় এগিয়ে আছে। ভারতীয়দল যদি ৫ম টেষ্টে জয়ী হ'তে পারে তাহ'লে খেলার ফলাফল সমান হবে। ফলে কোন পক্ষই 'রাবার' পাবে না; তবে গতবার কমনওয়েলথ-দলকে হারিয়ে ভারতীয়দল যে 'রাবার' সম্মান লাভ করেছিলো তা ভারতবর্ষেরই থেকে যাবে। নচেৎ ৫ম টেষ্ট খেলা ড্র গেলে কমনওয়েলথদলই 'রাবার' পাবে।

৪র্থ টেষ্ট ম্যাচের মনোনীত ৫জন ভারতীয় খেলোয়াড়কে বসিয়ে তাঁদের স্থানে অপর ৫জনকে নেওয়া হয়েছে। বাদ পড়েছেন নাইডু, চৌধুরী, যোশী, কিষেণচাঁদ এবং আলভা। এদের স্থানে খেলবেন গাইকোয়াড়, রেগে, রাজেন্দ্রনাথ, গোপীনাথ এবং রামচন্দ্র। শেষের দু'জন বিগত ৪টে টেষ্টের কোনটাতেই খেলেন নি। তরুণ খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পক্ষে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থন আছে যদি মনোনয়ন ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব না দেখা যায়। নিরোদ চৌধুরীকে ৫ম টেষ্টে বাদ দেওয়ায় খেলোয়াড় নির্ব্বাচক কমিটিকে সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। চৌধুরী ৩টে টেষ্ট ম্যাচ খেলেছেন, ১ম, ৩য় এবং ৪র্থ। ২য় টেষ্ট ম্যাচ না খেলেও ১ম ও ৩য় টেষ্ট ম্যাচের খেলায় তিনি মোট ৯টা উইকেট নিয়ে ৩টে টেষ্টের ভারতীয় বোলিং এভারেজ তালিকায় শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। ৪র্থ টেষ্টে ২টো উইকেট পান। কম উইকেট পেলেও ভাল বল করেছিলেন। বিপক্ষের খেলোয়াড়রা তাঁর বল সহজভাবে খেলতে পারে নি। অনেকের মতে পঞ্চম টেষ্টের ভারতীয় দলটি বিগত ৪টি টেষ্টের তুলনায় বিশেষ শক্তিশালী। বাঙ্গালা দেশে একটা প্রবচন আছে, 'যার শেষ ভাল তার সব ভাল'। আমরা ভারতীয় দল সম্পর্কে এই প্রবচনেরই পুনরাবৃত্তি করছি।

ভারতীয় ক্রিকেট সফরে কমনওয়েলথদল এ পর্য্যন্ত ২৪টা ম্যাচ খেলেছে। খেলার ফলাফল সমান অর্থাৎ ১২টা জয়, ১২টা ড্র। হার নেই।

ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়া ঃ

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ ঃ

ইংলণ্ড ঃ ২৯০ (ব্রাউন ৭৯, হাটন ৬২, সিম্পসন ৪৯। মিলার ৩৭ রানে ৪, জনসন ৯৪ রানে ৩ উইকেট। ও **১২৩** (ইভারসন ২৭ রানে ৬ উইকেট পান)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৪২৬ (কিথ মিলার নটআউট ১৪৫, আইভিন জনসন ৭৭, হ্যাসেট ৭০, আর্চার ৪৮। বেডসার ১০৭ রানে ৪ এবং ব্রাউন ১৫৩ রানে ৪ উইকেট।)

এ বছরের টেষ্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়া পর পর তিনটে টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে 'এসেস' বিজয়ী হয়ে গেছে। সুতরাং ৪র্থ এবং ৫ম ম্যাচ খেলার ফলাফল সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ার কোন মাথা ব্যথা নেই। ১৯৩৪ সাল থেকে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে এ পর্য্যন্ত ৬টা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ জাতীয় টেষ্ট সিরিজ ম্যাচ হ'য়েছে। পাঁচটা টেষ্টের সিরিজে হারিয়ে অষ্ট্রেলিয়া 'এসেস' পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডের ভাগ্যে একবার ও 'এসেস' জয়লাভ ঘটে নি। ১৯৩৮ সালের টেষ্ট সিরিজে খেলা সমান দাঁড়ায় সুতরাং সে বছরও 'এসেস' সম্মান অষ্ট্রেলিয়ার কাছেই থেকে যায়।

তৃতীয় টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংসে ১৩ রানে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। অষ্ট্রেলিয়া দলের কিথ মিলার নটআউট ১৪৫ রান করেন এবং বোলার জ্যাক ইভারসন ২৭ রানে ৬টা উইকেট পান। ইংলণ্ডের ২য় ইনিংস ১২৩ রানে শেষ হওয়ার কারণ হ'লেন ইভারসনের মারাত্মক বোলিং।

মিলারের নটআউট ১৪৫ রান এ বছরের টেষ্ট সিরিজের উভয় দলের মধ্যে ১ম সেঞ্চুরী। দুই দলের তিনজন রানআউট হ'ন, তার মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ারই শেষ দু'জন।

রঞ্জিট্রফিতে বাঙ্গলা দল ঃ

রঞ্জিট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের সেমি-ফাইনালে পশ্চিম-বাঙ্গলা প্রদেশ ১৫০ রানে বিহারকে পরাজিত ক'রে পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে উঠেছে। বাঙ্গলা দলের অধিনায়কত্ব করেন টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সি এস নাইডু। বাঙ্গলার দলের ২য় ইনিংসের ৪৯৩ রান, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ও বিহার দলের মধ্যে যে ৯ বার রঞ্জিট্রফি খেলা

হয়েছে তার মধ্যে এক ইনিংসের সর্ব্বোচ্চ রান হিসেবে রেকর্ড হয়েছে। এ ছাড়া নবম উইকেটে পি সেন এবং জে মিত্রের জুটিতে যে ২৩১ রান উঠে তা এই দুই দেশের মধ্যে রেকর্ড। রঞ্জিট্রফিতে নবম উইকেটের রেকর্ড ২৪৫ (হাজারে ও নাগরওয়ালা)—অর্থাৎ এখানে ১৪ রান কম।

বিলিয়ার্ড ঃ

ন্যাশনাল বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় এ বছরের ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী উইলসন জোন্স ১,৫৫৮ পয়েন্টে তাঁর গতবারের প্রতিদ্বন্দীটি এ শিলেভরাজকে পরাজিত করেন। জোন্স সেমি-ফাইনালের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান টম ক্লারিকে ৬২০ পয়েণ্টে হারিয়ে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন।

অল ইণ্ডিয়া স্নোকার চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে শিলেভরাজ জয়লাভ করেছেন রীডকে হারিয়ে।

৭।২।৫১

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমার স্মৃতি এমন ক'রে দোলায় কেন রাণী
আমি জানি—জানি—জানি।
কোন ফাগুনে ফুলের বনে
এসেছিলে সংগোপনে,
জ্বালিয়ে ছিলে প্রথম প্রেমের উজ্জল প্রদীপখানি।

উদাস হাওয়ার গোপনবুকে সেই সে গীতি রাজে
নদীর কলতানের মাঝে সুরের ধারা বাজে।
সুনীল আকাশ যেথায় মেশে,
সবুজ ধরার চরণ ঘেঁষে,
সেই সুদূরে দিনের শেষে আসবে তুমি জানি।

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "বিশ্বামিত্র"—২৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "মনের মিল"—২৲
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "মহীয়সী নারী"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "রাধারাণী-ইন্দিরা"—১৲
শ্রীসত্যকিঙ্কর মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "বোধন"—১৷৹
ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম-এ পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস্-প্রণীত "বেদান্ত-দর্শন—অদ্বৈতবাদ (দ্বিতীয় খণ্ড)"—১০৲
শ্রীগীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বুনন-শিক্ষা "অনিতা বয়নিকা"—১৲
শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অপরাজিতা"—৪৲
শ্রীরাধারমণ দাস-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "দস্যুরাজের কূটচক্র"—১৲
ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু প্রণীত "শিশুপালন"—।৹

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত বিজয়িনী ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

চৈত্র—১৩৫৭

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

শ্রীগীতগোবিন্দ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

সংস্কৃত সাহিত্য মহোদধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন, গৌড়কবি জয়দেব বিরচিত গীতগোবিন্দ কাব্য। রচনাপদ্ধতি, ভাষা ও ভাবের অপূর্ব সামঞ্জস্য, ভক্তির অফুরন্ত উচ্ছ্বাস—সর্বদিক থেকে এ গ্রন্থ অপূর্ব, অনবদ্য। প্রায় আটশত বৎসর ধরে এ গ্রন্থ ভারতবর্ষে অসীম প্রভাব বিস্তার পূর্বক প্রতি গৃহে সমাদর লাভ করেছে। সেইজন্য এই গ্রন্থের গুণবর্ণন, বিশেষতঃ অল্প সময়ের মধ্যে—অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার। অতি সংক্ষেপে জয়দেবের সর্বতোমুখী প্রতিভার ২।১টী দিকে মাত্র আলোক সম্পাতের চেষ্টা করছি।

এ গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবি সমসাময়িক কবিবৃন্দের স্তুতিবর্ণন প্রসঙ্গে বলেছেন :—

> বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সংদর্ভশুদ্ধিং গিরাং
>
> জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যঃ দুরূহদ্রুতেঃ।
>
> শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্যগোবর্ধন-
>
> স্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ॥

এ শ্লোকোক্ত কবি উমাপতিধর, শরণ, আচার্য গোবর্ধন, ধোয়ী প্রভৃতি সাহিত্য মহারথগণের নিরুপম দানের জন্য বঙ্গজননী চির-গৌরবিনী। এঁরা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্ম-পরিগ্রহ করে এঁরা বঙ্গজননীর ক্রোড়দেশ সমলঙ্কৃত করেছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এ মহাকবি জয়দেবের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নাই। বীরভূম জেলার অন্তর্গত অজয় নদীর তীরস্থ কেঁদুলী বা কেন্দুবিল্ব গ্রাম (৩ ১০) তাঁর জন্মস্থান, অদ্যাপি মাঘ মাসের শেষদিনে তাঁর স্মৃতি-তর্পণোপলক্ষে এখানে প্রতি বৎসর মহা-মেলা হয়। খৃষ্টীয় ১৪৯৯ সালে প্রতাপরুদ্রদেব আদেশ প্রদান করেন যে, নর্তকবৃন্দ এবং বৈষ্ণব গায়কগণ কেবল গীতগোবিন্দের গানই শিক্ষা করবেন এবং ১২৯২ সালের একটী প্রস্তর লিপিতে "গীতগোবিন্দে"র একটী শ্লোক পরিদৃষ্ট হয়। গীতগোবিন্দের একটী শ্লোকে (১১·১১) কবি নিজের পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রামাদেবী (পাঠান্তরে রাধাদেবী, বামদেবী) বলে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে কবি নিজেকে "পদ্মাবতী-চরণ-চারণ চক্রবর্তী (১-২) এবং অন্য স্থলে (১০-৮) পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবি—বলে উল্লেখ করেছেন। খুব সম্ভবতঃ, পদ্মাবতী তাঁর পত্নীর নাম। কালক্রমে জয়দেবের গীতগোবিন্দ এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে তাঁর নামে অনেক কিংবদন্তী রচিত হতে থাকে।

নাভা দাসের হিন্দী "ভক্তমাল" গ্রন্থ এবং চন্দ্র দত্তের সংস্কৃত "ভক্তমালা" গ্রন্থ এই সব কিংবদন্তীর আকর স্বরূপ।

এই গীতগোবিন্দ ভারতের কিরূপ আদরের বস্তু, তার প্রমাণ এই যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে গীতগোবিন্দের ৪০টীর অধিক টীকা এবং দ্বাদশের অধিক অনুকরণ-গ্রন্থ বিরচিত হয়েছে। আমাদের পরম গৌরবের বিষয় এই যে, শিখদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ "আদি গ্রন্থ" সাহেবে হরিগোবিন্দ প্রশস্তি নামক হিন্দী ভাষায় বিরচিত যে কবিতা আছে, তা' কবি শ্রীজয়দেব-রচিত। ইহাই হরিগোবিন্দ স্তুতি বিষয়ে প্রাচীনতম কবিতা বলে আদিগ্রন্থে উল্লিখিত আছে। জয়দেব সম্বন্ধে ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই দশাবতার স্তোত্র প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবকে সর্বপ্রথম ভগবদবতাররূপে স্বীকার করেছিলেন। একপে হিন্দুবৌদ্ধধর্ম সমন্বয়ের অগ্রদূতরূপে তিনি উত্তরাধিকারিবৃন্দের চিরবন্দ্য। সেই মহিমময় মিলনমন্ত্রটী এই—

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
> সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং
> কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।"

অর্থাৎ, হে কেশব! তুমি বুদ্ধশরীর ধারণ করে করুণাপরবশ হয়ে যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ করেছ।

গীতগোবিন্দ কাব্য রূপে ও গুণে অনবদ্য। এর রচনাপ্রণালী সম্পূর্ণ মৌলিক। কেবল সংস্কৃতসাহিত্যে নয়, জগতের অন্য কোনও সাহিত্যে এরূপ রচনা-প্রণালী দৃষ্ট হয় না। সেজন্য ইহাকে কাব্য, নাটক, সঙ্গীত বা অন্য কোন্ বিশেষ পর্যায়ের রচনা বলা উচিত সে বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ আছে। যথা, গীতগোবিন্দকে বিখ্যাত জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিদ Lassen Lyric Drama বা গীতি-নাট্য, প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী Sir William Jones Pastoral Drama বা গোপ নাট্য, এবং জার্মান প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ Von Schroder Purified Yatra বা বিশুদ্ধ যাত্রা-গান এবং Pischel বা Levi নাট্য ও সঙ্গীতের মধ্যবর্তী একটী রচনা বলে মতপ্রকাশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, গীতগোবিন্দ কাব্যকে অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত কোনও একটী বিশেষ পর্যায় বা শ্রেণীভুক্ত করলে ভ্রম হবে—যেহেতু গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারার মত ত্রিধারার অনুপম সমন্বয় এ গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ, গীতগোবিন্দ একাধারে কাব্য, নাটক ও সঙ্গীত গ্রন্থ। প্রথমতঃ, এ গ্রন্থকে কাব্য বলতেই হয়; কারণ, জয়দেব একে দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, এ গ্রন্থে নাট্যরূপও সুস্পষ্ট, যেহেতু প্রতি সর্গে প্রারম্ভিক কবিতানিচয়ের পরেই রাধা, কৃষ্ণ ও রাধাসখী, এই তিনজনের মধ্যে যে কোনও দুজনের কথোপকথন সন্নিবদ্ধ আছে। তৃতীয়তঃ, এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই গান—রাগ-রাগিণী, সুর তাল-সমন্বয়ে অপূর্ব সঙ্গীতের মূর্ত প্রতীক। তিনটী বিভিন্ন প্রণালীর রচনার এরূপ সমন্বয় জগতের ইতিহাসে সত্যই অপূর্ব।

গীতগোবিন্দের গুণাবলী বিশ্লেষণের পূর্বে তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রয়োজন। এ গ্রন্থ দ্বাদশ সর্গে ও চতুর্বিংশ প্রবন্ধে সুসংপৃক্ত ও সমাপ্ত। প্রথমে বসন্তসমাগমে যমুনাতীরস্থ বাণীর নিকুঞ্জে অন্যান্য গোপীজন-পরিবৃতা রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ; ক্রমে ক্রমে রাধার প্রতি কৃষ্ণের গভীরতম আকর্ষণ; মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি ব্যপদেশে অপূর্ব লীলাপ্রকাশ।

প্রথম সর্গে চারিটী প্রবন্ধ। প্রথম প্রবন্ধে দশাবতার বর্ণন। অবশিষ্ট তিনটীতে রাধাকৃষ্ণের নৃত্যাদি প্রেম পরিবেশ খ্যাপন। চতুর্থ প্রবন্ধে কৃষ্ণের সর্বগোপীজনের প্রেমাভিব্যক্তি সুপরিস্ফুট। দ্বিতীয় সর্গে পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রবন্ধে রাধার খেদোক্তি ও কৃষ্ণমিলনের নিমিত্ত গভীর আকুতি প্রকাশ। তৃতীয় সর্গে একটী মাত্র প্রবন্ধ (সপ্তম)। এই প্রবন্ধে শ্রীকৃষ্ণ রাধার উদ্দেশ্যে হৃদয়ের উদ্বেলিত প্রেম নিবেদন করছেন। চতুর্থ সর্গে অষ্টম ও নবম প্রবন্ধ; এই প্রবন্ধদ্বয়ে রাধাসখী কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্বক রাধার মর্মন্তুদ দুঃখ কৃষ্ণসকাশে বিজ্ঞাপিত করছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে দশম ও একাদশ প্রবন্ধে রাধাসখী কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পুনর্মিলন প্রস্তাবে রতা। সপ্তম সর্গে ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ প্রবন্ধে ক্রন্দনাতুরা রাধার গভীর বিলাপ, প্রতিশ্রুতিরক্ষণ-বিমুখ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আক্ষেপ এবং চন্দ্রোদয়ে রাধার প্রলাপ। অষ্টম সর্গে কৃষ্ণের পুনরাবির্ভাব এবং সপ্তদশ প্রবন্ধে রাধার কৃষ্ণের প্রতি কঠোর মান ও বিক্ষোভ প্রকাশ। নবম সর্গে অষ্টাদশ প্রবন্ধে রাধাসখী রাধাক্রোধোপনয়নে রতা এবং দশম সর্গে ঊনবিংশ প্রবন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রাধোদ্দেশ্যে স্তুতি নিবেদন। তথাপি মানরতা রাধার কোপোপশমে রতা দূতীর সান্ত্বনা বাক্য বিনিঃসৃত হয়েছে একাদশ সর্গে, দ্বাদশে রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন এবং উভয়ের অপূর্ব পরস্পর মিলনোক্তিতে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি।

রচনাভঙ্গির দিক থেকে গীতগোবিন্দ যেমন অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়, তেমনি বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ইহা সমভাবে অপূর্ব বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। কারণ, এ কাব্যে যুগপদ্ভাবে শান্ত ও শৃঙ্গার—এই দুই ভিন্ন রসের অপূর্ব প্রকাশ আমাদের বিমুগ্ধ করে। তজ্জন্য গীতগোবিন্দ কাব্যকে আধ্যাত্মিক দিক থেকে জীব ও ঈশ্বরের সুমধুর মিলনপরিক্রমা, অথবা কেবল গীতি কাব্যের দিক থেকে প্রেমিক-প্রেমিকার অনুপম প্রেমলীলা চিত্ররূপে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই দুটী ভিন্ন রসের মধ্যে যে কোনও একটী রস আস্বাদনে পাঠকের পূর্ণ পরিতৃপ্তির তিলমাত্র ব্যত্যয় ঘটে না। আমাদের দেশে সাধারণতঃ শ্রীগীতগোবিন্দকে আধ্যাত্মিক কাব্য বলেই গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশীয় রস-পিপাসুগণ এ গ্রন্থকে নিছক গীতিকাব্যরূপে গ্রহণ করেও অসীম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

প্রথমতঃ, গীতগোবিন্দ কাব্যকে আধ্যাত্মিক কাব্যরূপেই আলোচনা করছি। গীতগোবিন্দের মূল তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণের ঐশী প্রেমলীলা। তজ্জন্য এ গ্রন্থ বৈষ্ণবদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থরূপে যুগে যুগে পূজালাভ করেছে। কোন্ ভক্তিহিমাচলের গোপন গহন কন্দরে গীতগোবিন্দ-ভক্তি-মন্দাকিনীর প্রথম স্রোতোধারা লুক্কায়িত হয়ে আছে কে জানে? ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে রাধার প্রথম আবির্ভাব। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের রাধা থেকে কৃষ্ণপ্রাণা জয়দেবরাধা স্বতন্ত্রা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং লীলাশুকের কৃষ্ণ কর্ণামৃতের

শ্রীরাধাও গীতগোবিন্দের রাধা থেকে ভিন্না। যে রাধাকৃষ্ণভক্তি চণ্ডীদাসী বিদ্যাপতির হৃদয়সুরধুনী বিপ্লাবিত করে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চিত্তদেশ উন্মথনপূর্বক সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের অন্তস্তল পরিপ্লাবিত ও পরিপূর্ণ করেছে, সেই ভক্তিরই অপূর্ব প্রকাশ শ্রীগীতগোবিন্দে। এস্থলে রাধা-কৃষ্ণৈকসর্বস্বা হ্লাদিনী শক্তিরূপে প্রকটিতা স্বকায় দিব্যালোকে ভূতলে প্রথম আবির্ভূতা। গীতগোবিন্দের পূর্বে রচিত যে তিনটী গ্রন্থে আমরা শ্রীরাধার উল্লেখ পাই—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত—সেই তিনটীতেই শ্রীরাধা অন্যতমা গোপীমাত্র। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী কবি জয়দেবই প্রথম রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবল্লভা, হৃদয়সর্বস্বারূপে প্রতিষ্ঠিত করে' রাধাকৃষ্ণোপাসনার নবধারার প্রবর্তন করেছেন।

এরূপে মর্ত্যধামে অমরবিত্ত লাভে যাঁরা ধন্য, তাঁদের সকলের কাছে গীতগোবিন্দ যে অমরসুধা-নিষ্যন্দিনী ভক্তি মন্দাকিনীর বিপুলতম প্রবাহরূপে প্রতীয়মান হবে, তা' আর আশ্চর্য কি? মনের প্রেমের পূর্ণতম, প্রকৃষ্টতম পরিণতি ভাগবত প্রেমে—ভাগবতপ্রেমে আত্মবিলোপেই মানবের দিব্য-সত্তার চরম বিকাশ। সেজন্য মহাকবি জয়দেব বলেছেন—

"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা"।

অর্থাৎ, রাধা বলছেন, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণে আমি নিজেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেছি। এই দিব্যোন্মাদনাপ্রণোদনার নিমিত্তই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এ গ্রন্থকে বরণীয়তম গ্রন্থপঞ্চকের অন্যতম বলে সগৌরবে ঘোষণা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শোনে পরম আনন্দ॥

এই জন্য মর্ত্যধামে অমরত্বের সন্ধানী সকলেই এ গ্রন্থকে "আনন্দস্বরূপ", "রসো বৈ সঃ" বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবেন। এরূপে আধ্যাত্মিক কাব্যরূপে শ্রীগীতগোবিন্দ একটী অপূর্ব সৃষ্টি।

কিন্তু কেবল ভক্তির উৎসস্বরূপেই নয়, একটী নিছক গীতিকাব্য হিসাবেও সংস্কৃত সাহিত্যমণিমঞ্জুষার মধ্যে গীতগোবিন্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যরূপে এ গ্রন্থের চরম গৌরব—ভাব ও ভাষার অপূর্ব সমন্বয়। ভাবও নিগূঢ়, অথচ ভাষাও সুমধুর—এরূপ মণিকাঞ্চনসংযোগ অতি বিরল। কারণ, অতলস্পর্শী রত্নাকরের গর্ভস্থ, অস্বচ্ছ জলরাশি ভেদ করে সুদূরতল-স্থিত মণিমাণিক্য যেমন থেকে যায় চিরকাল আমাদের দৃষ্টি ও স্পর্শের বাহিরেই, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুকঠিন ভাষার আবরণে আবদ্ধ হয়ে নিগূঢ় তত্ত্বাদিও হয় আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অবোধ্য ও অলভ্য। অপর পক্ষে, অগভীর পার্বত্য স্রোতস্বতীর স্বল্প, স্বচ্ছ জল ভেদ করে যেমন আমরা দর্শন ও স্পর্শ করি বালুকা ও কঙ্করই মাত্র, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরল, সুমধুর ভাষার মাধ্যমে আমরা যা' উপভোগ করি, তা লঘু ক্ষণভঙ্গুর বস্তুমাত্র, নিগূঢ় শাশ্বত তত্ত্ব নয়। সেজন্য যে স্থলে ভাষা অতি সাবলীল ও সুমধুর, সে স্থলে ভাবের নিগূঢ়তা বিষয়ে সন্দেহ হ'তে পারে। গীতগোবিন্দের ভাষায় শব্দের মাধুর্য, ছন্দের ঝঙ্কার প্রভৃতি এরূপ অত্যধিক যে, এ গ্রন্থে ভাবের সমপরিমাণ গভীরতা বিষয়ে আশঙ্কা হয়ত আশ্চর্য নয়। কিন্তু গীতগোবিন্দের একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ভাবের মহিমা ও ভাষার মাধুর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত হয়ে আছে। উপনিষদ, রামায়ণ প্রভৃতিতে যেরূপ নিগূঢ় ভাবমাহাত্ম্য অতি স্বচ্ছ সরল ভাষায় প্রকটিত হয়েছে, গীতগোবিন্দেও ঠিক তাই। তজ্জন্য পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই বিগত দু'শত বৎসর ধরে এ গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Ruckert ও ইংরাজ মনীষী Sir Edwin Arnold গীত-গোবিন্দের অনুবাদ করে সাহিত্যক্ষেত্রে অমরত্ব লাভ করেছেন। অনুবাদে মূলের ভাষার মাধুর্য অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তা' সত্ত্বেও কেবলমাত্র অনুবাদের মাধ্যমেও গীতগোবিন্দ রসসুধা পান করে বিশ্বজন বিমোহিত হয়েছেন।

গীতগোবিন্দের ভাষার মাধুর্যপ্রসঙ্গে যে কথা প্রথমেই বলতে হয়; তা হচ্ছে এর অতুলনীয় অনুপ্রাস বিন্যাস। অথচ কোনও স্থানেই ভাব ব্যাহত হয়নি। শুধু তাই নয়, ভাবের পোষকতা ও পুষ্টতা সাধিত হয়েছে। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

"ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে

বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে নৃত্যতি
যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে"॥

এই ভাষার আর একটী লক্ষণীয় দিক এই যে স্থলে স্থলে দীর্ঘসমাসবহুল হলেও এর সাবলীল সুস্নিগ্ধতার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটে নি। পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটী তার প্রমাণ। আর একটী সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি—

"চন্দনচর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন বনমালী—
কেলিচলন্মণিকুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ডযুগল-স্মিতশালী"।

এরূপে ভাব, ভাষা ও রচনাপ্রণালী—সকল দিক থেকেই ভারতের গীতগোবিন্দ জগতের ইতিহাসে সম্পূর্ণ একক ও অদ্বিতীয়।

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হূণ রক্ত

মৎস্যের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট একটি উপত্যকায় চষ্টনদুর্গ অবস্থিত। উত্তরদিক হইতে আর্যাবর্তে প্রবেশের যতগুলি সঙ্কট-পথ আছে, এই উপত্যকা তাহার অন্যতম; তাই এখানে দুর্গের প্রতিষ্ঠা। এই পথে পূর্বকালে বহু দুর্মদ যোদ্ধৃজাতির অভিযান আর্যভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে, বণিকের সার্থবাহ মহামূল্য পণ্য লইয়া যাতায়াত করিয়াছে, চৈন পরিব্রাজকগণ তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। উপত্যকাটি উত্তরে দক্ষিণে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দীর্ঘ; প্রস্থে মাত্র অর্ধ-ক্রোশ। পূর্বে ও পশ্চিমে অভ্রংলিহ গিরিশ্রেণী।

চষ্টনদুর্গের সিংহদ্বার দক্ষিণমুখী। দুর্গটি দৃঢ়গঠন, কমঠাকৃতি; কিন্তু আয়তনে বৃহৎ নয়। উচ্চ প্রাকার-বেষ্টনীর মধ্যে তিন চারি শত লোক বাস করিতে পারে।

অপরাহ্ণে দুর্গের দ্বার খোলা ছিল; দূর হইতে অশ্বারোহীর দল আসিতে দেখিয়া ঝনৎকার শব্দে লৌহ-কবাট বন্ধ হইয়া গেল।

গুলিক ও চিত্রক দুর্গদ্বারের প্রায় শত হস্ত দূর পর্যন্ত আসিয়া অশ্বের গতিরোধ করিল। এই স্থানে কয়েকটি পার্বত্য বৃক্ষ ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া একটি বৃক্ষ-বাটিকা রচনা করিয়াছে। গুলিকের ইঙ্গিতে সৈনিকের দল অশ্ব হইতে নামিয়া অশ্বের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল। আজ রাত্রি সম্ভবত এই তরুতলেই কাটাইতে হইবে। সকলের সঙ্গে দুই তিন দিনের আহার্য ছিল।

চিত্রক ও গুলিক অশ্ব হইতে নামিল না। ওদিকে দুর্গের দ্বার তো বন্ধ হইয়া গিয়াছিলই, উপরন্তু দুর্গ প্রাকারের উপর বহু লোকের ব্যস্ত যাতায়াত দেখিয়া মনে হয় তাহারা আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া দুর্গ রক্ষার আয়োজন করিতেছে।

ইহাদের যুযুৎসা অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া চিত্রক মৃদু হাস্য করিল, বলিল—মনে হইতেছে ইহারা বিনা যুদ্ধে আমাদের দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমরা কে কোথা হইতে আসিতেছি তাহা না জানিয়াই দুর্গরক্ষায় উদ্যত হইয়াছে।'

গুলিক বলিল—'আমাদের সংখ্যা দেখিয়া বোধহয় ভয় পাইয়াছে। আমরা সকলে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইলে উহারা তীর ছুঁড়িবে, পাথর ফেলিবে; কিন্তু দুই একজন যাইলে বোধহয় কিছু বলিবে না। আমরা কে তাহা জানিবার আগ্রহ নিশ্চয় উহাদের আছে। চল, আমরা দুইজনে যাই। আমাদের পরিচয় পাইলে নিশ্চয় দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে।'

চিত্রক বলিল—'সম্ভব। কিন্তু আমাদের দুইজনের যাওয়া উচিত হইবে না। যদি দুইজনকেই ধরিয়া রাখে তখন আমাদের নেতৃহীন সৈন্যেরা কী করিবে?'

গুলিক বলিল—'সে কথা সত্য। তবে তুমি থাক আমি যাই।'

চিত্রক বলিল—'না, তুমি থাক আমি যাইব। প্রথমত তোমাকে যদি ধরিয়া রাখে তখন আমি কিছুই করিতে পারিব না, সৈন্যেরা তোমার অধীন, আমার সকল আদেশ না মানিতে পারে। দ্বিতীয়ত, আমি যদি কিরাত বর্মার সাক্ষাৎ পাই, আমি তাহাকে এমন অনেক কথা বলিতে পারিব যাহা তুমি জাননা। সুতরাং আমার যাওয়াই সমীচীন।'

যুক্তির সারবত্তা অনুভব করিয়া গুলিক সম্মত হইল। বলিল—'ভাল। দেখ যদি দুর্গে প্রবেশ করিতে পার। কিন্তু একটা কথা, সূর্যাস্তের পূর্বে নিশ্চয় ফিরিয়া আসিও। না আসিলে বুঝিব তোমাকে ধরিয়া রাখিয়াছে কিম্বা বধ করিয়াছে। তখন যথাকর্তব্য করিব।'

চিত্রক দুর্গের দিকে অশ্ব চালাইল। সে তোরণ হইতে

বিশ হাত দূরে উপস্থিত হইলে তোরণশীর্ষ হইতে পরুষকণ্ঠে আদেশ আসিল—'দাঁড়াও।'

চিত্রক অশ্ব স্থগিত করিল, ঊর্ধ্বে চক্ষু তুলিয়া দেখিল, প্রাকারস্থ সারি সারি ইন্দ্রকোষের ছিদ্রপথে কয়েকজন ধানুকী ধনুতে শর সংযোগ করিয়া তাহার পানে লক্ষ্য করিয়া আছে। একটি ইন্দ্রকোষের অন্তরাল হইতে প্রশ্ন আসিল—'কে তুমি? কী চাও?'

চিত্রক গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—'আমি পরম ভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ স্কন্দগুপ্তের দূত। দুর্গাধিপ কিরাত বর্মার জন্য বার্তা আনিয়াছি।'

প্রাকারের উপর কিছুক্ষণ নিম্নস্বরে আলাপ হইল, তারপর আবার উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন হইল—'কী বার্তা আনিয়াছ?'

চিত্রক দৃঢ়স্বরে বলিল—'তাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য নয়। দুর্গাধিপকে বলিব।'

আবার কিছুক্ষণ হ্রস্বকণ্ঠ আলোচনার পর তোরণ হইতে শব্দ আসিল—'উত্তম। অপেক্ষা কর।'

কিয়ৎকাল পরে দুর্গের কবাট ঈষৎ উন্মোচিত হইল। চিত্রক দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। কবাট আবার বন্ধ হইয়া গেল।

তোরণ অতিক্রম করিয়া দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার ঘোড়ার বল্গা ধরিল। চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল। চারিদিক হইতে প্রায় ত্রিশজন সশস্ত্র যোদ্ধা তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। চিত্রক লক্ষ্য করিল, ইহাদের অধিকাংশই আকৃতিতে হূণ; খর্বকায় গজস্কন্ধ ক্ষুদ্রচক্ষু, মুখে শ্মশ্রু গুম্ফের বিরলতা। সকলের চোখেই সন্দিগ্ধ কুটিল দৃষ্টি।

যে-ব্যক্তি ঘোড়া ধরিয়াছিল সে কর্কশকণ্ঠে বলিল—'তুমি দূত! যদি মিথ্যা পরিচয় দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিয়া থাক উপযুক্ত শাস্তি পাইবে। চল, দুর্গাধিপ নিজ ভবনে আছেন, সেখানে সাক্ষাৎ হইবে।'

চিত্রক এই ব্যক্তিকে শান্তচক্ষে নিরীক্ষণ করিল। চল্লিশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ়শরীর হূণ; বামগণ্ডে অসির গভীর ক্ষতচিহ্ন মুখের শ্রীবর্ধন করে নাই, বাচনভঙ্গী অতিশয় অশিষ্ট। চিত্রক কিন্তু কোনও রূপ ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাচ্ছিল্যের সহিত প্রশ্ন করিল—'তুমি কে?'

হূণের মুখ কালো হইয়া উঠিল; সে চিত্রকের প্রতি কষায়িত নেত্রপাত করিয়া বলিল—'আমার নাম মরুসিংহ। আমি চষ্টনদুর্গের রক্ষক—দুর্গপাল।'

আর কোনও কথা হইল না। চিত্রক নিরুৎসুক চক্ষে দুর্গের চারিদিক দেখিতে দেখিতে চলিল। দুর্গটি সাধারণ প্রাকারবেষ্টিত পুরী মাত্র, বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নাই। মধ্যস্থলে দুর্গাধিপের প্রস্তরনির্মিত দ্বিভূজক ভবন।

ভবনের নিম্নতলে প্রশস্ত বহিঃকক্ষে কিরাত বাহু দ্বারা বক্ষ আবদ্ধ করিয়া ভ্রূকুটি বিকৃত মুখে পাদচারণ করিতেছিল, কক্ষের চার দ্বারে চারজন অস্ত্রধারী রক্ষী। চিত্রক ও মরুসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিলে কিরাত তাহাদের লক্ষ্য করিল না, পূর্ববৎ পাদচারণ করিতে লাগিল। তারপর সহসা মুখ তুলিয়া ক্ষিপ্রপদে চিত্রকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরস্পরের দর্শনে উভয়ের মনে আনন্দ উপজাত হইল না। চিত্রক দেখিল, কিরাতের আকৃতি হূণদের মত নয়; সে দীর্ঘকায় ও সুদর্শন, কেবল তাহার চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র ও ক্রূর। চিত্রক মনে মনে বলিল—তুমি কিরাত! রট্টার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে!

কিরাত বলিয়া উঠিল—'কে তুমি? কোথা হইতে আসিতেছ?'

চিত্রক বলিল—'পূর্বেই বলিয়াছি আমি সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দূত। তাঁহার স্কন্ধাবার হইতে আসিয়াছি।'

ক্রোধ-তীক্ষ্ণ স্বরে কিরাত বলিল—'স্কন্দগুপ্ত! কী চায় স্কন্দগুপ্ত আমার কাছে? আমি তাহার অধীন নহি।'

চিত্রক বলিল—'সম্রাট স্কন্দগুপ্ত কী চান তাহা তাঁহার বার্তা হইতেই প্রকাশ পাইবে।' একটু থামিয়া বলিল—'শিষ্টসমাজে মাননীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বিনয় বাক্য প্রয়োগের রীতি আছে।'

কিরাত অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল—'তুমি ধৃষ্ট। আমার দুর্গে আসিয়া আমার সহিত যে ধৃষ্টতা করে আমি তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া প্রাকার বাহিরে নিক্ষেপ করি।'

চিত্রকের ললাটে তিলকচিহ্ন ক্রমশ লাল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে ধীরস্বরে বলিল—'সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দূতকে লাঞ্ছিত করিলে স্কন্দ সহস্র রণ-হস্তী আনিয়া তোমাকে এবং তোমার দুর্গকে হস্তীর পদতলে নিষ্পিষ্ট

করিবেন। মনে রাখিও আমি একা নই; বাহিরে শত অশ্বারোহী অপেক্ষা করিতেছে।'

মনে হইল কিরাত বুঝি ফাটিয়া পড়িবে; কিন্তু সে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিল। অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে বলিল—'তুমি যে স্কন্দগুপ্তের দূত তাহার প্রমাণ কি?'

চিত্রক নিঃশব্দে অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া দিল।

নতমুখে কিছুক্ষণ অঙ্গুরীয় পর্যবেক্ষণ করিয়া কিরাত যখন মুখ তুলিল তখন তাহার মুখ দেখিয়া চিত্রক অবাক হইয়া গেল। কিরাতের মুখে অগ্নিবর্ণ ক্রোধ আর নাই, তৎপরিবর্তে অধরপ্রান্তে মৃদু কৌতুক হাস্য ক্রীড়া করিতেছে। কিরাত মিষ্টস্বরে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনি স্বাগত। আমার রূঢ় ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করিবেন না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় কোনও আগন্তুক দুর্গে প্রবেশ করিলে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। আপনি যদি আমার তর্জনে ভয় পাইতেন তাহা হইলে বুঝিতাম—অঙ্গুরীয় সত্ত্বেও আপনি সম্রাটের দূত নয়, শত্রুর গুপ্তচর। যাহোক আপনার ব্যবহারে আমার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে। আসুন—উপবেশন করুন।'

চিত্রক কথায় ভিজিল না, মনে মনে বুঝিল কিরাত তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া এখন অন্য পথ ধরিয়াছে। সে আরও সতর্ক হইল। কিরাত শুধু ক্রূর ও ক্রোধী নয়, কপটতায় ধুরন্ধর।

উভয়ে আসন পরিগ্রহ করিলে কিরাত বলিল—'সম্রাট কী বার্তা পাঠাইয়াছেন? লিখিত লিপি?'

চিত্রক শুষ্কস্বরে বলিল—'না, সম্রাট সামান্য দুর্গাধিপকে লিপি লেখেন না। মৌখিক বার্তা।'

কিরাত এই অবজ্ঞা গলাধঃকরণ করিল। চিত্রক তখন বলিল—'সম্রাট সংবাদ পাইয়াছেন যে বিটঙ্করাজ রোট্ট ধর্মাদিত্য চষ্টন দুর্গে আছেন—'

চকিতে কিরাত প্রশ্ন করিল—'এ সংবাদ সম্রাট কোথায় পাইলেন?

চিত্রক বলিল—'কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরার মুখে।'

কিরাতের চক্ষু ক্ষণেকের জন্য বিস্ফারিত হইল; সে কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল—'তারপর বলুন।'

'সম্রাট জানিতে পারিয়াছেন যে আপনি ছলপূর্বক ধর্মাদিত্যকে দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।'

কিরাত পরম বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিল—'আমি আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি! সে কি কথা! ধর্মাদিত্য আমার রাজা, আমার প্রভু—'

চিত্রক নীরসকণ্ঠে বলিয়া চলিল—'কুমার ভট্টারিকা রট্টা যশোধরাকেও আপনি কপট-পত্র পাঠাইয়া দুর্গে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—'

গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কিরাত বলিল—'সকলেই আমাকে ভুল বুঝিয়াছে। ইহা দৈবের ছাড়া আর কি হইতে পারে? ধর্মাদিত্য স্বয়ং কন্যাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন—'

চিত্রক বলিল—'সে যা হোক, সম্রাট স্কন্দগুপ্ত আদেশ দিয়াছেন অচিরাৎ বিটঙ্করাজকে আমাদের হস্তে অর্পণ করুন। সম্রাট তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষী।'

কিরাত বলিল—'কিন্তু বিটঙ্করাজ আমার অধীন নয়, আমিই তাঁহার অধীন। সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করা না করা তাঁহার ইচ্ছা।'

'তবে বিটঙ্করাজকেই সম্রাটের আদেশ জানাইব। তিনি কোথায়?'

'তিনি এই ভবনেই আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অতিশয় অসুস্থ। তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে না।'

কিছুক্ষণ উভয়ে চোখে চোখে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কিরাতের দৃষ্টি অবনত হইল না। শেষে চিত্রক বলিল—'তবে কি বুঝিব সম্রাটের আজ্ঞা পালন করিতে আপনি অসম্মত?'

কিরাত ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—'দূত মহাশয়, আপনিও আমাকে ভুল বুঝিতেছেন। আমি অসহায়। ধর্মাদিত্য আমার রাজা, আমার পিতৃতুল্য, তাঁহার জীবন বিপন্ন করিয়া আমি আপনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটাইতে পারি না। বৈদ্য আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কোনও প্রকার উত্তেজনার কারণ ঘটিলেই ধর্মাদিত্যের প্রাণবিয়োগ হইবে।'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চিত্রক বলিল—মহারাজের সঙ্গে সন্নিধাতা আসিয়াছিল, তাহার নাম হর্ষ। সে কোথায়?'

স্কন্দগুপ্তের দূতের কাছে কিরাত এ প্রশ্ন প্রত্যাশা করে নাই, সে চমকিয়া উঠিল। তারপর দ্রুতকণ্ঠে বলিল—'হর্ষ আসিয়াছিল বটে, কিন্তু গতকল্য কপোতকূট ফিরিয়া গিয়াছে।'

'আর নকুল? এবং তাহার সহচরগণ?'

'রাজকন্যা রট্টা যশোধরা আসিলেন না দেখিয়া তাহারাও ফিরিয়া গিয়াছে।'

কিরাত যে মিথ্যা কথা বলিতেছে তাহা চিত্রক বুঝিতে পারিল, হর্ষ ও নকুলের দল দুর্গেই কোনও কূটকক্ষে বন্দী আছে। সে নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গাধিপ মহাশয়, আমার দৌত্য শেষ হইয়াছে। সম্রাটকে সকল কথা নিবেদন করিব; তারপর তাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি করিবেন। তিনি আপনাকে জানাইতে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে তিনি স্বয়ং আসিয়া সহস্র হস্তী দ্বারা দুর্গ সমভূমি করিবেন। আপনাকে একথা জানাইয়া রাখা উচিত বিবেচনা করি।'

চিত্রক ফিরিয়া দ্বারের দিকে চলিল।

'দূত মহাশয়!'

কিরাত তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। কিরাতের কণ্ঠস্বর মর্মাহত, মুখের ভাব বশংবদ। সে বলিল—'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন মহাপরাক্রান্ত সম্রাটের বিরাগভাজন হইয়া আমার লাভ কি? নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আমি—'

'সে কথা সম্রাট বিবেচনা করিবেন।'

'দূত মহাশয়, আপনার প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। আপনি কয়েক দিন অপেক্ষা করুন, এখনি ফিরিয়া যাইবেন না। ইতিমধ্যে যদি ধর্মাদিত্য আরোগ্য হইয়া ওঠেন তখন আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথোচিত কর্তব্য করিবেন। আমার দায়িত্ব শেষ হইবে।'

এ আবার কোন্ নূতন চাতুরী? চিত্রক বিবেচনা করিয়া বলিল—'আমি আগামী কল্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি। তাহার অধিক নয়।'

কিরাত ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিল—'মাত্র কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত! ভাল! ভাল, আপনার যেরূপ অভিরুচি। আপনাদের সকলকে দুর্গ মধ্যে স্থান দিতে পারিলে সুখী হইতাম, কিন্তু দুর্গে স্থানাভাব।—মরুসিংহ, দূত-প্রবরকে সসম্মানে দুর্গ বাহিরে প্রেরণ কর।'

মরুসিংহ হিংস্রচক্ষে চিত্রকের পানে চাহিল, তারপর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। চিত্রক তাহার অনুগামী হইল।

ভবনের প্রতীহারভূমি পর্যন্ত আসিয়া চিত্রক একবার ফিরিয়া চাহিল। দ্বারের কাছে কিরাত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখে বশংবদ ভাব আর নাই, দুই চক্ষু হইতে কুটিল হিংসা বিকীর্ণ হইতেছে। চারি চক্ষুর মিলন হইতেই কিরাত ফিরিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

* * *

চিত্রক যখন বৃক্ষবাটিকায় ফিরিয়া আসিল তখন সূর্যাস্ত হইতেছে। গুলিককে সমস্ত কথা বলিলে গুলিক গুম্ফের প্রান্ত আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল—'হুঁ। অসভ্য বর্বরটার কোনও দুরভিসন্ধি আছে। রাত্রে সাবধান থাকিতে হইবে; অতর্কিতে আক্রমণ করিতে পারে।'

কিরাতের যে কোনও গুপ্ত অভিপ্রায় আছে তাহা চিত্রকও সন্দেহ করিয়াছিল; কিন্তু রাত্রে আক্রমণ করিবে তাহা তাহার মনে হইল না। অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কিরাত কালবিলম্ব করিতে চাহে। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? চিত্রকের দল ফিরিয়া না গিয়া এখানে থাকিলে কিরাতের কী সুবিধা হইবে? কিরাত কি ধর্মাদিত্যকে হত্যা করিয়াছে? কিম্বা হত্যা করিতে চায়? সম্ভব নয়। ইচ্ছা থাকিলেও আর তাহা সাহস করিবে না। তবে কী?

গুলিক বলিল—'দণ্ডেন গো-গর্দভৌ—লোকটাকে হাতে পাইলে লাঠৌষধি দিয়া সিধা করিতাম। যাহোক উপস্থিত সতর্ক থাকা দরকার। আমি দশজন প্রহরী লইয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পাহারায় থাকিব, বাকি রাত্রি তুমি পাহারা দিও।'

সন্ধ্যার পর চিত্রক বৃক্ষতলে কম্বল পাতিয়া শয়ন করিল। দেহ ও মন দুইই ক্লান্ত, সে অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

মধ্যরাত্রে গুলিক আসিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুলিক তাহার কম্বলে শয়ন করিয়া নিমেষ মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল এবং ঘর্ঘর শব্দে নাসিকাধ্বনি করিতে লাগিল।

বৃক্ষবাটিকায় ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে সৈন্যগণ ভূ-শয্যায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। তরুচ্ছায়ার বাহিরে আসিয়া চিত্রক সাবধানে বৃক্ষবাটিকা পরিক্রমণ করিল। ভূমি সমতল নয়; অত্রতত্র বৃহৎ পাষাণ খণ্ড পড়িয়া আছে, অন্ধকারে দৃষ্টিগোচর হয়না। দশজন সৈনিক স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে প্রহরা দিতেছে। বাটিকার পশ্চাদভাগে অশ্বগুলি ছন্দবদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। বাহিরের দিকে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া চিত্রক কিছুই দেখিতে পাইল না, ঘন তমিস্রায় সমস্ত একাকার হইয়া গিয়াছে। কেবল দুর্গের উন্নত স্কন্ধ আকাশের গায়ে গাঢ়তর অন্ধকারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

সতর্ক থাকা ব্যতীত প্রহরীর আর কিছু করিবার নাই। চিত্রক তরবারি কোমরে বাঁধিয়া অলস মন্থর পদে বৃক্ষবাটিকা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দুর্গ নিস্তব্ধ, শব্দ মাত্র নাই। নানা অসংলগ্ন চিন্তা চিত্রকের মস্তিষ্কে ক্রীড়া করিতে লাগিল। রট্টা··স্কন্দগুপ্ত কিরাত ·

ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। চন্দ্রের পরিপূর্ণ মহিমা আর নাই, অনেকখানি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তবু তাহার ক্ষীণ প্রভায় চতুর্দিক অস্পষ্টভাবে আলোকিত হইল।

পরিক্রমণ করিতে করিতে চিত্রক লক্ষ্য করিল, যে-দশজন সৈনিক পাহারা দিতেছে তাহারা প্রত্যেকেই একটি বৃক্ষকাণ্ডে বা প্রস্তরখণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চক্ষু মুদিত। চিত্রক বিস্মিত হইল না, দাঁড়াইয়া ঘুমাইবার অভ্যাস প্রত্যেক সৈনিককে আয়ত্ত করিতে হয়। অল্পমাত্র শব্দ শুনিলেই তাহারা জাগিয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সে তাহাদের জাগাইল না।

শত হস্ত দূরে দুর্গের তোরণ ও প্রাকার ম্লান জ্যোৎস্নায় ছায়াচিত্রবৎ দেখাইতেছে। অকারণেই চিত্রক সেই দিকে চলিল। একবার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটি চিন্তা ক্ষণিক রেখাপাত করিল—এই দুর্গ ন্যায়ত ধর্মত আমার!

অর্ধেক দূর গিয়া চিত্রক থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল; তারপর দ্রুত এক প্রস্তরখণ্ডের পশ্চাতে লুকাইল। তাহার চোখের দৃষ্টি স্বভাবতই অতিশয় তীক্ষ্ণ। সে দেখিল, দুর্গের দ্বার নিঃশব্দে খুলিতেছে; অল্প খুলিবার পর দ্বারপথে একজন অশ্বারোহী বাহির হইয়া আসিল।

চিত্রক কুঞ্চিত পলকহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু আর কোনও অশ্বারোহী বাহিরে আসিল না, দুর্গদ্বার আবার বন্ধ হইয়া গেল। যে অশ্বারোহী বাহিরে আসিয়াছিল, এতদূর হইতে মন্দালোকে চিত্রক তাহার মুখ দেখিতে পাইল না। অশ্বারোহী বাম দিকে অশ্বের মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দ ছায়ার ন্যায় প্রাকারের পাশ দিয়া চলিল।

অশ্বারোহীর ভাবভঙ্গীতে আত্মগোপনের চেষ্টা পরিস্ফুট, অশ্বক্ষুর হইতে কিছুমাত্র শব্দ বাহির হইতেছে না। চিত্রক একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল—অশ্বের চারি পায়ে ক্ষুরের উপর বস্ত্রের মতো কিছু বাঁধা রহিয়াছে, তাই শব্দ হইতেছে না। কোথায় যাইতেছে এই নৈশ অশ্বারোহী—?

সহসা তড়িচ্চমকের ন্যায় চিত্রকের মস্তিষ্ক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে কিরাতের সমস্ত কুটিল দুরভিসন্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িল। চিত্রক বুঝিল অশ্বারোহী চোরের মত কোথায় যাইতেছে। (ক্রমশঃ)

মৃত্যুঞ্জয়ী বাঙলা

শ্রীনবগোপাল সিংহ

রাত্রির তমিস্রা যত হ'য়ে আসে নিবিড় গভীর
প্রত্যুষের সিন্ধুতটে আলোকের সম্ভাবনা রাজে,
অপচ্য ফলের মাঝে জাগে নাকো অঙ্কুরের শির
নবীন লণ্ডন জাগে ভস্মিভূত নগরীর মাঝে।

পুঞ্জিভূত ব্যাভিচার, অন্যায়ের সঞ্চিত জঞ্জাল
কালের দাবাগ্নি আজ পেয়ে গেছে প্রচুর ইন্ধন
বঙ্গের শ্যামল অঙ্গ সে অনলে হয়েছে কঙ্কাল
নতুনের সম্ভাবনা তবু আনে পুলক স্পন্দন।

ভৌগলিক বাংলার অঙ্গ আজ হ'লো দ্বিখণ্ডিত
যুগান্তের ইতিহাস আজো তবু শাশ্বত, অক্ষয়!
নিমাই, বিবেক, রবি, শহীদের সাধন অর্জিত
বাঙলার মৃত্যু নাই, হবে তার পুনরভ্যুদয়।

মহাভারতীয় সাবিত্রী

শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাবিত্রী সত্যবান (২)

কিছুদূর গমন করিতে করিতে একটা বামাকণ্ঠধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। নবাগত ধ্বনি। পথের পার্শ্বদেশ হইতে। সেদিকে ভূমি ঢালু হইয়া নামিয়া গিয়াছে। জঙ্গল বিরল। দূরে এক বিশাল জলাশয়। কুমুদ কহ্লার পদ্ম শোভিত। হংস কারণ্ডব চক্রবাক বক-মুখরিত। এই জলাভূমি বর্ষাকালে নদীসংযুক্ত হয়। অন্য কালে স্বপ্রতিষ্ঠ।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিল দূরে এক বন্য নারী মূর্ত্তি। ও দাদাঠাকুর ও রাজপুত্তুর এই বলিয়া সে সত্যবানকে আহ্বান করিতেছে। ক্রমশ তাহার রৌদ্র করণোদ্ভাসিত সমগ্রমূর্ত্তি প্রকট হইল। তন্বী যুবতী। কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরের ন্যায় মসৃণ দেহ-কান্তি। দেহযষ্ঠী বলিষ্ঠ, কিন্তু অনাবশ্যক মেদ-মাংস বর্জ্জিত। কটিবাস সংক্ষিপ্ত। বক্ষও অনাবৃত প্রায়। হাস্যময় মুখে স্বাস্থ্য ও সারল্য বিরাজমান। মস্তকের কেশ পাশে প্রচুর বন্যপুষ্পাবদ্ধ। কপালদেশে শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু। হস্তপদ ও গাত্রের স্থানে স্থানে প্রচুর কর্দ্দমের প্রলেপ।

সে বলিল ও দাদাঠাকুর আমার গাভী পাঁকে বসিয়া গিয়াছে, একা তুলিতে পারিতেছি না। একটু হাত লাগাও না ভাই।

তারপর তাহার সাবিত্রীর দিকে দৃষ্টি পড়িল। এই স্থানে রাজপুত্রের আবির্ভাব অদ্ভুত নহে। তাহা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র এই আলোচনা হইয়াছে। সরল শবর কন্যা নাগরবাসীদিগের মত মনোভাব গোপন-বাচক কথা বার্ত্তা কহিতে শিখে নাই। সে বলিয়া ফেলিল—এই বুঝি সেই রাজকন্যা যে আমাদের রাজপুত্রকে নিতে এসেছে। তা হবে না দিদি, আমরা সহজে আমাদের রাজপুত্রকে ছেড়ে দিচ্ছি না। দাম দিতে হবে।

সাবিত্রীর মুখমণ্ডল ঈষৎ রক্তিম হইল। চকিতে সত্যবানের দিকে চাহিয়া তাহারও সেই অবস্থা দেখিল। কিন্তু শবর কন্যার সারল্য ও ভঙ্গীতে সে না হাসিয়া পারিল না। কথাবার্ত্তা যাহাতে আরো বেশী বক্রভাব ধারণ না করে তজ্জন্য সত্যবান শবর কন্যার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া গাভীর দিকে অগ্রসর হইল। গাভীর অবস্থা দেখিয়া তাহার উদ্ধারপ্রয়াসকারিণীর পঙ্কলিপ্ত দেহের কারণ বুঝা গেল। সত্যবান ও শবরী দুই জনে মিলিয়া তাহার উত্তোলনে প্রচণ্ড চেষ্টা করিতে লাগিল। কোনও ফল হইল না।

তাহাদের কর্দ্দম বিভূষিত মূর্ত্তি হাস্যোদ্রেককারী হইয়াছিল। সাবিত্রীও হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। তাহার হাস্য দেখিয়া শবরী ক্রুদ্ধা হইল। বলিল—তুই কিলা মেয়ে, তোর হবুবর এত কষ্ট করছে, আর তুই হাসছিস। একবার হাত লাগাতে পারছিস না। তুইও একটু কাদা মাখ—এই বলিয়া এক ঢেলা কাদা তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিল। সাবিত্রী কুপিতা হইল না। কৌতুক ভাবেই লইল। বস্ত্র সংবৃত করিয়া তাহাদের সাহায্যার্থে গমন করিল এবং অবিলম্বে কর্দ্দমভূষিতা হইল। তাহাদের সমবেত চেষ্টায় গাভী উদ্ধার পাইল।

শবরী গাভীকে তৃণ রজ্জু দিয়া বাঁধিল। বলিল, ওদিকে ভাল ঘাট আছে সেখানে নেয়ে নিবে আয়। সকলে সেখানে গেল। গাভীটিকে স্নান করাইয়া পরিষ্কার করিয়া উহাকে ঘাটের এক পার্শ্বে বাঁধিয়া তিন জনে স্নান ও সন্তরণ করিতে লাগিল। এই স্থানে সরসীর জল অনেকটা পরিষ্কার। দূরে অজস্র কুমুদ, কোকনদ, শ্বেত ও রক্ত পদ্ম শোভিতেছে। কোন কোন স্থানে অজস্র পানিফল ফলিয়াছে। সন্তরণ পটু শবরী অজস্র পুষ্প ও ফল আহরণ করিয়া সাবিত্রীকে দিল। অপর দুইজনও যথাসাধ্য ফুল ও ফল সংগ্রহ করিল।

স্নান সমাপন হইলে তীরে উঠিয়া শবরী গাভী লইয়া নিজ আবাসের দিকে চলিয়া গেল।

(৩)

সাবিত্রী ও সত্যবান ফল আহরণার্থ বড় বনের দিকে চলিল। উভয়ের সিক্ত বসন পরিবর্তনের উপায় ছিল না। রৌদ্র তাপ ও বায়ু উহা ক্রমশ শুষ্ক করিতে লাগিল। ব্যায়াম ও ভ্রমণ হেতু উভয়ের শরীরে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হওয়ায় শৈত্য অনুভব জনিত কষ্ট সঞ্চার হইল না। বড় বন হইতে তাহারা প্রচুর আমলকাদি ফল আহরণ করিল। এতক্ষণে তাহাদের বস্ত্রাদি সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পথি মধ্যে এক মনোরম দৃশ্যযুক্ত স্থান দেখিয়া ও একটি সুন্দর সুচ্ছায় বৃক্ষ দেখিয়া তাহারা সেখানে উপবেশন করিল। সত্যবান একটু পরেই অদূরে একটি বৃক্ষাবলম্বী শাখালতা দেখিল। সে উঠিয়া গিয়া উহার তলদেশ খুঁড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ মধ্যেই এক প্রকাণ্ড আলু জাতীয় মূল বাহির হইল। ক্ষুধার্ত্তা সাবিত্রী উহার এক খণ্ড খাইতে যাইতেছিল। সত্যবান নিষেধ করিল। বলিল উহা কাঁচা খায় না, সিদ্ধ বা পুড়াইয়া খাইতে হয়। উহার ব্যবস্থা করিতেছি।

সাবিত্রী বলিল এখানে আগুন পাবেন কোথা হতে। সঙ্গে ত চকমকি ও ইস্পাত নাই। সত্যবান বলিল, বনে কিরূপে অগ্নি উৎপাদন করা হয় দেখাইতেছি। সে অদূরস্থ অগ্নিমন্থ বৃক্ষের দুই শুষ্ক সরল ডাল সংগ্রহ করিয়া আনিল। সে দুটিকে ছুরিকা দিয়া উপযুক্ত আকার কাটিয়া লইল। একটিকে নিচে রাখিয়া দুই পা দিয়া উহা চাপিয়া ধরিল। সে উহার মধ্যে ছুরিকা দিয়া একটি ছোট গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিল। অপর দণ্ডটির নিম্ন ভাগ কীলকাকৃতি করিয়া সূচাল করিল। সূচাল মুখটি নিম্ন দণ্ডের উপর

স্থাপন করিয়া দণ্ডটিকে দুহাতে করিয়া বেশ জোর দিয়া নিম্নদিকে চাপ দিয়া—ঘুরাইতে লাগিল। বলিল, ঋত্বিকগণ এই ভাবেই যজ্ঞাগ্নি নির্ম্মাণ করে। উপরের কাঠটি উত্তরারণি নিচের কাঠটি অধরারণি। কিছুক্ষণ ঘর্ষণের পর অগ্নি উৎপাদিত হইল। ফুঁ দিয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করিল। পরে কতকগুলি শুষ্ক শাখা ও পত্র তদুপরি দিয়া ফুঁ দিতেই প্রজ্বলিত অগ্নি হইল। তদুপরি একখণ্ড আলু সংস্থাপন করিয়া আরও ইন্ধন চাপাইয়া দিল। বেশ একটু বড় আগুন হইল। কিছুক্ষণ পরেই একখণ্ড কাষ্ঠের সাহায্যে আলুখণ্ডকে বাহিরে আনিল। উহার উপরটা পুড়িয়া গিয়াছে। ভিতরটা বেশ সিদ্ধ হইয়াছে।

ভোজন পর্ব্ব ও বিশ্রাম শেষ করিয়া তাহারা আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইল।

বিবাহ

অশ্বপতি কন্যাদানে সংকল্প করিয়া বৈবাহিক উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিয়া, পুরোহিত ও বিপ্রগণ সহ দ্যুমৎসেন আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি আশ্রমের কিছুদূরে যানাদি পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীগণ-সহ পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। শাল বৃক্ষতলে কুশাসনে উপবিষ্ট অন্ধ ভূপতিকে দেখিলেন। যথারীতি তাহার পূজা করিয়া বিনয় বচন দ্বারা আত্মনিবেদন করিলেন। তাহাকে অর্ঘ ও আসন প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা পূর্ব্বক অন্ধরাজা আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

অশ্বপতি :—সাবিত্রী নাম্নী আমার কন্যাকে আপনি স্নুষার্থে গ্রহণ করেন এই আমার অভিপ্রায়।

দ্যুমৎসেন :- আমি রাজ্যচ্যুত হইয়া আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক নিয়ত তপস্বীদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতেছি। বনবাসাশ্রমে অনভ্যস্তা আপনার কন্যা কিরূপে এই সকল ক্লেশ সহ্য করিবেন?

অশ্বপতি :- এ বিষয়ে সুখ ও দুঃখ কি- তাহা আমি ও আমার কন্যা বিশেষ ভাবে অবগত আছি। তাহার পরই এই প্রস্তাব করিতেছি। অতএব প্রণয় ও সুহৃদ ভাবে আপনার নিকট আগত ও প্রণত আমার আশা বিনষ্ট করিবেন না। আপনি সম্পূর্ণরূপে আমার উপযুক্ত, আমিও আপনার তদ্রূপ। অতএব সাবিত্রীকে সত্যবানের বধূরূপে গ্রহণ করুন।

দ্যুমৎসেন :- -আমি পূর্ব্বেই আপনার সহ এ সম্বন্ধ অভিলাষ করিয়াছিলাম। কেবল ভ্রষ্টরাজত্ব হেতু ইতস্তত করিতেছিলাম। আমার অতিথি আপনি- যখন ইহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন তখন এই বিবাহ অদ্যই নিবর্ত্তিত হউক। তখন দুই নৃপ দ্বিজগণকে আনয়ন করিয়া যথাবিধি উদ্বাহ ব্যাপার সমাধা করিলেন। অশ্বপতি যথারীতি সপরিচ্ছদা কন্যা দান করিয়া পরম আনন্দে স্বপুর গমন করিলেন। সত্যবান ও সর্ব্বগুণান্বিতা ভার্য্যা লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। সাবিত্রীও মনোমত পতি-লাভে হৃষ্ট হইল। পিতার গমনের পর সাবিত্রী বস্ত্র ও আভরণ সকল রাখিয়া দিয়া বল্কল ও কাষায় বসন গ্রহণ করিল। সাবিত্রী তাহার প্রিয়বাদিত্ব, নিপুণতা, ও শমের দ্বারা শ্বশ্রূ, শ্বশুর, স্বামী ও আশ্রম-বাসিগণকে পরিতোষিত করিলেন।

সেই দুর্দ্দিবস

আশ্রমে ক্রমশ দিন গত হইতে লাগিল। নারদের বাক্য সাবিত্রী হৃদয়ে অহরহ জাগ্রত ছিল। সে প্রত্যেক দিনটি গুনিয়া যাইতে লাগিল ক্রমশ সেইদিন আসিল যাহা হইতে চতুর্থ দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইবে সাবিত্রী শ্বশুরকে বলিল—আমি তিনদিন উপবাসী থাকিয়া ব্রত উপাসনা করিব। চতুর্থ দিনে পারণ করিব।

দ্যুমৎসেন :—তাইত এ অতি তীব্র কঠোর ব্রত। ত্রিরাত্র কি প্রকারে উপবাস করিয়া থাকিবে?

সাবিত্রী :—তাত এ বিষয়ে আপনি উদ্বেগ করিবেন না। অধ্যবসায়ে দ্বারাই এ ব্রত গ্রহণ করিতে হয়। আমি ইহা সম্পূর্ণ করিতে পারিব।

দ্যুমৎসেন :—তুমি ব্রত ভঙ্গ কর এ কথা বলিতে পারিনা, বরং ব্র সম্পূর্ণ কর এই কথাই আমার বলা উচিত।

সাবিত্রী ব্রতাবলম্বন করিয়া কাষ্ঠের মত স্থির ভাবে অবস্থান করিত লাগিল। সে কোন্ দেবতার ধ্যানে মগ্না রহিল? মহাভারতকার তা লিখেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রে ভূয়োভূয় লিখিত আছে সাধক যে ভাবে, ভক্তি পূর্ব্বক যে দেবতারই উপাসনা করুক না কেন একই সর্ব্বভূতান্তরা পরমাত্মা তত্তদেবতারূপে সাধকের মনস্কামনা পূর্ণ করেন।

চতুর্থ দিবস উপস্থিত হইলে, প্রাতে সূর্য্য দিহস্ত পরিমিত আকাশে উঠিলে, দীপ্ত হুতাশনে হোম করিয়া সাবিত্রী পৌর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়া সব সমাধা করিয়া, শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও বৃদ্ধ বিপ্রদিগকে অভিবাদন করি তাহাদের সম্মুখে কৃতাঞ্জলি বসিল। তাহারা তাহাকে অবৈধব্য হউ বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্যানযোগ পরায়ণা সাবিত্রী মনে মনে সে তপস্বীদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

তখন শ্বশ্রূ ও শ্বশুর বলিলেন- ব্রত যথাযোগ্য ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে এখন কিছু আহার কর। সাবিত্রী বলিল, আদিত্য অস্তমিত হইলে আ ভোজন করিব এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় সত্যবান পরশু স্কন্ধে লই বনের দিকে গমন করিল। সাবিত্রী তাহাকে যাইয়া বলিল, তুমি আ একাকী বনে যাইতে পারিবে না। আমি সঙ্গে যাইব। তোমা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে উৎসাহ হইতেছে না।

সত্যবান :—এ মহাবনে তুমি যাইওনা। বিশেষ ব্রতোপবাসক্ষীণদেহা পায়ে চলিয়া কেমন করিয়া যাইবে?

সাবিত্রী :- উপবাস হইতে আমার কোনও গ্লানি ও শ্রম নাই গমনে আমার খুব উৎসাহ হইয়াছে। আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

সত্যবান :—যদি তোমার গমনোৎসাহ হইয়াছে তাহা হইলে তোমা প্রিয়ই করিব। গুরুজনগণের অনুমতি গ্রহণ কর, যাহাতে আমা কোনও দোষ না স্পর্শে।

সাবিত্রী শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের নিকট যাইয়া বলিলেন :—এই আম ভর্ত্তা ফল সংগ্রহার্থে মহাবনে যাইতেছেন। আমার ইচ্ছা আপনাদে অনুমতি লইয়া ইহার সহিত বনে গমন করি। অদ্য ইহার বি আমার সহ্য হইতেছে না। গুরু ও অগ্নি হোত্র কার্য্যের জন্য ইনি ব

যাইতেছেন। তাহাকে নিবারণ করা উচিত হয় না। আর আমি প্রায় সম্বৎসর এই আশ্রম হইতে বাহির হই নাই। কুসুমিত বন দেখিতেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।

দ্যুমৎসেন :—পিতা কর্ত্তৃক সম্প্রদানের পর হইতে এ যাবৎ সাবিত্রী যে কোনও রূপ আবদার করিয়াছে তাহা আমার মনে পড়ে না। অতএব বধূ যথাভিলষিত কার্য্য করুক। পরে সাবিত্রীকে বলিলেন—পুত্রি, পথিমধ্যে সত্যবান যেন অপ্রমাদ ভাবে কার্য্য করে তাহা দেখিও। উভয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া সাবিত্রী সহাস্যমুখে পতির অনুগমন করিল। অন্তর কিন্তু তাহার দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছিল। বিপুলেক্ষণা সাবিত্রী চারিদিকে ময়ূরজুষ্ট বিচিত্র বন সকল দেখিতে দেখিতে চলিল। সত্যবান মধুর বচনে বলিলেন, ঐ দেখ পুণ্যবহা নদী সকল ও পুষ্পিত বিরাট তরুগণ। সাবিত্রী সর্ব্বাবস্থাতেই ভর্ত্তাকে নিরীক্ষণ করিয়া চলিল। নারদের বাক্যে তাহাকে মৃত বলিয়াই মনে করিতে লাগিল।

মহাবনে

আয়াসসহায় সত্যবান ফল সকল আহরণ করিয়া কঠিনকে পূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ কাটিতে আরম্ভ করিল। কাষ্ঠ কাটিতে কাটিতে তাহার স্বেদ জন্মিল ও মস্তকে বেদনা অনুভূত হইল। শ্রমপীড়িত হইয়া প্রিয় ভার্য্যার নিকট আসিয়া বলিল,—এই ব্যায়ামবশতঃ আমার মস্তকে বেদনা অনুভূত হইয়াছে। শরীর ও বক্ষ সকল যেন মনে হইতেছে। নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ মনে হইতেছে। বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই বলিয়া সে ভূতলে শয়ন করিল। সাবিত্রী সেখানে গমন করিয়া স্বামীর মস্তক নিজ ক্রোড়ে সংস্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিল। সে সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহাকে নিরীক্ষণকারী এক শ্যামবর্ণ রক্তাক্ষ, পাশহস্ত ভয়াবহ পুরুষকে অবলোকন করিল। সে নারদ কথিত দিবস ও ক্ষণ আগত অনুভব করিল। তাহার হৃদয় কম্পিত হইল। সে ধীরে পতির মস্তক ভূমিতে ন্যস্ত করিয়া সহসা উঠিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই পুরুষকে বলিল :—আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে কারণ এই বপু অমানুষ। আপনি কে এবং কি জন্য আগমন করিয়াছেন।

যম :—শুভে সাবিত্রী, তুমি পতিব্রতা ও তপোন্বিতা এজন্য তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আমাকে যম বলিয়া জান। এই তোমার ভর্ত্তা, পার্থিবাত্মজ সত্যবান ক্ষীণায়ু। ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।

সাবিত্রী :—শুনিয়াছি আপনার দূতগণই মানবকে লইয়া যাইবার জন্য আসে। তবে আপনি স্বয়ং কেন আসিয়াছেন?

যম :—এই রূপবান, গুণসাগর ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি সৎপুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার উপযুক্ত নহে। এজন্য স্বয়ং আমিই আগমন করিয়াছি।

এই বলিয়া যম সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পাশবদ্ধ পুরুষকে বলের সহিত আকর্ষণ করিয়া বাহির করিলেন। সত্যবানের দেহ হতশ্বাস, নিষ্প্রভ ও নিশ্চেষ্ট হইল। যম পাশবদ্ধ সত্যবানের আত্মাকে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন আরম্ভ করিলেন। সাবিত্রী যমের অনুগমন করিল।

যম বলিলেন :—সাবিত্রী তুমি ফিরিয়া যাও। ইহার ঊর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সমাধান কর।

সাবিত্রী :—আপনি আমার ভর্ত্তাকে লইয়া যেখানে যাইতেছেন সেখানে আমারও গমন করা কর্ত্তব্য। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। কাহারও সহিত সপ্তপদভ্রমণ করিলে মিত্রতা হয়। অতএব আপনি আমার মিত্র হইয়াছেন। মিত্রভাবে আপনাকে কিছু বলিব। সাধুগণ ধর্ম্মকেই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু ভাবেন। ধর্ম্ম ব্যতীত তাঁহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় কোনও বস্তু প্রার্থনা করেন না।

যম। তোমার কথায় আমি প্রীতি হইয়াছি। ইহার জীবন ব্যতীত কোনও বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী :—তাহা হইলে স্বরাজ্য হইতে চ্যুত, বনবাসাশ্রিত বিনষ্টচক্ষু আমার শ্বশুর আপনার বরে লব্ধচক্ষু হউন।

যম :—তুমি যাহা চাহিলে আমি সেই বর দিলাম। পরিশ্রম বশতঃ তোমাকে গ্লানিযুক্ত মনে হইতেছে। এক্ষণে ফিরিয়া যাও।

সাবিত্রী :—শ্রমঃ কুতো ভর্ত্তৃসমীপতো হি মে

> যতো হি ভর্ত্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
> যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ সুরেশ
> ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে।

সৎসঙ্গ লোকের একবার মাত্রও প্রার্থনীয়। সাধুদিগের সঙ্গ কখনও বিফল হয় না। অতএব সৎপুরুষের সঙ্গেই বাস কর্ত্তব্য।

যম :—মনোনুকূল, বুধগণেরও বুদ্ধি বর্দ্ধন, তোমার এই হিত কথা শুনিয়া প্রীত হইলাম। সত্যবানের জীবন ব্যতীত কোনও বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী :—আমার শ্বশুর নিজ রাজ্য লাভ করুন, আর তিনি যেন কখন ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত না হন।

যম :—তোমার শ্বশুর অচিরে নিজ রাজ্য পাইবেন এবং তিনি ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন না। হে নৃপাত্মজে, তোমার কামনা পূর্ণ হইল। এখন তুমি ফিরিয়া যাও যাহাতে তোমার শ্রম আর না হয়।

সাবিত্রী :—প্রজা সকল আপনার নিয়মে সংযমিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে এই জন্যই আপনার যম এই বিখ্যাত নাম। আমার আরও কিছু কথা শুনুন।

> অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।
> অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

প্রায় লোকই আমার স্বামীর ন্যায় শক্তি কৌশল হীন। কিন্তু সাধুগণ প্রাপ্ত অমিত্রের প্রতিও দয়া করিয়া থাকেন।

যম :—হে শুভে পিপাসিতের পক্ষে জল যেমন প্রীতিকর, তোমার বাক্যও সেইরূপ সুমধুর। সত্যবানের জীবন ব্যতীত যদি ইচ্ছা কর অন্য বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী :—আমার পিতার বহুপুত্র হউক এই তৃতীয় বর দিন।

যম :—তোমার পিতার বহুপুত্র হইবে। এইবার তুমি ফিরিয়া যাও। বহুদূর আসিয়াছ।

সাবিত্রী। ন দূরমেতন্মম ভর্ত্তৃসন্নিধৌ মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি। আমার আর একটু কথা শুনুন। প্রতাপবান আপনি সূর্য্যের পুত্র বলিয়া আপনার বৈবস্বত নাম। প্রজাসকল আপনার প্রভাবেই ধর্ম্মপথে বিচরণ করে এই জন্যই আপনার ধর্ম্মরাজত্ব। সাধুদিগের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, নিজের প্রতিও তেমন নহে। এজন্য লোকে সাধুর প্রণয় ইচ্ছা করে এবং সাধু পুরুষকেই লোকে অধিক বিশ্বাস করে।

যম। তুমি ছাড়া আর কাহাকেও এরকম বলিতে শুনি নাই। আমি তুষ্ট হইয়াছি, ইহার জীবন ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। সত্যবানের ঔরসে আমার বলবীর্য্যশালী কুলপ্রদীপ বহু পুত্রলাভ হউক। এই আমার চতুর্থ বর প্রার্থনা।

যম। তোমার বলবীর্য্যশালী বহুপুত্র হইবে। এইবার ফিরিয়া যাও। বহুদূর আসিয়াছ।

সাবিত্রী। সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ।
সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্ সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ॥

(সৎদিগের ধর্ম্ম বৃত্তি চিরন্তন। সৎ অবসন্ন হন না, ব্যথিত হন না। সৎদিগের সাধু সঙ্গ বিফল হয় না। সৎদিগের সন্তদিগের নিকট হইতে কোনও ভয় নাই।)

যম। হে পতিব্রতা তুমি যেমন যেমন ধর্ম্মযুক্ত, মনোনুকূল, মহার্থযুক্ত, সুপদ বাক্য সকল বলিতেছ তেমনি তোমার প্রতি আমার উত্তমা ভক্তি সঞ্জাত হইতেছে। তুমি এক্ষণে অপ্রতিম বর প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী। বর প্রার্থনা করি, এই সত্যবান জীবিত হউক। পতি বিনা ত আমি মৃতারই মত।

ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা সুখং ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্ত্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং ন ভর্ত্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্॥

আর আপনি আমাকে বহুপুত্র বর দিয়াছেন। আমার স্বামীকে হরণ করিলে আপনার কথা কিরূপে সত্য হইবে। অতএব সত্যবানকে জীবন দান করুন।

তাহাই হউক—বলিয়া ধর্ম্মরাজ সত্যবানকে পাশ মুক্ত করিয়া সাবিত্রীকে বলিলেন : এই আমি তোমার স্বামীকে মুক্ত করিলাম। সে অরোগ ও সিদ্ধার্থ হইবে। সত্যবান হইতে তোমার বহুপুত্র লাভ হইবে। তোমরা একত্রে শতাধিক বর্ষ কালযাপন করিবে। তোমার পুত্র পৌত্রগণ ক্ষত্রিয় রাজা হইবে ও তোমার নামে খ্যাত হইবে। তোমার পিতামাতারও বহু পুত্র হইবে। তাহারাও ক্ষত্রিয় রাজা হইবে।

এই বলিয়া সাবিত্রীকে ফিরাইয়া ধর্ম্মরাজ স্বভবন গমন করিলেন।

যম গমন করিলে সাবিত্রী বিবর্ণদেহ সত্যবানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শির নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিল। সত্যবান সংজ্ঞালাভ করিয়া সাবিত্রীকে প্রেমসহকারে দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি তোমার ক্রোড়ে বহুক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম। উঠাইলে না কেন? আর সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ যে আমাকে আকর্ষণ করিল সেই বা কে। সাবিত্রী বলিল আমার অঙ্কে তুমি বহুক্ষণ ঘুমাইয়াছ। সেই শ্যামবর্ণপুরুষ যমরাজ। তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এখন বিশ্রান্ত ও বিনিদ্র হইয়াছ। যদি নিজেকে শক্তিমান মনে কর ত উঠ। রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখ।

সত্যবান। বনে তোমার সহ ফল আহরণার্থ আসিয়াছিলাম। তার পর কাষ্ঠ কাটিবার সময় শিরে বেদনা অনুভব করিয়া তোমার ক্রোড়ে শায়িত হইয়া নিদ্রিত হইলাম। তার পর এক শ্যামবর্ণ মহাতেজস্বী পুরুষকে দেখিলাম। ইহা কি আমার স্বপ্ন না সত্য। যদি তুমি এ সম্বন্ধে কিছু জান তাহা বল।

সাবিত্রী। রজনী অতিবাহিত হইলে কল্য তোমাকে সকল কথা যথাযথ বলিব। এখন উঠ, পিতামাতাকে দেখিতে যাইবে চল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। ক্রূরভাষী নিশাচর জন্তুগণ আনন্দে বিচরণ করিতেছে। পত্রপত্র সকলের উপর দিয়া গমনশীল মৃগগণের শব্দ আসিতেছে। শিবা সকলের ভীষণ নিনাদে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।

সত্যবান। রজনী ত ঘোর অন্ধকার দেখিতেছি। তুমিও ত পথ জাননা, যাইতে পারিবে না।

সাবিত্রী। বনে একটি শুষ্ক বৃক্ষ দগ্ধ হইয়াছিল। বায়ু দ্বারা ধমায়মান তাহার অগ্নি কখনও কখনও দেখা যাইতেছে। চারিদিকে অনেক শুষ্ক কাষ্ঠ ও পত্রাদি পড়িয়া রহিয়াছে। ঐ আগুন আনিয়া ইহা দিগকে জ্বালাইয়া দিয়া আলোক প্রস্তুত করি। তাহাতে তোমার সন্তাপ দূর হইবে। যদি শরীর দুর্ব্বল বোধ কর, এবং অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া পাইবে না ভাব তাহা হইলে না হয় এই অরণ্যেই আজ রাত্রি যাপন কর। প্রাতঃকালে প্রাতে আলোক দেখা দিলে ফিরিয়া যাইব।

সত্যবান। আমি পূর্ব্বে কখনও সন্ধ্যাকালে আশ্রমের বাহির হই নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মাতা আমাকে অবরোধ করেন। দিবসেও আমার যাইতে বিলম্ব হইলে পিতামাতা উদ্বিগ্ন হইয়া আশ্রমবাসিগণের সহিত আমাকে খুঁজিতে বাহির হইতেন। একবার আমার বিলম্ব হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত ক্রন্দন করিয়াছিলেন। আমাকে বলিয়াছিলেন, পুত্র তুমি আমাদের বৃদ্ধ বয়সের যষ্টি। তোমা বিনা আমরা একদিনও বাঁচিব না, আমি আমার জন্য ভাবিতেছি না। পিতামাতার দুঃখ ভাবিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে।

এই বলিয়া সত্যবান উচ্চ স্বরে রোদন করিয়া ফেলিলেন।

সাবিত্রী :—যদি আমি কোন তপস্যা, দান ও হোম করিয়া থাকি, তাহার ফলে অদ্যকার রাত আমার শ্বশ্রূ শ্বশুর ও ভর্ত্তার শুভ হউক। আমি ইতিপূর্ব্বে কোনও মিথ্যাকথা বলিয়াছি মনে হয় না, সেই সত্যে আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর জীবিত হউন।

সত্যবান :—সাবিত্রী, আমি পিতামাতাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অতএব যাইবার ব্যবস্থা কর।

সাবিত্রী কেশ সংযমন করিয়া উভয় বাহুদ্বারা পতিকে উঠাইলেন।

তারপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ফলপূর্ণ কঠিন দেখিলেন। বলিলেন, কাল ফল লইয়া যাইব। আজ তোমার কুঠারটি লইব। উহা যজ্ঞের জন্য প্রয়োজন। আত্মরক্ষার জন্যও বটে। এই বলিয়া সে কঠিনভার বৃক্ষশাখায় অর্পণ করিল এবং কুঠারটি গ্রহণ করিয়া পুনরায় সত্যবানের নিকট আসিয়া তাহার হস্ত নিজ স্কন্ধে স্থাপন করিল। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ভর্ত্তাকে ধরিয়া অগ্রসর হইল। সত্যবান বলিল বৃক্ষান্তরের মধ্য দিয়া আগত জ্যোৎস্না দ্বারা পথ আলোকিত দেখাইতেছে। অভ্যাস গমনের দ্বারা এ পথ আমার সুপরিচিত। তুমি নিঃশঙ্কে গমন কর। আমিও নিজ শরীরকে সুস্থ ও সবল অনুভব করিতেছি। অতএব এস, শীঘ্র শীঘ্র যাই।

উভয়ে দ্রুত আশ্রমের দিকে গমন করিল।

নিষ্কৃতি

দ্যুমৎসেন চক্ষুলাভ করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। রাত্রিকাল পর্য্যন্ত সত্যবানকে না দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। পত্নীসহ তাহাকে বনে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কুশ ও কণ্টকে তাহাদের পদ ও শরীর বিক্ষত হইল। পুত্রের কোনও সাড়া না পাইয়া তাহারা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণও চারিদিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ তপস্বীগণ বিবর্ণ ও ক্লান্ত রাজারাণীকে নানারূপ প্রবোধ বাক্য বলিয়া উপবেশন করাইলেন। গৌতমাদি ঋষিগণ বলিলেন, আমরা তপস্যাদ্বারা যে দিব্যজ্ঞান অর্জন করিয়াছি তাহাতে জানিতেছি সত্যবান জীবিত আছে। সাবিত্রী লোকপূজ্যা সুলক্ষণা ও পতিপ্রাণা কন্যা, তাহাতে তাহার ভাগ্যে বৈধব্য নাই। ইত্যাদি আশ্বাস বাক্যে রাজা রাণী কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়াছেন এমন সাবিত্রী সত্যবান সেখানে উপনীত হইল। সকলে তাহাদিগকে এত বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সত্যবান বলিল, বনমধ্যে কাষ্ঠ কাটিতে গিয়া আমার শিরোবেদনা হয় তাহাতেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। উহাই বিলম্বের কারণ।

ঋষিগণ তখন সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজার চক্ষুলাভ এক অদ্ভুত ব্যাপার—এ সম্বন্ধে তুমি যদি কিছু জান তাহা আমাদিগকে বল। সাবিত্রী সত্যভাষিণী এবং তাহার কোনওরূপ অহমিকা ভাব নাই। সে বলিল নারদের বাক্যে স্বামীর মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়া আমি ঐ ব্রত করিয়াছিলাম এবং স্বামীকে ঐ দিন পরিত্যাগ করি নাই। তার পর তাহাকে ধর্ম্মরাজ লইতে আসিলে আমি স্তবদ্বারা সেই দেবতাকে তুষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তুষ্ট হইয়া তিনি আমাকে পাঁচটি বর দেন। প্রথমটি শ্বশুর সম্বন্ধে। একটিতে তাঁহার চক্ষু পুনঃপ্রাপ্ত। দ্বিতীয়টিতে তাঁহার ভ্রষ্ট রাজ্য লাভ। তৃতীয় বরে আমার পিতার শত পুত্র লাভ হইবে। (সাবিত্রীর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর নিজের জন্য নহে ইহা দ্রষ্টব্য।) চতুর্থ বরে আমার শত পুত্র লাভ ও পঞ্চম বরে সত্যবানের দীর্ঘায়ু লাভ। এই জীবনাকাঙ্ক্ষাতেই আমি সেই ব্রত পালন করিয়াছিলাম। এই আমার জীবনের অতি কষ্টের কাহিনী আপনারা সকলেই শুনিলেন। আর কোনও রহস্য নাই।

ঋষিগণ বলিলেন হে সাধ্বি সাবিত্রী, তুমি সুশীল স্বভাবের দ্বারা এবং পুণ্য ব্রত পালন দ্বারা এই তমোহ্রদনিমগ্ন বাসনাপন্ন রাজকুলকে উদ্ধার করিয়াছ। তোমাদের সকলের জয় হউক। এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে শাল্ব দেশ হইতে প্রজাবৃন্দ আসিয়া দ্যুমৎসেনকে সংবাদ দিল যে তাহার বিপক্ষ রাজা নিজ অমাত্যের ষড়যন্ত্রে সদলে নিহত হইয়াছে। তৎপক্ষীয় সকলে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইয়াছে। প্রজাবৃন্দ এক মতে বলিয়াছে—দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মানই হউন আর চক্ষুহীনই হউন তিনিই আমাদের রাজা হইবেন। আমরা সকলে আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়াছি। তাহারা সকলে রাজাকে চক্ষুষ্মান দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইল।

অতঃপর সৈন্যপরিবৃত রাজা স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাণী ও সাবিত্রী পরিচারিকাবৃতা হইয়া শিবিকা আরোহণে চলিলেন। যথাসময়ে রাজার পুনঃ অভিষেক কার্য্য হইল। সত্যবান যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। যথাকালে সাবিত্রীর সহোদরগণ এবং নিজের বিক্রান্ত পুত্রগণ জন্মিল।

পাণ্ডুলিপি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

শ্রাবণ সন্ধ্যার ছায়া আকাশের দূর কোণে কোণে
প্রদোষের পাণ্ডুলিপি পূরবীর তারে তারে বোনে
সর্পিল পথের শেষে।
সেখানে অনেক দূরে গ্রামান্তের বন রেখা মেশে,
ধান চারা জেগে-ওঠা প্রান্তরের পারে—
তারি এক ধারে
প্রতিদিন এঁকেছে জগৎ,
সূর্য্যাস্ত সাগর তটে দিগন্তের দূর ছায়া পথ,
মাঝে মাঝে সুর তার দিবসের পড়ন্ত আলোকে
দ্বারে দ্বারে যায় ডেকে,
সেখানে বাগান কোণে সূর্য্যমুখী তার,
দেখেছে গোপন চোখে আলো মায়ার
সন্ধ্যাশেষে রক্তরাগ রেখা,—
সে অন্তিম দেখা,
আরবার যেন শুধু ঘটে
সাগরের ঢেউ ভাঙা অতি দূর উচ্চ বালুতটে,—
যেন একবার,
ইতিহাস লিখে যায় জীবনের অসীম ব্যথার।

বিশ বছর পরে

শ্রীনির্মলকান্তি মজুমদার

বিশ বছর পরে ফিরে এসেছি ছেড়ে-যাওয়া-গ্রামে ভুলে-যাওয়া লোকের মাঝখানে। কত পরিবর্তনই না হয়েছে! হাটতলার প্রাচীন বটগাছটা নেই—জায়গাটা একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ভূমিকম্পে গাছটা উপড়ে গিয়েছিল—তারপর গ্রামবাসীরা জ্বালানীরূপে এর ডালপালা সব নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলেছে। প্রাণে প্রচণ্ড আঘাত লাগল। ঐ গাছটার পাশেই ছিল আমাদের পাঠশালা। ওর সংগে আমাদের শৈশবের কত স্মৃতিই না জড়িত। ওর ঝুরি ধ'রে আমরা দোল খেতাম। পরীক্ষার সময় ওর নীচে ব'সে আমরা পড়া মুখস্থ করতাম—একে একে ডাক পড়ত। বটগাছটায় বাস করত নানা রংএর নানা পাখী। তাদের বিচিত্র কলতান ভোরবেলায় বড় ভাল লাগত। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে ক্লান্ত পথচারীর দল ওর শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করত। অপরাহ্নে ওর তলায় বসত বৃদ্ধদের বৈঠক—কোনদিন ধুম পড়ে যেত দাবা, পাশা বা তাসের। কোনদিন জমে উঠত—তামাক আর খোশ গল্প, আবার কোনদিন শোনা যেত আদালতের বিচার। গাছটার শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় অদৃশ্য অক্ষরে লেখা ছিল কত কথা, কত কাহিনী। ওর মর্মর ধ্বনিতে গাঁথা ছিল কত সুখ-দুঃখের সুর, জন্মমৃত্যুর শঙ্খরব, বিবাহের সানাই, শবযাত্রার সংকীর্তন। ও ত' মহাবৃক্ষ নয়, মহাগ্রন্থ—আমাদের কাছে একাধারে 'ঠাকুরমার ঝুলি' ও 'দাদামশায়ের থলে'।

বাগ্দী-পাড়াটা একেবারে শ্মশান হয়ে গিয়েছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলেই নাকি এই দশা। নদেরচাঁদ সর্দার মারা গিয়েছে। লোকটার চেহারা ছিল দৈত্যের মতো, গায়ে ছিল ভীষণ জোর। লাঠি খেলায় সে ছিল ওস্তাদ, বাঁশের উপর ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠত দোতলার ছাদে। 'পোল ভল্ট চাম্পিয়ন' হবার যোগ্যতা ছিল তার, কিন্তু তার ভাগ্যে চৌকিদারি ছাড়া আর কিছু জোটেনি। ইংরেজ আমলে নিরক্ষর শক্তিমান পল্লীবাসীর এই ছিল বোধ হয় চরম পুরস্কার। নিশীথে নদের চাঁদের হাঁক শুনে ভয়ে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে যেত। চৈত্র রাতের উদাস হাওয়ায় তার অঙ্গনে মাদল বাজিয়ে প্রাণ কাঁদানো গান হ'ত। আজ সেখানে শেয়ালের আড্ডা। নদের চাঁদের কূলে বাতি দিতে কেউ নেই। বাগ্দী পাড়ার রোহিণী মাসী অনেক আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছে। গ্রামশুদ্ধ লোক তাকে সমীহ ক'রে চলত—শ্রদ্ধায় নয়, ভয়ে। তার মতো কলহ-কুশলা নারী এ তল্লাটে আর কেউ ছিল না। ঝগড়া বাধলে আর রক্ষা ছিল না—আকাশ বাতাস কেঁপে উঠত তার কণ্ঠের ঝংকারে। একবার পাঁচ ঘণ্টা কলহ চালিয়ে ডোমপাড়ার কামিনীকে পরাস্ত করার পর রোহিণী জলগ্রহণ করে। মাসী বেঁচে থাকলে আজ বাগদী পাড়ায় শেয়ালের নিশ্চিন্ত বসবাস সম্ভব হ'ত না। রাত্রিচরেরাও মাসীকে চিনত।

পশ্চিম পাড়ার আখড়াটি ভেঙে পড়েছে। অধ্যক্ষ শ্রীকণ্ঠ দাস সম্প্রতি নিরুদ্দেশ হয়েছে। বাবাজী আমলকী তলায় বসে একতারা বাজিয়ে গান করতেন। মহোৎসবের সময় আখড়ায় জনসমাগম হ'ত। পাশেই খুদী বোষ্টমীর ঘর তালাবন্ধ। গ্রামের হাটে পুতুল, পুঁতির মালা, কাচ পোকার টিপ, ছোট ছোট টিনের আয়না ও কাঠের চিরুণি বিক্রি করত। খুদীর চেহারাটা ছিল বিশ্রী রকমের—তার দিকে চাইতে ভয় করত। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাকে স্বপ্নে দেখে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠত। ক্রমে ডাইনী ব'লে খুদীর বদনাম রটে। তাতেই সে গ্রাম ত্যাগ করে—সেই যে গিয়েছে আর ফেরেনি। এ পাড়ার প্রহ্লাদ কবিরাজ আজও বেঁচে আছেন, তবে রোগী দেখতে বেরোন না। বয়স হয়েছে, গ্রামে কয়েকজন এল, এম, এফ ডাক্তার হওয়ায় পসারও তেমন নেই। আমাদের ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন মস্ত লোক—তার পেট-মোটা ঘোড়াটা ছিল একটা প্রকাণ্ড আকর্ষণ।

মুচী পাড়ার ধারেই মাঠের বাগান। এখানে একটা তেঁতুল গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল ধুলো মুচীর বউ। দুপুর বেলা মাঠের বাগানে আমরা পেয়ারা খেতে আসতাম। তেঁতুল গাছের ধার দিয়ে চলবার

সময় আমাদের গা ছমছম করত দিনের আলোতেও। আমাদের দেশে শৈশবে ভূত পেত্নীর ভয় ক-জনের না থাকে ?

বুনো পাড়ার বিলের ধারে সতীমায়ের গাছ। এখন যেখানে বিল, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের যুগে সেখানে ছিল গঙ্গা। সেই সময়ে গঙ্গাতীরে ঐ গাছটির তলায় এক মহীয়সী মহিলা জলন্ত চিতায় পতির অনুগমন করেছিলেন। সেই থেকে গাছটি সতীমায়ের গাছ ব'লে পরিচিত। গাছটির ডালপালা সব শুকিয়ে ভেঙে পড়েছে। শুধু কাণ্ডটা কাৎ হয়ে হসন্তের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তবু আজও এ অঞ্চলে চলার পথে পল্লী রমণীরা শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। অদূরেই ছিল নন্দ বুনোর কুঁড়ে। নন্দ ত' মানুষ ছিল না, ছিল জীবন্ত যমদূত। কিন্তু তার কণ্ঠে ছিল স্বর্গের সুধা। সে যখন আপনমনে গাইত—'নবমী নিশি গো, তুমি আজ পোহায়ো না, তুমি গেলে আমার উমা যাবে, নয়ন জল আর শুকাবে না'—তখন পল্লীপ্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে শুনত তার গান।

মজুমদারদের গোলাবাড়ীর গায়ে টগর গাছটা কবে মরে গিয়েছে। ঐ গাছটার নীচে গাজনের সময় কাঠের সিংহাসনে মহাদেবকে বসানো হ'ত। সন্ন্যাসীদের কপালে বাণ ফোঁড়া, ঘুঙুর পায়ে ধুনুচি হাতে নাচ, শ্রেষ্ঠ ভক্তের উপর ঠাকুরের ভর, রাত্রিশেষে নিবন্ত আগুনের উপর সন্ন্যাসীদের গড়াগড়ি—চলচ্চিত্রের ছবির মতো একে একে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। থেকে থেকে যেন কানে বাজছে ভক্তি বিহ্বল সন্ন্যাসীদের উদাত্ত কণ্ঠস্বর—'বলে—কৈলাস-শিব-শংকর-মহাদেব।' একদা অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হ'ত—বর্তমানে সন্ন্যাসীর দুর্ভিক্ষে গাজন বিলুপ্তপ্রায়।

মহাকালের মন্দিরটির শেষ দশা। বহুকাল সংস্কার হয়নি। শ্যাওলা-সবুজ গায়ে ফাট ধরেছে—চূড়াটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে গাছের শিকড়। পূজা বন্ধ। যাঁদের পূর্বপুরুষ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা হয়েছেন প্রবাসী, আর ঠাকুর রয়েছেন উপবাসী। লোকের ধারণা এতে গ্রামের অশেষ অকল্যাণ হচ্ছে। ছেলেবেলায় এখানে কত উৎসব হতে দেখেছি ! ফাল্গুন কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রিতে পল্লীবাসিনীদের কী ভিড় ! নিশিযাপনের কত সহজ ব্যবস্থা ! ঝরা পাতা জড়ো ক'রে আগুন জ্বালানো হ'ত ; পুরুত ঠাকুর কথকতা করতেন ; মাঝে মাঝে দিগ্‌বধূদের চমকে দিয়ে বেজে উঠত ঢাকের ঘুম-পাড়ানো বাজনা। আজকের বিজনতার মধ্যে সে সব কল্পনা করাও কঠিন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনের কথা ভাবতে লাগলাম। সহসা শাস্ত্রবিমুখ শহরবাসীর ভিতর সুপ্ত পল্লী শিশু জেগে উঠল তার সবল বিশ্বাস নিয়ে। দূর থেকে ভাঙা দেউলের দেবতাকে বার বার নমস্কার জানালাম।

অবৈতনিক হাসপাতালটির জীর্ণ অবস্থা। নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের দুর্মূল্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতা, উপযুক্ত আহার্যের অভাব, অর্থকষ্ট ও দুশ্চিন্তায় লোকের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। সুযোগ বুঝে ব্যাধিও বিস্তার করেছে তার প্রভাব। কিন্তু রুগীর অনুপাতে ওষুধের অনটন। জেলা বোর্ডের দান অতি সামান্য। যে বধিষ্ণু বণিক পরিবারের বদান্যতায় হাসপাতালটি পরিপুষ্ট হয়েছিল তাঁরা আর দেশে থাকেন না। পরিবারের বর্তমান কর্তা বিলাসী বালিগঞ্জবাসী—পরিত্যক্ত পল্লীর প্রতি সমস্ত সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন। তবে বণিকজায়া স্মৃতির টানে সংগোপনে সাময়িক সাহায্য ক'রে থাকেন। মেঘ বারিবর্ষণ বন্ধ করলেও রজনীর প্রসুপ্ত প্রহরে শিশিরের অভিষেক বন্ধ হয়নি। তাই হাসপাতালটির দ্বার আজও মুক্ত রয়েছে। গ্রামের উদীয়মান কর্মীদের এসব ভাববার অবসর নেই। রাজনীতিই এখন তাদের নেশা ও পেশা। মানুষ যখন অন্ধকার থেকে আলোকে আসে, তখন অনেক সময়ে দুর্গতি দেখা দেয়। কবে আবার শুভবুদ্ধি এসে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করবে কে জানে।

বামুনপাড়ায় রামায়ণ ঠাকুরের বাড়ী। রামায়ণ ঠাকুর এখন বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ। অথচ একদিন তিনি ছিলেন প্রাণ-শক্তির অফুরন্ত উৎস। যেমন ধবধবে গলায় পৈতে, তেমনি টকটকে গায়ের রং। নেচে-নেচে রামায়ণ গান করতেন—শুনে সকলেই হতেন মুগ্ধ। সীতার বনবাসের একটা জায়গা আজও আমার মনে রয়েছে। শ্রীরামচন্দ্রের সংগে লব-কুশের সাক্ষাৎ—লব কুশ কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্রকে পিতা ব'লে বিশ্বাস করতে পারছেন না। অপূর্ব ভঙ্গীতে রামায়ণ ঠাকুর গাইতেন—

'কেমন ক'রে মোদের পিতা হবে হে রাম রঘুমণি ?
ধরণীর কন্যা সীতা, সেই ধরণীর পতি তুমি।'

ঠাকুরমহাশয়ের নাচের পালা শেষ হয়েছে—শুরু হয়েছে যাতের পালা। লোকের আর রামায়ণে রুচি নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের ঘরে জাপানী রেডিও, অদূরবর্তী রেল ষ্টেশনের ধারে সিনেমা। সহজ লোক-শিক্ষা ও সরল আমোদ প্রমোদের পুরাতন ব্যবস্থা প্রায় উঠে গিয়েছে। এখন গ্রামে ফণ্ড কমিটি নিয়ে কলহ, পঞ্চায়েৎ নিয়ে সংগ্রাম, চিত্রতারকার রূপ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, কথায় কথায় সভা আর খবরের কাগজে মিথ্যা সংবাদ পাঠানো। অতীতের অনাড়ম্বর আনন্দের দিনগুলো যেন বাঙালীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চিরতরে মুছে গিয়েছে।

বিশ বছরে পল্লী সমাজের প্রভূত রূপান্তর ঘটেছে, কিন্তু পল্লী প্রকৃতি পূর্বের মতো অম্লান সুষমায় ঝলমল করছে আজও। আকাশ তেমনি উদার, মাঠ তেমনি অবারিত, দূর বনানীর শ্যামশ্রী তেমনি স্নিগ্ধ। বিলের বুকে মৃদু বাতাসে দুলে দুলে উঠছে কয়েকখানি নৌকা, সাঁতার দিচ্ছে কয়েকটি সাদা হাঁস; সবুজ ঘন ঘাসের আস্তরণে মাছরাঙার মেলা, স্বচ্ছ জলে তরুণ রবির অরুণ আলোর ইন্দ্রজাল। শারদীয়া পূজার আর দেরী নেই। কাশের বনে লেগেছে রজতের ঢেউ; শেফালী কুঞ্জে ফুটেছে হাসি, রাখালের বাঁশরীতে ও সাধকের হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকৃত হচ্ছে আশাবরীর আলাপ। পায়ে চলার পথখানি এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে ক্রন্দনময়ী পৃথিবীর পরপারে 'সব পেয়েছি'র দেশে। বিলের একটি শুভ্র জলরেখা মিলিয়ে গিয়েছে দরদিগন্তে—যেন ভক্তের হৃদয়-নিঃসৃত একটি স্রোত স্পর্শ করেছে ভগবানের চরণ। ইচ্ছা করে এই পবিত্র পরিবেশে গাঢ় নীলিমার নীচে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির মহাকবির পায়ে প্রণাম জানাই—ইচ্ছা করে এই নামহারা নির্জন নিভৃতে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিই।

সীতা জন্মের ইতিকথা

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

তুলসীদাস বা বাল্মীকি রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণে আমরা সীতার অস্পষ্ট জন্মবৃত্তান্ত পাই। নিতান্ত অলৌকিক বলে মনে হয় সে বৃত্তান্ত। কিন্তু মহাকবি বাল্মীকি রচিত অদ্ভুত রামায়ণে সীতার প্রকৃত জন্মবৃত্তান্ত ও কারণ বড়ই বিস্ময়কর। এই উপাখ্যান আর যাই হোক না কেন, রোমাণ্টিক গল্প হিসাবে যে অতুলনীয়, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অদ্ভুত রামায়ণ সপ্তকাণ্ডাত্মক রামায়ণের উত্তর কাণ্ড বা পরিশিষ্ট। মূল রামায়ণে যে সমস্ত ঘটনা অমীমাংসিত বা উহ্য রয়ে গিয়েছে অদ্ভুত রামায়ণ করেছে তার সমাধান। এর ঘটনাগুলো অদ্ভুত ধরণের, তাই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে অদ্ভুত রামায়ণ।

সীতাজন্মের ইতিকথা এইপ্রকার—

তখন ত্রেতাযুগ। অতি পুরাকালের কথা। কৌশিক নামে এক ঋষি ছিলেন। শুদ্ধ সাত্ত্বিকস্বভাব ব্রাহ্মণ—অহরহ হরিনাম সঙ্কীর্তনই তাঁর ব্রত। তাঁর সুমধুর তান মান লয় ও মূর্ছনাযুক্ত অপূর্ব সুর সঙ্গীতে পশু পাখি সবাই আকৃষ্ট। পরাক্ষ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ হরিসঙ্কীর্তন শ্রবণের লোভে কৌশিককে নিয়মিত অন্নদান করতে শুরু করলেন। কৌশিক করুণাবশতঃ তাঁর ইচ্ছায় বাধা দিলেন না।

ক্রমে কৌশিকের সাতজন শিষ্য হয়। সকলেই ধীমান—জ্ঞান, বিদ্যা পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধাচারী। তাঁদের সঙ্গে কৌশিক নিত্য হরিনাম লীলায় মত্ত হয়ে দিন কাটাতে থাকেন। একদিন পঞ্চাশজন ব্রাহ্মণ হরিনাম গাইতে গাইতে সেই স্থানে এসে উপস্থিত হলেন কিন্তু সেখানে কৌশিকের সঙ্গীত শ্রবণে এত মুগ্ধ হয়ে পড়েন যে সে স্থান ত্যাগ করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তারা কৌশিকের সঙ্গে একত্র বাস করতে লাগলেন।

এমনিভাবে কৌশিকের গুণের খ্যাতি চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে একদিন "কলিঙ্গ" নামে এক রাজা কৌশিকের সঙ্গীত পটুতার কথা শুনে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কৌশিককে অনুরোধ জানান তাঁর স্তবগান করতে। কৌশিক উত্তর দিলেন যে হরিকথা ছাড়া তিনি মানুষের স্তবগান করতে অভ্যস্ত নন। রাজা বহুত চেষ্টা করেও কৌশিককে কিছুতেই রাজী করাতে সক্ষম হলেন না। নিরুপায় হয়ে পড়ে রাজার মাথায় কূট কৌশল গজালো। তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দকে আদেশ দিলেন—তাঁর জয়গানে ধরণীতল মুখরিত করে তুলতে। কৌশিক প্রমুখাৎ ভক্তগণ এখন রাজার গুণগান না শুনে কি করে থাকে দেখা যাক।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তকে অত সহজে জয় করা যায় না। তেজস্বী কৌশিক বাধা হয়ে তাঁর শিষ্যগণ সমেত নিজ নিজ জিভ ছেদ করে ফেল্লেন, যাতে ভ্রমক্রমেও ঐ রাজার গুণকথা না উচ্চারণ করতে হয়।

রাজার কৌশল ব্যর্থ হোল। তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লুঠ করে স্বদেশ হতে কৌশিকদের দূর করে দিলেন।

এজন্য মুণিগণের কষ্টেই কেটে গেল। যথাসময়ে তাঁরা প্রয়াসলাভ করলেন। কিন্তু স্বর্গরাজ্যে তাদের সকলের জন্য উঁচু জায়গা নির্দ্ধারণ করা ছিল। তাঁরা সকলেই উচ্চস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে স্বর্গের শোভাবর্দ্ধন করতে লাগলেন। দেবতাগণ তাঁদের অবসর সময় মত প্রাণভরে কৌশিকাদির অপূর্ব্ব হরিসঙ্কীর্ত্তন শুনে তৃপ্ত হতেন।

একদিন স্বর্গরাজ্যে কৌশিকের প্রীতি হেতু একটা মহা সঙ্গীত অনুষ্ঠান দেবগণ সুরু করলেন। সঙ্গীতপিপাসু স্বর্গবাসীগণ সকলেই জড়ো হলেন গান শুনতে। কোটী কোটী দাসী পরিবৃতা লক্ষ্মীদেবীও স্বয়ং সেই সভায় যোগ দিতে এলেন। তার অনুচারীগণ জনতার আধিক্য লক্ষ্য করে ঔদ্ধত্যবশতঃ ব্রহ্মাদি মুণিঋষিগণকে তর্জ্জন গর্জ্জনে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা গর্ব্বিতভাবে স্থান অধিকার করে বসলেন। কিন্তু একমাত্র নারদ ছাড়া অপর কেউ এতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেন না; কারণ বিষ্ণুপ্রণয়িনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস কারো ছিল না।

এই ঘটনার পর অতি সম্মানের সঙ্গে তম্বুরুকে ডাকা হোল। তম্বুরু হাজির হতেই লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁকে গান করতে আদেশ করলেন। তম্বুরু সুমধুর সঙ্গীত সুরু করলেন। তাঁর সঙ্গীত শুনে লক্ষ্মী নারায়ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং খুসীবশে তম্বুরুকে বহুমূল্য দ্রব্যে পুরস্কৃত করলেন।

ওদিকে নারদমুণি অন্যান্য সকলের সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর অনুচরীদের কাছে অপমানিত হয়ে চটেই ছিলেন। এখন এ ঘটনায় রাগের বশে তাঁর হিতাহিত বোধ লোপ হোল। প্রজ্বলিত ক্রোধে তখনি তিনি লক্ষ্মীদেবীকে শাপ দিলেন। লক্ষ্মীদেবী রাক্ষসীপ্রকৃতিবশে যেহেতু তাঁদের অপমান করেছেন, সেহেতু তিনি রাক্ষসীগর্ভে জন্ম নেবেন। অধিকন্তু তাঁর দাসীগণ নারদকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলেছে বলে রাক্ষসীগণও তাঁকে দূরে নিক্ষেপ করবে।

মুণিবাক্য বৃথা হবার নয়। লক্ষ্মীদেবী বুঝলেন তাঁকে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম নিতেই হবে। তখন করজোড়ে লক্ষ্মীদেবী নারদের কাছে এইটুকু প্রার্থনা করলেন যে যদি কোন রাক্ষসী নিজ ইচ্ছায় মুণিগণের শোণিত পান করে তবে তারই গর্ভে যেন তিনি জন্ম নেন।

নারদ সম্মত হলেন লক্ষ্মীদেবীর প্রস্তাবে।

ওদিকে মর্ত্ত্যভূমে দশানন রাবণ অজর অমর হবার বাসনায় কঠোর তপস্যা জুড়েছে। বহু বছর তপস্যার ফলে তার শরীর হতে ভয়ানক তেজরাশি নির্গত হচ্ছে। সমস্ত জগৎ সংসার ছারখার হবার উপক্রম। ব্রহ্মা সশরীরে অবতীর্ণ না হয়ে আর পারলেন না। রাবণের সামনে তিনি প্রকট হয়ে ইচ্ছামত বর চাইতে আদেশ করলেন। রাবণ অমর হবার বর যাচ্ঞা করলে। ব্রহ্মা কিন্তু এতে কোনমতেই সম্মত হলেন না। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে রাবণ প্রার্থনা জানাল যে সুর, অসুর, যক্ষ, পিশাচ, রাক্ষস, বিদ্যাধর, কিন্নর, অপ্সরা কেউ যেন তাকে নিধন করতে না পারে। মানুষ রাক্ষসদের ভোজ্য—তাই মানুষের কথা রাবণ বাদ দিয়ে গেল। রাবণ নিজ বধের এক অসম্ভব উপায় নিজেই নির্দ্ধারণ করে ব্রহ্মাকে বলিল যে, যদি কোন দিন মোহবশে নিজ কন্যাকে কামার্থে প্রার্থনা করে এবং সেই কন্যাদ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয় তবে সেই পাপে যেন তার মৃত্যু আসে। ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলে অন্তর্হিত হলেন।

রাবণ জানতো এ কখনো কোনদিন সম্ভব হতে পারে না। অতএব সে পৃথিবীতে চিরদিন অমরই থাকবে।

অমর বর লাভ করে রাবণ ভয়ানক অত্যাচারী হয়ে উঠ্‌ল। নিঃশঙ্ক চিত্তে ত্রিলোক ভূলোকের সমস্ত কিছু তৃণবৎ জ্ঞান করে ঘুরে বেড়ায়। আকাশ পাতাল স্বর্গ তার দাপটে থর থর করে কাঁপতে থাকে। সর্ব্বলোকই রাবণ প্রায় জয় করে ফেললো।

একদিন রাবণ দণ্ডকারণ্যে মুনিদের আশ্রমে উপস্থিত হ'ল। তাঁদের জয় না করলে রাবণের বীরত্ব প্রকাশ নিষ্ফল ভাবলে। তাদের কাছে গিয়ে বললে, "তোমরা আমাকে করদান কর", এই কথা বলেই রাবণ বলপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ শরাগ্র বিদ্ধ করে ঋষিদের শরীর হতে রক্ত বের করে এক কলসীতে পূর্ণ করে নিলে।

সেই দণ্ডকারণ্যে গৃৎসমদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। গৃৎসমদের স্ত্রী একটী সুলক্ষণা কন্যা লাভের জন্য স্বামীর কাছে প্রার্থনা করেন। এইজন্য মুনিবর লক্ষ্মীদেবীকে কন্যারূপে পেতে প্রত্যেকদিন মন্ত্রোচ্চারণ করে কুশের আগা দিয়ে এক কলসীর মধ্যে বিন্দু বিন্দু দুগ্ধ সঞ্চয় করতেন। দৈবযোগে রাবণ সেই কলসীতেই মুনিদের করদান স্বরূপ রক্ত সংগ্রহ করলেন।

লঙ্কায় ফিরে এসে রাবণ স্ত্রী মন্দোদরীকে বললেন, কলসীটী তুমি যত্ন করে রাখ। এতে মুনিদের রক্ত আছে। এই রক্ত বিষের চেয়েও বেশী উগ্র—সুতরাং তুমি কাউকে এটা স্পর্শ করতে দিও না, অথবা ভুলেও কোনদিন পান করবে না। আজ আমার ত্রৈলোক্য জয় সম্পূর্ণাঙ্গ হয়েছে।

তারপর সর্ব্বজয়ী রাবণ হৃষ্টচিত্তে দেবতা, দানব গন্ধর্ব্বদের সুন্দরী মেয়ে বলপূর্ব্বক হরণ করে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়োয় মনের আনন্দে বিহার করতে মগ্ন রইল।

রাণী মন্দোদরী স্বামীর এরকম ব্যবহারে মূহ্যমান অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন। প্রাণের জ্বালায় কিছুদিন পর তাঁর জীবনযাত্রা অসহ্য বলে মনে হ'ল। পতি বর্ত্তমানে যে পত্নীকে বিরহভোগ করতে হয় তার জীবন যৌবন বা কুল মান বৃথা। এই স্থির করে অসহ্য হৃদয় আবেগে মন্দোদরী সেই উগ্র ঋষিশোণিতরাশি মৃত্যু কামনায় পান করে ফেললেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যু হওয়া দূরে থাক—নূতন এক প্রাণের সৃষ্টি করে ফেললেন। শোণিত পান করার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং রাণী মন্দোদরীর গর্ভে জ্বলন্ত প্রভায় গর্ভস্থ হলেন। আকস্মিক গর্ভে রাণী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে পড়লেন। স্বামী যখন একথা শুনবেন তখন তাকে কি বলবেন তিনি। বৎসরাধিক কাল তাঁর সাথে রাণীর কোন সাক্ষাৎ নেই। সাধ্বী স্ত্রীর অহেতুক গর্ভের কথা রাবণ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন না—বরং তাঁর কোপানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে।

চিন্তানলে দগ্ধাতে দগ্ধাতে অবশেষে মন্দোদরী এক উপায় বের করলেন। বিমানযোগে অবিলম্বে তীর্থ ভ্রমণের ছলে লঙ্কা ত্যাগ করে কুরুক্ষেত্রে এলেন। এইখানে তিনি স্বীয় গর্ভ নিষ্কাশন করে মাটীর নীচে পুঁতে সরস্বতী নদীর জলে স্নানান্তে শুদ্ধভাবে লঙ্কায় ফিরে এলেন। দেবগণ ছাড়া দুনিয়ার আর কেউ এ ঘটনার সাক্ষী রইলেন না। রাবণেরও কোনক্রমে জানবার উপায় থাকল না, কিভাবে তার মৃত্যুবাণের জন্ম হয়েছে।

এর কিছুকাল পর রাজর্ষি জনক লাঙ্গল যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সময় স্বর্ণ লাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞ ভূমি কর্ষণকালে একটী কন্যা লাভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ হতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। দৈববাণী হোল, তুমি এই সুলক্ষণা মেয়েটীকে যত্নে প্রতিপালন কর, এতে তোমার, তথা সারা জগতের মঙ্গল হবে—লাঙ্গলের সীতায় কন্যাকে পাওয়া গেছে বলে এর নাম রাখ "সীতা"।

সীতা জন্মের এই ইতিবৃত্ত।

প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রে সেকালের সমাজচিত্র

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে অনেকগুলি বাস্তুশাস্ত্র দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে এখনও সবগুলি মুদ্রিত হয় নি, কতকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। যে গুলি প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে মানসার, ময়মত, সমরাঙ্গন-সূত্রধার প্রভৃতি কয়েকটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এগুলি অবশ্য প্রাচীন হলেও খুব প্রাচীন নয়। ডা. প্রসন্নকুমার আচার্য মানসারের তারিখ নির্দেশ করেছেন ৫০০ থেকে ৭০০ খৃষ্টাব্দ। ময়মত ও প্রায় সেই সময়েরই। সমরাঙ্গন সূত্রধার কিছু পরের রচনা, তার তারিখ হ'ল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, এই হল গণপতি শাস্ত্রীর মত। সে হিসেবে এগুলি খুব পুরোনো নয়, অন্ততঃ এমন পুরোনো তো নয়ই যে সময়ের আর কোনও হদিসই মেলে না। এক হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগের ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার পরিচয় সেকালের ভাস্কর্যে স্থাপত্যে ইতিহাসের নানা শাখায় বিস্তীর্ণ ভাবে ছড়ানো আছে। সে হিসেবে বাস্তুশাস্ত্রগুলিতে যে সমাজচিত্র পাই, সেগুলিকে ইতিহাসের অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে প্রকৃত ইতিহাস রচনা হতে পারে না। বিশেষতঃ প্রত্যেক শাস্ত্রই হল সূত্র, বাস্তব জীবনে তার ব্যতিক্রম থাকবেই। সুতরাং সূত্রটাই সব, এ কথা মনে করা ঠিক নয়। সূত্রের চেয়েও বাস্তব জীবন ইতিহাসের চোখে ঢের বেশী মূল্যবান্।

এই মুখবন্ধটুকুর উদ্দেশ্য হল যে বর্তমান প্রবন্ধে আমি ইতিহাসের সেই ব্যাপক পুনর্বিচার করবার কোনও চেষ্টা করব না। বাস্তুশাস্ত্রে যে রকম সমাজচিত্র দেখতে পাওয়া যায় সেইটাই পাঠক সমাজের কাছে উপস্থিত করবার চেষ্টা করব। হয়তো বাস্তবক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম যথেষ্ট ছিল, হয়তো সেই সমাজচিত্র ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের পক্ষে সত্যও নয়, কোনও বিশেষ অংশের পক্ষে সত্য। কিন্তু সেই ব্যাপক পুনর্বিচার বর্তমান পরিধি ও বর্তমান উপলক্ষের অন্তর্গত নয়। এখানে বাস্তুগ্রন্থগুলিতে মোটামুটি যে সমাজের চেহারা পাওয়া যায় তারই কিছু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব মাত্র।

বিভিন্ন বাস্তুশাস্ত্র আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে বিষয়বস্তুর পার্থক্য থাকলেও মোটামুটি তাদের একটা কাঠামো আছে। যেমন, প্রায় প্রত্যেক বাস্তুশাস্ত্রেই ভূপরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, কি ভাবে ভাল মাটি চেনা যায়। ভূপরিগ্রহ তারপর—অর্থাৎ কিভাবে ভূমিগ্রহণ বা কার্যারম্ভ করতে হবে। তারপর মানোপকরণ, অর্থাৎ মাপের হিসেব। সেই সঙ্গে আছে দিক্ পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ দিক্ নির্ণয়, অর্থাৎ বাড়ী গ্রাম বা শহরের lay out এর কোন কোন অংশে কোন কোন দেবতার অধিষ্ঠান; বলিকর্মবিধান, অর্থাৎ কোন দেবতাকে কি বলি দিয়ে কার্যারম্ভ করতে হবে; গ্রামবিন্যাস, অর্থাৎ গ্রামের নক্সা; নগর বিধান; ভূলম্ব-বিধান—অর্থাৎ বিভিন্নধরণের বাড়ীর মাপ ও proportion-এর কথা। এইভাবে একতলা থেকে বারোতলা পর্যন্ত বাড়ীর নানা কথা বলা হয়েছে, স্তম্ভ দ্বার গোপুর উপপীঠ অধিষ্ঠান ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে, সন্ধিকর্ম অর্থাৎ জোড়বার নানা কৌশল বলা হয়েছে। রঙ্গালয় সম্বন্ধেও কথা আছে, দেবমূর্তি গড়বার কথাও আছে। যানবাহন শয্যা দোলা অলঙ্কার ইত্যাদির কথাও আছে। এই হল বাস্তুশাস্ত্রগুলির মোটামুটি বিষয়বস্তু।

এই সব জিনিস আলোচনা করতে করতে যে জিনিসটা সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেটা হল এই যে—সেকালের লোকে, অন্ততঃ সব লোক, খুব ক্লিষ্টভাবে জীবনযাপন করত না, বরং বেশ ঐশ্বর্যের সঙ্গে আরাম করেই থাকত। দ্বিতীয় কথা হল এই যে—সেকালেও সামাজিক স্তরবিভেদ অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে বুঝতে পারা যায়। কারণ একদিকে যেমন বিরাট ঐশ্বর্যমণ্ডিত বড় বড় বাড়ীর কথা দেখতে পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি কাঁচা বাড়ীর কথাও উল্লেখ আছে। আরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—কেউ বা থাকবেন শহরের মধ্যে, কেউ বা শহরে থাকবার অধিকারী ন'ন—তাদের থাকতে হবে শহরের বাইরে। এই চিত্রের পরিচয় পদে পদে। ময়মতের মধ্যে বা মানসারে বহুরকম ছোট বড় বাড়ীর বর্ণনা আছে। সব চেয়ে ছোট বাড়ী হল একপদবিশিষ্ট অর্থাৎ একটা কোঠবিশিষ্ট, তার নাম হল সকল। এই রকম ছোট বাড়ী যতিদের প্রিয়। পেচক হল চারপদ; পীঠ নয়পদ, মহাপীঠ ষোলপদ, উপপীঠ পঁচিশপদ, উগ্রপীঠ ছত্রিশপদ, মণ্ডুক চৌষট্টিপদ; পরমশায়িক একাশি পদ। এই রকম করে বাড়তে বাড়তে খুব বড় বড় বাড়ীর কথাও বলা হয়েছে। বিশালাক্ষ হল সাতাশ আশি পদ বিশ্বেশসার হল ন'শো পদ, ঈশ্বরকান্ত ন'শো একষট্টি পদ, ইন্দ্রকান্ত এক হাজার চব্বিশ পদ।(১) এ হল বাড়ীর আয়তন। তেমনই উচ্চতা সম্বন্ধেও বলা হয়েছে বাড়ী একতলা থেকে আরম্ভ করে বারোতলা পর্যন্ত হতে পারে। কোনও বাড়ীই অবশ্য একশো হাতের বেশী উঁচু হবে না, সত্তর হাতের বেশী চওড়া হবে না। (অর্থাৎ সেকালের মাপের হিসেবে ১৫০ ফুট উঁচু, আর ১০৫ ফুট চওড়া)। এর মধ্যেও বাড়ীর নানা প্রকারভেদ থাকত; রাজবেশ্ম, অর্থাৎ রাজার বাড়ীতে বহু অঙ্গন, মন্ত্রণালয়, ধান্যালয়, অস্ত্রালয়, অশ্বশালা, গজশালা; খলূরিকা (parade ground), রাণীদের থাকবার জায়গা ইত্যাদি থাকত, যা সাধারণ বাড়ীতে থাকত না।

একদিকে যেমন এই সব বড় বড় বাড়ীর বর্ণনা দেখি, অন্যদিকে দেখি

১। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দুটী বাড়ীরই বেশী উল্লেখ দেখা যায়—সে দুটী হল মণ্ডুক (৬৪ পদ) এবং পরমশায়িক (৮১ পদ)। মৎস্য-পুরাণে, বিধান পারিজাতে এবং অন্যান্য জায়গাতেও এই দুটীরই উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্র কামিকাগমেও এদেরই উল্লেখ আছে। যাঁরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানতে চান এবং এই বাড়ী দুটীর বিভিন্ন শাস্ত্রমতে বিভিন্ন plan দেখতে চান তাঁরা Dr. Stella Kramrisch প্রণীত Hindu Temples, Vol. I দেখবেন।

সামাজিক স্তর বিভেদ তখন বেশ শক্ত হয়ে বসেছে। ময়মতের দ্বিতীয় অধ্যায় হল বস্তুপ্রকার। মাটি কতরকমের হয় সেকথা আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হিসেবে জমিরও তফাৎ আছে। ব্রাহ্মণদের বাসযোগ্য ভূমি হবে, চারকোণা, শ্বেত, অনিন্দিত, উদুম্বর (ডুমুর) গাছসমেত, উত্তর দিকে নীচু, উত্তম, এবং তার যে ভূমির আস্বাদ হবে কষায় মধুর। ক্ষত্রিয়দের বাসযোগ্য ভূমি হবে পূর্বদিকে নীচু, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, তাতে অশ্বত্থগাছ থাকবে। বৈশ্যদের ভূমি হবে পীত, অম্লরসান্বিত। শূদ্রের ভূমি হবে পূর্বদিকে নীচু, কালো, কটুরস, ন্যগ্রোধবৃক্ষযুক্ত।

চতুরস্রং দ্বিজাতীনাং বস্তু শ্বেতমনিন্দিতম।
উদুম্বরদ্রুমোপেতমুত্তরপ্রবণং বরম্॥
কষায়মধুরং সম্যক্ কথিতং তৎ সুখপ্রদম।
ব্রাহ্মণাধিকায়াং রক্তং তিক্তরসান্বিতম॥
প্রাক্‌নিম্নং তৎ প্রবিস্তীর্ণমশ্বত্থদ্রুমসংযুতম।
প্রশস্তং ভূভৃতাং বস্তু সর্বসম্পৎকরং সদা॥
যচ্চ বৈশ্যকেনাধিকায়াং পীতমম্লরসান্বিতম।
প্লক্ষদ্রুমযুতং প্রাগ্‌বনতং শুভদং বিশাম্॥
চতুরংশাধিকায়াং বস্তু প্রাকপ্রবণান্বিতম।
কৃষ্ণং তৎ কটুকরসং ন্যগ্রোধদ্রুমসংযুতম॥
প্রশস্তং শূদ্রজাতীনাং ধনধান্য সমৃদ্ধিদম॥

গ্রাম ও শহরের বিন্যাসও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আকার ও প্রকারের পার্থক্য অনুসারে গ্রাম নানারকম হতে পারে, শহরও তাই। গ্রামগুলির ভালমন্দর একটা মানদণ্ড হল, গ্রামে কতগুলি ব্রাহ্মণ থাকেন। উত্তম গ্রাম ত্রিবিধ—উত্তমোত্তম, উত্তমমধ্যম আর উত্তমাধম। সবচেয়ে ভাল (অর্থাৎ উত্তমোত্তম) গ্রামে বারো হাজার ব্রাহ্মণের বাস, উত্তমমধ্যম গ্রামে দশহাজার, উত্তমাধম গ্রামে আটহাজার। তেমনি মধ্যম গ্রামেরও ভাল মাঝারি অধম এই তিনভাগ, তাতে যথাক্রমে সাতহাজার, ছহাজার আর পাঁচহাজার ব্রাহ্মণ থাকবেন। তেমনি অধম গ্রামেরও তিনভাগ, তাতে যথাক্রমে চারহাজার, তিনহাজার ও দুহাজার ব্রাহ্মণ থাকবেন। অধমের চেয়েও যেগুলি খারাপ সেগুলি হল নীচ। যেমন একহাজার ব্রাহ্মণ থাকলে নীচোত্তম, সাতশ ব্রাহ্মণ থাকলে নীচমধ্যম, পাঁচশো থাকলে নীচাল্প। ক্ষুদ্র গ্রামে এর চেয়েও কম ব্রাহ্মণ থাকার কথা আছে। দেড়শ, একশোসাট, দুশোচল্লিশ, তিনশকুড়ি, চৌষট্টি, পঞ্চাশ, বত্রিশ, চব্বিশ, বারো, ষোলো—অশক্তপক্ষে দশ থেকে একজন ব্রাহ্মণও থাকার কথা আছে।

অস্মাদ্ অশক্তানাং চেদ দানং দশভূসুরাপ্তমেকাদি।

দণ্ডক হল একধরণের গ্রাম, তার ব্রহ্মস্থানে (অর্থাৎ ঠিক মধ্যে) দেবালয় বা পীঠ থাকবে, বড় ছোট নানা রকম পথ থাকবে (কোনটার নাম নারাচপথ, কোনটী বামনপথ, কোনটী মঙ্গলবীথী ইত্যাদি)। তার মধ্যে বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অন্য লোকেরা, তপস্বীরা থাকবেন। ব্রাহ্মণদের অংশের নাম মঙ্গল, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের অংশের নাম পুর, অন্যদের গ্রাম, তাপসদের মঠ।

দ্বিজকুলপরিপূর্ণং বস্তু যন্মঙ্গলাখ্যং
নৃপবণিগভিযুক্তং বস্তু যত্তৎ পুরং স্যাৎ।
তদিতরজনবাসং গ্রামমিত্যাচাতেস্মিন্
মঠমিতি পঠিতং যৎ তাপসানাং নিবাসম্॥

— ময়মত, নবম অধ্যায়

এই রকম ভাবেই স্বস্তিক, প্রস্তর, প্রকীর্ণক, নন্দ্যাবর্ত, পরাগ, পদ্ম ও শ্রীপ্রতিষ্ঠিত, এই সব বিভিন্ন ধরণের গ্রামের বর্ণনা করা হয়েছে।

গ্রামে সাধারণতঃ কি কি থাকবে এই প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম হবে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, তাতে সাধারণতঃ চারটী দ্বার থাকবে, চারটী জলমার্গ অর্থাৎ জলনিকাশের রাস্তা থাকবে; আর থাকবে ছোট দরজা আটটা, গ্রামের প্রাচীরের বাইরে পরিখা। এর মধ্যে দৈবিক ভাগে ও মানুষ ভাগে (দৈবিক ভাগ একটা অংশ, মানুষ ভাগ অপর অংশ—এই সব কথা পদবিন্যাসে বিস্তৃত বলা আছে) বিপ্রদের গৃহশ্রেণী, পৈশাচভাগে কর্মোপজীবীদের, অন্যত্র দেবতাদের মন্দির। দেবতাদের মধ্যে অনেক দেবতার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যথা—শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, দুর্গা, কালিকা, কেশব, সুগত (বুদ্ধ), জিন, কাত্যায়নী, কুবের। গ্রামের এক অংশে মদিরালয় স্থাপনের কথাও আছে। গ্রামের দক্ষিণে থাকবে গোশালা, উত্তরদিকে পুষ্পবাটিকা, পূর্বদ্বারের কাছে তাপসদের বাসগৃহ, সবত্র জলাশয়, বাপী ও কূপ থাকবে। দক্ষিণে বৈশ্যদের গৃহ, শূদ্রদেরও বাসস্থান। পূব বা উত্তরদিকে কুলাল অর্থাৎ কুমোরদের বাড়ী থাকবে, আর থাকবে নাপিত ও অন্য কর্মজীবীদের বাড়ী। বায়ুকোণে মৎস্যোপজীবীদের বাড়ী, পশ্চিমে মাংস থেকে যাদের বৃত্তি তাদের (অর্থাৎ মাংসবিক্রেতাদের) বাড়ী। উত্তরদিকে তৈলোপজীবীরা থাকবে। গ্রামের বাইরে কিছুদূরে স্থপতিদের বাস, তার থেকে আরও কিছুদূরে রজকদের বাস, সেখান থেকে পূবের দিকে একক্রোশ দূরে চণ্ডালদের কুটির। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে চণ্ডালদের মেয়েরা—যারা তামা, লোহা বা সীসের গয়না পরে—তারা রোজ সকালে একবার গ্রামে ঢুকে গ্রামের ময়লা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।

চণ্ডালযোষিতাস্তাম্রায়সীসভূষণাঃ সদা।
পূর্বাহ্ণে মলমোক্ষক্রিয়াচিতা গ্রামমাবেশ্য॥

—ময়মত, ৯ম অধ্যায়, ৯৭ শ্লোক

গ্রামের বাইরে পূর্ব-উত্তর কোণে পাঁচশ দণ্ড দূরে শবাবাস থাকবে, সেখান থেকে আরও ততখানি দূরে শ্মশান থাকবে। এখানে চর্মকারদের বাস থাকবে, এ কথাও মানসারে উল্লিখিত আছে।

শহরের বর্ণনাও অনেকটা একরকম। প্রথমেই ছোট বড় শহরের বর্ণনাও অনেকটা একরকম। প্রথমেই ছোট বড় শহরের বিভেদ—এই অনুসারে শহর নানা রকম। যথা,—খেট, খর্বট, দ্রোণমুখ নিগম, কোষ্ঠকোলক অথবা কোলক, পুর, বিড়ম্ব। প্রাচীরেরও সেই রকম

শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। শহরের চারপাশে প্রাচীর, তার বাইরে পরিখা। এই প্রাচীর তৈরী করবার সময় হাতি দিয়ে বা কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে মাটী ইঁট পাথর পিটে পিটে শক্ত করা হত। বিভিন্ন শহরের প্রকারভেদে শহরের ভিতরকার ব্যবস্থারও প্রভেদ হত। রাষ্ট্রের মধ্যভাগে সজ্জনবহুল অংশে নদীর ধারে যে শহর তার নাম নগর। সেখানে রাজগৃহ থাকলে তা হত রাজধানী।

রাষ্ট্রস্য মধ্যভাগে সজ্জনবহুলে নদীসমীপে চ।
নগরং কেবলমথবা রাজগৃহোপেতরাজধানী বা ॥
—ময়মত, ১০ম অধ্যায়, ১৯ শ্লোক।

রাজধানীতে চারদিকে চারটি দ্বার থাকবে, গোপুর থাকবে, শালা থাকবে, ক্রয়বিক্রয়ের জায়গা থাকবে, অনেক লোকের সমাগম থাকবে, বাইরে পরিখা থাকবে, মুখে (অর্থাৎ প্রবেশমুখে) রক্ষার জন্য অনেক শিবির থাকবে, পূর্বে ও দক্ষিণে রাজবল অর্থাৎ সৈন্যসামন্ত থাকবে, দেবতাদের নানা মন্দির থাকবে, উদ্যান থাকবে, অনেক গণিকা থাকবে।

সর্বসুরালয়সহিতা নানাগণিকান্বিতা বহূদ্যানা।
—ঐ, ২৩ শ্লোক।

নদী আর পাহাড়ে ঘেরা শূদ্রাধিষ্ঠিত শহরের নাম খেট। চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা শহরের নাম খর্বট। সাগরতীরের শহরের নাম পত্তন। সেখানে দ্বীপান্তর থেকে নানা জিনিষ আসবে, বহুলোক থাকবে, কেনাবেচার জায়গা থাকবে, বিশেষ করে রত্ন ধন ক্ষৌম (রেশমের কাপড়), গন্ধবস্তু প্রচুর পরিমাণে থাকবে।

দ্বীপান্তরগতবস্তুভিরভিযুক্তং সর্বজনসহিতম্।
ক্রয়বিক্রয়ৈর্যুক্তং রত্নধনক্ষৌমগন্ধবস্ত্বাঢ্যম্ ॥
সাগরবেলাভ্যাসে তদনুগতায়ামি পত্তনং প্রোক্তম্।

গ্রামের মত শহরেও নানাশ্রেণীর লোকের বাস। শহরের চারপাশে রথপথ থাকবে, মধ্যে থাকবে বণিক্‌দের গৃহশ্রেণী। তার পাশে তন্তুবায়দের কুমোরদের এবং অন্য কর্মোপজীবীদের বাড়ী। মধ্যখানে তাম্বুলাদি ফল কেনাবেচার দোকান থাকবে, অন্যত্র মৎস্য মাংস শুষ্ক শাক বিক্রির দোকান থাকবে। তা ছাড়া এই সব জিনিষ বিক্রিরও দোকান থাকবে—ভক্ষ্য, ভোজ্য, হাঁড়িকলসি ও অন্যান্য ভাণ্ড, কাঁসার জিনিষ, বস্ত্র, ধানচাল, চাটাই, লবণ, তেল, গন্ধপুষ্প, রত্ন, সোনা, মজিষ্ঠ-মরীচ-পিপুল-হলুদ প্রভৃতি মধু, ঘৃত ইত্যাদি। শহরের বাইরে চণ্ডাল কুটীর।

সেকালের লোকেদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব জিনিষের প্রচলন ছিল এ থেকে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। এ ছাড়া বলিকর্মবিধানে বলা হয়েছে কোন দেবতাকে কি কি বলি দিতে হবে। তার মধ্যেও সেকালের দৈনন্দিন জীবনে দরকারী নানা জিনিষের আভাস মেলে। বাস্তুর ঠিক মধ্যে হল ব্রহ্মার স্থান। সেখানে গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দুধ, মধু, ঘি, চালের পায়স আর খই দিয়ে বলি দিতে হবে। আর্যকের পদে ফল উপহার দিতে হবে, আর দিতে হবে মাষকলাই মিশ্রিত অন্ন আর তিল। এইভাবে এই উপলক্ষে এইসব জিনিষগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়:—নবনীত, মধু, কন্দ, মধুক (মহুয়া), হরিদ্রাচূর্ণ, তগরফুল, শিম্বান্ন (শিম-মিশ্রিত অন্ন), সমুদ্রের মাছ, মৎস্যৌদন (মাছভাত), মোদক (মোয়া) শোণিত (অসুরকে বলি দিতে হত), সতিল তণ্ডুল, শুষ্কমৎস্য, সিদ্ধকরা হরিদ্রা, মদ্য, খৈ, ধান্যচূর্ণ, দধি, ঘি, গুড়োদন (গুড়মিশ্রিত অন্ন), দুগ্ধোদন, শুষ্কমাংস, ক্ষীরান্ন, বস্তমেদ (ছাগবসা) মুদ্গচূর্ণ (মুগের চূর্ণ), সিদ্ধমাংস, শঙ্খ ও কচ্ছপের মাংস, লবণ, পিষ্টতিল, মুদ্গসারক। এছাড়া অষ্টধান্যের (শালি, ব্রীহি, কোদ্রব ইত্যাদি) উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়। আরও বলা হয়েছে এই সব বলি নিয়ে আসবে কন্যারা অথবা বেশ্যারা। গর্ভন্যাস বা ভিত্তিস্থাপনের উপলক্ষেও এরকম নানা জিনিষের উল্লেখ করা হয়েছে। সে উপলক্ষেও সেকালে প্রচলিত ছিল নানা জিনিষ ভিত্তিতে স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সূর্যের পদে রূপোর বৃষ দিতে হবে, যমের পদে তামা, ঈশের পদে বৈকুন্ত, অগ্নির পদে সীসা, বায়ুর পদে সোনা, জয়ন্তের পদে জাতিহিঙ্গুল, ভৃশের পদে হরিতাল, বিতথের পদে মনঃশিলা, ভৃঙ্গরাজের পদে মোম, শোষের পদে গৈরিক। এইভাবে বহুজিনিষের উল্লেখ আছে। যথা,—অঞ্জন, মুক্তা, বিদ্রুম, পুষ্পরাগ, বৈদূর্য, হীরক, ইন্দ্রনীলমণি, মহানীল, মরকত, পদ্মরাগ শালি (ধান), ব্রীহি (ধান), কোদ্রব (চীনা বা কাঁকন ধান) কঙ্কু (একপ্রকার শস্য), মাষকলাই, তিল মুগ, কুলত্থকলাই, সোনা, লোহা, তামা, রূপো, সীসে, শঙ্খ, ধনু, দণ্ড, কুক্কুট, ময়ূর, মেষ, মহিষ, কৃষ্ণমৃগ, সর্প, ছত্র, করক (ভিক্ষাপাত্র ?), স্থালী, দর্বী খড় (স্থালী হল হাঁড়ি। দর্বী, হল হাতা, খড় কাষ্ঠদণ্ড)[২], কুম্ভ—এ সবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাড়ীর বর্ণনাতেও বলা হয়েছে সব বাড়ী সকলের জন্য নয়। বারোতলা বাড়ী হল সার্বভৌম রাজাদের। রক্ষোগন্ধর্বযক্ষদের জন্য এগার তলা বাড়ী নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ব্রাহ্মণদের জন্য দশতলা কিম্বা ন'তলা। যুবরাজ ও রাজারা পাঁচ থেকে সাত তলা। সুতরাং ব্রাহ্মণের নেহাৎ ভাঙা কুটীরে তপোবনে কাল কাটাতেন না, সাধারণ রাজা যুবরাজের চেয়েও বড় বাড়ীতে বাস করতেন। বৈশ্য ও শূদ্রদের বাড়ী তিনতলা কি চারতলা—তার বেশী নয়।

রক্ষোগন্ধর্বযক্ষাণামেকাদশতলং মতম্।
বিপ্রাণাং নবভৌমং স্যাদ্ দশভৌমমথাপি বা ॥
* * *
ত্রিভূমং চ চতুর্ভূমং বণিজাং শূদ্রজন্মনাম্।

২। মহাভারতে আছে বিরাট্ রাজার সভায় সূপকারের বেশে ভীম প্রবেশ করছেন, তাঁর হাতে খজা, দর্বী, কোষমুক্ত কালরঙের অসি।

অথাপরো ভীমবলঃ শ্রিয়া জ্বলন্নুপাযযৌ সিংহবিলাসবিক্রমঃ।
খজাঞ্চ দর্বীঞ্চ করেণ ধারয়ন্নসিঞ্চ কালাঙ্গমকোষমব্রণম্ ॥

আরও বলা হয়েছে, শিলাময় হর্ম্য দেবালয় বা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দের আলয় হবে, বৈশ্য ও শূদ্রদের শিলাহর্ম্যে থাকা মানা। সময় সময় শূদ্ররা অপক্ব (কাঁচা) ইষ্টকের বাড়ীতেই থাকত।

শিলা দেবালয়ে গ্রাহ্যা দ্বিজাবনিপয়োর্মতা।
পাষণ্ডিনাং চ কর্তব্যা ন কুর্যাদ্ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥
—ময়মত, ১৫ অধ্যায়, ৭৮ শ্লোক।

বাড়ীর ছাদ সম্বন্ধে মানসারে একজায়গায় বলা হয়েছে, ইঁটের বাড়ীর ছাদ হবে কাঠের, পাথরের বাড়ীর ছাদ হবে পাথরের।

কেবলং চেষ্টকহর্ম্যে দারুপ্রচ্ছাদনান্বিতম্।
শিলাহর্ম্যে শিলাভৌলিং কুর্য্যাৎ তত্তৎবিশেষতঃ॥
—মানসার, ১৮ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোক।

রাজবাড়ীতে রাণীদের থাকবার জায়গা, অস্ত্রশালা, অভিষেকের জায়গা, বস্ত্রধনালয়, রত্নহেমাদির আলয়, ভূষণালয়, ভোজনমণ্ডপ, পচনালয়, পুষ্করিণী, কঞ্চুকীদের বাসস্থান, পুষ্পমণ্ডপ, মজ্জনালয়, (স্নানের ঘর), সূতিকামণ্ডপ, দাসদাসীদের আলয়, রাজকন্যাদের আলয়, বিলাসিনীদের আলয়, হাতিশালা, অশ্বশালা, বিভিন্ন যানের আলয়, নৃত্যাগার, পুরোহিতাগার, মহানসালয়, ধেনুশালা, বানরালয়, মেষযুদ্ধের জন্য মণ্ডপ, কুক্কুট যুদ্ধের জন্য মণ্ডপ, ময়ূরালয়, ব্যাঘ্রালয়, শিকারীদের থাকবার জায়গা, রহস্যাবাস (লুকিয়ে থাকবার জায়গা), সন্ধিবিগ্রহমণ্ডপ, খলূরিকা (parade দেখবার জায়গা), রঙ্গালয়, কারাগৃহ প্রভৃতি থাকবে।

এ ছাড়া দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় লাগে এমন কতকগুলি জিনিষের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, যানবাহন। দেবতা বা ব্রাহ্মণেরা সাধারণতঃ ছোট রথ ব্যবহার করতেন। লড়ায়ের সময়ও ছোট (সাধারণতঃ তিন চাকাযুক্ত) রথ ব্যবহৃত হত। দৈনন্দিন ব্যবহারের রথগুলি আর একটু বড় হত—তাতে সাধারণতঃ পাঁচ চাকা থাকত। তাছাড়া উৎসবের সময় খুব বড় রথ ব্যবহার হত—তাতে ছয় থেকে দশ চাকা থাকত। সার্বভৌম রাজাদের রথ একতলা থেকে ন'তলা পর্যন্ত হত ; অন্যদের কম। এ ছাড়া শিবিকা ছিল।

পর্য্যঙ্ক অর্থাৎ পালঙ্কও কয়েকরকম। ময়মতে বলা হয়েছে মঞ্চ, মঞ্চিলিকা (ছোট মঞ্চ), কাষ্ঠ পঞ্জর, ফলকাসন, পর্যঙ্ক, বালপর্যঙ্ক,—এই সব হল শয্যার প্রকারভেদ। বালপর্যঙ্ক হল ছোট খাট, বা ছেলেদের খাট। তাতে চারটী পায়া থাকবে, কিন্তু সামনের দিকে একটা চাকা লাগানো থাকবে। বোধহয় ঠেলে নিয়ে যাবার সুবিধার জন্যই চাকা লাগানো হত। বড় খাট চওড়া হত একুশ থেকে সাঁইত্রিশ আঙ্গুল পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৫¾ ইঞ্চি থেকে ২৭¾ ইঞ্চি পর্যন্ত)। খাটগুলি কম চওড়া মনে হয়। পায়াতে এবং অন্যত্র পদ্ম সিংহ ইত্যাদি নানারকম খোদাই থাকত। তাছাড়া ছিল দোলা, অর্থাৎ দোলনা। শিকলে টাঙানো থাকতো দোলাগুলি। রাজা মহারাজারা সিংহাসনে বসতেন, তারও বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

অলংকার বেশভূষার বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, রাজারা ও দেবতারা নানারকম মস্তক আভরণ পরবেন ; তার মধ্যে জটা, মৌলি, কিরীট, করণ্ড, শিরস্ত্রক, কুণ্ডল, কেশবন্ধ, ধম্মিল্ল, মুকুট, পট্ট (পাগড়ী) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। পাগড়ীর আবার তিন ভাগ,—পত্রপট্ট, রত্নপট্ট এবং পুষ্পপট্ট। এ ছাড়া নানা অলংকারের উল্লেখ আছে, যেমন,—শিরোবিভূষণ, চূড়ামণি (মাথায় পরবার মণি), কুণ্ডল (ইয়ারিং ?) তাটঙ্ক (কানের গয়না), কঙ্কন, কেয়ূর (আর্মলেট ?) কিঙ্কিনীবলয় (ছোট ঘণ্টাযুক্ত বলয়), অঙ্গুরীয়ক, হার, অর্ধহার, মালা, স্তনসূত্র, পুরসূত্র (বুকের চারিদিকে জড়িয়ে থাকত), উদরবন্ধ (কোমরবন্ধ), কটিসূত্র*, মেখলা, সুবর্ণকঙ্কুক (সোনার বর্ম বা জ্যাকেট), নূপুর, পাদজালভূষণ (পায়ে জালের মত ভূষণ) ইত্যাদি। কাপড়ের মধ্যে বলা হয়েছে—

পীতাম্বরদুকূলং চ নলকান্তপ্রলম্বনম্।
অথবা জানুপর্য্যন্তং চর্মচীরং চ বানসম্॥
—মানসার, ৫০ অধ্যায়, ১৬ শ্লোক

হলদে কাপড় ঝুলবে নলক (ankle) পর্যন্ত ; অথবা চামড়ার বা বল্কলের আবরণ ঝুলবে হাঁটু পর্যন্ত। তর্জনী ছাড়া সব আঙ্গুলেই আংটি পরতে হবে।

বাড়ীতে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হত তার মধ্যে কয়েকটি জিনিসের বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, দীপদণ্ড, ব্যাজন, দর্পণ, মঞ্জুষা, দোলা ইত্যাদি। দীপদণ্ড অর্থাৎ আলোকদানি দুরকমের, যা নড়ানো যায় এবং যা নড়ানো যায় না। বাড়ীর সামনে যে আলোকদানি থাকবে, তা বাড়ীর সঙ্গে মানানসই হওয়া চাই। পাখা হত চামড়ার, কাঠে চামড়া ঝুলানো থাকত। দর্পণের কাঁচের বিস্তার হত বাইশ আঙ্গুল পর্যন্ত। প্রত্যেক আয়নাই হত গোল, পিতল কাঠ বা লোহায় আটকানো থাকত। মঞ্জুষা অর্থাৎ বাক্সও হত নানারকমের। প্রথমে হল পর্ণমঞ্জুষা। তারপর হল কাঠের বাক্স, লোহার পেটি দিয়ে শক্ত করে মোড়া। তারপর হল তৈল মঞ্জুষা, তেল রাখবার Jar। তারপর হল বস্ত্রমঞ্জুষা। তুলাদণ্ডেরও উল্লেখ এই প্রসঙ্গে আছে। এ ছাড়া শীল মোহরের বর্ণনা আছে—রাজাদের দক্ষিণ হস্তের মধ্যাংশের অনুকরণে তৈরী হত শীলমোহর বা পাঞ্জা। তার সঙ্গে থাকত কলম। সবশেষে উল্লেখ করা হয়েছে নানারকম পঞ্জরের কথা—মৃগনাভিবিড়াল, চাতক, চকোর, শুক, মরাল, পায়রা, নীলকণ্ঠ পাখি, গঞ্জরী, কুক্কুট, চটক, নকুল, ব্যাঘ্র, এইসব রাখবার জন্য খাঁচা দরকার হত।

*। কটিসূত্রের বর্ণনা হল এই :—

কটিসূত্রং তু সংযুক্তং কটিপ্রস্থ (প্রান্তে) সপট্টিকা।
মেঢ্রান্তং পট্টিকান্তং স্যাত্তন্মধ্যে সিংহবক্ত্রবৎ॥
—মানসার, ৫০ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক।

অর্থাৎ কটিসূত্রের সঙ্গে কটিপ্রান্তে পট্টিকা থাকবে, সেই পট্টিকা ঝুলবে পুরুষেন্দ্রিয় পর্যন্ত। পট্টিকার মধ্যে সিংহের মুখের মত খোদাই থাকবে। খানিকটা রোমানদের মত পোষাক নয় কি ?

উপসংহার

বাস্তুশাস্ত্রে সেকালের সমাজযাত্রার যে পরিচয় পাওয়া যায় তারই একটা মোটামুটি চিত্র উপরে দেবার চেষ্টা করেছি। পূর্বেই বলেছি, এই চিত্রের সঙ্গে সেকালের বাস্তব জীবনের চিত্র মিলিয়ে না দেখলে সেকালের সমাজযাত্রার সব ছবিটি পরিস্ফুট হয় না। তা ছাড়া এই সময়ের অন্যান্য বইতেও সেকালের সমাজযাত্রার বিবরণ আছে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সমাজ সহজে বদলায় না,—আজও নানাদিকে মহাভারতীয় সমাজের রেশ আছে। প্রাচীন কালে সমাজবিবর্তনের গতি তো একালের তুলনায় আরও ধীর মন্থর ছিল। সেইজন্য বাস্তুশাস্ত্রগুলির কিছু পূর্বেও যে সব বই রচিত হয়েছে, তার মধ্যেও যে সমাজচিত্র আছে সেগুলিও দেখা দরকার। যেমন নীতিশাস্ত্রগুলি। কৌটিল্য প্রভৃতি গ্রন্থেও সেকালের জীবনযাত্রার ছবি পাওয়া যায়। চাষবাস, প্রভুভৃত্যসম্বন্ধ, শহর বা গ্রামের ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্য, সমাজে নারীর স্থান—এরকম বহুবিষয়ে নানা তথ্য এই সব বইগুলিতে ছড়ানো আছে। এমন কি কাব্যের মধ্যেও এ সবের হদিস মেলে। এই সব পুঁথির প্রমাণ এবং তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের প্রমাণ মিলিয়ে ধরলে সেকালের সমাজযাত্রার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হতে পারে।

ভারতীয় দর্শন মহাসভা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রজত-জয়ন্তী উৎসব

বিগত ইংরাজী ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় দর্শন মহাসভার রজত জয়ন্তী উৎসব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল ও অন্যান্য ভবনে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা মহানগরীতেই উহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের তদানীন্তন অধ্যাপকবৃন্দ একটি নিখিল ভারত দর্শন মহাসভার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া উহার সৃষ্টি কল্পনা করেন। স্বগত ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ অধ্যাপকগণের উদ্যোগ আয়োজনে ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে দার্শনিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উহার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহার পরে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন মহাসভার বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছে। দশ বৎসর পরে ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে দ্বিতীয়বার কলিকাতায় উহার অধিবেশন হইয়াছিল। এইভাবে ২৪ বৎসর অতীত হইয়া দর্শন মহাসভা ২৫ বর্ষে পদার্পণ করে এবং উহার রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের কাল উপস্থিত হয়।

গত ডিসেম্বর মাসের ২০শে তারিখ বুধবার হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুসজ্জিত সেনেট হলে দর্শন মহাসভার চারি দিবসব্যাপী এই ঐতিহাসিক রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান বেদ গানের মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়। বর্তমান অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রায় ২০০ প্রতিনিধি যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশ হইতে আরও প্রায় ২০০ প্রতিনিধি এবং সহযোগী সদস্যরূপে প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকেন। ভারতের বাহির হইতে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ৮ জন বৈদেশিক খ্যাতনামা দার্শনিকও জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করেন।

ভারতের ও বাহিরের বিভিন্ন দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক, রাষ্ট্রনায়ক, শিক্ষাব্রতী ও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ হইতে দর্শন মহাসভার সাফল্য কামনা করিয়া এবং নানা মতবাদের সংঘর্ষে নিপীড়িত মানব জাতির মুক্তির পথ নির্দেশে সাহায্য করিবার আহ্বান জানাইয়া শতাধিক শুভেচ্ছা বাণী দর্শন মহাসভার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু, শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও অধ্যাপক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের শুভেচ্ছা বাণী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম দিনের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দোপাধ্যায় দর্শন মহাসভার প্রতিনিধি ও অতিথিগণকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সত্যের সন্ধান ও কল্যাণ সাধন দর্শনের দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য। দর্শন আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে যে পার্থিব ধনসম্পদ মানুষের জীবনের চরম লক্ষ্য নহে এবং উহাতে সে পরম সুখ-শান্তি পায় না। দার্শনিকগণই জগতের সৎলোক এবং মনুষ্যজাতির উন্নতির পথ প্রদর্শন করা তাঁহাদেরই কর্তব্য। তাঁহারা কি প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের ন্যায় আবার আমাদের এই প্রার্থনা মন্ত্র শিক্ষা দিতে পারেন না? "অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়"।

পশ্চিম বংগের রাজ্যপাল ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু অধিবেশনের উদ্বোধন করিবার পূর্বে যোগী শ্রীঅরবিন্দ, নব্য ভারতের অন্যতম স্রষ্টা সর্দার প্যাটেল ও ধর্মগুরু শ্রীরমণ মহর্ষির পরলোকগমনে তিনটি শোক-প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সেগুলি উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রদ্ধাবনত চিত্তে গ্রহণ করেন। দর্শন মহাসভার উদ্বোধন করিয়া তিনি এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, আজ নিপীড়িত মানব জাতির মুক্তির পথ কি? কোরিয়ার জনগণ যে উপর্যুপরি দলিত মথিত হইতেছে তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আজ তাহারা কাহার আশাপথ চাহিবে? কোরিয়ার সমরানল পরিব্যাপ্ত হওয়ার আশংকায় অন্য দেশের জনগণের প্রাণে যে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য আজ তাহারা কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে? বিজ্ঞান আজ আর তাহাদের

কোনও আশার বাণী শুনায় না। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার আজ যেন শুধু মানুষের মারণাস্ত্র প্রস্তুত করিতেই নিয়োজিত হইতেছে। ডাঃ কাটজু বলেন যে আজ দার্শনিকগণই মানুষের আশা-ভরসার স্থল। তাঁহারা সত্যের অনুসন্ধান করেন, কল্যাণ মার্গের সন্ধান দেন, ব্যষ্টি বা সমষ্টিগত ভাবে মানুষের ধ্বংসের পরিকল্পনা করেন না। মহাত্মা গান্ধী একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন, তাঁহার শিক্ষা ও প্রদর্শিত পথ দার্শনিকগণের অনুসরণ করা কর্তব্য।

দর্শন মহাসভার রজত-জয়ন্তী অধিবেশনের প্রধান সভাপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এক মর্মস্পর্শী অভিভাষণ দেন। তিনি বলেন, আজ যে সর্বব্যাপী বিশৃংখলা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া মানব সমাজ চলিয়াছে তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে মানুষের ও রাষ্ট্রনায়কগণের দৃষ্টি-ভংগীর আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে। আজ তাঁহারা মানব জাতির উৎসাদনাস্বরূপ আণবিক বোমার হিসাব করিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মানবিকতা ও মৈত্রী-ভাবের অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা একটি দুষ্ট চক্রের মত মানব সমাজকে ঘুরাইতেছে। এই চক্রের গতিরোধ করিতে হইলে মানুষকে আণবিক শক্তির ক্রীড়নকরূপে না দেখিয়া, মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, তাহার প্রতি মানবোচিত মমতাবুদ্ধির উদ্রেক করিতে হইবে। আমরা এখন যে অমানুষিক যুগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি এবং যে নির্মম সমাজ ব্যবস্থার অধীন হইয়াছি তাহার অবসান ঘটাইয়া এক নূতন যুগের সূচনা করিতে হইবে এবং এক নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইলে। এই মহৎ কার্য সম্পাদন করিবার ভার বিশ্বের দার্শনিকদেরই লইতে হইবে। তাঁহারা সর্ব দেশের ও সর্ব কালের চিন্তানায়ক, তাঁহারাই মানুষের চিন্তার গতি ও ভাব-ধারার পরিবর্তন করিতে পারেন। অবশ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন দার্শনিক এজন্য মহৎ প্রচেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর রাষ্ট্রনায়কগণের রণকোলাহলে আজ কেহ শুনিতে পান না। তথাপি তাঁহাদিগকে এক নূতন দিব্য জগতের কল্পনাকে সার্থক করিবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই দার্শনিকমণ্ডলীর মহান কর্তব্য।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের বক্তৃতান্তে দর্শন মহাসভার কার্যনির্বাহক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক এ আর ওয়াদিয়া সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে 'জনগণমন' জাতীয় সংগীতের দ্বারা প্রাতঃকালীন অধিবেশন সমাপ্ত হয়। অপরাহ্ণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ এ সি ইয়ুয়িং 'সম্বাদ ও অপরোক্ষ জ্ঞান' (Coherence and Immediate Cognition) সম্বন্ধে এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ পি কংগার 'প্রাচীন ভারত ও গ্রীস' সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ প্রদান করেন।

২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারে দর্শন মহাসভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয়। ইহাতে পূর্বাহ্ণে দর্শনের ইতিহাস শাখার সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর 'দর্শন অধ্যয়ন' সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন এবং তৎসম্পর্কে দর্শনের ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা বিবৃত করিয়া বর্তমান কালে দর্শনের অভ্যুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা, তর্কশাস্ত্র ও তত্ত্ববিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র মুখে 'প্রাচীন প্রমাবিজ্ঞান' (Traditional Epistemology) সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করেন। ইহাতে তিনি যুক্তিতর্ক দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, পাশ্চাত্য প্রমাবিজ্ঞানে যে সব নূতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস হইয়াছে সেগুলি পুরাতন ও সনাতন তত্ত্বগুলির রূপান্তর অথবা নূতনের মোহবশে রচিত অসিদ্ধ মতবাদ মাত্র। ইহার পরে "বর্তমান সমাজে দার্শনিকের স্থান" সম্পর্কে একটি আলোচনা-সভা হয়। ইহাতে অধ্যাপক এ আর ওয়াদিয়া, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য ও মাদাম সোফিয়া ওয়াদিয়া ওজস্বিনী ভাষায় তাঁহাদের বক্তব্য বিবৃত করেন। তাঁহাদের মতে দার্শনিকদের ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনের সমস্যার কথা না ভাবিয়া শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বিচার করাই উচিত নহে, পরন্তু মানুষের সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যায় দার্শনিক চিন্তা ও গবেষণা নিয়োগ করা কর্তব্য। এ বিষয়ে যে আলোচনা হয় তাহাতে অনেক অধ্যাপক যোগদান করেন। প্রধান সভাপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার বক্তৃতা বলিয়া বিতর্কের উপসংহার করেন। এই দিন অপরাহ্ণে অধ্যাপক সি এ শিল্প "মানবীয় বোধ" (Human Understanding) সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দেন এবং অধ্যাপক কনস্টান্টিন্ রেগামী "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দেন। সন্ধ্যাকালে বিচিত্রানুষ্ঠানদ্বারা প্রতিনিধিগণের আনন্দ বর্ধন করা হয়।

২২শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালীন অধিবেশনে নীতিশাস্ত্র ও সমাজ-দর্শন শাখার সভাপতি ডাঃ টি এম পি মহাদেবন "নীতিশাস্ত্রের অতীতাবস্থা" (Beyond Ethics) এবং মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দত্ত "মনোবিজ্ঞানের বর্তমান গতি" সম্বন্ধে তাঁহাদের সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেন। পরে এক বিতর্ক সভায় "শ্রীঅরবিন্দ কি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন ?" এই প্রশ্নের আলোচনা হয়। ইহাতে বক্তা ছিলেন, ডাঃ ইন্দ্র সেন, অধ্যাপক এন এ নিকাম, ডাঃ হরিদাস চৌধুরী এবং অধ্যাপক জি আর মালকানি। এই বিতর্কে সকলের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক অধ্যাপক বিতর্কে যোগদান করেন। উপসংহারে সভাপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন যে, দর্শনের চরম সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীঅরবিন্দ যে ভাবধারা ও প্রত্যয়রাজির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। অপরাহ্ণে ডাঃ এফ এস সি নরথ্রুপ "সমসাময়িক দর্শন" সম্বন্ধে, অধ্যাপক কংগার "আত্মতত্ত্ব বিষয়ে কতিপয় মন্তব্য" সম্বন্ধে এবং অধ্যাপক অলিভিয়ার ল্যাকোম "গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের ঐক্য" সম্বন্ধে চিন্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যায় ডাঃ গর্ডিনার মার্ফি "সঙ্ঘবন্ধন বিষয়ে বর্তমান গবেষণা" (Current Studies in Group Cohesion) সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। সন্ধ্যার পরে জ্যোতির্মঠের জগৎগুরু শ্রীশঙ্করাচার্যের পক্ষে অভ্যর্থনা সমিতি দর্শন মহাসভার প্রতিনিধিদের প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করেন।

২৩শে ডিসেম্বর শনিবার, শেষ দিনের অধিবেশনে পূর্বাহ্নে "বর্তমান ধর্ম সকলের মূল তত্ত্ব" (The Fundamentals of Living Faiths) এ বিষয়ে এক আলোচনা-সভা হয়। ইহাতে ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'হিন্দু ধর্ম', ডাঃ এম এন ধাল্লা 'জোরষ্টার ধর্ম', জনাব কাজি আবদুল ওদুদ 'ইসলাম ধর্ম', ডাঃ এ এন উপাধ্যে 'জৈন ধর্ম', ডাঃ মললশেখরম 'বৌদ্ধ ধর্ম', এবং অধ্যাপক সি পি মাথু 'খৃষ্ট ধর্ম' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনাতেও অনেকের আগ্রহ দেখা যায়। সভাপতি অধ্যাপক এ আর ওয়াদিয়া তাঁহার বক্তৃতায় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে একটি মূলগত ঐক্য এই আলোচনাতে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিবৃত করেন। অপরাহ্ণে বিভাগীয় সভাগুলিতে অনেক প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। সন্ধ্যায় শেষ অধিবেশনে 'দর্শন ও বিভিন্ন বিজ্ঞান' সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-সভা হয়। ইহাতে ডাঃ বীরেশচন্দ্র গুহ 'দর্শন ও প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'দর্শন ও পদার্থবিজ্ঞান' সম্বন্ধে, এবং শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত 'দর্শন ও আইন' সম্বন্ধে অতি মনোজ্ঞ ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা করেন। এই আলোচনা হইতে একটি মহান সত্য পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা গেল যে বৈজ্ঞানিক মতবাদ বিশ্বসমস্যা সমাধানের শেষ কথা নয় এবং বিজ্ঞানের উপরে প্রজ্ঞান বা পরাবিদ্যার স্থান। অধ্যাত্ম-বিদ্যা বা তত্ত্বদর্শনই সেই পরাবিদ্যা। ইহাই দার্শনিকদের চরম লক্ষ্য এবং দার্শনিক জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ।

দর্শন মহাসভার রজত-জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে একটি মনোরম স্মারক গ্রন্থ (The Indian Philosophical Congress : Silver Jubilee Commemoration Volume, 1950) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রায় সব অভিভাষণ ও বক্তৃতাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহার মূল্য ২০৲ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। দর্শন মহাসভার যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যাপক এন এ নিকাম ও ডাঃ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এই ঠিকানায় উহা প্রাপ্তব্য।

ভারতে ভূবিদ্যার শতবার্ষিক ইতিহাস

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা মহানগরীতে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি নামে যে বিদ্যোৎসাহিনী সমাজ আজও বর্তমান, এ' সমাজ নানা নব্য বিদ্যা ও গবেষণার নানা নূতন ধারা এদেশে প্রথম প্রচার করেন। এ' সমাজের প্রতিষ্ঠা লাভ করার পরই এদেশে ভূবিদ্যার প্রথম আলোচনা এ' সমাজেই ঘটেছিল। এ' সম্পর্কে সমাজের রক্ষণশালায় নানা দর্শনীয় বস্তুও সংগৃহীত হয়েছিল। পরে ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগ স্থাপিত হওয়ায় সে বিভাগের হাতেই রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সকল সংগ্রহ অর্পণ করা হয়।

ভারতে বৃটিশ শাসনের কুফল সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী কালের অন্তরালে সঞ্চিত হয়েছিল---যা'র প্রকোপ ক্রমে শাসকের শক্তিকে হীনবল করে দেয় দেশীয় স্বাধীনতাবোধের এক প্রবল বন্যা। রাজ ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করেই বিদেশী শাসনের কুফল দেখা দেয়। অন্যদিকে, বিদেশী জ্ঞানী-বিজ্ঞানীর ব্যক্তিগত কিম্বা সংহত সাধনা এদেশে কত নূতন বিদ্যা, কত নূতন গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে---যে-পথ ধরে আমরা এগিয়ে চলেছি বর্তমান আন্তর্জ্জাতিক প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে। এ' সাধনা সাধারণ ভাবে রাজ কিম্বা অর্থনৈতিক স্পর্শদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছে।

শতবার্ষিক উৎসব

১০ই জানুয়ারী ১৯৫১, বুধবার (২৫শে পৌষ, ১৩৫৭) তারিখে ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষণ বিভাগের শতবার্ষিক জীবন পরিপূর্ণ হয়। সারা ভারতের গণ্যমান্য ভূতত্ত্ববিদেরা এ' উপলক্ষে কলিকাতায় সমবেত হন। চারদিন ব্যাপী এক উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিদেশের স্বনামধন্য ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে কয়েকজন এ' উৎসবে যোগদান করেন। ভারতীয় ভূতত্ত্বের প্রগতির ইতিহাস একটি প্রদর্শনীর সাহায্যে বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণকে দেখানো হয়। শতবার্ষিকীর প্রধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই জানুয়ারী, শনিবার তারিখে। এ' স্মারক উৎসব উদ্‌যাপিত হয় ভারতীয় যাদুঘরের প্রাঙ্গণে। পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু, বোম্বাই এর প্রদেশপাল স্যার মহারাজ সিং, ভারত সরকারের খনি-শক্তি-কর্ম্মশালার মন্ত্রক ও উপমন্ত্রক শ্রীগ্যাড্‌গিল ও শ্রীবার্গোহাই, ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের পূর্বতন উপদেষ্টা স্যার লুই ফারমর এবং আমেরিকা, রুশিয়া, গ্রেটবৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, অষ্ট্রিয়া, বর্ম্মা, কানাডা, সিংহল, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান, হল্যাণ্ড, দক্ষিণ রোডেশিয়া প্রভৃতি নানা দেশের প্রতিনিধি ভূতত্ত্ববিদেরা উৎসবে যোগদান করেন। ভারতীয় ডাক-বিভাগ এ' উৎসব উপলক্ষ করে এক বিশেষ ডাক-টিকিট প্রচার করেছেন।

১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা। ডাঃ ভয়সে হায়দারবাদ রাজ্যের ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত এক মানচিত্র তৈয়ার করেন। ভারতে এ' জাতীয় মানচিত্র এই প্রথম। তারপর, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মালওয়া রাজ্যের এরূপ বিশেষ এক মানচিত্র রচনা করেন কাপ্তান ড্যাঙ্গারফিল্ড। পরের বছর কাপ্তান হারবার্ট পশ্চিম হিমালয়ের মানচিত্র তৈয়ার করেন। ডাঃ ভয়সে এদেশে চিকিৎসক হয়ে আসেন এবং এদেশেই মারা যান। তাঁর জীবনের শেষ পাঁচটি বছর দক্ষিণ ও মধ্যভারতের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা ও আবিষ্কারের কাজে অতিবাহিত হয়।

ভয়সে, ড্যাঙ্গার ফিল্ড ও হারবার্ট-এর কাজের স্থানীয় প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ছিল সত্য, কিন্তু সারা দেশের উপযোগী করে কোন কাজ সেকালে সুরু করা হয় নি, আর সেভাবে কাজ করার সুযোগও ছিল না। কারণ

তখনও বৃটিশ শাসন সমস্ত দেশ জুড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। স্থানীয় আবিষ্কারের নানা তথ্য সংগ্রহ করে গ্রাণো নামে এক ভূতত্ত্ববিদ্ বিলেতে বসেই ভারতের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এক মানচিত্র তৈয়ার করেন। তখন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। এরপর ২৩ বছর সময় বয়ে গেল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ এ' দেশের ভূতত্ত্ব-বিষয়ক সরকারী মানচিত্র প্রথম প্রকাশিত হল। ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষণ বিভাগের প্রথম পঁচিশ বছরের নানা আবিষ্কার অবলম্বন করে এ' মানচিত্র রচিত হয়। আর এ' রচনা কাজের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভূতত্ত্ববিদ্ ওল্ডহ্যাম।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ভূতত্ত্ব সমীক্ষণ বিভাগের চরম লক্ষ্য হল—দেশের খনিজ সম্পদের উদ্ধার ও যথাযথ ব্যবহার। এভাবের কাজ কিছু কিছু যে হয়নি তা'

ডাঃ ফারমর—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।—শত বার্ষিকী উৎসবে যোগদান করার জন্য ইনি কলিকাতায় এসেছিলেন

বলা চলে না। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের লৌহসম্পদ প্রমথনাথ বসু মহাশয় প্রথম আবিষ্কার করেন। এ' আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে আজও টাটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে চলেছে। উইলিয়ামস্ বলে এক ভূতত্ত্ববিদ্ রামগড়ের কয়লাখনি আবিষ্কার করেন, কিং বলে অন্য একজন ভূতত্ত্ববিদ্ সিঙ্গারেনীর কয়লা খুঁজে পান। এ' দুই খনি থেকে কয়লা তোলার কাজ আজও হয়ে চলেছে।

কয়লা, লোহা, তামা, পেট্রোলিয়ম, এমন কি সোনার যে সব খনি আজও সম্পদ প্রসব করছে—ভারতীয় খনিজ সম্পদের যে অনুমান করা হয় তা'র সঙ্গে তুলনায় এ' অধুনালব্ধ সম্পদ যৎসামান্য। খনিজ সম্পদ উদ্ধারের জন্য প্রথম কর্ত্তব্য হল ভূভাগের সমীক্ষণ ও তা'র যথাযথ মানচিত্র রচনা। উড়িষ্যা, বাস্তর, আসাম ও হিমালয়ের কতক অংশ বাদে এদেশের ভূতত্ত্ব বিষয়ক মানচিত্র প্রায় সম্পূর্ণভাবে রচিত হয়েছে। এখনও সমীক্ষণের কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভূতত্ত্ববিদদের প্রধান কাজ ছিল কয়লার সন্ধান। সোনা, লোহা, অভ্র ও পেট্রোলিয়ম করে অন্য খনিজ পদার্থের আবিষ্কারও করা গিয়েছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড এদেশে কয়লা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে যে সমিতি গঠিত হয় তা'র কর্ম্মসচিব হয়ে আসেন। ডাঃ ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ডের চেষ্টায় রাণীগঞ্জ

ডাঃ ওয়েষ্ট—ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ

কয়লা খনির আবিষ্কারক উইলিয়ামস্-এর এদেশে আসার ও কাজ করার সুযোগ ঘটে। কাজে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় ক্যাম্পে উইলিয়ামস্-এর জীবনাবসান ঘটে। মারা যাওয়ার পূর্ব্বে তিনি রাণীগঞ্জ কয়লার খনি ছাড়া কাইমুর উপত্যকা আবিষ্কার করেন।

তখন এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব চলেছে। কোম্পানী কয়লা আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করায় ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ডকে উইলিয়ামসের পরিত্যক্ত কাজ সম্পূর্ণ করার আদেশ দেন। ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড গিরিডির কয়লাখনি খুঁজে পান। এ'স্থানের কয়লা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলে

আজও আদর পাচ্ছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের গোড়ায় ম্যাক্‌ক্লেল্যাণ্ড ভূতত্ত্ব সমীক্ষণের কাজ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করায় কোম্পানী সেই কাজে টমাস ওল্ডহ্যাম্‌কে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিয়োজিত করেন। ওল্ডহ্যাম্ সাহেবের সময় থেকে এদেশে ভূতত্ত্ব সমীক্ষণের কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে হয়ে চলেছে।

প্রথম সরকারী ব্যবস্থা

প্রথম ওল্ডহ্যাম এদেশে পাঁচ বছরের মেয়াদে আসেন। পরে ২৫ বছর এদেশে কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করে দেশে ফিরে যান। ওল্ডহ্যামই প্রথম সরকারীভাবে ভূতত্ত্ব সমীক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত
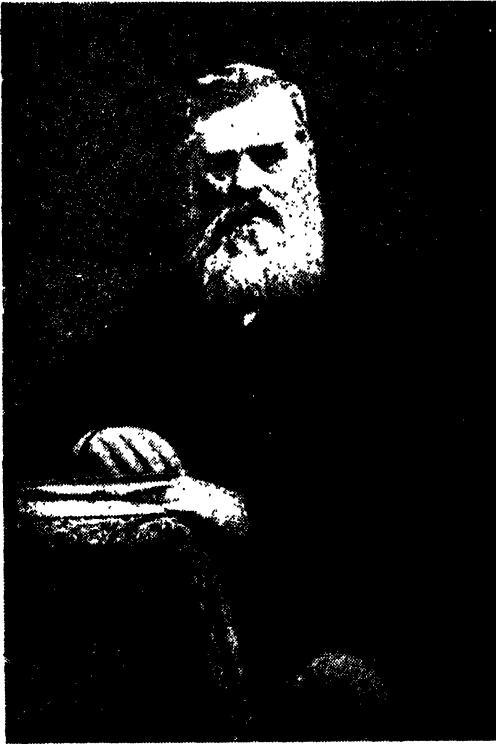
টমাস্ ওল্ডহ্যাম—ভারতীয় ভূতত্ত্ব-বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ

হন। আর ওঁর আমলে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রথম দপ্তরখানা প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা মহানগরীতে ১নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীটে। এই দপ্তর পরে ভারতীয় যাদুঘরে সরিয়ে আনা হয়। গোড়ায় একেলা কাজ সুরু করার পর ওল্ডহ্যাম ক্রমে প্রত্যেক বছরে দু'চারজন করে সহকারী ও কেরাণী নিযুক্ত করে চলেন। এঁর কর্ম্মকালে যেসব কাজ হয় তা'র তালিকা মন্দ বড় নয়—খাসিয়া পাহাড় ও দামোদর উপত্যকার জরিপ, পরে রাজমহল পাহাড় ও নর্ম্মদা-সাতপুরা অঞ্চলের জরিপ, তালচেরে কয়লা খনির আবিষ্কার, মধ্যভারতের এক বিস্তৃত অংশের সমীক্ষণ। এতসব কাজের মধ্যে কয়লা আবিষ্কার ও কয়লার খনি যে যে স্থানে আছে সেই সেই স্থানের সমীক্ষণ ও জরিপই ছিল ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রধান কাজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ম্মা-যুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে ওল্ডহ্যাম বর্ম্মা পরিদর্শনে যান ও ইয়েনান্‌জিয়াং অঞ্চলে তেলের খনির সন্ধান পান।

ওল্ডহ্যামের প্রথম পঞ্চবার্ষিক চাকুরীর মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাঁকে পুনর্নিয়োগ করায় তিনি দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সারা ভারতের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় এক নূতন মানচিত্র তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকারকে অবহিত করেন। তখন লর্ড ক্যানিং ছিলেন দেশের প্রধান রাজ-প্রতিনিধি। তাঁর সদিচ্ছার আনুকূল্যে ভূতত্ত্ব বিভাগের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চল্‌ল। ওল্ডহ্যাম সাহেবের এগার জন সহকারী নিযুক্ত হলেন। আর ভূতত্ত্ব বিষয়ক যাদুঘরের একজন অধ্যক্ষ সে-কাজের ভার গ্রহণ করলেন। ১৮৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে বিভাগীয় বাৎসরিক বিবরণ প্রথম প্রকাশিত হ'ল। এ' বিবরণ ছাড়া সমীক্ষণ ও আবিষ্কারের বিশদ বিবরণ, নানা চিত্র সম্বলিত করে জনসাধারণের গোচরীভূত করা হ'ল।

এদেশের প্রাকৃতিক, বিশেষ করে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয়, মানচিত্র তৈরীর কাজ ওল্ডহ্যামের আমলে বেশ এগিয়ে চলেছিল। এ' কাজে বাধাও ছিল প্রচুর। বিশেষ করে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদেশীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্তর ও মধ্য ভারতে এ কাজের অগ্রগতি অন্ততঃ কয়েক বছরের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিল। সে সময়ে দক্ষিণ ভারতে পর্য্যবেক্ষণের কাজ বেশ দ্রুতই এগিয়ে চলে। আর কাজ হয় হিমালয় অঞ্চলে। ওল্ডহ্যামের সহকারীদের মধ্যে ব্ল্যান্‌ফোর্ড ও মেড্‌লিকটের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওল্ডহ্যাম কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর মেড্‌লিকট্ ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে অধ্যক্ষ পদের নামকরণ ছিল "সুপারিন্‌টেনডেন্ট." মেড লিকট্ এ' পদের নবনামকরণ করেন "ডাইরেক্টর।"

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

ওল্ডহ্যামের কার্য্যকালে ভারতীয় ভূতত্ত্বের যেসব আবিষ্কার ও সমীক্ষণ হয় তা'দের অর্থ নৈতিক প্রয়োজনীয়তার কথা বাদ দিলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-সম্বন্ধীয় মূল্য বড় কম নয়। প্রস্তরীভূত অবস্থায় প্রাচীন যুগের গাছপালা, যা'দের কয়লারখনি অঞ্চলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, কিম্বা মাটির নীচে অবস্থিত বিভিন্ন স্থল ও জলের স্তর লক্ষ্য করে বলা যায় যে এক সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও কুমেরু দেশ এক মহাদেশ রচনা করেছিল। পরে নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে বর্ত্তমান স্থল ও জলের বিভাগ সম্ভব হয়েছে। ব্ল্যানফোর্ড ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের ভূতত্ত্ব সমাজের সামনে এ' বিষয়ে প্রথম বক্তৃতা দেন। পরে, অন্যদেশের বৈজ্ঞানিকেরাও আবিষ্কার ও বিচারের সাহায্যে একই মত প্রকাশ করেছেন।

মেড্‌লিকট্ সাহেব ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর যে সব কাজ হয় তা'দের মধ্যে মধ্যভারত, রাজপুতনা ও যোধপুরের পাহাড়

অঞ্চলের সমীক্ষণ, আরাবল্লী অঞ্চলের পর্য্যবেক্ষণ, ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশের মানচিত্রকরণ, আসামে কয়লাখনির আবিষ্কার ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পর্য্যবেক্ষণই প্রধান। হিমালয় অঞ্চলের পর্য্যবেক্ষণ ও সমীক্ষণ আধুনিক ভূতত্ত্ববিদদের এক বিশেষ আকর্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা হিমালয় ভ্রমণ করতে এসে প্রাণ দান পর্য্যন্ত করে গিয়েছেন। কেউ কেউ বিফলতা নিয়ে ফিরে গিয়েছেন দেশে, আবার সামান্য কয়েকজন সফলকামও হয়েছেন। হিমালয় পর্য্যবেক্ষণের কাজ মেডলিকটই প্রথম গ্রহণ করেন। সেজন্যও তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। মেড্‌লিকট্ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ১১ বৎসর কাল অধ্যক্ষের কাজে রত থাকেন।

মেড্‌লিকটের পর ডাঃ কিং অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এঁর আমলে দক্ষিণ ভারতে নানা প্রয়োজনীয় আবিষ্কার সম্ভব হয়। সালেম অঞ্চলে ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্রোমিয়াম ও লোহার সন্ধান মেলে; নেলোর অঞ্চলে মেলে অভ্র আর মহীশূরে কুরুবিন্দ। এ' সময়ে বিখ্যাত ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্ প্রমথনাথ বসু মহাশয় মধ্য প্রদেশে গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ডাঃ কিং-এর সময়ে বর্ম্মার তৈলাঞ্চলে নানা পর্য্যবেক্ষণের ফলে বহু মূল্যবান খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

ডাঃ কিং অবসর গ্রহণ করবার পর গ্রিস্‌বাক সাহেব ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। গ্রিসবাকের কার্য্যকালে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ব-বিভাগের অফিস ভারতীয় যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। এঁর তত্ত্বাবধানে উত্তর ভারতে ও রাজপুতানা অঞ্চলে কয়লা-খনির পর্য্যবেক্ষণ চলে। বেলুচিস্থানের ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মানচিত্র সম্পূর্ণ করা হয়। নানা প্রস্তরীভূত জীবজন্তু ও গাছপালার সংগ্রহ করা হয়। 'এ সময়ে আর একটি আবিষ্কার ঘটে যা' দেশ দেশান্তরের বৈজ্ঞানিকেরাও সানন্দে গ্রহণ করেন। ভূতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ টমাস ওল্ডহ্যাম সাহেবের পুত্র আর, ডি, ওল্ডহ্যাম এ' আবিষ্কারটি করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আসামে যে ভূমিকম্প হয় সেই বিপর্য্যয়কে কেন্দ্র করে এ' আবিষ্কারটি হয়। তিনি লক্ষ্য করেন যে ভূমিকম্পের সময় প্রধানতঃ তিন রকমের আলোড়ন ঘটে। এ' আবিষ্কার পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে গবেষণার কাজে আসে।

গ্রিসবাকের কার্য্যকাল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। টি এইচ্ হল্যাণ্ড নব-অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এর আমলে কয়লা (গিরিডি, রাণীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে) ম্যাঙ্গানিজ (মধ্য প্রদেশে) ও তামার (সিংভূমে) যেসব খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল তা'দের পুনর্সমীক্ষণ করা হয়। হল্যাণ্ড সাহেবের সময়েই প্রমথনাথ বসু মহাশয় ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে লোহার খনি আবিষ্কার করেন আর অধ্যক্ষ সাহেব স্বয়ং মাদ্রাজ প্রদেশে এক রকমের কাল পাথর আবিষ্কার করেন, যা'র গঠনে এক অভূতপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান। এই পাথরের নিদর্শন সেণ্টজন গির্জ্জার সংলগ্ন কবর স্থানে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেবের সমাধি স্তম্ভে রয়েছে। হল্যাণ্ড সাহেবের আমলে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের সম্প্রসারণ সম্ভব হয়।

প্রস্তরীভূত হাতী

হল্যাণ্ড সাহেবের পর মিঃ হেডন অধ্যক্ষ হয়ে আসেন বিলেত থেকে তখন ১৯১০ খৃষ্টাব্দ। হেডন সাহেবের কার্য্যকালে হিমালয় অঞ্চলের নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তিনি স্বয়ং তিব্বত, আফগানিস্থান ও হিমালয় পাহাড় অঞ্চলে কার্য্যে রত থাকেন। এমন কি ইরাণদেশেও তিনি পর্য্যবেক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন। সিওয়ালিক পাহাড় ও বেলুচিস্থানের পাহাড় অঞ্চলে
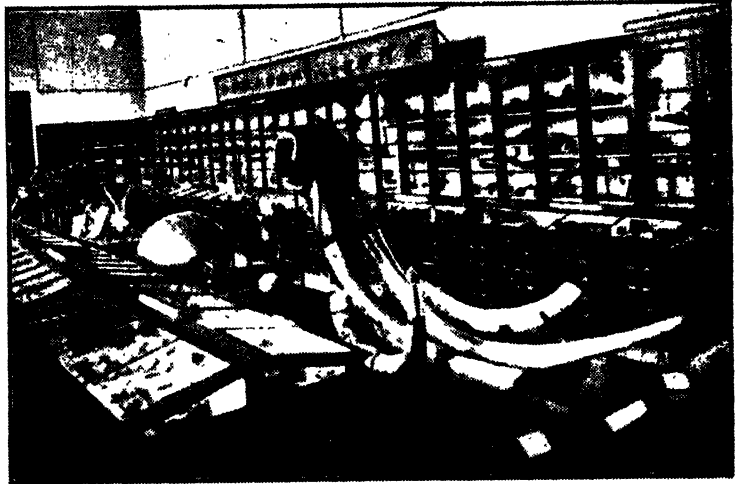
কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত প্রস্তরীভূত হাতির দাঁত

স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডধারী জন্তুর প্রস্তরীভূত যেসব মূর্ত্তির আবিষ্কার এ' সময় হয়েছিল তা'র বৈজ্ঞানিক মূল্য যথেষ্ট। স্তন্যপায়ী জন্তুর বিবর্ত্তন বিচার বিষয়ে এ' আবিষ্কার খুবই মূল্যবান। ভারতীয় যাদুঘরে এরূপ প্রস্তরীভূত হাতীর নিদর্শন সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রাচীন কালের হাতী বর্ত্তমানের হাতী অপেক্ষা আয়তনে ও দৈর্ঘ্যে অনেক বড় ছিল। প্রস্তরীভূত জীবজন্তুর আবিষ্কারে যাঁদের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য, তাঁদেরই একজন ছিলেন, জি, ই, পিলগ্রাম।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে হেডন সাহেবের স্থান গ্রহণ করেন ই, এইচ, প্যাস্কো। ইনি ভারতীয় খনি সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধের তাগিদে ভূতত্ত্ব বিভাগের কাজ মন্দগতি হয়ে পড়েছিল, সে মন্দগতি ক্রমে দ্রুত হ'তে লাগল। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে পাথরের গঠন নিয়ে চলল গবেষণা; বিহার ও উড়িষ্যায় লৌহ-খনির সন্ধান সুরু হ'ল; সিংভূমে হ'ল তামার খনি

পর্য্যবেক্ষণ ; এমন কি আসামের খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে নূতন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা ঘটল। প্যাস্কো সাহেব ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করায় এল, এল, ফারমর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। এর কার্য্যকালে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশে পর্য্যবেক্ষণের কাজ সমাপ্ত করা হয় ; সিংভূমে লোহার খনি আবিষ্কারের পুনঃপ্রচেষ্টা চলে ; মাদ্রাজে অ্যাজ্‌বেষ্টোস্ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধান করা হয় এবং আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলে কয়লার অবস্থান সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগৃহীত হয়। হিমালয় অঞ্চলে ও বর্ম্মায় পর্য্যবেক্ষণের কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে চলে। ১৯৩১, ১৯৩৪ ও ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে বিহার, নেপাল ও বেলুচিস্থানে যে ভূমিকম্প হয় সেই ভূমিকম্পের প্রকৃতি ও বিস্তৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লক্ষ্য করা হয়।

খনিজ সম্পদের ভবিষ্যৎ

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ফারমর সাহেবের কার্য্যকাল শেষ হয়। তাঁর স্থান গ্রহণ করেন এ, এম্ হেরন। এঁর কার্য্যকালে হিমালয়ের পিরপঞ্জল অঞ্চল, গাড়োয়াল অঞ্চল, কারা-কোরাম অঞ্চল, গারো ও খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে পর্য্যবেক্ষণের কাজ হয়। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বর্ম্মাদেশ ভারত সরকারের শাসন মুক্ত হয়। সে কারণে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের যে অংশ বর্ম্মায় কাজে রত ছিল, সেই অংশ ভারতীয় বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
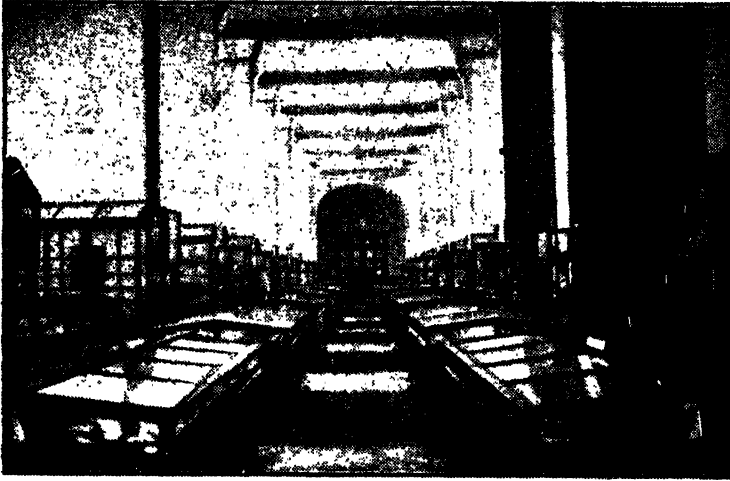
কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত ভারতীয় খনিজ পদার্থের নানা নমুনা

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগে এক নূতন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এঁর নাম সি, এস্, ফক্স। এঁর কার্য্যকালে নানা খনিজ পদার্থের পর্য্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার সম্ভব হয়। মেওয়ার রাজ্য ও রাজস্থান অঞ্চলে দস্তা ও সীসকের খনিগুলোর সংস্কার করা হয়। রাজপুতানা, বিহার ও মাদ্রাজ প্রদেশে অভ্রের সন্ধান ও উত্তোলনের কাজ দ্রুত হয়ে চলে। বেলুচিস্থানে গন্ধকের আবিষ্কার হয়। বাংলা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে উলফ্রাম্ ধাতুর অবিস্থিতি আবিষ্কার করা হয়। আফগনিস্থানে কয়লা ও লবণের খনি পর্য্যবেক্ষণ করা হয়। আসাম ও দক্ষিণ ভারতের ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় মানচিত্র তৈয়ারের কাজ ধীর গতিতে এগিয়ে চলে।

ফক্স সাহেব ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করায় ই, এল্, জি, ক্লেগ্ অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। বৎসরাধিক সময় কাজ করার পর ক্লেগ্ সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মারা যান। ক্লেগ্ সাহেবের পর স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ওয়েষ্ট। ডাঃ ওয়েষ্ট আজও কৃতিত্বের সঙ্গে পদাধিকার করে আছেন। কাজে যোগদান করার পরই ডাঃ ওয়েষ্ট ভূতত্ত্ব বিভাগের নানাদিক থেকে উন্নতি সাধন করায় মনোযোগ দেন। বিভাগের বিভিন্ন অংশের সংস্কার ও পুনর্গঠন ঘটে চলে। বিভাগটি প্রধানতঃ দুই-ভাগে বিভক্ত করা হয়,—খনিজ-পদার্থ সন্ধান ও সমীক্ষণ বিভাগ ও যন্ত্রবিদ্ বিভাগ। প্রথম বিভাগে ভূপ্রকৃতি পরীক্ষণ, খনি খনন, ভূ রসায়ন, অপ্রচলিত খনিজ পদার্থ সন্ধানের কাজ হয়। দ্বিতীয় বিভাগে জলসেচন, পথ ঘাট নির্ম্মাণ, ভূমি পরীক্ষা ইত্যাদি কাজ হয়।

ডাঃ ওয়েষ্টের কার্য্যকালে যেসব কাজ হয়েছে তাদের মধ্যে রাজস্থান, গাড়োয়াল ও সিকিম অঞ্চলে তামার খনি আবিষ্কার ও পরীক্ষা, ম্যাঙ্গানিজের নূতন খনি আবিষ্কার, লোহা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধান ও পরীক্ষাই প্রধান। তার এক বিশেষ পরীক্ষার কাজ এগিয়ে চলেছে জ্বালানি পরীক্ষা-কেন্দ্রে। যে কয়লা অপরিণত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে সেই কয়লা থেকে পেট্রোলিয়ম তৈরী করা যায় কিনা সে-বিষয়ে গবেষণা চলছে। ভূ-প্রকৃতি পরীক্ষণ বিভাগ কয়লা খনির আয়তন নির্ণয়, খনির কোন্ স্তরে ম্যাঙ্গানিজ ধাতু বর্ত্তমান তা'র সন্ধান ইত্যাদি কাজ করে থাকে। যন্ত্রবিদ্ বিভাগ দেশে যেসব বাঁধ তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলোর জমির অবস্থা লক্ষ্য করে আসছে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে আসামে যে-ভূমিকম্প হয় তা'র ফলে ভূপৃষ্ঠের যে সব পরিবর্ত্তন হয় সেগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। সে ভূমি-কম্পের উৎপত্তি স্থানও আবিষ্কার করা গিয়েছে।

মাত্র কিছুদিন আগে ডাঃ ওয়েষ্ট কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করায় তাঁর স্থান গ্রহণ করেছেন ডাঃ এম্ এস্ কৃষ্ণান্। ডাঃ কৃষ্ণান্ ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ভারতীয় পরিচালক।

ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের যে শত বছরের ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়েছে এ সময়ে অষ্ট্রিয়ান, জার্ম্মান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়, বৃটিশ ও ভারতীয় করে নানা

দেশের বৈজ্ঞানিক এ' বিভাগে কাজ করেছেন। আজ বিশেষ করে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের উপর শত বছরের গৌরবময় কর্ম্মধারাকে পরিচালিত করার ভার বর্ত্তিয়েছে। এ' ভার সুষ্ঠুভাবেই বাহিত হবে, আশা করা যায়।

অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় এদেশে ভূতত্ত্ব-বিষয়ক কাজ আরও ব্যাপক ভাবে হওয়া প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতের সরকার সে-বিষয়ে সচেতন আছেন। মাননীয় খনি-শক্তি-কর্ম্মশালার মন্ত্রক ভূতত্ত্ব বিভাগের শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে বক্তৃতা দান করেন সেই বক্তৃতা আমাদের আশান্বিত করেছে। এদেশের ভূগর্ভে কত রত্ন সম্পদ আজও অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে তা'র হিসেব কে করতে পারে? যে পরিমাণ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তা'র উত্তোলন ও সম্যক ব্যবহার আজও হয়ে উঠেনি। বিশ বছর আগে ভারতের খনিজ সম্পদ বছরে ১৯ কোটি টাকা উৎপাদন করেছে; আজ এ' সম্পদ ৭৫ কোটি টাকা উৎপাদন করতে সক্ষম। এত টাকার প্রায় ষোল আনাই ব্যক্তিগত তহবিল স্ফীত করছে। কিন্তু দেশের খনিজ সম্পদ জনসাধারণের সম্পত্তি এবং এর আয় দেশের জাতীয় আয় বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রদেশপাল শতবার্ষিকী উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। একমাত্র ভারত সরকারই খনিজ পদার্থ-উত্তোলন করতে পারবেন এবং সে পদার্থ নানা শিল্পশালায় গিয়ে পৌঁছুবে একমাত্র সরকারেরই নির্দ্দেশে। দেশের শ্রীবৃদ্ধিতে ভারতীয় খনিজ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য বড় কম নয়।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঢং ঢং করে পাচটা বাজতেই মুখ তুলে ঘড়ির দিকে দেখলে মিনতি। সারাদিনরাতের মধ্যে অপরাহ্নিক্ বিরামের এই আরম্ভটুকু তাকে যেন নেশায় পেয়ে বসে। কদিনই বা এসেছে সে এই অতিকায় সহরে, কদিনই বা কাজে ঢুকেছে—বড় জোর কয়েক সপ্তাহ—তার ভিতরও বেশী সময় কেটেছে 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'য়—আর না হয় মাথা গোঁজবার আশায় যেমন তেমন একটা বাসার খোঁজে। কাজের মধ্যেও এমন কিছু মাধুর্য্য বা চিত্তচমৎকতা নেই যে বিত্তের অভাব ঘুচিয়ে চিত্তকে সরস না হয় সহনীয় করে তোলে। সহকর্ম্মী ও কর্ম্মিনীরাও তেমনি। সবাই বোঝে কোনমতে যেনতেনপ্রকারেণ দিনগত পাপক্ষয় করে বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়াটাই কর্ত্তব্যকর্ম্মের সার্থকতা। তার বেশী কেউ ভাবে না, কষ্ট করে ভাববার যে দায়িত্ব আছে সেটাও সজ্ঞানে স্বীকার করে না।

তাড়াতাড়ি কাগজ কলম গুছিয়ে উঠে পড়লো সে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় মাঠের পাশে জলের ধারে সরল বনস্পতির নীচে সবুজ ঘাসের আস্তরণের উপর মাঝে মাঝে তাদের জমাটী আড্ডা জমে—ছেলেরা নাকি নাম দিয়েছে গাছতলার আসর। রেখা শিখা মিনতি মলিনা শোভা সেবা সবাই জড়ো হয়—সবাই কাছাকাছি থাকে। অনেকেই গ্র্যাজুয়েট, অনেকেই কাজ করে, কেউ বা আফিসে, কেউ বা শিক্ষয়িত্রী, কেউ বা পড়ছে ডাক্তারী। মিনতির মত দু-একজন ঘরছাড়া ছন্নছাড়ার দলেরও আছে। এই সময়টিই তাদের একান্তভাবে নিজস্ব, এই সময়টিতেই তাদের সুখ-দুঃখের আলোচনা, সখীসংবাদ, মুখরোচক খবরের আদান প্রদান চলে। নবাগতা মিনতিও বসে থাকে এই সময়টির জন্য উন্মুখ অধীর হয়ে। অথচ সে বাগবিস্তার করতে জানে না, পরের রসালো সমালোচনা করতে পারে না, নতুন বই আর ফিল্ম থেকে আরম্ভ করে সকলের হাঁড়ির খবর জোগাড় করতে পারে না, মন দেওয়া নেওয়ার সেতারবার্ত্তা ত দূরের কথা। ত্রিশ বছরের ওঠা-পড়া, নাড়াখাওয়া মনটা যেন আর সাড়া দিতে চায় না—একটা জগদ্দল বিশমনী পাথর যেন কে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। চুপ করে বসে থাকে সে, কখনো দু-একটা কথা বলে, তবু কী যে ভালো লাগে তার এই সময়টুকু—একঘেয়েমির নাগপাশ থেকে সদ্যমুক্ত এই আবছা আলোর অপরূপ ক্ষণটি! মাঝে মাঝে চেয়ে থাকে সে সামনের পানে স্তব্ধ হয়ে, ছায়ানিবিড় আকাশের প্রান্তে, দিগন্তলীন্ সীমার পানে। স্নিগ্ধ শ্যামলিমার মাঝে হয়ত দেখতে পায় তরঙ্গভঙ্গুর জলরেখা—কার কলচিহ্ন নিয়ে চলে গেছে সোনার বরণ উর্ব্বর হরিৎ ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে, নদীমাতৃক প্রান্তর বেয়ে মাটিমায়ের কোলে।

—এই যে মিনুদি, এতো দেরী করতে হয়, তোমার গানটা তৈরী ত—বলে তাকে সরবে অভ্যর্থনা করে শিখা।

ম্লান হেসে সে বসে পড়ে একপাশে, একপশলা বৃষ্টির সরস রাগানুরাগে ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ তখন বাতাসে লেগে গুন্ গুন্ করে বলে—এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর—এইটে গাইব ভাবছি, চলবে ?

শিখা জবাব দেয়—তোমার গলায় আবার চলবে না, যা চালাবে তাই চলবে—

মুখর হয়ে ওঠে সভাস্থল। বাস্তুহারাদের সাহায্যে জলসা হবে—তারই পঞ্চমুখী জল্পনা, কল্পনা, আলাপ আলোচনা।

শিখার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী। কথা কয় যত, কাজও করে তত। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মতই সে শিখরিণী। এদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্য ও লাস্যময়ী সে। প্রাণের ব্যারোমিটারে উত্তাপ এখনও এ্যাবনরম্যালে পৌছায়নি। বয়সও অপেক্ষাকৃত কম—চোখে এখনও রং ধরে, দেহে যৌবনের বন্যা আটক, মনে এখনও কল্পলোকের মানস ঘোরাফেরা করে। তাছাড়া অন্যদের মত নিতান্ত নিরুপায়ও নয় সে। চাকরী করতে আসা শুধু বসে না থাকার প্রতিষেধক হিসাবে; নিছক অভাবে পড়ে নয়—বাপের যাহোক কিছু সঙ্গতি আছে। সংসার সমুদ্র মন্থনের হলাহলটা এখনও কণ্ঠে ওঠেনি। নীলকণ্ঠের জিম্মাতেই আছে।

রেখা মুখ ঘুরিয়ে বল্লে—শুনেছিস্ অশেষবাবু নাকি বলেছেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাঁর আসে না, ওসব তাঁর দ্বারা হবে না, এককালে গাইতেন বেশ ভালই, এখন নাকি ছেড়ে দিয়েছেন।

মিনতি চমকে ওঠে, কোথায় যেন একটা আলোড়ন।

শিখা জবাব দেয়—হ্যাঁ, সত্যিই ত, হতো আসল কানাড়া আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ী, তবে ত তাঁর গলায় মানাতো! কেন বাবা কবিগুরুকে ধরে আনা—মিশ্ররাগ রাগিণী নিয়ে টানাটানি—

সেবা ঠাট্টা করে বলে—তুই থাম্ বাপু, সঙ্গীতরত্নাকরের সঙ্গে আর গানের টেক্কা দিস্নি, জানিস্ উনি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করেছেন—কত নাম—

শোভা শিখার মত শাণিত বিদ্যুৎজিহ্ব নয়, সব সময়েই সব জিনিষ মানিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাওয়াই তার স্বভাব, সে বল্লে—আসলে ও জিনিষটা ভগবান-দত্ত, যেমন মিনতির। তবে শিক্ষায় সাধনায় ঘষে মেজে আরও সার্থক করে তোলা যায়—

শিখা হেসে বলে—তা আর বলতে, বাবার কি কম পয়সা গেছে আমার জন্য ওস্তাদদের মাইনে দিতে দিতে। মা প্রথম প্রথম আপত্তি করতো, শেষকালে ভাবলে কোকিলকণ্ঠী না হলেও যদি গলার গান শুনে কেউ আচমকা প্রাণটাই দিয়ে ফেলে—মেয়ে একেবারে ডবল্ অনার্স হয়ে দুই ইউনিভারসিটির ডিগ্রী পেয়ে যায়।

মলিনা ফোড়ন্ কাটে—জানা আছে সবই, বিয়ের বাজারে সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে ঐ রূপ আর রূপোয়, তা না হলে……

অজান্তে একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার, কোথায় যেন একটা ব্যথা।

মিনতি ভাবে—হায়রে, নারীর রক্তে রয়েছে যে নীড় বাঁধবার প্রসুপ্ত বিষ। কোন প্রজন্মে তিনি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেন কে জানে—

সেবা ফস্ করে বলে ফেলে—সিমন্তে সীন্দূর অরুণ বিন্দু অনাগত থাকলেই বা ক্ষতি কি? কি দরকার নিজের স্বাধীনতা হারিয়ে ঐ জিনিষটাকে মাথায় তুলে নেবার। দিল্লীর লাড্ডু খেলেও পস্তাতে হয়, না খেলেও……

কথাটা প্রায় ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে দেখে শোভা বক্তব্যের মোড়টাকে ঘুরিয়ে দেয়—অরক্রেষ্টার কি হলো রে শিখা—

শিখা বলে—কেন, শোননি, অশেষবাবু ভার নিয়েছেন যে—

নামটা এবার মিনতির নার্ভের উপর হঠাৎ বিদ্যুত-তাড়িত শকের কাজ করে। বিদ্যুত বর্ষণের একটা পজিটিভ স্রোত যেন তার নেগেটিভ মনকে সজোরে ধাক্কা দেয়—কোন এক দূর অতীতে পিছনে ফেলে-আসা একটি তন্দ্রাজড়িত মুহূর্ত্ত ভেসে ওঠে তার মনে, আর তার সঙ্গে একটি সুস্নিগ্ধ ঘনশ্যাম ছিম্‌ছাম চেহারা—প্রতি কথার ভঙ্গীতে যার ছিল চুম্বকের উদ্ধত আকর্ষণ।

শোভা বলে চলেছে—সাবধান শিখা, তোর এখনও বয়স কম, উনি নাকি বহু কুমারীর চিত্ত ও তাদের বাপ

মায়ের কিঞ্চিৎ বিত্ত জয় করবার আশায় সম্প্রতি কলকাতাতেই অধিষ্ঠান হয়েছেন। অতনু নাকি বারে বারে হেরে গেছেন তার কাছে। মীনকেতনের ধ্বজা লুটিয়ে পড়েছে ধূলায়। অনেকগুলি ভগ্ন হৃদয়ের দামী টুকরো তার জীবন-ইতিহাসের মিউজিয়ামে চক্‌চকে শো-কেশে দৃশ্যবস্তুর মধ্যে জ্বল জ্বল করে—

সেবা বলে—ও, সেই স্কাউণ্ড্রেলটা নয় ত? আমি যখন স্কটিশে সেকেণ্ড ইয়ারে, ও ত তখন ফোর্থ ইয়ারে, কি বিশ্রী কাণ্ডটাই হলো—

শিখা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে বল্লে—কি যে বলো রেখাদি, সে কেন হবে—

শোভা হেসে বল্লে—দেখিস্ অঘটনঘটন্-পটিয়সী, ঘটাসনি কিছু।

মিনতির কানে সব কথা ঢোকে না—শুধু নামটা যেন নিয়ন্ লাইটের মত তার মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করে জ্বলে আর নেভে, আর কান দুটো ভোঁ ভোঁ করে।

কি রকম আনমনা হয়ে উঠে পড়ে সে—

শিখা চেঁচিয়ে বলে—সেকী মিনুদি, চল্লে যে—না হয় গাছতলার গানই হবে—"কা, যা তরুবর পঞ্চ বি ডাল"

মিনু হেসে বল্লে—তুই যে এম্-এ ক্লাসে প্রাচীন চর্য্যাপদ পড়েছিস্ সে ত জানি, কিন্তু সত্যিই হামারি দুখের নাহি ওর, চলি অনেক কাজ—

কিন্তু জলসার কথা ভুলো না, গানটা প্র্যাকটিশ করো। সুরপতি তোমার হৃদি বৃন্দাবনে বাস না করে কণ্ঠেই করুন্, আমরাও জয়জয়ন্তী করি।

পুরাণো দিনের কথা ভাবতে মিনতির গায়ে যেন কাঁটা দেয়, সমস্ত শিরদাঁড়াটা যেন শির্ শির্ করে। নিজের জীবনের গত কয়েকটা বছরের কাহিনী সিনেমার ছবির মত কালোর প্রোফাইলে সাদার ব্যাকগ্রাউণ্ডে চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। অতি সামান্য মধ্যবিত্ত ঘরের শ্যামলা মেয়ে সে। পঞ্চকন্যার প্রথমজন। রূপের গর্ব্ব তার ছিলনা, রৌপ্যের ত নয়ই। বাপ ছিলেন নেহাতই দরিদ্র শিক্ষক। বি-এ পর্য্যন্ত কষ্টেসৃষ্টে কলেজে পড়ে প্রাইভেটে যখন বাংলায় এম্-এ দিলে তখন পাহাড়জঙ্গল পেরিয়ে বর্ম্মার সীমান্তে লেগে গেছে ঘোর যুদ্ধ। পালিয়ে আসছে দলে দলে লোকেরা, ভয়ে ভাবনায় আশঙ্কায় বাঙালী মাদ্রাজী হিন্দু মুসলমান্ জৈন খৃষ্টান্। তখন মিনতি ওরই কাছাকাছি এক ছোট্ট সহরের মেয়ে স্কুলে সবে সহকারী হেড-মিস্ট্রেসের চাকরী জোগাড় করেছে, থাকে বোর্ডিংএ, মেয়েদের সঙ্গে। একদিন রাত নয়টায়, মেয়েরা সব শুয়ে পড়েছে, সে ও আর দুজন শিক্ষয়িত্রী গল্পগুজব করছে। ঝিমঝিম্ করে বৃষ্টির অশ্রান্ত কলরবে মনের ভিতর একটা উদাস সুর গুমরে উঠছে—কী যেন পাওয়া গেল না—এমন সময় বোর্ডিংএর মালী এসে খবর দিলে—দিদিমণি, একজন মিলিটারী বাবু এসেছেন, বলছেন রাতটা যদি থাকতে দেন্ —ছোকরাবাবু মেয়েদের বোর্ডিংএ রাত কাটাবে বিনা পরিচয়ে, এরূপ একটা অসদৃশ ব্যাপারে বিশেষ বিচলিত হয়েই মালীকে বল্লে মিনতি—বাবুকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

মোটর সাইকেল সমেত এসে দাঁড়ালো যে—তাকে শুধু একজন সুপুরুষ স্মার্ট ইয়ংম্যান বল্লে কম বলা হয়, ফিটফাট্ ব্যাক্‌ব্রাশকরা একটি ২৬।২৭ বৎসরের ছেলে।

সবিনয়ের ভঙ্গীতে সে বল্লে—দেখুন্, আমি রেঙ্গুন্ থেকে রেফেউজি, সেখানে কলেজে লেকচারার ছিলাম, হাঁটাপথে ফিরেছি, নিজে জানি কি কষ্টের মধ্য দিয়েই এই সব হতভাগ্যদের আসতে হয়, তাই একটু সুস্থ হয়েই চলেছি তাদের যদি সুবিধা সাহায্য করতে পারি, এজন্য সাময়িক ভাবে মিলিটারীতে ঢুকেছি। পথে মোটর-সাইকেলটা বিগড়ে গেছে—এখানে ডাক্ বাংলাও নেই, তাই রাতের মত কোথাও যদি একটু আশ্রয় পাই—

রাতে সেইখানেই থেকে গিয়েছিলো লোকটি। তিনটি তরুণী শিক্ষিতা হলেও যে তার ভাব ভাষা, কথাবার্ত্তা, চটক্ চেহারা দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিল—সে কথা আজও মিনতির মনে আছে। লজ্জায় নাম জিজ্ঞাসা করতে পারেনি তারা। শুধু সে বলেছিল—নামে কি আসে যায়, আর মিলিটারীতে ঢুকলে নাম আর থাকে না, মানুষ হয় স্রেফ্ নাম্বার।

রাত্রে নিজের হাতে স্টোভ্ জেলে গরম লুচি ভেজে অতিথি সৎকার করেছিল, সে কথাও ভোলবার নয়। আর রাত দেড়টা পর্য্যন্ত গল্পগান চলেছিল। ছেলেটি নিজেই গেয়েছিল—কে জানিত আসবে তুমি গো এমন অনাহুতের

মত···। মিনতিকেও গাইয়ে ছেড়েছিল। মিনতির গলা ছিল চমৎকার। বৈষ্ণব বাপ ছিলেন রসজ্ঞ ব্যক্তি, পদ-কীর্ত্তনে ছিল নাম, শিক্ষা ও সাধনা। মিনতির শেখা তাঁরই কাছে। অত্যন্ত দরদ্ দিয়ে সেদিন মিনতি গেয়েছিল—"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।" অতিথি হেসে বলেছিল—শেষকালে মল্লারে জয়জয়ন্তী ধরলেন একতালায়, আমি হলে ধরতুম ললিত—ছোট দশকোষী, বিদ্যাপতি ঠাকুরেরই পদ গাইতুম—"আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইলু"।

গান আর এগোয়নি। কিন্তু সেদিনকার তরুণীর কান দুটো ঘোর লাল হয়ে উঠেছিল।

এক রাত্রির মধ্যেই সে জমিয়ে নিয়েছিল নিদারুণভাবে। কি রকমে বোমা বর্ষণের মধ্যে রেঙ্গুন্ থেকে সে বেরিয়েছিলো তার টুসিটারে, ইরাবতীর পথে, প্রোম মাগুালে হতভাগা ভারতীয়দের কি দুর্দ্দশা সে দেখে এসেছে, মাউণ্ট পোপায় কত বড় শঙ্খচূড় সাপের হাত হতে কি রকম ভাবে নিষ্কৃতি পায় সে—ঐ পাহাড়ের অধিপতি যক্ষ মহাগিরির মন্দিরে প্রতি রাত্রে বারোটার পর তার প্রেমাভিলাষিণী হয়ে ঐ দেশের বিদেহিনী রাণী আজও আসেন। পাঁচশো বছর ধরে প্রতি রাতে তিনি আসছেন, পাষাণের কাছে মাথা খুঁড়ছেন—প্রিয় তুমি একবার চেয়ে দেখো, কিন্তু সাড়া পায় না। মিনতি কেঁপে উঠেছিল। তার পরে কি রকম ভাবে মিটিলার জঙ্গলে বুনো হাতীর দলের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সে বেঁচে পৌচেছিল মান্দালয়। সেখান থেকে কত কষ্টে শৈবো লাল-রুবীর খনি পেরিয়ে ভামো মিচিনা হয়ে নাগা পর্ব্বতের ভেতর দিয়ে কত বিপদের সম্মুখীন হয়ে ভারতের মাটীতে পা দেয়, তার সুবিস্তৃত কাহিনী তিনটি নারী মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল। সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হয়েছিল মিনতি। সেদিন যদি তাদের স্বয়ম্বরা হবার সাধ ও সাধ্য থাকতো, তাহলে পঞ্চ নলের আসবার কোন দরকার হতো না—একটিতেই কাজ চলে যেতো।

পরের দিন ভোরে এই ক্ষণিকের অতিথিটিকে চা ঢেলে দেবার সময় সত্যই তার হাত কেঁপেছিল, গলাটা ধরে উঠেছিল, সে শুধু আস্তে আস্তে বলেছিল—

আপনিত কাজের মানুষ, ভুলে যাবেন নিশ্চয়ই—

সে আবেগের সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল—দেখুন, কবির ভাষায় বলতে গেলে পাকা করে আমি ভিত গাঁথিনি কোথাও, পথের ধারেই আমার বাসা, আমায় মনে রেখে লাভ নেই, আমি অতি অকিঞ্চন বহুরূপী, কেন দুঃখ পাবেন, তবে আমি মনে রাখবো এই রাতটির কথা, আর গানটির চরণ—'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'।

সে চলে যেতে মিনতির মনে হয়েছিল অনেক কিছু আলো, বাষ্প, তাপ চলে গেলো তার সাথে। সকালবেলার জবাকুসুমসঙ্কাশ আকাশের আলোক ঘোলাটে হয়ে উঠলো। তার পাবকস্পর্শ যেন পৌছল না।

কালের প্রলেপে ক্ষীণ হয়ে আসছিল সে স্মৃতি, কিন্তু ছমাস পরে হঠাৎ একদিন একটা বইএর পার্শ্বেল এলো মিনতির নামে—রবীন্দ্রনাথের "মহুয়া"। কে পাঠিয়েছে তার নাম নেই, শুধু গোটা গোটা অক্ষরে অতি সযত্নে লেখা "দেখতো চেয়ে আমায় তুমি চিনিতে পার কিনা"। বইটা উল্টে পাল্টে কোথায় আর কিছু লেখা দেখা গেলনা, শুধু এক কোণে 'অ' দিয়ে আরম্ভ একটি নাম যেন লেখা ছিল পেন্সিলে। অশেষ কি অবশেষ, আব্দুল কি আব্রাহাম তা বোঝা যায় না—তবে নামটি অতি সন্তর্পণে রবার দিয়ে উঠিয়ে ফেলার সযত্ন চেষ্টা রয়েছে। তারপর সেইদিন থেকেই এই আদ্য অক্ষরের সঙ্গে এক অপরিচিত অনাহূত অতিথির নামটা আর এই বইটা মিনতির মগ্ন চৈতন্যে মিশে গেছলো।

তেইশ বছরের তরুণীর সদ্য-জাগরিত মন নিয়ে ভাগ্যবিধাতা অনেক ভাঙাগড়ার খেলা খেলেছিলেন। কিন্তু চারিটি ছোট বোন, বিধবা মা, নাবালক্ ভাই, তাদের লেখাপড়া আহার আচ্ছাদনের কথা ভাবতে ভাবতে তার জাগ্রত চেতনায় আর মনে থাকতো না এই এক রাত্রির রোমান্সের কথা, জীবনচন্দের বৈচিত্র্য বা সুরলক্ষ্মীর স্নেহ-স্পর্শ সমস্ত স্নায়ুতে তন্ত্রীতে রক্তের ঝঙ্কার স্তিমিত হয়ে গিছলো—নেই নেই এই সুরে। গভীর প্রসুপ্ত রাতেও তার বিরাম ছিল না। চাল ডাল তেল নুন লকড়ির মোটা কথা ভাবতে ভাবতে আর ছাত্রীদের জিরাণ্ডিয়াল ইন্‌ফিনিটিভ মুখস্থ করাতে করাতেই তার মনের সব কটি তান্ বুঝি ঘুমিয়ে পড়তো। সেতারেতে কোন তারই বাঁধা হতো না। রামকেলী, ললিত, মনোহরসাই, মান্দারণী কেঁদে কেঁদে ফিরে যেতো।

এমনি করেই সুখে দুঃখে কোন রকমে কায়ক্লেশে কেটে যাচ্ছিল তাদের দিনগুলো। একজন তরুণী তেইশ পেরিয়ে চব্বিশে পড়লো, চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশ, তারপর ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ, উনত্রিশ, ত্রিশ—বিশ্ব বিধাতার বিধানে তাতে কি আসে যায়। বয়সের হিসাবে জৈব নিয়মের ইতিহাসে এটা একটা নতুন কিছু খবর নয়। জীবন দেবতার দেউলে এক একটি বছর এক একটি ব্যর্থ ব্যথার নিবেদন হয়ে জ্বলে ওঠে, কিন্তু দীপান্বিতা হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে শুধু সে চুপ করে বসে থাকতো বাইরের দিকে চেয়ে, উদাসী মন কি যেন এক অজানা ব্যথায় উদ্বেল হয়ে উঠতো, জমে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস বায়বীয় বাষ্পাপেক্ষা স্থূল আকারে নেমে পড়তো চোখের জলের বিন্দুতে। মৌনম্লান দিগন্তও মাঝে মাঝে সমব্যথায় সজল হয়ে উঠতো কাজলবরণ মেঘে। মনের এই গোপন চাঞ্চল্য রহস্যময় হয়ে তাকে উন্মন্ করে তুলতো। কিন্তু মন ত কারুর হাত ধরা নয়, নীতি বাক্যও সে মানেনা, উপদেশও কানে দেয় না।

তারপর কত ঘটনা ঘটলো। কত আশা আকাঙ্ক্ষা বেদনার ভারে করালী রাত্রির মুহূর্ত্তগুলি ভরে উঠলো, বিশ্রামের ক্ষণগুলি বিস্মৃতির অতলে ডুবে গেলো। বোনগুলি বড় হয়ে উঠলো লকলকে তেজী লতার মত। ভাই প্রশান্ত কলেজে ঢুকলো—ভারী শান্ত ছেলেটি—দিদি বলতে অজ্ঞান। সে নিজেও তখন দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজে চাকরী পেয়ে গেছে। মিনতি ভাবলে—এতদিনে বুঝি দায়িত্ব নামিয়ে একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে, নিরালায় ফিরে চাইতে পারবে সে নিজের দিকে। এমন সময় বেজে উঠলো আর এক বিষাণ—পালাও, পালাও। মানুষের অতি আদিম ও অকৃত্রিম প্রবৃত্তিগুলো উদ্দাম হয়ে রণনৃত্যে মাতলো—ঘর পুড়লো, বাড়ী পুড়লো, জীবন যৌবন ধন মান সবই কামনার করাল গ্রাসে ডুবলো। ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মানহারা মানবীর দল প্রেতিনীর মত পথে পথে। ঢেউ এসে লাগলো মিনতিদেরও। উন্মত্ত দুর্ব্বৃত্তরা একদিন নদী পেরিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করলে। মিনতির ভাই, আর তার দুজন বন্ধু বেরিয়ে পড়েছিলো লাঠি হাতে, তারা বলেছিল—দিদি, যে দেশের ধূলোয় মানুষ হলুম সেই দেশের ধূলোতেই মরবো, শিয়াল কুকুরের মত তাড়া খেয়ে পালাতে পারবো না।

মিনতি শুধু কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল—যাই করিস মার কথা একবার ভাবিস্ ভাই—

ফেরেনি কেউ তারা—সারা রাত চার বোন মাকে নিয়ে পাঁচটি অনাথা শুধু কেঁপেছিল। ভয়ে ভাবনায় চেঁচিয়ে কাঁদতেও পারেনি। ভোরের সময় মুখোস মুখে দলের অধিপতি যে ঢুকেছিল—তার হাতের দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল মিনতি। উল্কী-পরা হাতে আঁকা ছিল একটি অক্ষর, আর তাকে বেষ্টন করে উদ্যতফণা দংশনোদ্যত একটি সাপ। মনে হলো যেন একটি অতি-পরিচিত দৃপ্ত ভঙ্গী, একটা বেপরোয়া পারুষ্য। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মিনতি। তারাও নিঃশব্দে সরে পড়েছি। রাতের অন্ধকারে উচ্চবাচ্য না করে।

মা ও বোনেরা কেঁদে পাড়া মাত করেছিল। মহা-বরষার রাঙা জলে ভেসে গিয়েছিল মায়ের চোখের জল, বোনেদের কাতরতা।

কার পাপে, কতো দুঃখে, কার অনলোদ্গীরণ নিঃশ্বাসে ছারখার হয়ে পুড়ে গৃহস্থ ছাড়লো ঘর, স্বামী হারালো স্ত্রী, মা হারালো ছেলে, ভাই খুঁজে পেলে নাকো বোনকে। কার রোষে, কিসের দোষে এই লেলিহান অভিসম্পাত—এর প্রতিকার কোথায়? প্রতিবিধান কি? ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে পড়েছিলো মিনতি পথে নিঃশব্দে নীরবে। তারপর নোঙরবিহীন অত্যাচার হজম করে আজ আবার একটা চাকরী জোগাড় করে সে দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে, কিন্তু দূরে দিগন্তে মেঘের আনত ছায়া দেখলেই তার মনটা হুহু করে ওঠে। ওরি নীচে শুষ্কতৃণাঙ্কুরশ্যামল যে মৃত্তিকাময়ী ধরিত্রী, সেই ধাত্রীর কোলে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, ধ্যান করেছে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসছে তার স্বপ্নসম্ভব রাজপুত্র, যত কিছু ভালো, যত কিছু সুন্দর, যত কিছু মহান্ তার প্রতিমূর্ত্তি হয়ে।

কদিন পরে গাছতলার আসরে শোভাই কথাটা তুলেছিল—শুনিছিস্ কি কাণ্ড, কাগজে দেখলুম, শিয়ালদা ষ্টেশনে কতকগুলো বদ্‌লোক নাকি মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে যাবার বেশ জমাটী ব্যবসা ফেঁদেচে—

সেবা বল্লে—শুধু জেল নয়, মাটিতে পুঁতে চাবকাতে হয়—

মলিনা উত্তর দিলে—সত্যি, এদের নাকি সব গ্রামে-গ্রামে, জেলায় জেলায় দল আছে। ছলে, বলে, কৌশলে, ছদ্মবেশে এরা মেয়ে জোগাড় করে নানা উপায়ে—যুদ্ধের সময়ও নাকি মানুষ চালানী কারবার এরা করতো—

মিনতি শিউরে ওঠে—মানুষ এত ছোট হয়, এত নীচ, এত লোভাতুর হতে পারে।

শিখা বলে—মনে থাকে যেন কাল ড্রেস-রিহার্সাল। মিনুদি!

মিনতি আর একবার চমকে ওঠে—এই জলসার ব্যাপারটা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তার মনের ভিত্তিটাকে, সমস্ত সত্ত্বাটাকে নাড়া দেয়—এ কি দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসেছে!

জোর ড্রেস রিহার্সাল চলছে—সবাই ব্যস্ত। অশেষবাবু তখনও আসেন নি। মিনতি গান ধরেছে—"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর"। একমনে অতি দরদ দিয়ে সে গাইছে, চোখের কোণে জল। এমন সময় দূরে দরজার কাছে, যেন ছায়া পড়লো, কায়ার মায়ায় রূপ নিয়ে। গাইতে গাইতে তার মনে হলো যেন—আট বছর আগেকার এক বর্ষণমুখরিত রাত্রির একটা স্পষ্ট ছবি চোখের সামনে সে দেখতে পাচ্ছে। আরও দেখতে পাচ্ছে একটা অস্পষ্ট ছবি—যেদিন তার বাড়ী চড়াও করেছিল দুর্বৃত্তরা। দুটোর ভিতর কিছু সম্বন্ধ আছে কিনা দুর্বল মস্তিষ্কে বিচার করতে সে পারেনা। কিন্তু মনের সিস্‌মোগ্রাফে প্রচণ্ড দোলা খায়—ভূমিকম্পের আভাস। গানের তাল হঠাৎ কেটে যায়, আর একটা নতুন কলি যেন ভিতরে গুমরে গুমরে ওঠে অবরুদ্ধ কান্নায়—দেখতো চেয়ে আমায় তুমি চিনিতে পারো কি না।

শিখা বল্লে—এ কি মিনুদি—

পরের দিন জলসায় অশেষবাবুকে আর পাওয়া যায়নি। জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে তাকে চলে যেতে হয়েছিল অন্যত্র। শিখা প্রথমটা অত্যন্ত মুষড়ে গিছলো। মিনতিরও গলা ধরে যাওয়ায় সে প্রথমে গাইতে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত শিখাই তাকে জোর করে টেনে নিয়ে এসে বসিয়ে দেয় মাইকের কাছে। জয়জয়ন্তী জমেছিল চমৎকার—'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'। সবাই জয় জয় করেছিল।

রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

কুম্ভরাশি

আপনার জন্মরাশি যদি কুম্ভ হয়, অর্থাৎ চন্দ্র যে সময়ে কুম্ভ নক্ষত্রপুঞ্জে ছিলেন, সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হ'য়ে থাকে, তাহলে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনার প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তন্ময়তা ও একাগ্রতা। যখন যেভাব আপনার মনকে অধিকার করে, আপনি তাতে এমনি তন্ময় হ'য়ে যান যে, অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ আপনার থাকে না; এমন কি সে সময় অনেক গুরুতর ব্যাপারও আপনার নজর এড়িয়ে যায়। এজন্য যদি আপনাকে কেউ খেয়ালী বা বাতিকগ্রস্ত ব'লে মনে করে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

একটা নতুন কিছু অনুভব করার ইচ্ছা আপনার খুব বেশী, কাজেই যা কিছু মৌলিক বা অভিনবত্বার দিকে আপনি সহজেই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। আপনি চান বর্তমান জগতের চেয়ে বেশী অগ্রসর হ'তে, সবরকম প্রগতিমূলক ধারণার উপর আপনার একটু পক্ষপাত থাকা সম্ভব।

আপনার মনোভাবের মধ্যে একটা উদ্দামতা ও প্রচণ্ডতা আছে। যখন যে ব্যাপারে আপনি আকৃষ্ট হন, যখন যে কর্মধারা আপনি অনুসরণ করেন, সহস্র বাধা-বিঘ্ন ঠেলে আপনি জোরের সঙ্গে এগিয়ে চলেন। অনুরোধ, উপরোধ, অনুনয়, অনুযোগ, নিন্দা, অপবাদ কিছুতেই আপনাকে গন্তব্য পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে না। এই প্রবল একগুঁয়েমির দুটো দিক আছে—ঊর্দ্ধপথে চালিত হ'লে, যেমন আপনাকে অধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় অথবা সমাজ কি রাষ্ট্রের সংস্কারে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে; বিপথে চালিত হ'লে, তা তেমনি আপনাকে নাস্তিক, নীতিজ্ঞান-বর্জিত, সমাজদ্রোহী ও যথেচ্ছাচারী ক'রে তুলতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

যদিও আবেষ্টনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার শক্তি আপনার অসাধারণ এবং ইচ্ছা করলে আপনি যে কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন, তবু সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে স্থায়ীভাবে বদ্ধ থাকা আপনার কাছে অস্বস্তিকর ঠেকে।

আপনি অসামাজিক নন। অপরের সঙ্গ ও সহযোগিতা আপনি পছন্দ করেন। তাই যে কোন ক্লাব, এসোসিয়েশন, সংসদ-পরিষদ ইত্যাদিতে যোগ দেওয়া আপনার পক্ষে খুবই সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইবেন এবং মতের মিল না হ'লে সংঘ থেকে বেরিয়ে আসতে একটুও দ্বিধা করবেন না।

সব বিষয়ে আপনি সংস্কারের পক্ষপাতী। সমাজেই হোক, রাষ্ট্রেই হোক, আপনি চাইবেন কিছু অভিনবত্ব, কিছু অদল বদল। সুতরাং প্রগতিমূলক কোন আন্দোলনে সক্রিয়ভাবেও ঐকান্তিকতার সঙ্গে যোগ দেওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়।

জীবনের সকল ব্যাপারে আপনার কিছু না কিছু মৌলিকতা বা উদ্ভাবনী শক্তি প্রকাশ পেতে পারে। কল্পনা বা ভাবুকতা আপনার মধ্যে থাকলেও, শুধু তাই নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। পরিকল্পনাকে কার্যকরী আকার দিতে না পারলে আপনার তৃপ্তি হয় না।

আপনার প্রকৃতিতে উদারতা আছে এবং আপনার মধ্যে সহানুভূতিরও অভাব নেই, সেই জন্য বাহিরে থেকে অনেক সময় আপনাকে নির্বিরোধী এবং নিরীহ ভালমানুষ মনে হ'তে পারে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আপনার চরিত্রে দৃঢ়তা কম নেই। তা ছাড়া পর্যবেক্ষণ শক্তি আপনার বেশ পরিণত এবং অপরের চরিত্রের বিশেষত্ব আপনি চট্ করে বুঝতে পারেন। কাজেই লোকের সঙ্গে মিশে জন-প্রিয়তা অর্জন করা অথবা যে কোন ব্যাপারে হোক নেতৃত্ব গ্রহণ করা আপনার পক্ষে কঠিন হয় না।

নিজের মত বা পথের উপর প্রবল নিষ্ঠা থাকলেও আপনার মধ্যে গোঁড়ামি নেই এবং যে মুহূর্তে যুক্তি বা অভিজ্ঞতা দিয়ে নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারেন, সেই মুহূর্তেই পুরানোকে ছেড়ে নতুনকে গ্রহণ করতে আপনার মোটেই আটকায় না। কিন্তু এই পরিবর্তন এক এক সময় এমনি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত হয়, যে লোকে আপনাকে খামখেয়ালী কিম্বা অব্যবস্থিত-চিত্ত মনে করতে পারে।

আপনার মধ্যে অগ্রগামী বা পথ-প্রদর্শকের ভাব প্রবল। নিজের পথে শুধু নিজে অগ্রসর হ'য়েই আপনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন না। আপনি চান আপনার অগ্রগতির সঙ্গে আরও দশজন এগিয়ে চলুক। যাতে বহুজনের হিত বা আনন্দ আছে বলে আপনি মনে করেন, সেই ধরণের পরিকল্পনায় আপনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন।

আপনার প্রকৃতিতে বৈজ্ঞানিক-সুলভ মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। প্রত্যেক জিনিষ আপনি জানতে ও বুঝতে চান স্পষ্ট ও পরিষ্কার-ভাবে। যা নিজের অভিজ্ঞতায় অনুভব করেন নি বা যুক্তি দিয়ে বোঝেন নি—তার কোন মূল্য আপনার কাছে নেই। নতুন কোন ধারণা পেলে আপনি সহজেই তার দিকে আকৃষ্ট হন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বা যুক্তির কাছে সমর্থন না পেলে, তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতেও আপনার আটকায় না। সেই জন্য আপনার বিশ্বাস ও নিষ্ঠা খুব দৃঢ় হলেও, মূঢ় বিশ্বাস ও অবুঝ নিষ্ঠার স্থান আপনার মধ্যে নেই। স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং অভ্রান্ত যুক্তি আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি বলে, আপনার ভাব-ভঙ্গী ও চাল-চলনে অনেক সময় এমন একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়, যা সহজেই অপরকে প্রভাবিত করতে পারে।

আপনার মধ্যে আত্মাভিমানে আঘাত লাগলে আপনি হঠাৎ এমন কাজ ক'রে বসতে পারেন যাতে আপনার প্রতিষ্ঠাহানি বা গুরুতর ক্ষতি কিম্বা লোকনিন্দা হ'তে পারে। সে বিষয়ে একটু সংযত হওয়া প্রয়োজন।

আপনি সহজে রাগেন না, কিন্তু তেমনি হঠাৎ রেগে উঠলে আপনার আচরণে এমনি কাণ্ডজ্ঞানহীনতা প্রকাশ পায় যে লোকে অবাক হ'য়ে যায়। বিশেষতঃ আপনার প্রিয় বস্তুর উপর আক্রমণ আপনি মোটে সহ্য করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে আপনার ক্রোধের অভিব্যক্তি প্রায়ই সীমা অতিক্রম করে যায় এবং তখন অনাবশ্যক রূঢ় কঠোর ও নিষ্ঠুর হ'তে আপনি মোটেই কুণ্ঠিত হন না। শিক্ষা ও সংসর্গের দ্বারা মার্জিত হ'লে আপনার ক্রোধ কঠোর শ্লেষ বা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের আকার গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু সেখানেও অনেক সময় মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

শুধু ক্রোধের ব্যাপারেই নয় অন্য সকল অনুভূতির ব্যাপারেও আপনার মধ্যে সময়ে সময়ে একটা অস্বাভাবিক তীব্রতা ও বাড়াবাড়ির ভাব লক্ষিত হ'তে পারে; তা সংযত না করলে আপনাকে বিশেষ প্রতিকূলতা ও ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে যা আপনার কর্ম বা প্রতিষ্ঠার পক্ষে কম বেশী বাধার সৃষ্টি করবে।

আপনার মধ্যে স্বাধীনতা প্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে এবং আপনার স্বমতের বিরোধী কোন কিছুর সঙ্গে রফা করতে আপনি নারাজ। এই প্রকৃতির অপরিমিত অনুশীলনে আপনাকে অযথা প্রভুত্বপ্রিয় ও স্বৈরতান্ত্রিক ক'রে তুলতে পারে এবং আপনার বহু শত্রু সৃষ্টি করতে পারে, সুতরাং এ সম্বন্ধেও সংযম আবশ্যক।

শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাব আপনার উপর খুব বেশী। সৎশিক্ষায় ও সাধু সংসর্গে আপনার জীবনধারা যেমন উন্নত ও আদর্শস্থানীয় হ'তে পারে, তেমনি শিক্ষার অভাবে অথবা অসতের সাহচর্যে আপনি অবনতির নিম্ন-স্তরে নেমে যেতে পারেন এবং নানারকম অপরাধমূলক মনোভাব আপনার মধ্যে প্রকট হ'তে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজের সম্বন্ধে আপনি অতিরিক্ত সজাগ হ'য়ে চেষ্টা করলে যে কোন মুহূর্তে আপনি অধোগতির পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হ'তে পারেন।

আপনার মধ্যে অসাধারণত্বের বীজ আছে। আপনি যদি সংকীর্ণ আত্ম-কেন্দ্রিকতা ও ইন্দ্রিয়বশ্যতা পরিহার করতে পারেন, এবং আপনার শক্তি দশের হিত বা আনন্দের জন্য প্রয়োগ করতে পারেন তাহ'লে আপনার জীবন সফল ও সার্থক হ'য়ে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অর্থ ভাগ্য

সাধারণতঃ আর্থিক ব্যাপারে আপনি সৌভাগ্যশালী হবেন বটে—কিন্তু উপার্জনের সংস্রবে আপনার নানারকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। আপনার জীবনের অন্য সকল ব্যাপারের মত আর্থিক ব্যাপারেও একটা আকস্মিকতা

লক্ষিত হবে। আপনার যেমন এক সময়ে অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে উপার্জন বৃদ্ধি বা অর্থপ্রাপ্তি হ'তে পারে, আর এক সময়ে তেমনি সহসা ও বিচিত্রভাবে উপার্জন হ্রাস ও ক্ষতিও হ'তে পারে। যদিও নিজের গুণপণা, কৃতিত্ব ও পরিশ্রম দিয়ে আপনি উপার্জন করবেন, তবুও উপার্জনের ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধব, মুরুব্বি বা সহযোগীর তরফ থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। কোন সংসদ, পরিষদ বা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কিম্বা কোন ধনী মুরুব্বির কাছ থেকে দান, বৃত্তি অথবা পুরস্কার হিসাবে কোন রকম প্রাপ্তিও অসম্ভব নয়। পরিশ্রমের সঙ্গে আপনার উপার্জনের সব সময় সংগতি থাকবে না, কোন সময়ে হয়তো কঠোর পরিশ্রম ক'রেও আশানুরূপ উপার্জন হবে না, আবার আর এক সময়ে নামমাত্র পরিশ্রমে প্রভূত উপার্জন হবে। কোন অর্থকরী বিদ্যায় আপনার উপার্জন হওয়া সম্ভব। কোন আত্মীয়া বা অপর কোন স্ত্রীলোকের পক্ষ থেকে আপনার কিছু প্রাপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু চন্দ্র যদি পাপপীড়িত হয়, তাহ'লে আত্মীয়া বা অন্য স্ত্রীলোকের দ্বারা ক্ষতি হওয়াই সম্ভব। আপনার আর্থিক ব্যাপার সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং তা প্রকাশ্য সমালোচনার বিষয় হওয়াও অসম্ভব নয়। আপনি চেষ্টা করলে সঞ্চয় করতে পারেন বটে, কিন্তু সঞ্চয় হ'লেও কোন অদ্ভুত খেয়ালের বশে বা ঝোঁকের মাথায় অকস্মাৎ বহু অর্থ নষ্ট করাও আপনার পক্ষে খুবই সম্ভব। এ বিষয়ে যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে পারেন, তাহ'লে আপনার যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কর্ম জীবন

নানারকম কাজের যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে। আপনি সাধারণত সেই সব কাজ পছন্দ করেন যাতে কোন না কোন ধরণের প্রয়োগ-কুশলতা আবশ্যক হয়। যে সব কাজে কম-বেশী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে হয় এবং যাতে মৌলিকতার অবসর আছে, তার দিকে আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে। সব রকম পরিকল্পনার কাজে আপনার কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। ব্যবহারিক বিজ্ঞান বা শিল্প কলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজে আপনি যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন। একদিকে যেমন রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, যন্ত্র-শিল্প প্রভৃতির কাজে আপনি প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন অপরদিকে তেমনি কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য-কলা ইত্যাদির মধ্য দিয়েও খ্যাতি বা প্রশংসা অর্জন করতে পারেন। আপনার কাজের ধারা এমন হওয়া চাই—যাতে কিছু না কিছু নতুনত্ব আছে এবং যাতে প্রায়ই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বা বুদ্ধি কৌশলের পরিচয় দিতে হয়। গতানুগতিক পথে একঘেয়ে কাজ আপনার পক্ষে বিরক্তিকর। আপনি এমন স্থানে ও এমন ভাবে কাজ করতে চান যাতে পাঁচ জনের প্রশংসমান দৃষ্টি আপনার উপর পড়ে, তা নইলে আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির পূর্ণ স্ফুরণ হয় না। সেই জন্য একলা কাজ করার চেয়ে বহু সহযোগী নিয়ে কাজ করা আপনি পছন্দ করেন বেশী। যে সব কাজে নানা রকম সমস্যার সমাধান বা রহস্যের উচ্ছেদ করতে হয়—সে সব কাজেও আপনি কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন। আপনার মধ্যে নাটকীয় বোধ খুব পরিণত বলে আপনার কাজের মধ্যেও একটা নাটকীয় ধারা খোঁজেন।

আপনি নাট্যকার, অভিনেতা, নৃত্য শিল্পী, নাট্য-পরিচালক বা প্রযোজক ইত্যাদির যে কোন কাজে যেমন খ্যাতিলাভ করতে পারেন তেমনি অস্ত্র-চিকিৎসা, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, সৈন্য-পরিচালনা, উৎপাদন শিল্পের সংশ্রবে পরিকল্পনামূলক কাজ, ডিটেকটিভের কাজ ইত্যাদির মধ্য দিয়েও প্রতিষ্ঠা পেতে পারেন।

কর্মের ব্যাপারে আপনার জীবনে অনেক উঠাপড়া চলবে। এক কর্ম করতে করতে সহসা কর্ম পরিবর্তন করা আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়, তা সে ইচ্ছা করেই হোক বা বাধ্য হ'য়েই হোক্। কর্ম-ক্ষেত্রে আপনি যেমন অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু বা মুরুব্বি পাবেন, তেমনি আপনার বহু প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুও থাকবে—যারা আপনার প্রতিষ্ঠাহানির চেষ্টা করবে। অনেক সময় আপনার খামখেয়াল বা অযথা প্রভুত্বপ্রিয়তা কর্ম-বিপর্যয় বা সম্ভ্রমহানির কারণ হ'য়ে দাঁড়াতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। এ বিষয়ে একটু সংযত হ'তে পারলে কর্মের মধ্য দিয়ে আপনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পাবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পারিবারিক

আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আপনার মোটের উপর সদ্ভাব থাকবে এবং কোন কোন আত্মীয়ের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা বা ঘনিষ্ঠতাও হ'তে পারে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের জন্য আপনাকে কম বেশী ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি ভোগ করতে হবে। অনেক সময় আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সহসা ও অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ হবে।

পারিবারিক ব্যাপারে আপনার সহসা এমন কিছু ঘটতে পারে যা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা প্রয়োজন। অথবা এও হ'তে পারে যে, আপনি এমন কোন গুপ্ত ব্যাপারে জড়িত হ'য়ে পড়বেন যাতে পরিবারের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হ'তে হবে। অনেক সময় আপনি ইচ্ছা ক'রেই পারিবারিক আবেষ্টন থেকে দূরে থাকবেন।

আপনার পিতার অথবা মাতার অকস্মাৎ রহস্যজনক মৃত্যু হ'তে পারে এবং তাতে করে গৃহস্থালীর ব্যাপারে একটা ওলট হ'য়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

আপনার সন্তানভাগ্য বিচিত্র। আপনার মোটেই কোন সন্তান না হ'তে পারে এবং অপরের কোন শিশুকে আপনি পোষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন। যদি আপনার নিজের সন্তানাদি হয় তাহ'লে তাদের সঙ্গে মতান্তর বা বিচ্ছেদ হ'তে পারে। সন্তানের বা তৎস্থানীয়ের জন্য কোন রকম বিবাদ বিসম্বাদ বা অপবাদও হ'তে পারে।

স্নেহপ্রীতির ব্যাপারে আপনার মধ্যে ঐকান্তিকতা ও গভীরতা আছে। আপনি যাকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, তার কাছে নিজেকে একান্তভাবে দান করেন। কিন্তু তবুও প্রীতির পাত্রের সঙ্গে সহসা বিচ্ছেদ হ'তে পারে। স্নেহ প্রীতির সংশ্রবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিবাদ-বিসম্বাদ বা লোকনিন্দার আশঙ্কা আছে।

বিবাহ

বিবাহ ও দাম্পত্য ব্যাপারের সংশ্রবে আপনার জীবনে কোন না কোন রকম বিচিত্র ঘটনা ঘটতে পারে। এ সম্বন্ধে আপনার মনে এমন

একটা ধারণা থাকা সম্ভব যা সাধারণ লোকের অদ্ভুত ঠেকে। অন্য সকল ব্যাপারের মত দাম্পত্য জীবনেও আপনি কিছু না কিছু অভিনবত্ব চান, কাজেই আপনার দাম্পত্যজীবন সব সময়ে ঠিক সোজা পথে চলবে না। আপনার যেমন সহসা বিবাহ হ'তে পারে, তেমনি সহসা বিবাহ বিচ্ছেদও অসম্ভব নয়। কিন্তু আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার ভাব জেগে ওঠে তাহ'লে আপনার দাম্পত্য জীবন বিশেষ সফল ও সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে। ভালই হোক আর মন্দই হোক আপনার দাম্পত্য জীবনে কিছু না কিছু অসাধারণত্ব থাকবেই এবং কোষ্ঠীতে যদি একটুও বিরুদ্ধ যোগ থাকে, তাহ'লে দাম্পত্য জীবনে সহসা গুরুতর বিপর্যয় হবেই। কোন রোমান্টিক অথবা গুপ্তপ্রেমের ব্যাপারে আপনার দাম্পত্য জীবনে অশান্তি নিয়ে আসতে পারে অথবা এও সম্ভব যে কোন রোমান্টিক অথবা গুপ্তপ্রেম শেষে বিবাহ বন্ধনে পরিণত হ'ল। আপনার খামখেয়াল অথবা অতিরিক্ত প্রভুত্বপ্রিয়তা আপনার দাম্পত্য অশান্তির কারণ হ'তে পারে। আপনার যদি এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হয় যাঁর জন্মমাস আষাঢ় ভাদ্র কার্তিক অথবা ফাল্গুন কিম্বা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের একাদশী কিম্বা কৃষ্ণ পক্ষের পঞ্চমী তাহ'লে দাম্পত্যজীবন সুখকর হ'তে পারে।

বন্ধুত্ব

আপনার পরিচিতি বিস্তৃত হওয়াই সম্ভব। আপনি নিজে সঙ্গপ্রিয় এবং যার সঙ্গে মতের মিল হয় সহজেই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে পারেন। আপনার নানাশ্রেণীর লোকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হ'তে পারে। একদিকে যেমন ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাজে আপনার অবাধ গতিবিধি থাকতে পারে অপরদিকে তেমনি সাধারণ ব্যক্তিদের সঙ্গেও আপনি যথেষ্ট মেলামেশা করতে পারেন। আইন-ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, রাজনীতিজ্ঞ এবং বিদেশী ধনশালী ব্যক্তিদের মধ্যে আপনার দু'চার জন হিতকামী বন্ধু থাকবেন, যাঁদের কাছ থেকে আপনি নানারকমে সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সহযোগী, সহকারী অথবা অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কারো কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'তে পারে। কিন্তু অন্য সব ব্যাপারের মত বন্ধুত্বের ব্যাপারেও আপনার কম-বেশী পরিবর্তনশীলতা লক্ষিত হবে। অনেক সময় সহসা ও অতর্কিতভাবে বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটবে, এবং কোন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সহসা উদাসীনতা এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতায় রূপান্তরিত হওয়াও বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ প্রতিষ্ঠাশালী ও উচ্চপদস্থ বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকাশ্য শত্রু হ'য়ে উঠে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে। সরকার-পক্ষীয় কোন কোন পদস্থ ব্যক্তিও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আপনার বিপদ বা সম্ভ্রমহানির কারণ হ'তে পারে। তবুও বন্ধুমহলে আপনার যথেষ্ট খাতির থাকবে এবং অনুচর পরিচরের সংখ্যা মোটের উপর কম হবে না। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব তাঁদের সঙ্গে, যাঁদের জন্মমাস আষাঢ়, কার্তিক অথবা ফাল্গুন এবং যাঁদের জন্মতিথি শুক্লপক্ষের একাদশী কিম্বা কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী।

স্বাস্থ্য

অন্যান্য ব্যাপারের মত আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও কম-বেশী বৈচিত্র্য লক্ষিত হবে। কিসে যে আপনার দেহ ভাল থাকে এবং কিসে যে খারাপ হয়, তা কেউ সহজে বুঝতে পারবে না। অনেক সময় হয়ত গুরুতর পরিশ্রম, অত্যাচার, অনিয়ম, অবহেলা প্রভৃতি কিছুতেই আপনার স্বাস্থ্যকে টলাতে পারবে না, আবার এক সময়ে সব রকম স্বাস্থ্যবিধি নিখুঁতভাবে মেনে চললেও দেহ বিকল হ'য়ে উঠবে। আপনার অস্বাস্থ্যের কারণ ও নিদান অনেক সময় সাধারণ চিকিৎসকের দ্বারা ঠিক করা সম্ভব হবে না। আপনার স্বাস্থ্য নির্ভর করবে—ততটা দৈহিক পরিবেশের উপর নয় যতটা মনের ও নাড়ীমণ্ডলের অবস্থার উপর। আপনার মধ্যে দৈহিকের চেয়ে মানসিক জীবনীশক্তি বেশী প্রবল। আপনি চেষ্টা করলে অনেক সময় শুধু মানসিক ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেই দেহকে ব্যাধিমুক্ত করতে পারবেন। আপনার মধ্যে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত ও নাড়ীমণ্ডলের ব্যাধির প্রবণতা আছে এবং কোন রকম মনোকষ্ট বা শোক আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণ হ'তে পারে। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনাতেও দেহ-কষ্ট অসম্ভব নয়।

আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য একান্ত আবশ্যক। বেশী তীব্র ঔষধ আপনার ব্যবহার না করাই ভাল—কেন-না ঔষধের বিষক্রিয়া আপনার ব্যাধির জটিলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। স্বাস্থ্য ভাল রাখতে হ'লে আপনার মনকে কোন না কোন কাজে ব্যাপৃত রাখা প্রয়োজন। অলস কর্মহীন জীবন আপনার সুস্বাস্থ্যের একটা মস্ত অন্তরায়। আহার বিহারেই হোক, কাজ কর্মেই হোক, এক-ঘেয়েমি আপনার পক্ষে পীড়াদায়ক। নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে পেতে হ'লে ঔষধের চেয়ে আবেষ্টন ও পথ্যের পরিবর্তন আপনার কাজ করবে বেশী।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার ছোট বড় অনেক ভ্রমণ হ'তে পারে। ভ্রমণের ব্যাপারেও আপনার কম বেশী বৈচিত্র্য থাকবে। অনেক সময় ঝোঁকের মাথায় বা খেয়ালের বশে অকস্মাৎ স্থান পরিবর্তন করবেন, আবার অনেক সময় ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হ'য়ে ভ্রমণ করতে হবে। কোন সভা সমিতির সংশ্রবে কিম্বা বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ অসম্ভব নয়। আপনার দূর তীর্থাদি দর্শন বা সমুদ্র যাত্রাও হ'তে পারে।

ধর্ম জীবনের সংশ্রবেও আপনার নানারকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হবে। সাধারণতঃ প্রচলিত ধর্ম মত বা রীতি নীতি আপনি মানতে চাইবেন না, যাতে করে লোকে আপনাকে ধর্মদ্বেষী বা নাস্তিক ব'লে মনে করতে পারে। অনেক সময় প্রচলিত ধর্মকে ভেঙে গ'ড়ে নতুনরূপ দিতে চাইবেন। ধর্মের সাধারণ অনুষ্ঠানের চেয়ে তার গূঢ় ও রহস্যময় দিকটা আপনাকে আকর্ষণ করে বেশী এবং সব রহস্যময় বিদ্যা যেমন ফলিত-জ্যোতিষ, হঠযোগ, সম্মোহন, ভৌতিক চক্রানুষ্ঠান ইত্যাদির দিকেও আপনার কম-বেশী ঝোঁক থাকতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত গুরু না পেয়ে এ সকল গুপ্ত সাধনা করতে গেলে আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে, বিশেষতঃ

হঠযোগ, সম্মোহন, ভৌতিক চক্র ইত্যাদি করতে গিয়ে ইন্দ্রিয়-বৈকল্য, বায়ু রোগ, স্নায়ু শূল ইত্যাদি ব্যাধির উৎপত্তি হ'তে পারে সে সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক। কিন্তু, উপযুক্ত গুরু পেলে ঐ সকল সাধনায় আপনি যথেষ্ট উন্নতি করতে পারবেন।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ২, ১৪, ২৬, ৩৮, ৫০, এই সকল বর্ষগুলিতে নিজের অথবা পরিবারস্থ কারো সংশ্রবে কোন রকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে। ৮, ১১, ২০, ২৩, ৩২, ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৫৬, ৫৯ এই বর্ষগুলিতে কোন উল্লেখযোগ্য আনন্দলাভ সম্ভব।

রঙ

ছাই রঙ, সব রকমের বিচিত্র বা পাঁচমিশালী রঙ, ছিট, চেক (Checks) হুপ (hoops) ইত্যাদি এবং পরিবর্তনশীল রঙ (যেমন ময়ূরকণ্ঠ) আপনার প্রীতিজনক ও ভাগ্যবর্ধক। দেহ মনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু মেটে লাল রঙ বা মধুপিঙ্গল রঙ ব্যবহার করতে পারেন।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযোগী রত্ন ধূম্রক্ষেত্র বৈদূর্য (Cats eye) ওপ্যাল (Opal) হীরা প্রভৃতি। অসুস্থ অবস্থায় গোমেদ বা প্রবাল ধারণ করতে পারেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন তাদের মধ্যে কয়েকের নাম—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম হংস, স্বামী সারদানন্দ, কবি শেলী, কবি গেটে, নাট্যকার উইলসন ব্যারেট বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, মাদাম কুরী, শার্লোট বর্ট, সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড, শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডিউক অফ ওয়েলিংটন, অভিনেত্রী মিস বিনোদিনী, চিত্রতারকা শ্রীমতী সাধনা বসু, সাহিত্যিক ও প্রযোজক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

চারটি মুস্লিম রাষ্ট্রে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

এবার পূজার ছুটিতে চারটি মুসলমানী শহরে অতি অল্প কালের জন্য নামতে হ'য়েছিল। দুবার করাচী, দুবার কায়রো, একবার বাসরা আর একবার বেহরিন।

একদিন করাচী ছিল আমাদেরই দেশের এক বন্দর। তিন বছরে তার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আজ করাচী পাকিস্তানের রাজধানী। সুতরাং তার লোকসংখ্যা বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং সেজন্যই বহু ভাষাভাষী। মুলতানী নিজের সমাজে মুলতানী কয়। মুলতানী ভাষা সিন্ধী এবং পাঞ্জাবী হ'তে বিভিন্ন—অথচ উভয় ভাষার মিশ্রণে তার গঠন। এ দুটি ভাষাই সংস্কৃত হ'তে উদ্ভূত। তাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে বহু শব্দ, বিশেষ বিশেষ্য শব্দ বোঝা যায়। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কাচ্ছী এবং অতি অল্প পরিমাণে বাংলা শোনা যায় এ শহরে। তা ছাড়া শোনা যায় বেলুচী—সে ভাষা পাখতুনের সঙ্গে মুলতানী মেশানো। কারণ কোয়েটার হিন্দুদের মধ্যে মুলতানী চলে, বেলুচী মুসলমান বেলুচ ভাষায় কথা বলে।

ভাষার বিভ্রাট হতে পাকিস্থান মুক্তি পায়নি। ও-দেশের মানুষ মাত্রে নবীন দেশপ্রিয়তার ফলে উর্দুকে মাতৃ-ভাষা বলে এবং ঐ ভাষা বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষ নিজ গৃহে আপন আপন মাতৃ-ভাষা ত্যাগ করতে পারেনি। পাকিস্থানী জীবনের এ সমস্যায় দৃষ্টি পড়ে ভারতবাসীর, কারণ তার চিত্তে এই ভাষা-বৈচিত্র্য দুঃস্বপ্নের স্রষ্টা। পাকিস্থান হিন্দুস্থান অপেক্ষা আয়তনে কত ক্ষুদ্র তা সবাই জানে। এর মধ্যে এত ভাষা সাধারণতঃ মানুষের একজাতিত্বে ঘনিষ্টভাবে মেশার অন্তরায় হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে পাকীস্তানের প্রত্যেক মুস্লিম অধিবাসীর স্বদেশপ্রেম গভীর এবং তীক্ষ্ণ। সবাই যত্ন করে উর্দু শিখতে। তার যত দোষ থাক, আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে পাকীস্থানীর স্বদেশপ্রেম আমার দেশের অধিবাসীর পক্ষে অনুকরণীয়। মানুষ মাত্রেই নিজের কথা, নিজের স্বার্থ, নিজের তুচ্ছ বা বড় ব্যক্তিত্বের ভাবনা প্রথম ভাবে। কিন্তু যে দেশের লোকের সকল ভাবনা আপনাকে ঘিরে, দেশকে ঘিরে নয়, সে দেশের ভাবী-কালের কালো রূপ কল্পনা করতে কবিত্বের বা বদ্-খেয়ালের আবশ্যক হয় না।

আকাশ-রথ হ'তে নেমে পরীক্ষা দিতে, পাশ-পোর্ট দেখাতে যে ঘরে প্রথম অপেক্ষা করতে হয়, সেথায় কোয়াদে আজিম জিন্না সাহেবের বড় ছবি। জিন্নার নামে অভিভূত হয়না এমন মুস্লিম পাকীস্তানে নাই। কিন্তু সকল হিন্দু কি মহাত্মার নামে—যাক্ সে পাপ কথা।

ছাড়-পত্র, ডাক্তারের সার্টিফিকেট প্রভৃতি পরীক্ষার পর হাওয়াই আড্ডার বাহিরে গেলাম। আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে অভ্যর্থনা করবার জন্য যারা বাহিরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, তারা আমাদের প্রতি যে দৃষ্টি দিল, তার অর্থ সরল—এখানে কেন? ভারতীয় হিন্দু ছিলাম মাত্র দুজন। ফেরবার সময় মাত্র আমি। প্রত্যাবর্তনের সময় একদলকে দেখলাম মালা হাতে দাড়িয়ে আছে—আগাখানি মুসলমান। আমি অতি বিনীতভাবে একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—কিনকী ইন্তিজারীমে জনাব খাড়ে হায়।

অম্লান বদনে লোকটি বল্লে—আপসে কুছ তাল্লুক নেহি।

তার চেলার দল বিদ্রূপ করে হাসলে। একজন অন্যকে বল্লে—কলকাত্তিয়া হিন্দু।

আমি আর একবার চেষ্টা করলাম।

"বড়ে সখসকো দেখ লেতে থে জনাব।"

মালাধর উত্তর দিল না। একজন বল্লে—যাইয়ে।

আমি বাহিরে গেলাম। ভাবলাম, ভাগবটোরার পরও আমাদের উভয় দেশের লোকের মধ্যে সম্প্রীতি নাই কেন? কিন্তু এ কেবল উত্তরের পরিধি বহু যোজন-বিস্তৃত।

বিরোধিতা বা উপেক্ষার একটা কারণ অন্ততঃ স্পষ্ট। যেখানে হিন্দুস্থানী পাকীস্থানীর রুচির, স্বদেশের বা অনুষ্ঠানের প্রতি কটাক্ষপাত বা বিদ্রূপ সে ক্ষেত্রে সহজ ভদ্রতা ঝড়ের মুখের তরীর মত সৌজন্যের বাঁধন ছিঁড়ে ভেসে যায়। কিন্তু নব-গঠিত রাষ্ট্রের একদলের দুর্বলচিত্তে সদাই আশঙ্কা বিদ্যমান—হিন্দু পাকীস্তানকে চায় না। বাহিরের লোকের প্রতি সন্দেহ হয় না। কিন্তু জ্ঞাতি-শত্রু যখন পাশের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করে—তোমাদের আজ কি রান্না হ'ল গো—তখন ফৌজদারী আদালতের উকীল মোক্তারের প্রতি মা কমলার কৃপাদৃষ্টি পড়ে। বিলাতে একটি মুসলমান ছাত্রকে আমার এক বন্ধু হিন্দু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি কি ভারতীয়? সে ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলেছিল—ড্যাম্‌ন্‌ড্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে আমার কোনো সংস্রব নাই। আমি পাকীস্তানী। এর কারণ সহজে অনুমেয়। তরুণ ভেবেছিল যে ভদ্রলোক পাকীস্তানকে অস্বীকার করছেন তার প্রাচীন পৈতৃক পরিচয়ে। নতুনকে না মানলে নবীন রুষ্ট হয়।

আমি আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেখানে মানুষ বোঝে প্রশ্ন দরদী প্রাণের, যেথায় সে মনুষ্যত্বের সাধারণ নীতি মানে। করাচী হোটেলে আমি বেলুচী পরিবেশক দেখেছি যাবার সময়। তাদের মিষ্ট কথা বলার ফলে আমাকে একটু গুরু ভোজন করতে হয়েছিল। ফেরবার সময় দুটি 'বয়কে' জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা পাকীস্থানের কোন প্রদেশের। তারা বল্লে—হুজুর হামলোক হিন্দুস্থানী। লক্ষ্ণৌকা। তখন লক্ষ্ণৌর সুখ্যাতি করলাম, দেশের কথা বললাম, ফলে গুরু ভোজন, উদর-খোরাসে-খাইয়ের উৎপীড়ন। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে পূর্ব পাকীস্তানের কেহ আছে? শুনলাম প্রধান বাবর্চি পূর্ব বঙ্গের। তারা তাকে ডেকে দিলে। বেচারা মাতৃ-ভাষায় কথা বোলে তৃপ্ত হ'ল। সে কলিকাতায় কাজ করত। অনেক কথা হ'ল—আন্তরিকতার অভাব রইল না।

আমি এ বিষয় এতো বিশদভাবে বলছি একটা কারণে। আমাদের আগেকার দিনের হিন্দু মুসলমানের অসম্প্রীতির একটা ক্ষুদ্র কারণ ছিল, পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধার শব্দ ব্যবহার। ইংরাজ প্রভু নানা উপায়ে দু-পক্ষকে পরস্পরের নিকট হতে সরিয়ে রাখবার জন্য বিধিমতে (?) চেষ্টা করছিল। তার ফলে "নেড়ে" "কাফের" প্রভৃতি ছোট কথাগুলা বড় কারণ হয়ে দাড়ালো বাঁধন দড়ি কাটবার। বঙ্কিমচন্দ্রের যবন কথা মুসলমানকে কি ক'রে অবমানিত করলে, আমি ভেবে পাইনি। কারণ যবন মানে প্রথমে ছিল গ্রীক, তার পর আরব প্রভৃতি। একদিকে মুসলমান নিজের পরিচয় দিতে শিখলে আরবের সন্তান, অন্য দিকে হিন্দুর মুখে যবন শুনে গেল বিগড়ে। সুতরাং আজও আমাদের উচিত নয় এমন কথা বলা, যার ফলে পরস্পরের ক্ষতস্থলে আঘাত লাগে।

কিন্তু অন্য দেশের মুসলমান তো আমাদের জাত-শত্রু ভাবে না। বিলাত যাবার কালে করাচী হ'তে বাসরা গেলাম। ইরাকে সাটেল আরবের ধারে এক হোটেলে চা খেতে গেলাম। হোটেলের বাগানে চারিদিকে নানা

রঙের বিজলী বাতির বেড়া। বাহিরে স্থানে স্থানে জোট-বাঁধা খেজুর গাছ—প্রসিদ্ধ নদী সাটেল আরব, ষাট মাইল দূরস্থিত পারস্য উপসাগরের পানে ছুটছে। সূর্য্য অস্তাচলগামী। বাগানে গোলাপের ঝোঁপ। এক দিকে প্রকাণ্ড একটা দোলা। আমি এবং আমার সহ-যাত্রী ডাঃ ত্রিবেদী একটা টেবিলে বসলাম। বাকী ছিল দু'খানা চৌকী। দুটি ইরাকী ভদ্রলোক এসে তথায় বসলেন।

বহুদিনের বহু ঐতিহাসিক স্মৃতির উদ্রেক করে সহর বাসরা। কলিকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অতি অল্প ফারসী শিখেছি। ভাবলাম নিউকাসেলে কয়লা নিয়ে যাই—এদের ওপর ফারসী নিক্ষেপ করি। একটু মুচকে হেসে বল্লাম—গুলসা খবসুরত অস্ত। সাটেল আরব কুজা অস্ত।

আমা অপেক্ষা মোলায়েম হেসে পরিষ্কার ইংরাজিতে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—আপনি ইরাণি বলছেন? আমরা ও ভাষা বুঝি না। আমাদের ভাষা আরবী।

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লাম—আমি আরবী জানি না।

দ্বিতীয় ভদ্রলোক বল্লেন—আমরাও হিন্দী জানি না। সুতরাং দুর্ভাগ্যক্রমে বিদেশী ইংরাজের ভাষায় হিন্দু ভায়ের সঙ্গে কথা কইতে হবে।

তারপর তারা অতি শ্রদ্ধা-ভরে কহিল—মহাত্মাজীর কথা। এসিয়ার মধ্যে আজ পণ্ডিতজী যে একজন প্রধান নেতা সে মত তারা আন্তরিক ভাবে ব্যক্ত করলে। একজন দুঃখ করলে যে বাঙালীর মধ্যে আরবী-জানা লোক যখন আছে, তখন টেগোরের কবিতা কেন তাদের ভাষায় অনুদিত হয়নি। আমি তাকে বল্লাম না যে আমি মাত্র একটি ভদ্রলোককে জানি যিনি বাঙলা হতে আরবী ভাষায় কবিতা অনুবাদ করবার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ বলে পরিচয় দিতেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াবার কার্য্যে সকল শক্তি নিয়োগ করেছিলেন জীবনের সন্ধ্যা-বেলা। সে বিষ রবীন্দ্র-কাব্যকে নিহত করেছে তাঁর মেধায়।

কায়রোতেও হিন্দু-বিদ্বেষের কোনো নিদর্শন নাই। বহরীণ দ্বীপে, আসল আরবী-পোষাক-পরিহিত—খোয়, ইমামা পাগড়ি কয়েকটি ভদ্রলোক আমার মুখে ভারতবর্ষের অবস্থা, মহাত্মাজির বিবরণ, পণ্ডিত নেহেরুর কথা শোনবার ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিল। সেদিন দেওয়ালী। একজন ভদ্রলোক সিন্ধী ব্যবসায়ীদের দোকানে আলোকমালা দেখিয়ে দেওয়ালী উৎসবের প্রশংসা করলেন।

এক ভদ্রলোক বল্লেন—আজ বহরীণের প্রবাসী হিন্দুরা আমাদের গায়ে গোলাপজল দেয়, আমরা মোবারক করি।

মানুষের মনের গভীরে কি ভাব লুকানো থাকে তা বোঝা অতীব কঠিন ব্যাপার। স্বল্পকাল মাত্র কয়েকটি লোকের সাথে উড়ো বাক্যালাপ ক'রে উড়ো জাহাজের যাত্রীর পক্ষে কোনো জাতির মনোভাব বোঝবার দাবী ধৃষ্টতা, বাতুলতা এবং নিছক্ বোকামী। আমি আমার স্বল্প অভিজ্ঞতার কথা বলছি। তার ফলে অন্ততঃ আমার মনে এই ধারণা হয়েছিল যে আরব, মিশর এবং ইরাক ক্ষণিকের হিন্দু যাত্রীকে "আনডিজায়ারেবল" ভাবে না, এ-কথা বলা যায়। অন্যের মুখেও শুনেছি যে মহাত্মা গান্ধী, ঠাকুর, পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি নামগুলায় ওদেশের ভদ্রলোকদের নাসিকার অগ্রভাগ কুঞ্চিত হয়না।

করাচী পুষ্ট হয়েছে পাকীস্তান রাষ্ট্র গঠনের পর—জনসংখ্যায়, অট্টালিকা শোভায় এবং নূতন পথের সম্পদে। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে আকাশ-রথ সহরের ওপর ঘোরে। সেই চক্র-ভ্রমণের ফলে সমস্ত সহরের রচনা-কৌশল বেশ বোঝা যায়। সহর সমৃদ্ধ পুরাণো। সহরের বাহিরে বড় বড় সোজা রাস্তা। বেশ খালি জমি ঘেরা অট্টালিকা। কালে গাছ বড় হ'লে সহরের সৌন্দর্য্য আরও বাড়বে। নতুন বড় বাড়ির মধ্যে জনসভা এবং গবর্ণর জেনেরালের বাড়ি খুব উচ্চ এবং বড়। কিন্তু নবীন ইস্‌লামী রাষ্ট্রে অট্টালিকা কেন অতি পাশ্চাত্যের রূপে সোজা উঠেছে? আমাদের কলিকাতার কারবারী মহল বহু অট্টালিকা সম্পদে সম্পন্ন। কিন্তু নতুন বাড়িগুলি অতি প্রকাণ্ড প্যাকিং বাক্সের মত, কারণ তারা অতি আধুনিক।

প্রাচ্যে গৃহ নির্মাণের একটা ধারা ছিল, তাকে নবীন যুগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। মানুষ নতুনত্ব চায়। অনুকরণে সমাজের তথা শিল্পের অভিব্যক্তি। তাই এ যুগের ধনী আমেরিকার অনুকরণ প্রাচ্যের গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিয়েছে। অবশ্য পূর্ব-দিনে শিল্প পুষ্টিলাভ করত ধর্মকে ঘিরে। দেবদেবীর মন্দির, ভগবান, আল্লা, গডের প্রার্থনা-গৃহ মানুষের জগতকে সৃষ্টি করেছিল শিল্পসম্ভারে। বীর-

পূজায় প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তিশিল্পকে সম্মানিত করত। আজ ব্যবসা-দেবতা গগনচুম্বী অট্টালিকায় সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য বিশ্বকে সাজিয়েছে। মানুষের কৃতিত্বের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায় আধুনিক সৌধনির্মাণে। ভারের হিসাব অঙ্ক শাস্ত্রকে মন্থন করছে। পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, ধাতু-বিজ্ঞান প্রভৃতি কার্য্যকরী হ'য়েছে আকাশভেদী সৌধ-গঠনে। যুগে যুগে ভারতবর্ষ ধর্মের নামে বহু অট্টালিকা গড়েছে। হিসাবের ভুলে হয়তো কোনারক সূর্য্য-মন্দির ধ্বংসের অভিযানে পরাজিত। কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য আজিও চিত্তকে প্রফুল্ল করে, সকল দেশের সুন্দরের উপাসকের। সুষমার আকর তাজ প্রেমের বিজয়-মন্দির। ভারতবর্ষ এবং পাকীস্থান নিজের নির্মাণ কুশলতা ভুললে চলবে কেন? এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপাদনের পথে চললে—বৈরিতার ফলে বৈরিতার জন্ম নিরোধ হবে।

করাচীতে পাঞ্জাবী মুসলমানের প্রাধান্য, বিশেষ ব্যবসা-ক্ষেত্রে। সিন্ধের হিন্দুর দোকানদারী এসিয়া, দক্ষিণ-য়ুরোপ এবং আফ্রিকায় দক্ষতা অর্জন করেছে। সর্বত্রই এদের দোকান দেখা যায়। কিন্তু করাচীতে কেন, পাকীস্তানের সর্বত্র এরা এমন সন্ত্রাস অর্জন করেছে যার ফলে সিন্ধুর হিন্দু সার্থক করেছে প্রবচন—গাঁয়ের যোগী ভিক্ষা পায় না।

বাসরা ইরাকের দক্ষিণ প্রান্তের সহর। দুটি মহাযুদ্ধে বহু ভারতবাসী বাসরায় গিয়েছিল সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে। অনেক ভারতীয় যুদ্ধ বাহিনীর সাহস, ধৈর্য্য ও বীরতার ফলে আরব, ইরাক, লেবানন, সিরিয়া, জরডান, পালেষ্টিন প্রভৃতি দেশ তুর্কী সাম্রাজ্য হ'তে ছিন্ন হ'য়েছিল। ইংরাজের এ কৃতিত্বের মূলে অবশ্য ছিল স্বার্থ। কিন্তু তার অপ্রত্যক্ষ ফলে আজ ইংরাজের দুর্দিনে এই সব প্রদেশ স্বাধীনতার মুক্তবায়ু সেবন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা একেবারে পাশ্চাত্যের কবল হতে পরিত্রাণ পায়নি, কারণ ইরাক ও পারস্যের তৈলভূমি সারা সভ্য জগতের লক্ষ্য-কেন্দ্র।

প্রাচীন আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের ধ্বংস আজ বুকে ধরে আছে ইরাক। ইরাকী কিন্তু সে ঐতিহ্য হ'তে বোগ্দাদের গৌরবে অতীব গৌরবান্বিত। তাদের মাতৃ-ভূমিতে ছিল আব্বাসীদ সাম্রাজ্যের রাজধানী বোগদাদ—হারুণ-উল-রসিদের দেশ, আরব্য উপন্যাসের রোমান্সের ক্ষেত্র এবং পূর্বদিনের মুস্লিম সুলতানদের লীলাভূমি। আজ তারা আরবী ভাষা কয়। কিন্তু আরব জাতি হ'তে ইরাকী ভিন্ন, এ-কথা ইরাকীও বলে—আরবও বলে। অথচ গত যুদ্ধের পর ইংরাজ ম্যাণ্ডেটের দোহাই দিয়ে প্রথমে মক্কার সরিফ বংশের রাজা হোসেনের পুত্র আব্দাল্লা, পরে ফয়জুলকে ইরাক রাজ্যের সিংহাসনে বসিয়েছিল।

আরবের সুলতান ইব্নে সৌদ এক অদ্ভুত বীর। তিনি নিজের সাহস, প্রতিভা, দূরদৃষ্টি এবং কর্মতৎপরতার ফলে সারা আরব দেশে নিজের কর্তৃত্ব বিস্তার করেছেন। ইরাকের দক্ষিণে বাসরা বড় সহর। বাসরা পার হলেই আরবের নেজদ্। নেজদীদের দাবী ও সীমানা নিয়ে ইরাকের যে ঝঞ্ঝাট বেঁধেছিল, ইরাক তার কু-ফল হ'তে মুক্ত হয়েছে, ইংরাজের মধ্যস্থতায়। এর তেমনি বিপদ ঘটেছিল উত্তর সীমানা নিয়ে। কুর্দী মুসলমান হ'লেও তার ঐতিহ্য, ভাষা ও কৃষ্টি, আরব্য ও ইরাণী মুসলমান হ'তে বিভিন্ন। মোসলের অধিকসংখ্যক অধিবাসী ছিল কুর্দী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কী সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হ'ল। মহ্মুদ্ বরজানজী এক স্বাধীন কুর্দী রাষ্ট্র স্থাপিত করেন। এক মাসের মধ্যে ১৯১৯ সালের জুন মাসেই ইংরাজ তাকে গ্রেপ্তার করে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিল। পরে তুর্কীর প্রাধান্যকে দমন করবার জন্য মহ্মুদকে মুক্তি দেওয়া হয়। নানা যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৯২৭ সালে কুর্দ হ'ল ইরাকের অন্তর্ভূত।

ইরাকে শিয়া সুন্নি সমস্যাও ছিল। কিন্তু এদের দেশ-প্রিয়তা এ সব ধর্মের নামে দলাদলিকে একেবারে নির্বাসন করেছে। ইরাকী ইরাকী। সে আরবী ভাষা কয়, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে এমন কি আমেরিকায় তরুণদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে।

ইরাকীদের সাথে সৌদী আরেবিয়ার মূল-গত পার্থক্য আজিও বিদ্যমান। ইব্নে সৌদের নাম আরব্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে চিরদিন। বহুদিন অক্লান্ত দেশ-সেবার ফলে তিনি বহু আরব গোষ্ঠীকে একত্র করেছেন তাঁর পতাকায়। সকলের অপেক্ষা তাঁর মহান দেশসেবা ভ্রাম্যমান মরুবাসী বেদুইন দলকে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে। কিন্তু তিনি ওহাবী। ওহাবী ইরাকীকে বলে কু-সংস্কারপূর্ণ এবং পৌত্তলিক। ইরাকীও আরবকে বলে—মধ্যযুগের গোঁড়া। লেবানন, ট্রান্সজরডান প্রভৃতিতে

খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী আরব আছে। এদের স্বদেশ প্রেম গভীর। আরবী সাহিত্য আরবী কৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে, অথচ আরবী ভাষা-ভাষী সকল রাষ্ট্র যাতে আধুনিক বিজ্ঞানপুষ্ট পথ অবলম্বন করে, তার জন্য খৃষ্টান আরবের প্রয়াস প্রশংসাযোগ্য।

ইরাকে সৌদী আরবের রাজদূতকে দেখবার অবকাশ হ'য়েছিল। ইনি আরবী পোষাকে সজ্জিত—মাথায় আরবী ইমামী পাগড়ী। ইরাকে ওরূপ পোষাক সাধারণতঃ কেহ ব্যবহার করে না। কতক সেদিনের তুর্কীর প্রভাবে, তার পর ইংরাজের বন্ধুত্বে, য়ুরোপীয় পোষাক, নিদেন ছোট কোট ও পাতলুনই সুবিধার পোষাক ব'লে এরা গ্রহণ করেছে। উৎসবের দিনে বোগদাদী লম্বা জোব্বা ও পাগড়ি ব্যবহৃত হয়। লেবানন, সিরিয়া বা ইরাণে যেমন ফরাসী ভাষা প্রিয়, ইরাকে তেমনিই রাজা। আরবীর সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা চলে।

সৌদী আরেবিয়ার দৃষ্টি মক্কার দিকে। সকল মুসলমানেরই পক্ষে মক্কা পবিত্র। কিন্তু রাষ্ট্র এবং নবীন জাতীয়তার আদর্শে প্রত্যেক মুসলমানী দেশ নিজ নিজ স্বদেশকে উচ্চস্থানে সমারূঢ় করবার জন্য প্রয়াসী। সিরিয়ার লক্ষ্য দামস্কাস। ইরাকের লক্ষ্য বোগদাদ। ইংরাজের সহযোগিতায় বোগদাদ সত্যই বহু দেশের সংযোগ কেন্দ্র। সে ইতিহাসের শেষটা ইংরাজের পক্ষে করুণরসাত্মক। এক বিশিষ্ট শিক্ষিত ইংরাজের সঙ্গে বিলাতে এ বিষয়ে আলোচনার শেষে ভদ্রলোক বল্লেন—মানুষ করে প্রস্তাব, ঈশ্বর করেন নিষ্পত্তি। ও জগতের ধারা। ইংরাজ চরিত্রের এ দিকটা সত্যই প্রশংসনীয়। আমরা যাকে বলি অদৃষ্ট বা অনাসক্তযোগ, এরা তাকে বলে—সেন্স অব্ হিউমার।

খলিফ মনসুর ৭৬২ খৃঃ অব্দে বোগদাদকে ইতিহাসের দৃষ্টিপথে আনেন। ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, মেসোপেটেমিয়া ও আধুনিক ইরাকের গঙ্গা যমুনা। হারুণ-উল-রসীদের সাম্রাজ্যকালে বোগদাদের প্রতিষ্ঠা ও যশ উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল, জগতের ইতিহাসে। তাতার জাতির অভ্যুদয় আরব গৌরবকে ম্লান করেছিল। ১২৫৮ খৃঃ অব্দে তাতার হালাকু খান মুস্লিম খিলাফতের কেন্দ্র বোগদাদে অভিযান ক'রে তার প্রভূত ক্ষতি করেছিল। ১৩৯৩ খৃঃ অব্দে তাইমুর বোগদাদকে প্রায় ধ্বংস করেছিল। তুর্কী জাতির ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর ক্রমশঃ কুস্তুনতুনিয়ায় মুস্লিম সভ্যতার কেন্দ্র হ'য়েছিল। তবু বোগদাদের গৌরব হারুণ-অল্-রসীদ ও বহু মুস্লিম কীর্তির সঙ্গে জড়ানো রইল। তাঁর মহিষী জোবেদা বেগমের সমাধি আজিও ইরাকীর অর্ঘ্য দাবী করে। আর সেটি একটি কারণ, যার জন্য ওহাবী ইরাকীকে বলে পৌত্তলিক।

প্রথম মহাযুদ্ধে লরেন্স আরব সেজে কিরূপে তুর্কীর কবল হ'তে আরব দেশগুলিকে ইংরাজের প্রতিপত্তির মধ্যে আন্‌বার চেষ্টা করেছিল সে কাহিনী মানুষকে রোমাঞ্চ করেছে। তারপর জল-পথে বিপদ ঘটলে স্থলপথে ভারত পৌঁছিবার সদভিপ্রায়ে ইংরাজ বোগদাদকে কেন্দ্র ক'রে বহু রেলপথও বিস্তৃত করেছে পশ্চিম এশিয়ার উপর। কিন্তু আজ ভারত স্বাধীন, ইরাক স্বাধীন, লেবানন প্রভৃতির অবস্থা ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদকে নিস্তেজ করেছে। সুতরাং আবার ঘুরে ফিরে সেই প্রাচীন অকেজো করবার নীতি মনের মাঝে ভেসে ওঠে—যত্নই কর অম্বা, ঘটান্ জগদম্বা। অবশ্য ইংরাজ বলবে—যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ।

বাসরার সাটেল আরবের ধারে হোটেলের দোতলায় গিয়ে দেখা গেল এক সুন্দরী যুবতী। য়ুরোপীয় পোষাক কিন্তু কণ্ঠে বহুমালা এক হাতে হীরক-খচিত অলঙ্কার। আমরা বাসরাবাসীদের জিজ্ঞাসা করলাম—এরা য়িহুদী? দোভাষান মহিলার দলের এক ভদ্রলোক ও অন্য মহিলা আমাদের অদূরে এক টেবিলের দুপাশে বসে সান্ধ্য-ভোজনে ব্যাপৃত ছিল।

—আপনার দৃষ্টিশক্তি প্রশংসনীয়। কেমন করে চিনলেন?

আমি বল্লাম—আমাদের দেশেও য়িহুদী আছে। ওদের নাকের গড়ন ভুল করা যায় না।

এবার ওদের সৌজন্য মেঘাবৃত হ'ল। ঠোটের হাসি মিলিয়ে গেল। চক্ষু একটু বিস্ফারিত হ'ল।

একজন বল্লে—আরব অভ্যাগতের অভিসম্পাত ওই জাত। এদের এশিয়ার বাহিরে পাঠানো উচিত। ইস্রেল!

একটু স্বস্থ হ'লে কথার শেষে আমি বল্লাম—তা' যদি হয়—ইরাক কেন এদের পোষে?

এবার অন্য ভদ্রলোক হাসলে। বল্লে—আমাদের রাজনীতিবিদেরা বলেন, এরা তো ইরাকের নাগরিক। ইস্রেলকে আমরা সহিতে পারি না, কিন্তু দেশের নাগরিককে সহ্য করতেই হবে।

প্রথম ভদ্রলোক বল্লেন—অথচ আমার বিশ্বাস এরা গুপ্তচর।

প্লেনে ওঠবার সময় ভাবলাম—সাবাস্ য়ুরোপ। বহুত আচ্ছা ভেদ-নীতি। আমাদের মধ্যেও বহু দুর্বলচিত্ত আছে, যারা সকল মুসলমান নাগরিককে পাকস্তানের গুপ্তচর ভাবে এবং পাকিস্থানেও বহু হিন্দু সম্বন্ধে, বহু মুস্লিমের অনুরূপ ধারণা।

সা	রা	গা	|	পা	গা	রা	I	সা	।	সা	|	।	।	।	I
প্র	ণ	মি		বা	র	ম্		বা	০	র		০	০	০	
সা	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	র্সা	I	র্রা	র্সা	না	|	র্সা	পা	পা	I
হে	যু	গ		সা	র	থি		হে	ম	হা		তা	প	স	
পা	র্সা	র্সা	|	র্রা	র্গা	র্মা	I	র্গা	।	র্গা	|	।	।	।	I
আ	লো	ক		দী	প্	তি		মা	০	ন		০	০	০	
র্সা	র্গা	র্রা	|	।	র্সা	র্সা	I	না	র্রা	র্সা	|	না	ধা	না	I
অ	ন	লো		০	জ্জ্ব	ল		হে	ম	হা		পু	রু	ষ	
পা	ধা	গা	|	পা	ধা	না	I	র্সা	।	র্সা	|	।	।	।	I
প	র	ম		জ্যো	তি	ষ্		মা	০	ন		০	০	০	
সা	রা	গা	|	গা	গা	গা	I	গা	গা	গা	|	গা	গা	গা	I
যু	গে	যু		গে	যা	র		ধ্ব	নি	ছে		ম	ন্	ত্র	
মা	রা	গা	|	মা	পা	ক্ষা	I	পা	।	পা	|	।	।	।	I
দু	র্	জ		য়	তূ	র্		বা	০	র		০	০	০	
পা	র্গা	র্গা	|	র্রা	র্রা	র্রা	I	না	র্রা	র্সা	|	না	ধা	না	I
ম	র	ম		নি	ঙা	ড়ি		চ	র	ণে		তাঁ	হা	র	
পা	ধা	গা	|	পা	ধা	না	I	র্সা	।	র্সা	|	।	।	।	I
প্র	ণ	মি		বা	র	ম		বা	০	র		০	০	০	
সা	রা	গা	|	পা	গা	রা	I	সা	।	সা	|	।	।	।	I
প্র	ণ	মি		বা	র	ম		বা	০	র		০	০	০	
সা	মা	মা	|	মা	মা	মা	I	রা	পা	পা	|	পা	।	পা	I
এ	সো	হে		মো	হ	নি		শা	রা	টি		বি	০	শে	
ধা	গা	গা	|	পা	ধা	না	I	র্সা	।	র্সা	|	।	।	।	I
জ্বা	লা	ও		প্রা	ণে	র		আ	০	লো		০	০	০	
র্সা	র্গা	র্রা	|	র্সা	না	না	I	র্রা	র্সা	না	|	ধা	পা	পা	I
মু	র্	ছি		তা	ও	ই		ধ	র	ণী		ব	০	ক্ষে	
ধা	গা	গা	|	পা	র্রা	গা	I	রা	।	সা	|	।	।	।	I
তো	মা	র		ক	রু	ণা		ঢা	০	লো		০	০	০	

১। "অরূপ আলোর পরশ" হইতে "প্রণতি বারম্বার" পর্যন্ত স্বরটী "শতেক ভক্ত বহিয়া চলেছে" পংক্তির স্বরে গীত হইবে।

২। "উদয় তোমার জ্যোতি" হইতে শেষ লাইনের "প্রণতি বারম্বার" পর্যন্ত স্বরটী "হে যুগ সারথী" পংক্তির সুরে গীত হইবে। তাহার পর প্রথম ছত্রে ফিরিতে হইবে।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আন্দামানে বাস্তুহারা পুনর্ব্বসতি

ভারতবর্ষে কোনরূপ বিপর্য্যয় ঘটিবার বহু পূর্ব্বে, মহাযুদ্ধের অনেক আগে প্রসিদ্ধ ভৌগলিক Dudley Stamp তাঁহার Asia নামক ভূগোল গ্রন্থে আন্দামান নিকোবর সম্বন্ধে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া শেষে লিখিয়াছেন, "Both group of islands may in future play an important part in Indian economy, since there are large tracts suitable for settlement"। এই কয়টি লাইনের মধ্যে যে কি প্রগাঢ় সত্য নিহিত আছে তাহা সেদিনের ভূগোল পাঠক ঠিক মত উপলব্ধি করিতে না পারিলেও অধুনা আমরা এই কথাগুলির সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রহণ করিতেছি। পূর্ব্ব বাংলার অগণিত হতভাগ্য নরনারী পণ্ডিতম্মন্য ফরাসী রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের আত্মঘাতী খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন কেবলমাত্র ধর্ম্ম, সম্মান ও প্রাণ একরকমে আত্মরক্ষা করিবার আদিম জৈবধর্ম্মে প্রণোদিত হইয়া নিঃস্ব অবস্থায় ভারতের সীমানার মধ্যে দলে দলে আসিতে লাগিল তখন কংগ্রেস-সরকার নিজেদের ইডিয়লজি বা ইডিয়টোলজিতে আবদ্ধ গুটিপোকার ন্যায় অনন্যোপায় হইয়া এই অসংখ্য বাস্তুহারার জন্য কথঞ্চিৎ স্থান দেখাইয়া দিলেন আন্দামানে। অনেকেই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু একদল অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান এবং ভাগ্যবান ব্যক্তি আন্দামান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সপরিবারে এইরূপে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং তাহাদের নিকট কুখ্যাত এই দূর দ্বীপে যাত্রা করিবার সংকল্প প্রচুর সাহসিকতার পরিচয় সন্দেহ নাই, কিন্তু কঠোর বাস্তবকে এইভাবে স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার এই চেষ্টা নিশ্চয়ই প্রশংসার্হ। এ পর্য্যন্ত কতগুলি বাস্তুহারা এইভাবে আন্দামানে গিয়াছেন, পশ্চিম বাংলার সরকারী দপ্তর হইতে সেই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। (এই সংবাদগুলির জন্য বর্ত্তমান লেখক পশ্চিম বাংলার সুযোগ্য রিলিফ কমিশনার শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই সি এস এবং তরুণ সাহিত্যিক শ্রীমনোজিৎ বসু সহকারী ডিরেক্টর, প্রচার বিভাগের নিকট বিশেষভাবে ঋণী।)

আন্দামানের প্রথম অভিযাত্রী দলে কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছেন,

	১২৮টি	পরিবারের	মোট ৫১৫ জন—	১৩ই মার্চ্চ ১৯৪৯
দ্বিতীয় দলে	৭২টি	„	„ ৩২৮ „—	২৮শে মার্চ্চ ১৯৪০
তৃতীয় দলে	৩০টি	„	„ ১৪৮ „	২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০
চতুর্থ দলে	৩৫টি	„	„ ১৩৪ „	১৩ই এপ্রিল ১৯৫০
পঞ্চম দলে	৩০টি	„	„ ১১৮ „	২৬শে মে ১৯৫০
মোট	২৯৫		১২৪৩ „	

এই ২৯৫টি পরিবারের মধ্যে ২৫১টি পরিবার কৃষিজীবী, ২৪টি পরিবার সূত্রধর, ২০টি মিস্ত্রী ও ঘরামি বলিয়া নাম লিখাইয়া ছিল।

ইহাদের মধ্যে ২৭টি মাত্র পরিবার আন্দামানে বাস করা অসুবিধা বোধ করিয়া পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ লইয়া জানা গেল, এই সমস্ত ফেরৎ যাত্রীদের প্রায় সকলেই সরকারী দান গ্রহণ ও বিনামূল্যে সমুদ্রযাত্রা লোভেই গিয়াছিল, উপনিবেশ গঠনের শক্তি ও ইচ্ছা এবং হয়ত বা প্রয়োজনও ইহাদের তেমন ছিল না।

এই সমস্ত বাস্তুহারা পরিবারবর্গকে সরকার যে সমস্ত সুবিধা দিয়াছেন তাহাও নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :--

(১) ইহারা আন্দামানে যাইবার জন্য জাহাজে বিনামূল্যে পাশ পাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে এইরূপ প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হইয়াছিল যে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইলে বিনামূল্যেই জাহাজে ফিরিবার পাশ পাইবেন।

(২) আন্দামানে প্রত্যেক পরিবার বিনামূল্যে ১০ একার চাষ জমী পাইবেন।

(৩) চাষের জন্য বিনামূল্যে দুইটি করিয়া মহিষ ও দুধের জন্য একটি করিয়া গাভী।

(৪) চাষের জন্য বিনামূল্যে বীজ সার এবং কৃষির যন্ত্রপাতি।

(৫) বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য বিনামূল্যে করোগেট টিন, পেরেক, দরজা জানালার জন্য কব্জা, স্ক্রু ইত্যাদি।

(৬) আন্দামানে উপস্থিত হওয়ার পর হইতে দশ মাস পর্য্যন্ত মাসিক প্রত্যেক কৃষক পরিবারের সাবালক ব্যক্তির জন্য ৩০ টাকা হিসাবে এবং নাবালকের জন্য মাসিক ১৫ টাকা হিসাবে সাহায্য; তবে কোন পরিবারকেই ১০০ টাকার অধিক মাসিক সাহায্য দেওয়া হইবে না।

(৭) শিল্পী পরিবারের জন্য উপরোক্ত হিসাবে মাসিক সাহায্য মাত্র তিন মাসের জন্য দেওয়া হইবে। কৃষি ও শিল্পী পরিবারের মধ্যে এই পার্থক্যের কারণ এই যে, কৃষি পরিবার ফসল না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না, কিন্তু শিল্প-শ্রমিক চেষ্টা করিলে তিন মাসেই আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে।

উপরোক্ত ১২৪৩ জন ব্যক্তি ছাড়াও আর তিনটি দলে কতকগুলি শ্রমিক আন্দামানে পাঠানো হয়। তাহাদের মধ্যে গিয়াছেন—

প্রথম দলে ২৭টি পরিবারের ৯৪ জন—১৯শে জুন ১৯৫০। ইহারা অদক্ষ শ্রমিক (unskilled labour) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ইহাদের প্রত্যেক শ্রমিক মাসিক ৫২ টাকা হিসাবে বেতন এবং শেষ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বসতির জন্য জমী ও করোগেট টিন ইত্যাদি বিনামূল্যে পাইবে।

দ্বিতীয় দলে মাত্র ৩০ জন পুরুষ—ইহাদের সহিত স্ত্রীলোক নাই। Regional Employment Exchange হইতে ইহাদের প্রেরণ করা

হইয়াছে এবং ইহারাও উপরোক্ত অদক্ষ শ্রমিক শ্রেণীকে প্রদত্ত বেতন ও পুনর্বসতির সুবিধা পাইতেছেন।

তৃতীয় দলে শেষ হইতে প্রায় একমাস পূর্ব্বে ২৭এ জানুয়ারী (১৯৫১) তারিখে মহারাজা জাহাজে ৪৯টি পূর্ব্ববঙ্গীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ী পরিবার আন্দামানে যাত্রা করিয়াছে। এই ৪৯টি পরিবারের মধ্যে ২টি কর্ম্মকার, ২৩টি সূত্রধর, ২টি কুম্ভকার, ১০টি ধীবর এবং ১২টি ছোট ব্যবসায়ী আছেন। সরকার কর্তৃক এই সমস্ত পরিবারের প্রতি পরিবারকে রন্ধনের বাসন ও প্রয়োজনীয় ধুতি শাড়ী ও ছোটদের জামা, অন্যান্য পোষাক, এবং এক মাসের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাথা পিছু ১৫ টাকা এবং নাবালকদের মাথা পিছু ১২ টাকা হিসাবে পরিবার প্রতি অনূর্দ্ধ ১০০ টাকা ভরণপোষণ বাবদ মঞ্জুর করা হইয়াছে। এ ছাড়া জাহাজের জন্য বিনামূল্যে 'পাশ' দেওয়া হইয়াছে। আন্দামানে পুনর্ব্বাসনের উদ্দেশে প্রতি পরিবারকে গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এক একর জমী ও ৯০০ টাকা নগদ এবং ব্যবসা আরম্ভ করিবার জন্য ৫০০ টাকা ঋণ ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি দেওয়া হইবে (এই সংবাদ ২৮শে জানুয়ারী ১৯৫১ দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত)। এইরূপে অদ্যাবধি মোটের উপর দেড় হাজার আন্দাজ লোক সরকারী ব্যয় ও তত্ত্বাবধানে আন্দামানে প্রেরিত হইয়াছে। উপরোক্ত লোকগুলি সকলেই বাঙ্গালী হিন্দু, বোধ হয় অপর ধর্ম্মের কোন লোক আমাদের সিকিউলার সরকারের নিকট আন্দামানে যাইবার জন্য আবেদন করে নাই, সেই জন্যই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ কংগ্রেস সরকার এই ক্ষেত্রে অসাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ করিবার সুযোগ পান নাই। নচেৎ কি হইত বলা যায় না।

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে এ পর্য্যন্ত মোট দেড় হাজার আন্দাজ বাস্তুহারা সরকারী ব্যবস্থাধীনে আন্দামানে স্থায়ী হইয়াছেন। এ ছাড়া সম্প্রতি নিজেদের চেষ্টায় সরকারী সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়াই ৪৪টি কৃষক পরিবারের ১৭২ জন লোক ফেব্রুয়ারী ১৯৫০এ আন্দামানে যাত্রা করে এবং তাহারা সেখানে বসবাস করিতেছে। এই সমস্ত হিসাব একত্র করিয়া যাওয়া ও আসার সংখ্যা জমা খরচ করিয়া দেখা যায় যে পার্কের পরিকল্পনা মত ১,৫০০০০ লোকের বসতি করা যেখানে সম্ভব সেই দুই বৎসরের মধ্যে সেখানে মাত্র ১৬।১৭ শত লোককে স্থাপন করা খুব উৎসাহজনক হিসাব নহে। যাহা হউক, ইহার জন্য অদ্যাবধি মোট কত টাকা সরকারী তহবিল হইতে খরচ হইয়াছে তাহা জানিতে পারি নাই, তবে ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ সালে অর্থাৎ ঠিক একবৎসর পূর্ব্বে দিল্লী পার্লামেন্টে শ্রী আর কে সিদ্ধার প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন সহকারী প্রধান মন্ত্রী প্যাটেলজী বলিয়াছিলেন যে, আন্দামানে পুনর্ব্বসতি বাবদ সেই তারিখ অবধি মোট ৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

সরকারী ব্যয়ে বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বাসনের সহিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের আন্দামানে যাইবার প্ররোচনা দিবার উদ্দেশ্যে সরকার বর্ত্তমানে আর একটি ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ব্যবস্থার সুবিধা যে কেহ গ্রহণ করিতে পারেন। সেই ব্যবস্থায় যে কোন লোক পোর্টব্লেয়ারে বাটী নির্ম্মাণের জন্য এক একর পরিমিত জমি বাৎসরিক সামান্য ২।০ টাকা খাজনায় বিনামূল্যে গ্রহণ করিতে পারেন, তবে উহার সর্ত্ত এই যে জমী পাওয়ার এক বৎসরের মধ্যে সেই জমীতে বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। বাগান ইত্যাদি করিবার উদ্দেশ্যে আরও অধিক পরিমাণ জমিও পোর্টব্লেয়ার সহরের উপরে বা উপকণ্ঠে পাওয়া যাইতে পারে। আন্দামান সরকারের দেওয়া এই সুবিধা কেহ কেহ গ্রহণ করিতেছেন এবং লেখকের বন্ধু শ্রীসারদাচরণ দাস মহাশয় ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে এইরূপে একখণ্ড জমী লইয়াছেন। এ বিষয়ে বিশদভাবে জানিতে হইলে ১৬৪, অপার চিৎপুর রোডে তাঁহার নিকট সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও রসোগোল্লার কারবারের জন্য সারদাচরণের বংশানুক্রমিক খ্যাতি আছে, আন্দামানে জমী প্রাপ্তির এই শুভ সন্দেশ বিতরণে তিনি নিশ্চয়ই কার্পণ্য করিবেন না।

আন্দামানে কৃষি ও শিল্পী পরিবারের পুনর্ব্বসতির সহিত সাধারণ মধ্যবিত্তদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এইরূপে জমীর ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে খুবই সমীচীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। চারদিন যাবৎ সমুদ্র যাত্রা করিয়া এইরূপ একটি সুন্দর দ্বীপে অবসর বিনোদনের জন্য যাইবার উপযুক্ত ধনী ও মধ্যবিত্ত হাওয়া-খোরের অভাব বাংলা দেশের হইবে না বলিয়াই মনে হয়। যে বাঙ্গালী বিহার ও ছোট-নাগপুরের পাহাড় ও জঙ্গলে জায়গায় বাসপরিবর্ত্তন করিয়া ই আই আর ও বি এন আরের প্রত্যেকটি ষ্টেশনের আশে পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোরম সহর গড়িয়াছে তাহারা যে আন্দামানের মনোরম দ্বীপটিকে আরও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। এ ছাড়া মধ্যবিত্তদের বসবাসের জন্য ও তাহাদের উপযুক্ত উপজীবিকা সংগ্রহের সুবিধার জন্য Subhas Dwip colonisation cooperative Society Ltd নামক একটি multipurpose সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। এ সমিতির সম্পাদক ডা. শ্রীসত্যেনকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় মধ্যবিত্ত ঘরের বেকার তরুণদের আন্দামানে ভাগ্যান্বেষণের সুযোগ সুবিধার বন্দোবস্ত করিতেছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে। উৎসাহী ভাগ্যান্বেষীগণ এ বিষয়ে ৪৮, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট কলিকাতায় সংবাদ লইতে পারেন। নিছক উপদেশ ও মিষ্ট বাক্য নয়, হয়ত কিঞ্চিৎ বাস্তব সৎপরামর্শও সেখানে মিলিতে পারে।

মোটের উপর আন্দামানকে বাংলা দেশের উপনিবেশে পরিণত করিতে হইলে এখনও সে বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ইহা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আন্দামানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালীরা যদি ইহাকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ না করি, তাহা হইলে অতি শীঘ্র অন্য প্রদেশবাসীরা ইহাকে নিজস্ব করিয়া লইবে। খণ্ডিত বাংলাকে এই দ্বীপগুলি দিবার জন্য ভারত সরকারের ইচ্ছা আছে। হয়ত বা সেই কারণেই চিফ কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার প্রমুখ প্রায় সমস্ত পদস্থ কর্ম্মচারীই বাঙ্গালী। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালীর উপর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং এই সুযোগে বাঙ্গালীরা যেন ইহা গ্রহণ করিয়া লাভবান হইতে পারে ইহাই প্রত্যেক বাঙ্গালীরই দেখা উচিৎ। দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের মোপ্‌লারা এই দ্বীপের কতকাংশ সরকারী সাহায্য ব্যতীতই নিজস্ব করিয়া লইয়াছে, আন্দামানের বিবলীগঞ্জ নামক স্থান ইহারা পূর্ণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। উপরন্তু ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে Interview Island নামক আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম একটি দ্বীপ চাহিয়া লইয়া সেখানে ভারত সরকারের নিকট হইতে অন্য কোন সাহায্য না লইয়াই এক লক্ষ লোককে বসাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। এই অবস্থায় বাস্তুহারা-প্রপীড়িত সংকীর্ণ বাংলাদেশ যদি হাঁপ ছাড়িবার উপযুক্ত এই জায়গাটুকুও সরকারী সহায়তায় নিজস্ব করিয়া লইতে না পারে তাহা হইলে আর কবে পারিবে?

(ক্রমশঃ)

গ্রাম যে তিমিরে—সেই তিমিরে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

নদীয়া ঘাট্‌তি জেলা। ঘাট্‌তি জেলার ধান বাইরে যাবে না—এ হচ্ছে সরকারী নীতি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঘাট্‌তি জেলায় আদৌ প্রোকিওরমেণ্ট চল্‌বে কেন? আমি নদীয়ার যে অঞ্চলে বাস করি সে অঞ্চলে যে-সকল চাষী-গৃহস্থের বাড়্‌তি-ধান থাকে তাদের সংখ্যা আঙুলে গণনা করা যায়। এই বাড়্‌তি ধান ধারে অথবা নগদ নিয়ে এসে গ্রামাঞ্চলের বহু অনাথা মেয়ে ঢেঁকিতে ভানে। সেই ঢেঁকি-ছাটা চাল বিক্রী ক'রে তাদের সংসার চলে। গান্ধীজী ঢেঁকি ছাটা চাল ব্যবহারের উপরে এত যে জোর দিয়েছিলেন—সে এই সহস্র সহস্র অনাথা মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে। সহরে থাকতে ঢেঁকির মূল্য ভালো ক'রে বুঝতাম না। গ্রামে গিয়ে দেখলাম—বাড়ীর পাশ দিয়ে সার দিয়ে মেয়েরা চলেছে। ময়লা কাপড়—অনেকের হাতে রূপার চুড়ি। মুসলমানের মেয়েরা খালি বোরা নিয়ে যায় ধান আনতে। অপরাহ্নে দেখতাম, মেয়েগুলি ফিরে আসছে মাথায় ধানের বস্তা নিয়ে। ওরা গিয়েছিলো নিকটবর্তী গ্রামগুলিতে—যাদের বাড়্‌তি ধান আছে তাদের কাছ থেকে ধান কিনতে। ঐ ধান ঢেঁকিতে ভেনে তারা চাল তৈরী করবে—আর সেই ঢেঁকি-ছাটা চাল বিক্রী ক'রে ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকন্যার আহার যোগাবে। যারা সর্ব্বহারা—যারা সকলের পিছে সকলের নীচে—তাদেরই কান্না থামানোর জন্য গান্ধীজী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সহর নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি। ভারতে সহর আর কয়টা? আসল ভারত তার লাখো লাখো শ্মশানপ্রায় গ্রাম নিয়ে, আর এই গ্রামগুলির অস্থি-মজ্জা খেয়ে ফুলে উঠেছে সহরগুলি। গ্রামগুলিকে বাঁচাতে গেলে দরকার—গ্রামের মৃতপ্রায় শিল্পগুলিকে পুনর্জ্জীবন দান। গান্ধীজী তাই কুটীর-শিল্পের উপরে এতখানি জোর দিলেন। গ্রামের অনাথা মেয়েরা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে ভাবতাম—এ অঞ্চলে ধানের কল এলে ঢেঁকিগুলি অচল হয়ে যেতো, আর তার ফলে শত শত অনাথা মেয়ে পুত্রকন্যা নিয়ে শুকিয়ে মরতো।

গান্ধীজী যে-স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢেঁকি, যাতা, ঘানি ইত্যাদির উপরে এতখানি জোর দিয়েছিলেন গবর্ণমেণ্টের প্রোকিওরমেণ্ট-নীতি সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। প্রোকিওরমেণ্টের ফলে গাঁয়ের ধান বাইরে চলে যাচ্ছে এবং সহরে গুদামজাত হচ্ছে। গাঁয়ের অনাথা মেয়েদের ঢেঁকিগুলির অবস্থা কি হবে—এ কথা কি কর্ত্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন? তারা ধান কোথায় পাবে? গবর্ণমেণ্ট বলবেন যাদের বাড়্‌তি ধান আছে তাদের কাছে। ধান থাকলেই বা গরীবদের কি উপকার হচ্ছে। সম্পন্ন চাষী তার বাড়তি ধান গলা কাটা দরে বিক্রয় করবে, আর সেই ধান কিনতে গরীবেরা প্রাণান্ত হবে। কথাটা উড়িয়ে দেবার নয়। ধনী—সে সহরের লোক আর গ্রামেরই লোক স্বার্থ সহজে ত্যাগ করতে চায় না। গরীব মেরে পেট ভরানোই তাদের পেশা—ব্যতিক্রম নেই এমন কথা বলি না। ধনীদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান কিনে সেই ধান যদি কনট্রোলের দরে গবর্ণমেণ্ট গরীবদের সরবরাহ করতে পারতো, তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু গাঁয়ের ধান গাঁয়ে সরবরাহ করবার বেলায় কর্তৃপক্ষের আচরণে যে শৈথিল্য দেখেছি তাতে লোভাতুর সম্পন্ন চাষীর প্রতি সরকারী বক্রোক্তি—ছুঁচের প্রতি চালুনির বক্রোক্তির মতোই হাস্যকর ব'লে মনে হয়। নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি, গাঁয়ের লোকেরা অনেক সময়ে মাসে একবার কনট্রোলের ধান পায় না। যা পায়, তাও পরিমাণে এত অল্প যে তাতে চাষীর পেটের সিকির সিকিও ভরে না। গোরু বাছুর, বাসন-কোসন বিক্রী ক'রে তাকে কালো-বাজারে চল্লিশ টাকা মণে চাল কিনতে হয় ক্ষুধার্ত্ত পুত্রকন্যার কান্না থামাবার জন্য। সহরের লোকেরা কিন্তু নিয়মিতভাবে কনট্রোলের দরে যে চাল পায় তাতে তাদের কুলিয়ে যায়। গাঁয়ের ধনীরা গলাকাটা দরে ধান বিক্রী করে সত্য। কিন্তু পাওয়া যায়। প্রোকিওরমেণ্টের নীতিতে যে ধান গাঁয়ের বাইরে চলে যায়, সে যে ফিরে আসবার নাম করে না। গ্রামের লোকেরা সরকারী কাণ্ডকারখানা দেখে

দীর্ঘশ্বাস ফেলে—আর ভাবে 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘাটতি জেলার গ্রামাঞ্চল থেকে ধান সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সহরে সেই ধান্য গুদামজাত করার ফল দরিদ্র গ্রামবাসীদের পক্ষে বিষময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রোকিওরমেণ্ট অর্থগৃধ্নু গ্রামাধনীদের বিষ দাঁত ভাঙতে কতখানি সাহায্য করছে জানিনে। মানুষকে বশীভূত করবার একটা আশ্চর্য্য শক্তি রাখে রূপার চাকতি। টাকার সম্মোহন অস্ত্রে তন্দ্রাভিভূত হয় না—এমন বিবেক দুর্লভ। সুতরাং যাদের টাকা আছে প্রোকিওরমেণ্টের জালকে এড়িয়ে যেতে সেই রুই-কাতলাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না। ধরা পড়তে তারাই পড়ে—যারা চুনোপুঁটি। এই চুনোপুঁটির করুণ আর্ত্তনাদে বাঙলার আকাশ আজ কাঁদছে। যে কথা বলছিলাম। প্রোকিওরমেণ্টের ফলে যারা ধনী চাষী—তারা কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা বলা সহজ নয়। কিন্তু ওর ফলে গ্রামের হাজার হাজার অনাথা মেয়ের ঢেঁকি যে অচল হবার উপক্রম হয়েছে—একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

দেখে শুনে মনে হয়েছে—কনট্রোল প্রথার কল্যাণে সহরের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে গ্রামগুলি আগে যেমন বলি হচ্ছিল এখনও তেমনি বলি হচ্ছে। ল্যাঙ্কাশায়ার নেই, কিন্তু দিল্লী আছে, কোলকাতা আছে, বোম্বাই আছে। গ্রামকে শোষণ করবার বেলায় কেউ কম যায় না। সেখানে ল্যাঙ্কাশায়ার আর কোলকাতা সগোত্র। অতএব 'হরিজন' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মশরুওয়ালার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি বলি, গ্রামের ধান গ্রামবাসীর দৃষ্টির আড়ালে যেতে দেওয়া কোনমতেই ঠিক হবে না। কিন্তু সেই ধান কার তত্ত্বাবধানে থাকবে? নিশ্চয় যার বাড়তি ধান—তার তত্ত্বাবধানে নয়। সে তো বেড়ালের পাহারায় দুধ রাখার সামিল। কোন সম্প্রদায়িক অথবা রাজনৈতিক দলের নেতার তত্ত্বাবধানেও নয়। ধান থাকবে সেই লোকের পাহারায়—যাকে গাঁয়ের সর্ব্বহারারা মনে করে তাদেরই একজন। এ প্রস্তাব মশরুওয়ালার এবং যুক্তিসঙ্গত। ধনী চাষীদের লোভকে সংযত করবার সরকারী ব্যবস্থা কার্য্যকরী হলে উত্তম কথা। কিন্তু সেই লোভের মাথায় অঙ্কুশ হানতে গিয়ে যদি দরিদ্র চাষীদের মুখের গ্রাস প্রোকিওরমেণ্টের নীতিতে তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে তা হবে দুষ্টু ঘোড়াকে শায়েস্তা করবার জন্য তার পা কেটে দেওয়ার মতো। বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পুকুরে ডুব দেয়—এমন হস্তীমূর্খও দুনিয়ায় আছে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা উপায়ের কথা চিন্তা করতে গিয়ে অপায়ের কথাও ভাবে। সহরকে খাওয়াতে হবে নিশ্চয়ই এবং যেহেতু বোম্বাইয়ের মালাবার হিলে অথবা কলকাতার চৌরঙ্গীতে ধান ফলে না সেই হেতু সহরকে বাঁচাবার জন্য গ্রামাঞ্চল থেকেই ধান্য অথবা গম সংগ্রহ করতে হবে—একথাও ঠিক। কিন্তু সহরকে বাঁচাতে গিয়ে গ্রামকে মেরে ফেলা চলে না। যে-চাষীর পরিশ্রমের উপরে সমাজের শক্তি, স্বাস্থ্য, অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নির্ভর করছে—সে যদি খাদ্যাভাবে জীবন্মৃত থাকলে সমাজ জাহান্নামে যাবে। অতএব গবর্ণমেণ্টকে বলি হুঁসিয়ার।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে সহরকে বাঁচিয়ে রাখবার দায় যেমন গ্রামের, তেমনি গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়কে সহর কি অস্বীকার করতে পারে? গ্রামের বাড়তি ধান সহরে পাঠানোর নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। নইলে সহরের লোকে খাবে কি? যাতে সহরের নাগরিকরা ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গোলার ধান জোর ক'রে কেড়ে আনছে। চাষী তার বাড়তি ধানের ন্যায্য মূল্য পর্য্যন্ত পাচ্ছে না। কিন্তু গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সরকার কী ব্যবস্থা করছেন? বড়ো বড়ো সহরে ক্রোড়পতিরা সোনার তালের উপরে সোনার তাল জমিয়ে চলেছেন। কেন তাঁদের বাড়তি টাকা কেড়ে এনে সেই টাকা গ্রামের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হবে না? গ্রামের বাড়তি ধানের উপরে যদি সহরের দাবী থাকতে পারে, তবে সহরের বাড়তি ধনের উপরে গ্রামেরই বা দাবী থাকবে না কেন? কিন্তু আগেই বলেছি—ল্যাঙ্কাশায়ার আর কোলকাতা সগোত্র। ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান এখন অধিকার করেছে কোলকাতা। গ্রাম যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে।

[শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা কবি ও প্রবীণ দেশকর্ম্মী। তিনি জনগণের মনের কথা উপরোক্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদে যদি কাহারও কিছু বলিবার থাকে, লিখিয়া পাঠাইলে তাহাও প্রকাশ করা হইবে।—ভাঃ সঃ]

ফ্রেডারিক নিৎসে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

Encyclopedistগণ ধর্ম্মের ধ্বংসসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য তাহাদের সমগ্র শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন, চরিত্র-নীতির ধর্ম্মমূলক ভিত্তি ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু চরিত্র-নীতির উপর তাহারা হস্তক্ষেপ করেন নাই। শত শত বৎসর ধরিয়া মানব-চরিত্রের যে যে গুণ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া আসিতেছিল, ধর্ম্মমন্দিরের বেদী হইতে যুগ যুগ ধরিয়া যে সকল গুণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছিল, পিতামাতা সযত্নে যে সকল গুণের বীজ সন্তানের হৃদয়ে বপন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করেন নাই; যে আদর্শ মানবজাতির সম্মুখে খৃষ্ট স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাকে মূল্যহীন বলেন নাই। ভল্টেয়ার হইতে আগষ্ট কোম্‌ট পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তার উপাসকগণ খৃষ্টীয় আদর্শের অঙ্গে আঘাত তো করেনই নাই, বরং আগ্রহের সঙ্গে তাহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন।

কোম্‌ৎ বলিয়াছিলেন "অপরের জন্য প্রাণধারণ কর।" সোপেনহর ও জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিল সমবেদনা, অনুকম্পা ও পরোপকারকে চরিত্র-নীতির মধ্যে প্রধান স্থান দান করিয়াছিলেন। সাম্যবাদেও এই সমস্ত গুণকে যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ফ্রেডারিক নিৎসে জার্মান দর্শনের রঙ্গক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া প্রচার করিলেন—এই সকল গুণের কোনও মূল্যই নাই, তাহারা চরিত্রের হীনতা-সাধক। জীবন সংগ্রামে এই সমস্ত তথাকথিত গুণ আমাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জীবন-সংগ্রামে প্রয়োজন শক্তির; এই সকল তথাকথিত গুণে শক্তির খর্ব্বতা সাধিত হয়। জীবন সংগ্রামে প্রয়োজন বুদ্ধির; পরার্থপরতা দ্বারা তাহার কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। বিনয় চিত্তের দৈন্যসূচক। চাই অহংকার। সাম্য ও গণতন্ত্র দ্বারা যোগ্যতমের উদ্বর্তন হয় না। অভিব্যক্তির লক্ষ্য প্রতিভার উৎপাদন, শক্তিহীনের সৃষ্টি নয়। ন্যায় বিচার দ্বারা বিরোধের মীমাংসা হয় না, তাহার জন্য প্রয়োজন শক্তির। বিস্‌মার্কই আদর্শচরিত্র মানব। বাস্তবের সঙ্গে তাহার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্যবহারে পরার্থপরতার স্থান নাই। ভোট ও বাগ্মিতা দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হইবে না; তাহার জন্য রক্তপাত এবং অস্ত্রের প্রয়োজন। গণতন্ত্রের 'আদর্শে' বিশ্বাসী ভ্রান্তি জীর্ণ ইয়োরোপে ঝটিকারমত প্রাদুর্ভূত হইয়া তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই বৃদ্ধ অষ্ট্রিয়াকে তাঁহার আদেশ পালনে বাধ্য করিয়াছিলেন; নেপোলিয়নের স্মৃতি-গর্ব্বিত উদ্ধত ফ্রান্সকে অবনমিত করিয়াছিলেন, এবং জার্মানীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে মিলিত করিয়া নূতন শক্তি-নীতির প্রতীক পরাক্রান্ত জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শক্তি-মোহাচ্ছন্ন নূতন রাষ্ট্রের সমর্থক দার্শনিক রূপেই নিৎসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্টের ধর্ম্মে ইহার সমর্থন ছিল না; সমর্থনের জন্য নূতন দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছিল। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদে সমর্থন মিলিবার সম্ভাবনা ছিল। নিৎসে ডারউইনের দর্শনের ব্যবহার করিয়াছিলেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্র নৈতিক দর্শনে তিনি অভিব্যক্তিবাদের প্রয়োগ করেন নাই। জীবন যদি বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম হয়, এই সংগ্রামে যোগ্যতমই যদি জয়লাভ করে, তাহা হইলে শক্তিই ধর্ম্ম, দুর্ব্বলতা অধর্ম্ম। যে টিকিয়া থাকিতে পারে, যে যুদ্ধে বিজয়ী হয় সেই ভালো। যে পরাজিত হয়, যে নতি স্বীকার করে, সেই মন্দ। ডারউইনপন্থীদিগের কাপুরুষতা ও ফরাসী পজিটিভ দার্শনিক এবং জার্মান সাম্যবাদীদিগের মধ্যশ্রেণীসুলভ মনোবৃত্তিবশতঃই এই সত্য তাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু খৃষ্টীয় নৈতিক আদর্শ অগ্রাহ্য করিবার সাহস তাহাদের হয় নাই। ইহাই ছিল নিৎসের ধারণা।

১৮৪৪ সালে ১৫ই অক্টোবর তারিখে প্রাসিয়ারাজ ফ্রেডারিক উইলিয়মের জন্ম দিনে নিৎসের জন্ম হয়। রাজার নামানুসারে তাঁহার ফ্রেডারিক নাম রাখা হয়। নিৎসের পিতা ছিলেন ধর্ম্মযাজক। মাতা নিষ্ঠাবতী পিউরিটান। পিতা ও মাতা উভয়েই ধর্ম্মযাজকের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নিৎসে নিজেও শান্ত-প্রকৃতি ও দয়ালু ছিলেন। একবার অল্পদিনের জন্য তাঁহার পদস্খলন হইয়াছিল। নতুবা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার চরিত্রের জন্য জেনোয়ার লোকে তাঁহাকে সাধু (Saint) বলিত।

পিতার অকালমৃত্যুবশতঃ নিৎসে পরিবারের সকলের নিকট অতিরিক্ত আদর যত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার চরিত্রের ক্ষতি হয় নাই। তিনি অসৎ বালকদিগের সহিত মিশিতেন না। তাঁহার সহপাঠিগণ তাঁহাকে "ছোট পাদ্রী" বলিয়া ডাকিত। একজন তাঁহাকে "মন্দিরস্থ যীশু" (Jesus in the Temple) বলিয়াছিল। নির্জ্জনে বসিয়া তিনি বাইবেল পড়িতে ভালবাসিতেন। তিনি এমন আবেগের সহিত বাইবেল পড়িতেন যে, যে তাঁহার পাঠ শুনিত, তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার চরিত্রে শৌরিক দার্ঢ্য ও গর্ব্ব ছিল। একদিন তাঁহার সহপাঠিগণ Mutius Scavolaর কাহিনীতে সন্দেহ প্রকাশ করায় তিনি কতকগুলি দেশলাই আপনার হাতের উপর রাখিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিলেন, এবং দেশলাইগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থিরভাবে ছিলেন। পুরুষত্বের যে আদর্শ তাঁহার মনে ছিল, সমগ্র জীবন তিনি আপনাকে তাহার অনুরূপ করিয়া গঠন করিতে উৎসুক ছিলেন।

ধর্ম্ম তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ছিল; অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি সেই ধর্ম্মে বিশ্বাস হারাইলেন। জীবন তাঁহার নিকট অর্থহীন বলিয়া প্রতীত হইল। তখন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত কিয়ৎকাল আমোদ-প্রমোদে

অতিবাহিত করিলেন এবং যে ধূমপান, সুরা, ও নারী-সঙ্গের প্রতি তাঁহার বিষম বিতৃষ্ণা ছিল, তিনি তাহাই আরম্ভ করিলেন। কিন্তু অচিরেই আবার বিতৃষ্ণ হইয়া তাহা বর্জন করিলেন। তদানীন্তন সমস্ত প্রচলিত প্রথার প্রতিই তাঁহার বিরাগ উৎপন্ন হইল।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি সোপেনহরের World as will and Idea পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলেন। গ্রন্থপাঠের সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল, সোপেনহর তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন। সোপেনহরের দর্শন তাঁহার মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিল। পরে তিনি সোপেনহরের দুঃখবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মনে শান্তি পান নাই। তিনি চিত্তের সমতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেও, নিজে কখনও তাহা লাভ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

তেইশ বৎসর বয়সে নিৎসেকে সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইতে হয়। বিধবার একমাত্র পুত্র ও ক্ষীণ দৃষ্টির অজুহাতে তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন, ফল হল নাই। পরে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। ইহার পরে তিনি Ph. D. উপাধি-প্রাপ্ত হন, এবং বেসলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

বেসলে অবস্থানকালে সুর-কলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ উৎপন্ন হয়, এবং তিনি পিয়ানো বাজাইতে শিক্ষা করেন। বেসল হইতে অনতিদূরে সুরশিল্পী রিচার্ড ওয়াগনার তখন বাস করিতেছিলেন। ওয়াগনার মধ্যে মধ্যে নিৎসেকে নিমন্ত্রণ করিতেন। ওয়াগনারের সঙ্গীত শুনিয়া নিৎসে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগী হইয়া পড়েন, এবং ওয়াগনারের যশখ্যাপনের জন্য তাঁহার প্রথম গ্রন্থ The Birth of Tragedy out of the spirit of Music (সুরের দেবতা হইতে বিয়োগাত্মক নাট্যের জন্ম) রচনা করেন।

১৮৭০ সালে যখন জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন নিৎসে সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার জন্যে আবেদন করেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষীণ দৃষ্টির জন্যে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। তখন শুশ্রূষাকারীর কাজ গ্রহণ করিয়া তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। এই সময় তিনি লিখিয়াছিলেন "রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় লজ্জাজনক উপায়ে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ইহা দুঃখের আকর; যে দুঃখের কখনও শেষ হয় না। তবুও যখন সেই রাষ্ট্রের আহ্বান আসে, তখন আমরা আত্মবিস্মৃত হই; তাহার রক্তমোক্ষণকারী আহ্বানে জনগণ সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত হয়।" যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবার পথে ফ্রাঙ্কফোর্টে তিনি একদল অশ্বারোহী সৈন্য বিপুল আড়ম্বরের সহিত নগরের মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে দেখিয়াই তাহার মনে যে অনুভূতি হইয়াছিল, তাঁহার সমগ্র দর্শন তাহা হইতেই উদ্ভূত। তখন আমি প্রথম বুঝিতে পারিলাম, যে "জীবনের ইচ্ছার" (Will to life) মহত্তম এবং বলবত্তম রূপ তুচ্ছ জীবন সংগ্রামের মধ্যে প্রকাশিত হয় না; তাহা প্রকাশিত হয় যুদ্ধাভিমুখী ইচ্ছার (Will to war) মধ্যে শক্তি—অভিমুখী ইচ্ছার মধ্যে, বিজয়াভিমুখী ইচ্ছার মধ্যে। পরবর্তী কালে কল্পনার সাহায্যে তিনি যে যুদ্ধক্ষেত্রের গৌরবোজ্জল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহার বাস্তবরূপ, তাহার নৃশংসতা ও হৃদয়হীনতা তিনি স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। তাঁহার স্পর্শকাতর চিত্ত শুশ্রূষাকার্য্যেরও উপযোগী ছিল না; রক্তের দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পীড়িত হইয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া আসেন।

১৮৭২ সাল নিৎসে বেসলে ফিরিয়া আসিলেন। ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া জার্মানজাতি গর্বে স্ফীত হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিয়া নিৎসে ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং যুদ্ধোন্মুখ দেশপ্রেমের (Chuvinism) প্রচারক; বিশ্ববিদ্যালয়দিগকে আক্রমণ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেন। "রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অপকৃষ্ট দার্শনিকদিগের পোষণই উৎকৃষ্ট দার্শনিকের আবির্ভাবে প্রধানতম বাধা।...প্লেটো এবং সোপেনহরের মতো দার্শনিকদিগের সমাদর করিতে কোনও রাষ্ট্রই সাহসী হয় না।...রাষ্ট্র তাহাদিগকে ভয় করে।" The use and abuse of History প্রবন্ধে জার্মান বুদ্ধি প্রত্নতত্ত্বের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা চাপা পড়িয়াছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সকল প্রবন্ধে তাঁহার দুইটি মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমতঃ অভিব্যক্তিবাদের আলোকে চরিত্র—নীতি এবং ধর্মবিজ্ঞানের সংস্কারের প্রয়োজন; দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ জীবের উন্নতি সাধন জীবনের লক্ষ্য নহে, কেননা ব্যক্তিগত ভাবে এই অধিকাংশ নিকৃষ্টতম। প্রতিভার সৃষ্টি, উৎকৃষ্ট ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নতি-সাধনই জীবনের লক্ষ্য।

১৮৭২ সালে Birth of Tragedy প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে নিৎসে গ্রীক বিয়োগান্ত নাট্যের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং ওয়াগনারকে জার্মানির ইস্কাইলাস্ (Aschylus) বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। গ্রীক দেবতা ডায়োনিসাস (Dionysus) এবং এপোলো (Apollo) চরিত্রের মিলন হইতে শ্রেষ্ঠতম গ্রীক কলা উদ্ভূত হইয়াছিল। ডায়োনিসাস ছিলেন সুরা, নৃত্য, গীত, ও প্রমোদের দেবতা- ঊর্দ্ধগামী জীবন, কর্ম্মে আনন্দ, চিত্তাবেগ এবং নির্ভীক দুঃখ ভোগের প্রতীক। এপোলো ছিলেন অবসর, বিশ্রাম, শান্তি—চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং মহা-কাব্যের দেবতা—জ্ঞান, শৃঙ্খলা ও দার্শনিক প্রশান্তির প্রতীক। ডায়ো-নিসাসের অশান্ত পৌরুষ এবং এপোলোর প্রশান্ত সৌন্দর্য, উভয়ের সংমিশ্রণ গ্রীককলার উৎস। ডায়োনিসাসের ভক্তগণের শোভাযাত্রা হইতে গ্রীক নাটকের কোরাসের জন্ম; জ্ঞানগম্ভীর এপোলোর চরিত্র হইতে তাহার কথোপকথনের রীতির সৃষ্টি।

প্রাচীন গ্রীকদিগের জীবন আনন্দপূর্ণ ছিল বলিয়া অনেকে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে দুঃখ-কষ্ট তাহাদের জীবনে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল, এবং তাহার তীব্র অনুভূতিও ছিল। মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর কি, এই কথা যখন সাইলেনাস মিদাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন, তখন মিদাস বলিয়াছিলেন "হায়, স্বল্পজীবী মানব, যদৃচ্ছা ও দুঃখের সন্তান তোমরা। যাহা অনুক্ত থাকাই শ্রেয়স্কর, কেন তাহা বলিতে আমায় বাধ্য করিতেছ? সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গলকর যাহা, তাহা অনধিগম্য। তাহা হইতেছে জন্মগ্রহণ না করা। তাহার পরেই যাহা

মঙ্গলকর, তাহা হইতেছে শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যাওয়া।" সোপেনহরের নিকট হইতে গ্রীকদিগের শিক্ষা করিবার বেশী কিছু ছিল না। জীবন যে দুঃখময়, তাহা তাহারা ভালরূপেই জানিত। কিন্তু তাহারা দুঃখবাদকে জয় করিয়াছিল তাহাদের কলাদ্বারা। আপনাদের দুঃখকষ্ট তাহারা নাটকে রূপান্তরিত করিয়াছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে দুঃখসমাকুল জগৎকে কেবল কলার মধ্যে প্রকাশিত করিতে পারিলেই, তাহার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হয়। যাহা ভীষণ, তাহার পরাভব এবং কলায় প্রকাশই বিরাট (Sublime)। দুঃখবাদ সূচনা করে ক্ষয়ের, সুখবাদ (optimism) দ্বারা সূচিত হয় পরবশ্যতা। যিনি বলবান তিনি চাহেন উদার ও প্রখর অভিজ্ঞতা ; তাহার জন্য তিনি দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত। এই অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্বকে জীবনের নিয়ম বলিয়া জানিতে পারিলে তিনি আনন্দিতই হন। তিনি "করুণ সুখবাদী" (Tragic optimist)। এই করুণ সুখবাদ যখন গ্রীকমন অধিকার করিয়াছিল তখনই এস্কাইলাসের নাটকের সৃষ্টি হইয়াছিল।

সক্রেতিস ছিলেন জ্ঞানবাদের প্রতীক। গ্রীকনাটকের অবনতিই তাহা দ্বারা সূচিত হইয়াছিল। ম্যারাথনের সৈনিকদিগের দৈহিক ও মানসিক সামর্থ্য অনিশ্চিত জ্ঞানালোকের নিকটে বলি দেওয়া হইয়াছিল : ফলে গ্রীকদিগের দৈহিক ও মানসিক শক্তির ক্রমশঃ খর্ব্বতা হইতেছিল। প্রাক্-সক্রেতিস যুগের দার্শনিক কবিতা সমালোচনামূলক দর্শন কর্তৃক স্থানচ্যুত হইয়াছিল, বিজ্ঞান কলার স্থান অধিকার করিয়াছিল, বুদ্ধি সহজাত সংস্কারের এবং দার্শনিক তর্ক মল্লযুদ্ধের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। প্লেটো ছিলেন মল্লযোদ্ধা, সক্রেতিসের প্রভাবাধীন হইয়া তিনি হইলেন সৌন্দর্য্যবিজ্ঞানী ; নাটক রচনা বর্জ্জন করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করিলেন এবং প্রবল হৃদয়াবেগের শত্রু হইয়া পড়িলেন। কবিদিগের নির্ব্বাসনের উপদেশ দিলেন এবং খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বেই খৃষ্টান হইলেন। ডেলফির এপোলো মন্দিরে "আপনাকে জানো" "অত্যধিক কিছুই ভালো নয়।" এই কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল। ইহা হইতে সক্রেতিস ও প্লেটো ভ্রান্ত ধারণা করিলেন যে বুদ্ধিই একমাত্র ধর্ম্ম (Virtue) ; আরিস্ততল মধ্য পথের (Golden mean) ব্যবস্থা দিলেন। জাতির যৌবনকালে পুরাণ ও কাব্যের উৎপত্তি হয়, জীর্ণ দশায় উৎপন্ন হয় দর্শন ও ন্যায়। গ্রীসের যৌবনে হোমার ও ইস্কাইলাস্ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, জীর্ণ দশায় উদ্ভূত হইয়াছিলেন ইউরিপাইদিস (Euripedes), ইউরিপাইদিস ছিলেন নৈয়ায়িক ও যুক্তিবাদী। তিনি নাট্যকার হইয়া রূপক ও পৌরাণিক কাহিনী বর্জ্জন করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের করুণ সুখবাদের ধ্বংসসাধন করিয়াছিলেন এবং ডায়োনিসীয় কোরাসের স্থলে এপোলোনীয় তার্কিক ও বাগ্মীদিগের আমদানী করিয়াছিলেন। পরিহাসরসিক এরিষ্টোফানিস্ সক্রেতিস এবং ইউরিপাইদিস্ উভয়ের মধ্যেই গ্রীক সংস্কৃতির অবনতি দেখিতে পাইয়াছিলেন, বলিয়া উভয়কেই ঘৃণা করিতেন। ইউরিপাইদিস যে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন The Bacchae গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। এই গ্রন্থে তিনি ডায়োনিসাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পরে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। কারাকক্ষে সক্রেতিসও ডায়ানিসাসের সুরের চর্চ্চা করিতেন। হয়তো তাঁহার মনে হইয়াছিল—"আমি বুঝিতে পারি না বলিয়াই কোনও বস্তুকে যুক্তিহীন বলা যায় না। হয়তো জ্ঞানের এমন এক রাজ্য আছে, যেখানে নৈয়ায়িকের প্রবেশাধিকার নাই। হয়তো কলা ও বিজ্ঞান অবিনাভাবী, এবং কলা বিজ্ঞানের পরিপূরক। কিন্তু এ অনুশোচনা তখন নিষ্ফল। অনিষ্ট যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছিল, গ্রীক নাটক ও গ্রীক চরিত্রের অবনতি রোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। বীরের যুগও ডায়োনিসাসের যুগের সমাধি হইয়া গেল। কিন্তু হয়তো সেই যুগ ফিরিয়া আসিবে। বিখ্যাত ওয়াগনার দ্বিতীয় ইস্কাইলাসের মতো রূপকও প্রতীকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং নাটকও সুরের মিশ্রণে ডায়োনিসীয় আনন্দ—প্লাবের সৃষ্টি করিয়াছেন। জার্ম্মান জাতির প্রকৃতির মূল ডায়োনিসিয়াস হইতে উদ্ভূত। তাহা হইতে যে সুরকলা উদ্ভূত হইয়াছে। বাক (Bach) হইতে বিটোভেন (Beethoven), বিটোভেন হইতে ওয়াগনার (Wagner) পর্য্যন্ত প্রসারিত সেই কলার সহিত সক্রেটিসের সংস্কৃতির কোনও সাদৃশ্যই নাই। দীর্ঘকাল জার্মানি ইতালী ও ফ্রান্সের এপোলোনীয় কলার অনুকরণ করিয়াছে ; জার্মাণ জাতির বুঝিবার সময় আসিয়াছে, যে তাহাদের সহজাত সংস্কার ঐ জীর্ণ সংস্কৃতি হইতে শ্রেষ্ঠতর। ধর্ম্মে জার্মাণজাতি যে সংস্কার সাধন করিয়াছে, সুর-কলাতেও সেইরূপ সংস্কার সাধিত হউক। কে জানে, জার্মাণ জাতির যুদ্ধের বেদনা হইতে আবার নূতন এক বীর জাতি জন্ম গ্রহণ করিবে না, এবং সুর কলার দেবতা হইতে ট্রেজিডি পুনরুজ্জীবিত হইবে না।

"Richard Wagner at Beyreuth" (বেরুথ রঙ্গালয়ে ওয়াগনার) প্রবন্ধে নিৎসে ওয়াগনারকে দ্বিতীয় Siegfried বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন ; এবং ভয় কাহাকে বলে, ওয়াগনার জানেন না, তিনি যাবতীয় কলার-সম্মিশ্রণে এক মহান সুষমামণ্ডিত সমন্বয়ের উদ্ভাবন করিয়া একমাত্র সত্য কলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বলিয়া সমগ্র জার্মান জাতিকে আগামী ওয়াগনার উৎসবের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ওয়াগনার ভক্তি চিরস্থায়ী হয় নাই। ওয়াগনারের চরিত্রে আত্মম্ভরিতা এবং প্রভুত্বলিপ্সা ও ঈর্ষার পরিচয় পাইয়া নিৎসে ক্ষুণ্ণ হন। বেরুথে ওয়াগনারের নাটকের অভিনয়ে তিনি কয়েক রাত্রি উপস্থিত ছিলেন। রাজা-রাজড়ার সমাগমে রঙ্গগৃহ অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু কয়েক রাত্রির পরেই নিৎসের বিরক্তি উৎপন্ন হইল। ওয়াগনারকে না বলিয়া তিনি বেরুথ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার কিছুকাল পরে সরেণ্টোতে অপ্রত্যাশিতভাবে ওয়াগনারের সহিত নিৎসের আবার দেখা হইল। ওয়াগনার তখন তাঁহার Parsifal নাটক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। নিৎসে ওয়াগনারের মুখে শুনিলেন এই নাটকে তিনি খৃষ্ট ধর্ম্ম, অনুকম্পা, নিষ্কাম প্রেম এবং "অকাট মূর্খ" খৃষ্টের গৌরব কীর্ত্তন করিবেন। একটিও কথা না বলিয়া নিৎসে সে স্থান ত্যাগ করিবেন। ইহার পরে তিনি আর কখনও ওয়াগনারের সহিত আলাপ করেন নাই। তিনি লিখিয়াছিলেন যাহার মধ্যে সরলতা ও অকপটতা নাই, তাহার মহত্ত্ব স্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব।" খৃষ্টধর্ম্মমতের

ত্রুটীবিচ্যুতি সত্ত্বেও ওয়াগনার যে তাহার মধ্যে নৈতিক মূল্য ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার জন্য তিনি তাহাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। "ওয়াগনার খৃষ্টধর্ম্মের সকল শাখার, ধর্ম্মের প্রত্যেকে রূপের, বীর্য্য-হীনতার যত প্রকার প্রকাশ আছে, সকলেরই স্তাবক! জরাগ্রস্ত উদ্দাম রোমান্টিক ওয়াগনার ক্রুশের সম্মুখে হঠাৎ অবনত হইয়া পড়িলেন। এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া শোক প্রকাশ করিবার জন্য কোনও দৃষ্টিশক্তিমান্ জার্মান কি ছিল না? তিনি কি কেবল আমাকেই দুঃখ দিয়াছিলেন?" ওয়াগনারের সহিত বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তাহার বন্ধুতার স্মৃতি নিৎসের মনে চিরকাল জাগ্রত ছিল।

ইহার পরে নিৎসের Human All too Human গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৮৭৮-৮০)। এই গ্রন্থ নিৎসে ভল্‌টেয়ারকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। গ্রন্থে মনো-বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া তিনি মানব মনের সুকুমার অনুভূতি ও প্রিয়তম বিশ্বাস সকলের বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। গ্রন্থের এক খণ্ড তিনি ওয়াগনারকে পাঠাইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ওয়াগনার তাহার Parsifal এর এক খণ্ড তাহাকে উপহার দেন।

১৮৭৯ সালে নিৎসে গুরুতর পীড়িত হইয়া পড়েন। জীবনের আশা ছিল না। যখন মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার ভগিনীকে বলিয়াছিলেন "যখন আমার মৃত্যু হইবে, তখন যেন আমার বন্ধুরাই কেবল আমার সমাধি স্থানে উপস্থিত থাকে। যখন আমার আত্ম-রক্ষার শক্তি থাকিবে না, তখন আমায় কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কোনও পুরোহিত যেন মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ না করে। সাধু অবিশ্বাসীরূপে যেন আমি কবরের মধ্যে অবতরণ করিতে পারি।" কিন্তু মৃত্যু হয় নাই। নিৎসে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

১৮৮১ সালে নিৎসের The Dawn of day এবং ১৮৮২ সালে The joyful wisdom প্রকাশিত হয়। এই সময় Lou Salome নাম্নী এক যুবতীর প্রতি তাঁহার প্রেম সঞ্চার হয়, কিন্তু যুবতী তাহার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেন। নিৎসে পলায়ন করিয়া নির্জ্জনবাসের জন্য আল্পস পর্ব্বতের উপরে Sils maria য় গমন করেন। এই স্থানেই ১৮৮৩ সালে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Thus spake Zarathushtra লিখিত হয়। এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি ওয়াগনারের Parsifal গ্রন্থের উত্তর দিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রন্থ যখন সমাপ্ত হয়, ওয়াগনার ও সেই সময়েই পরলোকগমন করেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে নিৎসের অতি উচ্চ ধারণা ছিল তিনি লিখিয়াছিলেন "এই গ্রন্থের সঙ্গে কবিদিগের নাম করিও না। শক্তির এত প্রাচুর্য্য হইতে ইহার পূর্ব্বে কোন গ্রন্থই রচিত হয় নাই।...প্রত্যেক মহান ব্যক্তির আত্মাও তাহার সৎ গুণ যদি একত্র সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে তাহারা সকলে মিলিত হইয়াও জরাথুষ্ট্রের আলোচনা (Discourse) সকলের মধ্যে একটির ও রচনা করিতে পারিবে না।" এই উক্তি অতি-রঞ্জিত হইলেও Thus spake Zarathushtra উনবিংশ শতাব্দীর এক-খানা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কিন্তু ইহার দার্শনিক মূল্য বেশী নহে। ইহা একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য। যুক্তিতর্ক দ্বারা নিৎসে তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। কিন্তু তাহার রচনা ভঙ্গী, ওজস্বিতা, ও মতের দার্ঢ্য ও ভাবাবেগ দ্বারা পাঠকের মন অভিভূত হয়। নিম্নে গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ঈশ্বরবাদ ও জরাথুষ্ট্র

জরাথুষ্ট্র ছিলেন প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ঈশ্বরবাদী ধর্ম্ম-প্রচারক। তাহাকেই নিৎসে নাস্তিক জড়বাদের প্রচারকরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে জরাথুষ্ট্র গৃহত্যাগ করিয়া দশ বৎসর যাবত এক পর্ব্বত-শিখরে নির্জ্জনে ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন। দশ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হে সবিতা, যাহাদের জন্য তুমি কিরণ বর্ষণ কর, তাহারা যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি তোমার তৃপ্তি হইত? দশ বৎসর ধরিয়া তুমি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আমার গুহা মধ্যে রশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছ। আমি যদি গুহা মধ্যে না থাকিতাম, আমার ঈগল ও সর্প যদি না থাকিত, তাহা হইলে তোমার আলোর ভারে এবং উত্থান-জনিত পরিশ্রমে তুমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতে। আমরাও তোমাকে প্রতিদিন সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছি। মধুমক্ষিকা অতিরিক্ত পরিমাণে মধু সঞ্চয় করিয়া যেমন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, আমিও তেমনি আমার জ্ঞানের ভারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই জ্ঞান গ্রহণ করিবার জন্য প্রসারিত হস্তের জন্যে আমি উদগ্রীব হইয়া আছি। আমাকে নিম্নে অবতরণ করিতে হইবে।"

জরাথুষ্ট্র পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন। পর্ব্বতের পাদদেশে এক বৃদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ জরাথুষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এতদিন পরে আবার মানুষের মধ্যে কেন যাইতেছ"? জরাথুষ্ট্র বলিলেন, "আমি মানুষকে ভালোবাসি।" বৃদ্ধ বলিল "আমি কি ভালবাসিতাম না? কিন্তু আমি ঈশ্বরকে মানুষ অপেক্ষা বেশী ভালবাসি। সেইজন্যই জনপদ ছাড়িয়া অরণ্যে বাস করিতেছি। এখন আর আমি মানুষকে ভালোবাসি না। মানুষের অনেক দোষ।" বনের মধ্যে তিনি কি করেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া বৃদ্ধ কহিলেন "আমি ঈশ্বরের স্তোত্র রচনা করি এবং তাহা গান করি।" বৃদ্ধের নিকট বিদায় লইয়া জরাথুষ্ট্র নগরের অভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন "ইহাও কি সম্ভবপর? ঈশ্বরের যে মৃত্যু হইয়াছে, এই অরণ্যবাসী বৃদ্ধ তাহা এখনও শোনেন নাই!"

নগরে উপস্থিত হইয়া জরাথুষ্ট্র দেখিলেন এক বাজীকরের রজ্জু নৃত্য দেখিবার জন্য বহু লোক বাজারে সমবেত হইয়াছে। তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া জরাথুষ্ট্র কহিলেন "আমি তোমাদিগকে অতি-মানবের কথা বলিব। মানুষ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। তোমরা তাহার জন্য কি করিয়াছ?...মানুষের নিকট মর্কট কি? পরিহাসের বস্তু। অতি-মানবের নিকট মানুষও তাহাই হইবে। কীট হইতে তোমরা মানুষ হইয়াছ। কিন্তু এখনও তোমাদের মধ্যে কীটের অনেক কিছু আছে। এক সময়ে তোমরা মর্কট ছিলে। এখনও মানুষের মধ্যে মর্কটত্ব প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। অতিমানবই পৃথিবীর

লক্ষ্য। তোমরাও অভিমানবকে পৃথিবীর লক্ষ্য কর। পৃথিবীর প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করিও না। পৃথিবীর সীমানার বাহিরে ভবিষ্যৎ সুখের আশা তোমাদিগকে যাহারা দেয়, তাহাদের কথা বিশ্বাস করিও না। যাহারা এই সকল আশা দেয়, তাহারা জানুক আর না জানুক, তাহারা বিষপ্রয়োগ করিতেছে। তাহারা জীবনকে ঘৃণা করে; পৃথিবী তাহাদের ভারে ক্লান্ত, তাহাদের কথা শুনিও না। এক সময় ঈশ্বর-নিন্দা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু ঈশ্বর মরিয়া গিয়াছেন। এখন পৃথিবীর নিন্দাই মহাপাপ। এক সময় আত্মা দেহকে ঘৃণা করিত এবং তাহাকে পীড়ন করিত। এই উপায়ে শরীর ও পৃথিবীর বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য আত্মা চেষ্টিত ছিল। আত্মা তখন ছিল কুৎসিত ও ক্ষুধার্ত্ত এবং নিষ্ঠুরতাতেই ছিল তাহার আনন্দ। কিন্তু তোমাদের দেহ তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে কি বলে? তোমাদের আত্মা কি দারিদ্র্য-পীড়িত অপবিত্র পদার্থ নহে? ইহা কি ঘৃণিত আত্ম-তুষ্টি নহে?

জরাথুষ্ট্রের কথা শুনিয়া লোকে হাসিতে লাগিল। রজ্জুনৃত্য আরব্ধ হইল—সাগ্রহে তাহারা তাহাই দেখিতে লাগিল। বাজীকর হঠাৎ রজ্জু হইতে পড়িয়া ভীষণ আঘাতপ্রাপ্ত হইল। জনতা তখন বিচ্ছিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। আহত বাজীকর সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল জরাথুষ্ট্র তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, কহিল "সয়তান যে আমাকে পা ধরিয়া ফেলিয়া দিবে, তাহা জানিতাম। সে আমাকে এখন নরকে টানিয়া লইতেছে। তুমি কি আমাকে রক্ষা করিবে?" জরাথুষ্ট্র কহিলেন "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, নরক বলিয়া কিছু নাই। সয়তান বলিয়াও কেহ নাই। তোমার দেহের মৃত্যুর পূর্ব্বেই তোমার আত্মার মৃত্যু হইবে। সুতরাং ভয়ের কোনও কারণ নাই।" বাজীকর অবিশ্বাসের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "তোমার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে জীবন হারাইলে কোনও ক্ষতিই নাই, আমার সঙ্গে পশুর প্রভেদও নাই।" জরাথুষ্ট্র কহিলেন "তা কেন? বিপদকে তুমি তোমার ব্যবসায় করিয়াছ। তাহাতে অবজ্ঞার কিছু নাই। সুতরাং আমি স্বহস্তে তোমাকে সমাহিত করিব। বাজীকরের প্রাণবিয়োগ হইল; জরাথুষ্ট্র তাহাকে বহিয়া লইয়া গেল কবর দিবার জন্য।

এক যুবক জরাথুষ্ট্রকে এড়াইয়া চলিত। একদিন তাহাকে ডাকিয়া জরাথুষ্ট্র বলিলেন "পৃথিবী অনাবশ্যক লোকে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনন্তজীবনের প্রলোভনে এই সকল লোক এই জীবন হইতে সরিয়া পড়ুক। হরিদ্রাবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদধারী যাহারা, তাহারা মৃত্যুর প্রচার কার্য্য করে। এই সকল ঘৃণিত লোক অন্তরে শিকারী পশু বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা এখনও মানুষে পরিণত হয় নাই; জীবনকে বর্জ্জন করিবার উপদেশ দিয়া তাহারা যেন জীবন হইতে ভ্রষ্ট হয়। অনেকে আধ্যাত্মিক ক্ষয়রোগে পীড়িত। জন্মিয়াই তাহারা মরিতে আরম্ভ করে, আলস্য ও বৈরাগ্যের উপদেশের জন্য তাহারা উদগ্রীব। মৃত্যু তাহারা চায়, তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। কোনও রুগ্ন অথবা বৃদ্ধ লোকের সহিত তাহাদের দেখা হইলে, অথবা মৃত দেহ দেখিলে, তাহারা বলে "এই তো জীবন!" ইহা দ্বারা তাহাদেরই অপদার্থতা প্রমাণিত হয়। তাহাদের দৃষ্টি জগতের একটা দিকেই আবদ্ধ। অনেকে বলে জীবন দুঃখপূর্ণ। ভালো, তাহা যদি হয়, তবে তোমরা বাঁচিয়া থাকিও না। কেহ কেহ বলে—কাম-প্রবৃত্তি পাপ। সন্তান উৎপাদন করিও না। কেহ বলে "অনুকম্পা না থাকিলে জগৎ চলিতে পারে না। যাহা আমার আছে, সব লও। আমার জীবনের বন্ধন তাহা হইলে খসিয়া পড়িবে।" "যাহারা মৃত্যুর মাহাত্ম্য প্রচার করে, সর্ব্বত্রই তাহাদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত, তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক। তাহারা মরুক।"

"রাষ্ট্র কি? যত প্রকারের রাক্ষস আছে, রাষ্ট্র তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়হীন। নির্ব্বিকারভাবে রাষ্ট্র মিথ্যা বলে।" "আমিই সমগ্র জাতি"—এত বড় মিথ্যা কথা রাষ্ট্রের মুখ হইতে বাহির হয়। ইহা মিথ্যা। জনসাধারণের জন্য ফাঁদ পাতিয়া, যাহারা তাহাদিগকে বলে রাষ্ট্র, তাহারা ধ্বংসকারী। রাষ্ট্ররূপ রাক্ষস উচ্চৈঃস্বরে বলে "পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা বড় কিছুই নাই। আমি ঈশ্বরের আদেশ-প্রচারক অঙ্গুলি।" শুনিয়া সকলে তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া পড়ে; "এই নূতন দেবতার যদি তোমরা পূজা কর, যাহা চাও, তাহাই পাইবে," বলিয়া ইহা তোমাদিগকে পূজার জন্য আহ্বান করে।" শুনিয়া যত অতিরিক্ত (Superfluous) লোক আছে, তাহারা মৃত্যুকে বরণ করে। এই মৃত্যুকেই তাহারা জীবন বলে। রাষ্ট্রের মধ্যে ভালো মন্দ সকলেই বিষপান করে। এখানে মন্থর আত্মহত্যা জীবন নামে অভিহিত হয়। এই সকল অতিরিক্ত লোক অন্যের আবিষ্কার ও জ্ঞান চুরি করিয়া তাহাকে সংস্কৃতি নামে অভিহিত করে। ইহারা রোগে পীড়িত, ইহারা যে পিত্ত বমন করে, তাহাকে "সংবাদপত্র" বলে। ইহারা পরস্পরকে গ্রাস করে। সকলে রাজসিংহাসনের দিকে ধাবিত। রাজসিংহাসনে অনেক সময় উপবিষ্ট হয়—দুর্গন্ধময় মল। অনেক সময় দুর্গন্ধময় মলের উপর রাজসিংহাসন স্থাপিত হয়।"

জরাথুষ্ট্র ও কাম

"নগরে কামুক লোকের সংখ্যা অত্যধিক; এইজন্য আমি বনে বাস করিতে ভালবাসি। কামুকী রমণীর প্রেমের পাত্র হওয়া অপেক্ষা নরঘাতকের হাতে পড়াও ভাল। স্ত্রীলোকের সহিত এক শয্যায় শয়ন অপেক্ষা অধিকতর সুখকর যাহাদিগের নিকট কিছুই নাই, তাহাদের অন্তর মলপূর্ণ। তোমরা নির্দ্দোষ হও—অন্ততঃ জন্তুর মত নির্দ্দোষ হও। আমি তোমাদের সহজাত প্রবৃত্তির নাশ করিতে বলিতেছি না, তাহাদিগকে নির্দ্দোষ করিতে বলিতেছি। দৈহিক বিশুদ্ধি অনেকের পক্ষে দোষ। যাহাদের পক্ষে দৈহিক বিশুদ্ধি কষ্টসাধ্য, তাহাদের তাহার প্রয়োজন নাই। তাহাদের পক্ষে ইহা নরকের দ্বার স্বরূপ।

ক্রমশঃ

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মিলন

(১৮৮৩—১৯৫১)

কলিকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মিলনের যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহাই দেশের পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থায়, বাঙ্গালা বিভক্ত ও দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরে, প্রথম প্রাদেশিক রাজনীতিক সম্মিলন। সেই জন্য ইহার গুরুত্ব যেমন অসাধারণ, লোকের পক্ষে তেমনই আশা করাও স্বাভাবিক যে, ইহা বিপন্ন, বিব্রত, বিভক্ত বাঙ্গালায় প্রাদেশিক কার্য্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া প্রদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পথ মুক্ত করিয়া দেশের সকল সম্প্রদায়কে এক-যোগে সেই পথে অগ্রসর হইতে, সাহায্য করিতে প্রেরণা প্রদান করিবে। এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, ইহার সহিত তেমনই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, প্রভৃতি কয় যুগের বরেণ্য বাঙ্গালীদিগের স্মৃতি বিজড়িত এবং ইহাতে বিগত প্রায় ৭০ বৎসরের রাজনীতিক আদর্শের ক্রমবিকাশ সপ্রকাশ। ইহার স্থাপনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহারও ভাগ্যবিপর্য্যয় অল্প হয় নাই। রাজরোষ, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, দলগত বিবাদ, মতভেদ—এ সকলই প্রবল বাত্যা বা বন্যার মত ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে—ইহা ধ্বংস করিতে পারে নাই। এককালে ইহা বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার প্রাদেশিক সমস্যা সমাধান চেষ্টার কেন্দ্র ছিল। যখন লর্ড কার্জ্জনের পরিকল্পনানুসারে বাঙ্গালা বিভাগ হইয়াছিল, তখনও ইহা সমগ্র বাঙ্গালার সম্মিলন ছিল—কেননা, বাঙ্গালা সে বিভাগ স্বীকার করিয়া লয় নাই। তাহার পরে ইহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিহার, উড়িষ্যা—এমন কি মানভূম, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বঙ্গভাষাভাষী জিলা বিচ্ছিন্ন করা হয়, আর তাহার পরে পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্তান রাষ্ট্রভুক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ইহাতে যোগ দিয়াছেন—"দুই জাতি" মত তখনও প্রচারিত হয় নাই—কল্পনাতীতই ছিল, কারণ তাহা ভেদবুদ্ধিপ্রচারক ইংরেজের সৃষ্টি। তখনও হিন্দু সম্প্রদায় "বর্ণ হিন্দু" ও "তপশিলীতে" বিভক্ত করা হয় নাই। সমগ্র প্রদেশের সমস্যা ইহার আলোচ্য ছিল। ইহা জাতীয় কংগ্রেসের শাখা নদী রূপে তাহার পুষ্টি সাধন করিয়াছে—তাহার শক্তি ও বেগ বর্দ্ধিত করিয়াছে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লালা লজপত রায় বারাণসী কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন—বিশ্বনিয়ন্তার বিধানে দেশে নূতন রাজনীতিক আলোক বিকাশ করিবার অধিকার বাঙ্গালার হইয়াছিল—কারণ, বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার ফল লাভ করিয়াছিল—"নূতন যুগসূর্য্য" বাঙ্গালায় সমুদিত হইয়াছিল। দেশাত্মবোধের প্রেরণা প্রথমে বাঙ্গালায় অনুভূত হইয়াছিল এবং সেই প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিরা ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুমেলা" প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দেও শিশিরকুমার ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিরা ঝিকরগাছায় মেলা স্থাপিত করিয়া দেশের জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধ প্রচারে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। প্রথম সংবাদপত্র বাঙ্গালায় প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালী সুরেন্দ্রনাথই প্রথম দেশাত্মবোধের প্রচার-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—জাতীয়তার জনক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতাতেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিক সম্মিলন হইয়াছিল। কলিকাতাতেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয় অধিবেশন। সেই বৎসরই বোম্বাই নগরে বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। নিখিল-ভারত রাজনীতিক সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজ রাজনীতিক ব্লাণ্ট উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাহার কার্য্য লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষ আজ স্বায়ত্ত-শাসনই চাহিতেছে—কেবল শাসন ক্ষমতাই নহে, আইন প্রণয়নের ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতাও তাহাকে দিতে হইবে।" সুরেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—সেই সম্মিলনে যে ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল, জাতীয় কংগ্রেসে তাহারই পরিণতি—তাহাতে ভারতের নানাস্থানের প্রতিনিধিস্থানীয় আহুত হইয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে—ইলবার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন হয় তাহার প্রত্যক্ষ ফলরূপে—কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কংগ্রেসই সমগ্র ভারতের রাজনীতিকদিগের মনোযোগ লাভ করে। ইংরেজ শাসকরা এক দিকে কংগ্রেসকে দুর্ব্বল করিবার জন্য জমীদার সম্প্রদায়কে ও মুসলমানদিগকে কংগ্রেস-বিমুখ করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন, আর এক দিকে কংগ্রেসের অনিষ্টসাধন করিতে থাকেন। ফলে রাজনীতিকরা কংগ্রেসের কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না যে, বহু প্রাদেশিক সমস্যা—বহু প্রাদেশিক অভাব ও অভিযোগ কংগ্রেসে আলোচিত হইতে পারে না—কংগ্রেসের বিবেচ্য হইতে পারে না। সেই জন্য প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রয়োজন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, প্রাদেশিক সমস্যা নিখিল-ভারত সমস্যায় পরিণতি লাভ না করিলে তাহার আলোচনা কংগ্রেসে হইতে পারে না; অথচ স্বাস্থ্য শিক্ষা—এমন কি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্বন্ধীয় সমস্যাও প্রদেশে প্রদেশে ভিন্নরূপ এবং তাহা প্রাদেশিক প্রতিনিধিদিগের দ্বারা সমবেত ভাবে আলোচিত হওয়াই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। সেই কারণে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রাদেশিক সম্মিলনের আরম্ভ হয়।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার সময় ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার সম্মিলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিবার জন্য বলেন :—

"আমার বিশ্বাস এবং সমবেত ব্যক্তিদিগেরও বিশ্বাস, এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জাতীয় কংগ্রেসের কোনরূপ বিরোধিতা থাকিতে পারে না। কংগ্রেস যে দেশের স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। আমাদিগের কতকগুলি অভাব ও অভিযোগ সমগ্র দেশের হইলেও প্রত্যেক প্রদেশের কতকগুলি স্বতন্ত্র ও বিশেষ অভাব ও অভিযোগ আছে। কংগ্রেসের পক্ষে প্রত্যেক প্রাদেশিক সমস্যার

বিচার করা সম্ভব নহে। সেই জন্য প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সম্মিলনে সে সকল বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। এই সকল সম্মিলন কংগ্রেসেরই পুষ্টিসাধন করিবে—তাহার শক্তিবৃদ্ধি করিবে।—প্রকৃত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবাহ প্রবল করিবে।

বাঙ্গালার পরে অন্যান্য প্রদেশেও প্রাদেশিক সম্মিলন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সে সকলের গুরুত্ব যত অনুভূত হইতে থাকে, সে সকলের শক্তিও তত বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

ইহার পরে কয় বৎসর নরেন্দ্রনাথ সেন বৈকুণ্ঠনাথ সেন, পাদরী বেগ প্রভৃতির নেতৃত্বে কলিকাতাতেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন হয় এবং সেই কারণেই তাহার প্রভাব প্রদেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইতে পারে নাই—তাহা আশানুরূপ বলশালী হয় নাই। তাহা বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালার রাজনীতিক নেতারা সম্মিলনকে যাযাবর প্রকৃতি দিতে—প্রতি বৎসর এক এক জিলায় তাহার অধিবেশন করিতে ব্যবস্থা করেন। সেই ব্যবস্থানুসারে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের আহ্বানে বহরমপুরে সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সে অধিবেশনে আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব ও বৈকুণ্ঠনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। সম্মিলন নব-জীবন লাভ করে।

আমরা নিম্নে পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহের তালিকা ও গুরুত্ব পরিচয় প্রদান করিতেছি :-

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন কৃষ্ণনগরে। এবার সভাপতি গুরুপ্রসাদ সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ। বিহার যখন ইংরেজী শিক্ষায় পশ্চাদপদ ছিল, তখনও যেমন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তথায় হিন্দী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, গুরুপ্রসাদ-বাবু তেমনই তথায় রাজনীতিক জীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন। তথায় উকীল গুরুপ্রসাদবাবু যেমন শিক্ষা-বিস্তারে সহায় হইয়াছিলেন, তেমনই ইংরেজী সংবাদপত্র প্রচার করেন। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত ও সুলেখক ছিলেন এবং 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মনোমোহন ঘোষ তখন ভারতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার। তিনি একাধিক মোকদ্দমায় পুলিসের সাজান সাক্ষ্য ফুৎকারে তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া দিয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ড হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি এদেশে বিচার ও শাসন বিভাগদ্বয়ের সম্মিলন নাশ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনি এই অধিবেশনে ব্যবস্থা করেন, প্রত্যেক প্রস্তাবে একজন বক্তা বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া সকলকে প্রস্তাবটি বুঝাইয়া দিবেন ; কারণ, জনগণের সহযোগ ব্যতীত আমাদিগের পক্ষে রাজনীতিক ক্ষমতা হস্তগত করা অসম্ভব।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের সহিত লালমোহন ঘোষের যে মতভেদ ঘটিয়াছিল, তাহার অবসান হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন নাটোরে। ভারতীয়দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া কবি মধুসূদনের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়াছিলেন সেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই অধিবেশনে সভাপতি ; আর মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সত্যেন্দ্রনাথের ইংরেজীতে রচিত অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছিল। জগদীন্দ্রনাথ স্বীয় অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন।

এই অধিবেশনকালে—অধিবেশন যখন চলিতেছিল সেই সময় দারুণ ভূমিকম্প হয়। সেইজন্য অধিবেশন যথানিয়মে সম্পন্ন হইতে পারে নাই। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের কেবল এই অধিবেশনে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতি বাঙ্গালায় বক্তৃতা করেন।

১৯৯৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—ঢাকা, সভাপতি কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গুরুপ্রসাদ সেন। কালীচরণ-বাবু ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ে নেতৃস্থানীয়দিগের অন্যতম ছিলেন। গুরুপ্রসাদবাবুর বাসগ্রাম বহুদিন পূর্ব্বে পদ্মা গ্রাস করিয়াছিল। অধিবেশন উপলক্ষে তিনি বহুদিন পরে পাটনা হইতে ঢাকায় গিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে কালীচরণের অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালায় অনূদিত করেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বর্দ্ধমানে। তাহাতে সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নলিনাক্ষ বসু।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন ভাগলপুরে। তখনও বিহার বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এবার সভাপতি রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি দীপনারায়ণ সিংহ।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ব্যারিষ্টার অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরেজী রচনায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান নেশান' সাপ্তাহিক পত্র তখন সমাদৃত। সুরেন্দ্রনাথ মনীষিমাত্রকেই রাজনীতিক আন্দোলনে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেন এবং তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে, নগেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনে সভাপতি হইয়াছিলেন। এ বার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র।

পর বৎসর সম্মিলনের কোন অধিবেশন হয় নাই। বিহারে সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল, কিন্তু উড়িষ্যায় হয় নাই। সেই জন্য সুরেন্দ্রনাথ উড়িষ্যা হইতে মেদিনীপুরে আগত কোন বাঙ্গালী প্রতিনিধিকে দিয়া কটকে পরবর্ত্তী অধিবেশন আহ্বান করাইয়াছিলেন। কিন্তু নব-উড়িষ্যার স্রষ্টা উড়িয়া মধুসূদন দাস তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সে বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বহরমপুরে। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই বৈকুণ্ঠনাথ সেন দেশের কাজে অর্থ ও সামর্থ্য অকুণ্ঠভাবে দিয়াছেন। তিনি কার্ণেগীর মত মনে করিতেন to die rich is to die disgraced. এই অধিবেশনে সভাপতি মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মণিমোহন সেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বর্দ্ধমানে। এ বার সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। সভাপতির অধিবেশনে আশুতোষ বলিয়াছিলেন—পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি নাই। এই উক্তি বিপিনচন্দ্র পালের রচনা। ইহা আশুতোষের অভিভাষণে অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান মৈমনসিংহ, সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অনাথবন্ধু গুহ। তখন জানা গিয়াছে, কার্জ্জন বাঙ্গালাকে বিভাগ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; শাসনের সুবিধার ছলে বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করাই বিভাগের উদ্দেশ্য। সেই বিষয় তখন সম্মিলনে ছায়াপাত করিয়াছিল।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বরিশালে, সভাপতি আব্দল রসুল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার দত্ত। রসুল অধিবেশনে প্রথম মুসলমান সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তখন সদ্যায় পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে ব্যামফাইল্ড ফুলার ছোটলাট। তাঁহার সম্বন্ধে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন—তিনি (মর্লি) যেমন এঞ্জিন চালাইতে অযোগ্য, ফুলার তেমনই পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপার পরিচালনে অযোগ্য। ফুলার—লর্ড মিলনারের মত--কেবল পশুবলে আস্থাবান; দমননীতির দ্বারা লোকমত দলিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। তাঁহার আদেশে গুর্খা সৈনিকদিগের দ্বারা সম্মিলনের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির সহিত রাজশক্তির এই প্রথম প্রবল সঙ্ঘর্ষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং সেই সঙ্ঘর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবল প্রেরণা দিয়াছিল। বারুদের স্তূপে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পাতের মত এই ঘটনায় বিস্ফোরণ হয়। বাঙ্গালায় চরমপন্থী দলেরও বাহুবলে বাহুবল প্রহত করিবার চেষ্টার উদ্ভব হয়।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আবার বহরমপুরে অধিবেশন। এ বার সভাপতি দীপনারায়ণ সিংহ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীনাথ পাল। দুই কারণে এই অধিবেশন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) সভাপতি দীপনারায়ণ ভারতে দেশাত্মবোধের প্রচারে বাঙ্গালার কৃতিত্বের ও নেতৃত্বের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলেন- বিহারে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে দরিদ্র কিন্তু গর্ব্বমণ্ডিত বিহার যদি অদূর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র ভাবে আপনার কার্য্য পরিচালিত করিতে চাহে, তবে তাহা কখনই অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(২) বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী--দুই দলে প্রভেদ সপ্রকাশ হয়। শেষোক্তদল পূর্ণস্বাধীনতাকামী ও ইংরেজের সহিত সহযোগ করিতে অসম্মত।

সভাপতির অভিভাষণের উপসংহারে বলা হয়—"জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নতি, জাতীয় সালিশী আদালত, জাতীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ব্যাঙ্ক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং আরও শত শত কার্য্যে জাতিকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই দুর্গম, কিন্তু অগম্য নহে, পথে আমাদিগকে সুমেরুশিরে আরোহণ করিতে হইবে—স্বরাজ-তারকা তথায় অবস্থিত। আসুন আমরা সকলে হিন্দু ও মুসলমান, বাঙ্গালী ও বিহারী মাতৃপূজার যজ্ঞানলে জাতিগত কুসংস্কারের জীর্ণ বাস নিক্ষেপ করি। পবিত্র 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে কলমা ও গায়ত্রী মিলিত হউক। আসুন আমরা ঐ সঙ্গীতের তালে তালে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হই।"

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন পাবনায়। তথায় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী। তখন বাঙ্গালায় রাজনীতিক কর্ম্মীরা দুই দলে বিভক্ত। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল—সে সকল লইয়াই সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। তাই সকল প্রস্তাব মৃদু করিবার চেষ্টা এই অধিবেশনে মডারেট দল করেন। স্থির হয়, ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আমাদিগের কাম্য, মডারেটরা সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন—চরমপন্থীরা তাহাতে আপত্তি করিতে পারিবেন, কিন্তু প্রস্তাব মত গৃহীত হইবে না—কারণ ভোটে চরমপন্থীদিগের জয় অনিবার্য। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা শেষোক্ত দলের বক্তা ছিলেন।

সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গের পরে কংগ্রেস মডারেট দলের হস্তগত হয় এবং সরকার বিনাবিচারে নির্ব্বাসন প্রভৃতি দমনদ্যোতক নীতির দ্বারা চরমপন্থীদিগকে দমিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন—বাঙ্গালায় হিংসাদ্যোতক কার্য্যও আরম্ভ হয়। লক্ষ্ণৌ সহরের অধিবেশনে কংগ্রেসে উভয় দলের মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাদেশিক সম্মিলনও মডারেটদিগের দ্বারা অধিকৃত থাকে। সেই অবস্থায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে অধিবেশন। তাহাতে সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বিপিনবিহারী মিত্র।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন কলিকাতায়; তাহাতে অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতিত্ব করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ফরিদপুরে হয়। সে অধিবেশনে কৃষ্ণদাস রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকায় অধিবেশন হয়। তাহাতে অশ্বিনীকুমার দত্ত সভাপতি এবং আনন্দচন্দ্র রায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। অশ্বিনীবাবুর সভাপতিত্বও সম্মিলনে বিশেষ উৎসাহের উদ্ভব করিতে পারে নাই। তখন প্রদেশের অবস্থা উৎসাহের উপযুক্ত নহে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন চট্টগ্রামে। তাহাতে আব্দল রসুল সভাপতি এবং যাত্রামোহন সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বরিশালে যে অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রসুল তাহার সভাপতি হইবেন, স্থির ছিল।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন কুমিল্লায়—সভাপতি ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন কৃষ্ণনগরে। তাহাতে সভাপতি মতিলাল ঘোষ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রসন্নকুমার বসু। মতিলালবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় সুরেন্দ্রনাথ বলেন—মনোমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত মতিবাবুর নাম নব বঙ্গের অন্যতম স্রষ্টা বলিয়া বিদিত থাকিবে। মতিবাবু সরকারের সহিত রাজনীতিক নেতৃগণের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে বলেন—সাধারণতঃ নিয়মানুগ বিরোধিতা—কেবল দেশের জন্য প্রয়োজনে সহযোগ। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যের প্রয়োজন শিক্ষার প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক, তবে শিক্ষা পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যের সহায়তা করে।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে সম্মিলনের কোন অধিবেশন হয় নাই। পরবৎসর

(১৯১৭ খৃষ্টাব্দ) অধিবেশন কলিকাতায়; সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে উভয় দলে মিলনের পরে সম্মিলনের অধিবেশন হুগলীতে। এ বার সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। তখন সরকার বিনাবিচারে লোককে বন্দী করিয়া রাখিতেছেন। অখিলবাবুর অভিভাষণে তাহার তীব্র প্রতিবাদ ছিল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—মৈমনসিংহ. সভাপতি যাত্রামোহন সেন. অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্যামাচরণ রায়।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরে সম্মিলনের অধিবেশন . অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—উপেন্দ্রনাথ মাইতি, সভাপতি ফজলুল হক।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে অধিবেশন। তাহাতে অশ্বিনীকুমার দত্ত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং বিপিনচন্দ্র পাল সভাপতি। বিপিনবাবু গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পন্থার সমর্থক ছিলেন না। কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অতিরিক্ত অধিবেশনে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে। বহুমতে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতেও বিপিনবাবু সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই বিষয়ে মতভেদহেতু তিনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' পত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্ব ত্যাগ করেন। তিনি বলিতেন–

(১) গান্ধীজী ইন্দ্রজালের ভক্ত, তিনি যুক্তির অনুরক্ত। তিনি গান্ধীজীর মত ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় নির্দ্দেশ করিতে পারেন না —তাহা অসম্ভব।

(২) গান্ধীজীর কর্ম্মপন্থায় মর্য্যাদার যোগ নাই। সে আন্দোলন, বাঙ্গালার বঙ্গবিভাগ-বিরোধী আন্দোলনের মত সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই—তাহা বণিকের আন্দোলন।

বিপিনবাবু তাহার সভাপতির অভিভাষণে গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত কর্ম্ম-পন্থার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। কিন্তু সেই আন্দোলন তখন প্রবল প্রবাহে দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই জন্য বিপিনবাবু তাহার উক্তির জন্য কতক লোকের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখন মত প্রকাশের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করেন নাই। তাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন চট্টগ্রামে। তাহাতে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সভানেত্রী বাসন্তী দেবী। কংগ্রেস কর্ত্তৃক গৃহীত অসহযোগ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন জন্য বাঙ্গালার জনমত গঠনের চেষ্টা এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য। চিত্তরঞ্জন তখন কারাগারে। তিনি ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু, লালা লজপত রায়ের মত, বহুমতের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কংগ্রেস গৃহীত পদ্ধতির সমর্থন করিয়াছিলেন। কারাকক্ষে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের সমর্থক যুক্তিগুলি পুনরায় বিবেচনা করেন এবং তাহার পত্নীর অভিভাষণে তাহার মত প্রতিবিম্বিত হয়। কারামুক্ত হইয়া আসিয়া তিনি গয়ায় কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে এই পরিবর্ত্তনের সমর্থন করেন এবং পরাভূত হইয়া—বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া—কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্যদল গঠিত করেন ও দিল্লীতে অতিরিক্ত অধিবেশনে বিজয় লাভ করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন যশোহরে। তাহাতে সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—নলিনীনাথ রায়। শ্যামসুন্দর কংগ্রেস-গৃহীত অসহযোগ পদ্ধতির সমর্থক। তিনি পরোক্ষভাবে চিত্তরঞ্জনের চেষ্টার বিরোধিতা করেন এবং বলেন—"মহাত্মার তীব্র তপস্যার গোমুখী হইতে যে জীবন-জাহ্নবী দেশের সর্ব্বত্র কলনাদে প্রবাহিত হইতেছে, তাহার বারি কি হিন্দু কি মুসলমান সাধকমাত্রই অঞ্জলি ভরিয়া পান করিতেছেন। তাহা বাধাবিপত্তির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঐরাবত কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে—অন্তর্ব্বাধা ও বাহ্যবাধা কিছুই তাহাকে রোধ করিতে পারিবে না।"

১৯২৪ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন সিরাজগঞ্জে। তাহাতে সভাপতি আক্রাম খাঁ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যোগেশচন্দ্র চৌধুরী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন যেমন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া পশ্চাৎ হইতে ভীষ্মের প্রতি শরসন্ধান করিয়াছিলেন, এই অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন তেমনই, পশ্চাতে থাকিয়া, অসহযোগ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধন জন্য লোকমত গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন ফরিদপুরে। তাহাতে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। গান্ধীজী এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বরিশালে বিপিনচন্দ্রের, চট্টগ্রামে বাসন্তী দেবীর, যশোহরে শ্যামসুন্দরের ও সিরাজগঞ্জে আক্রাম খাঁ'র অভিভাষণ চতুষ্টয়ে যে মতভেদ সপ্রকাশ হইয়াছিল তাহার সমাধান হয় কি না—সমগ্র বাঙ্গালাকে তিনি স্বমতে আনিতে পারেন কিনা দেখিবার জন্য অসুস্থ শরীরেও চিত্তরঞ্জন এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন। তাহার মত শক্তিশালী ও প্রভাবসম্পন্ন নেতার পক্ষে এ বার সভাপতিত্ব করিবার আরও কারণ ছিল :—

(১) তিনি অসহযোগের কর্ম্মপন্থায় পরিবর্ত্তন সাধনে বাঙ্গালাকে তাহার সমর্থন করিতে চাহিতেছিলেন।

(২) তখন বাঙ্গালা সরকার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়ের মধ্যস্থতায় মীমাংসার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিরূপ সর্ত্তে স্বরাজ্য দল মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিতে পারেন, তাহা জানিবার চেষ্টা হইতেছিল।

(৩) বাঙ্গালার রাজনীতিক কর্ম্মীদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় ইংরেজ সরকারের কাযে ধৈর্য্য হারাইয়া অহিংসায় আর অবিচলিত থাকিতে পারিতেছিল না।

চিত্তরঞ্জনের অভিভাষণ সকল কংগ্রেসকর্ম্মীর প্রীতিপ্রদ হয় নাই।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় চিত্তরঞ্জন ফরিদপুর হইতে দার্জ্জিলিংএ গমন করেন এবং তথায় অতিশ্রমকাতর দেহ রক্ষা করেন। তাহার ব্যক্তিত্বে ও বুদ্ধিতে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা একযোগে কার্য্য করিতেছিলেন। তাহার মৃত্যুতে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং বাঙ্গালায় রাজনীতিক বিরোধ প্রবল হয়। তিনি একাধারে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাদেশিক কংগ্রেসের

নেতা, ব্যবস্থাপরিষদে বিরোধীদলের নায়ক ও কলিকাতার মেয়র ছিলেন। সেই তিন মুকুট (triple crown) একজনেরই থাকিবে কি না, তাহা লইয়া মতভেদ হয়।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যখন কৃষ্ণনগরে সম্মিলনের অধিবেশন হয়, তখন সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, মতভেদহেতু, অধিবেশনের কার্য্য সম্পূর্ণ না করিয়াই আসন ত্যাগ করিলে—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অধিবেশনের অবশিষ্ট সময় সভাপতিত্ব করেন এবং তাহা নিয়মানুগ কি না, তাহা লইয়া মতভেদ হয়। সে অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—বসন্তকুমার লাহিড়ী।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন হাওড়া জিলায় মাজু গ্রামে। সে বার সভাপতি যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডক্টর প্রমথনাথ নন্দী।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান—বসিরহাট (২৪ পরগণা), সভাপতি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তখন যতীন্দ্রমোহন বাঙ্গালায় চিত্তরঞ্জনের স্থানে গান্ধীজীর চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত।

এই সময় হইতে আবার দমননীতির প্রাবল্য লক্ষিত হয়। ইংরেজ সরকার চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে আবার বাঙ্গালার স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দমননীতি প্রযুক্ত করিতে থাকেন। সেই জন্য ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। এই সময় বাঙ্গালার রাজনীতিক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বসু অভ্রংলিহ গিরিশৃঙ্গের মত প্রতিভাত হইতে থাকেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রংপুরে সম্মিলনের অধিবেশনে তিনিই সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে নলিনীনাথ রায়চৌধুরী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের স্থান রাজসাহী, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুদর্শনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। নির্ব্বাচিত সভাপতি বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হওয়ায় ললিতচন্দ্র দাশ তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বহরমপুরে। এ বার সভাপতি হরদয়াল নাগ, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আবদুস সামাদ।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি ডক্টর ইন্দ্রনারায়ণ সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ইংরেজ আমলাতন্ত্রের নীতি অনুসারে, তাঁহারা দেশবাসীকে হয় দমিত না হয় বিদ্রোহী করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। দমনের পর দমনদ্যোতক ব্যবস্থায় দুই বৎসর সম্মিলনের অধিবেশন সম্ভব হয় নাই। তাহার পরে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি যতীন্দ্রমোহন রায়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাধাগোবিন্দ রায়।

পরবর্ত্তী অধিবেশন ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে জলপাইগুড়ীতে। তাহাতে সভাপতি—শরৎচন্দ্র বসু। সেই অধিবেশনে সুভাষের নেতৃত্বের স্বরূপ অগ্রজের সভাপতিত্বে বিকশিত হয়। সে অধিবেশনে বৃটিশ সরকারের সহিত সংগ্রামের ঘোষণা করা হয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

এই অধিবেশনে ইংরেজাধিকৃত ভারতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের মঞ্চে যবনিকাপাত হয়।

নূতন অবস্থায়—স্বায়ত্ত-শাসনশীল বিভক্ত ভারতরাষ্ট্রে—হাওড়ায় সে যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে। অবস্থা স্বতন্ত্র—দৃশ্য অভিনব—অভিনেতারা সকলে নূতন নহেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের ইতিহাস প্রায় ৭০ বৎসরের বাঙ্গালার রাজনীতিক কাম্যের—ভাবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস। "নিবেদন আর আবেদন" পরে ইহাতে পূর্ণস্বাধীনতার দাবী এবং পরিবর্ত্তন ইহাতে আছে, বহু আন্দোলন ইহাতে তাহাদিগের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। বহু ঘটনায় ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দীর্ঘকাল নিখিল-ভারতীয় সমস্যা—স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা—ইহাতে বাঙ্গালার নিজস্ব বহু সমস্যায় আবশ্যক মনোযোগদানের অবসর দেয় নাই। আজ বাঙ্গালা খণ্ডিত—ভারত বিভক্ত। পশ্চিমবঙ্গে আজ নূতন বহু সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। আশা করি, হাওড়ার অধিবেশন নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিবে এবং বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার সমস্যা সমাধানে অধিক প্ররোচিত করিতে পারিবে।

খোঁজ

শ্রীশীতল বর্ধন

স্বপন ঘোরে গহন বনে
পথ হারাতে চাই,
নাইবা যদি ফিরতে পারি
ভাবনা কিছু নাই।
বন ফুলের ফোটাদলে
যবে জোনাক বাতি জলে,
ছায়াদলের একাকারে,
মিশিয়ে যেতে চাই।

বনের দেবী সেথায় তুমি
পায়ে নূপুর বাজে,
অন্ধকারে ঝিল্লী রবে
নিত্য সেথা সাঁঝে।
ঝরা পাতার বিছানাতে,
ডাকে নিশী নিঝুম রাতে,
মনে আমার জাগে সাড়া,—
তোমার খোঁজে যাই।

(পূর্বানুবৃত্তি)

মূর্ত্তিমতী বৈরাগ্যের মত রূপ। অজয়ের গর্ভধারিণী—বিশ্বনাথের প্রথমা-পত্নী জয়া। বৈরাগ্যের মত রূপ, কিন্তু কোথাও একবিন্দু বিষন্নতা নাই, প্রসন্ন মুখ প্রশান্ত দৃষ্টি। শুভ্র দেহবর্ণ, শুভ্র পরিচ্ছদ, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাটা—মাথায় ছোটখাটো একটি মেয়ে—অরুণাকে কয়েক মুহূর্ত্ত স্থির দৃষ্টিতে দেখিল—তারপর বলিল—এস।

অরুণা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল। করিবারই যে কথা। মনে মনে অপরাধ-বোধ কাঁটার মত খোঁচা মারিতেছিল। মনে হইতেছিল—নিজে সে বঞ্চক, ওই মেয়েটিকে বঞ্চিত করিয়া সে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ একদা কাড়িয়া লইয়াছিল। শুধু কাড়িয়া লইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার স্বত্বটুকু পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দাবীটুকু নিঃশেষে বিলুপ্ত করিয়া দিবার জন্য—বিশ্বনাথের সামাজিক সত্তাটুকু মুছিয়া দিয়া তাহাকে অন্য মানুষে পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার এ অস্বস্তিকর ভাবটুকু ওই বঞ্চিত মেয়েটিই ঘুচাইয়া দিল। আগাইয়া আসিয়া তাহার হাতে ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিল—যাঁকে নিয়ে তোমাতে আমাতে ঝগড়া বিবাদ হ'তে পারত' ভাই—তিনিই যখন নাই—তখন তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে দুঃখ পাব আমি। এখন তো আমাদের দুজনেরই এক দুঃখ। সুখের অংশ নিয়ে ঝগড়া হয়, এক দুঃখের দুঃখী যারা তাদের ঝগড়া নাই। দুঃখ তাদের বুকে বুকে মিলিয়ে দিয়ে আত্মায়-আত্মায় মিলিয়ে দেয়।

অরুণা তাহাকে প্রণাম করিয়া পাশে বসিল। অনেক কষ্টে তাহার সঙ্গে আলাপের ভূমিকা করিল—নিতান্ত সাধারণ মানুষের মত অতি সাধারণ অর্থহীন প্রশ্ন করিয়া—প্রশ্ন করিল—ভাল আছেন আপনি? জয়াকে সে যতক্ষণ দেখে নাই—ততক্ষণ তাহার মনে একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল—কিন্তু এখন সামনে আসিয়া সে যেন কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। জয়া বলিল—শরীর আমার ভাই বড় একটা খারাপ কখনই হয় না। তবে অজয়টা আমাকে দুঃখ দিতে চেষ্টা করছে—এই জন্যে মনটা ভাল নাই। বলা নেই কওয়া নেই পালিয়ে এসেছে।

—এখানে এসেছে?

—হ্যাঁ। সে আমি জানতাম। দাদুর সঙ্গে দেখা না-করে সে কোথাও যাবে না। এসেওছিল দাদুর কাছে।

—কবে?

—দিন সাতেক আগে। দাদু লিখলেন—অজয় এসেছিল—বোধহয় না ব'লেই চলে এসেছে। আমার কাছে একবেলা থেকে—একটু ঘুরে আসি ব'লে বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরে নাই। সে কাশী ফিরেছে কিনা জানাবে। কি করব, অগত্যা ছুটে এলাম।

—খোঁজ পেয়েছেন কিছু? এই তো ছোট এতটুক্-খানি শহর—এখানে সে লুকিয়ে থাকবে কোথায়?

—খোঁজ কিছু পাই নি। দেখি, ফিরবেই তো। না-ফিরে যাবে কোথায়?

—না-ফিরে যাবে কোথায়? এ আপনি কি বলছেন?

এবার যেন আর একটি মানুষ ওই সরল সহজ মানুষটির ভিতর হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, জয়া বলিল—নাই যদি ফেরে, তাই বা কি করব? একটি হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল—বিচিত্র বিস্ময়কর রূপ সে হাসির। কণ্ঠস্বর অনাসক্ত প্রসন্ন, বিষন্নতার এতটুক্ স্পর্শ নাই।

অবাক হইয়া গেল অরুণা।

ঠিক এই সময়েই খড়মের শব্দ বাজিয়া উঠিল।

বৃদ্ধ ন্যায়রত্ন আসিতেছেন। সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ দেবকী

সেনের সঙ্গে আগাইয়া আসিয়া হাসি মুখে দাঁড়াইলেন।—সেন সংবাদ দিলে তুমি এসেছ।

অরুণা তাঁহাকে প্রণাম করিল।

জয়া আসন পাতিয়া দিল, ন্যায়রত্ন বসিয়া বলিলেন—জয়া এসেছে কাল, তোমায় খবর দিতে বলেছে। আমি বলেছিলাম—জয়ারই গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করাটা উচিত হবে। জয়া যেত, তুমি তার আগেই এসে পড়েছ। ভালই হয়েছে।

অরুণা ও সব কথা এড়াইয়া একেবারে বলিয়া বসিল—আপনার কাছেই আমি আসছিলাম। প্রশ্ন ছিল অনেক। কিন্তু পথে দেবকীবাবুর মুখে অজয়ের কথা শুনে সে সব প্রশ্ন আমার আর মনেই নেই। শুধু একটা কথাই মনের মধ্যে তোলপাড় করছে। আপনাকে জিজ্ঞাসা করব।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল, অথবা—ওই প্রশ্নটাই তাহার মনের মধ্যে যে আবেগের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহাতেই তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

ন্যায়রত্ন তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

অরুণা বলিল—এ কথার সত্যি জবাব আমাকে আর কেউ হয় তো দেবেন না। আমি দুঃখ পাব বলেই দেবেন না। কিন্তু আপনি নিজে দুঃখকে ভয় করেন না, দুঃখ মিথ্যে বলেই ভয় করেন না। আপনি আমাকে বলুন—অজয় যে ঘর ছেড়ে মাকে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে এসেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করে—আপনার কাছ থেকেও চলে গেল, সে কেন? তার কারণ কি আমি?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—তাঁহার কণ্ঠস্বর একবার কাঁপিল না বা কোন ক্রমে সঙ্কুচিত হইল না, বলিলেন—হ্যাঁ।

অরুণা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তারপর বলিল—তার অভিযোগটা কি? আমার বিরুদ্ধে তার অনেক অভিযোগ থাকতে পারে, কিন্তু আপনাদের অপরাধটা কি? আমাকে স্বীকার করা?

ন্যায়রত্ন হাসিলেন, ওই হাসিই অরুণার কথার জবাব। ওই হাসিই বলিয়া দিল—হাঁ।

অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল—আমি আপনাদের সঙ্গে আর কোন সংশ্রব রাখব না। অজয়কে বলবেন।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—সে তো জয়াও পারবে না, বিশ্বনাথ তাকে তার শেষ পত্রে অনুরোধ ক'রে গিয়েছে।

অরুণা চকিত হইয়া মুখ তুলিল! ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বিশ্বনাথ জয়াকে শেষ পত্রে অনুরোধ করিয়া গিয়াছে? শেষ পত্র?

ন্যায়রত্ন বলিলেন—জেলের হাসপাতালে মৃত্যু শয্যা থেকে সে জয়াকে পত্রখানি লিখেছিল। এই একখানি পত্রই সে লিখেছিল—সম্পর্কচ্ছেদের পর। আমি সে পত্র দেখিনি। জয়া আমাকে কাল এসে দেখালে! তোমাকে সে বিবাহ করেছিল, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছিল, এ সব কোন কথাই আমি জানতাম না। মৃত্যু শয্যায় আমার সঙ্গে তার দেখাও হয় নি। তুমি ছিলে—তার শেষ শয্যার পাশে, তুমি জান সে তোমাকে কিছু ব'লে গিয়েছিল কি না। আমি যখন গিয়ে পৌঁচেছিলাম তখন সংকার হয়ে গেছে, সংবাদ শুনে আমি জেল ফটক থেকেই ফিরেছিলাম। যাক সে সব কথা। তোমার সঙ্গে জংসনের প্ল্যাটফর্মে দেখা হ'ল—তুমি এসে দাবী জানালে, ইরসাদ বললে—সে সাক্ষী, মুসলমান হয়ে সব সম্পর্কচ্ছেদ করে—তোমাকে নিয়ে সে নতন জীবন স্বরু করেছিল। আগেকার দিন হলে—আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করতাম না। বারবার অস্বীকার করেছি—ক'রে আজ যে উপলব্ধিতে পৌঁচেছি—তাতে তোমাকে অস্বীকার করতে আমি পারি না—পারলাম না। মানুষের চেয়ে বড় সত্য আমার কাছে আর কিছু নাই। কঠোর ধর্ম্ম-পালন করে মানুষের চেয়ে বড় কিছু পাই নি। মানুষকে আঘাত করেছি—বর্জ্জন করেছি—দুঃখ পেয়েছি। তোমাকে স্বীকার করলাম—অজয়—না—না, বলে ছুটে পালাল। কিন্তু কি করব? অজয়কে আমি ত্যাগ করি নি। সেই ত্যাগ করলে আমাকে। করুক। আমি এখানেই থেকে গেলাম। আমার গৃহ-দেবতা নিয়ে সমস্যা—ওটা নিতান্তই ছদ্ম একটা আবরণ। গৃহদেবতার সেবার জন্য জমি আছে, জমির জন্য অনেকে নেবেন পূজার ভার। তা ছাড়া—আমাদের বংশের নির্দ্দেশ আছে—যদি কোনদিন গৃহদেবতার পূজা অচল হয়ে কোন কারণে—যদিই নির্ব্বংশ হয় এই মহাগ্রামের ঠাকুর বংশ—তবে—যে জয়তারার আশ্রম থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই বিগ্রহ, সেই জয়তারা

আশ্রমেই ফিরে যাবেন বিগ্রহ এবং তার সঙ্গে যাবে সমুদয় সম্পত্তি। আমি বিগ্রহ জয়তারার আশ্রমেই এনে রেখে—এখানে থেকে গেলাম—তার কারণ, ওই অজয়। আমি কাশী ফিরে গেলে—অজয় আমার উপর অভিমান করে হয়তো—নিষ্ঠুর একটা কিছু করতে পারে। কিন্তু জয়া যে বিশ্বনাথের অনুরোধ—আদেশ বলে শিরোধার্য করে অজয়ের সঙ্গে মত-বিরোধ ঘটাবে—সে কি ক'রে জানব? অজয় এল। বললে—ঠাকুর—আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম—একটা কথা।

বললাম—বল কি কথা?

বললে—আপনি কাকে চান? আমাকে—না—ওই—কি বলে তোমাকে বুঝাবে ভেবে পেলে না। মা বলতেও চায় না, আবার নাম ধ'রে—কি কোন অসম্মানজনক উক্তি ক'রেও বুঝাতে মুখে বাধে। আমি বুঝলাম, বুঝে, আমিই কথা জুগিয়ে দিলাম. বললাম—কার কথা বলছ? আমার কনিষ্ঠা পৌত্রবধূর?

বললে—হাঁা। হাঁা। তার কথাই বলছি।

বললাম—ভাই, আমার তো আর চাওয়ার দিন নাই। এখন যাওয়ার ভাবনাই বড়। এ সময়—কাউকে আঁকড়ে আমি ধরে নেই। তবে স্বীকার অস্বীকারের কথা যদি বল—তবে বলব ভাই, বিশ্বনাথ আমার পৌত্র—তুমি যেমন তার পুত্র—সে তেমনি তার স্ত্রী। বিশ্বনাথ যে ধর্ম্মই গ্রহণ করুক—আমার পৌত্র—এ সত্যটা যখন কিছুতেই ঘুচবে না, তখন তুমিই বল—কেমন ক'রে আমি অস্বীকার ক'রে বলব—সে আমার কেউ নয়? বললাম, তার চেয়ে তোমরা সকলেই আমাকে মুক্তি দাও। আমি যে মুক্তি নিয়েছি—সেই মুক্তিকে তোমরা সকলে স্বীকার করে নাও। বল—তুমি মুক্ত। তোমার উপর আমাদের কোন দাবী নাই, তুমি আমাদের কেউ নও।

শুনলে, কোন জবাব দিলে না। দ্বিপ্রহরের পর—আসছি বলে চলে গেল।

ন্যায়রত্ন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—কাল জয়া এল, তার মুখে শুনলাম, সেখানে তার মায়ের সঙ্গে এই প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ হয়েছে বলে—সে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। জয়া তাকে বিশ্বনাথের পত্র দেখিয়েছে—বলেছে তাঁর আদেশ অমান্য করতে আমি পারব না।

অরুণা বলিল—সে পত্র আছে? আমাকে দেখাবেন একবার?

—তুমি দেখবে?

দৃঢ়কণ্ঠে অরুণা উত্তর দিল—হাঁা—আমি দেখব।

ন্যায়রত্ন জয়াকে বলিলেন—পত্রখানি দাও। পড়ে দেখুক।

পত্রখানি হাতে লইতেই অরুণার হাত কাঁপিয়া উঠিল। কঠিন সংযমে নিজেকে দৃঢ় করিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তারপর পত্রখানি খুলিল।

বিচিত্র পত্র; বিশ্বনাথেরই উপযুক্ত পত্র।

হাসপাতালে বোধ হয় মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া আছি, চিকিৎসকেরা সঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, সঙ্গী সাথীরাও সঠিক বুঝিতেছেন না কিন্তু আমি বুঝিতেছি—এ শয্যা হইতে আমি উঠিব না। দাদু বলিতেন, তাহার কাছে শুনিয়াছিলাম, আজ অনুভব করিতেছি। হয় তো আমাদের বংশগত সাধনার প্রভাব আমার রক্তধারায়, আমার দেহকোষে যে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে তাহার গুণেই আমার অনুভূতি প্রত্যক্ষভাবে মিলাইয়া অনুভব করিতেছে। আমার সমস্ত দেহ মন—একটি তিক্ত বিষাদে ভরিয়া গিয়াছে; এক অসহনীয় অস্বস্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্ব বস্তুতে শুধু জিহ্বার অরুচি নয়—সমস্ত কিছুর প্রতি একটা বিরাগের অরুচি আসিয়াছে। কিছু খাইতে ভাল লাগে না, কোন মানসিক আকাঙ্ক্ষাও আর নাই। শুইয়া বসিয়া বিশ্রামের শান্তি পাই না, ঘুম হয় না, অথচ মনে হয় একটা গভীর নিদ্রার আমার প্রয়োজন। তাহা হইলেই বাঁচি। দাদু বলিতেন—এই হইল মৃত্যুর স্পর্শ; বর্ষণের শান্তির পূর্ব্বে রৌদ্রের প্রখরতার মত এটুকু আয়োজন-পর্ব্ব। এবং মন আমার বলিতেছে—দিন নাই—দিন নাই—দিন নাই। তাহাতে কোন ক্ষোভ নাই; আমি ও ভাবনায় নির্ভয় এবং প্রসন্ন।

শুধু কয়েকটা কথা তোমাকে জানাইতে চাই।

তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম—তাহার কারণ তুমি জান।

আমার জীবন-বিশ্বাসে—তোমাদের জীবন-বিশ্বাসে অনেক প্রভেদ। অনিবার্য্য রূপে—তোমাদের সঙ্গ হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হইত। না হইলে—আমার বিশ্বাস

বিসর্জ্জন দিয়া তোমাদের লইয়া অন্য জীবন যাপন করিতে হইত। কারণ তোমরা অর্থাৎ তুমি বা দাদু আমার পথের পথিক হইতে পারিতে না। এ লইয়া কোন অনুশোচনা আমার নাই। যাক্। তোমাদের পরিত্যাগ করিয়াই আমি ক্ষান্ত হই নাই। আমি আইনগতভাবে ধর্ম্মগত পদ্ধতিতে তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া অরুণা সেন নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম; পরে আবার হিন্দু হইয়াছিলাম। সে আমার কর্ম্মসঙ্গিনী, জীবনবিশ্বাসে আমরা এক সম্প্রদায়ের মানুষ। তোমাকে বিবাহ করিয়া প্রথম যৌবনে যেমন সুখী হইয়াছিলাম—তেমনি সুখী হইয়াছিলাম। সে কলিকাতায় তাহার পিত্রালয়ে আছে। আসিতে পত্র লিখিয়াছি।

মৃত্যুকালে অনেক ভাবনা ভিড় করিয়া আসিতেছে।

আমি তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকাইয়া দিলেও তোমরা চুকাইয়া দাও নাই—এইটাই প্রথম ভাবনা। ভাবিতেছি—যাচাই করিয়া দেখিয়া বলিতেছি, সেখানে তো ফাঁকি নাই। তুমি ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ভালবাসা দুটাকে এমন এক করিয়া লইয়া আমাকে মনে করিয়াই রিক্ত জীবনযাপন করিতেছ—তাহার সম্পর্কে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছি না। অনেকের মধ্যেই এই জীবনে ফাঁকি আছে, অসত্য আছে—কিন্তু তোমার মধ্যে নাই এ আমি জানি। কোন লোভ তোমাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, সেখানে শুধু যে অন্ধ ধর্ম্মবিশ্বাসই একমাত্র সত্য—তা-তো নয়, আমি জানি—সেখানে আমার প্রতি ভালবাসাও সমান সত্য—একথা আমার চেয়ে আর তো কেউ বেশী জানে না! আমি পরিত্যাগ করিয়াও আমার উপর তোমার যে দাবী—সে দাবীকে তো উচ্ছেদ করিতে পারি নাই। সে এক অদ্ভুত অক্ষয় দাবী! ভালবাসা ধর্ম্মকে মহীয়ান করিয়াছে—ধর্ম্ম ভালবাসাকে অক্ষয় অমর করিয়াছে। সেখান হইতে আমার স্মৃতির সম্পর্কের মুক্তি নাই। আমি বাহির হইতে যত আঘাত হানিতে যাইতেছি—তত সে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। আমি লজ্জিত হইতেছি। তাই ওখানে হাত দিব না। বারণ করিব না। তাই এ চিঠি লিখিতে আমি বাধ্য হইলাম। নূতন জীবন-বিশ্বাসে আমার যাহা ধারণা, তাহার সঙ্গে না-মিলিলেও—তোমার এই শুচি শুভ্রতার প্রতি মুগ্ধ না হইয়া উপায় নাই। এই জীবন বিশ্বাস মত—তোমাকে যে পথনির্দ্দেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য—তাহা দিব না—কারণ সে উপদেশ তোমার জন্য নয়। তুমি সাধারণ হইতে ব্যতিক্রম।

যাক্। অন্য কথা। এইবার বলিব আমার বর্ত্তমান স্ত্রীসম্পর্কে কথা। অরুণা আমার শক্তিময়ী জীবনসঙ্গিনী। আমার কর্ম্মের দোসর। ভাবনায় সহভাবিনী। আমাদের নূতন জীবন-বিশ্বাস অনুযায়ী সে তাহার পথ বাছিয়া লইবে, দ্বিধা করিবে না। আমিও তাহাকে বলিয়া যাইব। সে পুনরায় বিবাহ করিবে। সুখী হইবে; জীবনের কর্ম্মপথে দোসর খুঁজিয়া লইয়া সে আবার চলিতে সুরু করিবে। নিজে সে শিক্ষিতা মেয়ে, আপন জীবিকা সে উপার্জ্জন করিয়া লইতেও পারিবে। ভাবনা কিছুই নাই। তবুও ভাবিতেছি। ভাবিতেছি—ভালবাসাটা যদি তোমার মতই সত্য হইয়া উঠিয়া থাকে? ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে বাদ দিয়াও তো এমন হয় বা হইতে পারে! তাহার মন যদি আমাকে ভুলিতে না-পারিয়া—তাহার তরুণ জীবনের দেহের দাবীকে উপেক্ষা করিয়াই থাকিতে চায়? এবং কোনদিন কোনক্রমে রোগে হোক বিপদে হোক—এমন কি তাহার বার্দ্ধক্যে হোক—তাহার আপনজনের আশ্রয়ের বা সেবার প্রয়োজন হয়? তবে সেদিন—তুমি যদি বাঁচিয়া থাক—তবে তাহাকে আপনজন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইও। এইটুকু অনুরোধ করিয়া গেলাম। মেয়েটির মা-বাপ নাই, আছে তাহার এক ভাই—সেও আমারই মত রাজনৈতিক কর্ম্মী—তাহারও জীবন অনিশ্চিত;—আর আছে খুড়ো এবং খুড়ী, তাহাদের উপর সকল কালের ভরসা করা যায় না। তাই তার সম্পর্কে আমার চিন্তা। জানি চিন্তা মিথ্যা। জীবন আপন পথ বাছিয়া লয়, দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া পথ করিয়া লওয়ার শক্তি তাহার অদ্ভুত। তবুও তোমাকে লিখিলাম। অবশ্য প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না—কারণ অরুণা যে অসাধারণ যুক্তিবাদে বিশ্বাসী দৃঢ়চিত্ত মেয়ে—তাহাতে সে—কর্ম্মপথের সকল স্মৃতির দুর্ব্বলতা পিছনে রাখিয়া সম্মুখে চলিবার শক্তির অধিকারিণী বলিয়াই আমার বিশ্বাস।'

চিঠিখানা শেষ করিয়া অরুণা মুখ তুলিল।

জয়া বলিল—এবার চিঠিখানাই অজয়কে পড়তে দিতে হবে। দিই নি, লজ্জা তো খানিকটা লাগে!

হাসিল সে। (ক্রমশঃ)

খাদ্য-সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতরাষ্ট্রের খাদ্য-সমস্যার সমাধান এখনও হইতেছে না। আমরা প্রথমে পশ্চিম বঙ্গের সমস্যার বিষয় আলোচনা করিব। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব হইয়া ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১৫ই মাঘ ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছিলেন—

"আমার মত এই যে, বর্ত্তমানে যে স্থানে লোককে ৮ আউন্স মাত্র খাদ্যোপকরণ দেওয়া হইতেছে, সে স্থানে মানুষের ১৬ আউন্স খাদ্যোপকরণ প্রয়োজন।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন, তিনি অবগত আছেন—চোরা বাজার চলিতেছে এবং বাহিরে গোপনে খাদ্য-শস্য চালান করা হইতেছে। তিনি লোককে সাহায্য প্রদান করিতে বলেন। চোরা বাজার ও গোপনে খাদ্য-শস্য চালান—পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, দীর্ঘ ৩ বৎসরেও পশ্চিম-বঙ্গে সরকার লোককে ৯ আউন্স মাত্র খাদ্যোপকরণ দিয়া আসিতেছেন! অর্থাৎ আজও তাঁহারা প্রদেশকে খাদ্যো-পকরণ সম্বন্ধে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। যদি প্রত্যেককে ১৫ আউন্স হিসাবে দৈনিক দিতে হয়, তবে ৪৪ লক্ষ টন খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হয়—তাহার মধ্যে চাউল ৪০ লক্ষ টন; দাইল এক লক্ষ টন এবং গমজাত দ্রব্য ৩ লক্ষ টন। সরকারী হিসাবে দেখা যায় ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন—

আমন ধান্য···৩২, ৬৯, ৫০০ টন

বোরো ধান্য··· ১৬, ৭০০ টন

আশু ধান্যের হিসাব এখনও সরকারের হস্তগত হয় নাই! আর আশু ধান্যের জমীতে পাটের চাষও করা হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুন্দরবন অঞ্চল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি যে বিবৃতি দিয়া-ছেন, তাহার আলোচনার পূর্ব্বে আমরা বলিতে চাহি, বাঙ্গালার গভর্ণররূপে লর্ড রোণাল্ডশে যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে অবিভক্ত বাঙ্গালায় সুন্দরবন অঞ্চলে ধান্য চাষের জমীর পরিমাণ ৬ কোটি একর। পশ্চিমবঙ্গে তাহার কত অংশ পড়িয়াছে, তাহা জানিবার বিষয়। শ্যামা-প্রসাদ বলিয়াছেন, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ২৪ পরগণা জেলার ২টি স্থানে—কলিকাতার অদূরে যে জমী ৩ বৎসর পূর্ব্বেও ধান্য উৎপাদন করিত, তাহা আজ জলমগ্ন এবং সেই ২টি স্থানে জল নিকাশের ব্যবস্থা হইলে বার্ষিক প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মণ অধিক ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে।

(১) ক্যানিং (মাতলা) থানার এলাকায় ৩ শত ৪৪ বর্গমাইল স্থান এখন বৎসরের অধিকাংশ সময় জলমগ্ন থাকায় চাষের অযোগ্য। তথায় লোক-সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। তথায় ৩ বৎসর পূর্ব্বেও চাষ হইত। বিদ্যাধরী নদীর বাঁধ কোথাও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভগ্নদশাগ্রস্ত। তথায় ৩ লক্ষ মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে। মাত্র ৪।৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে এই ৩শত ৪৪ বর্গমাইল স্থান চাষের উপযোগী করা সম্ভব।

(২) সোনারপুর ও বারুইপুর দুইটি থানার এলাকায় ১০৫ বর্গমাইল স্থান, সরকারের স্বীকৃতি অনুসারে, বিদ্যাধরী ও পিয়ালী নদীদ্বয় মজিয়া যাওয়ায় জলমগ্ন থাকে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের মতে এই জমীর জল-নিকাশের ব্যয় ৯০ লক্ষ টাকা। জল-নিকাশ হইলে যে জমীতে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার

মণ ধান্য উৎপন্ন হইতে পারে তাহার জন্য এক বার ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় অধিক নহে। কারণ, উৎপন্ন ধান্যের মূল্য প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার—প্রয়োজন মনে করিলে—এই ব্যয়ের টাকা কেন্দ্রী সরকারের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে লইয়া ২ বৎসরে শোধ করিতে পারেন।

আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবিলম্বে এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

সরকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কতকগুলি কথা জিজ্ঞাস্য। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-শস্যের অভাব কি অনিবার্য বৃদ্ধি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছে? সরকারী ব্যবস্থায় শতকরা ১৩ মণ ৩০ সের খাদ্য শস্য কি নিম্নলিখিতরূপ হারে কমিতেছে?—

জিলায় সংগ্রহকারী সংগ্রহ বাবদে	১ মণ
জিলা সংগ্রহকারী গুদাম হইতে সরকারী সংগ্রহ-গুদামে প্রেরণ বাবদে	২০সের
সংগ্রহকারী গুদামে ঘাটতী বাবদে	১ মণ
ঐ গুদাম হইতে জলপথে বা স্থলপথে প্রেরণের ঘাটতী বাবদে	২০সের
রেলে বা নৌকায় কলিকাতায় মাল প্রেরণের ঘাটতী বাবদে	১ মণ
ঘাট বা সাইডিং হইতে সরকারী গুদামে প্রেরণকালে লরীতে ঘাটতী বাবদে	২০ সের
খাদ্য গুদামে ঘাটতী বাবদে	১ মণ
খাদ্য গুদাম হইতে রেশন গুদামে মাল প্রেরণে ঘাটতী বাবদে	২০ সের
রেশনিং গুদামে ঘাটতী বাবদে	১ মণ
রেশনিং গুদাম হইতে রেশন দোকানে মাল প্রেরণে লরীতে ঘাটতী	২০ সের
রেশন দোকানে ঘাটতী বাবদে	১মণ ১০সের
মোট ঘাটতী	১৩ মণ ৩০ সের

এইরূপে স্বাভাবিক ঘাটতী অস্বাভাবিক ঘাটতীতে পরিণত হয়।

তদ্ভিন্ন এ কথা কি সত্য যে, বে-সরকারী রেশন দোকানে কোন ক্ষতি না হইলেও সরকারী রেশন দোকানে ১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে মোট লোকশান—৫ লক্ষ ২২ হাজার ২শত ৭১ টাকা?

মোট মজুদ শস্যের মূল্য	...	৬৬,০৮৬ টাকা
যে মাল দোকানে গিয়াছে তাহার মূল্য		১৩,৭৬,২১০ টাকা
	মোট	১৪,৪২,২৯৬ টাকা
বিক্রীত মালের মূল্য	.	৮,৩৯,৪৪৬ টাকা
মজুদ মালের মূল্য	...	৮০,৫৭৯ টাকা
	মোট	৯২০,০২৫ টাকা

সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ—৫,২২,২৭১ টাকা।

এই অবস্থায়—যদি রেশনিং ব্যবস্থা রাখিতেই হয়, তবে সরকারী দোকান বন্ধ করিয়া বেসরকারী দোকানের মারফতে লোককে খাদ্যোপকরণ দিবার ব্যবস্থা করা হয় না কেন?

আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিয়া উত্তর দিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য-সচিব আশা করেন, ১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার—

(১)	সেচ ও জল নিকাশের দ্বারা অতিরিক্ত	১,২৮,০০০ টন
(২)	ভূমির উন্নতি সাধনের দ্বারা অতিরিক্ত	২,০০০ টন
(৩)	উৎকৃষ্ট বীজ দিয়া অতিরিক্ত	৬,০০০ টন
(৪)	সার দিয়া অতিরিক্ত	১০,০০০ টন

চাউল পাইবার আশা করেন।

কিন্তু "আশায় নিরাশা ফলে"—পণ্ডিত জওহরলালের ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতরাষ্ট্র খাদ্যোপকরণে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করিবার আশা নিরাশায় পরিণতি লাভের পরে আর আশায় নির্ভর করিয়া লোক অপূর্ণাহারে থাকিতে সম্মত হইতে পারে না। আর জিজ্ঞাস্য—সরকার উৎকৃষ্ট বীজ কোথা হইতে সংগ্রহ করিবেন এবং কিরূপেই বা সার দিয়া অতিরিক্ত ১০ হাজার টন চাউল পাইবার আশা করিতে পারেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাটের বীজ সম্বন্ধীয় ব্যাপার লোক ইহার মধ্যেই ভুলিতে পারে না। সরকারের সার-সরবরাহ সম্বন্ধেও বহু অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

আমরা দেখিতেছি, যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত গণতন্ত্র-শাসিত চীন ইতোমধ্যেই চটের পরিবর্তে ভারতকে ৫০ হাজার টন চাউল দিতে চাহিয়াছে এবং ৬ হাজার টন চাউল লইয়া জাহাজ ৭ই ফাল্গুন কলিকাতা বন্দরে উপনীত

হইয়াছিল। চীন যাহা করিতে পারিয়াছে, ভারত রাষ্ট্র তাহা পারে না কেন?

বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষকালে যখন সুভাষচন্দ্র চাউল দিতে চাহিয়াছিলেন, তখন বৃটিশ সরকার—বাঙ্গালায় অনাহারে ৩০।৩৫ লক্ষ লোক মরিলেও, সে চাউল গ্রহণ করেন নাই। শুনিয়াছি, ভারত রাষ্ট্রের খাদ্যাভাবকালে রুশিয়া গম দিতে চাহিলে ভারত সরকার তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হ'ন নাই। অথচ আমেরিকার কাছে খাদ্য-শস্য চাহিতে লজ্জানুভব হয় নাই। আর আজ কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত যে পণ্য বিনিময়ে চাউল লওয়া হইল, তাহা নিশ্চয়ই পরিবর্তিত মনোভাবের পরিচায়ক। ৮ই ফাল্গুন কলিকাতায় কমুনিষ্ট চীনের রাষ্ট্রদূত এক সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যদিও ঐ ৫০ হাজার টন চাউলের অধিকাংশ দিল্লীতে ও বিহারে যাইবে, তথাপি এমন আশা করা অসঙ্গত নহে যে, পরে আমদানী চাউলে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করা হইবে না।

ভারত সরকারের খাদ্য-মন্ত্রী কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়া অনেক আশার কথা শুনাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কথার কুজ্ঝটিকায় সত্যের স্বরূপ অধিক দিন গোপন করা যায় না। এখন তিনি বলিতেছেন, কত দিনে লোককে পূর্ণাহার প্রদান করা সম্ভব হইবে, তাহা তিনি জানেন না। আর তাহার পত্নী স্বামীর কার্য্য সুসাধ্য করিবার চেষ্টায় গৃহিণীদিগকে পরিবারে খাদ্য-পরিমাণ কিসে হ্রাস করা যায়, সেই চেষ্টা করিতে বলিতেছেন।

লোককে দীর্ঘকাল অপূর্ণাহারে রাখিবার ফল জাতির পক্ষে শোচনীয় এবং তাহাতে অসন্তোষের উদ্ভবও অনিবার্য্য। বর্ত্তমান অবস্থা শাসকদিগের অযোগ্যতার পরিচায়ক বলা অসঙ্গত নহে।

পুনর্ব্বসতি ও খাদ্যোৎপাদন—

সরকার পুনর্ব্বসতি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারিতেছেন না। দেশ বিভাগের ফলে যে এই সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিভাগ-সমর্থকরা আজ আরব্যোপন্যাসের ধীবর যেমন দৈত্যকে দেখিয়া ভীতিবিহ্বল হইয়াছিল, তেমনই অবস্থাপন্ন হইয়াছেন। অজস্র অর্থের ব্যয় ও অপব্যয় করিয়া তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতির ও আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে। অথচ যাহারা অর্থ পাইতেছে, তাহারা সকলেই তাহা পাইবার যোগ্য কি না, সে বিষয়ে আবশ্যক অনুসন্ধানও অনেক ক্ষেত্রে হইতেছে না, ফলে সাহায্য লাভের অযোগ্য ব্যক্তিরা চাতুরী ও তদ্বির করিয়া সাহায্য পাইতেছে, আর যোগ্য ব্যক্তিরা সাহায্য পাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে পুরুষানুক্রমে পূর্ব্ববঙ্গত্যাগী ব্যক্তিরাও যে উদ্বাস্তু সাজিয়া সাহায্য পাইয়াছে—এমন অভিযোগ উপেক্ষণীয় নহে। সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহা জনগণের। সুতরাং সে সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

তাহার পরে ভূমির সমস্যা। বহু প্রকৃত ও তথা-কথিত উদ্বাস্তু বিনানুমতিতে পরের জমীতে বাস করিতেছে। পরের জমী বিনানুমতিতে অধিকার বে-আইনী। কিন্তু অনেক স্থলেই লোক, সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা না করায়, অনন্যোপায় হইয়া সে কাজ করিয়াছে। এখনও সরকার তাহাদিগের প্রয়োজন ও জমীর অধিকারীদিগের অধিকার—এতদুভয়ে সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিতেছেন না। ফলে উভয়পক্ষে স্থানে স্থানে সংঘর্ষ হইতেছে। সরকার বলিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত ব্যক্তিরা যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছে, অন্যত্র তাহাদিগের বাসব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে সে সকল স্থান ত্যাগে বাধ্য করা হইবে না। কিন্তু তাহারা যে আইন করিতেছেন, তাহার সহিত এই প্রতিশ্রুতির সামঞ্জস্য সাধন সহজ-সাধ্য হইতে পারে না।

আবার সরকার উদ্বাস্তুদিগকে সরকারী চাকরীতে যে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহা লইয়াও পশ্চিমবঙ্গের লোকের সহিত উদ্বাস্তুদিগের মনোমালিন্য শেষোক্তদিগের প্রতি সহানুভূতি ক্ষুণ্ণ করিয়া নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে ধনীরা যে জমী অল্পমূল্যে কিনিয়া অধিকমূল্যে বিক্রয় করিবার জন্য—অনেক স্থলে চাষের জমী চাষের অযোগ্য করিতেছিলেন, সে সকল জমী বাসযোগ্য করিতে খাদ্যোপকরণ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটিতেছিল—চাষের জমী বাসের জমীতে পরিণত করা হইতেছিল এবং যে জমী হইতে মৃত্তিকা

আনয়ন করা হইতেছিল, তাহা চাষের অযোগ্য করা হইতেছিল। সরকার এতকাল সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই এবং সে জন্য লোক এমন অভিযোগও উপস্থাপিত করিয়া আসিয়াছে যে, তাহারা ধনীর স্বার্থে অবহিত এবং ফাটকাবাজদিগের সমর্থক। আজ সেদিকে মনোযোগদানের প্রয়োজন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম ও প্রধান ভুল—তাহারা পল্লীগ্রামগুলিতে সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা পুনর্ব্বসতি করাইয়া প্রদেশের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। এখনও যে পশ্চিমবঙ্গে শত শত পল্লীগ্রাম বিরল-বসতি এবং সে সকলে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস-ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু সে সকল স্থানের উন্নতি-সাধন জন্য গ্রামবাসীদিগের সহযোগ প্রয়োজন, সে সহযোগ সরকার আকর্ষণ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি নানা স্থানে সচিবদিগের বিরুদ্ধ 'সম্বর্দ্ধনায় তাহাদিগের প্রতি লোকের বিরূপভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

সরকার নূতন সহর গড়িবার পরিকল্পনা করিতেছেন। কিন্তু কলিকাতার নিকটে বারুইপুরের মত স্থানে যদি ২৪ পরগণার "রাজধানী" করা হয়, তবে কি সহজেই সে কাজ সিদ্ধ হইতে পারে না?

কলিকাতায় লোকসংখ্যা কমাইবার প্রয়োজনও অনুভূত হইতেছে। তাহার উপায় কি?

আবার চাষের জমীর পরিমাণ হ্রাসে যে প্রদেশকে প্রাথমিক প্রয়োজনে পরমুখাপেক্ষী করা হয়, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। বিহার যে ইচ্ছামত অবাধ-ব্যবসার নীতি ভঙ্গ করিয়া ঘৃত, শাক-সব্জী প্রভৃতিরও চালান বন্ধ করিতেছে, তাহাতেও কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদেশে খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধির জন্য লোককে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করিবার উপায় করিবেন না?

সর্ব্বাগ্রে বেসরকারী পরামর্শ পরিষদ গঠিত করিয়া সরকারী কর্ম্মচারী, আইনজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। বাসের প্রয়োজন ও চাষের প্রয়োজন—উভয়ই সমান মনোযোগ দাবী করে এবং উভয়ে সামঞ্জস্য সাধন না করিতে পারিলে কিছুই হইবে না। কংগ্রেস এই গঠন কার্য্যে প্রকৃত সাহায্য করিতে পারেন। সে জন্য সেবার আগ্রহ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতি কি সে বিষয়ে অবহিত হইবেন?

পশ্চিমবঙ্গে বাস্তহারা সমস্যার ও খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি-সমস্যার সমাধান না হইলে কেবল যে পশ্চিমবঙ্গে অসন্তোষ ও অশান্তি বর্দ্ধিত হইবে, এমন নহে—পরন্তু তাহাতে সমগ্র ভারত রাষ্ট্রে বিষ বিসর্পিত হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদিগের সহিত সহযোগের উপায় না করিলে—সরকারী কর্ম্মচারীরাই বিশেষজ্ঞ মনে করিলে—রুগ্ন ভগ্ন সচিবসঙ্ঘ এ সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন না। সে বিষয়ে আবশ্যক যোগ্যতার পরিচয়ও তাহারা দিতে পারেন নাই। অথচ এ সকল সমস্যার সমাধান—সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং সদিচ্ছার অনুশীলন করিলে সমাধান সহজসাধ্য হয়।

অপহরণ, অপচয়, অব্যবস্থা—

গত মাসে আমরা দামোদর পরিকল্পনায় বিস্ময়কর ব্যয় বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও আমরা তাহার পরে সরকার যে হিসাব দিবেন, তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই। তখন বলা হইয়াছিল, ৫৫ কোটি টাকার স্থানে ব্যয় প্রায় ৮৮ কোটি টাকা হইবে। গত ২ই ফাল্গুন পার্লামেণ্টে মন্ত্রী শ্রীপ্রকাশ বলিয়াছেন—এখন পর্য্যন্ত মনে হইতেছে, ব্যয় একশত ১০ কোটি টাকা অর্থাৎ মূল আনুমাণিক হিসাবের দ্বিগুণ হইবে। মন্ত্রী নিতান্ত নির্লজ্জ-ভাবে বলিয়াছেন, প্রথমে যে হিসাব ধরা হইয়াছিল, তাহা কতকটা আন্দাজ-করা অর্থাৎ তাহার ভিত্তি নাই। এই দরিদ্র দেশের পক্ষে ৫৫ কোটি টাকা কত অধিক তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। যে সরকার তত টাকা ব্যয় করিবার পরিকল্পনা এই ভাবে করিতে পারেন, সে সরকারের প্রতি কি লোকের আস্থা থাকিতে পারে?

যে দিন দামোদর পরিকল্পনা সম্বন্ধে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দিনই আর ২টি সংবাদ!—

(১) মন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর বলিয়াছেন—সরকারের গৃহ নির্ম্মাণ কারখানায় আর বিক্রয়ার্থ গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে না; কেবল কিরূপে উৎপাদন সম্বন্ধে বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়, তাহারই পরীক্ষা চলিতেছে। প্রথম এই কারখানায় ব্যয় হইয়া গিয়াছে—

(ক) কারখানার জন্য মূলধন হিসাবে—

৫২,৮৮,০০০ টাকা

(খ) কারখানা চালাইবার ব্যয়—

৪৪,০০,০০০, টাকা

প্রথম দফার মধ্যে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭ শত ৩৩ টাকা পরামর্শদাতাদিগকে দিতে হইয়াছে, অথচ দেওয়ালের ফলক স্থায়ী হইবে কি না, সে বিষয়ে তাঁহারা কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না।

এই পরামর্শদাতারা নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কাহারা এবং কে বা কাহারা তাঁহাদিগের নিয়োগ জন্য দায়ী, তাহা কি জানা যাইবে ?

(২) পার্লামেন্টে শ্রীকৃষ্ণস্বামী ভারতী যখন নির্ব্বাচনের জন্য ভোটারের ফরম ছাপাইতে কত ব্যয় করিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তখন অর্থ মন্ত্রী বলেন, তাহা জানা যাইলে একটি "ভয়াবহ তথ্য" প্রকাশ পাইবে। ভারতী মহাশয় বলেন—মাদ্রাজে ভোটারের ফরম মুদ্রিত করিতে ব্যয়—১২ লক্ষ টাকা, আর পশ্চিম বঙ্গের ঐ বাবদে ব্যয়—৮০ লক্ষ টাকা, অথচ পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা মাদ্রাজের লোকসংখ্যার অর্দ্ধেক।

পশ্চিমবঙ্গে এই ব্যয়াধিক্য সত্য হইলে,ইহার কারণ কি ?

পার্লামেন্টে প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পাইয়াছে, সার সরবরাহে কেন্দ্রী কৃষি বিভাগে এক কোটিরও অধিক টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। অথচ কেবল এক জন কর্ম্মচারী (সারের ডিরেক্টার) পদচ্যুত হইয়াছেন এবং আর এক জনকে সরকারের অসন্তোষ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অর্থাৎ কাহাকেও মামলাসোপর্দ্দ করা হয় নাই। অথচ এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, এক বা তুইজনের সহযোগে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে না—ইহাতে বহু লোক লিপ্ত ছিল। আর অর্থ বিভাগ যে কিরূপে অতিরিক্ত সার আমদানীর টাকা দিয়াছিলেন, তাহাও বিস্ময়ের বিষয়। এ যেন—"শিরে কৈল সর্পাঘাত, কোথা বাঁধবি তাগা ?"

আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে সরকারের হিসাবে এত ভুল হয় এবং যাহার এত টাকা চুরি করিলেও চোরকে বা চোরদিগকে মামলাসোপর্দ্দ হইতে হয় না—সে সরকার কিরূপে সুষ্ঠুভাবে কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন ?

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—

প্রবীণ ব্যারিষ্টার এবং প্রসিদ্ধ আইন-পত্র "উইকলী নোটসের" প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক যোগেশচন্দ্র চৌধুরী গত ১৮শে মাঘ ৮৯ বৎসর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া-রোধে অতর্কিতভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপক থাকিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথা হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে অগ্রণীদিগের অন্যতম ছিলেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহার সঙ্গে স্বদেশী শিল্পজ পণ্যের প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাই কংগ্রেসের প্রথম শিল্প-প্রদর্শনী। তাহার পূর্ব্বে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে যখন বোম্বাইএ ব্যবহারাজীবরা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে সাহস করেন নাই, তখন কলিকাতা হইতে ১৬ হাজার ৭ শত, ৬৮ টাকা ৮ আনা সংগ্রহ করিয়া ব্যারিষ্টার পিউ ও গার্থকে বোম্বাইএ প্রেরণ করা হইয়াছিল। যোগেশচন্দ্র নিজ ব্যয়ে তাঁহাদিগের সহগামী হইয়া মামলা চালনে তাঁহাদিগের সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগের সময় তিনি বিলাতী পণ্য বর্জ্জন আন্দোলনে সক্রিয় সাহায্যদান জন্য কলিকাতায় "ইণ্ডিয়ান ষ্টোরস" দোকান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ধনরক্ষক ছিলেন।

বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন কলারের আদেশে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তিনি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পরে তিনি একবার সম্মিলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন এবং এক বার সভাপতি (বীরেন্দ্রনাথ শাসমল) মতভেদে অধীর হইয়া আসন ত্যাগ করিলে, তিনিই সভাপতি হইয়া অধিবেশনের কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন।

যোগেশচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ও পরে কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তেজ বাহাদুর সপরুর সভাপতিত্বে যে কমিটী—দমনদ্যোতক

আইনগুলির বিচার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, তিনি তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। আমলাতন্ত্র ইচ্ছামত কর দ্বিগুণ করার প্রতিবাদে তিনি তথায় সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ভারত সভার সভাপতিও ছিলেন।

আশুতোষ চৌধুরী তাঁহার অগ্রজ এবং প্রমথ চৌধুরী, কুমুদনাথ চৌধুরী, মন্মথনাথ চৌধুরী, সুহৃদনাথ চৌধুরী ও অমিয়নাথ চৌধুরী তাঁহার অনুজ। ভ্রাতাদিগের মধ্যে এখন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অমিয়নাথ জীবিত রহিলেন।

"উইকলী নোটস" পত্র যোগেশচন্দ্রের বিরাট কীর্ত্তি।

তিনি সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা সরসীবালাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়দেবের ও এক কন্যার মৃত্যুশোক তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পত্নী, এক কন্যা ও এক পুত্র—ব্যারিষ্টার রণদেব জীবিত আছেন।

যোগেশচন্দ্র শিষ্টস্বভাব, মিষ্টভাষী, সামাজিক ও দেশহিতে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার মত নানা গুণে গুণী বাঙ্গালী অধিক দেখা যায় না। তাঁহার আদি বাস পাবনা জিলার হরিপুর গ্রামে।

"রেশন" হ্রাস—

এলাহাবাদ হাইকোর্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোকর্দ্দমা দায়ের হইয়াছে। মহেশ সিংহ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরীয়া। তিনি যুক্তপ্রদেশের সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় শাসনতন্ত্র (২২৬ ধারা) অনুসারে মামলা করিয়াছেন—

সরকার হয় তাঁহাকে আবশ্যক খাদ্যশস্য দিবার ব্যবস্থা করুন, নহেত তাঁহাকে তাহা বাজারে কিনিবার অধিকার প্রদান করুন।

তিনি বলেন, সরকারের নির্দ্দেশানুসারে তিনি যুক্তপ্রদেশে কোথাও খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারেন না। তিনি নিরামিষভোজী। তাঁহার মাসিক বেতন ৪৫ টাকা মাত্র। সে টাকায় তিনি ফল, ঘৃত বা শাকসব্জী ক্রয় করিতে পারেন না। তিনি অপূর্ণাহারে রহিয়াছেন এবং মামলায় বলা হইয়াছে, অপূর্ণাহারের ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য, রোগপ্রতিরোধক্ষমতা ও আয়ুঃক্ষুণ্ণ হইবে। যাহারা এলাহাবাদ সহরের বাহিরে বাস করে, "রেশন" হ্রাস নির্দ্দেশ তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে এবং পল্লীগ্রামে লোক ইচ্ছামত খাদ্যশস্য ক্রয় করিতে পারে। কাজেই "রেশন" হ্রাস অসঙ্গত বৈষম্যদ্যোতক ব্যবস্থা এবং আবেদনকারীর প্রাথমিক অধিকারের পরিপন্থী। আবেদনকারীর পক্ষে ব্যবহারাজীব বলেন—শতকরা ৮২ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে—"রেশন" হ্রাসে তাহাদিগের কোন অসুবিধা নাই এবং যথেচ্ছা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা মানুষের স্বাভাবিক অধিকার।

হাইকোর্ট আবেদন অগ্রাহ্য করেন নাই।

বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ মন্তব্য করিতে পারি না। কিন্তু সমগ্র প্রদেশের লোক যে বিচারফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিবে, তাহা বলা বাহুল্য। দেখা যাউক কি হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিপরীক্ষা—

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি গুরু অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ফলে তৎকালীন ভাইস-চান্সেলার পদত্যাগ করেন এবং অভিযোগ সম্বন্ধে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ জন্য এক সমিতি গঠিত হয়। ভাইস-চান্সেলার পদত্যাগ করিলে সঙ্গে সঙ্গে চারুচন্দ্র বিশ্বাসকে ঐ পদ প্রদান করা হয়। ওদিকে ব্রজেন্দ্রলাল মিত্রকে সভাপতি করিয়া তদন্ত আরম্ভ হয়। অনুসন্ধান শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রজেন্দ্রলাল মৃত্যুমুখে পতিত হইলে এডভোকেট-জেনারল সুধাংশুমোহন বসুকে তাঁহার স্থান প্রদান করা হয়। অনুসন্ধান সমিতির বিবরণ এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে আলোচিত হইয়াছে। রিপোর্ট সম্বন্ধে যে প্রস্তাব সিনেটে গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে রিপোর্টের সমর্থন হয় না। চারুচন্দ্র বিশ্বাস সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, সিণ্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছুই কর্ত্তব্য নাই—সিণ্ডিকেটকে তাহা পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলা হউক। মাত্র ৫ জন সদস্য ঐ সংশোধিত প্রস্তাবের সমর্থন করেন—চারুচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত, প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কেলাস ও ডক্টর রাধাবিনোদ পাল। ইহা ৪০ ভোটে পরিত্যক্ত হয়। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপক্ষ সমর্থন করিয়া যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য। রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহাও করেন নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিরাট ও বহুদিনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ চরিতার্থ করিবার উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা যে বিশেষ দুঃখের কারণ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থাকিলে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত থাকিবে না।

বিনাবিচারে আটক—

যে অস্থায়ী আইনের বলে ভারতের জাতীয় সরকার —বিদেশী ইংরেজ সরকারের পদাঙ্কঅনুসরণ করিয়া— বিনাবিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণ করিতেছেন, তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য তাহা পুনরায় প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব ভারত সরকার পার্লামেণ্টে করিয়া— বহু মতে তাহা গ্রহণ করাইয়াছেন। বিনাবিচারে আটক যে অসিদ্ধ সে সম্বন্ধে মামলায়—

(১) গত ১৪ই সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ হাইকোর্ট (ফুল বেঞ্চ)
(২) গত ৫ই জানুয়ারী কলিকাতা হাইকোর্ট
(৩) গত ১১ই ও ১২ই জুলাই বোম্বাই হাইকোর্ট
(৪) গত ২৬শে মে সুপ্রিম কোর্ট
(৫) গত ২৭শে জুলাই বোম্বাই হাইকোর্ট
(৬) গত ২৭শে মার্চ্চ পাটনা হাইকোর্ট

রায় দিয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের ৩৩ জন প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব আইন পুনঃপ্রবর্ত্তনে আপত্তি জানাইয়া লিখিয়াছিলেন—

"যে সরকার শান্তির সময়েও বিনাবিচারে নরনারীকে বন্দী করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করেন, সে সরকার এক বৎসর পরেই সে ক্ষমতা ত্যাগ করিতে চাহেন না। কারণ, ঐ ক্ষমতা শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন বলা হইলেও তাহার দ্বারা সহজে বিরোধী রাজনৈতিকদিগের সহিত যুদ্ধ করা যায়। দিল্লীতে (সরকারের) অনুগত পার্লামেণ্টের সাহায্যে যে এই আইন পুনঃপ্রণয়নে বিশেষ আপত্তি হইবে—এমন কি বিতর্ক হইবে—এমন মনে হয় না। সুতরাং আইন বিধিবদ্ধ হইবে। তথাপি ভারতের নাগরিকদিগের এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। এই আইন কেবল ভয়াবহই নহে—পরন্তু স্বাধীন ভারতের পক্ষে কলঙ্কজনক। সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারক এই আইন নিয়মানুগ বলিয়াও মত প্রকাশ করিয়াছেন—পৃথিবীর কোন দেশে শান্তির সময়ে লোককে বিনা বিচারে বন্দী করিয়া রাখিবার আইন নাই। প্রকৃতপক্ষে যে সরকারের এইরূপ আইন প্রয়োজন হয়, সে সরকার সভ্য সরকার নহেন। ভারতের নাগরিকগণকে এই আইন সম্বন্ধেও পার্লামেণ্টের যে সকল সদস্য ইহার পুনঃপ্রণয়ন সমর্থন করিবেন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে।"

সরকারপক্ষে চক্রবর্ত্তী রাজাগোপালাচারী এই বিবৃতির ভাষায় আপত্তি করিয়াছেন। অবশ্য তিনি বিবৃতির যুক্তিতে আপত্তি করিতে পারেন নাই—সে ক্ষমতা তাহার নাই।

পার্লামেণ্টকে যে (সরকারের) অনুগত বলা হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার আপত্তি। কিন্তু এই পার্লামেণ্টের সদস্যগণ স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতের অধিবাসিবৃন্দের দ্বারা নির্ব্বাচিত না হওয়ায় তাঁহাদিগের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারেন না এবং মন্ত্রীরাও অধিকাংশ ইংরেজ আমলাতন্ত্রের দ্বারা মনোনীত। সে কথা ভুলিলে চলিবে না।

রাজাগোপাল দম্ভভরে বলিয়াছেন—"আমরা এ দেশ শাসন করিতে পারিব, এই বিশ্বাসেই ইংরেজের নিকট হইতে ক্ষমতা লইয়াছিলাম।" কিন্তু শাসন যে সুশাসনের মত কুশাসনও হইতে পারে, তাহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন?

যাহারা পরাধীন ভারতে বিনা বিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই যে ক্ষমতা পাইয়া স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতে সেই ব্যবস্থার সমর্থন করিতেছেন, ইহা যেমন বিস্ময়কর তেমনই পরিতাপের বিষয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—ক্ষমতা মানুষকে হীন করে—স্বৈরক্ষমতা তাহাকে সম্পূর্ণরূপ হীন করে।

যে আইন শান্তির সময় নিন্দার্হ। শান্তির সময় যদি সরকার সেই আইন প্রবর্ত্তিত ও পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন, তবে কি দেশের লোক তাহা সমর্থনযোগ্য মনে করিবে?

বস্ত্রাভাব—

ভারত রাষ্ট্রে অন্নের মতই বস্ত্রের সমস্যা উৎকট হইয়াছে। শর্করার অভাবের মত বস্ত্রের অভাব সম্বন্ধেও

অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে যে, সরকার দুর্নীতি দূর করিতে না পারায় এই দুই অভাব দূর হইতেছে না। অর্থাৎ অভাব কৃত্রিম এবং কতকগুলি লোকের স্বার্থের জন্য সৃষ্ট।

ভারত রাষ্ট্রে কৃষির পরে হাতের তাতশিল্পেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক অন্নার্জ্জন করে। সেই শিল্পও আজ কিরূপ বিপন্ন তাহা পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ মহাতাবের স্বীকৃতিতে বুঝিতে পারা যায়ঃ—

"সুতার উৎপাদন হ্রাসেই হাতের তাঁতের কাপড়ের পরিমাণ হ্রাস বুঝিতে পারা যায়। পূর্ব্বে মাসে ৮২ হাজার গাঁইট সুতা উৎপন্ন হইত, এখন মাত্র ৬২ হাজার গাঁইট উৎপন্ন হয়, এবং (দেশের লোককে অভাবগ্রস্ত রাখিয়াও) মাসে ১৫ হাজার গাঁইট রপ্তানী করা হয়। কাজেই হাতের তাঁতে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে।"

কেন সুতার উৎপাদন হ্রাস হইয়াছে এবং তাহা বৃদ্ধির চেষ্টা হয় নাই, তাহা মন্ত্রী বলেন নাই। আর কেনই বা এই অবস্থায় মাসে ১৫ হাজার গাঁইট সুতা বিদেশে রপ্তানী করা হয়, তাহাও জানা যায় নাই। এই সুতা কোথায় রপ্তানী করা হয় এবং কাহার বা কাহাদিগের লাভের জন্য তাহা করা হয়, তাহা জানিতে দেশবাসীর নিশ্চয়ই অধিকার আছে।

যে শিল্পে বহুলোকের অন্নসংস্থান হয়, তাহার উন্নতি সাধন করাই সরকারের কর্ত্তব্য। তাহা না ভাবিয়া সরকার তাহার অবনতি কি "চিত্রাপিত প্রায়" থাকিয়া লক্ষ্য করিতেছেন? ইহার অনিবার্য্য ফল যে দেশে বেকার-সমস্যার তীব্রতা-বৃদ্ধি এবং জাতির দুর্দ্দশা তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যে এইরূপ হইতেছে, ইহা কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট—

পশ্চিমবঙ্গের আগামী বর্ষের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ব্যবস্থা পরিষদে ৮ই ফাল্গুন উপস্থাপিত করা হয়। তাহাতে দেখা যায়—সরকারী হিসাবে—এ বার ঘাটতী—

রাজস্বহিসাবে ঘাটতী ৪ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, রাজস্ব হিসাবাতিরিক্ত হিসাবে ঘাটতী ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ মোট ঘাটতী ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা।

মোটর যানের উপর কর বৃদ্ধি করিয়া সরকার অতিরিক্ত এক কোটি ৫০ লক্ষ টাকা উপার্জ্জনের আশা করেন॥

দামোদর পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, পথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্য আনুমানিক ব্যয় ১৪ কোটি ৫১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। কতকগুলি উন্নতিকর কার্য্যের জন্য—কেন্দ্রী সরকার সাহায্য না করিলে—প্রাদেশিক সরকার ২ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করিবেন।

এ বার বাজেটে রঙ্গীন ছবি স্থান পাইয়াছে। অর্থ-সচিবের দীর্ঘ বক্তৃতায় অর্থনীতিক ব্যাপারাতিরিক্ত বহু ব্যাপারের আলোচনা অবান্তর এবং অকারণ। হয়ত তাহা তাঁহার অসুস্থতারই পরিচায়ক। তবে তিনি শুশ্রূষাকারিণী লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া একবার ব্যবস্থা পরিষদে দর্শন দিয়াছিলেন এবং লোককে এমন আশার অবকাশও দিয়াছেন যে, তিনি হয়ত সত্য সত্যই কার্য্যভার ত্যাগ করিবেন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা আজ এত অধিক ও এত প্রবল যে, সে সকলের সমাধানজন্য বিশেষ মনোযোগ ও পরিশ্রম প্রয়োজন।

দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতি প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্য এ বারও প্রয়োজনানুরূপ অর্থ ব্যয় সম্ভব হয় নাই। খাদ্যের জন্যও ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইয়াছে। কাজেই এই বাজেট জাতি গঠনের দিক হইতে লোকের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। ইহাতে ব্যয়-সঙ্কোচের চেষ্টাও দেখা যায় না।

আমেরিকার মনোভাব—

ভারত রাষ্ট্র অ্যাংলো-আমেরিকান দলভুক্ত হইলেও ভারতের অন্নকষ্টে আমেরিকার বিশেষ সহানুভূতির পরিচয় আমরা পাইতেছি না। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তথায় ভারতকে খাদ্যোপকরণ সাহায্য করার আলোচনায় সেক্রেটারী অব ষ্টেট এচিশন বলিয়াছেন, গত বৎসর পাকিস্তানের অতিরিক্ত খাদ্য-শস্য গ্রহণ সম্বন্ধে ভারত রাষ্ট্র সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। তবে পাকিস্তানের অতিরিক্ত খাদ্য শস্যেও এ বার ভারতের অভাব পূর্ণ হইতে পারে না। এইরূপে পরোক্ষভাবে, ভারত সরকারের দোষ উদ্ঘাটন করা হইয়াছে এবং অন্যত্র বলা হইয়াছে—যে ভাবে ভারতকে খাদ্য-শস্য দিয়া সাহায্য করিবার প্রস্তাব হইতেছে,

তাহাতে পাকিস্তানকে অসন্তুষ্ট করিবার কোন কারণ থাকিবে না! ভারতরাষ্ট্র খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে থোরিয়াম দিতে পারে না, সে কথাও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। একজন প্রতিনিধি এমন কথাও বলিয়াছিলেন—যাহারা আমেরিকার বিরোধী তাহাদিগকে সাহায্য করা কি সঙ্গত হইবে? উত্তরে এচিশন বলিয়াছিলেন—ভারতের জনগণ বা সরকার যে আমেরিকার বিরোধী, তাহা বলা যায় না।

এই সকল উক্তি প্রত্যুক্তিতে বুঝিতে পারা যায়, আমেরিকার মনোভাব—ভিখারীর প্রতি উদ্ধত দাতার মনোভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। এচিশনকে ইহাও বলিতে হইয়াছে যে, ভারত রাষ্ট্র এশিয়া বা পূর্ব্ব-য়ুরোপের কোন দেশের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে নাই। অর্থাৎ সে কেবল আমেরিকার দ্বারে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং আমেরিকার দান করিবার মত প্রভূত খাদ্য-শস্য আছে ও ভারতের নীতি কি হইবে সে সম্বন্ধে আমেরিকা কোন আদেশ করিতেছে না।

ইহাই আমেরিকার মনোভাব।

পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন—

গত ১২ই ও ১৩ই ফাল্গুন হাওড়ায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রদেশ বিভক্ত ও দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবার পরে ইহাই এই সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন। এই অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য :—

(১) ভারত সরকারের শ্রম-মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ইহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের আরম্ভ। এই বার প্রথম সরকারের মন্ত্রী—যিনি বাঙ্গালী বা বাঙ্গালার অধিবাসী নহেন, তিনি সভাপতি হইলেন।

(২) সম্মিলন পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হইল।

কংগ্রেস ও সরকার, প্রদেশ ও রাষ্ট্র অভিন্ন ভাবে গৃহীত হইল। তদ্ভিন্ন নিখিল-ভারত কংগ্রেস সম্পাদক কালা ভেঙ্কটরাও উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে কংগ্রেসে ঐক্য স্থাপন জন্য সদুপদেশ দিয়াছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের বহু সমস্যা আজ সমাধানের জন্য লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীজগজীবন রাম—মন্ত্রী হইলেও সে সকল তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সীমাবহির্ভূত। সেই জন্য তাঁহার অভিভাষণে আগামী নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের জয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যত ফুটিয়া উঠিয়াছিল—পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাগুলি তত আলোচিত হয় নাই।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে ক্ষুদিরাম হইতে অরবিন্দকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠক্কর বাপাকে ও সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলকে স্মরণ করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত জওহরলালের ভারলাঘব করিবার জন্য চেষ্টা যে প্রত্যেক ভারতবাসীর "কর্ত্তব্য" এমন কথাও বলিতে দ্বিধানুভব করেন নাই।

সম্মিলনের অঙ্গ হিসাবে একটি শিল্প-প্রদর্শনীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রেলে যাত্রীর ভাড়া বৃদ্ধি—

ভারত সরকারের মন্ত্রী শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার প্রস্তাব করিয়াছেন—যাত্রীর ভাড়া আরও বাড়াইয়া সরকার আর ১৯ কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি করিবেন। বৃদ্ধির পরিমাণ —প্রতি মাইলে

তৃতীয় শ্রেণী	১ পাই
মধ্যম শ্রেণী	১.৫ পাই
দ্বিতীয় শ্রেণী	২ পাই
প্রথম শ্রেণী	৩ পাই

দরিদ্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকেই অধিক পিষ্ট করা হইবে—সে শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি শতকরা ২০; আর সর্ব্বাপেক্ষা অল্প বৃদ্ধি প্রথম শ্রেণীর ভাড়ায়—২৪ পাই হইতে ২৭ পাই! যে সময় রেলে যাত্রীর ও মালের ভাড়ায় লাভই হইতেছে, সেই সময় এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে পার্লামেণ্টে কেহ কেহ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"লুঠ! লুঠ!" —গোপালস্বামী তাহাতে হাসিয়া বলেন, "লুঠের অংশ আপনারাও পাইবেন।" আগামী বর্ষে আনুমানিক

আয়	২৭৯,৫০,০০,০০০ টাকা
ব্যয়	২১৬,৯৭,০০,০০০ টাকা

ইহার মধ্যে ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ভারত সরকারের সাধারণ তহবিলে যাইবে। আর

নানাবিধ ব্যয় ... ৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা

উন্নতির জন্য ...... ১০ কোটি টাকা ইত্যাদি।

মোট কথা ভারত সরকারের সাধারণ ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য যে টাকার প্রয়োজন, তাহা এইরূপে সংগ্রহ না করিলে ঋণ করিতে হয়।

প্রস্তাবিত বৃদ্ধিতে লভ্য ৩৯ কোটি টাকার মধ্যে ১৮ কোটি টাকা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে। ইহা সমর্থনযোগ্য নহে; কারণ ইহাতে দারিদ্র্যদলননীতিই আদর পাইবে।

ভারত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ ও অপব্যয় বর্জ্জন ব্যতীত তাঁহারা কিছুতেই আয়-ব্যয়ে সমতা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

বিদ্যাসাগর-স্মৃতি—

আজকাল অনেকের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন-পরিচয় আমরা পাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা আজও হয় নাই। বহু দিন পূর্ব্বে তাঁহার গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসগৃহ ও সংগৃহীত পুস্তক বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বাসগৃহটি উদ্ধার করিয়া জাতীয় সম্পদরূপে রক্ষা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমরা জানি, গৃহটি যখন বিক্রীত হয়, তখন হাইকোর্ট গৃহসংলগ্ন ৩ কাঠা আন্দাজ জমী তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোনরূপ কাজের জন্য রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সে কাজে উদ্যোগী ছিলেন. হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভারতবর্ষের' জলধর সেন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিতকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সে জমী এখনও স্মৃতিরক্ষাকল্পে ব্যবহৃত হয় নাই। কিছুদিন পরে তাহার অবস্থা কি হইবে বলিতে পারি না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষা কোন জনকল্যাণ-কর অনুষ্ঠানের বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে প্রথম বেসরকারী কলেজ কি ভাবে স্থায়ী করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিলে শিক্ষা-বিস্তারে তাঁহার দানের কথা প্রথমেই মনে পড়ে। সে কার্য্যে কোন স্থায়ী ব্যবস্থাও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ করা যাইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় সে চেষ্টাও করিতে পারেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বহু বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, এমন লোকের সংখ্যা যে লক্ষাধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদিগেরও কর্ত্তব্য আছে।

আমরা বাঙ্গালীমাত্রকেই এই বিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য-ব্যবস্থা—

পাকিস্তানের সহিত ভারত রাষ্ট্রের বাণিজ্য-ব্যবস্থার চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্র পাকিস্তানকে কয়লা ও লৌহ দিবে এবং পাকিস্তান ভারত রাষ্ট্রকে চাউল, গম ও পাট দিবে। ভারত রাষ্ট্র কাঁচা চামড়াও চাহিয়াছে। ভারত সরকার যে পরিমাণ পাট, গম ও চাউল চাহিয়াছেন, পাকিস্তান সে পরিমাণ দিবে বা দিতে পারিবে কি না, নিশ্চয় বলা যায় না।

ভারত সরকার যে পাকিস্তানী মুদ্রার মূল্যে পাকিস্তান হইতে মাল কিনিতে সম্মত হইয়াছেন, তাহার অর্থ— India has unconditionally recognised Pakistan's rupee rate সুতরাং দীর্ঘকাল সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল যে ব্যবস্থা ভারত রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বুঝিয়া আপত্তি করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে নেহরু সরকার সে বিষয়ে পাকিস্তানের নিকট সম্পূর্ণভাবে—বিনা-সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারত সরকারের গম ও চাউলের এবং পাটেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু পাকিস্তানের কয়লার ও লৌহের প্রয়োজনও অল্প নহে। সে অবস্থায় পাকিস্তান যে দাবী করিয়াছে তাহাই মানিয়া লইয়া যে ব্যবস্থা করা হইল, তাহাতে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সৌধ দিল্লীর ঘড়ী-ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িবে কি না, কে বলিতে পারে? সেই জন্যই কি ভারত সরকার রেলে যাত্রীর ভাড়া বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছেন?

পাকিস্তান কত গম চাউল ও পাট দিবে তাহা না জানিতে পারিলে, এই ব্যবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের মোট ক্ষতির পরিমাণ স্থির করা সম্ভব নহে। তবে ক্ষতি যে ভয়াবহ তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না।

ডীন ইঞ্জে বলিয়াছেন, পলাশীর যুদ্ধের পরে বাঙ্গালা লুণ্ঠনের টাকায় ৩০ বৎসরে ইংলণ্ড শিল্পে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। ফ্রান্সের সহিত প্রথম যুদ্ধে জার্ম্মানী যে অর্থ আদায় করিয়া-

ছিল, তাহাই জার্মানীর সমৃদ্ধির ভিত্তি হইয়াছিল। মাউন্টব্যাটেনের প্ররোচনায় গান্ধীজীর নির্দ্দেশে ভারত সরকার পাকিস্তানকে যে ৫০ কোটিরও অধিক টাকা দিয়াছেন, তাহাতেই পাকিস্তান সূতিকাগারে মরে নাই। আর আজ যে ব্যবস্থা হইল, তাহাতে জয়ী হইয়া পাকিস্তান সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইল।

যে অবস্থা হইল, তাহাতে পাকিস্তানে একশত টাকার মাল কিনিলে তাহার জন্য ভারত রাষ্ট্রকে এক শত ৪৪ টাকা দিতে হইবে, আর পাকিস্তান ৬৯ টাকা সাড়ে ৮ আনা মাত্র দিয়া ভারতরাষ্ট্র হইতে এক শত টাকা লইয়া যাইবে।

ভারত সরকার বিদেশ হইতে প্রয়োজনে খাদ্যশস্য কিনিয়া বিক্রেতার নির্দ্দিষ্ট দর দিতেছেন। পাকিস্তানী পণ্য সম্বন্ধে তাঁহারা সেই ভাবেই ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিন্তু পাকিস্তান তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ভারত সরকারকে নতি স্বীকার করাইয়া কাগজে কলমে তাহার মুদ্রামান স্বীকার করাইয়া লইয়াছে।

মধ্যে কথা উঠিয়াছিল, ভারত রাষ্ট্র এক শত টাকার পাকিস্তানী মাল কিনিলে—ভারত হইতে এক শত টাকা দিবে—অবশিষ্ট টাকা অর্থাৎ ৪৪ টাকা ইংলণ্ডে ভারত রাষ্ট্রের প্রাপ্য "ষ্টার্লিং ব্যালান্স" হইতে দেওয়া হইবে। কথাটা একই হইলেও পাকিস্তান সে ব্যবস্থায় সম্মত হয় নাই। সে ভারত রাষ্ট্রকে সরাসরি এক শত ৪৪ টাকা দিয়া তাহার এক শত টাকার মাল ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়াছে।

অথচ ভারত সরকার এই ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন না—পণ করিয়া দীর্ঘ ১৭ মাস কাল অনেক কথা বলিয়াছেন। লোককে বিভ্রান্ত করিবার বহু চেষ্টাই হইয়াছে।

ভারত সরকারের এই আত্মসমর্পণের ফলে ভারতের কৃষক হইতে চাকরীয়া সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।

১৫ই ফাল্গুন—১৩৫৭

সৃষ্টি ও স্রষ্টা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভগবান্, তোমা ডাকি নাই বটে
জীবনে একটিবার,
মন্ত্রতন্ত্র, ধ্যানধারণার
ধারি নাই কভু ধার!
তব নাম স্মরি' ভুলে একবার
ঝরে নাই মোর আঁখিজলধার,
আরতি তোমার করি নাই কভু
রুধিয়া দেউল দ্বার।
দিয়েছ ছড়ায়ে যে অমৃতধারা
সুন্দর ঐ ভুবনে—
ভরি' অঞ্জলি করিয়াছি পান
শুধু আপনার মনে।
মুরতি লভিয়া মোর আনন্দ
হয়েছে কবিতা, হয়েছে ছন্দ,
হিল্লোল তার কভু কি মুরছি'
পড়ে নাই শ্রীচরণে?

তোমার সৃষ্টি বাসিয়াছি ভালো,—
সে কি তব পূজা নয়?
মুগ্ধ এ দুটি আঁখি যে তোমার
আরতি-প্রদীপ বয়!
কাননের ফুল করিনি চয়ন,—
কথার মালিকা করেছি বয়ন
হৃদয় কুসুম উপবন হ'তে
তব লাগি' দয়াময়!
কেন গড়েছিলে ধরণী তোমার
এত লোভনীয় করি?—
সৃষ্টিরে লয়ে মেতে আছি তাই
স্রষ্টারে বিস্মরি'!
পড়িয়া কাব্য—ভুলেছি কবিরে,
ডুবেছি রসের অতল গভীরে,
শিল্পীরে ভুলি'—ছবি নিয়ে তার
আদরে বক্ষে ধরি!

নিখিল ভারত আলোক-চিত্র প্রদর্শনী

বিশ্বামিত্র

দেশ আজ বন্ধনমুক্ত। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল আজ ছিঁড়ে গেছে—দেশের মানুষই তার শক্তি দিয়ে, সাধনা দিয়ে সে শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন করতে সমর্থ হ'য়েছে। আজ দেশের মানুষ স্বাধীন মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে মুক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করার অবসর পেয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাধীন

ঘড়ির নাড়ী (Pulse of time) ফটো—ডাঃ এন কানিৎকর

দেশের মানুষের জীবন-নদীর তট প্রাবিত ক'রে নানা নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা, নতুন উদ্ভাবনী উদ্দাম বেগে বইতে শুরু করেছে। এটা আশার কথা, এটা আনন্দের কথা।

যদিও দেশের পূর্ণ শান্তি এখনো ফিরে আসেনি, এখনো বহু দুর্যোগ আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত—তবু নানা দিক দিয়ে নানা ভাবে যে জাগরণের সাড়া জেগেছে দেশের সর্ব অঙ্গে, তা সত্যই আশাপ্রদ।

সম্প্রতি কলিকাতা ললিতকলা প্রদর্শনীর মে "নিখিল ভারত আলোক-চিত্র প্রদর্শনী" নামে একটি বিরা ফটো প্রদর্শনীর প্রদর্শন ব্যবস্থা হয়েছে। 'ফটোগ্রাফি এ্যাসোশিয়েসন্ অব বেঙ্গল' এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ভবানীপুরের সন্নিকটে ১নং চৌরংগী টেরেস্‌এ এই বিশে

রৌদ্রপীড়িত জনতা (Huddle in the Sun) ফটো—পী-এন্ মেহের

প্রদর্শনীটি সর্বসাধারণের জন্য আগামী ১৫ই মার্চ (বাংলা ১লা চৈত্র) থেকে উন্মুক্ত হবে। ১নং চৌরংগী টেরেস্ বাড়িটি শ্রীজে-এম-মজুমদার মহাশয়ের এবং এখানি সবরকমে প্রদর্শনীর উপযুক্ত। গৃহখানি যেন এমনি প্রদর্শনীর জন্যই নির্মাণ করা হয়েছিল।

এই আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন যাহা রাজাধিরাজ বর্ধমানাধিপতি এবং সভাপতিত্ব করবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এ প্রদর্শনের সময় নির্দেশ আছে।

'ফটোগ্রাফিক অ্যাসোশিয়েসন্ অফ্ বেঙ্গল'এর এই উদ্যম প্রশংসনীয়। ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকেই এ ব্যাপারে বেশ সাড়া পাওয়া গেছে। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ছয় শত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের

প্রভাতী সংবাদ (Morning news)

ফটো—[illegible]

হাতে এসেছে। তার মধ্যে ১১৩টি ফটো নির্বাচিত করা হ'য়েছে প্রদর্শনের জন্য। ফটোগুলির প্রত্যেকটিই বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ এবং মনোরম। ক্যামেরার কাজ কতো নিখুঁত হ'তে পারে তা এই ফটোগুলি দেখলেই বোঝা যাবে। আলো-ছায়ার অপূর্ব সমাবেশ প্রত্যেকটি ছবিকে যেন জীবন্ত ক'রে তুলেছে। স্থানাভাবে মাত্র ছয় খানি ফটো এই প্রবন্ধের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হ'ল। কিন্তু এই ছয়খানি ছবি দেখেই উপলব্ধি করা যেতে পারবে যে আলোকচিত্র কতোখানি প্রাণবন্ত হ'তে পারে এবং কোনক্রমেই এই বিশেষ শিল্পটি উপেক্ষণীয় বা অবহেলার বস্তু নয়।

স্তম্ভ (Pillars)   ফটো—চন্দুলাল জে সাহ

প্রদর্শনীতে যে ফটোগুলি দেখানো হবে তার মধ্যে

তুষার তরঙ্গ (Cold wave)   ফটো—আর-আর ভরদ্বাজ
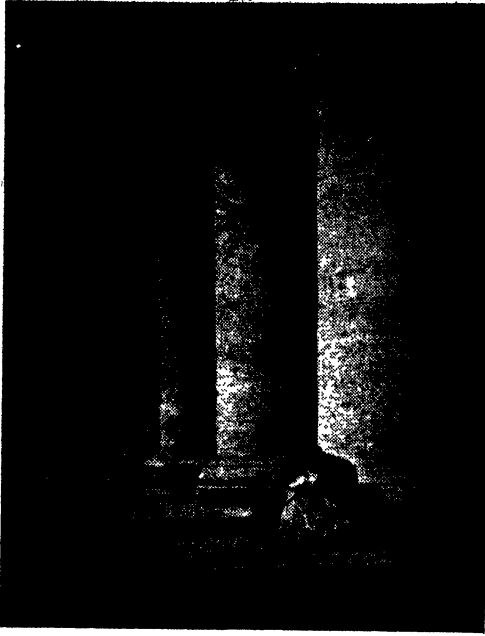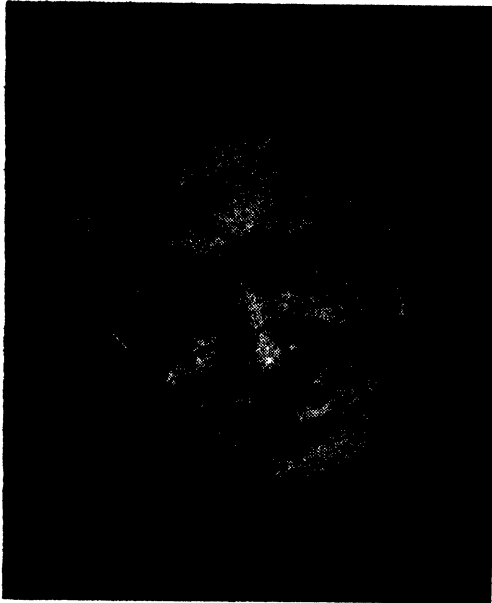
রেভারেণ্ট ফাদার গেন্স (Rev. Fr. Gense S. J.)
ফটো—জাহাঙ্গীর এন উনওয়ালা

উল্লেখযোগ্য যেগুলি এবং যেগুলি পুরস্কার পেয়েছে তার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :

ডাঃ জি-টমাস—১০৫, "Tranquility" নামক একটি ফটোর জন্য একখানি পদক লাভ করেন। কে-বি-কোপকার তাঁর ৫৬, "Carefree Retreat" নামক ফটোর জন্য একটি পদক পুরস্কার পান। ডব্লু-এন-ভাট তাঁর ১০, "My

friend the Floods" নামে একটি ফটোর জন্য আর একখানি পদক পুরস্কার পান। এই ভাবে এম-পি-পলশন তাঁর ৮২, "Come unto me"—সি-এন-চেম্বারস্ ১৪, "Fishermen's Down"—ভি-এস্-গডবলে ৩১, "Home ward Trail" প্রভৃতি আলোক-চিত্র শিল্পীরা তাঁদের অভিনব আলোক চিত্রের জন্য পদক পুরস্কার পেয়েছেন।

এ ছাড়াও আরো কয়েকজন ফটোগ্রাফার তাঁদের অদ্ভুত ফটোগ্রাফির জন্য বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। যথা :—

চণ্ডুলাল জে শাহার ফটো—"Pillars"—জে-এন-আনওয়ালার "Rev. Fr. Gense S. J."—পি-এন-মেহেরার "Huddle in the sun"—আকতার কে সইয়দের "Morning News"—শচী-আর গুহর "Twins ডাঃ এন কানিথকরের "Pulse of time" এবং আর-আর ভরদ্বাজের "Cold wave"।

এঁরা প্রত্যেকেই কৃতী ফটোগ্রাফার। এঁদের প্রত্যেকটা ফটোই প্রদর্শনীর গৌরব বর্ধন করেছে। আশা করা যায় এই ভাবে উৎসাহ পেলে ভবিষ্যতে এঁরা দেশকে আরো মনোরম ফটো দেখিয়ে আনন্দ দান করতে পারবেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে সব চেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছেন এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা। দেশের শিল্পামোদী জন-সাধারণের সামনে এঁরা একটা নতুন আনন্দলোকের দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন। এঁদের উদ্যম সার্থক, সার্থক এঁদের অধ্যবসায়।

প্রণতি

শ্রীমতিলাল দাশ

মেঘ মেদুর আকাশতলে গোপন মোহে বিভল শ্রাবণ
তোমায় আজি স্মরণ করি পদ্মাবতী-চরণ-চারণ

পুণ্য তোমার মধু বচন
বারে বারে করছি মনন

জাগছে মনে নীলার ছায়ায় রাধার গোপন অভিসারে
পরম প্রিয়ার পরশ চেয়ে বাজছে ব্যথা হৃদয় তারে।

সরস কর নীরস হিয়া মধুর তব গানে গানে
আবার আসে সে আস্বাদন তৃষিত সব প্রাণে প্রাণে

বিরহী মন চায় যাহারে
পায় না আজি আর তাহারে

ভুবন-ভরা আয়োজনে তাইত গভীর কান্না জাগে
বিশ্ব মানুষ কাঙাল হয়ে রসামৃত তাইত মাগে।

অজয় নদের বালু বেলায় ফুটেছিল মধুর গীতি
বুঝিয়েছিলে প্রেমের রীতি শুনিয়েছিলে দিব্য প্রীতি

আজ আমাদের জীবন মাঝে
সে সুর তব আর না বাজে,

তাইত মোরা পাগল হয়ে মরছি ঘুরে পথ বিপথে
নিরুদ্দেশে সন্ধানে নয় চলছি ছুটে ব্যগ্র রথে।

প্রেমামৃতের মহান কবি জাগাও তোমার মধুচ্ছন্দ
আসুক ফিরে সে সুরভি দিকে দিকে সে আনন্দ

সকল পাওয়া সফল হবে
মিলনমুখর কলরবে

আজ শ্রাবণে বরণ করি তাইত তোমা কাব্যপতি
যে প্রেম টানে তোমার পানে সে প্রেমে হোক নিগূঢ়রতি

—কুড়ি—

ঝড়ের মেঘটা থমথমে হয়ে উঠেও দমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বেশি কিছু বক্তৃতা হল না—দরকারও ছিল না তার। শাদা-শিদে সহজ আলোচনা শান্তভাবেই শুনে গেল দুপক্ষ। সত্যিই তো, নিছক একটা ঝোঁকের মাথায় এমন ভাবে কি খুন খারাপী করবার মানে হয় কিছু? জান জিনিসটা নিতে এক লহমাও সময় লাগে না, কিন্তু হাজার বছর চেষ্টা করলেও যে আর তা ফিরিয়ে দেওয়া যায় না, যেন খেয়াল থাকে কথাটা।

তা হলে রফা হল কী?

দশখানা গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বর ডাকা হোক। সাবুদ করা হোক প্রাচীন যাঁরা আছেন আশেপাশে। পরচা দেখা হোক, দেখা হোক নক্শা। মস্‌জিদ যদি থাকে এখানে, আবার গড়ে উঠবে। পীরের জায়গা নাকি ছিল, আবার নতুন করে তা হলে চেরাগ জ্বলবে তাঁর। তখন যদি কেউ বাধা দেয়, তা হলে অনেক সুযোগ মিলবে লাঠির জোর পরখ্ করবার। আর যদি না থাকে—বেশ তো, চুকে বুকেই গেল সব।

মুসলমানেরা রাজী, সাঁওতালেরাও রাজী।

কৃতজ্ঞ চিত্তে রঞ্জন বলেছিল, মাস্টার সাহেব, সময় মতো আপনি এসে পড়েছিলেন বলেই রুখে গেল দাঙ্গাটা।

আলিমুদ্দিন হেসেছিলেন—অত্যন্ত ক্লান্ত, বিষণ্ণ হাসি।

—কিন্তু সত্যিই যদি এখানে মস্‌জিদ থেকে থাকে, তা হলে এর পরে হয়তো আমাকেই দাঙ্গায় নামতে হবে। পীরের জায়গা, খোদার জমিন্ আমরা এমনি ছাড়ব না।

—তখনকার ভার আমরা নিচ্ছি—নগেন জবাব দিয়েছিল: কিন্তু আজ আপনি যা করলেন এটাকে এমনি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে—

—অবিশ্বাস্য!—মুহূর্তে ধ্বক্ করে জ্বলে উঠেছিল মাস্টারের চোখ: আপনাদের কি ধারণা যে দাঙ্গা বাধানোটাই মুসলমানের কাজ?

—না, তা বলছি না—নগেন সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল: মানে, আমার বলবার কথা ছিল—

আলিমুদ্দিন তিক্ত স্বরে বলেছিলেন, জানি। আমাদের সম্বন্ধে আপনাদের কী অভিযোগ সব আমার জানা আছে। আপনারা বলেন, আমরা অসহিষ্ণু, অন্য ধর্মকে আমরা সহ্য করতে পারি না। তা নয়। আমাদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই আমরা তার মর্যাদা রাখবার জন্যে সহজে প্রাণ দিতে পারি। ইস্‌লামের সত্যই তো তাই। যেচে আমরা কাউকে ঘা দিতে চাই না, কিন্তু কেউ আমাদের ওপর চড়াও হলে তাকেও আমরা ক্ষমা করব না।—আলিমুদ্দিনের চোখ দুটো আচমকা এক ঝলক আগুন বৃষ্টি করেছিল: দিনের পর দিন আমাদের তুচ্ছ করেননি আপনারা? দূরে সরিয়ে দেননি যবন বলে?—এক বৃষ্টি-ঝরা সন্ধ্যার অপমানের ক্ষত আকস্মিকভাবে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছিল আলিমুদ্দিনের বুকের ভেতর: আপন বলে যতবার আপনাদের দিকে আমরা হাত বাড়াতে গেছি, ততবার ঘৃণা করে সে হাত ঠেলে দেয়নি আপনাদের সমাজ!

কী থেকে কথাটা কোথায় গিয়ে পৌঁছুল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আলিমুদ্দিন তিক্ততম স্বরে বলেছিলেন, তাই তো পাকিস্তান চাই! সমান শক্তি না নিয়ে দাঁড়ালে আমাদের কোনোদিন শ্রদ্ধা করতে শিখবেন না আপনারা। সে শিক্ষা আপনাদের দরকার।

রঞ্জন বলেছিল, ঠিক। আপনাদের দাবীকে আমরা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ভুল বোঝাটা দুপক্ষেই হয়েছে —এক হাতে তালি বাজেনি। সে কথা যাক মাস্টার সাহেব। আপনি একদিন সময় করে আসুন না জয়গড়ে। অনেক কিছু আলোচনা আছে আপনার সঙ্গে?

—কী আলোচনা?

—আপনি একটা কিছু গড়তে চাইছেন—আমরাও

চাইছি। শেষ পর্যন্ত যাই হোক, হয়তো অনেকদূর পর্যন্ত এক সঙ্গে এগোতে পারি আমরা। সেই সুযোগটাই বা ছাড়া কেন ?

—অনেকদূর পর্যন্ত এক সঙ্গে এগোবো !—চোখ বুজে কিছুক্ষণ যেন কী চিন্তা করে নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন : সে কথা মন্দ বলেন নি। কিছুদিন না হয় এক টার্গেটেই প্র্যাকটিস্ করা যাক। তারপর মুখোমুখি দাঁড়ানো যাবে রাইফেল্ নিয়ে।

রঞ্জন বলেছিল, মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইনা আমরা—পাশাপাশি পা ফেলে এগোতে চাই সম্মুখের দিকে। আজ আপনাদের না পাই, দুদিন পরে পাবোই।

—দুরাশা করছেন। তেলে-জলে মিশ খায় না। খাবেও না কোনোদিন।

রঞ্জন হেসে বলেছিল, শুধু একটি কথায় আমার প্রতিবাদ আছে মাস্টার সাহেব। তেল-জল কথাটা আমি মানি না। দুটোই জল—একটা জম্‌জমের, আর একটা গঙ্গার। শুধু মাঝখানে হাজার দুই মাইলের তফাৎ। ওটুকু পার হতে পারলেই দুটো জল এক সঙ্গে মিশবে।

আলিমুদ্দিন ব্যঙ্গভরে বলেছিলেন, কিন্তু এই আটশো বছরেও কেউ তা পারেনি।

—আটশো বছর ধরে যা পারা যায়নি, তা আজও পারা যাবেনা এটা কোনো যুক্তিই নয় মাস্টার সাহেব। মানুষ পৃথিবীতে পা দিয়েই আকাশে উড়তে চেয়েছে কিন্তু এরোপ্লেন গড়তে তার সময় লেগেছে হাজার হাজার বছর। সেই জন্যেই আমরা আশাবাদী। বলুন, কবে আসছেন জয়গড়ে ?

* * * *

নগেনের ঘরে বসে আরো জোরালো, আরো তীব্র কণ্ঠে আলিমুদ্দিন বললেন, পাকিস্তান আমাদের চাই। কিন্তু ওই শাহুর মতো লোকের জন্যে নয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, পণ্ডিত হোক, আর মৌলবীই হোক—শয়তান আর অত্যাচারীর জায়গা নয় পাকিস্তান। আল্লার রসুলের নাম নিয়ে আমরা গড়ব আজাদী দুনিয়া—সমস্ত শঠ-বঞ্চকদের নিকাশ করব সেখান থেকে। গরীবের রক্ত যারা শুষে খায়, তাদের টুঁটি টিপে ধরব !—বলতে বলতে মাস্টারের হাতের মুঠিটা শক্ত হয়ে এল—মুহূর্তের জন্যে মনে হল যেন ফতে শা পাঠানের গলাটাকেই পিষে ধরেছেন তিনি !

নগেন বললে, সে পাকিস্তানে আমরা সবাই পাকিস্তানী হতে রাজী আছি মাস্টার সাহেব। অত্যাচারী হিন্দুস্থান আমাদেরও দুশ্‌মন। তাই সকলের আগে গরীবকে আমরা এক সঙ্গে মেলাতে চাই, কোমর বেঁধে দাঁড়াতে চাই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে। আমাদের 'কৃষাণ-সমিতির' কথা নিশ্চয় শুনেছেন আপনি।

আলিমুদ্দিন বললেন, শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করিনা।

—কেন করেন না ?

—ও-ও আপনাদের একটা চক্রান্ত। মুসলমানের দল ভাঙানোর ফন্দি।

রঞ্জনের মুখ লাল হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্যে : একটু অবিচার হচ্ছে না মাস্টার সাহেব ?

—অবিচার ?—ঘৃণাভরে আলিমুদ্দিন বললেন, কংগ্রেসে একদিন আমিও ছিলাম—স্বাধীনতার জন্যে জেল আমিও খেটেছি, আমার মাথাতেও পুলিশের লাঠি পড়েছে অনেকবার। আমি জানি, কিসে কী হয়। ভালো ভালো কথা অনেক শুনেছি, কিন্তু মুসলমানের দাবীর কথা যখনি উঠেছে, তখনি কেমন করে তা দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে সে কথা আমি ভুলিনি।

নিজেকে সামলে নিয়ে রঞ্জন বললে, ভোলবার দরকার নেই। কিন্তু একটা জিনিস বিশ্বাস করুন মাস্টার সাহেব, দিন বদলায়।

—হয়তো বদলায়। কিন্তু এখনো তার প্রামাণ পাইনি।

—প্রমাণ তো চাননি !—রঞ্জন হাসল : শুধু অভিমান করে দূরে সরেই দাঁড়িয়ে আছেন। এসে একবার দেখুন না আমাদের ভেতর।

—এসে কী দেখব ?—উদ্ধত স্বরে আলিমুদ্দিন বললেন, চাপা পড়ে যাব আপনাদের তলায়। নগেন বললে, চাপা পড়বেন কেন ? আমাদের এখানকার কৃষাণ-সমিতিতে হিন্দুর চাইতে মুসলমান বেশি। তারা নিশ্চয় আপনার পেছনে থাকবে।

আলিমুদ্দিন চুপ করলেন। কিছু একটা ভেবে স্থির

করে নিতে চাইলেন নিজের মধ্যে। তারপর: যদি সেই সুযোগে আপনাদের কৃষাণ-সমিতিকে আমাদের লীগের প্ল্যাট্‌ফর্ম করে নিই ?

—নিন্ না করে !—রঞ্জন হাসল: গরীবের জন্যে যে লড়বে সেই আমাদের দল। সে মুস্‌লিম লীগ হোক, কৃষাণ-সমিতি হোক, এমন কি হিন্দু মহাসভাও হোক—কিছু আসে যায় না।

আবার চুপ করে রইলেন আলিমুদ্দিন! চিন্তার ভ্রূকুটি ফুটেছে কপালে। অর্ধমনস্ক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরের ছায়া-রৌদ্র-চঞ্চল মহুয়া বনের দিকে—ঝলক-লাগা টাঙ্গন নদীর নীল ধারায়। তারপর ধীরে ধীরে মুক্তি দিলেন বুক চাপা একটা দীর্ঘনিশ্বাসকে।

—নাঃ, লোভ দেখাচ্ছেন আপনারা। ও সবের মধ্যে আর আমি নেই। এর ফলে শুধু আমার পাকিস্তানের লক্ষ্য থেকেই আমি ভ্রষ্ট হবো। সোস্যালিজ্‌মের বুলি কপ্‌চে মুস্‌লিম লীগকে স্যাবোটেজ করতে চান আপনারা।

রঞ্জন হাসল: কিন্তু আপনি যা চাইছেন, তাও তো সোস্যালিজম্ ছাড়া কিছু নয়।

—ইস্‌লামী সোস্যালিজম্। শরিয়তী আইনে সে চলবে। ধর্মকে সামনে রেখে সে এগিয়ে যাবে। আপনাদের মত ধর্ম মানে না, মুসলমানের সঙ্গে রফা হতে পারে না আপনাদের।

—ধর্ম না মানলেও আপনার ধর্মে সে কখনো হাত দেবেনা মাস্টার সাহেব।

বিরক্ত হয়ে আলিমুদ্দিন বললেন—এ সব বলে আমায় ভোলাতে পারবেন না। আমাদের লক্ষ্য সোজা—আমরা যা চাই, তাও স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছি। যদি মেনে নিতে পারেন আসুন। নইলে এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। তা হলে আজ বরং উঠি—আলিমুদ্দিন চৌকি ছেড়ে ওঠবার উপক্রম করলেন।

—সে কী হয়! এখনি উঠবেন কেন ?—নগেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

—বাঃ, ফিরতে হবেনা ? ঢের বেলা হয়ে গেছে।

—তা হোক্ না। খেয়ে যাবেন এখান থেকে।

—খেয়ে যাব ?—আলিমুদ্দিন যেন চমকে উঠলেন।

—সেই ব্যবস্থাই তো করা হয়েছে। এতদূর থেকে এসে না খেয়ে ফিরে যাবেন, তা কি হয় ? মুখের চেহারাট কঠিন হয়ে উঠল আলিমুদ্দিনের: নাঃ, থাক।

—কেন ? আপনি কি হিন্দুর বাড়িতে খান না ?—রঞ্জন জানতে চাইল।

আলিমুদ্দিন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন রঞ্জনের দিকে। ক্ষতটায় আবার নিষ্ঠুর আঁচড় পড়ছে একটা। বিতৃষ্ণাভরা অদ্ভুত গলায় বললেন, খেতাম এককালে। কিন্তু এখন আর খাই না। দেখলাম, যাদের সঙ্গে জাত মেলে না, তাদের সঙ্গে পাতও মিলবে না কোনোদিন।

নগেন শশব্যস্তে বললে, এখানে ও ভয় রাখবেন না। আমাদের কোনো জাতই নেই।

—আপনারা মুসলমানের রান্না খান ?

নগেন উত্তেজিত হয়ে বললে, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে। অমন মোগলাই রান্না থেকেই যদি বঞ্চিত হলাম, তা হলে আর বেঁচে থেকে সুখ কী ?

নিঃশব্দে আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আলিমুদ্দিন। আস্তে আস্তে বললেন, তবে খাব। কিন্তু আজ নয়। অনেক কাজ আছে—এক্ষুণি আমাকে বেরুতে হবে।

—তবে এক মিনিট দাঁড়ান। আপনার চার্জ এখন আর আমাদের ওপর নেই—ও ভারটা আমার বোন নিয়েছে। তাকেই ডাকি।—নগেন স্বর চড়িয়ে ডাকল, উত্তমা—

—আসছি—উত্তমার সাড়া এল।

—আবার কেন—দ্বিধাভরে বলতে গিয়েও থেমে গেলেন আলিমুদ্দিন। দোরগোড়ায় উত্তমা এসে দাঁড়িয়েছে। তেমনি চিরাচরিত অভ্যস্ত তার চেহারা। গাছকোমর বাঁধা, গালে কপালে স্বেদবিন্দু।

নগেন বললে, এই ছ্যাখ্, মাস্টারশাহেব না খেয়ে পালাচ্ছেন।

—সে কি কথা ? এত কষ্ট করে রাঁধছি, পালালেই হল !

সংস্কারবশেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন আলিমুদ্দিন। এই মেয়েটির কাছে রূঢ় হয়ে উঠতে তাঁর বাধল। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বললেন, অনেক কাজ আছে—আজ থাক্।

—আমার হয়ে গেছে, বেশিক্ষণ আপনাকে আটকে রাখব না দাদা।

দাদা! মুহূর্তে চমকে উঠলেন আলিমুদ্দিন—বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকালেন উত্তমার দিকে। কল্যাণী! উত্তর-বঙ্গের এক মফঃস্বল শহরে বর্ষার রাত্রে যে চিরদিনের মতো কালো অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল, আজ কোথা থেকে সে এমন করে প্রাণ পেয়ে উঠল! কোন্ মৃত্যুর আড়াল থেকে আলিমুদ্দিন শুনলেন এই প্রেতকণ্ঠ! একটা তিক্ত যন্ত্রণায় মোচড় খেয়ে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। দাদা!

মৃত্যুর ওপার থেকে আবার ভেসে এল কল্যাণীর প্রেতস্বর।

—আধঘণ্টার মধ্যেই খেতে দেব।

আলিমুদ্দিন তেমনি তাকিয়ে রইলেন। উত্তমার মুখটা মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ—আর ধীরে ধীরে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে সেখানে। আর সেই শূন্যতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে কতগুলো দিন—কতগুলো বৎসর—জ্যোতির্ময় পতঙ্গের মতো উড়ে চলেছে ঝাঁক বেঁধে। তারপর সেগুলো যখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, তখন দেখা গেল যেন পাথরের বেদীর ওপর হিন্দুর একটা মূর্তি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে মূর্তি কল্যাণীর!

কিন্তু আলিমুদ্দিন তো পৌত্তলিক নন। নিষ্প্রাণ প্রতিমা শুধু নিতেই জানে—দেবার শক্তি কোথায় তার! একবার অজ্ঞানের অর্ঘ্য সাজিয়েছিলেন, তার দাম তো শোধ করে দিতে হয়েছে কড়ায় গণ্ডায়! আবার—আবার কি সে ভুল তিনি করবেন? সেদিনের সেই অসহ্য যন্ত্রণার পরেও কি যথেষ্ট শিক্ষা হয়নি তাঁর? না, নিজেকে সংযত করতে হবে এবার।

পারলেন না।

উত্তমা বললে, আর একটু বসুন দাদা, খুব শিগ্গিরই আপনাকে ছেড়ে দেব।

যা বলা উচিত ছিল, তার উল্টোটাই বললেন আলিমুদ্দিন। বহুদিন আগে যে কংগ্রেসকর্মীর কবরের ওপর তিনি শেষ মুঠো মাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর গলার ভেতর থেকে তার আত্মাটাই কথা কয়ে উঠল।

—আচ্ছা, বেশ!—যেন ঘোরের মধ্য থেকে জবাব দিলেন।

যেমন সহজে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল উত্তমা, তেমনি সহজেই অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় দোলায় ভেসে চললেন আলিমুদ্দিন। এ হওয়া উচিত ছিল না, কোনো প্রয়োজন ছিল না এর। যে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে একদিন তিনি দূরে সরে গিয়েছিলেন, কখনো কি জানতেন যে একটা সামান্য আকর্ষণেই আবার সেখানকার সেইখানেই ফিরে আসবেন তিনি? কখনো কি কল্পনা করেছিলেন তাঁর মন এত দুর্বল, এমন হীনশক্তি? একটা অন্ধ, ব্যর্থ আক্রোশে নিজেকেই তাঁর আঘাত করতে ইচ্ছে হল। কবে কোন্ কালো সমুদ্রের ক্ষুব্ধ আক্রোশ পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একটা শিলাখণ্ডের ওপর—চক্ষের পলকে সেখান থেকে অন্তহীন তরঙ্গের মধ্যে আছড়ে পড়লেন তিনি!

এতক্ষণ পরে কানে এল, নগেন হাসছে।

—দেখলেন তো! ইচ্ছে করলেই এত সহজে পালানো যায় না।

—তাই দেখছি!—ক্লান্ত পীড়িত স্বরে যেন স্বগতোক্তি করলেন মাস্টার।

বাইরের মহুয়া বনে ঝলক লাগা রোদ। টাঙ্গন নদীর নীল জল বিষণ্ণ বেদনার মতো বয়ে চলেছে। তার বাঁধা দুপুরের ভেতর থেকে থেকে ঝঙ্কার তুলছে হট্টিটির ডাক। ঠাণ্ডার ছায়া দিয়ে ছাওয়া এই ঘরখানা। খাটের ওপর শীতলপাটি পাতা। একটু আগেই দোর গোড়া থেকে যে সরে গেল—সে তো সেই স্বপ্নে দেখা কল্যাণী! আজ মনে হল—অত্যন্ত আকস্মিকভাবে মনে হল: পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত দীর্ঘ, কত অন্তহীন পথ যেন তিনি পেরিয়ে এসেছেন! যেন মরীচিকার হাতছানিতে ছুটে চলেছেন মরু বালিকার এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে—। কী চেয়েছেন নিজেও স্পষ্ট করে জানেন না, কী পাবেন তারও কোনো সুস্পষ্ট রূপ নেই! তার চেয়ে এখানকার এই ছায়ায়—কল্যাণীর এই ছায়ায়—তিনি কি কোনো স্বপ্নহীন নীরন্ধ্র তন্দ্রার মধ্যে তলিয়ে যেতে পারেন না?

—কী ভাবছেন মাস্টার সাহেব?

রঞ্জনের প্রশ্ন। আবিষ্ট চোখ তুলে ধরলেন মাস্টার।

নগেন বিষণ্ণ গলায় বললে, অবশ্য আপনার যদি খুব বেশি অসুবিধে থাকে, তবে আমি পীড়াপীড়ি করবনা। যদি অস্বস্তি বোধ করেন—

—অস্বস্তি? নাঃ—একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিলেন আলিমুদ্দিন: অন্য কথা ভাবছিলাম। সে যাক্। হাঁ, এখন আমাদের পুরোণো আলোচনাটাই চলুক—জোর করে সব কিছু ভুলে যাওয়ার একটা প্রচণ্ড প্রচেষ্টা করে মাস্টার বললেন, খানিক দূর পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে যেতে পারি—এই কথাই হচ্ছিল। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত? আর আপনাদের প্রোগ্রামটাই বা কী?

রঞ্জন কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল একটা লোক। তার পর আলিমুদ্দিনকে দেখেই চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। ছাঁটা ছাঁটা চুল—ষণ্ডা চেহারা—একটা বন্য মহিষের মতো দেখতে। দুটো রক্তমাখা চোখে আগুন বর্ষণ করতে করতে সে হিংস্র জন্তুর মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল।

নগেন চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

—কী—কী হয়েছে যমুনা?

যমুনা আহীর তবু জবাব দিলনা। প্রকাণ্ড চওড়া বুকটা প্রচণ্ড নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শুধু তালে তালে ওঠা-পড়া করতে লাগল।

—কোনো ভয় নেই, বলো। ইনি আমাদের বন্ধু লোক।

যমুনা কেঁপে উঠল একবার। তারপর একটা অদ্ভুত বিকৃত স্বর বেরুল তার গলা দিয়ে।

—আমি ফেরারী—থানায় যেতে পারিনি। কিন্তু ইস্ দফা হাম খুন করেঙ্গা—জান লে লেঙ্গা!

—কার জান নেবে? কী হয়েছে?—নগেন আকুল হয়ে উঠল: খুলে বলো সব।

সেই অদ্ভুত বিকৃত স্বরে যমুনা বললে, শাহুর লোক লাঠি পাঠিয়ে মাঠ থেকে ঝুমরিকে ধরে নিয়ে গেছে। (ক্রমশঃ)

কৃপাময়ীর মন্দির—

গত পৌষ মাসের শেষ বুধবারে মুর্শিদাবাদ কাসিমবাজারের প্রাচীনতম দেবালয় কৃপাময়ী কালীর নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে।

কৃপাময়ীর মন্দির—কাসীমবাজার, মুর্শিদাবাদ ফটো—ভেণ্টু জ

পুরাতন মন্দির সহরের ধ্বংসের সহিত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে দীর্ঘকাল প্রাচীন শিলামূর্ত্তি অনাদৃত ভাবে পড়িয়াছিল। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, ডাঃ শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমদনগোপাল সরকারের চেষ্টায় ও জনসাধারণের সাহায্যে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ ও নিত্য পূজার ব্যবস্থা হইল। কাসিমবাজারের ভগ্নস্তূপ হইতে এই শিলামূর্ত্তি উদ্ধার করা হইয়াছিল। বাঙ্গলার বহু স্থানে এইরূপ প্রাচীন মূর্ত্তি পড়িয়া আছে—সেগুলির উদ্ধার হইলে বাঙ্গলার সংস্কৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা হইবে।

বিদেশে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার—

ভারত সেবাশ্রম সংঘের একদল সন্ন্যাসী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার করিতে গিয়াছেন। ঐ দলের অন্যতম ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ এক পত্রে আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"৪৮ দিন সমুদ্র ভ্রমণের পর আমরা ১০ই জানুয়ারী ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অফ্ স্পেনে আসিয়াছি। পথে আমরা মরিসাসে ও কেপটাউনে ২ দিন করিয়া ছিলাম। সেখানে বক্তৃতা ও অন্যান্য প্রচারাদি হইয়াছে। এখানে সমস্ত দ্বীপটিতে হিন্দুর

সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। বিহার ও উত্তর প্রদেশের অধিবাসীই বেশী। তাহাদের বাসস্থান কোথায় ছিল অনেকেই বলিতে পারে না। হিন্দী একেবারে ভুলিয়াছে—ইংরাজি ছাড়া আর কিছুই বুঝে না। ৫ বৎসরের শিশু হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলের সহিতই ইংরাজিতে কথা বলিতে হয়। ভজন কীর্ত্তন ছাড়া আর সবই ইংরাজিতে করিতে হইতেছে। আমরা হিন্দী ভাষা কিছু শিখাইবার চেষ্টা করিতেছি। ধর্ম্ম বলিতে কি, তাহা কোন হিন্দুই প্রায় জানে না। ধুতি শাড়ীর প্রচলন একেবারেই নাই। নিতান্ত বড়লোকের ঘরের বধূ কোথাও উৎসবে যাইতে হইলে দৈবাৎ একখানা শাড়ী পরেন। তা ছাড়া সবই চেষ্টা করিতেছি। তবে উচ্চারণ অনেক তফাৎ। হিন্দী বা সংস্কৃত ভাল ভাবে উচ্চারণ করিতে পারে না। অসংখ্য হিন্দু খৃষ্টান হইয়াছে। তবে তাহারাও প্রত্যহ দলে দলে আমাদের পূজা ও প্রার্থনায় আসিতেছে। ছেলেমেয়েদের নাম ও সীতা, গীতা, রাম, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি রাখিয়াছে। সহরের বিশিষ্ট লোকজন লইয়া অভ্যর্থনা সমিতি হইয়াছে, তাহারা নানা বিষয়ে আমাদের সাহায্য করিতেছেন।"

ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের সভ্য সন্ন্যাসীরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট অফ্ স্পেনে পৌছিলে, তাঁহাদের নাগরিক সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। তাহার পর

ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশন (ভারত সেবাশ্রম সংঘ) ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর গবর্ণর সার হিউবার্ট রেন্স-এর ভবনে

গাউন। রাস্তার ঝাড়ুদার হইতে জমীর চাষী পর্য্যন্ত প্যান্ট-কোট পরে ও ভাষা ইংরাজি। আমরা প্রত্যহ পূজা আরতি করিতেছি—প্রথমে লোক হইত না—এখন বেশ লোকজন হয়। কেমন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, তাহাও জানে না। মাত্র ১০৫ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ চাষী বা শ্রমিক হিসাবে এ দেশে আসিয়াছে—কিন্তু আশ্চর্য্য, এত অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি সব ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা বক্তৃতাদি করিতেছি, বহু দূর হইতে হিন্দুরা তাহা দেখিতে আসিতেছে—আমরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভজন, পূজার মন্ত্র, স্তোত্র প্রভৃতি শিখাইবার

ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর গবর্ণর সার হিউবার্ট রেন্স সরকারী ভবনে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। স্বামীজিরা স্যানফ্রে নামক সহরে প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করিয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। প্রত্যহ পূজা, আরতি, বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে ধর্ম্মকথা প্রচার, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পুস্তক বিতরণ, গীতা ব্যাখ্যা প্রভৃতির দ্বারা সহরে একটা নূতন পরিবেশের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

স্বাধীন ভারত হইতে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য এখন বহু দলের এই ভাবে বিদেশে ভ্রমণ করার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে। ইহকালসর্ব্বস্ব, জড়বাদজর্জরিত

জগতকে ভারতই শুধু তাহার ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা নূতন জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে।

৺নিরুপমা দেবী—

শ্রীরামপুর (হুগলী) হইতে শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায় জানাইয়াছেন—গত ফাল্গুন মাসের "ভারতবর্ষে"র 'দেশ বিদেশ' বিভাগে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় নিরুপমা দেবী সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এই আলোচনায় দুইটি ভুল আছে। নিরুপমা দেবী গত ২২-এ পৌষ, ৭ই জানুয়ারি দেহত্যাগ করিয়াছেন, ২৩-এ পৌষ নহে। তাঁহার চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য জগত্তারিণী ও ভুবন-মোহিনী স্বর্ণপদক দুইখানি বন্ধক দেওয়ার যে সংবাদ মুর্শিদাবাদের কোনো সাময়িক পত্র পরিবেশন করিয়াছেন তাহার মূলেও সত্য নাই। এ বিষয়ে তাঁহার অগ্রজ সুলেখক শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট মহাশয়কে পত্র লেখায় তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :

"নিরুপমা তাঁহার স্বর্গতা মাতার সেবার জন্য শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্ব্বে একবার তিনি বৃন্দাবনে অত্যন্ত অসুস্থা হন। তাঁহাকে এখানে আনিয়া চিকিৎসা করিয়া বাঁচান গিয়াছিল। তারপর ১৯৪৯ সালে আবার মাতৃসেবার জন্য তিনি বৃন্দাবন যান। তারপর আমার মাতৃদেবী গত চৈত্র মাসে ধামপ্রাপ্ত হন। ইহার পর নিরুপমা এখানে ফিরিব ফিরিব করিতেছিলেন। গত আশ্বিন মাস হইতে তিনি অত্যন্ত অসুস্থা হইয়া পড়েন। এমন কি চিঠিপত্রও দিতে পারেন নাই। আমরা আমাদের একজন আত্মীয়ার নিকট হইতে পত্র পাইয়া জানিতে পারি যে তিনি অসুস্থা। তখন এখান হইতে আমার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে এবং লক্ষ্ণৌ হইতে আমার মধ্যম পুত্রকে পাঠাইয়া তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করি। কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষর ব্যতীত এখানকার পোষ্ট অফিস ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে না পারায় আমরা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। সেই সংবাদ কোনো অত্যুৎসাহী সাংবাদিক পাইয়া নিরুপমার মৃত্যুর পর ঐ বিকৃত সংবাদ কাগজে ছাপাইয়া দেয়। কথাটা সম্পূর্ণ আজগুবি। আমি তাঁহার চিকিৎসাদির জন্য এবং মৃত্যুর পর উর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করি। * * নিরুপমার বয়স সম্বন্ধেও ভুল সংবাদ বাহির হইয়াছে। মৃত্যুর তারিখও ভুল। * * নিরুপমার মৃত্যু তারিখ ৭ই জানুয়ারী ১৯৫১।"

গিরিজাপ্রসন্ন স্মৃতি উৎসব—

মোহিনী মিলের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তীর পুত্র ও শ্যামনগর (২৪পরগণা) শ্রীঅন্নপূর্ণা কটন মিলের প্রতিষ্ঠাতা ৺গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর চতুর্থ বার্ষিক স্মৃতি উৎসব গত ৬ই ফেব্রুয়ারী মিল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত
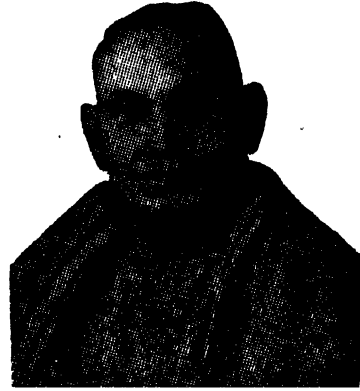
৺গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী

হইয়াছে। সভায় পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতিত্ব করেন ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি প্রধান অতিথি ছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এবং শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি গিরিজা-বাবুর গুণাবলী ও কার্য্যদক্ষতার বিষয়ে সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস—

বেঙ্গল কেমিকেল এণ্ড ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিমিটেডের প্রধান কেমিষ্ট ও ভারতবর্ষের লেখক ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস বর্তমান বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কে বিশুদ্ধ ও ফলিত রসায়নের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। বেঙ্গল কেমিকেলের অন্যতম কেমিষ্ট ডক্টর সতীন্দ্রজীবন দাশগুপ্তও নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

পরলোকে ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়—

আরিয়াদহ (২৪পরগণা) নিবাসী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জানুয়ারী ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি এলাহাবাদ হইতে বি-এ ও এল্ এল-বি পরীক্ষা পাশ করেন ও বহুদিন ব্যবহারজীবীর কাজ করেন। ১৯২১ সাল হইতে তিনি অসহযোগ

৺ব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায়

আন্দোলনে যোগদান করিয়া কংগ্রেসের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ২৪পরগণা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক এবং বারাকপুর মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে কাজ করিয়াছিলেন। কয়েকবার তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। আরিয়াদহ অনাথ ভাণ্ডারের তিনি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—

আসামের জনপ্রিয় কম্পট্রোলার শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি সংযুক্ত রাজস্থানের একাউন্টেণ্ট-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া জয়পুর গমন করিতেছেন। সুধাংশুবাবু সুপণ্ডিত এবং ভারতবর্ষের নিয়মিত লেখক। তিনি শিলিংয়ে অবস্থানকালে আসামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন এবং রাজ্যপাল

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের পৃষ্ঠপোষকতায় তথায় একটি 'ইতিহাস পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শিলংস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বৌদ্ধ সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন, শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ প্রতিষ্ঠিত পাঠ ও সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সুধাংশুবাবু বাঙ্গলা ও অসমীয়া সংস্কৃতির মিলন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহের সহিত কাজ করিয়াছেন।

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ২১৭ (হ্যাসেট ৯২ ; মরিস ৫০। বেডসার ৪৬ রানে ৫ এবং ব্রাউন ৪৯ রানে ৫ উইকেট। ও **১৯৭** (হোল ৬৩ ; হার্ভে ৫২ ; হ্যাসেট ৪৮। বেডসার ৫৯ রানে ৫ এবং রাইন ৫৬ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড ঃ ৩২০ (সিমসন ১৫৬ নট-আউট ; হ্যাটন ৭৯। মিলার ৭৬ রানে ৪ এবং লিণ্ডওয়াল ৭৭ রানে ৩ উইকেট।) ও **৯৫** (২ উইকেট। হ্যাটন ৬০ নট আউট)

১৯৫০-৫১ সালে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট ম্যাচ সিরিজে অষ্ট্রেলিয়া ৪টে টেষ্ট খেলায় জয়ী হয়েছে অপরপক্ষে ইংলণ্ড ১টা—পঞ্চম টেষ্টে। পর পর ৩টে টেষ্টে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া 'এসেস' পেয়ে যায়। সুতরাং বাকি দু'টো টেষ্ট খেলার উপর অষ্ট্রেলিয়ার বিশেষ কোন আগ্রহ না থাকারই কথা। তবু অষ্ট্রেলিয়া ৪র্থ টেষ্টে ইংলণ্ডকে হারায়। ৫ম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ইংলণ্ডের কাছে হেরেছে। ১৯৩৮ সালের পর টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ডের কাছে অষ্ট্রেলিয়া এই প্রথম হার স্বীকার করলো। শেষ হেরেছিলো ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের ওভালের ৪র্থ টেষ্টে এক ইনিংস ৫৭৯ রানে।

ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট খেলার ইতিহাসে উভয়দলের পক্ষে ইংলণ্ডের এই জয়লাভ 'বৃহত্তম জয়' হিসাবে আজও রেকর্ড হয়ে আছে। শেষ পঞ্চম টেষ্টে উল্লেখযোগ্য খেলা হিসাবে ইংলণ্ডের পক্ষে ব্যাটিংয়ে এল হ্যাটন এবং বোলিংয়ে বেডসারের নাম বিশেষ ক'রে মনে থাকবে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৩৪ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত ৬টা টেষ্ট সিরিজের খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৬টাতেই 'এসেস' পেয়েছে। হারিয়েছে ৫টা সিরিজে। ১৯৩৮ সালের টেষ্ট সিরিজে টেষ্ট খেলার ফলাফল সমান দাঁড়ায় কিন্তু ১৯৩৭ সালে অষ্ট্রেলিয়া 'এসেস' জয়ী থাকায় ১৯৩৮ সালেও 'এসেস' সম্মান অষ্ট্রেলিয়ার কাছেই থেকে যায়।

ক্রীড়াচাতুর্য্যের তুলনামূলক বিচারে বর্ত্তমান ইংলণ্ড দলের থেকে অষ্ট্রেলিয়া যে শক্তিশালী সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অষ্ট্রেলিয়ার 'এসেস' লাভ এবং ক্রীড়া-চাতুর্য্যের উপর কোন রকম কটাক্ষপাত না করেও একটা কথা বলা চলে যে, এবারের টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দলকে কিছু কিছু ভাগ্য বিড়ম্বনার সঙ্গেও লড়তে হয়েছে ; যেমন খারাপ আবহাওয়া এবং খেলোয়াড়দের অসুস্থতা। অবিশ্যি একথা ঠিক, এ সমস্ত ঘটনার ঝুঁকি নিয়েই ক্রিকেট খেলায় নামা। তবে যেখানে দু'দলই সমান সমান কিম্বা উনিশ-বিশ সেখানে একদলের ভাগ্য বিড়ম্বনায় খেলার আকর্ষণ যতখানি না কমে তার থেকে বহু গুণ বেশী কমে যায় শক্তির দিক থেকে দু'দলের মধ্যে যখন বিরাট ব্যবধান থাকে—বর্ত্তমানের ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজে সম্প্রতি আমরা যা অবলোকন করলাম। ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার দল গঠন ব্যাপারেও দুইদলের নীতির পার্থক্য আছে। জাতির ভবিষ্যত বংশধরদের কথা অষ্ট্রেলিয়া কোনমতেই উপেক্ষা করেনি ; অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহল তরুণ খেলোয়াড় আবিষ্কারের অভিযানে পাড়ি দেয় ; তাদের নীতি, 'No risk, No gain.' এই নীতির মধ্যে বিপদের ঝুঁকি যত আছে, তার থেকে বেশী আছে ভবিষ্যতের সাফল্যময় সম্ভাবনা। ইংরেজ জাতির সাম্রাজ্যবাদ নীতির মূল দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল রক্ষণশীলতা বা গোঁড়ামি। ইংলণ্ডের ক্রিকেট দল গঠন ব্যাপারে এই নীতির ব্যতিক্রম নেই বলেই অষ্ট্রেলিয়ার তরুণ ক্রিকেট দলের কাছে বার বার

পরাজয় ঘটছে। ইংরেজ শাসনাধীনে সুদীর্ঘকাল বসবাস ক'রে ভারতীয় ক্রিকেট মহলের দৃষ্টিভঙ্গীও ইংরেজ চরিত্র দ্বারা প্রভাম্বিত হয়েছে। জাতীয় সম্মান এবং স্বার্থের পক্ষে এ নীতি কোনমতেই গঠনমূলক নয়।

ভারতীয় টেষ্ট ক্রিকেট ঃ

কমনওয়েলথ ঃ ৪১৩ (ওরেল ১১৬। মানকড় ১৬৪ রানে ৪ উইঃ) ও **২৬৬** (৬ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ওরেল ৭১ নট আউট ; আইকিন ৬৩। গাইকোয়াড় ৮৩ রানে ৩ উইঃ)

ভারতবর্ষ ঃ ২৪০ (উমরিগড় ৫৭। ডুল্যাণ্ড ৭০ রানে ৪ উইঃ) ও **৩৬২** (মার্চ্চেণ্ট ১০৭, উমরিগড় ৬৩, মুস্তাক ৮০, গোপীনাথ ৬৬ নট আউট। রামাধীন ১০২ রানে ৫ এবং ওরেল ১১১ রানে ৩ উইঃ)

কানপুরে গ্রীন পার্কে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ বনাম ভারতীয় দলের বে-সরকারী শেষ ৫ম টেষ্টে কমনওয়েলথদল ৭৭ রানে ভারতীয় দলকে হারিয়ে দেয়। পাঁচটি বে-সরকারী টেষ্টের মধ্যে ৩টি খেলা ড্র যায়, কমনওয়েলথ দলের পক্ষে জয় ২টো (২য় এবং ৫ম টেষ্ট)। কমনওয়েলথ দল ১৬জন খেলোয়াড় নিয়ে এবারের ভারত সফরে এসেছিলো। ৪জন নামকরা খেলোয়াড় ভারতীয় সফর শেষ হওয়ার আগেই ভারতবর্ষ ছেড়ে স্বদেশে ফিরে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাটা স্পিনবোলার জর্জ্জট্রাইব স্বদেশে ফিরে যাওয়ায় ৫ম টেষ্টে যোগদান করেন নি। সুতরাং সফরের শেষ টেষ্ট ম্যাচে দলটি আগের থেকে দুর্ব্বল ছিল বলা চলে। ক্রিকেট খেলায় টসে জয়লাভ করা খেলায় অর্দ্ধেক আধিপত্যবিস্তারের সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ৫ম টেষ্টে অধিনায়ক বিজয় মার্চ্চেণ্ট টসে জয়লাভ করেও দলকে ব্যাট করতে পাঠান নি।

বৃষ্টির দরুণ ভিজে উইকেট বিপক্ষের প্রতিকূলে যাবে ভেবেই মার্চ্চেণ্ট প্রথমে কমনওয়েলথ দলকে ব্যাট করতে ছেড়ে দেন। কিন্তু হাতে অনুকূল অবস্থায় উইকেট পেয়েও ভারতীয় বোলারগণ কমনওয়েলথদলকে বিপর্য্যয়ের মুখে ফেলতে পারেননি। প্রথম দিনের খেলার নির্দ্ধারিত সময়ে কমনওয়েলথদল ৬ উইকেটে ৩০৭ রান করে। এই রানই ভারতীয় বোলারগণের ব্যর্থতার যথেষ্ট পরিচয় হিসাবে নেওয়া যায়। এই সঙ্গে বোলার নীরদ চৌধুরীর কথা মনে পড়ছে। ৫টা টেষ্টের বোলিং এভারেজ তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন ৩টে টেষ্ট খেলে। ২য় টেষ্টে তিনি দলের পক্ষে বেশী উইকেট পান। সুতরাং ৫ম টেষ্টে তাঁকে দল থেকে বাদ দেবার কোন যুক্তি ছিল না। তাঁর বদলী যিনি নেমে-ছিলেন তাঁর শোচনীয় ব্যর্থতায় চৌধুরীর যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। ওরেল ১১৬ রান করেন, এবারের টেষ্ট্ সিরিজে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। এই রান তুলতে গিয়ে ওরেল পাঁচবার আউট হ'তে হ'তে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। এর মধ্যে একবার রান আউট আর চারবার সহজ ক্যাচ তুলে দিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের লোকচক্ষে অক্ষমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করবার সুযোগ দেন। একজন খেলোয়াড়েরই চারটে ক্যাচ না লুফতে পারা টেষ্ট খেলোয়াড়দের পক্ষে মোটেই শোভন নয়। খেলার ৩য় দিনে ভারতীয়দলের ১ম ইনিংস মাত্র ২৪০ রানে শেষ হয়। এদিকে উইকেটের অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও কমনওয়েলথদলের অধিনায়ক এম্‌স ভারতীয়দলকে 'ফলোঅন' থেকে কেন যে রেহাই দিলেন দর্শকমহল ভেবে কোন কুলকিনারা পেল না। ক্রিকেট খেলা অপ্রত্যাশিত ফলাফলের জন্য চিরকাল প্রসিদ্ধ। অপ্রত্যাশিত ফলাফল যেন ক্রিকেট খেলার অপর একদিকের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে অধিনায়ক এম্‌সের অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত ক্রিকেট খেলায় অপ্রত্যাশিত ফলাফলের সমতুল্য হিসাবে স্মরণীয় থাকবে। ৪র্থ দিনের লাঞ্চের সময় ২য় ইনিংসের ৬ উইকেটে ২৬৬ রান উঠলে পর কমনওয়েলথদল ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড ক'রে ভারতীয়দলকে ২য় ইনিংস খেলতে ছেড়ে দেয়। ভারতীয় দলের পক্ষে খেলায় জয়লাভের জন্য তখন ৪৪০ রান দরকার, হাতে সময় ৪৮০ মিনিট। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ২টো উইকেট পড়ে ১৪১ রান উঠলো, জয়ের জন্য ২৯৯ রান দরকার। খেলার শেষ দিনে ৩৬০ রানে ২য় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফলে ৭৭ রানে কমনওয়েলথ দল জয়ী হয়। ভারতীয়দল ৫ম টেষ্টে হেরে গেলেও তাদের এ পরাজয় কোনদিক থেকে অগৌরবের হয়নি ; কারণ দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয়দল এক সাফল্যময় ক্রিকেট খেলার পরিচয় দিয়েছে।

টেষ্ট খেলার ৫ম দিনে অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার শেষ ফলাফলে ভারতীয়দলের পক্ষে পরাজয় ঘটলেও কানপুরের

দর্শকমণ্ডলী কোন সময়েই ভারতীয়দলকে হারবার মত খেলতে দেখেনি। জয়লাভের প্রয়োজনীয় ৭৮ রানের মাথায় ভারতীয় দলের ২য় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ৭৭ রানে হার স্বীকার করে। এই পরাজয়ের মধ্যেও আমাদের মনে থাকবে মার্চেন্টের দৃঢ়তাপূর্ণ ১০৭ রান, মুস্তাকের ৮০, উমরীগড়ের ৬৩ এবং টেষ্টে নবাগত তরুণ কলেজ ক্রিকেট খেলোয়াড় গোপীনাথের নট আউট ৬৬ রান। আর অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা মনে রাখবো, খেলার শেষে অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও, প্যাভেলিয়ন এবং মাঠের আসবাব পত্রের উপর একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল দর্শকমহলের অখেলোয়াড়ী হামলা। কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই খেলার প্রয়োজন নয়; খেলোয়াড় হিসাবে খেলায় যোগদান এবং দর্শক হিসাবে মাঠে উপস্থিত থাকার মুখ্য উদ্দেশ্য, জাতিকে অটুট স্বাস্থ্য সম্পদে এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে সুদৃঢ় করতে উদ্বুদ্ধ করা। নৈতিক চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা ক'রে আমরা কখনই খেলার মাঠে চিত্তবিনোদনের উপাদান লাভ করতে পারবো না। খেলার মাঠ তখন আর চিত্তবিনোদনের প্রমোদ স্থান থাকবে না, দাঙ্গাহাঙ্গামার কুরুক্ষেত্রে পরিণত হবে।

রঞ্জিট্রফিতে পশ্চিম বাংলা দল ঃ

হোলকার ঃ **৫১৫** (সারভাতে ২৬৪। পি চ্যাটার্জি ১৩৭ রানে ৭ উইকেট। ও **১৫৩** (১ উইকেট। মুস্তাকআলি ১০০)

পশ্চিম বাংলা ঃ ৪৪৭ (পি রায় ১৬৩; এস বোস ৮২; সি এস নাইডু ৬৯; পি চ্যাটার্জি ৪৯)

রঞ্জিট্রফি প্রতিযোগিতার পূর্ব্বাঞ্চলের ফাইনালে গত বছরের রঞ্জিট্রফির রানার্স আপ হোলকারদল প্রথম ইনিংসের রানের ব্যবধানে অগ্রগামী থাকায় পশ্চিম বাংলাকে ৬৮ রানে পরাজিত করেছে। পশ্চিম বাংলা শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভে সমর্থ না হলেও হোলকার দলের বিপুল রান সংখ্যার বিপক্ষে তাদের দৃঢ়তাপূর্ণ খেলা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঙ্কজ রায় ও শিবাজী বসুর ২য় উইকেটের জুটিতে বাংলা দলের ১৪৯ রান এবং ৩য় উইকেটে পঙ্কজ রায় ও পি চ্যাটার্জির জুটিতে ১৩১ রান উঠে। বাংলা দলের পক্ষে অধিনায়কত্ব করেন সি এস নাইডু অপরপক্ষে হোলকার দলে প্রবীণ খেলোয়াড় কর্নেল সি কে নাইডু। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় একই দলের পক্ষে দুই সহোদর ভাইকে খেলতে দেখা গেছে; কিন্তু অধিনায়ক হিসাবে দুই ভাইয়ের দুইদিকে যোগদান অভিনব, ক্রিকেট খেলায় অপ্রত্যাশিত ঘটনার পর্য্যায়ে ফেলতে পারেন।

হকি মরশুম ঃ

ক'লকাতায় হকি মরশুম আরম্ভ হয়েছে এবং বিভিন্ন বিভাগের খেলা পুরোদমে চলছে। প্রথম বিভাগে গত বছরের লীগবিজয়ী কাষ্টমস ৫টা খেলায় ৯ পয়েণ্ট করেছে। মোহনবাগান (৬টায় ১২ পয়েণ্ট) এবং ভবানীপুর (৮টায় ৮ পয়েণ্ট) এ পর্য্যন্ত একটা খেলাতেও হারেনি।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীঅশোককুমার মিত্র প্রণীত "দু' ঘণ্টা"—২৲
নিশিকান্ত বসুরায় প্রণীত নাটক "ললিতাদিত্য" (৬ষ্ঠ সং)—২৲
"প্রত্যক্ষদর্শী"-লিখিত "মিডিয়ামে গান্ধীজী"—॥০, "মিডিয়ামে ৺শরৎ বসু"—৷৵০
কালপুরুষ প্রণীত "মিডিয়ামের ইতিহাস"—৸০
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত একাঙ্ক নাটক "পরিণাম"—১৲
শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত রহস্যোপন্যাস "মৃত্যু-ভবনে মোহন"—২৲, "মোহন ও ক্ষুধিত-প্রান্তর"—২৲
শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "শেষের গান"—১॥০
শ্রীবিজয়াপদ সমাদ্দার-সম্পাদিত বাংলা পদ্যানুবাদ "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"—২৲
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "বিবস্ত্র মানব" (২য় সং)—৪৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "রুম নাম্বার থার্টি"—১।০
সুশীল রায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "পাঞ্চালী"—২৲
মনোজ বসু প্রণীত উপন্যাস "নবীন যাত্রা"—৩৲
জীবেন্দ্র সিংহরায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "অঙ্গীকার"—॥৵০
ডাঃ সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "সীমাহীন"—২৲
শ্রীমৃণালকান্তি বসু প্রণীত "শান্তির সন্ধানে"—১।০
শ্রীশরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "গান্ধী স্মরণে"—।০
"ভাই" প্রণীত "আঁধারে আলো" (২য় প্রবাহ)—২৲
শ্রীরাধারমণ দাস সম্পাদিত রহস্যোপন্যাস "অদ্ভুত হত্যা"—২৲

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিল্পী—শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

ঝড়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
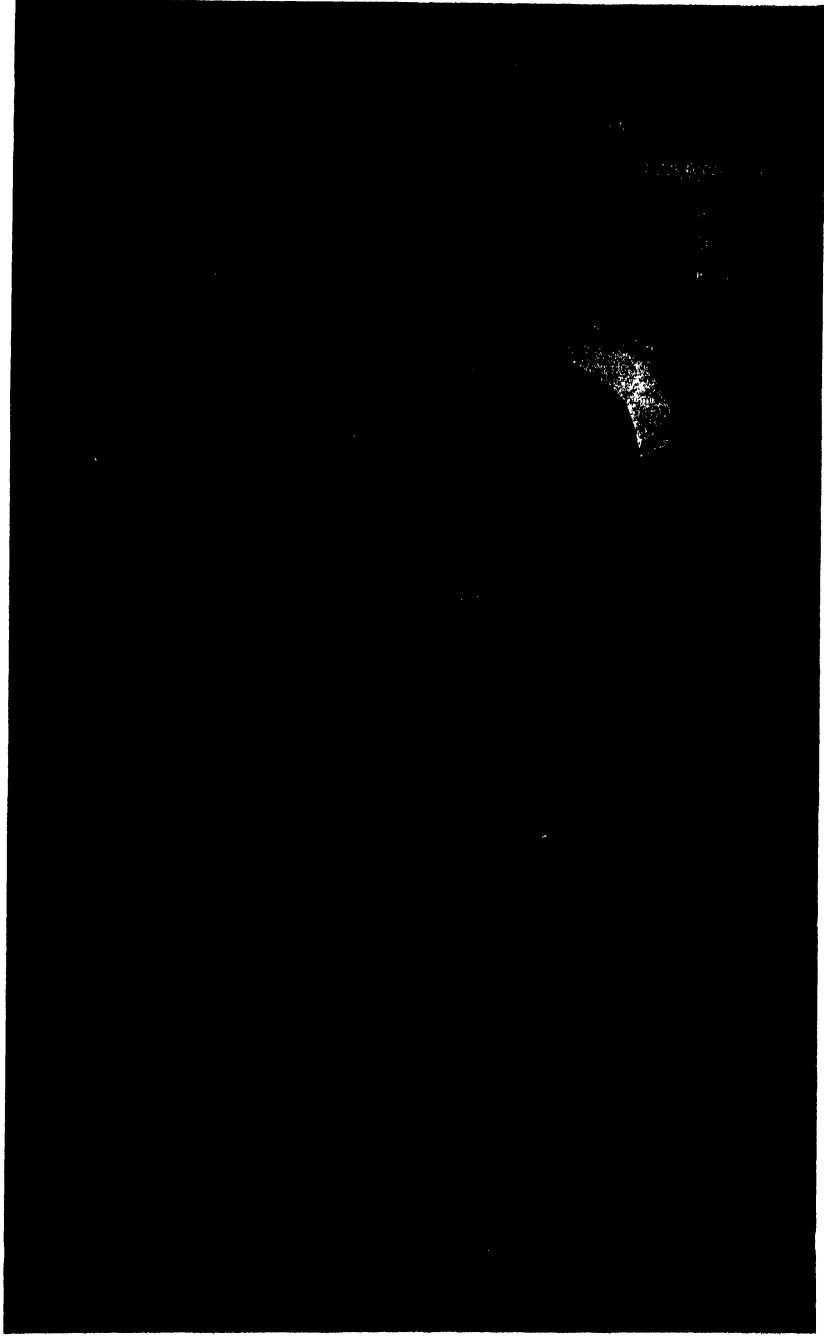
বৈশাখ—১৩৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড	অষ্টত্রিংশ বর্ষ	পঞ্চম সংখ্যা

ভারতের রাসায়নিক শিল্পের পর্যালোচনা

শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন

রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুতিকে রাসায়নিক শিল্প বলা হয়। এই শিল্পের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, মুখ্যবস্তুর উৎপাদন-কালে যে সব গৌণ বস্তু উৎপন্ন হয় সেগুলি ফেলে না দিয়ে কোনও না কোন কাজে সেগুলির ব্যবহার করা। আখ থেকে বিশুদ্ধ চিনি তৈরি এর একটি সহজ উদাহরণ। আখ থেকে রস নিষ্কাশন কালে যে ছোবড়া জন্মে সেগুলি ফেলে না দিয়ে কয়লার পরিবর্তে বয়লারে পুড়িয়ে কাজে লাগানো বা তা থেকে প্রক্রিয়া বিশেষের সাহায্যে কাগজ তৈরি করে ব্যবহার করা। তার পর রস থেকে বিশুদ্ধ শাদা চিনি প্রস্তুত করবার সময় যে ঝোলা গুড় বাদ যায় তা থেকে সুরাসার উৎপন্ন করা। সাবান তৈরির বেলায় গৌণ বস্তু গ্লিসারিণ জন্মে, কিন্তু নানা কারণে আমাদের দেশে অনেক স্থলেই উহা বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা হয় না বলে সাবানের দাম আমাদের বেশী পড়ে যায়। বক্সাইট নামক প্রস্তর বিশেষ থেকে যখন ফট্‌কিরি তৈরি করা হয় তখন ঐ প্রস্তরে নিহিত টাইটেনিয়ম ধাতুর যৌগিক পদার্থ ও অল্প মাত্রায় বেরিয়ে আসে, আমাদের দেশের ফট্‌কিরির কারখানায় উহা ফেলে দেওয়া হয়—অথচ ঐ অকেজো অংশ থেকে মূল্যবান পেণ্ট, পাউডার প্রভৃতি প্রস্তুত করতে পারলে ফটকিরির দাম অনেকটা কমে যেতে পারে।

আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করতে আমেরিকা, ইতালি বা জাপান থেকে বিশুদ্ধ সালফার আমদানি করি কিন্তু বিলাতে পাথুরে কয়লা থেকে কোক প্রস্তুতকালে গন্ধক ঘটিত যে যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায় তা থেকে তারা প্রচুর সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে। কাজেই তাদের সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরির খরচা কম পড়ে। আমাদের দেশে এদিকে এখনও কোনও চেষ্টা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে

রাসায়নিক শিল্পের গৌণ বস্তুর চাহিদাই এত বেশী হয় যে, শেষকালে কোন্‌টি মুখ্য তা বুঝবার উপায় থাকে না। লবণ জল থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ সাহায্যে কষ্টিক সোডা তৈরিতে ইহা দেখা যায়। এস্থলে গৌণ বস্তু হিসাবে জন্মে ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন। অ্যামোনিয়া তৈরি, তরল তেলকে ঘনীভূত করা বা কয়লা থেকে পেট্রোল উৎপাদনে হাইড্রোজেন দরকার হয়। পক্ষান্তরে কীটঘ্ন ডিডিটি, গ্যামাক্সেন, কাপড় ও পুস্তকাদির কীট নিবারক ডাইক্লোরোবেনজিন প্রভৃতি উৎপাদনে ভূরি পরিমাণে ক্লোরিণের দরকার হয়। এতদ্‌ভিন্ন আমাশয়ের ঔষধ এনটোকিন, ম্যালেরিয়ার প্যালুড্রিন এবং কুষ্ঠের মহৌষধ নভোট্রোন প্রভৃতি মূল্যবান ঔষধ তৈরিতেও—ক্লোরিণের প্রয়োজন। বিবিধ মূল্যবান রাসায়নিক প্রস্তুতের অপরিহার্য উপাদান বলে ক্লোরিণকে আজকাল বলে 'কুইন অব কেমিক্যালস'। কোনও দেশে নানা শ্রেণীর রাসায়নিক শিল্প প্রসার লাভ না করলে গৌণ বস্তুর চাহিদা থাকে না, ফলে মুখ্য বস্তু উৎপাদনের খরচা পড়ে যায় বেশী এবং সে কারণ বিদেশী প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো হয়ে পড়ে দুষ্কর। যদিও প্রাচীন ভারতে সুরাসার তৈরি, উর্দ্ধপাতন সাহায্যে বিবিধ গন্ধ তৈলের নির্যাস নিষ্কাশন, ধাতু ও উদ্ভিদ থেকে বিভিন্ন প্রকারের তেজস্কর ঔষধ প্রস্তুতি প্রভৃতি প্রচলিত ছিল তথাপি কালক্রমে রসায়ন শাস্ত্রের চর্চা ও তৎসঙ্গে উহার প্রয়োগবিধি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে পড়েছিল। লৌহাদি ধাতু নিষ্কাশন এতদ্দেশে কতদূর উন্নত স্তরের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিরাট আকারের লৌহস্তম্ভাদি দেখে। এর পরে আমাদের অন্ধকার যুগের সূত্রপাত হয়—আর—ঐ সময় ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ নব উদ্যমে নব্য রসায়নী বিদ্যার চর্চা ও প্রয়োগ করে বিরাট আকারের রসায়নিক শিল্প গড়ে তোলে। গত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জার্মানি এ বিষয়ে সকল সভ্য জাতিকে হার মানিয়ে দেয়। রঞ্জন শিল্পই ছিল রাসায়নিক শিল্পের মধ্যমণি। রঞ্জন শিল্পের ক্রমবিকাশ শীর্ষক ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমাদের পুস্তকে জার্মানির এই শিল্পোন্নতির সুস্পষ্ট ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

ইংলণ্ড ও জার্মানির রাসায়নিক শিল্পোন্নতির গোড়ার কথা থেকে বুঝা যায়—আমাদের দেশ ঐ শিল্পে এত পশ্চাৎপদ কেন। এদেশে নব্য রসায়নী বিদ্যার চর্চা সুরু হয় অনেক দেরীতে এবং উহার গবেষণা কার্যের সূত্রপাত হয় আরও অনেক পরে। বিদেশী শাসক সম্প্রদায় এদেশে ঐ শাস্ত্রের সম্যক চর্চা বা গবেষণার জন্য চেষ্টিত ছিলেন না। দেশের মেধাবী ছাত্র যারা ঐ সব দেশে প্রথম দিকে গেছেন তারা বিজ্ঞান-শিক্ষার দিকে ঝোঁকেন নি। যারা সর্বপ্রথমে বিলাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থে যান তাদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আরও অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য দেশে ফিরে তাহাদের অনেকেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করায় তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের দ্বারা এদেশ উপকৃত হয়নি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞানশিক্ষাদানের সঙ্গে তাঁর অনন্যসাধারণ দেশপ্রেম ও কর্মদক্ষতা বলে ভারতে প্রথম রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠিত করার গৌরব লাভ করেছেন। নব্য রসায়নের ইতিহাসের সঙ্গে যারা পরিচিত তাদের কেহ কেহ ক্ষোভের সঙ্গে বলে থাকেন আচার্য রায়ের মত প্রতিভাবান ব্যক্তি যদি ঐ সময় ইংলণ্ডে না গিয়ে জার্মানির তদানীন্তন দিকপাল রসায়নবিদ কেকুলে, বেয়ার, এমিল ফিশার প্রভৃতি প্রথিতযশা কোনও অধ্যাপকের নিকট শিক্ষালাভ করে আসতেন তবে নব্য রসায়নী বিদ্যা তথা রাসায়নিক শিল্প-ক্ষেত্রে ভারত আজ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারত। কিন্তু আমাদের দেশে বৈদেশিক রাজশক্তির যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল তাতে আচার্য রায় যদি জার্মান রাসায়নিক বিদ্যা আয়ত্ত করেও আসতেন তার দ্বারা তিনি আমাদের শিল্পক্ষেত্রে যে এর চেয়ে বেশী কিছু দিয়ে যেতে পারতেন তা মনে হয় না। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর রাসায়নিক কাঁচা মালের প্রাচুর্য, দেশবাসী ও গভর্ণমেণ্টের অকুণ্ঠ সহযোগিতা প্রভৃতি পাওয়া না গেলে কোনও শিল্প দাঁড় করানো যে কতটা কষ্টসাধ্য তাহা কারখানার কাজে নিযুক্ত থেকে বুঝতে পেরেছি। আজ ত দেশে জৈব-রসায়ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত লোকের অভাব নেই তব্‌ কেন এদেশ রঞ্জন শিল্প বা সিনথেটিক ঔষধপত্রাদি প্রস্তুতি ব্যাপারে এত পিছিয়ে আছে? প্রকৃত অভাব আমাদের শিল্প সম্বন্ধে সবিশেষ ওয়াকিবহাল শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের। বর্তমানে আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প সম্বন্ধে পরিকল্পনা হচ্ছে।

কিন্তু জমি তৈরি না করে উচ্চাঙ্গের কলমের চারা বসানোর মত এই প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়। প্লাষ্টিক সম্বন্ধে বহু গবেষণা হচ্ছে, উচ্চ বেতনে বহু অধ্যাপক নিয়োজিত হচ্ছেন কিন্তু প্লাষ্টিকের গোড়া পত্তনে যে কার্বলিক অ্যাসিড ও ফরম্যালডিহাইড্ অপরিহার্য বস্তু তার উৎপাদনে কোনও চেষ্টাই ত দেখা যাচ্ছে না। অন্যান্য শিল্পের বেলায়ও ঠিক এইরূপ ব্যাপারই ঘটছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই।

অন্যান্য দেশে স্থানীয় কাঁচা মালের সদ্ব্যবহারের উপরেই নির্দিষ্ট কোনো রাসায়নিক শিল্প গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে প্রথমতঃ যে ভাবে এই শিল্পের পত্তন হয় তার মধ্যে সেরূপ ভেবে চিন্তে বা পরিকল্পনা করে—আরম্ভ করার কোনও নজির মেলে না। রাসায়নিক বিজ্ঞানে পারদর্শী ছাত্রদের কাজে লাগানোর এবং তাদের অর্জিত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার দ্বারা দেশের সেবা করাই আচার্য্যদেবের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি প্রথম যে সালফিউরিক অ্যাসিডের প্ল্যাণ্ট বসান, তাতে দৈনিক মাত্র ৫টন অ্যাসিড উৎপন্ন হত। বলা বাহুল্য তার জন্য গন্ধক আসত বিদেশ থেকে—যেমন আজও আসছে। অথচ সেই প্ল্যাণ্টের কাজ বন্ধ করে দেবার জন্য তদানীন্তন সরকার কম চেষ্টা করেন নি। মানিকতলা বোমার জন্য বেঙ্গল কেমিক্যালের অ্যাসিড পাওয়া যায় বলে তারা আচার্য্যদেবের এই প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেন। সালফিউরিক অ্যাসিড যে কেবল নানাবিধ ঔষধ, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতিরই অপরিহার্য উপাদান তা নয়—পরন্তু সালফেট ও ফসফেট শ্রেণীর ভূমির সার তৈরিতেও এই অ্যাসিড না হলে চলেনা। আমাদের দেশে মাথাপিছু এই অ্যাসিড উৎপন্ন হয় মাত্র ৬ আউন্স, পক্ষান্তরে ইংলণ্ডে ৪০ পাউণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ঐ অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ১৫০ পাউণ্ড। সুতরাং ঐ সব দেশ যে শিল্পক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে কতদূর অগ্রসর তা সহজেই বোঝা যায়। খাদ্যশস্যের ফলনও ঐ সব দেশে অত্যন্ত বেশী। আমরা আমেরিকার কাছ থেকে কেন খাদ্যশস্য আনি তারও হদিস পাওয়া যায়—এই সামান্য ব্যাপারেই।

প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য রায় যে মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এই শিল্পের পত্তন করেন পরবর্তীকালে যুদ্ধের হিড়িকে বা শান্তির সময় যে সব কারখানা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল বলে মনে হয় না। আপাতঃ লাভই এদের অধিকাংশের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাই যুদ্ধসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই এদের অধিকাংশেরই অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে—অথবা অপকার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। এখন দিন এসেছে সরকারের জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থায়ীভাবে দেশের কল্যাণকর শিল্প গড়ে তোলার—কিন্তু কথায় বলে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। আজ দেশে পরিকল্পনার অন্ত নেই কিন্তু তার সার্থক রূপদানে যে বিদ্যাবত্তা, যে ধৈর্য ও অধ্যবসায়—যে চরিত্রদার্ঢ্য ও মনোবলের প্রয়োজন দেশে তার শোচনীয় অভাববশতই আজ আমরা এগোতে পারছি না।

রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত অনেককে আজ অনেক সময় বহু অভিযোগ শুনতে হয়। "কই মশায়! দুই দুটি যুদ্ধ চলে গেল কিন্তু আপনারা তেমন এগোতে পারলেন কই? এখনো যে আমাদের বিলিতী ঔষধপত্র না হলে চলে না?" কিন্তু অনেকেরই হয়ত একথা জানা নেই যে কী ভীষণ প্রতিবন্ধক ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হয়েছে—এখনও হচ্ছে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যাবে। দেশে যখন ক্লোরোফরম তৈরির সূত্রপাত হ'ল—তখন বিলিতী ক্লোরোফরমের দাম ছিল চার পাঁচ টাকা পাউণ্ড। সেই দেশী মাল বাজারে বেরুল অমনি তারা এর দর কমিয়ে—এক টাকারও নীচে নামিয়ে দিল। আরও মজার কথা এই যে, যে কাঁচা মাল এই কাজে লাগত তারও দর সঙ্গে সঙ্গে ওরা অসম্ভব বাড়িয়ে দিল। কাজেই দেশে ক্লোরোফরম তৈরি বন্ধ করে দিতে হল। সম্প্রতি অপর একটি অপরিহার্য ঔষধের বেলাতেও ঐরূপ ব্যাপার ঘটছে। কুষ্ঠ রোগে সুপরীক্ষিত ফলপ্রদ সালফোন শ্রেণীর ঔষধ বার মাস আগেও বিলিতী একটি কোম্পানী প্রায় আড়াইশ টাকা কিলোগ্রাম দরে বিক্রী করত। কিন্তু যেই ঐ ঔষধ এদেশে তৈরি হচ্ছে বলে তারা জানল অমনি তারা ঐ ঔষধের দর নামিয়ে দিল ১৭২৲ টাকাতে; সুতরাং দেশী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঐ ঔষধ তৈরি করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে তা সহজেই অনুমেয়। ভারত স্বাধীন হলেও শিল্পক্ষেত্রে আমরা যে কতদূর অসহায় ও

পরপ্রত্যাশী, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন এমন তীব্রভাবে কেউ উপলব্ধি করতে পারছেন কিনা জানি না। এর প্রধান কারণ আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্পের গোড়ার পদার্থগুলি প্রস্তুতের এখনও কোনও ব্যবস্থাই হয়নি বা ব্যবস্থা করার তেমন ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও লক্ষিত হচ্ছেনা। এদিকে হাভানা চুক্তিতে যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে শিল্প-প্রধান দেশগুলির স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টাই প্রবল। শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি উন্নতি লাভ করে নিজেদের অভাব নিজেরা মোচন করুক তা যেন ঐ চুক্তির লক্ষ্য নয়। কারণ অধুনা অনুন্নত দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে শিল্পপ্রধান দেশের রপ্তানির পরিমাণ কমে গিয়ে কিছু লোক বেকার হয়ে পড়বে এই আশঙ্কা তাদের পেয়ে বসেছে। কিন্তু একথাও তাদের ভেবে দেখা উচিৎ যে, অনুন্নত দেশে শিল্পের প্রসার ঘটলে তারা উন্নত দেশের কাছ থেকেই যন্ত্রপাতি এবং শিল্পের কাঁচামাল ক্রয় করবে এবং তাতে করে শিল্পোন্নত দেশগুলির পণ্যের কাটতি ব্যাহত হবার তেমন সঙ্গত কারণ থাকবে না।

আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ মাল চলাচলের নানা অসুবিধার জন্য শিল্পের উন্নতি অনেক স্থলে বাধা পাচ্ছে। আমাদের রেলপথ প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত দুই শ্রেণীর রয়েছে। এক লাইন থেকে অপর লাইনে মাল উঠানো নামানোর সময় ভেঙ্গেচুরে অনেক সময় ক্ষতি হয়—তারপর কুলি খরচাও যায় বেড়ে। আবগারির মালের বেলায় এই অসুবিধা আরও চরমে ওঠে। একেই ত বিভিন্ন প্রদেশে আবগারির শুল্কের হার বিভিন্ন তাছাড়া রেলের ঐরূপ অসুবিধার জন্য পাত্রাদি ভেঙ্গে গিয়ে অ্যালকহল পড়ে গেলেও অনেক সময় শুল্ক দিতে হয় পুরো মালের উপর। আর এই শুল্কের পরিমাণ যে মালের প্রকৃত দামের চেয়ে ৩০।৪০ গুণ বেশী তাও হয়ত অনেকে জানেন না। সুতরাং রেললাইনের সমতার অভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কিরূপ ক্ষতি স্বীকার করতে হয় তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

হতভাগ্য দেশবিভাগ বর্তমানে আমাদের রাসায়নিক শিল্পেরও ঘোর অনিষ্ট করেছে। অনেক মূল্যবান্ উদ্ভিজ্জ কাঁচামাল এফিড্রা, স্যান্টোনিন প্রভৃতির উৎস পাকিস্তানে পড়ায় হিন্দুস্থানের শিল্পপ্রতিষ্ঠান সেগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যন্ত্রপাতিও অনেক অর্থব্যয়ে যা খাড়া করা হয়েছিল সেগুলো অকেজো পড়ে রয়েছে। চায়ের পরিত্যক্ত গুঁড়ো থেকে ক্যাফিন তৈরির ব্যবস্থা অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই করেছিলেন। চা-বাগানগুলো হিন্দুস্থানে পড়লেও ঐ গুঁড়ো আনতে হয় পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে। নানা কারণে সেগুলো আনা সম্ভবপর হচ্ছে না, ফলে ক্যাফিন তৈরি বন্ধ হয়ে আছে, বহু অর্থব্যয়ে বসানো যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরে নষ্ট হচ্ছে, লোক ও অনেক বেকার বসে আছে। এদিকে বর্তমান সরকারের অব্যবস্থার দরুণও কোনও কোনও উদ্ভিজ্জ কাঁচামাল উৎপাদনের ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে। গত যুদ্ধের মধ্যে মংপুতে ইপিকাকের চাষ বেশ ভাল ভাবেই আরম্ভ হয়েছিল। এথেকে মূল্যবান্ ঔষধ এমেটিন তৈরি হত। দুঃখের বিষয় বর্তমান সরকারের ঔদাসীন্য-বশতঃ ঐ চাষ গেছে বন্ধ হয়ে। কুইনিনের চাষ সম্বন্ধেও একথা বলা যায় যে ম্যালেরিয়া-প্রধান এদেশের পক্ষে চাষের প্রসারের যখন বহু প্রয়োজন ছিল, তখন তা না করায় দেশ আজ বৈদেশিক ম্যালেরিয়া প্রতিষেধকে ভরে গিয়েছে।

কর্মী ও কর্মচারীদের প্রতি দরদসম্পন্ন, দূরদৃষ্টি ও দেশকল্যাণ প্রণোদিত সুদক্ষ পরিচালনা অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এক্ষেত্রেও অপরিহার্য। রাসায়নিক শিল্প ক্রমপরিবর্তনশীল—রসায়নশাস্ত্রের নিত্য নব গবেষণা ও উদ্ভাবনার সঙ্গে এর উন্নতি জড়িত, সুতরাং কেমিষ্টদের শিক্ষা দীক্ষা অতি উচ্চাঙ্গের না হলে এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হতে পারে না। জার্মানি প্রভৃতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানদণ্ড অতি উচ্চাঙ্গের ছিল বলেই তাদের শিল্পের এত দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ঐ শিক্ষা ও গবেষণায় জীবনী শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়। "দেশ আমাদের, দেশের গৌরব ও আমাদের ওপর নির্ভর করে" এই আদর্শে যেন তারা অনুপ্রাণিত হয় না। বিজ্ঞান শিক্ষা করে সরকারী চাকুরীর প্রলোভনই বেশী। দেশের অভাব অভিযোগ মেটাবার দৃঢ় মনোভাবের অভাব। তাই আমাদের দেশেই মার্ক, বেয়ার, পার্কিন গড়ে ওঠে না। কাজেই আমাদের শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত রাসায়নিক পাওয়া শক্ত। এর সংস্কার আশু প্রয়োজন। কুলি মজুর নিয়ে কাজ করা অনেক উচ্চশিক্ষিত অগৌরবের

মনে করেন। এদিকে সেদিন পর্যন্ত এমন কি এখনও বৈদেশিক প্রতিযোগিতার প্রাবল্যের দরুণ আমাদের রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এই শিল্পের সম্প্রসারণ করে উপযুক্ত ও লোভনীয় বেতনে কেমিষ্ট নিযুক্ত করতে ভরসা পাননি। অগতির গতি হিসাবে যারা এই শিল্পে যোগদান করেছিলেন তাদের অনেকেই সময়ের সদ্ব্যবহার করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতাবলে এই শিল্পকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এদের অধিকাংশেরই ভিতরে ছিল দেশ সেবার মনোভাব। দেশে সবারই কিছুনা কিছু সংস্থান ছিল, তাই স্বল্প বেতনেও এঁরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রাণমন ঢেলে দিয়ে কাজ করে গেছেন। কিন্তু হতভাগা দেশ বিভাগের ফলে এদের অনেকেরই শেষ আশ্রয় ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ায় ও দ্রব্যমূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় এরা অভাবের পীড়নে মুষড়ে পড়েছেন। কর্তব্য এবং দেশাত্মবোধ ছিল এদের উজ্জ্বল আদর্শ, কিন্তু সে আদর্শ বজায় রাখা আজ এদের পক্ষে হয়ে উঠেছে সুকঠিন। তবে এই আদর্শবাদ তারা ছেড়ে দিলে চলবে না—আজ ভীষণ পরীক্ষার দিনে তারা মেরুদণ্ড খাড়া করে দাঁড়িয়ে পরের ন্যায় অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে কর্তব্য সম্পাদন করে যাবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। বর্তমান সরকারের শ্রমিকস্বার্থ সংরক্ষণী নীতি প্রশংসনীয়। তবে শ্রমিকদের আরও বেতন বৃদ্ধি করলে তাদের কাছে কাজ পাওয়া সুসাধ্য হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার। তদ্ভিন্ন দেশের সর্বাপেক্ষা দরকারী কৃষিকার্যই এতে করে ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা যায়। হাল জাল ফেলে সবাই ছুটবে সহরের কারখানায় চাকুরীর দিকে। এ বিষয়ে শ্রমিক নেতৃগণ ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপরওয়ালাদের বিশেষ করে ভেবে দেখবার দিন এসেছে। বাস্তুহারা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মস্তিষ্কজীবীরা আজ যে শ্রমিকদের চেয়েও দুঃস্থ ও অসহায় হয়ে বিলুপ্তির পথে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে তা কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার করে না। আর এই শ্রেণীর বেঁচে থাকার ওপর যে দেশের শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্পোন্নতি সব কিছুই যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করছে তাও স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এঁদের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করলে অচিরে তাঁরা নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অনেকের ধারণা শিল্পের জাতীয় করণে (nationalization) উন্নতির সূচনা করবে। আমার মনে হয় এই ধারণার মূলে রয়েছে সরকারের নির্লোভ মনোবৃত্তি এবং সুষ্ঠু ফল প্রাপ্তি। আমাদের দেশে ইতিমধ্যে সরকার যে সব বিভাগের পরিচালনার ভার স্বহস্তে নিয়েছেন তাদের ফলাফল লক্ষ্য করলে কি বুঝা যায়। অধিকদূর না গিয়ে সরকারী বেসরকারী কলেজের পরীক্ষার ফলাফল থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। টেলিফোনের ব্যাপার থেকেও অনেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবেন। দেশে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, আপামর সাধারণের কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান আরও সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত হলে কি হয় বলা যায় না। আপাততঃ এ বিষয়ে খুব উৎসাহিত হবার কারণ দেখা যায় না। অবশ্য সরকার অন্য ভাবে দেশের শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের সহায়তা করতে পারেন—করা উচিতও এবং এই দণ্ডেই। জেকোশ্লোভাকিয়ার খবরে দেখিতে পাই—ঐ দেশের ব্যাঙ্কে যাদের অত্যধিক টাকা মজুত পড়েছিল সরকার তা থেকে উপযুক্ত পরিমাণে নিয়ে শিল্পস্থাপনে প্রয়াসী ও কোনও নির্দিষ্ট শিল্পবিষয়ের পারদর্শী এক একটি বোর্ডের হাতে নামমাত্র সুদে ঐ টাকা দিয়ে দিতেন। অবশ্য শিল্পের স্থাপন, উন্নতি করণ, পরিচালনা প্রভৃতির সমস্ত ভার ন্যস্ত থাকত ঐ বেসরকারী বোর্ডের উপর। এতে করে উপযুক্ত লোকের সুদক্ষ পরিচালনায় বহুবিধ শিল্প দ্রুত ঐ দেশে গড়ে উঠতে পেরেছিল। আমাদের দেশেও ঐরূপ নীতি কার্যকরী হবে বলে মনে করি। ফলতঃ কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠা করে তার লাভলোকসানের ভার কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংঘের উপরে ন্যস্ত না করলে ঐ শিল্প পরিচালনার প্রকৃত কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান আসতে পারে না, ফলে ঐ শিল্প কোনও দিনই স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে না। শিল্পের উন্নতি অবনতির উপর কর্মীদের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে। সরাসরি সরকার থেকে বেতনপ্রাপ্ত লোকদ্বারা শিল্পোন্নতি সম্ভব বলে মনে হয় না। সমাজ ও জাতীয় জীবনে রাসায়নিক শিল্পের স্থান সকলের উপরে। তাই দেশের সকলেরই এই শিল্পের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হওয়া সর্বাগ্রে দরকার। যারা সাক্ষাৎভাবে এর সঙ্গে জড়িত কেবল তাদের সাহায্যেই এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর নয়। একমাত্র জাতীয়তা-বোধের তীব্র পুনরভ্যুত্থান দ্বারাই এই জাতীয় শিল্প গড়ে উঠবে ও বিকাশলাভ করবে বলে আমার বদ্ধমূল ধারণা।

সন ১৩৫৮ সাল

জ্যোতি বাচস্পতি

১৩৫৭ সালের ৭ই চৈত্র, ইং ২১শে মার্চ ১৯৫১, ভারতীয় ষ্টাণ্ডার্ড বেলা ৩টা ৫৬ মিঃ সময়ে রবি বিষুব রেখার উপর আসবেন। সেই সময়কার গ্রহসংস্থান এক বছরের মত পৃথিবীর উপর প্রভাব স্থাপন করবে। সে সময়কার গ্রহসংস্থান এই রকম—
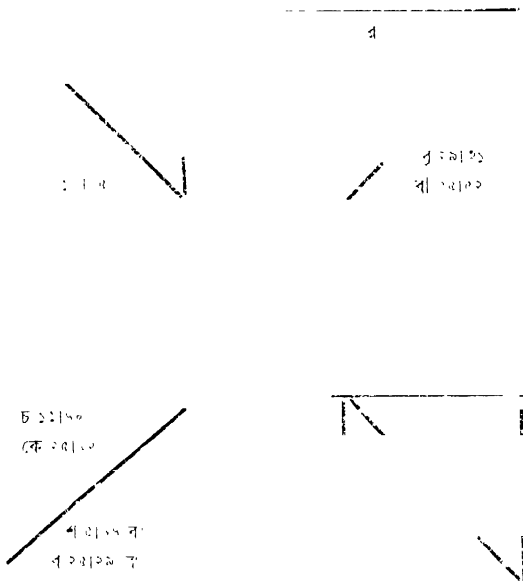
এই সংক্রমণের একটা গুরুত্ব আছে এবং সেটা সাধারণকে বোঝাবার জন্যই প্রাচীন মনীষীরা এই সংক্রমণের নাম দিয়েছিলেন মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং এই দিনটিকে কতকগুলি কৃত্য ও উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের বাংলা দেশে প্রচলিত পাঁজিগুলিতে যে ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি ব'লে লেখা হয় তা একেবারে ভুল। ঐ দিন বাস্তবিক মেষ সংক্রান্তি। জ্যোতিষের মতে বাস্তব গণনায় মহাবিষুব সংক্রান্তির যে গুরুত্ব আছে, মেষ সংক্রান্তির সে গুরুত্ব নেই। মহাবিষুব সংক্রান্তির সময়ে যে গ্রহসংস্থান, তা থেকে বোঝা যায় গ্রহগুলির প্রভাবে সে বৎসর পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজ কী ভাবে প্রভাবিত হবে।

এ বৎসরের রাশিচক্রটি লক্ষ্য করলে প্রথমেই নজরে পড়ে, রবি মীন রাশিতে থেকে মঙ্গল ও বুধ যুক্ত এবং শনি দৃষ্ট। কোন শুভ গ্রহের দৃষ্টি তার ওপর নেই। কোন গ্রহের শুভ প্রেক্ষাও সে পাচ্ছে না। বরং শনি, প্রজাপতি ও রুদ্রের অশুভ প্রেক্ষায় সে পীড়িত। রবির ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা শনির সঙ্গে। তা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে সে রুদ্রের অশুভ প্রেক্ষায় সংযুক্ত হচ্ছে। এর ফলে এ বছরও পৃথিবীকে অনেক দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। পৃথিবীর সর্বত্রই শাসন-কর্তৃপক্ষের এটা একটা বিশেষ দুর্বৎসর। অধিকাংশ দেশেই জনসাধারণের সঙ্গে শাসন কর্তৃপক্ষের কোন সহযোগিতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রজা সাধারণের বিরোধ উপস্থিত হবে। কর্তাদের মধ্যে একনায়কত্ব সুলভ মনোভাব প্রকট হবে। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ আইন বা অর্ডিন্যান্স ক'রে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করার চেষ্টা হবে, যার ফলে সর্বত্র অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। যাঁরা সমাজের বা রাষ্ট্রের মাথা। উপরে আছেন তাঁদের পক্ষে বছরটি মোটেও ভাল না। তাদের নানারকম ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে—এমন সব সঙ্কটের সম্মুখীন হ'তে হবে যার সমাধান করা তাদের পক্ষে সহজ হবে না। তাদের প্রতিপত্তি প্রবল হ'য়ে উঠবে না। কোন কোন দেশে প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের পতনও অসম্ভব নয়। প্রজাসাধারণের সঙ্গে প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ বিশেষ সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে না। প্রজা সাধারণের সহানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী বা সংস্কারকামীদের দিকে প্রসারিত হবে। অধিকাংশ দেশে প্রজা সাধারণ চাইবে শান্তি, কিন্তু কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালে তাদের শান্তির বাসনা ব্যাহত হবে। একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা ও হতাশা পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবে।

মোটকথা এ বৎসরটি পৃথিবীর পক্ষে একটি সঙ্কটপূর্ণ বৎসর। এই বৎসর শাসন কর্তৃপক্ষের আচরণ যদি সংযত না হয় তাহ'লে পৃথিবীর মানুষের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।

ইংলণ্ডের পক্ষে এ বৎসরটি খুব ভাল নয়। তাকে নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে। আর্থিক ব্যাপারে গেল বছরের চেয়ে কতকটা ভাল হলেও, তার বৈদেশিক ব্যাপার নিয়ে নানারকম ঝঞ্ঝাট যাবে। কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ বিরোধ, এমন কি যুদ্ধের সম্ভাবনা উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নয়। এ ব্যাপারে অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সহযোগিতা হ'তে পারে বটে, কিন্তু সে সহযোগিতার মধ্যে অবাঞ্ছনীয় অনেক কিছু থাকবে। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা না থাকলেও, বাইরের চাপে তাকে বিপদে লিপ্ত হ'তে হবে এবং তাতে ক'রে তার অযথা অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় হবে। সমর সজ্জার জন্য এ বৎসর তার অযথা বহু ব্যয় জনসাধারণ প্রীতির চক্ষে দেখবে না। ইংলণ্ডের সরকারকে নানারকম ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হ'তে হবে। জনসাধারণ নানারকম সংস্কারের দাবী করবে। তার মন্ত্রীসভার পতন হওয়াও অসম্ভব নয়। শাসকমণ্ডলের উপরওয়ালাদের মধ্যে অনেক দুর্দৈব ঘটতে পারে। কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়। কৃষি ও উৎপাদনের ব্যাপার নানারকমে ব্যাহত হবে। তা ছাড়া খনি প্রভৃতিতে দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক

উৎপাত ও অন্যরকম উপায়ে গৃহ-ভূমির ক্ষতির আশঙ্কা আছে! ইংলণ্ডে সমাজতান্ত্রিক প্রচার কার্য খুব বৃদ্ধি পাবে এবং তা জনসাধারণের সমর্থন লাভ করবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে এ বৎসর অনেক সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। তার যুগ্ম ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে বুধ ও বরুণ। সুতরাং তার আর্থিক ব্যবস্থায় নানারকম বিপর্যয় উপস্থিত হবে। নানারকম বিচিত্র ব্যাপারে তার বহু অর্থের অপচয় হবে এবং যদিও রাজস্বের ব্যাপারে তার বিশেষ ক্ষতি হবে না, তবুও তাকে প্রচুর ব্যয় করতে হবে এবং নানারকম গুপ্ত ব্যাপারে সাধারণের অর্থের অপব্যয় ও অপচয় হবে। বিশেষ করে যে মঙ্গল যুক্ত হওয়াতে সামরিক ব্যাপারে অসম্ভব রকম বেশী খরচ হবে আর সেইজন্য তাকে সাধারণের উপর করভার বৃদ্ধি করতে হবে এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক, ষ্টক এক্সচেঞ্জ এবং সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা গণ্ডগোল ও বিপদ নিয়ে আসবে। তার ব্যবসায় জগতে বিশেষ গণ্ডগোল হ'তে পারে। তা ছাড়া এ বছর তার মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে। নানারকমে লোকক্ষয় হবে। বাইরের দিকে তার যথেষ্ট সামরিকতা ও আড়ম্বর প্রকাশ পাবে এবং অনেক কুপরিকল্পিত নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে সে নিজেই নিজের ক্ষতির কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে। তার সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। কোন রকম মানসিক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটতে পারে। তা ছাড়া নানারকম দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক উৎপাতেও অনেক লোকক্ষয় হবে। কোন প্রবল ও প্রতিষ্ঠাশালী শত্রুর জন্য তার বিশেষ চিন্তা উপস্থিত হবে এবং সেজন্য তাকে নানারকমে ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে। তার শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা একনায়কত্ব-সূচক মনোভাব প্রকট হবে এবং স্বাধীন মত প্রকাশের বিরুদ্ধে নানারকম আইন কানুনেরও সৃষ্টি হবে। প্রজা সাধারণের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও আশঙ্কার ভাব প্রবল হবে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের হৃদয়ের যোগ লক্ষিত হবে না।

রুশিয়ারও ভাগ্যনিয়ন্তা হ'য়েছে বুধ, কিন্তু তার দশমে শুক্র সুপ্রেক্ষিত হ'য়ে আছে এবং লগ্নস্থ রবি মোটের উপর সুপ্রেক্ষিত। সুতরাং বৈদেশিক ব্যাপার ও বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তার নানারকম ঝঞ্ঝাট ও অশান্তি উপস্থিত হবে এবং প্রতিষ্ঠাশালী শত্রুর দ্বারা তার আর্থিক ক্ষতির চেষ্টা হবে বটে, কিন্তু সে গেল বছরের মতই অনেকটা নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকবে এবং তার প্রকৃত মনোভাব অনুমান করা বাইরের লোকের পক্ষে কঠিন হবে। তার প্রজাসাধারণের অবস্থা অন্য সব দেশের চেয়ে ঢের স্বচ্ছল হবে এবং শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের সহযোগিতা ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। কিন্তু তথাপি বিদেশের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ হবে না এবং শক্তিশালী শত্রুর দ্বারা অর্থ-নৈতিক অবরোধের আশঙ্কা আছে। এ বৎসর তার অকস্মাৎ ব্যয় বৃদ্ধি হবে। অনেক সময় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জন্য তাকে অকস্মাৎ বহু ব্যয় করতে হবে। তার বিরুদ্ধে বিদেশে নানারকম অপবাদ প্রচার হবে এবং অনেক ব্যাপারে তার কার্যকলাপের সমালোচনা হবে। কিন্তু তথাপি তার উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং জনসাধারণ যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে।

চীন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে চন্দ্র। চন্দ্র লগ্নস্থ প্রজাপতির দ্বারা ঘনিষ্ঠভাবে সুপ্রেক্ষিত হওয়ায় সাধারণের মধ্যে গঠনমূলক সংস্কারের দিকে খুব ঝোঁক হবে বটে, কিন্তু নানা কারণে তা কম বেশী বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেখানে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে এবং বাইরেও যুদ্ধের প্রবল সম্ভাবনা উপস্থিত হবে, যার জন্য তার উৎপাদন ও দেশের গঠনমূলক কাজ কম বেশী ব্যাহত হবে। এই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হ'তে পারে। তা ছাড়া কোনরকম প্রাকৃতিক বিপ্লব, দুর্ঘটনা ইত্যাদিতে বহু লোকক্ষয়ের আশঙ্কাও আছে। তার প্রজাসাধারণকে এ বৎসরও নানারকম অভাব অনটনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। কিন্তু তথাপি তাদের মধ্যে একটা আশাবাদী মনোভাব প্রকট হবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জন্য এ বৎসর তার নানারকম চিন্তা ও উদ্বেগ হবে কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র তার কাছে উপকৃতও হবে। এ বৎসর তার শিল্প বিস্তার, যাতায়াত, পথের উন্নতি সাধন ইত্যাদিতে বহু ব্যয় হবে কিন্তু নানারকম ঝঞ্ঝাটের জন্য এই সকল উন্নতিমূলক কাজ কম বেশী ব্যাহত হবে। এ বৎসরও তার সুস্থির থাকার সম্ভাবনা নেই। তার প্রেসিডেন্ট এবং সরকারের পক্ষে বৎসরটি খুব শুভ নয়। ভূমিজীবি ও কৃষকদের দ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে কোনরকম আন্দোলন হওয়ারও আশঙ্কা আছে। কিন্তু ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ সুপ্রেক্ষিত হওয়ায় যে ঝঞ্ঝাটগুলি অতিক্রান্ত হ'য়ে যাবে বলেই মনে হয়।

এ সকল দেশ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা যায় কিন্তু তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এখন, এ বৎসর ভারতের অবস্থা কী হবে দেখা যাক।

ভারতের এ বৎসর লগ্ন হয়েছে সিংহ, তার যুগ্ম ভাগ্যনিয়ন্তা হয়েছে বৃহস্পতি ও রবি। বৃহস্পতি সপ্তমে থেকে রাহুযুক্ত ও চন্দ্র দৃষ্ট এবং তা শনি। শত্রু প্রেক্ষায় পীড়িত। বুধ অষ্টমে নীচস্থ অস্তগত, প্রজাপতির দ্বারা কুপ্রেক্ষিত মঙ্গলযুক্ত এবং শনি ও বরুণ দৃষ্ট।

সপ্তম থেকে সাধারণতঃ বিচার করা হয় স্বদেশ ও স্বজাতি ছাড়া অপর সকল দেশ ও জাতি এবং তাদের সঙ্গে সহযোগ ও শত্রুতা, আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। অষ্টম থেকে বিচার করা হয় জাতির ঋণ, আন্তর্জাতিক বিনিময় বা বাণিজ্যে লাভ লোকসান, দেশের মৃত্যুর হার কূটনৈতিক গুপ্তমন্ত্রণা ইত্যাদি। সুতরাং এ বছর এই সকল ব্যাপারগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

বৃহস্পতি সপ্তমে থাকায় বোঝা যাচ্ছে যে বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ভারতের একটা শান্তি ও সৌহার্দ্যমূলক মনোভাব প্রকট হবে বটে কিন্তু বৃহস্পতি অস্তগত হ'য়ে রাহু যুক্ত হওয়ায় এবং শনির দ্বারা কুপ্রেক্ষিত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যাহত হবে এবং বিদেশে তার বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার ও বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে পারে। ভারত সব দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক এবং অর্থ নৈতিক চুক্তি করতে চাইবে কিন্তু তা সব সময় কাজে পরিণত হবে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে এবং অনেক সময় কোন বিদেশী শক্তির চাপে পড়ে এমন সব চুক্তি করতে হবে যা তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। বৃহস্পতি রাহু যুক্ত হওয়ায় এ বিষয়ে নানারকম গণ্ডগোল উপস্থিত হবে এবং বৈদে-

শিক ব্যাপারে সরকারের নীতি অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হওয়ারও বিশেষ আশঙ্কা আছে, তার মধ্যে স্থিরতা পাওয়া কঠিন হবে। বৈদেশিক ব্যাপারে তার এক সময়ের নীতি অপর সময়ে সহসা ও বিচিত্র ভাবে পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের সঙ্গে আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিনিধি বিনিময় হবে বটে, কিন্তু আসল কাজের বেলায় হবে পর্বতের মূষিক প্রসব। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও নানারকম গণ্ডগোল উপস্থিত হবে। শ্রেণী বিরোধ, প্রদেশে প্রদেশে সহযোগিতার অভাব প্রভৃতির জন্য একটা বিশৃঙ্খলা দেখা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক বিনিময় ও ঋণের ব্যাপারে তাকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে।

এ বৎসর ভারতের লগ্নে আছে চন্দ্র ও কেতু এবং লগ্নপতি রবি অষ্টমে থেকে বুধ ও মঙ্গল যুক্ত এবং শনির ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত। চন্দ্র নিজে দ্বাদশপতি কিন্তু তার উপর বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি এবং প্রজাপতির ঘনিষ্ঠ শুভ প্রেক্ষা আছে। নবমস্থ শুক্রের দ্বারাও সে সুপ্রেক্ষিত হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়স্থ বরুণের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ অশুভ প্রেক্ষা। এতে এইটুকু বোঝা যায় যে, ভারতের জনগণ নানা রকম দুর্দশা ভোগ করবে এবং বহুব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে বটে, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে একটা রাষ্ট্রীয় চেতনা অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত ভাবে জেগে উঠবে। অবশ্য চন্দ্র কেতু যুক্ত হওয়ায় জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশে নানা রকম বিঘ্ন ঘটবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা তা চেপে রাখার যথেষ্ট চেষ্টা হবে। কিন্তু সে বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও একটা সুসংহত জনমত গ'ড়ে উঠবে। অবশ্য, লগ্নপতি অষ্টমে থেকে ষষ্ঠপতির দ্বারা পীড়িত হওয়ায় দেশে অভাব অনটনে বহু প্রাণক্ষয় হবে। অনশন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হবে। এ সকল দুর্দৈব সত্ত্বেও কিন্তু জনসাধারণ এ বৎসর একজন শক্তিশালী নেতার সমর্থন ও সহযোগিতা পাবে কিম্বা হয়তো জনসাধারণের মধ্য থেকেই একজন শক্তিশালী নেতা বা নেত্রীর আবির্ভাব ঘটবে। একজন জনপ্রিয় নতুন নেতা বা নেত্রীর আবির্ভাব এ বৎসর খুবই সম্ভব। অন্ততঃ, নেতৃত্বের ব্যাপারে সহসা একটা বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটবে।

দ্বিতীয়ে শনি ও বরুণ দুটি গ্রহই বক্রী হ'য়ে থাকায় এবং দ্বিতীয়পতি বুধ অষ্টমে নীচস্থ অস্তগত ও পাপযুক্ত হওয়ায়, আর্থিক ব্যাপারে ভারতের পক্ষে এটা একটা মহা দুর্বৎসর। শনি দ্বিতীয়ে থেকে রবি, প্রজাপতি ও বৃহস্পতির দ্বারা কুপ্রেক্ষিত হওয়ায় আর্থিক ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নীতি সুপ্রযুক্ত হবে না। আর্থিক ব্যাপারে এমন কতকগুলি বিধি-বিধান প্রবর্তিত হ'তে পারে, যাতে জনসাধারণের উপকারের চেয়ে কায়েমী স্বার্থরক্ষার দিকেই লক্ষ্য থাকবে বেশী—ব্যক্তিগত লাভের জন্য সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য, সাধারণ শ্রমশিল্প এবং জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষা করা হবে এবং গভর্ণমেণ্টের দ্বারা এমন সকল কর স্থাপিত হবে যা মোটেই জনপ্রিয় হবে না। নানাদিকে অযথা অর্থের অপচয় ঘটবে এবং নানাদিকে রাজস্বের ঘাটতি দেখা যাবে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের মোটেই কোন সহযোগিতা থাকবে না এবং সরকারের দ্বারা এমন সকল আইন বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা হ'তে পারে যা জাতীয় সংস্কৃতি, শিক্ষা ও আর্থিক সমৃদ্ধির পরিপন্থী। আর্থিক ব্যাপারে নানা রকম দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই সকল ব্যাপারের সঙ্গে সরকারের কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরও সংশ্রব থাকতে পারে, যা নিয়ে পার্লামেণ্টে অশোভন তর্ক—বিতর্কের সৃষ্টি হ'তে পারে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এ বছরও চোরা কারবার পুরোদমে চলবে এবং তার জন্য জনসাধারণকে অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করতে হবে। বিশেষতঃ খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ, তেল, ঘি ইত্যাদি স্নেহ দ্রব্য এবং সাধারণের একান্ত আবশ্যক নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হবে। দেশে এ সকল বস্তুর অভাব না থাকলেও, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের গুপ্ত ষড়যন্ত্রে এবং গোপন মজুদের জন্য কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হবে। সরকারকেও এই সকল পুঁজিপতিদের ষড়যন্ত্রে নানা রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে এবং তার প্রতিকার করতে অক্ষম হওয়ার জন্য সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস হবে। মোট কথা আর্থিক ব্যাপারে সরকারকে নানা রকমে বিব্রত হ'তে হবে। মুদ্রাস্ফীতি আরো বেড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

সপ্তমে অস্তগত বৃহস্পতি রাহু যুক্ত হ'য়ে আছে, এতে বোঝা যায় যে, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিময়, লেন-দেন ইত্যাদির ব্যাপারে যে সকল চুক্তি হবে অনেক সময় রাষ্ট্রনৈতিক বা আইন ঘটিত কারণে তাতে বাধা-বিঘ্ন ঘটবে। অনেক সময় বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার সম্ভাবনা আছে এবং অনেক সময় অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে লেন-দেনের ব্যাপারে ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে। বৈদেশিক ব্যাপারে অনেক সময় বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এবং সরকারের কোন দৃঢ় নীতির পরিচয় পাওয়া যাবে না। অনেক সময় অদ্ভুত ভাবে তার নীতি পরিবর্তিত হবে। সপ্তমে রাহু থাকায় বিদেশে তার বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যা অপবাদ প্রচার হ'তে পারে এবং কোন রকম ষড়যন্ত্র হওয়াও বিচিত্র নয়। সরকারকে এ বৎসর অর্থাভাবের জন্য ঋণ গ্রহণ করতে হবে কিন্তু ঋণের সর্ত অনেকক্ষেত্রে তার পক্ষে ক্ষতিজনক হবে। অবশ্য বৃহস্পতি ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় সরকারী মহলে একটা আশাবাদী মনোভাবই অভিব্যক্ত হবে এবং বৈদেশিক সকল ব্যাপার একটু বিকৃত ক'রে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হবে। অর্থাৎ ক্ষতিকর ব্যাপারকেও লাভজনক বলে উল্লেখ করা হবে।

অষ্টমে রবি, বুধ ও মঙ্গল এই যোগটি ভারতবর্ষের পক্ষে এ বৎসরের একটি মহা দুর্যোগ। অষ্টমে রবির সঙ্গে কোন শুভগ্রহের যোগ-দৃষ্টি নেই। তার প্রথম বিয়োগী প্রেক্ষা বক্রী শনির সঙ্গে অপোজিশন এবং প্রথম সংযোগী প্রেক্ষা রুদ্রের সঙ্গে সেক্সোয়ার। অষ্টমস্থ বুধেরও কোন শুভ প্রেক্ষা নেই। তা প্রজাপতির অশুভ প্রেক্ষা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে অতি শত্রু মঙ্গলের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে। একমাত্র অষ্টমস্থ মঙ্গলের সঙ্গে দ্বাদশস্থ রুদ্রের একটি শুভ প্রেক্ষা আছে। লগ্নপতি রবি অষ্টমে থেকে এই রকম পাপ পীড়িত হওয়ার যা ফল, তা ভাবলেও হৃৎকম্প হয়। ১৩৫০ সালে ভারতের যে রাশিচক্র হয়েছিল তাতেও লগ্ন হয়েছিল সিংহ এবং লগ্নপতি রবি অষ্টমে থেকে দ্বিতীয়স্থ বরুণ ও চন্দ্রের অশুভ প্রেক্ষায় পীড়িত হয়েছিল, কিন্তু তার দু'একটা শুভ প্রেক্ষাও ছিল। এবারে

গাও নেই। এ বৎসর কত রকমে যে লোকক্ষয় হবে এবং কত বেশী লোকক্ষয় হবে, তা ধারণা করা যায় না। কর্তৃপক্ষ বড় গলায় প্রচার করছেন বটে যে, খাদ্যাভাবে তাঁরা একজনকেও মরতে দেবেন না। কিন্তু ভারতের যা রাশিচক্র হয়েছে, তাতে খাদ্যাভাবে যে বহু ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৃত্যু বরণ করতে হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শিশুমৃত্যুর হার এ বছর বিশেষ ক'রে বেড়ে যাবে এবং অখাদ্য বা অনভ্যস্ত খাদ্য গ্রহণ ক'রেও বহু ব্যক্তির মৃত্যু হবে। তা ছাড়া যানবাহনের দুর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক উৎপাতও বহু মৃত্যুর কারণ হবে। কোন রকম অদ্ভুত ব্যাধিরও প্রাদুর্ভাব হবার আশঙ্কা আছে এবং তাতেও বহু মৃত্যু হবে। কোন সংক্রামক রোগে এবং দুর্ঘটনায় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বহু লোকক্ষয়ের আশঙ্কাও আছে। মোটকথা এ বৎসর ভারতে যম রাজের রাজত্ব চলবে এবং এই মরণ-যজ্ঞে দু'চারজন প্রতিষ্ঠাশালী বা প্রতিষ্ঠানীয় ব্যক্তিকেও আহুতি দিতে হবে। রাষ্ট্রগণনায় অষ্টম থেকে শুধু মৃত্যুই বিচার করা হয় না, তা থেকে রাষ্ট্রের আর্থিক সঞ্চয়, ঋণ, রাজস্ব, বাজেট ইত্যাদিরও বিচার করতে হয়। সেখানে রবি থাকায় শাসন কর্তৃপক্ষকে নানা রকম বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হবে—এমন কি শাসন সংশ্লিষ্ট কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির উপর গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা অপরাধমূলক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'তে পারে, যা বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। অষ্টমে মঙ্গল থাকার শান্তিরক্ষা ও সামরিক ব্যাপারে অকস্মাৎ ব্যয় বৃদ্ধি হবে। তা ছাড়া রাজস্ব, বাজেট ইত্যাদির ব্যাপার নিয়ে পার্লামেন্টে বহু বিতণ্ডা উপস্থিত হবে এবং দলের মধ্যে ভাঙন ধরার বিশেষ আশঙ্কা আছে। নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে নানা রকম বাক্-বিতণ্ডা হবে এবং বাইরেও নির্বাচনের ব্যাপারে কোন রকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া অসম্ভব নয়। এ বৎসরও সরকার পক্ষ নির্বাচন পেছিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু তা নিয়ে তাঁদের বহু বিরোধিতার সম্মুখীন হ'তে হবে। বর্তমান সরকারের পক্ষে এ বৎসরটি অত্যন্ত দুর্বৎসর। একদিক দিয়ে কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি, অবহেলা, অনভিজ্ঞতা ইত্যাদির জন্য সরকারকে যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হবে, তেমনি জনসাধারণ নানারকমে নিপীড়িত হ'য়ে সরকারের উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে। অন্ততঃ এ বৎসর বর্তমান সরকারের একটি প্রবল প্রতিপক্ষের উদ্ভব হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

শুক্র আছে নবমে। নবমস্থ শুক্র সুপ্রেক্ষিত হওয়ায় নির্মাণমূলক কাজে অযথা ব্যয় বৃদ্ধি হবে। যে সকল পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়েছে তাতে তাদের অতিরিক্ত ব্যয় তো হবেই, আরো নতুন নতুন পরিকল্পনারও সৃষ্টি হবে। নদীতে বাঁধ নির্মাণ, যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ, রেলের লাইন নির্মাণ ইত্যাদিতে বহু ব্যয় হবে কিন্তু শুক্রের উপর রাহুর কুপ্রেক্ষা থাকায় এ সব ব্যাপারে কম বেশী অপব্যয় ও অপচয়ও হবে। তথাপি মোটের উপর এই সকল কাজে কতকটা সাফল্য আসবে। এ বৎসরের গ্রহচক্রে ভারতের পক্ষে এই একটী মাত্র গ্রহ শুভ আছে। এই যোগে সরকারের আয় বৃদ্ধি হবে এবং যাতায়াতের ব্যাপারে সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বাড়বে। জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ ইত্যাদিতেও কার্যকারিতা প্রকট হবে।

একাদশে প্রজাপতি—শনি, মঙ্গল ও রাহু দৃষ্ট হ'য়ে থাকায় পার্লামেন্ট, প্রাদেশিক পরিষদ, নির্বাচন ইত্যাদির সংশ্রবে নানারকম বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। এই সংশ্রবে সহসা ও অপ্রত্যাশিতভাবে এমন সকল ঘটনা ঘটবে যাতে সরকার পক্ষকে বিশেষ নাজেহাল হ'তে হবে। পার্লামেন্টে ও পরিষদে সরকারী দলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও মনোমালিন্য হওয়া সম্ভব এবং তাতে ক'রে কোন রকম কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হওয়াও অসম্ভব নয়। সরকারকে অনেক নিন্দাসূচক সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হবে এবং মন্ত্রীদের কার্যকলাপ নিয়ে পার্লামেন্টে ও পরিষদে বহু বাক্ বিতণ্ডার সৃষ্টি হবে। অনেক স্থলে বাক্-বিতণ্ডা, শালীনতা ও শোভনতার সীমা অতিক্রম ক'রে যাবে। বিশেষ ক'রে আর্থিক ব্যাপার এবং নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে মধ্যে মধ্যে তুমুল বিতণ্ডার উদ্ভব হবে। সরকার পক্ষ থেকে এমন সকল আইন বিধিবদ্ধ হ'তে পারে যা স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা উৎপন্ন করবে। কোন কোন স্থলে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হবে এবং সংবাদপত্র, পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির উপর কঠোর বাধা নিষেধ প্রযুক্ত হ'তে পারে। শিক্ষার ব্যাপারে কতকগুলি সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে বটে, কিন্তু তা হবে খাপছাড়া ধরণের এবং দেশের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য থাকবে না। এবার কিন্তু জনসাধারণের পক্ষ নিয়ে একজন শক্তিশালী নেতার বা নেত্রীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তাঁর সঙ্গে সরকার পক্ষের প্রবল বিরোধিতা উপস্থিত হবে। প্রচলিত সরকারের পক্ষে বৎসরটি বিশেষ দুর্বৎসর। জনসাধারণের মধ্যে যেমন, পার্লামেন্ট, পরিষদের মধ্যেও তেমনি তাকে প্রকাশ্য বিরোধিতার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। নির্বাচনের ব্যাপারেও এ বৎসর নানারকম অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। হয় নির্বাচন স্থগিত হবে, না হয় নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে নানারকম গণ্ডগোল এমন কি দাঙ্গা-হাঙ্গামাও অনুষ্ঠিত হ'তে পারে।

দ্বাদশে বক্রী রাহু থাকায় এ বছরও দেশে দুর্নীতির প্রবাহ পুরোদমেই চলবে এবং প্রকাশ্যে সে সম্বন্ধে যতই আন্দোলন আলোচনা হোক্ এবং তার বিরুদ্ধে যতই আইন কানুন বিধিবদ্ধ হোক্, দুর্নীতি ও চোরা-কারবার রোধ করা সম্ভব হবে না। কেননা, তার পেছনে থাকবে শক্তিশালী সমর্থন। বাস্তুহারা ও বেকারদের সংশ্রবে এ বৎসরও নানারকম অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটবে এবং প্রকৃত সমস্যার কোন সুষ্ঠু সমাধান হওয়া সম্ভব হবে না। দেশে অপরাধের সংখ্যা অসম্ভব রকম বেড়ে যাবে এবং সকল স্থানে অপরাধ মূলক কার্য-কলাপ বৃদ্ধি পাবে। দেশে স্থানে স্থানে অপরাধ-মূলক কার্যকলাপের জন্য গুপ্ত সংঘ গ'ড়ে উঠতে পারে এবং তার জন্য সরকারকে যথেষ্ট বিব্রতও হ'তে হবে।

উপরে যা লেখা হয়েছে তা থেকে এ বোঝা শক্ত নয় যে ১৩৫৮ সাল ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ দুর্বৎসর। তার স্বাস্থ্য, অর্থ, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা কোনটার সম্বন্ধেই বিশেষ কিছু শুভ নেই। সকল দিক দিয়েই জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করবে। কিন্তু এরই মধ্যে আশার একটুখানি ক্ষীণ আলোর রেখা আছে এই যে, অষ্টমস্থ রবি, মঙ্গল ও দ্বিতীয়স্থ শনি রাজযোগ করেছে এবং দ্বাদশপতি চন্দ্র লগ্নে থেকে একাদশের প্রজাপতি ও নবমের শুক্রের শুভপ্রেক্ষায় অনুগৃহীত হচ্ছে। এর মানে, এই অবর্ণনীয় দুর্দশার আঘাতে ভারতের জনসাধারণের নিশ্চল জড় দেহে একটা জাগৃতির আভাষ দেখা যাবে এবং জনসাধারণের মধ্যে একজন শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব ঘটবে।

দুঃস্বপ্ন

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বলিলে আপনাদের হয়ত প্রত্যয় হইবে না,—মাঝে মাঝে অদ্ভুত রকমের স্বপ্ন দেখাটা আমার একটা রোগ। সে সমস্ত স্বপ্ন এত অদ্ভুত যে দেখাইতে পারিলে আপনারা তাহা টিকিট করিয়া দেখিতেও প্রস্তুত হইতেন। একটা নমুনা দিলে আপনারা হয়ত বুঝিবেন—

অনেকদিন আগের কথা, তখন হিটলারের দাপটে সমস্ত ইউরোপ কম্পমান—যুদ্ধটা স্থগিত রাখিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে কিন্তু হিটলার হিটলারী হুঙ্কার দিতেছেন। এক-দিন রাত্রে আমি স্বয়ং সেই হিটলারকে স্বপ্ন দেখিলাম। বার্লিনে গিয়াছি—অথচ মেছুয়াবাজারের গলির মাঝে যেমন সব গলি অমনি একটা গলিতে, একটা ভাঙ্গা অপরিচ্ছন্ন মেস বাড়ীর মত বাড়ী, তাহারই সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ডাকি-তেছি—অ-হিটলার—হিটলার—

আমরা যেমন বন্ধুর বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া ডাকি—ও বিষ্টু ও কেষ্ট, ব্যাপারটা তেমনি। একটি তরুণী মেম-সাহেব আসিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেল। মেম সাহেব বলিল,—আসুন, সিঁড়িটা ভাঙ্গা আছে—

উপরের একটা ঘরে ঢুকিতেই দেখি হিটলার গোঁফ্ বাগাইয়া বসিয়া আছেন। স্পষ্ট বাংলায় বলিলেন,—বসুন, —আপনি বাঙালী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—বসুন,—একটু চা খাবেন ত?—ওরে গদা—

কিছুক্ষণ বাদে মুড়ি বেগুনী ও চা আসিল। চা পান করিতে করিতে আলাপ চলিল। কি আলাপ হইল সে কথা আজ বলিয়া লাভ নাই,—সে হিটলারও নাই, সে ভারতবর্ষও নাই। অতএব সে কথা থাক্—

স্বপ্ন তত্ত্বের পুস্তকাদি পড়িয়া কোন কুলকিনারা পাই নাই,—এইটুকু শুধু বুঝিয়াছি যে মুড়ী বেগুনী খাওয়া স্বভাব বলিয়া নিজেও খাইয়াছি, প্রবল প্রতাপ হিটলারকেও খাওয়াইয়াছি। তবে এই নমুনাটা দেখিয়া আপনারা ধরণটা কিছু বুঝিতে পারিবেন বোধ হয়।

সম্প্রতি একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি—আপনারা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন আর আমি দেখিয়া ত অত্যাশ্চর্য্য হইয়াছিই —সন্দেহ নাই। তবে হিটলারের সঙ্গে মুড়ি বেগুনীর মত আজগুবি থাকাটা অবশ্যম্ভাবী কারণ এটা স্বপ্ন এবং ঘুমাইয়াই দেখা। জাগিয়া দেখিলে হয়ত অন্যরূপ হইতে পারিত।

ফুটবল খেলা—

কিন্তু সাংঘাতিক রকমের। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় সমাগমে খেলা অনুষ্ঠিত হইবে কিন্তু যাহারা খেলিবেন তাহারা খেলোয়াড় নয়। পৃথিবীর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কবি-সাহিত্যিকের সহিত প্রসিদ্ধ ছায়াছবির নটনটীদিগের ম্যাচ খেলা। উদ্বাস্তগণের সাহায্যকল্পে কিনা মনে নাই, তবে মোহনবাগান মাঠে এটা নিশ্চিত মনে আছে।

খেলোয়াড়গণ নিম্নরূপ—

একপক্ষে—রবীন্দ্রনাথ, আনাতোল ফ্রাঁ, হামসুন, পিরানদেলো, শ', সিনক্লেয়ার, টমাসম্যান, পার্লবাক্, দেলেদ্দা, শরৎচন্দ্র, গলস্‌ওয়ার্দি।

অন্যপক্ষে—ভিলমা, মেরীপিকফোর্ড, মার্লেন, জেনেট গেনর, গ্রেটা, নার্গিস্, বাজম্যান, কানন, চার্লি, চন্দ্রা, দেবিকারাণী।

মাঠ মোহনবাগানের কিন্তু তাহার গ্যালারী আকাশ প্রমাণ। চারিপাশে সাংঘাতিক পুলিশ পাহারা, দর্শনী দশ হইতে সহস্রমুদ্রা। কেমন করিয়া জানিনা,—আমিও একজন দর্শক।

বেলা বারটায় কার্জ্জন পার্কের ওখানে ৫এ বাস হইতে নামিয়া দেখি, গড়ের মাঠ আর সবুজ নয় কালো হইয়াছে—অগণিত নরমুণ্ড। আর যাগবার উপায় নাই,—চারিপাশে ঠেলাঠেলি মারামারি, তাহার মাঝে আবার ঘোড়ায় চড়িয়া পুলিশ কসরৎ করিতেছে—পায়ের তলায় পড়িয়া কেহ কেহ ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে—আমার মত ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তি কি উপায়ে মন বাসনা পূর্ণ করিতে পারে।

দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি এবং দেখিতেছি—অকস্মাৎ একটা ঘটনা দেখিয়া-গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল—একজন বিপুলোদর বিরাট মাড়োয়ারী ঠেলিয়া ঠেলিয়া আগাইতে-ছিলেন, অকস্মাৎ পড়িয়া গেলেন এবং লোকজন সব তাঁহার উদরদেশে পদস্থাপন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রবল ভুঁড়ি বিরাট শব্দে ফাঁসিয়া গেল, আর কালো রক্তে রাস্তা ভাসিয়া পিছল হইয়া গেল—পুলিশের ঘোড়াগুলি পিছল রাস্তায় ঝপাঝপ্ পড়িয়া যাইতে লাগিল—

প্রমাদ গণিলাম। আমি কি করি? ওই বিরাট ব্যক্তির দুর্দ্দশা বা শেষ দশা দেখিয়া আর ভীড়ের মাঝে যাইতে সাহস হইল না। তখন উদ্ধশ্বাসে ছুটিলাম—

কি হইল জানি না, তবে মাঠের পিছন দিকে পৌঁছিলাম। পশ্চিমের বটগাছটার ডালে মানুষগুলি পাতার মত ঝুলিতেছে—টিকিট ঘরের ৫০০ গজের মধ্যে যাই এমন সম্ভাবনা নাই—তাই মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছি—

অকস্মাৎ দুইজন ঘোড়সোয়ার আসিয়া আমাকে দুই হাত ধরিয়া শূন্য পথে লইয়া চলিল—লালবাজারে যাইতেছি মনে করিয়া কান্না পাইতেছিল, কিন্তু তাহারা ক্ষুদ্র একটা চোরা দরজা দিয়া আমাকে ঢুকাইয়া দিল এবং প্রবেশ করিতেই আর দুইজন বলিষ্ঠ লোক আমাকে ধরিয়া আই, এফ, এ'র সেক্রেটারীর নিকট উপস্থিত করিল।

সেক্রেটারী বলিলেন—আজকার এ বিপদে আপনি ব্যতীত উপায় নাই—

আমি সভয়ে বলিলাম—অর্থাৎ—

—আপনাকে এই খেলায় রেফারি নিযুক্ত করা গেছে—

—কেন?

—কলকাতায় কোন রেফারী এ খেলাতে রাজি হন নি—অবশ্য প্রাণের ভয়ে—

—আজ্ঞে সে ভয়টা আমার একেবারেই নেই—এমন নয়—

—তা থাক্,—আমরা আছি, পুলিশ আছে—

—আমি ত সে রকম রেফারিগিরি করিনি—

সেক্রেটারী হাসিয়া পিঠে একটা করাঘাত করিয়া বলিলেন—বাঃ, আপনি আপনাদের গ্রামের কুমুদিনী কাপ খেলার রেফারী ছিলেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—তবে আর কি, যান, তিনি আমার হাতের মধ্যে বাঁশীটা দিয়া কহিলেন—যান ভয় কি?

দুই চার পা যাইয়াই বুক দমিয়া গেল—প্রশ্ন করিলাম—এখানে ষ্ট্রেচার, এ্যাম্বুলেন্স সব ঠিক আছে ত?

—হ্যাঁ আছে, যান্—

অতএব বাঁশী হাতে করিয়া চলিলাম—

লোকে লোকারণ্য। আ-হিমাচল কুমারিকা সর্ব্ব প্রদেশের লোক ত আছেই, এমন কি দক্ষিণাবর্ত্তে আ-টোকিও মস্কো সমস্ত দেশেরই প্রতিনিধি বর্ত্তমান—আনুসঙ্গিক ছাতা, লাঠি, টুপি, হ্যাট, সবই আছে।

গম্ভীর পদে মধ্য স্থানে যাইয়া বাঁশী বাজাইলাম। দুই ক্যাপটেন আসিলেন,—ওদিকের শ', এদিকের গ্রেটা। মোহরটা ঊর্দ্ধে উঠিতে গ্রেটা বলিল—হেড।

বলা বাহুল্য মাথাই পড়িল। গ্রেটা ষ্টার্ট লইয়া নিজের অবস্থানে ফিরিয়া গেল। আমি ঘড়ি দেখিতে দেখিতে ইষ্টনাম জপ করিলাম—ভগবান একেবারে প্রাণে মারিও না—বিধবা ও অপগণ্ড শিশু ক'টিকে কে দেখিবে!

বেশের কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য না ছিল এমন নয়—নটীগণ সব সর্ট পরিয়া আসিয়াছেন, পায়ে বুট্ জুতা, কেবলমাত্র সেণ্টার ফরোয়ার্ড চালি তাহার গোঁফ্ ও কোট জুতা লইয়া আছেন। ভারতীয় নটীগণের খোপাগুলি সর্টের সঙ্গে বেশ মানাইয়াছে,—এপারের ভিল্মা কেবল সাঁতরাইবার পোষাকে গোলরক্ষা করিতেছেন। ওদিকে সকলেই ইউরোপীয় বেশে উপস্থিত, কেবল গোলে রবীন্দ্রনাথ ধুতি ও তাহার আলখেল্লা পরিয়া আছেন—পায়ে শুড়তোলা চটি। আর শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক বেশে আসিয়াছেন—ছাতাটা সঙ্গেই আছে।

বাঁশী বাজাইয়া দিলাম—খেলা সুরু হইবে। চালি তাঁহার গোল্ডরাসে যেরূপ নাচিয়াছেন তেমনি ভাবে একটু নাচিয়া, একটু আগাইয়া একটু পিছাইয়া গোঁফে তা দিয়া সুট করিলেন।

বিরাট জনতা মুহুর্মুহুঃ করতালি দিতে লাগিল। নাকি

সুরের দুই চারিটা কথা কানে আসিল—চার্লি ডার্লিং—কি সুন্দর,—বিঁউটিফুল সট্—বার্জম্যান বল ধরিয়া আগাইতে লাগিল—

সিনক্লেয়ার অগ্রসর হইয়া চার্জ করিতে যাইবেন এমন সময় চারি পাশ হইতে ধ্বনি উঠিল,—ভীরু, কাউয়ার্ড,—নারীকে চার্জ,—সিনক্লেয়ার আর একটু আগাইয়া আসিতেই, তারস্বরে চিৎকার উঠিল—ফাউল—ফাউল—

বার্জম্যান বলটা কাননের নিকটে ঠেলিয়া দিতেই কানন বল লইয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু শ' দ্রুত লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া উপস্থিত হইলেন, মনে হইল বল ও খেলোয়াড়কে এক স্যুটে উধাও করিয়া দিবেন—

আবার চীৎকার—ফাউল ফাউল,—

আমি ভাবিলাম কি করি? এই জনগণের অমতে যদি ফাউল না দি তবে ত জীবন সংশয়। শ' বলিয়া উঠিলেন—Get yourself married,—motherhood is a physiological necessity for women—not football.

কানন এককলি গান গাহিলেন—মনের গহনে তোমার মুরতি খানি—শ' কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বল স্যুট করিয়া দিলেন—বল বহুউর্দ্ধে উত্থিত হইল। চারি পাশ হইতে রব উঠিল—ফাউল ফাউল,—মারো উস্‌কো।

তাহার পরেই শুনি, সদাশয় দর্শকগণ আমাকে বিশেষ কুটুম্ব সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতেছেন এবং বিশেষভাবে প্রহার করিবার জন্যে অন্য সকলকে উৎসাহিত করিতেছেন।

মনে মনে প্রমাদ গণিলাম—যাহাই হোক্ সতর্কতার সঙ্গে ফাউল ধরিতে হইবে। খেলিতে নামিয়া বলটা পড়িল শরৎচন্দ্রের সম্মুখে। তিনি বন্ধ করা ছাতা কাঁধেই খেলিতে নামিয়াছেন—শরৎচন্দ্র বলটা বহু কষ্টে সামলাইয়া একটু আগাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু নার্গিস্ আসিয়া ছোঁ মারিয়া বলটা কাড়িয়া লইয়া গেল—শরৎচন্দ্র ছাতাটার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া একটু স্মিতহাস্যে কহিলেন—বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, তা দূরেও ঠেলিয়া দেয়—

আমি সমীহ সহকারে প্রশ্ন করিলাম—কিছু ব'ললেন?

—না, তবে এঁরা কি সব ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—দর্শকগণ—?

—ঠুন্ ঠুন্ পিয়ালা, নতুন দাদা—

—বোধ হয়—

দ্রুত বলের পশ্চাৎধাবন করিলাম, এইবারে একটা ফাউল ধরিতেই হইবে। নার্গিস বলটাকে গ্রেটার নিকট ঠেলিয়া দিলেন, গ্রেটা বল লইয়া আগাইয়া গেলেন। পার্লবাক্ তাহাকে আটকাইতে চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু একটা কি রকম ভেল্কি দেখাইয়া গ্রেটা বল লইয়া চলিয়া গেল পার্লবাক্ ছুটিয়া গিয়া পড়িলেন—চারি পাশে তুমুল হাস্য ধ্বনি হইল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—চিয়ারীও—গো অন্,—গো অন্—

হামসুন ছুটিয়া আসিলেন এবং বীরবিক্রমে একটা স্লিপ করিয়া গ্রেটার গতিরোধ করিতে চাহিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না, গ্রেটা বল কাটাইয়া লইয়া গেল।

হামসুন গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া কহিলেন—লাজালি—অহো—লাজালি—ক্ষুধা—মহাবুভুক্ষাই পাগল ক'রেছে পৃথিবীকে—

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি? কিছু ব'ললেন?

হামসুন আপন মনেই বলিলেন—Soil—not, Civilizartion.

বল বহুদূর চলিয়া গিয়াছে অতএব ছুটিলাম—শ'ই পুনরায় আগাইয়া আসিলেন এবং গ্রেটার সঙ্গে একটা সংঘর্ষের ফলে বল আউট হইয়া গেল—

ফাউল—ফাউল—মারো মারো—রব উত্থিত হইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারী ভাঙ্গিয়া মাঠে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুলিশ বহু চেষ্টায় সেবারের মত তাহাদিগকে মাঠ হইতে হটাইয়া দিল—

শ' চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন,—Gentleman is a species now extinct in the world.

ভাগ্যি সে কথা কেহ শুনিল না, তাহা হইলে একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়া যাইত। গ্রেটা বলটাকে দেবিকারাণীকে পাস করিল—দেবীকারাণী কাঠবিড়ালীর মত দ্রুত এবং চকিতভাবে একেবারে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে বল লইয়া উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ সমীহ সহকারে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আভরণ, তোমারে দুর্লভ করি করেছে গোপন, পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা, অর্দ্ধেক মানবী তাই অর্দ্ধেক কল্পনা—

দেবিকা সেই ফাঁকে বলটি একেবারে নেটের মধ্যে

পাঠাইয়া দিলেন এবং একটু হাসিয়া সম্ভবতঃ নিজের সাফল্যে সগর্ব্বে ব্যঙ্গ করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন—তোমার কাছে মেনেছি হার, সেই ত আমার জয়।

চারিদিক হইতে টুপি টোপর লাঠি জুতা ছাতা বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া অন্ধকার করিয়া ফেলিল—এবং আবালবৃদ্ধ সকলেই একটু নাচিয়া কুন্দিয়া লইলেন—ধ্বনি উঠিল, জয় নটনটীর জয়—সাহিত্যিক ভূতের দলকে গো-হার হারিয়ে দাও—

চারিপাশের হট্টগোলে মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করিল—এমন ভীড় আর এত কলকোলাহল কেহ কোনদিন শুনে নাই—

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সেণ্টার হইল—

কিন্তু শ' এবার আগাইয়া বল ধরিলেন এবং গলস্‌ওয়ার্দ্দি বল ধরিয়া আগাইতে জেনেট গেনর আসিয়া স্লিপ করিলেন। দর্শকগণ মনে করলেন, জেনেট আহত—মারো মারো—গুণ্ডাকে—দেখিতে দেখিতে চারিপাশে সাংঘাতিক গোলমাল হইল—মারো মারো—

সঙ্গে সঙ্গে ইটপাটকেল ছাতাজুতা তীব্রবেগে নানাদিকে ধাবিত হইল—দেখি সাহিত্যিক-কুল দ্রুত পলাইয়া যাইতেছেন—মহাজন বলিয়া তাহাদিগের প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা ছিল তাই সেই পথ অনুসরণ করিয়া গ্যালারীর নীচে আশ্রয় লইলাম—

কতক্ষণ এই ভাবে ছিলাম জানি না—কোলাহল ও ইষ্টকাদি পতনের শব্দ যখন একটু কমিয়া আসিল এবং মনে হইল গোলমালটা একটু দূরে গিয়াছে তখন মাথা গলাইয়া দেখিলাম—মাঠ জনশূন্য, গ্যালারীর উপরে উঠিয়া যাহা দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত। সমস্ত মাঠ নৃত্যশীল জনগণে সমাচ্ছন্ন—জয়ী নটনটীকে মাথায় করিয়া, কাঁধে করিয়া কয়েকজন ঐরাবৎ সদৃশ আকৃতি বিশিষ্ট ধনীব্যক্তি নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন—আনন্দে উত্তেজনায় তাহাদের কটিদেশ হইতে বস্ত্র স্খলিত, কচ্ছ মুক্ত, বিপুলোদর লম্ফমান, —তাহারা হাসিয়া লাফাইয়া নাচিয়া চলিয়াছেন—আর তাহার পিছন পিছন অসংখ্য লোক লাফাইতে লাফাইতে, ডিগবাজি খাইতে খাইতে চলিয়াছে—এবং জয় ধ্বনি করিতেছে। সে জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে, —মনুমেণ্টের মাথা একটু একটু করিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছে—

আপাততঃ মাথাটা বাঁচিয়া গিয়াছে ভাবিয়া হৃষ্ট হইয়া উঠিলাম। পিছনে চাহিয়া দেখি পরাজিত, আহত সাহিত্যিকগণ নীরবে দাড়াইয়া আছেন,—কয়েকজন মাত্র সামান্য লোক তাহাদিগকে ঘেরিয়া দাড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি সেখানে উপস্থিত হইলাম—

দুই একজন বলিতেছেন—একটু আইডিন্ দেব এনে—

শ'র হাতে লাগিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের হাঁটুতে ক্ষত—রক্ত ঝরিতেছে, সকলেই অল্প-বিস্তর আহত। গলসওয়ার্দ্দির পা সাংঘাতিক জখম—

আমি বলিলাম—আইডিন, আইডিন আনবো—

হামসুন বলিলেন—আনতে পারেন কিন্তু পয়সা আমরা দিতে পারবো না—

শরৎচন্দ্র কহিলেন—যেহেতু নেই—

আমি পকেট—হাতড়াইলাম—কিছুই নাই। শরৎচন্দ্র কহিলেন—জানি নেই—থাকে না—

দুই চারিজন যাহারা ছিলেন তাহাদের একজন কহিলেন,—আমাদের শ্রদ্ধা আছে কিন্তু বই কিনবারও পয়সা নেই—আইডিনেরও পয়সা নেই—কি করবো—

শ' চটিয়া উঠিয়া কহিলেন—তবে দাঁড়িয়ে দেখছেন কি—যান ঐ দলে মিশে নাচুন—

ব্যথিত হইয়াছিলাম—আহত লোকগুলির চিকিৎসা হইবে না—

বেদনায় রবীন্দ্রনাথের চোখে জল আসিয়াছে—তিনি বলিলেন—উঃ—ভেঙ্গে গেছে না কি?

গলস্‌ওয়ার্দ্দি সান্ত্বনা দিলেন—need not worry Tagore,—The Mob can make you King today and kill you to-morrow.

রবীন্দ্রনাথ বলিলেন—বেঁচে থাকতে কয়েকটা কবিতা ভুল লিখেছিলাম, একটু সংশোধন করা দরকার—

—কোনটা?

—প্রশ্ন কবিতাটা—সেটা হবে—

ভগবান, তুমি যুগে যুগে ভূত পাঠায়েছ বারে বারে
নির্ব্বোধ সংসারে—
তারা বলে গেল, "মেরে ফেলো সবে" বলে গেল,
"খুন করো—পৃথিবীর যত মহামানবেরে মারো"
বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা ....
যাহারা তাদের উড়াইছে ধ্বজা, জ্বালাইছে তার আলো,
সাধারণে তার জয় জয়কার, সবাই বেসেছে ভালো।

আমি বলিলাম—আজ্ঞে, বিশ্বভারতীকে কবিতাটা সংশোধন করতে ব'লবো—এ আর এমন শক্ত কি?

শ' কপালে হাত দিয়া প্রক্ষিপ্ত ইষ্টকাঘাত প্রসূত ক্ষতের রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তিনি সখেদে বলিলেন,—How long, how long thy shall have to wait to receive thy saints?

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—ভাদ্রের গরমে ঘামিয়া গিয়াছি।

ফ্রেডারিক নিৎসে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রতিবাসীর প্রতি প্রেম:—আমি প্রতিবাসীকে ভালবাসিতে তোমাদিগকে বলি না। প্রতিবাসীর নিকট হইতে দূরে যাও, দূরের লোককে ভালবাস, ইহাই আমার উপদেশ। প্রতিবাসীকে ভালবাসা অপেক্ষা যাহারা দূরে আছে, যাহারা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে, তাহাদিগকে ভালবাসাই মহত্তর। যে আপনাকে শ্রদ্ধা করে না, নির্জনতা তাহার নিকট কারাগার তুল্য। সেইজন্য সে প্রতিবাসীর নিকট গমন করে।

জরাথুষ্ট্র ও নারী:—এক বৃদ্ধা জরাথুষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিল, স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে তুমি কখন কিছু বল নাই। আমার নিকট কিছু বল। জরাথুষ্ট্র কহিলেন, স্ত্রীলোকের সকলই প্রহেলিকা। স্ত্রীলোকের সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান—গর্ভধারণ। নারীর নিকট পুরুষ তাহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায় মাত্র। সে উদ্দেশ্য সন্তান-লাভ। কিন্তু খাঁটি মানুষ দুইটি বিভিন্ন বস্তু চায়—একটি বিপদ, অন্যটি আমোদ। সর্ব্বাপেক্ষা বিপৎজনক খেলনা বলিয়া পুরুষ নারীকে কামনা করে। যুদ্ধের জন্য পুরুষকে শিক্ষিত করিতে হইবে, স্ত্রীলোককে শিক্ষা দিতে হইবে যোদ্ধার অবসর-বিনোদনের জন্য। অন্য সকলই বৃথা। যিনি যোদ্ধা, তিনি অতিরিক্ত মিষ্ট ফল ভালবাসেন না। সেই জন্যই তিনি নারীকে ভালবাসেন। অতিতম মনোহারিণী নারীও তিক্ত। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক শিশুদিগকে ভাল বুঝিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ অধিকতর বাল-স্বভাব। খাঁটি পুরুষের মধ্যে শিশু লুক্কায়িত থাকে। সেই শিশু ক্রীড়াভিলাষী। নারীগণ, পুরুষের অন্তরস্থিত সেই শিশুকে খুঁজিয়া বাহির কর। বহুমূল্য প্রস্তরের মত বিশুদ্ধ ও পবিত্র এবং অনাগত জগতের গুণগৌরবোজ্জ্বল ক্রীড়াবস্তুই তোমরা হও। নক্ষত্রের জ্যোতিঃ তোমাদের প্রেম হইতে বিকীর্ণ হউক। প্রার্থনা কর "আমি যেন অতিমানবকে গর্ভে ধারণ করিতে পারি।" যত ভালবাসা তুমি পাও, তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসা দান কর। ভালবাসার ব্যাপারে প্রথম না হইয়া দ্বিতীয়-হইও না। নারী যখন ভালবাসে, তখন পুরুষ তাহাকে ভয় করুক। তখন নারী সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করে; যাহাতে স্বার্থত্যাগ করিতে হয় না, তখন তাহার নিকট তাহার কোনও মূল্য নাই। যখন নারী ঘৃণা করে তখনও পুরুষ তাহাকে ভয় করুক। কেননা পুরুষ অন্তরতম প্রদেশে পাপীমাত্র, কিন্তু নারী নীচ। লৌহ একদিন চুম্বককে বলিয়াছিল "আমি তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ঘৃণা করি, কেননা তুমি আকর্ষণ কর; কিন্তু টানিয়া লইবার শক্তি তোমার নাই। (নারী কাহাকে বেশী ঘৃণা করে? এই প্রশ্নের উত্তর।) স্ত্রীলোকের মন অগভীর। পুরুষের অন্তর গভীর।" বিদায় লইবার সময় বৃদ্ধা কহিলেন, "আমি তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাই। ইহা গোপন রাখিও। যখন স্ত্রীলোকের নিকট যাইবে, তখন তোমার চাবুক লইতে ভুলিও না।"

নবসৃষ্টি:—জরাথুষ্ট্র শিষ্যদিগকে বলিতেছেন "তোমরা কোনও দেবতাকে সৃষ্টি করিতে পার না, কিন্তু অতিমানব সৃষ্টি তোমাদের সাধ্যায়ত্ত। সুতরাং ঈশ্বরও দেবতাদের সম্বন্ধে মৌনী থাক। তোমরা আপনাদিগকে অতিমানবে উন্নীত করিতে হয়তো পারিবে না, কিন্তু অতিমানবের পিতা অথবা পিতামহে তোমরা আপনাদিগকে উন্নীত করিতে পার। তাহাই তোমাদের সৃষ্টি হউক। ঈশ্বর তো একটা অনুমানমাত্র। কিন্তু যাহার ধারণা করা সম্ভব, তাহাতেই তোমাদের কল্পনা সীমাবদ্ধ হউক। ঈশ্বরের কি ধারণা করিতে পার? যদি দেবতারা থাকিতেন, তাহা হইলে আমি যে দেবতা নই, ইহা আমি সহ্য করিতাম কিরূপে? সুতরাং কোনো দেবতাই নাই। ঈশ্বর অনুমানমাত্র, একটা চিন্তামাত্র। কিন্তু এই চিন্তা, যাহা সরল তাহাকে বক্র করে, যাহা দণ্ডায়মান তাহাকে কম্পমান করে।...সেই এক, অবিচলিত, স্বয়ং-পর্য্যাপ্ত, অবিনশ্বরের কল্পনাকে আমি অনিষ্টকর বলিয়া গণ্য করি। কষ্ট হইতে মুক্তি, এবং জীবের দুঃখের লাঘব সৃষ্টিদ্বারাই সম্ভব। কিন্তু স্রষ্টার আবির্ভাবের জন্য দুঃখভোগের প্রয়োজন। হে নূতন-সৃষ্টিকর্ত্তাগণ, তোমাদের জীবনে অনেক দুঃখজনক মৃত্যু সহ্য করিতে হইবে। স্রষ্টাকে

নবজাত শিশু হইতে হইবে, শিশুকে ধারণ করিতে হইবে, এবং তাহার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। আমি শতবার আত্মা হইয়া জন্মিয়াছি, শতবার জন্মের কষ্ট সহ্য করিয়াছি। বহুবার বিদায় গ্রহণ করিয়াছি। হৃদয়বিদারক শেষ দেখার যন্ত্রণা আমি অবগত আছি। কিন্তু আমি তাহাই ইচ্ছা করিয়াছি। আমার সকল অনুভূতি কষ্ট ভোগ করে, কিন্তু আমার ইচ্ছা আমাকে মুক্ত করে ও সান্ত্বনা দেয়। ইচ্ছা নাই, বস্তুর মূল্য-নিরূপণ নাই, নূতন সৃষ্টিও নাই—সেই ভীষণ দুর্ব্বলতা হইতে আমি যেন দূরে থাকি। আমার ইচ্ছা ঈশ্বর ও দেবতাদিগের নিকট হইতে আমাকে বহু দূরে লইয়া গিয়াছিল। দেবতা যদি থাকিত, তবে সৃষ্টি করিবার থাকিত কি? প্রস্তরের মধ্যে একটি মূর্ত্তি সুপ্ত আছে, আমাকে তাহার আবিষ্কার করিতে হইবে। কঠিনতম কুৎসিততম প্রস্তরের মধ্যেই আমার দৃষ্ট সেই মূর্ত্তি সুপ্ত। আমি সেই মূর্ত্তির কারাগারের প্রাচীরে আঘাত করিতেছি, আমি আরব্ধ কার্য্য শেষ করিব। কেননা অতিমানবের সৌন্দর্য্য ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। দেবতাদিগের আমার কি প্রয়োজন? ভক্তি কিরূপে করিতে হয়, তাহা এখন কেহই জানে না। যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিপরায়ণ জরাথুষ্ট্র। জরাথুষ্ট্রের ঈশ্বর অতিমানব (Superman)।

সকল দেবতাই মরিয়া গিয়াছে। এখন মহামানবের আবির্ভাব হইবে। মানুষ সেতুমাত্র, গন্তব্যস্থান নহে। মানুষ গতিশীল ও ধ্বংসকারী; ইহাই তাহার গৌরব। সুদূর ভবিষ্যতের মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রতিবাসীকে ভালবাসা অপেক্ষা মহত্তর।

অতিমানুষের এখনও জন্ম হয় নাই। তিনি ভবিষ্যতের গর্ভে। আমরা তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারি। তোমার ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছুই ইচ্ছা করিও না। তোমার সামর্থ্যের অতিরিক্ত ধার্ম্মিক হইতে চেষ্টা করিও না। যাহা সম্ভবপর নহে, এমন কিছু নিজের নিকট দাবী করিও না। যে সুখ অতিমানবের অধিগম্য, তাহা আমাদের জন্য নহে। আমাদের লক্ষ্য কর্ম্ম।

ধর্ম্মের পুরস্কার :—অলস ও স্বপ্নাতুর লোকের নিকট বজ্ররবে না বলিলে কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করে না। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কণ্ঠস্বর কোমল। প্রবুদ্ধ লোকেই তাহা শুনিতে পায়। আজ আমি সৌন্দর্য্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়াছি। সেই স্বর আমাকে বলিল "তাহারা তাহাদের ধর্ম্মের মূল্য চাহে।" তোমরা ধর্ম্মের পুরস্কার চাও? মর্ত্ত্যের জন্য স্বর্গ, বর্ত্তমানের জন্য অনন্তকাল চাও? পুরস্কারদাতা কেহ নাই বলার জন্য তোমরা আমাকে তিরস্কার কর। কিন্তু ধর্ম্মই ধর্ম্মের পুরস্কার, তাহাও তো আমি বলি নাই। প্রতিহিংসা, শাস্তি, পুরস্কার, পাপের দণ্ড—এসকল অতি কলুষিত শব্দ। তোমরা স্বরূপতঃ পবিত্র। এ সকল তোমাদের উপযোগী নয়। নক্ষত্র নির্ব্বাপিত হইলেও, তাহার বিকীর্ণ জ্যোতিঃর বিনাশ হয় না; তাহা চলিতেই থাকে। তোমাদের ধর্ম্মের জ্যোতিঃও তদ্রূপ। তাহার কর্ম্ম শেষ হইলেও, তাহার বিনাশ নাই, তাহা সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

সাম্যবাদী :—ট্যারানটুলা একপ্রকার বিষাক্ত মাকড়সা। ইহার দংশনে নাচের নেশা উৎপন্ন হয়, বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিত। সাম্যবাদীদিগকে ট্যারানটুলা অভিধানে অভিহিত করিয়া জরাথুষ্ট্র বলিতেছেন, ট্যারানটুলাদিগের অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন। তাহারা বলে সকল মানুষ সমান। বলিয়া লোকের মাথা ঘুরাইয়া দেয়। ন্যায়বিচারের বুলি তাহাদের মুখে, কিন্তু অন্তরে তাহাদের হিংসার জ্বালা। আমি চাই মানুষকে প্রতিহিংসা হইতে নিবৃত্ত করিতে। সাম্যপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছাই ট্যারানটুলাদিগের নিকট ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত। পরকে পীড়ন করিবার ইচ্ছাকে তাহারা ধর্ম্মের মুখোস পরাইয়া দেয়। ঈর্ষ্যা ও আত্মাভিমান তাহাদের অন্তরে হিংসার সৃষ্টি করে। অন্যকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা যাহাদের মধ্যে প্রবল, তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না। অসৎ বংশে তাহাদের জন্ম; তাহাদের মুখে নরহন্তা ও রক্তপাগল কুকুরের ছাপ। যখন তাহারা ন্যায়বিচারের ভাণ করে মনে রাখিও, যে তাহাদের শক্তি নাই বলিয়াই তাহারা পীড়ন করিতে পারিতেছে না। যাহাদের হাতে বর্ত্তমানে ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা থাকিলে, তাহাদিগের ক্ষতি তাহারা করিত। আমি বলিতেছি, সকল মানুষ সমান নহে। কখনও সকল মানুষ সমান হইবে না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে মহামানবের আবির্ভাব অসম্ভব হইত। অসাম্য ও সংঘর্ষ চিরকাল থাকিবে। ভাল ও মন্দ, ধনী ও দরিদ্র, উচ্চ ও নীচ—সকলই মূল্যের (value) নাম। বার বার জীবন আপনাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। এই সকল নাম তাহারই সূচনা করে। সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া সেই অত্যুচ্চ স্তম্ভের উপর জীবন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবে। উচ্চস্থান হইতে তাহাকে বহুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে—আনন্দপূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে। উচ্চস্থানের তাহার প্রয়োজন বলিয়াই, নানাবিধ সোপানের তাহার প্রয়োজন, নানা আরোহীরও প্রয়োজন। জীবন ঊর্দ্ধে উঠিবার জন্য এবং উঠিয়া আপনাকে অতিক্রম করিবার জন্য সচেষ্ট।

সৌন্দর্য্যের মধ্যেও অসাম্য এবং সংঘর্ষ বর্ত্তমান, শক্তি ও প্রভুত্ব-লাভের জন্য কলহ বর্ত্তমান। আমাদিগকেও পরস্পরের শত্রুতা করিতে হইবে—অবিচলিতভাবে, সুন্দরভাবে, স্বর্গীয়ভাবে।

আত্মাতিক্রমণ :—যেখানেই প্রাণ আছে, সেখানেই আমি "শক্তি-লাভের ইচ্ছা (will to power) দেখিয়াছি। ভৃত্যের মধ্যে প্রভু হইবার ইচ্ছা আছে। যে দুর্ব্বল, সে সবলের সেবা করিয়া, তাহা অপেক্ষা দুর্ব্বলতরের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছুক। প্রভুত্বের সুখ বর্জন করিতে সে চায় না। সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী লোকও অধিকতর শক্তিলাভের জন্য তাহার সর্ব্বস্ব, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জনে প্রস্তুত। যেখানে স্বার্থত্যাগ, সেবা এবং ভালবাসার রাজত্ব, সেখানেও ক্ষমতার ইচ্ছা বর্ত্তমান। যে দুর্ব্বল, সে এই গলিপথে দুর্গে প্রবেশ করে; প্রবলের হৃদয় অধিকার করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করে। প্রাণ আমার নিকট তাহার এই গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়াছে; "চিরকাল নিজকে অতিক্রম করিয়া আমাকে যাইতেই হই'ব। তোমরা ইহাকে বংশরক্ষার প্রবৃত্তি বলিয়া থাক,

কোনও উচ্চতর দূরবর্ত্তী বহুমূগ-লক্ষ্যাভিমুখী প্রবৃত্তিও বলিয়া থাক। কিন্তু সে একই কথা। ইহার জন্য আমার পতনও যদি হয়, তাহাও আমি স্বীকার করিব।" কিন্তু এই পতন ক্ষমতার জন্য প্রাণের আত্মত্যাগ।

"আমি যাহাই সৃষ্টি করি, তাহা যতই আমার প্রিয় হউক না কেন, অচিরেই আমি তাহার বিরোধী হই। সত্যাভিমুখী ইচ্ছা (will to truth)কেও পদদলিত করিয়া আমি অগ্রসর হই। "জীবনের ইচ্ছা"র (will to live) কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু "জীবনের ইচ্ছা"র অস্তিত্ব নাই। যাহার জীবন আছে, সে আবার জীবন লাভের জন্য কি চেষ্টা করিবে? যেখানে জীবন নাই, সেখানে ইচ্ছাও নাই। যেখানে জীবন আছে, সেখানেই ইচ্ছা আছে। কিন্তু সে ইচ্ছা ক্ষমতার ইচ্ছা। প্রাণ অনেক বস্তুকেই প্রাণ অপেক্ষা মূল্যবান গণ্য করে। ক্ষমতার ইচ্ছাই ইহার কারণ।"

মূল্যের স্থায়িত্ব :—ভালো ও মন্দ চিরস্থায়ী নহে। আজ যাহা ভালো, তাহা চিরকালই ভালো থাকিবে না। যাহা মন্দ, তাহাও চিরকাল মন্দ থাকিবে না। তোমাদের ভালো ও মন্দের সূত্র দ্বারা (formula) তোমরা "মূল্যের" (value) সৃষ্টি এবং তাহা দ্বারা ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়া থাক। কিন্তু তোমাদের সৃষ্ট মূল্য হইতে বলবত্তর শক্তি উদ্ভূত হয় এবং ডিম ভাঙ্গিয়া তাহা বাহির হয়। এইরূপে প্রথমে ধ্বংস, পরে সৃষ্টি—বর্ত্তমান মূল্যের ধ্বংস, নূতন সৃষ্টি। সত্য দ্বারা যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা ভাঙ্গুক।

কবি : জরাথুস্ট্রের এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি বলিয়াছেন, কবিরা বড় মিথ্যা কথা বলে। ইহা কেন বলিয়াছেন?" জরাথুষ্ট্র কহিলেন "কি জন্য কবিদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছি, তাহা কি আমার মনে আছে? জরাথুষ্ট্র নিজেও তো একজন কবি। আমরা সতাই অনেক মিথ্যা কথা বলি। আমাদের জ্ঞান কম; শিক্ষা করিতেও সহজে পারি না। তাই মিথ্যা বলিতে বাধ্য হই। আমাদের জ্ঞান কম বলিয়া, যাহারা অন্তরে বিনীত (poor in spirit), তাহাদিগকে আমরা ভালবাসি। সকল কবিই বিশ্বাস করেন যে, ঘাসের উপর অথবা নির্জ্জন অধিত্যকায় শুইয়া থাকিয়া কেহ যদি উৎকর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী দেশের সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারে। যদি তখন কোনও সুকুমার অনুভূতির উদ্রেক হয়, তাহা হইলে কবিরা মনে করেন, যে প্রকৃতি তাহাদের প্রেমে আবদ্ধ এবং তাহাদের কাণে কাণে প্রেমের কথা বলেন। এইজন্য তাহাদের মনে গর্ব্বের উদয় হয়। কবিরা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী দেশের অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বর্গের সম্বন্ধেও অনেক স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সকল দেবতাই কবিদিগের সৃষ্ট—প্রতীক, কবিদিগের কল্পনা। কবিরা সকলেই স্থূলদর্শী; জল ঘোলা করিয়া তাহারা সেই জলকে গভীর প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছুক। তাহারা অহঙ্কারী—ময়ূরের মত।"

(ক্রমশঃ)

আনমনা

রামাই বাউল

আনমনা এই মন টানে সেই
খাচার হীরামন।
(টানে) কাজলমাখা কমল আঁখি
(টানে) অমল আনন ॥
আড়াল তারে রুখবে বা কিসে?
চাপ দিলেই ভাব ঢুকবে নাকি?
ঢুকবে নাকি সে?
(এসে) হিয়ায় রহে হিয়ার পরশ
পরাণ বহে মন ॥
অধর জানে অধর ধারা কি,
ইসারাতেই রয় সে সাড়া,
রয় সে সাড়াটি
(তার) চমক লাগা পলক লাগাই
অলখ নিরঞ্জন ॥

মুখ চেয়ে রয় আলোর রাজার ঝি,
"সোনার কমল কয় সে কথা,
কও সে কথা কি,"
বাউল বলে, "ব'লবো কি আর
পর হ'ল আপন ॥'
বেকুব ভবের বুঝলোনা বা কী?
ফাঁকার চোখে সত্য মিছে
সব কিছুই ফাঁকি,
(শুধু) বাউলিণীর প্রীতির পুলক
গোলক রমন ॥
(তার) দুই পাজরে দুই প্রকৃতি রয়,
এ যা ধরে ও না করে,
ও ধরে এ নয়,
দ্বন্দ্বে সেই, আনন্দ রসের
বাউল ভজন ॥

কালের মন্দিরা

শ্রী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার

দুর্গ হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে গিয়া অশ্বারোহী অশ্ব থামাইল। উপত্যকা এখানে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, চারিদিকে উচ্চ নীচ প্রস্তরখণ্ড বিকীর্ণ। সাবধানে অশ্ব চালাইতে হয়। পথ এত বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়াই অশ্বারোহীকে চন্দ্রোদয়ের পর যাত্রা করিতে হইয়াছে। উপরন্তু চন্দ্রালোক সত্ত্বেও বেগে অশ্বচালনা করা সম্ভব হয় নাই। শব্দ নিবারণের জন্য ঘোড়ার পায়ে কর্পট বাঁধা; এরূপ অবস্থায় ঘোড়া অধিক বেগে দৌড়িতে পারেনা।

অশ্বারোহী পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দূর পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিল। প্রস্তরখণ্ডগুলা চারিদিকে কালো কালো ছায়া ফেলিয়াছে, সচলতার আভাস নাই; সব স্থির নিথর। অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবরোহণ করিল। ঘোড়ার ক্ষুরের কর্পট খুলিয়া এবার বেগে ঘোড়া ছুটানো যাইতে পারে; শব্দ হইলেও শুনিবার কেহ নাই।

তিনটি ক্ষুরের বস্ত্র খুলিয়া অশ্বারোহী চতুর্থ ক্ষুরে হাত দিয়াছে এমন সময় ঘোড়াটা ভয় পাইয়া দূরে সরিয়া গেল। অশ্বারোহী চকিতে উঠিয়া পিছু ফিরিল, অমনি তরবারির অগ্রভাগ তাহার বুকে ঠেকিল। চিত্রক বলিল—'মরুসিংহ, অশুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলে। আমার সঙ্গে ফিরিতে হইবে।'

মরুসিংহের বুকে লৌহজালিক ছিল, সে এক লাফে পিছু হটিয়া সঙ্গে সঙ্গে তরবারি বাহির করিল। চিত্রকের অসি তাহার বুকে বিঁধিল না। তাহাকে আর একটু দূরে ঠেলিয়া দিল মাত্র।

তখন মলিন চন্দ্রালোকে দুইজনে অসিযুদ্ধ হইল।

যুদ্ধ শেষ হইলে চিত্রক মরুসিংহের বুকের উপর বসিয়া তাহার হস্তদ্বয় তাহারই উষ্ণীষ-বস্ত্র দিয়া বাঁধিল; তারপর তাহাকে দাঁড় করাইয়া উষ্ণীষ-বস্ত্র তাহার কটিতে জড়াইল; উষ্ণীষ-প্রান্ত বামহস্তে এবং তরবারি দক্ষিণহস্তে ধরিয়া বলিল—'এবার চল। হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে। তুমি আগে চল, আমি পিছনে থাকিব। পলায়নের চেষ্টা করিও না—'

মরুসিংহ এতক্ষণ একটি কথা বলে নাই, এখনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না।

তাহারা যখন তরুবাটিকায় ফিরিল তখন উষার আলোক ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু তখনও রাত্রির ঘোর কাটে নাই।

চিত্রকের রহস্যময় অন্তর্ধান ইতিমধ্যে লক্ষিত হইয়াছিল। ছাউনীতে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল; সকলে জাগিয়া উঠিয়াছিল। চিত্রক বন্দীসহ ফিরিতেই গুলিক ছুটিয়া আসিয়া বলিল—'একি, কোথায় গিয়াছিলে? এ কে?'

চিত্রক বলিল—'ইনি চষ্টনদুর্গের দুর্গপাল—মরুসিংহ। আগে ইহাকে শক্ত করিয়া গাছের কাণ্ডে বাঁধ। তারপর সব বলিতেছি।'

মরুসিংহকে গাছে বাঁধিয়া দুইজন রক্ষী খোলা তলোয়ার হাতে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন নিশ্চিন্ত হইয়া চিত্রক গুলিককে অন্তরালে লইয়া গিয়া রাত্রির সমস্ত ঘটনা বলিল।

শুনিয়া গুলিক বলিল—'তোমার অনুমানই সত্য। কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না; হূণটার মুখ হইতে প্রকৃত কথা জানিতে হইবে।'

চিত্রক বলিল—'উহার নিকট হইতে কথা বাহির করা শক্ত হইবে।'

গুলিক বলিল—'যদি সহজে না বলে তখন কথা বাহির করিবার অন্য পথ ধরিব।'

তখন সূর্যোদয় হইয়াছে। চিত্রক ও গুলিক গিয়া মরুসিংহকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। মরুসিংহ কিন্তু নীরব; একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিলনা।

ক্রমে বেলা বাড়িয়া চলিল। নিরামিষ প্রশ্নে ফল হইতেছে না দেখিয়া গুলিক লাঠ্যৌষধের প্রয়োগ করিল। কিন্তু মরুসিংহের মুখ খুলিল না। দৈহিক পীড়ন ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। প্রাণে না মারিয়া যতদূর নৃশংসতা প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা প্রযুক্ত হইল।

দ্বিপ্রহর হইল। তথাপি মরুসিংহের মুখের অর্গল খুলিল না দেখিয়া গুলিক বর্মা সহসা হুঙ্কার ছাড়িল—'হতবুদ্ধি হূণ যখন প্রশ্নের উত্তর দিবেনা তখন উহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া লাভ নাই। উহাকে ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলিব। তবু একটা হূণ কমিবে।'

ঘোড়া দিয়া চিরিয়া ফেলার প্রক্রিয়া অতি সহজ। যাহাকে চিরিয়া ফেলা হইবে তাহার দুই পায়ে দুইটি রজ্জুর প্রান্ত বাঁধিয়া রজ্জু দুটির অন্য প্রান্ত দুইটি ঘোড়ার সহিত বাঁধিয়া দিতে হইবে; তারপর ঘোড়া দুইটিকে এক সঙ্গে বিপরীত দিকে ছুটাইয়া দিতে হইবে—

মরুসিংহকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার গুল্‌ফে রজ্জু বাঁধা হইলে মরুসিংহ প্রথম কথা কহিল। বলিল—'প্রশ্নের উত্তর দিব।'

দুইজন রক্ষী মরুসিংহকে টানিয়া দাঁড় করাইল।

অতঃপর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন: গত রাত্রে চুপি চুপি কোথায় যাইতেছিলে?'

উত্তর: হূণ শিবিরে।

প্রশ্ন: হূণ শিবির কত দূর?

উত্তর: এখান হইতে ত্রিশ ক্রোশ বায়ুকোণে।

প্রশ্ন: পথ আছে?

উত্তর: গুপ্তপথ আছে।

প্রশ্ন: তুমি হূণদের পথ দেখাইয়া আনিতে যাইতেছিলে?

উত্তর: হাঁ।

প্রশ্ন: কে তোমাকে পাঠাইয়াছিল?

উত্তর: দুর্গাধিপ।

প্রশ্ন: তুমি নিজ ইচ্ছায় যাও নাই? প্রমাণ কি?

উত্তর: দুর্গাধিপের পত্র আছে।

প্রশ্ন: কোথায় পত্র?

উত্তর: আমার তরবারির কোষের মধ্যে।

মরুসিংহের কটি হইতে তখনও শূন্য কোষ ঝুলিতেছিল। কোষ ভাঙ্গিয়া তাহার নিম্ন প্রান্ত হইতে লিপি বাহির হইল। অগুরুত্বকের পত্র, তদুপরি ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত লিপি। লিপি পাঠ করিয়া মরুসিংহকে আর প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন হইল না। গুলিক বলিল—'বন্দীকে পানাহার দাও। কিন্তু বাঁধিয়া রাখ। উহার ব্যবস্থা পরে হইবে।'

তারপর চিত্রক ও গুলিক বিরলে গিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিল। মন্ত্রণার ফলে দুইজন অশ্বারোহী বার্তা লইয়া স্কন্দের স্কন্ধাবারের দিকে যাত্রা করিল। গুরুতর সংবাদ; অবিলম্বে সম্রাটের গোচর করা প্রয়োজন।

তারপর মন্ত্রণানুযায়ী, অপরাহ্ণের দিকে চিত্রক একাকী দুর্গতোরণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল—'দুর্গস্বামীর সাক্ষাৎ চাহি।'

আজ আর বিলম্ব হইল না। দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল; চিত্রক প্রবেশ করিল।

কিরাত নিজ ভবনে ছিল, হাসিয়া চিত্রককে সম্ভাষণ করিল—দূত মহাশয়, আপনি ফিরিয়া যাইবার জন্য নিশ্চয় বড় চঞ্চল হইয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ধর্মাদিত্যের অবস্থা পূর্ববৎ, কোনও উন্নতি হয় নাই। আপনাকে আরও দুই একদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

চিত্রক উত্তর দিলনা, স্থিরদৃষ্টিতে কিরাতের পানে চাহিয়া রহিল।

কিরাত পুনশ্চ বলিল—অবশ্য আপনারা যদি নিতান্তই থাকিতে না পারেন তাহা হইলে কল্য প্রাতে ফিরিয়া যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু যে কার্য করিতে আসিয়াছেন তাহার শেষ না দেখিয়া ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইবে কি? কিরাতের কণ্ঠস্বরে গোপন ব্যঙ্গের আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কিরাতের মুখের উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্রক বলিল—'আমরা ফিরিয়া না যাই ইহাই আপনার ইচ্ছা।'

'হাঁ—অবশ্য। সম্রাটের আদেশ—'

'কিন্তু তাহাতে আপনার কোনও লাভ হইবে না।'

'আমার লাভ—?' কিরাত প্রখর চক্ষে চাহিল।

চিত্রক শান্ত স্বরে বলিল—'আপনি আশা করিতেছেন

আপনার নিমন্ত্রণ লিপি পাইয়া হূণ সেনাপতি সসৈন্যে আসিয়া আমাদের হত্যা করিবে। কিন্তু তাহা হইবার নয়। মরুসিংহ ধরা পড়িয়াছে; যে অধম গুপ্তচর হূণদের পথ দেখাইয়া আনিতে পারিত, সে এখন আমাদের হাতে।'

কিরাত প্রস্তরমূর্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া চিত্রক আবার বলিতে লাগিল—'আপনার পত্র হইতে আপনার অভিপ্রায় সমস্তই ব্যক্ত হইয়াছে। আপনি শত্রুকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া প্রথমে নিজ দুর্গ এবং ধর্মাদিত্যকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে চান; তারপর হূণেরা যাহাতে সহজে বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়া সম্রাট স্কন্দগুপ্তের কণ্টকস্বরূপ হইতে পারে সে জন্য তাহাদের সাহায্য করিতেও উদ্যত আছেন। আপনি রাজদ্রোহী—দেশদ্রোহী। কিন্তু সম্রাট স্কন্দগুপ্ত ক্ষমাশীল পুরুষ। এখনও যদি আপনি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া রোট্ট ধর্মাদিত্যকে আমাদের হস্তে অর্পণ করেন তাহা হইলে সম্রাট হয় তো আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন।'

এতক্ষণে কিরাত আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের ন্যায় ফাটিয়া পড়িল। তাহার অগ্নিবর্ণ মুখে শিরা উপশিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; সে উন্মত্তবৎ গর্জন করিয়া বলিল—'রাজদ্রোহী! দেশদ্রোহী! মূর্খ দূত, তুমি কী বুঝিবে কেন আমি হূণকে ডাকিয়াছি! এ রাজ্য আমার—অধম ধর্মাদিত্য প্রবঞ্চনা করিয়া আমার পৈতৃক অধিকার অপহরণ করিয়াছে! আমি বিটঙ্ক রাজ্যের ন্যায্য রাজা—'

চিত্রক বলিয়া উঠিল—'তুমি ন্যায্য রাজা?'

বাধা অগ্রাহ্য করিয়া কিরাত ফেনায়িত মুখে বলিয়া চলিল—'তথাপি আমি ধৈর্য ধরিয়া ছিলাম, বিদ্রোহ করিয়া নিজ অধিকার সবলে গ্রহণ করিতে চাহি নাই। আমি শুধু চাহিয়াছিলাম, ধর্মাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়া উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসন লাভ করিব। তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইত না। কিন্তু নষ্টবুদ্ধি ধর্মাদিত্য এবং তাহার নষ্টবুদ্ধি কন্যা—'

চিত্রক বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল—বিটঙ্ক রাজ্য ন্যায়ত তোমার একথার অর্থ কি?'

'তাহা তুমি বুঝিবে না। হূণ হইলে বুঝিতে। আমার পিতা তুষ্‌ফাণ স্বহস্তে পূর্ববর্তী আর্য রাজার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়াছিলেন; সেই অধিকারে বিটঙ্ক রাজ্য আমার পিতার প্রাপ্য। হূণদের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে। কিন্তু চতুর ধর্মাদিত্য—'

'কি বলিলে? তোমার পিতা পূর্ববর্তী আর্য রাজাকে হত্যা করিয়াছিল? ধর্মাদিত্য হত্যা করে নাই?'

'না। এ কথা সকলে জানে। কিন্তু এ পৃথিবীতে সুবিচার নাই—'

চিত্রকের তিলক ত্রিলোচনের ললাট বহ্নির ন্যায় জ্বলিতেছিল। সে কিরাতের দিকে একপদ অগ্রসর হইল—

এই সময় বাহিরে উচ্চ গণ্ডগোল শুনা গেল। দুই তিনজন প্রাকার রক্ষী কক্ষের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। একজন রুদ্ধশ্বাসে বলিল—'দুর্গেশ, শত শত রণহস্তী লইয়া একদল সৈন্য দক্ষিণদিক হইতে আসিতেছে। বোধ হয় স্বয়ং স্কন্দগুপ্ত। একটি হস্তীর মাথায় শ্বেত ছত্র রহিয়াছে।'—

*　　*　　*　　*

স্কন্দগুপ্ত বলিলেন—'রট্টা যশোধরার নিকট পাশার বাজি হারিয়াছিলাম, তাই পণ রক্ষার জন্য আসিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি আসিয়া ভালই করিয়াছি।'

দুর্গের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে সভা বসিয়াছিল; স্কন্দের রণহস্তী দল চক্রাকারে সভাস্থল ঘিরিয়া ছিল। দুর্গ এখন স্কন্দের অধিকারে। কিরাত স্কন্দের বিরুদ্ধে দুর্গদ্বার রোধ করিতে সাহসী হয় নাই; প্রাণ বাঁচাইবার ক্ষীণ আশা লইয়া তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

এদিকে কপোতকূট হইতে চতুরানন ভট্ট অনুমান চারিশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রায় স্কন্দের সমকালেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জম্বুকও সঙ্গে আসিয়াছে।

স্কন্দ একটি প্রশস্ত বেদীর উপর বসিয়াছিলেন; পাশে ধর্মাদিত্য। ধর্মাদিত্যের দেহ শুষ্ক শীর্ণ, মুখে ক্লেশের চিহ্ন বিদ্যমান; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া মরণাপন্ন রোগী বলিয়া মনে হয়না। রট্টা যশোধরা তাঁহার জানু আলিঙ্গন করিয়া পদপ্রান্তে বসিয়াছিল। চিত্রক গুলিক ও আরও অনেক সেনামুখ্য সভার সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান ছিল। কিরাত কিছু দূরে একাকী বক্ষ বাহুবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ধর্মাদিত্য ভগ্নস্বরে বলিলেন—'আমার আর রাজ্যসুখে

স্পৃহা নাই। আমি সংঘের শরণ লইব। রাজাধিরাজ, আপনি আমার এই ক্ষুদ্র রাজ্য গ্রহণ করুন; আততায়ীর সন্ত্রাস হইতে প্রজাকে রক্ষা করুন।'

স্কন্দ বলিলেন—'তাহা করিতে পারি। কিন্তু আমি তো বিটঙ্ক রাজ্যে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিব না। একজন স্থানীয় সামন্ত প্রয়োজন, যে সিংহাসনে বসিয়া প্রজা শাসন করিবে। এমন কে আছে?'

ধর্মাদিত্য বলিলেন—'আমার একমাত্র কন্যা আছে—এই রট্টা যশোধরা।' বলিয়া রট্টার মস্তকে হস্ত রাখিলেন।

স্কন্দ বলিলেন—'রট্টা আপনার কুমারী কন্যা। যদি আপনার জামাতা থাকিত সে আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন করিতে পারিত, কাহারও ক্ষোভের কারণ হইত না। কিন্তু অনধিকারী ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইলে রাজ্যে অশান্তি ঘটিবার সম্ভাবনা; বর্তমান অবস্থায় তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্মাদিত্য, আপনি আরও কিছুকাল রাজদণ্ড ধারণ করিয়া থাকুন। তারপর—'

ধর্মাদিত্য সবিনয়ে যুক্তকরে বলিলেন—'আমাকে ক্ষমা করুন। সংসারে আমার নির্বেদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনার রাজ্য আপনি যাহাকে ইচ্ছা দান করুন; আমার কন্যার জন্যও আর আমি অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না। রট্টা আপনার স্নেহ পাইয়াছে, সে আপনারই কন্যা। আপনি প্রজার কল্যাণে যেরূপ ইচ্ছা করুন।'

সভা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; তারপর রট্টা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার চিত্রকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিল; তারপর স্কন্দের দিকে ফিরিল। বলিল—'আয়ুষ্মন্, রাজ্যের ন্যায্য অধিকারীর যদি অভাব ঘটিয়া থাকে আমি একজন ন্যায্য অধিকারীর সন্ধান দিতে পারি।'

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিল। রট্টা বলিল—'যে আর্য রাজাকে জয় করিয়া পিতা বিটঙ্ক রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন সেই আর্যরাজার বংশধর জীবিত আছেন—'

স্কন্দ বলিয়া উঠিলেন—'কে সে? কোথায় সে?'

উত্তর না দিয়া রট্টা ধীর পদে গিয়া চিত্রকের সম্মুখে দাঁড়াইল। চিত্রক অভিভূতভাবে স্খলিত স্বরে একবার 'রট্টা—!' বলিয়া নীরব হইল।

রট্টা চিত্রকের হাত ধরিয়া স্কন্দের সম্মুখে লইয়া আসিল, বলিল—'ইনিই সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী।'

স্কন্দ সবিস্ময়ে বলিলেন—'চিত্রক বর্মা—!'

রট্টা বলিল—'ইঁহার প্রকৃত নাম তিলক বর্মা।'

স্কন্দ বলিলেন—'তিলক বর্মা, তুমি ভূতপূর্ব আর্য রাজার পুত্র?'

চিত্রক বলিল—'হাঁ। পূর্বে জানিতাম না, সম্প্রতি জানিয়াছি।'

স্কন্দ প্রশ্ন করিলেন—'প্রমাণ আছে?'

চিত্রক বলিল—'যিনি আমার গোপন পরিচয় প্রকাশ করিয়াছেন তিনিই প্রমাণ দিবেন। আমার কোনও আগ্রহ নাই।'

রট্টা বলিল—'প্রমাণ আছে; প্রয়োজন হইলেই দিব। কিন্তু আর্য, প্রমাণের কি কোনও প্রয়োজন আছে?'

স্কন্দ তীক্ষ্ণ চক্ষে একবার রট্টার মুখ ও একবার চিত্রকের মুখ দেখিলেন। তাঁহার অধরে ঈষৎ ক্লিষ্ট হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন—'না, প্রয়োজন নাই। তিলক বর্মা, বিটঙ্কের সিংহাসন তোমাকে দিলাম।—রট্টা যশোধরা, বিটঙ্কের রাজমহিষী হইতে বোধকরি তোমার কোনও আপত্তি নাই?'

রট্টা অধোমুখী হইয়া আবার পিতার পদতলে বসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলে চিত্রাপিতবৎ এই দৃশ্য দেখিতেছিল, এখন হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

রোট্ট ধর্মাদিত্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চিত্রককে সম্বোধন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—'বৎস, যৌবনের প্রচণ্ডতায় যে হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম তজ্জন্য অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। বিটঙ্কের সিংহাসন তোমার, তুমি তাহা ভোগ কর। আর, আমার রট্টা যশোধরাকে গ্রহণ করিয়া আমাকে ঋণমুক্ত কর।

চিত্রক মস্তক অবনত করিয়া বলিল—আপনি স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করিলেন; আপনি মহানুভব।

কিন্তু অন্য একটি আদান প্রদান এখনও বাকি আছে।'

চিত্রক দ্রুতপদে কিরাতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; বলিল—আমার পরিচয় শুনিয়াছ। পিতৃঋণ শোধ করিতে প্রস্তুত আছ?

রক্তহীন মুখ তুলিয়া কিরাত বলিল—'আছি।'

চিত্রক বলিল—'তবে তরবারি লও। আমাকেও পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।'

পরিশিষ্ট

আবার কপোতকূট।

রাজপ্রাসাদ আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে বাদ্যোদ্যম। ঝল্লরী মুরলী মৃদঙ্গ বাজিতেছে; নগরীর পথে পথে নাগরিক নাগরিকার নৃত্যগীত আর ান্ত হইতেছে না। পুরাতন রাজপুত্র ও নূতন রাজ-মারীর বিবাহ। দুই রাজবংশ মিলিত হইয়াছে। রোট্ট র্মাদিত্য জামাতার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া চিল্লকূট বিহারে আশ্রয় লইবেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্ত বরবধূর জন্য ন্ধাবার হইতে পাঁচটি হস্তী উপহার পাঠাইয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক কিরাত মরিয়াছে।

সকলেই সুখী; সকলেই আনন্দমত্ত। এমন কি বৃদ্ধ ণ-যোদ্ধা মোঙের অধরে হাসি ফুটিয়াছে। প্রত্যেক দিরা-ভবনে নাগরিকেরা আনন্দ কোলাহল করিয়া াহাকে ডাকিতেছে এবং মদ্য পান করাইতেছে। াহার বহু শ্রুত গল্প শুনিয়া কেহই পলায়ন করিতেছে া, বরং উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছে, বলিতেছে,—'মোঙ্, ারপর কী হইল? তারপর কী হইল?' মোঙের রাভিষিক্ত মন আনন্দে টলমল করিতেছে। সে ক্রমাগত ল্প বলিয়া চলিয়াছে।

রাজপ্রাসাদে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। গভীর াত্রে একটি পুষ্পসুরভিত কক্ষে চিত্রক রট্টা আর সুগোপা ল।

চিত্রক বলিল—'সুগোপা, তুমি আমার সহিত বিশ্বাস-তকতা করিয়াছ।'

সুগোপা চটুলকণ্ঠে বলিল—'বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে াঁকে পাইতেন কি?

পুষ্পাভরণভূষিতা রট্টার হাতে একটি রৌপ্যনির্মিত া * ছিল; কন্যাকে বিবাহকালে ইহা ধারণ করিতে । সেই বাণ দিয়া সুগোপার ঊরুর উপর মৃদু আঘাত করিয়া রট্টা বলিল—'সুগোপা কি আমার কাছে কিছু গোপন করিতে পারে। পর দিনই প্রাতে আসিয়া আমাকে তোমার সকল পরিচয় দিয়াছিল।'

চিত্রক রট্টার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'রট্টা, আমার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিয়া তোমার কী মনে হইয়াছিল?'

রট্টার চক্ষুদুটি ক্ষণকাল তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া রহিল; তারপর সে বলিল—'সেদিন সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোয় প্রাকারের উপর তোমার সহিত দেখা হইয়াছিল, মনে আছে? তোমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, তোমাকে প্রতিহিংসা লইবার সুযোগ দিব, নচেৎ তোমার হৃদয় জয় করিব। কিন্তু তুমি প্রতিহিংসা লইলে না। তাই তোমার হৃদয় জয় করিলাম; আর তোমাকে ভালবাসিলাম।'

রট্টা চিত্রকের প্রতি বিদ্যুদ্বিলাস তুল্য কটাক্ষ হানিল, তারপর সুগোপার কানে কানে বলিল—'সুগোপা, তুই এখন গৃহে যা—রাত্রি শেষ হইতে চলিল। আজিকার রাত্রে মালাকরকে আর বঞ্চিত করিস না।'

সুগোপাও চুপিচুপি বলিল—'বল না, নিজের মালাকর পাইয়াছ তাই আমাকে বিদায় করিতে চাও। আর বুঝি তর্ সহিতেছে না?' সুগোপা ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল।

তারপর সুখ স্বপ্নের ন্যায় ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

ওদিকে হূণের সহিত স্কন্দগুপ্তের যুদ্ধ চলিতেছে। হূণ কখনও হটিয়া যাইতেছে, কখনও অতর্কিত পথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। বিটঙ্ক রাজ্যে এখনও হূণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। চষ্টন দুর্গে অধিষ্ঠিত হইয়া গুলিক বর্মা সহস্র চক্ষু হইয়া সঙ্কট পথ পাহারা দিতেছে।

চিত্রক নিজ রাজ্যে এক সৈন্য দল গঠিত করিয়াছে। তিন সহস্র সৈন্য কপোতকূট রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে।

একদিন সূর্যাস্তের সময় প্রাসাদ শীর্ষে উঠিয়া রট্টা দেখিল, চিত্রক স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পশ্চিম দিগন্তের পানে তাকাইয়া আছে।

* আধুনিক কাজললতা।

রট্টা কাছে গিয়া তাহার বাহু জড়াইয়া দাঁড়াইল। 'কি দেখিতেছ ?'

চমক ভাঙিয়া চিত্রক বলিল—'কিছু না। সূর্যাস্তের বর্ণগৌরব কী অপূর্ব; মেঘ পাহাড় ও আকাশ একাকার হইয়া গিয়াছে—যেন রক্ত বর্ণ রণক্ষেত্র।'

রট্টা কিছুক্ষণ চিত্রকের মুখের উপর চক্ষু পাতিয়া রহিল, তারপর বলিল—'যুদ্ধে যাইবার জন্য তোমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে ?

ধরা পড়িয়া গিয়া চিত্রক একটু করুণ হাসিল। রট্টা তাহার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল—'যদি মন অধীর হইয়া থাকে, যুদ্ধে যাও না কেন ?'

চিত্রক চকিতে একবার তাহার পানে চাহিল, কিন্তু নীরব রহিল। রট্টা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'তোমার মনের কথা বুঝিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, হূণ আমার স্বজাতি, তাহাদের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ যাত্রা করিলে আমি দুঃখ পাইব। তোমার বোধ হয় বিশ্বাস, স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া পিতা রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন। সত্য কি না ?'

চিত্রক বলিল—'না, ধর্মাদিত্য অন্তর হইতে বুদ্ধ তথাগতের শরণ লইয়াছেন। কিন্তু তুমি রট্টা ? তোমার দেহে হূণ রক্ত আছে। আমি হূণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলে সত্যই কি তুমি দুঃখ পাইবে না ?'

রট্টা দৃঢ় স্বরে বলিল—'না। হূণ যেমন তোমার শত্রু তেমনই আমার শত্রু। আমার দেশ যে আক্রমণ করে, পরমাত্মীয় হইলেও সে আমার শত্রু। তোমার মন টানিয়াছে, তুমি যুদ্ধে যাও, স্কন্দগুপ্তের সহিত যোগদান কর।'

চিত্রক রট্টাকে বাহু বদ্ধ করিয়া বলিল—'রট্টা, ভাবিয়াছিলাম আমার রাজ্য যতদিন আক্রান্ত না হইবে ততদিন নিরপেক্ষ থাকিব। কিন্তু তবু হৃদয় অধীর হইয়াছিল। তুমি আমার মনের কথা কি করিয়া জানিলে ?'

'আমি অন্তর্যামিনী তাহা এখনও বুঝিতে পারো নাই ?' রট্টা হাসিল।

উৎসাহ ভরে চিত্রক বলিল—'তবে যাই ? আমি এক সহস্র সৈন্য লইয়া যাইব, বাকি দুই সহস্র পুরী রক্ষার জন্য থাকিবে।'

রট্টা বলিল—'তুমি রাজা, তোমার যাহা ইচ্ছা কর। কিন্তু তোমার অনুপস্থিতিতে রাজ্য দেখিবে কে ?'

চিত্রক বলিল—'তুমি দেখিবে। চতুর ভট্ট দেখিবেন।

রট্টা অনেকক্ষণ স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। চোখ দুটি ছল ছল করিতে লাগিল। শেষে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিল—'তুমি যখন যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিবে, একটি নূতন মানুষ পুরদ্বারে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাইবে।' বলিয়া স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

সমাপ্ত

শ্রীশঙ্করদেব

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

উত্তর পূরব প্রান্তে দিক্ ভ্রান্তে কে দেখাল পথ
প্রেমের হরিরে হেরি ভক্তিভরে নব বিষ্ণু মত
লয়ে এল ব্রহ্মপুত্র পারে ?
উচ্ছ্বসিত ভক্তিসনে মুক্তি বাণী ধ্বনিল ঝঙ্কারে।
কে আনিল গিরি দরী নদী তীর প্রান্তর প্লাবিয়া
চির সুন্দরের রস, অমৃত সে মৃত্যুরে মথিয়া
শুনাইল অমৃতের বাণী
ললিত কীর্ত্তন ঘোষে কৃষ্ণ নাম মহিমা বাখানি' ?
অসম সমাজ মাঝে বৈষম্যেরে কে করিল দূর ?
অস্পৃশ্যেরে কোলে তুলি রচি নব মানবতা সুর
জাগাইল জীবনের গান,
জনজাতি অসমীয়া সমভাবে করিল আহ্বান ?
পরম আত্মার সাথে চরম মুহূর্ত্ত মাঝে কেবা
বিহারের পথ দিল মনোরথ পূর্ণ করি' সেবা—
কারে সবে করিল বরণ,
লক্ষ দুঃখী জনে দিল বরাভয় সম্পূর্ণ শরণ ?
চারিধারে হাহাকারে বিপর্য্যয়ে প্রবল বন্যায়
সিন্ধু হ'তে গঙ্গাতীরে হিন্দু' ত্রস্ত হরিণের ন্যায় ;
ধর্ম মাঝে সেই দাবানলে
শ্রীশঙ্কর বিতরিল শান্তি বারি কৃষ্ণ প্রেম বলে।

কচ ও দেবযানী

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

অমররাজ্য হ'তে মর্ত্তে নেমে এলেন বৃহস্পতিপুত্র কচ। করস্পর্শে ন্দ্রজাল, কণ্ঠে তাঁর বেদধ্বনি, হৃদয়ে প্রেমের অমৃত-নির্ঝর। সুরলোকের বশুদ্ধ কল্পনায় বোধ হয় বৈচিত্র্য ছিল না, তাই তিনি নেমে এসেছিলেন লোকে জড়ের সেবায় জীবনকে ধন্য করতে। ইচ্ছা তাঁর মৃতসঞ্জীবন ন্ত্রশিক্ষা। সে মন্ত্রের ঋষি দৈত্যগুরু শুক্র। সেই জন্যই ত তাঁকে াসতে হল পৃথিবীতে। কিন্তু তাঁর হাতে যে ইন্দ্রজাল ছিল, তাতে বদ্ধ লেন শুক্র কন্যা দেবযানী। দেবযানী তাঁর সর্ব্বস্ব তুলে দিয়েছিলেন চের হাতে। তাঁর ধীরসঞ্চারিণী দৃষ্টি, গোবৃষবাঞ্ছিতা গতি, স্মিতপূর্ব্ব ালাপ যে বিলাসের সৃষ্টি করেছিল, তাকে উত্তেজিত করলেন কচ। ামৃতের দেশের মনোমোহিনী কাহিনী কচের মুখে একটি একটি ক'রে ুনে দেবযানী নিজেকে মনে করলেন ধন্যা। তাঁর মনে হল অমৃতের দেশে বুঝি দৃষ্টিতে কেবলই অমৃত, মুখে সামগীতি, করস্পর্শে ইন্দ্রজাল। চের রাগারুণ দৃষ্টিতে যে অমৃতের উৎস উঠেছিল তাতে ভেসে গেল দবযানীর সুদৃঢ় সংযম, তাঁর মুখের সামগান স্বপ্নরাজ্যের সুষমা সৃষ্টি রল, তাঁর করস্পর্শের ইন্দ্রজাল এমনি মুগ্ধ করল দেবযানীকে যে তিনি াজেকে লুটিয়ে দিলেন কচের পদপ্রান্তে। তখন কি তিনি ভেবেছিলেন ঠ নায়কের মত কচ, কত হাস্য, কত লাস্য, কতই করুণা ছড়িয়ে মুগ্ধা ায়িকার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্ন ক'রে আবার ফিরে যাবেন সেই স্বপ্ন রাজ্যে? খন কি বুঝেছিলেন মর্মোদ্যানের সরস ক্ষেত্রে তিনি যে বিচিত্র পুষ্পতরু াপণ করেছিলেন, নিষেকের অভাবে সেগুলি শুষ্ক ও নির্জীব হ'য়ে ড়বে? তখন কি তাঁর মনের কোণে স্থান পেয়েছিল, বেণুমতী হৃদয়ে লগীতির সঙ্গে বসন্তহিল্লোলের যে সুখস্পর্শ জেগে উঠেছিল, তা এমনি রে হাহাকারের সঙ্গে একটা দাহকের তাপের সৃষ্টি করবে তাঁর হৃদয়ে? তদিন বেণুমতী তীরে বসে দুই বন্ধুতে মিলে তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্র ল্পনার তুলিতে এঁকেছিলেন! কতদিন কচ স্বহস্ত রচিত পুষ্পমাল্য বযানীর দেবকণ্ঠে পরিয়ে দিয়েছিলেন, কতবার দেবযানী দৈত্যপুরে াতাস্ত অসহায় কচের জীবন দানবকবল হ'তে রক্ষা করে আপনাকে ন্যা মনে করেছিলেল! সে কল্পনা তখন এনেছিল অমররাজ্যের সুধা, মাল্যে ছিল কচের করস্পর্শের স্বর্গ সুষমা, সে রক্ষায় জেগে উঠেছিল দ্বল হৃদয়ের আত্মভোলা প্রেম। এই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন ক'রে কচ স গেলেন স্বর্গরাজ্যে। তখন যে অশ্রুর উৎস ঝরেছিল দেবযানীর রহবিধুর দৃষ্টি হ'তে, সে উৎস এখনও শুকায়নি, বেণুমতীর কুটিল াতের মধ্যে লুকোচুরি খেলছে। তখন যে বিরহতাপ দগ্ধ করেছিল বযানীর উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রকে, তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে জগতে কত ভূমি। তখন যে করুণ ক্রন্দন নির্গত হয়েছিল দেবযানীর বিরহকাতর কণ্ঠ হতে, সে ক্রন্দন এখনও জেগে রয়েছে বৈষ্ণবগণের করুণ মাথুর সঙ্গীতে।

কচ ও দেবযানীর উপাখ্যান আমরা যুগ যুগ ধরে শুনে আসছি। কত ঘটনার আবর্ত্তন চেষ্টা করেছে এই কাহিনীকে ডুবিয়ে দিতে, কত কঠোর সমালোচকের আবিললেখনী একে কলুষিত করতে চেয়েছে, কত ঐতিহাসিকের জড় সমালোচনা এই উপাখ্যানের কল্পনা কিশলয়গুলিকে একটি একটা করে ছিন্ন করে একে দণ্ডসার করেছে! কিন্তু তবু কি তাদের ইচ্ছা ফলবতী হয়েছে? কচ ও দেবযানীর করুণ কাহিনী চির যুগ ধ'রে আমাদের চোখের সামনে ভেসে রয়েছে। এই উপাখ্যান ডুবতে পারে না, এর মৃত্যু নেই। বাহিরের অভিব্যক্তি পাছে মুছে যায়, তাই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গে এদের কাহিনী জড়িত রয়েছে।

আদি যুগ থেকে চলে আসছে দেবাসুরের যুদ্ধ। আমাদের মনের সাত্ত্বিক ভাবগুলিই ত দেব, অসুর রজো ভাবের ভাব। এই দেবাসুরের যুদ্ধ অর্থাৎ সত্ত্বভাব ও রজোভাবের সংগ্রাম একটা চিরন্তনী কাহিনী। এ কাহিনী কখনও লুপ্ত হবে না, অনন্তকাল চলবে এই বিগ্রহ। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধিতে আমাদের মনে জেগে উঠে দয়া, অহিংসা, ক্ষমা, ধৃতি, তপস্যা প্রভৃতি দেবতা। পারুষ্য, হিংসা, ক্রোধ, অধৈর্য্য, লোভ প্রভৃতি অসুরগণ রজোগুণের সৃষ্টি।

আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে নিত্য যে সত্ত্বভাব ও রাজসিক ভাবের যুদ্ধ চলেছে, তাতে কতবারই পরাজিত হয় সত্ত্ব। অমর সত্ত্বের মৃত্যু হয় না, কিন্তু তার হস্তপদাদি ভগ্ন হয়। সে বিকৃত দেহে দাসত্ব করে রাজসিক ভাবের কাছে। পারুষ্যের নিকটে দয়া পরাজিত হয়, হিংসার কাছে অহিংসা মাথা নোয়ায়, ক্রোধ ক্ষমাকে তাড়িয়ে দেয়; ধৃতি বদ্ধ হয় অধৈর্য্যের দ্বারে, লোভের কাছ থেকে তপস্যা সরে যায়। সংঘাতের ফলে সত্ত্বরূপ দেবগণের কেহ কেহ বিকৃতাঙ্গ হয়। তারা মরে না; কিন্তু অকর্মণ্য হয়। এই অকর্মণ্যতাও একপ্রকার মৃত্যু। এই মৃত্যু থেকে তাদের উজ্জীবিত করবার জন্য সেই আদি যুগে প্রয়োজন হ'য়েছিল মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের। শুক্রের অধিকারে আছে এই মন্ত্র। জীবের শরীরে শুক্রশোণিতাদি যে সপ্তরস আছে তন্মধ্যে প্রধান শুক্র। শুক্র ধারণে জীবন, তার অভাবেই মৃত্যু। শরীরের এই শুক্রধাতু পুরাণকারের মতে ঋষি শুক্রাচার্য্য। শুক্রবৃদ্ধিতে আসুরিক শক্তির বৃদ্ধি, তাই শুক্র অসুরের গুরু। দীর্ঘরোগে কিম্বা কু-চিন্তায় শরীরের যে ক্ষয় হয় তার পরিপূরণ করে শুক্রধাতু। মৃত অর্থাৎ শক্তিহীন দেহ ও ইন্দ্রিয়গণের সঞ্জীবন সাধন করে বলেই শুক্র মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের গুরু। পুরাণ-বর্ণিতা দেবযানী শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ভাবরাজ্যের দেবযানী জীবের রাজসিক প্রকৃতি।

রজঃ প্রকৃতির জন্ম দেহের শুক্রধাতু হতে। শুক্রধাতু যতই বৃদ্ধি পায়, রজঃ প্রকৃতিও ততই সৃষ্টি করে চাঞ্চল্যের। তাই পুরাণকারের মতে দেবযানীর হৃদয়ে কামনার চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল কচের সঙ্গে প্রথম মিলন কালে। ব্রাহ্মণ কন্যার ধৃতি তাঁতে ছিল না। এই চাঞ্চল্যই দেবযানীর নামের সার্থকতা সম্পাদন করেছে। দেবের যান অর্থাৎ সত্ত্বগুণের গমনের শকটকে দেবযান বলে। স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈপ্' প্রত্যয়যোগে দেবযানী পদের সিদ্ধি। প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা বলে দেবযানী এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সত্ত্বগুণের গমনের শকট অর্থে বুঝ্‌তে হ'বে সত্ত্বগুণের তিরোধানের হেতু। শকট যেরূপে আরোহিগণকে স্থানান্তরে নিয়ে যায়, রজোগুণও সেইরূপ সত্ত্বগুণকে বিদূরিত করে। যা ধাতুর অর্থ গমন। যা ধাতুর উত্তর কারণবাচ্যে অনট্ প্রত্যয়যোগে যান শব্দের ব্যুৎপত্তি। পুরাণের কচ আমাদের শরীরে বুদ্ধিতত্ত্ব। কচ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে অচ্ প্রত্যয়যোগে কচশব্দের সৃষ্টি। কচ্ ধাতুর অর্থ দীপ্তি। যে দীপ্ত করে অর্থাৎ জগৎকে প্রকাশ করে তার নাম কচ। এই কচ অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বের অবস্থান মুখমণ্ডলে। মুখরন্ধ্রেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। কে না জানে যে চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ও কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পঞ্চ বিষয় জীবের প্রত্যক্ষ গোচর হয়? মস্তিষ্ক, কচের জনক বৃহস্পতির ক্ষেত্র। বৃহস্পতি অর্থাৎ বৃহৎপতি জীবের ভূমা চৈতন্য বা বিবেক ভিন্ন কিছুই নয়। যিনি দেহেন্দ্রিয়াদি সকলের উপরে আধিপত্য করেন তিনি আমাদের বিবেক বা পরমাত্মা। তার ক্ষেত্র মস্তিষ্ক বা ব্রহ্মরন্ধ্র। এই বিবেকেরই পুরাণকার নাম দিয়েছেন বৃহস্পতি। বুদ্ধি বা জৈবপ্রমা উৎপন্ন হয় বিবেক বা ঈশ্বর চৈতন্য হতে। জৈবপ্রমা যদি কচ হয় তবে তাঁর জনক হবেন ঈশ্বর চৈতন্য বা বৃহস্পতি। এই বুদ্ধি বা কচকে নামতে হয়েছিল শুক্র ক্ষেত্র ভূলোকে বা কোষ মধ্যে। কোষ মধ্যেই জীবের শুক্র ধাতু সঞ্চিত থাকে এবং এই কোষেরই নামান্তর ভূলোক।

শুদ্ধ কল্পনায় জীবের মন সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তাকে ভোগমার্গে নামতে হয়। ইন্দ্রিয় প্রণালীগুলিই ভোগমার্গ। এই ইন্দ্রিয় প্রণালী দিয়ে যে বিষয় রস অন্তরে প্রবেশ করে, মন তাহা গ্রহণ করবার সময়ে তদাকারে পরিণত হয়। তখন জীব বা প্রমা চেতন্য মনের সঙ্গে তাদাত্ম্যবোধে চিন্তা করে—আমি এই বিষয় রস ভোগ করছি। ভোগ সাত্ত্বিক হলেও, জীবের সাত্ত্বিক ভাবগুলি রাজসিক ভাবসমূহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্রমশঃ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তখনি ইন্দ্রিয় বৈকল্য ও শরীরের শীর্ণতা ঘটে। এই বৈকল্য ও শীর্ণতা দূর করবার জন্য আবশ্যক হয় শুক্র-বৃদ্ধি বা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র। এই সাত্ত্বিক ও রাজসিক ভাবগণের পরস্পর যুদ্ধের নাম দেবাসুরের যুদ্ধ। অন্তর্জগতের এই দেবাসুর সংগ্রামে বলবান্ রাজরূপী অসুরের নিকটে যখন সত্ত্বরূপ দেবের পরাভব হয়, তখন কাম-ক্রোধাদির আবির্ভাবে হৃদয় হ'তে চলে যায় বৈরাগ্য, ক্ষমা, শান্তি প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। তখন স্বেচ্ছাচারের ফলে জীব মনে ও দেহে শীর্ণ হ'য়ে পড়ে। সেই সময়ে বুদ্ধিরূপ কচ বিবেকরূপ বৃহস্পতির আদেশে শুক্রের কাছে চলে যান মৃতসঞ্জীবনের সন্ধানে। পথে পড়ে রজঃ প্রকৃতিরূপিণী দেবযানীর বৈচিত্র্যময় মনোরম উদ্যান। রাজসিকী প্রকৃতি মণিপুরচক্রে বসে আছেন স্বহস্তরোপিত কামনাকুসুমলতা মধ্যে। মণিপুর চক্রের সংশয় তুহিন কামনার কোমল লতাগুলিকে বর্দ্ধিত হ'তে দিচ্ছে না। তাই'ত বুদ্ধি কচকে যেতে হল রাজসিকী দেবযানীর কুসুমোদ্যানে। বুদ্ধির জ্যোতিঃ সংশয় তুহিন অপসারিত করল, দেবযানীর কামনাকুসুমগুলি একে একে প্রস্ফুটিত হ'ল, তাদের সৌরভ দিঙমণ্ডল আমোদিত করল। কিন্তু ভোগ করবে কে? বুদ্ধি কচ জড় শুক্রের মন্ত্র লাভ করে রজঃ প্রকৃতি দেবযানীকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেলেন আবার সেই জ্যোতির রাজ্যে। শুক্রের মৃতসঞ্জীবনে শরীর পুষ্ট হ'লে মনের সাত্ত্বিক ভাবগুলিও পূর্ণতালাভ করবে এই আশাতেই বুদ্ধি কচ জড়ের সংসর্গে এসেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি চিরকাল জড়ের সেবা করতে চায় না। তাই কচ ফিরে গেলেন বৃহস্পতির কাছে। দেবযানীর উদ্দেশ্য সফল হ'ল না, তার কুসুমের ভোক্তা মিলেও তাকে বঞ্চিত করলেন। তাই তাঁর বিরহ-বিধুর নয়নের অশ্রু শুকাল না, প্রবলবেগে নিম্নক্ষেত্রে নেমে তরঙ্গিনীর সৃষ্টি করল। তার তরঙ্গ এমনি আঘাত করল তীরস্থিত বুদ্ধি কচকে যে তার বক্ষঃস্থিত সযত্ন-রক্ষিত মৃত সঞ্জীবন সুধা পড়ে গেল। কিন্তু তাঁর হৃদয় তখন অমৃতময় হয়ে গেছে; তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল সত্ত্বরূপী দেবগণের। রজঃ প্রকৃতি-রূপা দেবযানীর নয়নাসার যে তরঙ্গিণীর সৃষ্টি করেছিল, সে তরঙ্গিণী করুণ উচ্ছ্বাসে নিম্নক্ষেত্রের উপর দিয়ে বলে গেল। সে নিম্নক্ষেত্রের বর্ণনা আর একদিন করব।

সাম্যের জয় হ'ক, সখ্যের জয় হ'ক, শান্তির জয় হ'ক।

ভারতে ইংরেজের তাম্রকূট সেবা

অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী

১৫৯৬ সাল, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক। সম্রাট আকবরের দরবার।

দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগর বিজয় সুসম্পন্ন। বিজাপুরের আমীর আসাদ বেগের প্রবেশ; সঙ্গে সম্রাটের জন্য নানা উপহার-মনোহর মূল্যবান। স্বয়ং আমীর আসাদ বেগের হস্তে এক অভিনব সামগ্রী—এক গুচ্ছ লতাগুল্ম-সুগন্ধি; অন্য হস্তে একটি পাত্র ও একটি সুদীর্ঘ নল—মণিমুক্তা-খচিত, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত. কৌতূহলী সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন—"বস্তুটি কি?" আমীর সস্মিতমুখে উত্তর দিলেন—"তাম্রকূট ও হুকা।"

তার পর আমীর সসম্মানে তাম্রকূটের মাহাত্ম্য সম্রাটের সম্মুখে নিবেদন করিলেন, সেবনের নিয়ম বর্ণনা করিলেন। সম্রাট উপহার গ্রহণ করিয়া আমীরকে কৃতার্থ করিলেন। সম্রাট আকবর তাম্রকূট সেবন করেন নাই; কিন্তু বহু আমীর এই নূতন সামগ্রী সানন্দে গ্রহণ করিলেন। এই হইল দিল্লীতে তাম্রকূট প্রচলনের ইতিহাস।

কোরাণের নিষেধ সত্ত্বেও সম্রাট জাহাঙ্গীরের তরল জিনিষের উপর প্রবল আসক্তি ছিল, কিন্তু তাম্রকূট ব্যাপারে তাহার কোরাণ-প্রীতি প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাম্রকূট নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাম্রকূট নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রসিদ্ধ দরবারী তাম্রকূট-আসক্ত ইংরেজ-পাদ্রী টেরী (Terry) জাহাঙ্গীরের রাজসভার বর্ণনা করিলেন—

"হিন্দুস্থানের মানুষ একপ্রকার মৃৎপাত্র ব্যবহার করে—ক্ষীণ কটি, উদর জলপূর্ণ, মস্তকে গোলাকৃতি আবরণ; মস্তকের উপরে ন্যস্ত আধারে (কলিকা) প্রজ্বলিত অঙ্গার খণ্ড। একটি নল দ্বারা পাত্রটি মানুষের মুখ সংলগ্ন, অনবরত মানুষ মৃৎপাত্রটিতে ধূম উদ্গীরণ করিতেছে।"

সমসাময়িক রসিক পারসী কবি তাম্রকূটের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন:—মানুষ হুক্কার মতন অন্য কোন আনন্দদায়ক সহচর আবিষ্কার করে নাই—সে মানুষ পথশ্রান্ত পথিকই হউক অথবা নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী হউক। হুকা আমার পরম বন্ধু, আমি আমার বন্ধুর নিকট আমার জীবনের গোপনতম রহস্য গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত; অনেক সময় আমি হুক্কার সঙ্গে গভীর আলোচনা ও জটিল পরামর্শ করি; হুকা আমার অন্তঃপুরে শয়ন গৃহের শোভা বর্ধন করে, অভ্যর্থনা-গৃহে আমার অতিথিকে আপ্যায়ন করে, আগন্তুককে অভ্যর্থনা করে। হুকা মানুষের দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়, হুকা নিঃসৃত সুগন্ধ গোলাপের নিশ্বাসকেও তুচ্ছ করে, হুক্কার সশব্দ সঙ্গীতে বুলবুলের কণ্ঠস্বরকেও লজ্জা দেয়। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে হুক্কায় নিঃসৃত ধূমরাশি জীবনী শক্তিকে দীর্ঘতর করিয়া তোলে; মুখ-নিঃসৃত ধূম্রজাল নয়নকে আনন্দ-লোকের আভাস দিয়া চরিতার্থ করে, হুকা মানুষের অপরূপ আবিষ্কার।"

সম্রান্ত মুঘলদের অপরূপ শিল্প-বিলাস ছিল। ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনীয় জিনিসকে তাহারা সুন্দর রুচিসম্পন্ন করিয়া ব্যবহার করিত। যখন মুঘল অভিজাতদের মধ্যে তাম্রকূট-প্রচলিত হইল, তখন তাহারা তাম্রকূট সংক্রান্ত প্রত্যেকটী জিনিসের এক নূতন প্রসাধন আরম্ভ করিল। শুষ্ক তাম্রকূট পত্রের সঙ্গে কদলী, ইক্ষু রস, দারুচিনি এবং কস্তুরী মিশ্রিত করিয়া সুগন্ধী করা হইত। পাত্রটী গোলাপ জল পূর্ণ করা হইত। হুক্কার স্কন্ধকে স্বর্ণ রৌপ্য লতা খচিত করা হইত। নলটি সম্পূর্ণ মকমল দিয়া জড়ান হইত। মকমলের উপর মুক্তাখচিত রৌপ্য জরির সূচিক্কণ কাজ থাকিত। নলের মুখ গজদন্তনির্ম্মিত। নলটির দৈর্ঘ্য এক হইতে দশ হস্ত পর্যন্ত দীর্ঘ। নলের সম্পূর্ণ রূপটি দৃষ্টিগোচর থাকা চাই, অথচ যেন ব্যবহারে অপরিষ্কার না হয়। সুতরাং নলটিকে অতি সূক্ষ্ম কালিকো বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইত। প্রতিদিন নলটি জলধারা নিঃসৃত করিয়া পরিষ্কার করা হইত, নচেৎ কস্তুরী গন্ধ সম্পূর্ণ উপভোগ করা যাইত না। অঙ্গার খণ্ড, চন্দন কাষ্ঠচূর্ণ, গুগগুল্, সুগন্ধি তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত

থাকিত। অঙ্গার-আধার কলিকাটি মৃত্তিকা নির্মিত হইলেও উহাতে কুম্ভকারের নিপুণ হস্তের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিত। কলিকার উপরের আবরণটি মোরাদাবাদী, বেনারসী, ঢাকাই রৌপ্য-শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইত। হুক্কার আসনের জন্য একখণ্ড মূল্যবান্ মকমল সর্ব্বদা হুক্কা-বরদারের স্কন্ধে শোভা পাইত। হুক্কাটি ব্যবহারের সময় ঘন মকমল খণ্ডের উপর বসান থাকিত। সেই মকমল খণ্ড, কলিকার নির্ম্মাণ কৌশল ও শিল্পের উপর হুক্কার অধিকারীর আভিজাত্য নির্ভর করিত। হুক্কা-বরদার অতি বিচিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া হুক্কার সেবা করিত। হুক্কা-বরদারের পরিচ্ছদই প্রভুর মর্য্যাদা সূচনা করিত।

ইংরাজগণ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষে পদার্পণ করে। ভারতবর্ষের সমস্ত জিনিষকেই তাহারা কৌতূহলের চক্ষে দেখিত। ভারতবাসীর জীবনযাত্রার প্রতিটি জিনিসের প্রতি একটা ভীতির ভাব ছিল। অনেক ইংরেজ ভারতীয়-জল স্পর্শ করিত না, কারণ জলে ম্যালেরিয়ার বিষ আছে। তাহারা জলের পরিবর্ত্তে মদ্য পান করিত। তারপর ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজ প্রথম প্রথম অন্তরঙ্গভাবে মিশিতে পারে নাই, সুতরাং ভারতীয় জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচয়ও প্রত্যক্ষ ছিল না। বিশেষতঃ ইংরেজ জাতি অত্যন্ত রক্ষণশীল, সহজে কোন জিনিস গ্রহণও করে না, বর্জ্জনও করে না। কখনো কখনো মুঘল আমীর ওমরাহদের দরবারে অথবা সঙ্গীতের আসরে হুক্কা, গড়গড়া, মুক্তাখচিত নল, মকমলের আস্তরণ তাহারা দেখিয়া বিস্মিত হইত, সুমিষ্ট ধূম্রগন্ধ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হইত, কিন্তু সাহস করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে ভয় পাইত। কালক্রমে প্রায় ১৫০ বৎসর পরে এই তাম্রকূট ভীতি দূরীভূত হইল। ইংরেজ হুক্কাদেবীকে অবহেলার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিল। প্রায় ১৫০ বৎসর পরে ১৭৫৯ সালে হুগলী কুঠীর আয় ব্যয়ের হিসাবে প্রথম হুক্কা-বরদারের নিযুক্তি ও বেতন নির্দ্ধারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৬০ সালে প্রায় প্রত্যেক কুঠীতে হুক্কার জন্য একটা স্বতন্ত্র ব্যয় নির্দ্ধারিত হইল।

১৭৭০ সালে চিনসুরা (হুগলীর)-গবর্ণর ভেরেলেষ্ট এক ভোজ উৎসবে প্রকাশ্যভাবে গড়গড়ার অবতারণা করেন। সেদিন তাম্রকূট ইংরেজ সমাজে পাংক্তেয় পরিগণিত হইল।

১৭৭৪ সালে "এশিয়াটিকাস" (Asiaticus) পত্রে উল্লেখ করা ছিল—"২০০ পাউণ্ড বেতনভোগী ইংরাজ মাত্রই একজন হুক্কা-বরদার নিযুক্ত করে।"

হুক্কা-বরদার শব্দটি ইংরেজগণ মুঘলদের নিকট হইতে অবিকৃত ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মুঘলদের অনুকরণে হুক্কা-বরদারের পোষাক, পরিচ্ছদ ও বেতন নির্দ্ধারিত হইল এবং হুক্কা ভারতে ইংরেজদের জীবন যাত্রার অঙ্গরূপে অধিষ্ঠিত হইল।

১৭৭৯ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংসের অনুকরণে প্রত্যেক ভোজসভায় হুক্কা অপরিহার্য বলিয়া সম্মানিত হইল। প্রভাতে প্রাতরাশ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হুক্কা ইংরাজের সহচরের স্থান গ্রহণ করিল। মাকিনটস (Mackintosh) সাহেবের সমসাময়িক বর্ণনায় দেখা যায়ঃ—

"প্রভাতে নাপিত কেশ কর্ত্তন করিতেছে, ইংরেজ প্রভু হুক্কা সেবা করিতেছেন; প্রাতরাশের টেবিলে খানসামা খাদ্য পরিবেশন করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে হুক্কা-বরদারের গড়গড়া-হস্তে প্রবেশ। খাদ্য শেষ না হইতে গড়াগড়ার শব্দে ভোজন-কক্ষ মুখরিত হইতে আরম্ভ হইল, ধূম্রগন্ধে কক্ষ আমোদিত হইয়া উঠিল। রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে মহিলার উপস্থিতি সত্ত্বেও হুক্কা-বরদারের প্রবেশ নিষেধ ছিল না। সেকালে শ্বেতাঙ্গিনী ইংরেজ-মহিলা কৃষ্ণকায় ভারতীয় হুক্কা-বরদার দর্শনে শঙ্কিত শিহরিত হইত না।"

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের একটি নিমন্ত্রণ পত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে লিখিয়াছেন ঃ—

"নিমন্ত্রিত অতিথিকে অনুরোধ করা হইতেছে, তাহারা কোন হুক্কা সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন না।

এই নিষেধ হুক্কা-বরদারের প্রতি প্রযোজ্য নহে।"

১৭৮৪ সালে হার্টলি হাউস (Hartly House) এর লেখিকার বিবরণে দেখা যায়—"একজন ইংরেজ মহিলা তাহার সঙ্গিনীর কেশ প্রসাধন করিতেছেন; তিনি স্বয়ং অতীব কারুকার্য্য-শোভিত হুক্কা দেবীর আরাধনা করিতেছেন।"

১৭৮৯ সালে দ্য গ্রাণ্ডপ্রা (de Grandpre) লিখিয়াছেন ঃ—"ভোজন উৎসবে খাদ্য পরিবেশন আরম্ভ হইলেই প্রত্যেকের জন্য একটি গড়গড়ার আবির্ভাব হয়;

মস্তকে প্রজলিত অঙ্গারগণ্ড। কখনো কখনো এক একটি হুক্কা একাধিক লোক সেবা করে, অবশ্য প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন নলমুখ।

কাপ্টেন উইলিয়ামসন (Captain Williamson) ২৫ বৎসর ভারতে বাস করেন। তিনি ১৮১০ সালে তাহার ভারতীয় অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। হুক্কার অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন, "অনেক ইংরেজ প্রাতরাশ শেষ হইবার পূর্বেই হুক্কা আনিবার আদেশ দেন এবং সমস্ত দিন তাম্রকূট সেবা করেন। রাত্রিতে শয্যাপ্রান্তে হুক্কা স্বকীয় আসনে সমাসীন থাকে এবং প্রভু হুক্কা-সেবা করিতে করিতে নিদ্রার আশ্রয় লাভ করেন। প্রতিবার ভোজনের পরই হুক্কা আবশ্যক। হুক্কাদ্বারা পরিসমাপ্তি না হইলে ভোজন অসম্পূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা হুক্কার অভাব অনুভব করেন। অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ দুইজন হুক্কা-বরদার নিযুক্ত করেন—একজন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত; অন্যজন সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয়।... হুক্কা বরদারের বেতন ১৫৲ মাসিক, হুক্কার জন্য মাসিক ব্যয় সাধারণ ১০০৲ টাকা।"

নেপোলিয়ানের যুদ্ধে কোম্পানীর অনেক পল্টন কর্মচারী যোগ দিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাম্রকূট সেবার অসুবিধা উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সেনাপতি নেলসনের 'সিগার' প্রীতির কথা আনন্দের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন, ট্রাফালগারের যুদ্ধে সিগারের অভাব তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাদ্রাজ অঞ্চলে হুক্কা প্রায় বাঙ্গালা দেশের মতনই জনপ্রিয় ছিল, বোম্বে প্রদেশে হুক্কা খুব বেশী প্রসার লাভ করে নাই। হুইসন সাহেব (Howison) লিখিয়াছেন ১৮২৫ সালে:—

"ভারতবর্ষে সময় ক্ষেপণের জন্য হুক্কা অতিশয় ভদ্র সহচর। হুক্কা মনোহর-দর্শন, নির্দোষ এবং আনন্দদায়ক। ধূম্রপানের যত প্রকার ব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে হুক্কাই সর্ব্বাপেক্ষা আরামদায়ক। হুক্কা একটী বিরাট শিল্প, অথচ মূল্যের বিবেচনায় অতিশয় নগণ্য; শিল্পের দিক দিয়া সুচিক্কণ, তাম্রকূট গন্ধে চিত্তকে বিহ্বল করে; সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির রুচিকেও হুক্কা আহত করে না।"

১৮৩০ সালে মিস্ রবার্টসন Robertson লিখিয়াছেন:

"ভোজ উৎসবে প্রায় প্রত্যেক টেবিলের পার্শ্বেই কারু-কার্য্য-শোভিত মকমলের আসনে সমাসীন হুক্কা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

১৮৪০ সালে হব্সন জব্সন (Hobson Jobson) গ্রন্থে উল্লিখিত আছে—"হুক্কা-সঙ্গীত ভোজন উৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গ।"

১৮৫০ সালের মধ্যেই হঠাৎ হুক্কা ইংরেজ সমাজে অচল হইয়া গেল। ১৮৬০ সালে মাদ্রাজ সহরে বার্ণেল সাহেব (Burnel) ছয় জনের বেশী ইংরেজ ভদ্রলোকের হুক্কা প্রীতি লক্ষ্য করেন নাই। তাহারাও সেই প্রাচীন যুগের ইংরেজ এবং ছয়জনই ১৮২০ সালের পূর্বে ভারতে আসিয়াছিলেন।

এই হুক্কা প্রীতির কারণ বোধ হয় পলেসলীর পরবর্ত্তী যুগ হইতে ইংরেজদের প্রচুর এবং অখণ্ড অবসর। সময় ক্ষেপণ ও অবসর বিনোদনের জন্যই হুক্কার সমধিক প্রচলন হইয়াছিল। সেই যুগে সংবাদপত্র, রেডিও, নাট্যশালা, ক্লাব ছিল না, যানবাহনের সুবিধা,পথ ঘাটের নিরাপত্তাও খুব ছিল না, নিজেদের বাংলোয় নিঃসঙ্গ বসিয়া থাকা বিরক্তিকর, সুতরাং সহচররূপেও হুক্কার সমাদর হইল। তার উপর ছুটী লইয়া যখন তখন বিলাতে যাওয়া এবং এক শহর হইতে অন্য শহরে যাওয়া সহজ ছিল না, সুতরাং হুক্কাকে ইংরাজগণ বিধাতার আশীর্ব্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিল।

ডালহৌসীর পর যখন রেলপথ নির্ম্মিত হইল এবং জাহাজে সহজেই বিলাত যাতায়াত সুগম ও সহজ হইল,তখন বিরাট হুক্কা লইয়া যাতায়াত করা সম্ভব হইত না,হুক্কা-বরদার, তাম্রকূট এবং উহার আনুসঙ্গিক সমস্ত জিনিস লইয়া বিলাত যাওয়া ভীষণ অসুবিধা। অবশ্য ক্লাইব বিলাতেও হুক্কা সেবা করিয়াছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইল, সঙ্গে সঙ্গে হুক্কাও ইংরাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাস্তুহারাদের উপনিবেশ

প্রায় সপ্তাহকাল ধরিয়া আমরা আন্দামানের ঔপনিবেশিক-বাস্তুহারাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছিলাম। আমি, আমার দুইজন সহযাত্রী বন্ধু অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক শ্রীসুনিলাভ গুহ, কংগ্রেস-কর্ম্মী শ্রীজীবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং আন্দামানের তদানীন্তন বাস্তুহারা পুনর্ব্বাসনের জন্য ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য সরকারী কর্ম্মচারী শ্রীযশোদাকুমার রায় ওরফে, জে কে রায় বি সি এস্। এ ছাড়া আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের দলে ছিলেন। একখানি ওয়েপন্ ক্যারিয়ার জাতীয় জঙ্গী বিভাগের মোটর গাড়ীতে করিয়া আমরা ঘুরিয়াছিলাম এবং এই আয়োজনের জন্য আমরা সকলেই চিফ্ কমিশনারের সেক্রেটারী শ্রী কে সি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট ঋণী। আমরা তিন জন ছিলাম প্রায় রবাহুত, গাড়ী করিয়া ঘোরার বন্দোবস্ত হইয়াছিল জীবানন্দবাবুর জন্য এবং জে কে রায় মহাশয় তাঁহারই গাইডরূপে সঙ্গে ছিলেন। এই রায় মহাশয়ের একটু পরিচয় দিই। ইনি বি সি এস্ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারী হইলেও অনেকটা রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীর ন্যায় মনোভাবসম্পন্ন। নিজে অকৃতদার এবং পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হইলেও এরূপ নিরহঙ্কারী লোকসেবক যে, মনে হয় এইরূপ কর্ম্মচারী যদি বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টে আরও কতকগুলি প্রবেশ করেন, তাহা হইলে দেশের অনেক অব্যবস্থার অচিরাৎ মীমাংসা হইয়া যায়। প্রত্যেকটি রিফিউজীকে ইনি ভালোবাসেন। যে সময়ে আমরা গিয়াছিলাম, সে সময়ে প্রায় ৮০০।৮৫০ বাস্তুহারা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইনি প্রায় প্রত্যেকেরই নাম জানিতেন এবং ইহাদের প্রত্যেকেরই সুখসুবিধা সম্বন্ধে ইনি সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। আমাদের সহিত যাইবার সময় ইনি পোষ্ট অফিস হইতে এক তাড়া চিঠি লইয়া চলিলেন এবং প্রত্যেক গ্রামে গিয়া প্রতিটি লোককে নাম ধরিয়া ডাকিয়া তাহার চিঠি তাহার হাতে দিয়া এমন ঘরোয়াভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, সত্যই মনে হইল ইনি রিফিউজীদের আপনার জন, ঘরের লোক। দেখিলাম, রিফিউজীরাও ইঁহাকে ভালোবাসেন, সুখদুঃখের কথা অকপটে বলিয়া থাকেন। এইরূপ সদাশয় সরকারী চাকুরে খুব কমই দেখা যায়। পরে শুনিয়াছি, ইনি নাকি বদলী হইয়া অন্যত্র গিয়াছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আন্দামানের পরে ইঁহার সহিত আর সাক্ষাৎকারলাভের সৌভাগ্য হয় নাই, অবশ্য সাক্ষাৎ পাওয়ার চেষ্টাও করি নাই।

পোর্টব্লেয়ারের চীফ্ কমিশনারের অফিস হইতে মোটরে বাহির হইয়া প্রথম যাই মঙ্গ্লুটন নামক গ্রামে। তারপর হাম্ফ্রিগঞ্জ, মথুরা ইত্যাদি কয়েকটি গ্রামে সেই দিনেই ঘোরা হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার অনেকগুলি বাস্তুহারাকে দেখিলাম, প্রায় সকলকেই সন্তুষ্টচিত্ত বলিয়া মনে হইল। অনেকেই টিনের ঘর প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন, কতকগুলি তখনও পর্য্যন্ত সরকারী ক্যাম্পে বাস করিতেছিলেন, তবে বাণ্ডিল বাণ্ডিল ঢেউতোলা টিন তাহাদের ক্যাম্পের কাছে রহিয়াছে। সরকার হইতে ঐ টিন সরবরাহ করা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত ঘর তৈয়ারী হয় নাই। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঔপনিবেশিক শ্রীবিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় গ্রাজুয়েট, নড়াইল পার্ব্বতী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ছিলেন; কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। আন্দামানে পুনর্ব্বাসনের নামে উৎসাহী হইয়া সপরিবারে এখানে আসিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী তৈয়ারী করা হইয়া গিয়াছিল। বয়সে প্রবীণ হইলেও উৎসাহে যুবকের অপেক্ষাও অধিক। স্বহস্তে চাষ আবাদ, গোপালন ইত্যাদি কাজ করিতেছেন এবং দেখিলাম যে, এই সমস্ত কাজে তিনি প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যেন এখানকার স্থানীয় মানুষ হইয়া গিয়াছেন। আমরা যখন তাঁহার বাড়ীতে গেলাম, তখন তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, তাঁহার শিশুকন্যা আমাদের রোয়াকে বসাইয়া পিতাকে ডাকিয়া দিল। তিনি তাঁহার বাগান হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদামাখা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিলেন, পরে হাত পা ধুইয়া অনেকক্ষণ যাবৎ সুখদুঃখের কথা বলিলেন। তাঁহার স্ত্রী চা প্রস্তুত করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার কন্যাকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিয়া আমাদের শুনাইতে বলিলেন। মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' কবিতাটি আমাদের শুনাইয়া দিল। কহিল 'হবু শুনগো গবু রায়, কালকে আমি ভেবেছি সারারাত্র' ইত্যাদি কবিতা আবৃত্তি শেষ হওয়ার পর আমি বলিলাম, 'মাষ্টার মশায়, এই কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া মনে হইল আপনি বর্ত্তমান সরকারী পরিকল্পনার মূল ব্যবস্থাটি সম্যক উপলব্ধি করাইবার জন্যই এই কবিতাটি আমাদের নূতন করিয়া শুনাইলেন'। সরকারী পরিকল্পনা ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এই জাতীয় রসিকতা দুই একজনের নিকট শ্রুতিসুখকর হইলেও বাকী কেহ কেহ বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলেন। বিনয়বাবুও যেন কেমন অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। সরকারী পরিকল্পনাকে তিনি ব্যঙ্গ করেন নাই, ইহা বুঝাইবার আতিশয্যেই তিনি যেন নিজে লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিল, তারপর তাঁহার নিজের কথা, গ্রামের কথা, লোকজনের কথা চলিতে লাগিল। বুঝিলাম যে, ভদ্রলোক প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া নিজে কিছুটা গুছাইয়া লইয়াছেন এবং তাঁহার প্রতিবেশীদের মধ্যে বেশ একটু আগ্রহের

সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি দৈনিক ৩০্ টাকা ভাড়া দিয়া একখানি মোটর বাস বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছেন। এই বাসখানি প্রত্যহ মধ্যাহ্নে পোর্ট-ব্লেয়ার সহর হইতে কালিমপুর অবধি যায় এবং পরদিন প্রাতঃকালে পোর্ট-ব্লেয়ারে ফিরিয়া আসে। বাসের মালিক, ড্রাইভার, পেট্রল, মবিল-অয়েল এবং আনুসঙ্গিক অন্য খরচ ঐ ৩০ টাকার মধ্য হইতেই বহন করেন, পরিমলবাবু নিজে কণ্ডাক্টররূপে ঐ বাসে টিকিট বিক্রয় করেন। একজন্য কোন বেতন পান না, তবে টিকিট বিক্রয়ের টাকাটা তিনি সমস্তই গ্রহণ করেন। ইহাতে বেশ ভালোরকমই লাভ থাকে। তিনদিনের টিকিট বিক্রয়ের হিসাবে শুনিলাম, একদিন ৪০্ টাকা, পরদিন ৫৭ টাকা ও তৎপর দিন ৪৬ টাকা তিনি পাইয়াছেন। ৩০্ টাকার উপর যাহা কিছু থাকে, সমস্তই তাঁহার পারিশ্রমিক এবং লাভ। ৩০্ টাকার কম টিকিট বিক্রয় একদিনও হয় না।

বাংলাদেশ হইতে ৭০০ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে স্বাধীনতা ও একদা কুখ্যাত আন্দামান দ্বীপে এতগুলি ছিন্নমূল নিপীড়িত বাঙ্গালী ভাইবোনেদের নূতন পরিবেশে সুখে দুঃখে এইরূপে অবস্থিত দেখিয়া মোটের উপর আনন্দই হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃত পরিশ্রমী তাহারা সকলেই একরূপ গুছাইয়া লইয়াছে। কিন্তু অলস প্রকৃতির লোকও কম নহে। হাসিমগঞ্জ গ্রামে হরিপদ দত্ত নামক এক শ্রমবিমুখ ও নির্বোধকে দেখিলাম। চাষ আবাদের পরিশ্রম করিতে সে নারাজ। আমাদের নিকট সে অকপটেই বলিল যে, জল কাদা লইয়া কাজ করিতে তাহার আর ভালো লাগে না। সে শীঘ্রই সপরিবারে বাংলা দেশে ফিরিতে চায়। তাহার নাকি কে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আছে আসানসোলে। সেখানে গিয়া সে দোকান করিবে। তাহাকে বলিলাম 'এই যদি তোমার ইচ্ছা, তবে এখানে এলে কেন?' সে বলিল, 'ভাবিয়াছিলাম, নূতনদেশে সুখে থাকা যাইবে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এখানে বড়ই পরিশ্রম।' বলিলাম, 'আসানসোলে কি বিনা পরিশ্রমেই জীবনযাপন চলিবে।' সে বলিল, 'উহা পরে দেখা যাইবে। কিন্তু এখানে আমি থাকিতে পারিব না।' এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। ইহারা নিজেরাও কোনদিন উন্নতি করিতে পারে না উপরন্তু ইহাদের সংস্রবে যাহারা থাকে, তাহাদেরও মন ভাঙ্গিয়া যায়। একজন ঔপনিবেশিক যদি দেশে ফিরিবার সংকল্প করিয়া প্রতিবেশীদের নিকট সেই বিষয় আলোচনা করে, তাহা হইলে অনেকেরই মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া উপনিবেশ গঠনে প্রচুর ব্যাঘাত আনিয়া থাকে। আবার দেশে ফিরিয়া সেই অকর্ম্মণ্য জীবটি নিজের ফিরিয়া আসার সাফাই গাহিবার জন্য একপ নানাবিধ বিপদ ও অসুবিধার কাহিনী রচনা করিয়া মুখে মুখে প্রচার করিতে থাকিবে যে, যাইবার জন্য প্রস্তুত অন্য বাস্তুহারাগণ আর আন্দামান যাইতে সাহস পাইবে না। জাতির ভৌগোলিক বিস্তারে ইহারাই পরম শত্রু।

বাস্তুহারাদের জীবনযাপন সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করিয়া তাহাদের অভিযোগ ও চাহিদা সম্বন্ধে দু' একটি বিষয় উল্লেখ করিব। তাহাদের প্রথম অভিযোগ এই যে, চাষের জন্য সরকার হইতে তাহাদের যে সমস্ত মহিষ এবং লাঙ্গল সরবরাহ করা হইয়াছে সেগুলি একেবারেই অকেজো। তাহাদের বিলাতী ধরণের ভারী লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। এই লাঙ্গলের সহিত তাহারা পরিচিত নহে। কাজেই এই লাঙ্গলে অনেকেই চাষ করিতে পারিতেছে না। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ এখানকার কামার-শালায় দেশী ধরণের লাঙ্গল গড়াইয়াও লইয়াছে। অতএব তাহাদের প্রার্থনা, যেন ভবিষ্যতে তাহাদের দেশী ধরণের লাঙ্গল দেওয়া হয়।

তাহাদের দ্বিতীয় অভিযোগ মহিষ সম্বন্ধে। প্রথমতঃ তাহাদের বলদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করাই অভ্যাস। কিন্তু সে যাহা হউক, চাষের জন্য যে সমস্ত মহিষ তাহাদের দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি একেবারে অকেজো। সেগুলি ছোট জাতের, আকারে বাছুরের মত এবং বৃদ্ধ। তাহাদের ঘাড়ে জোয়াল চাপাইলে তাহারা শুইয়া পড়ে। উহাদের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত যোয়ান, তাহারাও একঘণ্টার বেশী চাষ দিতে পারে না। শুনিলাম সরকারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত ঠিকাদার এইগুলির প্রতিটির জন্য সরকারের নিকট হইতে ৮০০ টাকা করিয়া বিল আদায় করিয়াছে। উপরন্তু ৭২ মহিষও প্রতিটি কৃষি পরিবার নিজস্ব একজোড়া করিয়া পায় নাই, উহাও নিজেদের মধ্যে পালা করিয়া লইতে হয়। এই মহিষের ব্যাপারটি একটি প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। এই শ্রেণীর প্রতিটি মহিষের জন্য ৮০০ টাকা মূল্য দেওয়ার মানে যে সরকারী অর্থের সবটাই অপব্যয়, সেকথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে ৯ই মার্চ্চ ১৯৫০ তারিখের দিল্লী পার্লামেণ্টের প্রশ্নোত্তরে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, আন্দামানের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও উড়িষ্যা হইতে যে মহিষগুলি ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার জন্য পুনর্বাসন তহবিল হইতে ২,৯৪,৯৯৭ টাকা সেই তারিখ অবধি ব্যয় করিতে হইয়াছে। এই অপব্যয়ের জন্য দায়ী কে, সে বিষয়ে সরকার পক্ষ হইতে কোনরূপ তদন্ত হইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় ইহার ব্যাপক সন্ধান ও অপরাধীকে সবিশেষ শাস্তি দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, দুধের জন্য যে সমস্ত মহিষী দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি ভালোই হইয়াছে। বাস্তুহারাদের বাড়ীতে দুধের অভাব নাই। প্রত্যেক পরিবারেই ৭।৮ সের করিয়া দৈনিক দুধ হয়; নিজেরা প্রচুর পান করে এবং আমাদের ন্যায় রবাহুত আগন্তুকদের অকৃপণ হস্তে দুধ খাওয়াইতে তাহাদের কোনই অসুবিধা হয় নাই।

ঔপনিবেশিক পুনর্ব্বাসীদের তৃতীয় অভিযোগ, তাহাদের গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ও প্রসূতিভবনের অভাব। বিদ্যালয়গুলি অধিকাংশই পোর্ট ব্লেয়ার সহরে এবং গ্রামের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পাঠ-শালায় হিন্দুস্থানী ভাষার সহযোগে শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলি বাঙ্গালী ছাত্রের উপযোগী নহে। চিকিৎসা সম্বন্ধেও ঐ দূরত্বের অসুবিধা রহিয়াছে। সহরে ভালো হাসপাতাল আছে, কিন্তু সহর যে ৮।১০ মাইল দূরে। শ্রী জে, কে, রায় মহাশয় বলিলেন যে, লোকবসতির সঙ্গে সঙ্গেই কালক্রমে এই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হইবে। কথাটা ঠিকই বটে।

চতুর্থ অসুবিধা বা চাহিদা অনেক গ্রামেই শুনিলাম। গ্রামের প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই অনুরোধ করিলেন যে, প্রতি গ্রামের মধ্যস্থলে সরকার হইতে কিছু জমী দিয়া যদি সাধারণ সম্পত্তি হিসাবে একটি করিয়া টিনের চালা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে সেই আটচালা ঘরে তাহারা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া হরিসভা, পাঠ বা কথকতার ব্যবস্থা করিতে পারেন। একজন বৃদ্ধ বলিলেন, 'বাবা, এই ধর্ম্মটুকু ছাড়তে পারিনি বলেই দেশ বাড়ী সব ছাড়তে হয়েছে। তা এখানে এসেও যদি সেই ধর্ম্মের একটা কথাও শুনতে না পাই, তা হলে আর ঘর বাড়ী ছাড়লুম কেন'। কথাটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলাম। সত্য বটে। ধর্ম্মের টান এই বাস্তুহারাদের মধ্যে যে কত প্রবল, তাহা তাহাদের সর্ব্বস্ব-ত্যাগ হইতেই অনুমিত হয়। ধর্ম্মটুকু ছাড়িলেই তাহাদের সব থাকিত, কিন্তু তাহারা সব ছাড়িয়া তাহাদের ধর্ম্মটুকুই রাখিয়াছে। কিন্তু এই দাবী বা চাহিদা সম্বন্ধে জে. কে. রায় মহাশয় নীরব রহিলেন, কংগ্রেসকর্ম্মী জীবানন্দবাবু বলিলেন, 'আগে খেয়ে পরে বাঁচ, তারপর ও সব হবে', কিন্তু উত্তরটা তাহাদের কাহারও মনঃপূত হইল না। মুসলিমপ্রেমে বিহ্বল কংগ্রেস ও সেকিউলার সরকার স্বেচ্ছায় হিন্দু-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করিয়া সেই মনোভাব দিয়া দেশের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণ মনকে দমন করিতে গিয়া এমন এক স্বখাত সলিলের সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহাই এখন তাহাদের প্রাণান্তকর হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইল যে, কংগ্রেস সরকার হিন্দু পুনর্ব্বাসীকে 'মুসলমানের ভয়ে' মন্দির বা হরিসভা গঠনের সুযোগ দিবেন না, বর্ত্তমান লেখকের সে বিষয়ে সাহায্য করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি নাই, ভারতবর্ষের পাঠক সমাজকে অনুরোধ করি, তাহাদের মধ্যে কেহ কি আন্দামান দ্বীপের ধর্ম্মপ্রাণ পুনর্ব্বাসীদের গ্রামে গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বত্যাগী বাস্তুহারাদের হিন্দুধর্ম্মে স্থায়ী ভাবে পুনর্ব্বসতি করাইতে পারেন না? হিন্দু মহাসভা, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, রামকৃষ্ণ মিশনকেও অনুরোধ করি, তাহারা যেন এ বিষয়ে একটু অবহিত হইতে চেষ্টা করেন। ধর্ম্মের জন্যই যাহারা দেশত্যাগী, বিদেশে যেন তাহাদের ধর্ম্মহীন জীবনই যাপন করিতে না হয়।

[নিকোবর দ্বীপের বিবরণ দিয়া আগামী সংখ্যায় এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবে]

বিক্রমপুরের অতীত ঐশ্বর্য্য

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিক্রমপুর ছিল অতীত কীর্ত্তি ও ঐশ্বর্য্যভূষিত দেশ। ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও চারুকলার যেমন ছিল উহা কেন্দ্রভূমি, তেমনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়াও তাহার গৌরব ছিল চিরন্তন। পণ্ডিতদের বাড়ী বাড়ী ছিল পুঁথিশালা। তাহাতে ছিল ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র ও সাহিত্যের অগণিত পুঁথি। বাড়ী বাড়ী দেবায়তনে শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইত, আজ তাহা উপেক্ষিত হইয়া পরিত্যক্ত ও মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। যেখানে সেখানে ছিল অতীতের মন্দির চিহ্ন, প্রস্তর স্তম্ভ, দীঘি সরোবরের তলদেশে মূর্ত্তি দারুনির্ম্মিত স্তম্ভ নিহিত রহিয়াছে অগণিত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শ্রীমূর্ত্তি, কতই না অবলোকিতেশ্বর, হেরুক, জম্ভল, লোকনাথ, সম্বর, মারীচি, তারা, ভ্রূকুটি তারা, হারিতি, বজ্রতারা কতই বা নাম করিব! আবার ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি—বিভিন্ন রূপের বিষ্ণুমূর্ত্তি,—বিশ্বরূপ বিষ্ণু, দশাবতার মূর্ত্তি—মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, রাম, কল্কি, পরশুরাম, বলরাম, আবার শৈব শ্রীমূর্ত্তি—দশহস্তবিশিষ্ট নটরাজ, অঘোর, কল্যাণসুন্দর, অর্দ্ধনারীশ্বর, উমা-মহেশ্বর, সৌর মূর্ত্তি—শ্রীসূর্য্য, রেবন্ত; নবগ্রহ, —ওদিকে গাণপত্য—গণেশ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ,—কার্ত্তিকেয় প্রভৃতির, আবার নারী বা শক্তি মূর্ত্তিও অগণিত—মনসা, অন্নপূর্ণা, মহিষমর্দ্দিনী, গৌরী, চণ্ডী, কাত্যায়নী, চামুণ্ডা, কালী এইভাবে শত শত মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি। এখন সে সব কোথায়? ইহাদের পরিচয়, প্রাপ্তিস্থান এবং কোন্ মূর্ত্তি কোথায় আছেন তাহা আমার লেখা দ্বিতীয় খণ্ড বিক্রমপুরের ইতিহাসে

ভগ্ন নটরাজ মূর্ত্তি—কলিকালা

উরসে কৌস্তভ, শিরে কিরীট, পুষ্ট ভুজ, পুষ্ট অঙ্গুলি, মধ্যে ত্রিবলী রেখা, কণ্ঠে বনমালা, যজ্ঞোপবীত নাভিদেশ পর্যন্ত বিলম্বিত। এই মূর্তির দক্ষিণ দিকে দেবী কমলা একহস্তে অভয় মুদ্রা, অপর হস্তে মৃণালসহ পদ্মকোরক ধৃতা বামদিকে বিদ্যাদেবী বীণাপাণি বরদমুদ্রা ও বীণাহস্তে শোভিতা। বিষ্ণু বিকশিতশতদলোপরি দণ্ডায়মান। পাদপীঠ নিম্নে গরুড় নতজানু হইয়া উপবিষ্ট। এই রক্তনির্মিত বিষ্ণুমূর্তির কারুকার্য অতি সুন্দর। কামার খাড়া বা স্বর্ণগ্রামের এই মূর্তিটি আর বিক্রমপুরে নাই। এই মূর্তিটি এখন কলিকাতা যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

অপর একটি প্রস্তরনির্মিত মূর্তি হলদিয়া গ্রামে পূজিত হইতেছেন। ইহা আকারে ক্ষুদ্র। বর্তমানে ইহাও গ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। উদ্ধার করিলাম। এই বিষ্ণুমূর্তির পাদলিপির পাঠোদ্ধার করিয়া ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার ১৩৪৮ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ভারতবর্ষ (৭৪৯-৭৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং Indian culture, VOL. VII, 1940-41 -P.p. 405II প্রকাশ করেন। অপর ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই উৎকীর্ণ লিপি প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন: It was brought to the notice of the world of scholars by Sj Jogendranath Gupta, who handed over the rublings of the inscription to Dr. Dineschandra Sarkar of the Calcutta University." ভট্টশালী মহাশয় ও ডক্টর সরকার কর্তৃক পাঠের সামান্য পার্থক্য রহিয়াছে। ভট্টশালী মহাশয়ের [illegible] পাঠে পঙক্তি....

[illegible] মহেশ্বর শিবলিঙ্গ

মূলচর গ্রামের নটেশ্বর গণেশ মূর্তি

যে বাসুদেব মূর্তিটির কথা বলিব সেই খোদিত লিপিযুক্ত প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমূর্তিটি বহুদিন পর্যন্ত আউটসাহী গ্রামের পরীকরণের আশ্রমে ছিল। এই মূর্তির পাদপীঠের উভয় পার্শ্বের লেখা হইতে জানা যায় যে বাসুদেব মূর্তিটি শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্রের ২৩ সংবৎসরে অর্থাৎ গোবিন্দচন্দ্র নামক জনৈক রাজার ত্রয়োবিংশ রাজাঙ্কে গঙ্গাদাস নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। গঙ্গাদাসের পিতা ছিলেন ভগবত (অমৃত) পালদাস। আমার আবিষ্কৃত এই বাসুদেব মূর্তির উৎকীর্ণ লিপি দ্বারা একটি নূতন ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশ পাইল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার লিখিত পাঠ সম্বন্ধে বলেন: শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত প্রতিলিপি—

১। শ্রীমদ্গো ॥ বিন্দচ ॥ ন্দ্র সম্বত্ ২৩

২। বালাজিক ও ॥ পরভ পা ॥ র দাস সুত:

৩। গঙ্গা দা ॥ স কারিত বা ॥ সুদেব

৪। ভট্টারক [:]

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকার বালজিক পাঠ করিয়াছিলেন। ভট্টশালী মহাশয়ের অর্থ এইরূপ: শ্রীমদ্গোবিন্দচন্দ্রের ২৩ সম্বতে বা সম্বৎসরে,— বালজিক বা বারজিক মৃত পারদাসের পুত্র গঙ্গাদাস কর্তৃক এই ভগবান্ বাসুদেবের মূর্তি তৈরী করানো হইল। [The 23rd year of the

the God Vasudeva, made by Gangadas, the betel Planter, son of the deceased Paradas," উক্ত সরকারের মতে রালজিক (অর্থাৎ রালজেক) তদন্তকার কোন স্থানের অধিবাসী অর্থ করিয়াছেন। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আলোচনা হইয়াছে। বাসুদেবের এই মূর্ত্তির পাদপীঠের এই লেখা আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য লেখাটির ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত। ইহা গদ্যে লিখিত। ঢাকা মিউজিয়ামের ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণী (Annual report of Dacca museum for 1911-12 page 10-11) এ মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ১৩২৮ সনে আষাঢ় মাসের "ভারতবর্ষে" আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম।

[illegible]

বিক্রমপুরে বহু গণেশ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবতার পূর্ব্বে গণদেবতার পূজা করিতে হয়। গণেশ লোকপালক, মহাভুজ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বজনহিতকারী। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বলোকানাং গণেশ্বর বিনায়কঃ। [মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব ১৫০, [illegible]] গণ শব্দের দুই অর্থ। এক অর্থে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতিকে বুঝাইয়া থাকে। অপর অর্থে বুঝায় জনসাধারণ—'the man, the people']

বিক্রমপুরে রঘুরামপুর হইতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত একটি সুন্দর গণেশ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। তাহা ঢাকা যাদুঘরে আছে। রাণীহাটি পল্লীতে নটেশ্বর বা নটরাজ গণেশ পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি আউটসাহী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের বাড়ী আছে। এখানে যে নটরাজ গণেশ [illegible]

মূলচর গ্রাম লেখকের জন্মভূমি। বর্ত্তমানে প্রায় জনমানববিহীন পরিত্যক্ত পল্লী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অষ্টভুজ গণেশটি নটরাজ বা নটেশ্বর গণেশ। বিনায়ক বা গণেশমূর্ত্তি গজমুণ্ড, লম্বোদর এবং দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ এবং অষ্টভুজ হইয়া থাকেন। মথুরার যাদুঘরে ও কলিকাতার যাদুঘরে (Dancing Ganesh) নটরাজ গণেশ মূর্ত্তি আছে। বিক্রমপুরের বিভিন্ন পল্লী হইতে দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ এবং অষ্টভুজ নটরাজ গণেশ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে—এখানে দুইটি নটরাজ গণেশের মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশ করিলাম। অগ্নিপুরাণ, হেমাদ্রি, সারদাতিলক প্রভৃতিতে গণেশের ধ্যান এবং বিভিন্ন হস্ত দ্বারা ধৃত আয়ুধ ইত্যাদির পরিচয় রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আর করিলাম না।

বিক্রমপুরের কত মূর্ত্তি ও মন্দির অদৃশ্য ও বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া এখন আর সম্ভবপর নহে।

আউটসাহী বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ পল্লী। আউটসাহী গুপ্ত বংশ বিখ্যাত। ১০৬২ সনে তাঁহারা কুরমিয়া নামক গ্রাম হইতে এই গ্রামে আসেন। ইঁহাদের বাড়ীতে অষ্টধাতু নির্ম্মিত কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কত কালের প্রাচীন বলা কঠিন। এখনও দেবী আউটসাহী গ্রামেই আছেন। বিখ্যাত শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত এই গ্রামের অধিবাসী।

গুপ্ত বাড়ী—আউটসাহী

মণীন্দ্রভূষণ রাজেন্দ্রবাবুর পুত্র। তাঁহাদের বাড়ী, দীঘি, নাটমন্দির, প্রভৃতি দর্শনীয়। তাঁহাদের বাড়ীর দীঘির ঘাটের সোপানশ্রেণীর উপরিভাগে দেয়াল ও প্রাচীর সংলগ্ন নটরাজ শিব, গণেশ, প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তি আছে; তাহাদের পরিচয়, ধ্যান ইত্যাদি পূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছি—এখানে শুধু চিত্র প্রকাশ করিলাম।

আউটসাহীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন কীর্ত্তি করের দীঘি ও মঠ। মঠটি বহুকালের হইলেও এখনও অনেকটা অবিকৃত অবস্থায়ই আছে, তবে ভূমিকম্পে কিছু ক্ষতি করিয়াছে। এই মঠের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় আছে তাহা হইতে তৎকালীন পল্লীসমাজের অবস্থা ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিজয়রাম করগুপ্ত নামক রাজসাহীনিবাসী জনৈক ভদ্রলোক ঢাকাতে নবাব সরকারে বড় কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর বৈদ্য ছিলেন। বিক্রমপুরের বৈদ্য সমাজে মিশিবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি আউটসাহী গ্রামে

বাড়ী ও তালুক ক্রয় করিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। করের দীঘি ও মঠ তাঁহার কীর্ত্তি। মঠটি তাঁহার মাতার শ্মশানের উপর প্রতিষ্ঠিত। মঠ মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিতও ছিল। আমি মঠের মধ্যস্থিত কক্ষে গৌরীপট্ট পড়িয়া আছে দেখিয়াছি। শিবলিঙ্গ অন্তর্হিত। সংস্কারাভাবে ইহার অবস্থা এক সময়ে খুবই খারাপ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে অনেকটা ভাল। বিজয়রাম আউটসাহী গ্রামে এত বড় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেও তাঁহার স্মৃতি এ গ্রাম হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। 'করের দীঘি' তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও বর্ত্তমান যুগের কেহই তাঁহার বিষয় বড় কিছু জানে না। সমাজের অনুদার মতাবলম্বীদের সংকীর্ণতার জন্য বিজয়রাম আউটসাহী বৈদ্য সমাজে মিশিতে পারিলেন না—মনের ক্ষোভে তিনি এখানকার বাড়ী ঘর আউটসাহীর অন্যতর কায়স্থ পরিবার বসুদের কাছে বিক্রয় করেন, বসুদের নিকট হইতে উক্ত গ্রামের গুহ বংশীয়েরা ক্রয় করেন। এখন ইহা কাহাদের সম্পত্তি তাহা জ্ঞাত নহি। মঠের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের দরোজার চতুঃপার্শ্বের ইষ্টক গাত্রে খোদিত নানাবিধ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

উক্ত গ্রামে কয়েকটি শিবমন্দির আছে। তাহাও বেশ প্রাচীন।

গ্রামের মধ্যেও চারি পার্শ্বের নিকটবর্ত্তী পল্লীতে অনেকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দীঘি বা পুকুর খনন করিবার সময়ই তাহাদের অধিকাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ, বরাহ এবং নটরাজ শিব প্রধান। রাণীহাটী গ্রামের একটি পাচার পদ্মবিল খননেই এ সকল দেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

আউটসাহী গ্রামের পার্শ্বে বিক্রমপুরের বিখ্যাত পল্লী সোনারঙ্গ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে কয়েকটি অতি সুন্দর মঠ আছে। সংখ্যায় আটটি হইবে। ঐ সকল মঠের মধ্যে দুইটি মঠ অতি সুন্দর। এইরূপ সুন্দর মঠ বিক্রমপুরে বিরল, অবশ্য প্রাচীনত্বের দিক দিয়া তেমন গৌরব ইহার নাই। এই যুগ্ম মঠ দুইটির প্রথমটি ১৭৬০ শকে অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ও বঙ্গাব্দ ১২৪৫ সালে নির্ম্মিত। দ্বিতীয়টি ১৭৬৫ শকে, ১২৫০ সালে এবং ইংরাজী সন ১৮৪৩ সালে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রথমটির বয়স ১১২ বৎসর এবং দ্বিতীয়টির বয়স ১০৭ বৎসর হইবে। প্রথম মঠটি নির্ম্মাণ করেন ৺জয়চন্দ্র মুন্সী, তাঁহার পিতা ৺রামদাস সেন ও মাতার চিতাভস্মের উপর, দ্বিতীয় মঠটি নির্ম্মাণ করেন ৺ভগবানচন্দ্র সেন ডেপুটি কালেক্টার তাঁহার পিতা ৺রূপচন্দ্র মুন্স ও মাতা বনবালা দেবীর চিতাভস্মের উপর। প্রথমটি পঞ্চরত্ন, দ্বিতীয়টি নবরত্ন। প্রথমটির ও দ্বিতীয়টির প্রবেশ পথের উপর নিম্নলিখিতরূপ দুইটি খোদিত লিপি আছে।

প্রথমটির লিপি

পঞ্চষট্‌সপ্ত ভূশাকে পঞ্চাঙ্গং পঞ্চমেকগে।
পঞ্চদস্থাং সমাস্থাপি পঞ্চবক্ত্রস্য মন্দিরে
বৈদ্যেন্দ্ররূপচন্দ্রেণ দেবীন্দ্র চণ্ডাতিনী
শ্যামা তাত শ্মশানে সা শ্মশানালয়বাসিনী।

দ্বিতীয়টির লিপি

মাতুমে বনমালায়া রূপচন্দ্রস্য মৎ পিতুঃ
স্মৃত্যর্থং তচ্ছ্মশানেস্মিন্ নবরত্নহজিতার্থজে
বেদ শঙ্গাষ্ট ভূশাকে ভক্ত্যাস্থাপি ভব. প্রিয়া
ভগবানচন্দ্র সেন শর্ম্মা প্রসাদশ্চ।

প্রথমটিতে প্রথমে শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল, পরে উহাতে শ্মশানালয়বাসিনী কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টিতে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। পূর্ব্বে উক্ত কালীমূর্ত্তি মুন্সীদের চণ্ডীমণ্ডপে স্থাপিত ছিল, কিন্তু দৈবযোগে দুইবার ছাদ ভাঙ্গিয়া উহার উপর পড়ে এবং পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে ঐ কালীমূর্ত্তি এইস্থান হইতে স্থানান্তরিত হউক এবং পাষাণ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে

সোনারঙ্গের যুগ্মমঠ

মৃন্ময়মূর্ত্তি স্থাপিত হউক। তদনুসারে প্রথম মঠে মৃন্ময় কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি পালেশ্বরীতে বিসর্জ্জন করা হয়। তৎপরে প্রসিদ্ধ তীর্থ লাঙ্গলবন্ধ নিবাসী এক ধীবর-কন্যা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ মূর্ত্তি উদ্ধার করতঃ লাঙ্গলবন্ধে স্থাপিত করে। উহা অদ্যাপি তথায় বর্ত্তমান আছে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ মূর্ত্তি ভাস্কর্য্য নৈপুণ্যে অতুলনীয়। এমন করিয়া পাথর খোদিয়া যে সব শিল্পী তাণ্ডব নৃত্যের প্রত্যেক ললিত ছন্দ, শিবের মুখ ভঙ্গিমায়, উদ্ধোৎক্ষিপ্ত জটার দোলায়, নৃত্য মুখর চঞ্চল চরণের প্রলয় নৃত্য যেন সমগ্র বিশ্ব জগতের বুকে জাগিয়াছে তাহার পরশ ভঙ্গিমা—শিবের পদতলের বৃষ তাহার পা দুটি বঙ্কিম ভাবে হেলাইয়া দুই পা উঠাইয়া লাঙ্গুল দোলাইয়া, আনন্দ বিহ্বল মুখে কি ভাবই না প্রকাশ

ভুজবিশিষ্ট নটরাজ মূর্ত্তি রাণীহাটি গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল, এখন উহা আউটসাহী শ্রীইন্দ্রগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আছে। ঐরূপ আর একটি মূর্ত্তি শ্রীপুর গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়া আড়িয়ল গ্রামে রহিয়াছে—বর্ত্তমানে এই মূর্ত্তি কোথাও স্থানান্তরিত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী। রামপাল হইতে প্রাপ্ত দশভুজবিশিষ্ট নটরাজ ঢাকা চিত্রশালায় আছে। ঐরূপ অপর একটি মূর্ত্তিও শঙ্করবন্দ নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া ঢাকা মিউজিয়ামে রহিয়াছে। নটরাজ, গণেশ, বিষ্ণু প্রভৃতি মূর্ত্তির বহু চিত্র পূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছিলাম।

চূড়াইন গ্রামের দেউল হইতে যে ভগ্ন নটরাজ মূর্ত্তিখানির পাদপীঠ এবং ঊর্দ্ধাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার পাদপীঠে পূর্ণ বিকশিত শতদল, উভয় পার্শ্বে যে গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল, তাহা বুঝা যায় তাহার পাদপীঠের মকর ও কচ্ছপের মূর্ত্তি দেখিয়া। পৃথিবীর ও যমুনার বাহন কচ্ছপ; তবে এখানে যমুনা হওয়াই সম্ভব। এই মূর্ত্তিটি যদি অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে প্রাচীন বাঙ্গলার রাজধানী বিক্রমপুরের এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তির নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতাম। আমরা যে কয়টি নটরাজ মূর্ত্তির উল্লেখ করিলাম তাহার মধ্যে শঙ্করবন্দের মূর্ত্তিটির আকার ২'৬, ২'২ বল্লাল বাড়ীতে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ১'২ ১'৭, রাণীহাটির মূর্ত্তি ১'৮।

নটরাজ মূর্ত্তির পূজা কবে হইতে বঙ্গদেশে অর্থাৎ বঙ্গ ও সমতটে প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। সেনরাজারা দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বাঙ্গালাদেশে আসেন। তাঁহারা ছিলেন প্রধানতঃ শৈব। তাঁহাদের লাঞ্ছন ছিল সদাশিব। কয়েকটী সদাশিব মূর্ত্তি বিক্রমপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে।—এই বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তির সন্ধান, দেউলের সন্ধান আমরা পাইয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতে পাইবার প্রত্যাশা করা যায়, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিবে অনাগত যুগের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকেরা। কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের দোষে অতীতের ঐশ্বর্য্যকে হারাইয়াছি। পাল ও সেনরাজদের কীর্ত্তি-চিহ্ন-পরিচয় আমরা অতি সামান্যই উদ্ধার করিয়াছি। পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করিয়া বৃহৎ বিক্রমপুর বা বঙ্গ-রাজ্যের গ্রামের পর গ্রাম, মন্দির, দেবালয় প্রাসাদ ধ্বংস করিয়াছে, সে সময়ের মূর্ত্তি, দেউল, দেবায়তনের সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেন নাই। আমাদের কাননও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি—পাহাড়ের মত উচ্চ দেউল, বৃহৎ দীর্ঘিকা, পল্লী ও বন্দর। কোথায় সে সব। বিক্রমপুরে—ঢাকা জেলায় বহু ধনী সন্তান ছিলেন যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে মনোযোগী হইলে—অর্থ সাহায্য করিলে বিক্রমপুরের ও পূর্ব্ববঙ্গের তথা বঙ্গের এক গৌরবোজ্জ্বল বিষয়ে ইতিহাস রচিত হইতে পারিত। এখনও যাঁহারা আছেন তাঁহারা উদ্যোগী হইলে এমন অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতে পারে যাহা হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব। আশা করি বাঙ্গলার—উভয় বঙ্গের ইতিহাস রচনা করিবার জন্য উভয় রাষ্ট্র মনোযোগী হইবেন।

বিক্রমপুরের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি, মুদ্রা পুঁথি পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি রক্ষার জন্য মুন্সীগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজে একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হইলে সব দিকেই ভাল হয়। ঢাকা মিউজিয়ামেও ঐ সব সংগৃহীত হইলে পূর্ব্ব পাকিস্থানের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। আশা করি, পাকিস্থান রাষ্ট্র এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইবেন।

নিরুপমা দেবীর 'দিদি'

আশাপূর্ণা দেবী

আমরা আজ যে গ্রন্থখানি নিয়ে আলোচনা করতে বসেছি, তার সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে প্রথমেই মনে পড়ে এ গ্রন্থের রচয়িতা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। মাত্র কিছুদিন আগে আমরা তাঁকে হারিয়েছি।

দিন মাস বছরের হিসেবে তাঁর মৃত্যুটা হয়তো অসময়ে নয়, কিন্তু—সময়ের হিসাব কি কেবলমাত্র দিন মাস বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

তা' তো নয়? আর নয় ব'লেই—অনুচিত্তচিত্তে বলবো—নিতান্ত অসময়েই তাঁকে আমরা হারিয়েছি। সে অসময় আমাদের সমাজ-জীবনের।

আজকের এই ভাঙনধরা সমাজে সর্ব্বাধিকার প্রয়োজন রয়েছে নিরুপমা দেবীর মতো সাহিত্যিকের 'দিদি'র মতো সৎসাহিত্যের।

বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে শোকসভা ডেকে তাঁর জীবনী আলোচনা করবার একটা প্রথা আছে, কিন্তু ভেবে দেখলে মনে হয়—অন্য সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'লেও সে প্রথা সাহিত্যিকের জন্য নয়, শিল্পীর জন্য নয়, কবির জন্য নয়।

শিল্পীর যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হবে কি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে? না নির্দ্ধারিত হবে তাঁর শিল্পের আদর্শ দিয়ে?

কি প্রয়োজন আমাদের, শিল্পীর প্রকৃতির মধ্যে যেটুকু স্থূল যেটুকু সাধারণ—তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনায়? আমাদের প্রিয় কোনো লেখকের যদি লোকান্তর ঘটে, তখন সভা ডেকে অথবা সাময়িক পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে—বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার মতো বিষয় কি এই হবে—তিনি রসগোল্লা পছন্দ করতেন কি সন্দেশ? চা পেলে খুসি হতেন কি সরবৎ? পরবর্ত্তী পাঠকের জন্য কি এই তথ্যটুকু রেখে যাবো—তিনি ডানদিকে সিঁথি কাটতেন না বাঁদিকে, খোলা ক্ষুরে দাড়ি কামাতেন অথবা সেফ্‌টি রেজারে?

অথচ প্রতিনিয়ত এইটাই চোখে পড়ে।

শ্রদ্ধা নিবেদনের এই অদ্ভুত ভঙ্গী! কিন্তু কি লাভ এই অকিঞ্চিৎকর আলোচনায়? লেখকের যথার্থ পরিচয় তো তার লেখার মধ্যেই। তাঁকে বুঝতে হ'লে—বুঝতে চেষ্টা করতে হবে তার লেখাকে। উপলব্ধি করতে হবে তাঁর দান কতোখানি। আলোচনা যদি করতে হয়—সে তার রচনার।

সেদিক থেকে—'দিদি'র আলোচনা সার্থক।

মতভেদ থাকবেই—তব আমার তো মনে হয়—'দিদি'ই নিরুপমা দেবীর শ্রেষ্ঠ রচনা।

অবশ্য নিরুপমা দেবীর কোনো রচনাই নিন্দনীয় নয়।

প্রায় সবগুলিই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের দরবারে আসন পাবার যোগ্য। বিশেষ ক'রে উল্লেখ করছি—'বিধিলিপি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'শ্যামলী' প্রভৃতির। তবু মনে হয় 'দিদি'র আখ্যানভাগটি বড়ো সুন্দর বড়ো সুচিন্তিত।

এর মধ্যে যে সমস্যা সে কেবল হৃদয়-দ্বন্দ্বের। একে গড়ে তোলবার জন্যে বাইরে থেকে কোনো সমস্যা টেনে আনতে হয়নি। পাঠকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি কোনো জটিল প্রশ্ন।

যে প্রশ্ন উত্থাপিত করা হয়েছে—তার উত্তর লেখিকা নিজেই দিয়েছেন।

অনেকটা এই ধরণের প্রশ্ন আছে অনুরূপা দেবীর 'মা' নামক বইখানিতে।

বর্তমান যুগে হয়তো ঠিক এ ধরণের আখ্যান বস্তু চলে না, কিন্তু মনে রাখতে হবে বইখানি লেখা হয়েছে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর আগে।

অবশ্য খুব ঠিক বললাম কিনা জানি না, অনুমানের উপর নির্ভর ক'রেই বলছি। আমি তা প্রথম কবে পড়েছি মনেও পড়ে না। বোধকরি নিতান্ত শৈশবকালেই।

এখানে একটা হাস্যকর কথা উল্লেখ করছি—উপন্যাস পড়বার ঝোঁক বা অভ্যাস আমার প্রায় অক্ষর পরিচয়ের যুগ থেকেই। এখনকার ছেলেমেয়েদের মতো সৌভাগ্য আমাদের ছিলোনা কারণ 'শিশুসাহিত্যের' বালাইটা তখন না থাকারই সামিল। অবশ্য দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় তখন এদিকে কিছু দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এ ছাড়া যতোদূর মনে পড়ে, আমাদের জন্যে আসতো 'বালক' নামধারী নামমলাটের বৃহদাকারের একখানি মাসিকপত্র। তার পরেই অবশ্য 'সন্দেশ' এবং সুখলতা ও সুকুমার রায়চৌধুরীর যুগ এলো। কিন্তু ক্ষুধা প্রবল। 'সন্দেশে' পূরণ হয় না।

এ নেশা আমার মায়েরও ছিল বিলক্ষণ। জ্ঞান হওয়া থেকেই দেখেছি বাড়ীতে লাইব্রেরীর বইয়ের নিত্য আমদানী। আর ছিল বিরাট একটা ট্রাঙ্ক বোঝাই 'গ্রন্থাবলীর' বোঝা।

বোঝবার বালাই না থাকলেও সেই 'বোঝাই' ছিল আমার প্রিয় সঙ্গী।

অথচ সে বয়সটা এতোই নগণ্য যে নাটক নভেলকে বিভীষিকা ভেবে পড়তে নিষেধ করাটাই হাস্যকর।…'একটা বই নিয়ে শান্ত হয়ে বসে থাকে তো থাক না'—অভিভাবকদের মনোভাব এই।

তার নিষিদ্ধ বয়স যখন এলো হতাশ অভিভাবকবর্গ দেখলেন নিষেধ করাটা পণ্ডশ্রম।

সেই সময় সন্ধানে আর একবার 'দিদি' পড়ি। প'ড়ে মুগ্ধ হই।

তখনকার সাহিত্যাকাশে দু'টি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অনুরূপা ও নিরুপমা। অনুরূপা দেবী অবশ্য বহু লিখেছেন কিন্তু নিরুপমা দেবীর সম্বন্ধে মনে হতো—কেন এতো কম লেখেন তিনি? অনেক বেশী কেন নয়? কেন 'দিদি' 'শ্যামলী' 'বিধিলিপি'র মতো বই রোজই পড়তে পাবো না? পড়তে বসে শেষ না ক'রে উঠতে ইচ্ছে হয় না, আবার শেষ হয়ে গেলে মন কেমন করে।

অথচ—

ঘটনাচক্রের আড়ম্বর নেই, পাঠককে চমক লাগিয়ে দেবার জন্যে বিশেষ কোনো প্রয়াস নেই, সমাজের উপর অনর্থক আঘাত হানবার উৎকট বাচতা নেই, তব পাঠকের উৎকণ্ঠা আগাগোড়া বজায় থাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি।

বইয়ের দেখা মুহূর্তের জন্যে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে না পাঠকের মনকে।

যদিও বইখানির মধ্যে নারী চরিত্রই প্রধান তব পুরুষ চরিত্রকেও অবহেলা করেন নি লেখিকা যে দোষ দেখা যায় অনেক লেখকের লেখাতেই। চারু উজ্জ্বল, সুরমা উজ্জ্বলতর কিন্তু অমরনাথও অনুজ্জ্বল নয়।

এর কারণ প্রতিটী চরিত্রের উপরই লেখিকার গভীর সহানুভূতি। সেই সহানুভূতির স্পর্শ পাঠকের মনকেও এমন তৈরি ক'রে নেয় যে—আমরা বিবাহিত অমরনাথের পুনর্বিবাহকে ব্যভিচার ব'লে ধিক্কার দিতে পারি না, জমিদার হরনাথবাবুকে কঠোরতার অপবাদ দিতে বাধে, চারুর অলৌকিক সরলতাকে অস্বাভাবিক ব'লে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব হয়।

মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ক'রে লেখিকা দেখিয়েছেন জীবনের সমস্ত জটিল গ্রন্থি সহজ হয়ে যায় ভালোবাসার মধ্যে।

প্রধান চরিত্র সুরমা।

চারুর 'দিদি'।

অথচ চারু তার সতীন।

তার সমস্ত সুখসৌভাগ্যের শনি, তার সুখাদীপ্ত জীবনাকাশের রাহু। তথাপি সুরমা চারুর 'দিদি'। তাই ব'লে এমন নয় যে, লেখিকা সুরমাকে গড়েছেন আত্মাভিমানশূন্য দেবী প্রতিমা রূপে—বা হৃদয়বৃত্তিহীন 'মাটির মানুষ' রূপে। শ্বশুরের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা কম্মবন্ধনহীনা সুরমার যে অভিমানাহত উদাসীন মূর্তি দেখতে পাই, সে মূর্তি বাসনাকামনাহীন পাষাণের দেবীমূর্তি নয়—রক্তমাংসে গড়া নারী মূর্তিই।…সে তুরন্ত অভিমানে স্বামীর উপর প্রতিশোধ নিতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায় "দেখ আমাকে অবহেলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছ বলিয়াই আমি তুচ্ছ নই হেলার যোগ্য নই। দেখিলে বুঝিতে পারিবে

কিন্তু সুরমা যে উপাদানে প্রস্তুত সে উপাদান সাধারণ হয়েও অসাধারণ। তাই তার অভিমানে জ্বালা নেই, প্রতিশোধ-হিংস্রতা নেই। সে স্বামীকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু সতীনকে সস্নেহ মমতায় কাছে টানতে দ্বিধা করে না।

কোমলে কঠোরে অপূর্ব সংমিশ্রণ এই সুরমা চরিত্র, নিরুপমা দেবীর এক অনবদ্য সৃষ্টি। তার বিজয়িনী মূর্ত্তি যেমন দীপ্ত, পরাজিতা মূর্ত্তি তেমনি মধুর। তাই তার আত্মসমর্পণের মধ্যে দৈন্য নেই।

এ আত্মসমর্পণ সমাজ ব্যবস্থার কাছে নয়, ভাগ্যের কাছে নয়, নিজের তৃষ্ণাজর্জ্জরিত বাসনার কাছে নয়, এ নিবেদন প্রেমের কাছে। একদা আপন হৃদয়ের অর্দ্ধস্ফুটিত যে প্রেমকে বিকশিত হতে দিতে রাজী হয় নি সুরমা, কঠিন পীড়নে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলতে চেয়েছে, সেই প্রেম বিকশিত হয়ে উঠেছে অমরনাথের আবেগ গভীর সশ্রদ্ধ প্রেমের সূর্য্যালোকে।

তাই আপন হৃদয় ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিতা সুরমা অনায়াসে নতজানু হয়ে বলতে পেরেছে—'নারীর দর্প নেই, তেজ নেই, অভিমান নেই, আছে কেবল ভালোবাসা, কেবল দাসীত্ব—'

আধুনিক পাঠিকারা হয়তো 'দাসীত্ব' শব্দে ক্রুদ্ধ হয়ে সতেজে বলবেন—এ চলবে না, এ অসহ্য।'

কিন্তু ঐশ্বর্য্য যেখানে প্রচুর, সেখানে 'দাসীত্ব' কি দীনতা?

একটি আধুনিকা বান্ধবীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন——'এ মনস্তত্ত্ব ভুল। সুরমার মতো এমন রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ একটা চরিত্রকে লেখিকা কেবলমাত্র 'হিন্দুয়ানী'র পায়ে বলি দিয়েছেন। ওর জীবনের সার্থকতা হবে কি সপত্নীর উপর আসক্ত স্বামীকেই অবলম্বন ক'রে? এটা গোঁড়ামী। বর্ত্তমান যুগের কোনো লেখকের হাতে পড়লে—' কিন্তু থাক—

তা' পড়লে সুরমার জীবনের সার্থকতা কি ভাবে হতে পারতো সে আপনারাও জানেন আমিও জানি। কিন্তু সেই মনস্তত্ত্বই কি সত্যি ঠিক?

হিন্দুর ঘরের ভিতর থেকে হিন্দু নারীর মহিমা, হিন্দু-নারীর দৃঢ়তা, হিন্দু নারীদের আদর্শ সত্যিই কি লুপ্ত হয়ে গেছে?

স্বামীর মধ্যে ত্রুটির লেশ আবিষ্কার করতে পারলেই বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে ছুটবে—এইটাই হবে হিন্দু নারীর প্রকৃত রূপ?

কাল বদলায়, রীতি নীতি বদলায়।

ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়, হয়তো এ ও হবে।

কিন্তু বড়ো দুঃখেই মনে হয়—কেন?

কেন এমন হচ্ছে?

ভারতের ঐতিহ্যে ভারতের সংস্কৃতিতে যে সম্বন্ধের বন্ধন ছিল জন্মান্তরের সূত্রে বাঁধা সে বন্ধন এমন ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে কি ক'রে?

সংসারে সব সম্বন্ধই তো আমাদের মেনে নিতে হয়, সহ্য করতে হয়? সকলের ভাগ্যেই কিছু আর মা বাপ, ভাইবোন ছেলেমেয়ে, এরা সবাই একান্ত মনের মতো হয় না, হয় না ত্রুটিবর্জ্জিত আদর্শচরিত্র। কই তাদের তো আমরা অপছন্দ ব'লে বাতিল করতে চাই না? অসহিষ্ণু হয়ে বদলে নেবার আইন খুঁজে বেড়াই না?

তবে?

স্বামীর বেলাতেই বা সে অসহিষ্ণুতা আসবে কেন? কেন পারবো না—মেনে নিতে। নেহাৎই 'পাতানো' সম্বন্ধ ব'লে?

আধুনিক মেয়েরা বোধকরি তাই ভাবতেই শিক্ষা করছে। তাই মনে হয় নিরুপমা দেবীর মতো লেখিকারই যথার্থ প্রয়োজন এখন।

হিন্দুনারীর বলিষ্ঠ আদর্শকে, ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারাকে, তলিয়ে বুঝতে হলে, পড়তে হবে এমনি সাহিত্যকে। সিনেমা সাহিত্যের স্রোতে ভেসে গেলে চলবেনা।

ভারতের মেয়েরা আজ অনেক দাবী জানাচ্ছেন, অনেক অধিকারের জন্যে লড়ছেন, তাঁদের পাণ্ডিত্য প্রচুর—বুদ্ধি বেশী—হিসাব-বুদ্ধি আরো বেশী, তাঁদের কাজের সমালোচনা করার সামর্থ্য নেই, তবু একটী প্রশ্ন তাঁদের সামনে আনতে ইচ্ছে করে—যাদের দেশের অনুকরণে এই অধিকারের লড়াই, তাদের দেশের মেয়েরা কি বাস্তবিকই সুখী আর সন্তুষ্ট?

কিন্তু থাক—এ আলোচনা। বলতে গেলে অনেক কথা এসে যায়। ফিরে যাওয়া যাক আমাদের মূল আলোচনায়।

সুরমা চরিত্র ছাড়া আরো একটী অপূর্ব্ব চরিত্র—চারু।

চারুর চরিত্র দুর্লভ, সৃষ্টিছাড়া, হয়তো বা অস্বাভাবিক। কারণ সচরাচর এমন চরিত্রের দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটেনা। কিন্তু সুনিপুণ রচনা-কৌশলের গুণে মনে হয় এ মেয়েকে যেন আমরা কোথায় দেখেছি। সংসারের মালিন্য একে স্পর্শ করতে পারেনা, অথচ একেবারে সংসারের ভিতরের একজন।

লেখনীর গুণ সেইখানেই।—

দুর্লভ চরিত্র সৃষ্টি ক'রেও পাঠককে বুঝতে দেওয়া হয়না—এটা নিতান্তই দুর্লভ। এমন তো কই দেখি না।

লেখনীর গুণ সেইখানেই—

যাতে অমরনাথের মতো অন্যায়কারীকেও মমতার চক্ষে না দেখে পারা যায়না।. চারুর মতো স্ত্রী পেয়েও আবার সুরমাকে ভালোবাসলো ব'লে রাগ হয়না।

কেউ কেউ বলেন—'এটা কেন হবে? অমরনাথ তো অতৃপ্ত ছিলনা। তা ঠিক, কিন্তু তবুও হয়, হওয়া অসম্ভব নয়।

পুরুষ সবল, পুরুষ বলিষ্ঠ, পুরুষ আশ্রয়দাতা—এ সবই সত্য, তবুও পুরুষের মধ্যে একটা প্রকৃতি প্রচ্ছন্ন থাকে, যে আশ্রয় চায়, নির্ভরতা খোঁজে।

চারুর কাছে অমরনাথের সুখ ছিল, শান্তি ছিল, তৃপ্তি ছিল, ছিলনা আশ্রয়। যে আশ্রয় সে দেখেছিল সুরমার মধ্যে। তাই অমরনাথের এ প্রেমও অবিশুদ্ধ বা চিত্ত দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক নয়।

আরো একটা দিক আছে।

সে উমারাণীর ও প্রকাশের দিক।

এখানেও মুগ্ধ হ'তে হয় লেখিকার অনবদ্য সংযম দেখে। উমারাণীর জন্য আমাদের মন করুণায় ভরে ওঠে, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু হলে ভালো হ'তো—তা ও তো কই মনে হয়না ?

শুধু একটী কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করবো—সেটা মন্দাকিনী সম্বন্ধে।

মনে হয় মন্দাকিনী চরিত্রটী কিছু যেন বাহুল্য। হয়তো বা না থাকলেও বিশেষ ক্ষতি হ'তো না।

মন্দাকিনীর যে আনুগত্য সে যেন ভৃত্যের আনুগত্য। এ থেকে ধরা পড়ে তার অক্ষমতা, তার চিত্তের দৈন্য। কেবল মাত্র স্বামীর করুণা পেয়ে যে ধন্য হয়ে সংসার করতে পারে—তাঁকে আমাদের তেমন ভালো লাগেনা।

তাছাড়া মন্দার ওপর লেখিকার যেন একটু অবিচারও আছে। স্বামীর হৃদয়কে আকর্ষণ করাবার জন্যে তাকে একটা মারাত্মক অসুখে ফেলাটা এর ওপর অবিচার নয় কি ?

রুগ্ন ব্যক্তির প্রতি যে মমতা, সে তো করুণারই নামান্তর।

প্রকাশের ব্যথা বিদীর্ণ চিত্তকে আশ্রয় দেবার ক্ষমতা কেন থাকবেনা মন্দাকিনীর ? বিবাহটাকে যে শাস্তি ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, এমন বিমুখ পুরুষ চিত্তকে যদি কেবলমাত্র নিজের গুণে আকর্ষণ করতে পারতো মন্দাকিনী, তবেই যেন তার ওপর সুবিচার হ'তো।

এটুকু বললাম শুধু এই জন্যে—বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ব'লেই। মনে হয়—প্রায় শেষের দিকে আনা এই চরিত্রটী গ্রন্থকর্ত্রীর একটা নতুন পরীক্ষা। এতো বড়ো কথা, এমন সূক্ষ্মশিল্প-কলাসম্পন্ন রচনার সম্বন্ধে এতোটুকু আলোচনা কিছুই নয়, বলবার আরো অনেক কথাই রয়েছে, কিন্তু সময় মতো থামার তো দরকার ?

নিরুপমাদেবীর প্রায় প্রত্যেক বই-ই যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার প্রমাণ তাদের একাধিক সংস্করণ।

তবু সময়ের প্রভাবে এখন আর তেমন প্রচার দেখিনা।

বিশিষ্ট প্রকাশকদের কর্ত্তব্য—সাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদগুলিকে লুপ্ত হ'তে না দিয়ে পুনঃ প্রকাশ ক'রে রক্ষা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করা।

পরিশেষে গ্রন্থরচয়িত্রী সেই মহিয়সী মহিলার উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

পাকিস্তানের কোন বান্ধবীকে

শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিনের পর তোমাকে হঠাৎ আজ পড়ে গেল মনে,
হঠাৎ বিকেলে আজ গিয়েছিনু তোমাদের পুরোনো পাড়ায়,
সবই তো তেমনি আছে, সবই এক, বারান্দার সেই পূবকোণে
ঝোলানো বাতির ঝাড় পামের পাতার ফাঁকে আজও দেখা যায়।

আনমনে পথ চলি, হাতছানি দেয় যেন লাল বাড়িখানা,
আমায় দেখিতে পেয়ে মনে হয় ওই বুঝি ডাকে আনোয়ার,
মনে হয় গেট্ খুলে ঢুকে গেলে আজও কেউ করিবে না মানা,
সন্ধ্যাটা কাটিবে ভাল চায়ের চুমুকে আর হাসিতে তোমার।

আজ তুমি কি পেয়েছ সে হিসাব করিব না, শুধু ভাবি মনে,
যে বাড়ীতে থাক তুমি সে বাড়ী কি লাল রঙ, পাম গাছে ঘেরা,
সেথাও কি বাতিঝাড় দিন রাত দুলে যায় বারান্দার কোণে,
তোমার ঘরের নীচে মাঠে কি খেলিতে আসে পাড়ার ছেলেরা ?

পুরোনো বইয়ের টেবিলে এখনও কি আনোয়ার [illegible] সেবার [illegible] ;
নোতুন নভেল এলে এখনও কি রাত জেগে শেষ ক'রে তবে শুতে যাও ?
প্রিয়জন কেউ যদি একটুকু ব্যথা দেয় তাতেই নয়নে জল নামে,
এখনও কি চেনা জানা কারও সাথে দেখা হ'লে আমাদের খবর [illegible] শুধাও ?

—আর তুমি অকারণে তেমনি কি হাসো আজও, আজও কি চাও
ঝকঝকে কালো পাড় শাড়ী ভালবাসো সখী ললিতার মতো ?
ওই দেখো ভুলে গেছি, ললিতা অনেক দিন পড়ে বিছানায়,
চোখের জলেতে লিখি—এ যাত্রায় উঠিবে না ললিতা হয়তো।

আমরা সবাই ছিনু বহুদিন কাছাকাছি, আজ কাল বাড়ে
বিচ্ছিন্ন বলাকা সম অর্থহীন আকাশেতে করি পরিক্রমা,
তবু মাথা খুঁড়ে মরি মাঝে মাঝে মাঝ-রাতে চাঁদের পাহাড়ে,
একতো হ'লনা আজও ভূগোলের সীমা আর স্বপ্নের সীমানা।

একুশ

—লীগ-কীগের কথা ছাড়ুন—পরম পরিতৃপ্তিতে গড়গড়ায় টান দিলেন ফতেশা পাঠান। তারপরে ধীরে ধীরে নাসারন্ধ্রে ধোঁয়াটাকে মুক্তি দিয়ে আধবোজা চোখ দুটোকে সম্পূর্ণ করে মেলে ধরলেন: কী করা যায় তাই বলুন এখন।

আজ বিকেলে আফিংয়ের মৌতাত করেছেন কিনা ভৈরবনারায়ণ, বলা শক্ত। আশ্চর্য জাগ্রত আর সজীব তাঁর চোখ। এই সময়ে ভৈরবনারায়ণকে দেখলে মত বদলাত রঞ্জন। যে মুখখানাকে সে 'প্রাইজ বুলের' সঙ্গে তুলনা করেছিল, সে মুখ দেখলে এখন তার অন্য কথা মনে পড়ত; মনে পড়ত গ্রীক পুরাণের গল্প—ভেসে উঠত লুব্ধ বীভৎস কামনায় ইয়োরোপার দিকে ছুটে আসা জুপিটারের বৃষভমূর্তি!

ভৈরবনারায়ণ বললেন, গণ্ডগোল আপনারাই তো বাধিয়েছেন। কী কতগুলো লীগ আর ন্যাশনাল গার্ড গড়েছেন, লোক ক্ষ্যাপাচ্ছেন—

ইসমাইল ফোঁস করে উঠল।

—লোক আমরা ক্ষ্যাপাচ্ছি না। এতকাল ধরে আপনারা সব ভোগ দখল করে এসেছেন, এবার আমরা আমাদের হিসেব মিটিয়ে নিতে চাইছি।

ভৈরবনারায়ণ হাসলেন: আলাদাই যদি হয়ে যেতে চান, তা হলে আর একসঙ্গে কী করে কাজ করা যায় বলুন। আমরা উত্তরে গেলে আপনারা যাবেন দক্ষিণে; আমরা পূবে যেতে চাইলে আপনারা পশ্চিমে—

ইসমাইল কী বলতে চাইছিল, ফতেশা থামিয়ে দিলেন।

—ওসব পরের কথা পরে। সে ফয়শালা দুদিন দেরীতে হলেও চলবে। কিন্তু অবস্থা বুঝতে পারছেন না এখন? আমার প্রজারা বাগ মানছে না। ওই চাষা প্রজা—ওই সাঁওতালের দল, সব জোট বাঁধছে। ওদের পেছনে আছে কতগুলো হারামী মুসলমান, আলিমুদ্দিন মাস্টারটা হয়েছে তাদের পাণ্ডা। আপনিই বা কোন্ সুখে চোখ বুঁজে বসে আছেন কুমারবাহাদুর? আপনার জয়গড় মহল বশ মানছে না, কালাপুখুরির ভুঁইয়ারা চাঁড়ার মুখ বাঁধবার জন্যে কোমর বাঁধছে। দেখছেন না, আপনি ডুবছেন, আমিও ডুবছি!

ভৈরবনারায়ণের ভুরুজোড়া একসঙ্গে জুড়ে এল।

—কিন্তু এর শেষ কোথায় সেটাই বুঝতে পারছি না! চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন কুমারবাহাদুর: সে যাক, পরের কথা পরেই হবে। আপাতত আপনার কথাটা আমার মনে ধরছে। আপনার যেমন মাস্টার জুটেছে, আমিও তেমনি এক ডাক্তারবাবু পুষেছিলাম। চোখে চোখেই রেখেছিলাম, কিন্তু সরে পড়েছে আমার ওখান থেকে। খবর পেয়েছি উঠেছে গিয়ে হতভাগা নগেন ডাক্তারের ওখানে। ভুঁইদের নাচাচ্ছে ওরাই। আপনি নতুন কিছু জানেন নাকি সরকার মশাই?

নগেনের কাকা মৃত্যুঞ্জয় সরকার এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। কুমারবাহাদুরের প্রশ্নে চোখ দুটো ঝাক্ ঝাক্ করে উঠল তার।

—হাঁ, কৃষাণ সমিতি হচ্ছে, গরম গরম বক্তৃতাও চলছে সেখানে।

—আপনি তো জয়গড়ের মাথা—ফতেশা প্রশ্ন করলেন, ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্টও বটে। ঠেকাতে পারেন না লোকগুলোকে?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়লেন।

—আমি অহিংসার সেবক—গান্ধীজীর শিষ্য। বলেছিলাম, এসব করে কী হবে? লোকের মনে হিংসা আর লোভ বাড়িয়ে কী লাভ? এর ফল হবে সর্বনেশে। কিন্তু মাথায় দুর্বুদ্ধি ঢুকেছে, সবশুদ্ধু মরবে শেষ পর্যন্ত। শুনল না। তা অহিংসার সেবক হিসেবে আমার কর্তব্য আমি করছি—সবই জানাচ্ছি কুমার বাহাদুরকে।

—হাঁ, ওর কাছ থেকেই সব খবর আমি পাচ্ছি। ভেবেছিলাম, এক ফাঁকে সব কটাকে মাটীতে দলে দেব!—ভৈরবনারায়ণ হিংস্র হাসি হাসলেন: ততদিন প্রশ্রয় নিক খানিকটা। এখন দেখছি শ্রাদ্ধ অনেক দূর পর্যন্ত গড়াচ্ছে। আর কী আস্পর্ধা বেড়েছে ওই আহীরগুলোর! জটাধর সিংকে খুন করেছে। দারোগা ধরতে গিয়েছিলেন, তাদের নাস্তানাবুদ করে হাওয়া হয়ে গেছে পালের গোদা যমুনা আহীর।

—সেটাও বোধ হয় নগেনের ওখানে গিয়ে জুটেছে—জুড়ে দিলেন মৃত্যুঞ্জয়।

—তাই নাকি?—ভৈরবনারায়ণের রুষ্ট মুখে 'বল ফাইটিংয়ের' জিঘাংসা ফুটে বেরুল: ওটাই তা হলে ঘাঁটি। একটা কাজ করতে পারেন সরকার মশাই? লাল ঘোড়া ছোটাতে পারেন নগেন ডাক্তারের আস্তানায়?

—অনুমতি হলেই পারি—মৃত্যুঞ্জয় হাসলেন: আমি অহিংসার সেবক। দরকার হলে অহিংসার জন্যে হিংসাকেও বাদ দেওয়া চলে না।

—আপনাদের গান্ধী সে কথা বলেছেন নাকি?—টিপ্পনি কাটল ইসমাইল।

—বাজে কথা থাক। শান্তি ধমক দিলেন, এখন শুনুন। পালনগরের ব্যাপারটা পণ্ড হল আপনার ঠাকুরবাবা আর আমার মাস্টারের দৌলতে। কিন্তু হাল আমি ছাড়িনি। আর একটা চেষ্টা করেছি যমুনা আহীরের মেয়েটাকে চুরি করিয়ে—

—তাই নাকি?—ভৈরবনারায়ণ চমকে উঠলেন: আমার এলাকা থেকে—

—মিথ্যে ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাবেন না কুমার বাহাদুর। দুজনের এলাকাই এখন যায় যায়—এ সমস্ত ছোট বড় মান-অভিমানের কথা থাক। সাঁওতালদের দিয়ে হল না, এবার যদি আহীরদের সঙ্গে—

—কাঁচা কাজ হয়েছে চাচা—একদম কাঁচা কাজ! উল্টো ফল হয়েছে। এতকাল আহীরেরা কারো সাতে পাঁচে ছিল না, এবার ওরাও তেতে উঠেছে। সাঁওতালদের নিয়ে এর মধ্যেই বৈঠক করেছে নিজেদের ভেতর।—ইস্‌মাইল অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো: চারদিকে এমন একটা বেড়াজাল তৈরী হয়েছে যে এখন কেটে বেরুনোই মুশকিল। মাঝখান থেকে লীগের কাজকর্মই পণ্ড!

—রাখো তোমার লীগ!—শান্তি সজোরে ফরাসে একটা থাবড়া মারলেন: যত জঞ্জাল সব! ভালো করতে গিয়ে একরাশ বিপত্তি বাধল। জটিল ওই আলিমুদ্দিন মাস্টার—এখন গোড়াশুদ্ধ ধরে টান দিয়েছে।

—সব ঠাণ্ডা হবে, কিছু ভাববেন না—ভৈরবনারায়ণ চিন্তিত মুখে বললেন, কিন্তু এখন একটা পথ বাতলান। দারোগাকে বলে কয়েকটা পাণ্ডাকে ধড়পাকড় করিয়ে—

ইসমাইল বললে, উঁহু, খুব সুবিধে হবে না। এক যমুনা আহীরকে ধরতে গিয়েই লেজায় ভেবড়ে গেছে দারোগা। বলছে, এসব ক্রিমিন্যাল এলাকায় কাজ করা সাতজন ভুড়িওলা কনেস্টবল, আর পচিশজন হাবা চৌকিদার নিয়ে সম্ভব নয়। মাঝ থেকে বেঘোরে প্রাণ যাবে। সহরে নাকি চিঠি দিয়েছে স্পেস্যাল পুলিস ফোর্সের জন্যে। যদি না আসে, এ এরিয়া থেকে ট্রান্স্‌ফার নেবে সে।

—যা করবার নিজেদেরই করতে হবে—শান্তি বললেন, ওসব হাতুটান মার্কা ছারপোকা-মারা দারোগার কর্ম নয়। আসুন এক জোট হই আমরা। নিজেদের মধ্যে মামলা মোকদ্দমা, লাঠালাঠি, হিন্দু মুসলমান—এগুলো এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় যে আপনার আমার কারুরই তা গায়ে লাগবে। কিন্তু প্রজা ক্ষেপবার ফল বুঝতে পারছেন? দুদিনে ওলট পালট করে দেবে। তখন হিন্দুও থাকবে না, মুসলমানও থাকবে না—সব শালা এক হয়ে জমিদারের ঘাড়ে লাঠি ঝাড়তে চাইবে। ওদিকে আপনার ঠাকুরবাবা এদিকে আমার মাস্টার, মানিকজোড় মিললে আর—

মিলেছে!—কথার মাঝখানে থাবা দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বললেন, মিলেছে। আলিমুদ্দিন সাহেব কাল নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছেন নগেনের ওখানে—

কথাটা সভার ওপর বজ্রপাতের মতো এসে পড়ল।

ঘরশুদ্ধ সকলে একসঙ্গে চমকে উঠলেন। খোঁচা-খাওয়া বিষধর সাপের মতো একটা অস্ফুট গর্জন করলেন ফতে শা পাঠান—মনে হল মাস্টারকে সামনে পেলে আর কিছুই করতেন না তিনি, শুধু হিংস্র ক্রোধে ছোবল মারতেন একটা!

সহ্য জ্বালায় ইস্‌মাইল বলে ফেলল, শালা হারামী!

চাপা তীক্ষ্ণস্বরে শাহু বললেন, ব্যাস্‌, খতম!

—না, খতম নয়।—ভৈরবনারায়ণ বললেন, এই শুরু! উত্তেজনায় তাঁর গলা কাঁপতে লাগল: আমার পূর্বপুরুষ কান্তনগরের যুদ্ধে লড়েছিল ইংরেজের সঙ্গে। আর কটা অবাধ্য লোককে ঠাণ্ডা করা যাবে না? আপনি তৈরী হোন শাহু, আমি তৈরী। গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেব—ডুটোয় না হলে দুশোর মাথা নামিয়ে দেব মাটিতে। তারপর ফাঁসি যেতে হয়—সে ভি আচ্ছা!

—তা হলে তাই কথা রইল—শাহু উঠে পড়লেন: আমি তা হলে আজ আসি কুমার বাহাদুর। রাত হয়ে গেছে। ইদ্রিস!

একজন বাদিয়া বরকন্দাজ ঘরের বাইরে থেকে দোর গোড়ায় এগিয়ে এল।

—গাড়ি জোতা আছে?

—জী।

—তা হলে—শাহু দু পা এগোলেন।

ভৈরবনারায়ণ বললেন, একটু বসে যান। বৃষ্টি পড়ছে।

—বৃষ্টি? তাও তো বটে।—শাহু বসলেন।

হাঁ, বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। এতক্ষণের তন্ময় আলোচনায় সে কথা কারো খেয়াল ছিল না। বাইরে লাল মাটির সহস্র দীর্ণ বুকের ওপর নেমেছে বহু প্রতীক্ষিত বর্ষণ, রৌদ্রদগ্ধ দিক-প্রান্তরের ওপর স্নেহের মতো ঝরে পড়ছে অকৃপণ ধারায়। এলো মেলো হাওয়ায় শোনা যাচ্ছে তালবনের মর্মর, আমবাগানের আর্তধ্বনি, মালিনী নদীর কল্লোল!

—তাই তো বৃষ্টি নামল যে!—শাহু বিব্রত হয়ে বললেন।

—ভয় নেই, এখুনি থামবে।—আশ্বাস দিলেন ভৈরবনারায়ণ।

—থামবে?—কাচের জানালার ভেতর দিয়ে বৃষ্টি-ঝরা অন্ধকারের দিকে তাকালেন বিচক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়: ঠিক সে কথা কিন্তু মনে হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে বান ডাকানো বৃষ্টি—সহজে থামবে না, চাফালে জল আসবে—

—চাফালে জল!—চকিত হয়ে মন্তব্য করলেন কুমার বাহাদুর। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা মনে পড়ল তাঁর—একটা সুতোয় টান পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে ভেসে এল পাশাপাশি কতগুলো ছবি। কালা পুখ্‌রি—ডাঁড়া—মালিনী নদীর বান—চাফালে জল—নগেন ডাক্তার—ঠাকরবাবু—

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল মাধব। কালা পুখ্‌রির মাধব। বৃষ্টিতে ভিজে একাকার, সর্বাঙ্গে কাদা—চোখে মুখে উৎকণ্ঠার আকুলতা।

—খবর কী মাধব?

হাঁপাতে হাঁপাতে মাধব বললে, নদীতে বান এসেছে।

—তারপর?

—ওরাও, তুরী, সাঁওতাল, জয়গড়ের সব হিন্দু-মুসলমান প্রজা, মাস্টার সাহেবের বাদিয়ার দল, সব এক জোট হয়ে কালা পুখ্‌রির ডাঁড়ায় বাঁধ বাঁধছে!

সমস্ত ঘর মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল।

ভৈরবনারায়ণ ডাকলেন, ফতে সাহেব!

শাহু বললেন, আপনি লোক ঠিক করুন, আমিও আসছি। গাড়ি জুততে বল, ইদ্রিস—

—জোর বৃষ্টি হচ্ছে যে শাহু—ইদ্রিস বলতে গেল।

—চুপ কর হতভাগা উল্লুক—যা বলছি তাই করবি!—বৃষ্টির আওয়াজ ছাড়িয়ে বজ্রধ্বনির মতো শাহুর কণ্ঠ ঘরময় ভেঙে পড়ল।

* * * *

অনেক দিন পর্যন্ত এমনভাবে মদ খায়নি ক্রু সাহেব।

মার্থার ভয়ে জীবনের উচ্ছৃঙ্খল দিনগুলো একদিন শাসন সংযত করে নিয়েছিল, মার্থার রুচি আর শিক্ষার সাহচর্যে নিজেকে মার্জিত করে নিতে চেয়েছিল সে। সেদিন সে জানত, গোল্ডাস্ গ্রীণের সোনার হরিণ মার্থাকে আর ভোলাতে পারবেনা, তার নিজের যা কিছু রঙ সব জলে গিয়ে সে মার্থার কাছে একটা মূল্যহীন ফাঁকি হয়েই ধরা দেবে। সেই হীনমন্যতার অপরাধে সে দিনের পর দিন স্তুতি করেছে মার্থাকে, তার গঞ্জনা সহ্য করেছে, ভালো হতে চেষ্টা করেছে। উচ্ছৃঙ্খল কুঠিয়াল পার্সিভাল আর কালো মায়ের যে নগ্ন কামনার মিলনে তার জন্ম, নিজের ভেতরে তার বন্য আবেগকে প্রাণপণে রোধ করেছে বার বার। মার্থা আসবার আগের অধ্যায়ে সেই একদিনের ভুল—একটা মেয়েকে জোর করে ধরে

এনে তারপর পুলিস-কেস বাঁচাবার জন্যে গলা টিপে তাকে খুন করা! সেই পাপ--সেই অপরাধে সে শঙ্কিত থেকেছে দিনের পর দিন! অসতর্ক দুর্বল মুহূর্তে নিজের হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠেছে সে।

কিন্তু আজ?

আজ আর কোনো ভয় নেই।

কী আছে—কেই বা আছে? কাকে ভয়—কার কাছেই বা কৈফিয়ৎ? আজ কুড়ি বছর ধরে যে চিঠি আসেনি- সে চিঠি আর কখনো আসবেনা। এতদিন পরে সে নিঃসন্দেহ হয়েছে। আশা করবার যা কিছু সাহস ছিল, একটি আঘাতে তার সব কিছু চুরমার করে দিয়ে গেছে মার্থা। মনে হয়েছে, আজ এতদিন পরে ফুরিয়ে গেছে স্মাইদ্ ক্যারু—এতদিন পরে আর তার কিছু করবার নেই।

সবাই বঞ্চনা করেছে তাকে—সবাই। বাপ, মা, মার্থা, অ্যালবার্ট—আর, আর পৃথিবী। খুন করেছিল সে? সেই খুনের পাপে এতদিন ধরে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল? পালিয়ে থাকতে চেয়েছিল এই অন্ধকার ভাঙা কুঠি-বাড়ির একটা গর্তের ভেতর? ক্যারুর মুখে একটা কঠিন হাসি ফুটে উঠল। আর তার ভয় নেই। শুধু একটি মেয়েকে নয়—পৃথিবীশুদ্ধ মানুষকে আজ সে খুন করতে পারে।

অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমেছে বাইরে। লাল মাটির আদিগন্ত পৃথিবীতে জল আর বাতাসের মাতামাতি শুরু হয়েছে উন্মাদ উল্লাসে। তালগাছের বুক ফুঁড়ে নামছে বজ্রের অসহ ক্রোধ—দিকে দিকে অবিন্যস্ত বনজঙ্গলে দুলছে রুদ্র তান্ত্রিকের জটা। খর খড়্গের দীপ্তি দুলছে ডাঁড়ার তীক্ষ্ণপ্রবাহে!

বাইরের ক্ষেপে-ওঠা পৃথিবীর সঙ্গে ক্যারুর সমস্ত মনও উদ্দাম হয়ে উঠল। কিছু একটা করা চাই—এই মুহূর্তে করা চাই তার। ক্যারু কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কান পেতে রইল। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাঙা কুঠি বাড়ির কড়া ভাঙা জানলার কবাটে পেত্নীর কান্না বাজছে, কোথায় যেন খোলা দরজা দিয়ে বাতাস ঢুকে কী একরাশ খস্ খস করে ওড়াচ্ছে ঘরের ভেতর। আর—আর—সেই মেয়েটা কি চুপ করে আছে এখনো? দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে না-

তার নির্জন কুঠি-বাড়ির একটা অন্ধকার ঘরে মেয়েটাকে জিম্মা করে রেখে গেছে শাহু। তখন প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি—শাহু বলে গেছে, সকালেই মেয়েটাকে সরিয়ে নিয়ে যাবে। ঘরের দিক থেকে অত্যন্ত বিব্রত আর বিপন্ন বোধ করেছিল ক্রুসাহেব। কিন্তু এখন? এখন আর কোনো ভয় নেই। পৃথিবী তাকে ঠকিয়েছে—সবাই তাকে বঞ্চনা করেছে। কাউকে আর সে ক্ষমা করবেনা। শিকার যখন মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে, তখন সে নেবেনা কেন তার পূর্ণ সুযোগ? দরকার যদি হয়, না হয় আর একবার আর একজনের গলা সে পিষে দেবে দুহাতে।

মদের নেশায় আচ্ছন্ন চেতনাটার ওপর ক্রমশ বাইরের অন্ধকার এসে ঘন হতে লাগল—ক্রমশ একটা বন্যজন্তু যেন সেখানে স্থায়ী হয়ে এসে বসল থাবা পেতে। মনের দিকে তাকিয়ে ক্যারু শুধু সেই জন্তুটার দুটো জলজ্বলে চোখ দেখতে লাগল। সে চোখ তিলে তিলে তার সমগ্র সত্তাকে হরণ করতে লাগল, মন্ত্রমুগ্ধ করতে লাগল, তারও পরে--আস্তে আস্তে নিজের ওপর তার আর বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব জেগে রইলনা।

বাইরে বৃষ্টি আর অন্ধকার তাকে লোভানি দিতে লাগল--হাওয়ার সঙ্গে মিশতে লাগল তার উদ্বেজিত উত্তপ্ত ঘনশ্বাস। দেওয়ালের গায়ে 'গড্ সেভ দ্য কিং' যেন রূপ বদলে ফেলল আকস্মিকভাবে--তার মনের চোখ দুটো তার মধ্যেও আবিষ্কৃত হল টেবিল-ল্যাম্পের ম্লান আলোয়। যেন কুটিল কটাক্ষে ডেকে বলতে লাগল: ওঠো—ওঠো! সময় চলে যাচ্ছে -দামী, দুর্লভ, দুর্মূল্য সময়!

অসহ্য জ্বালায় এবং অসংযত মত্ততায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়ালো ক্যারু। অন্ধকারে দূরে ছুঁড়ে ফেলল মদের বোতল, তারপর

টলতে টলতে এসে দাড়ালো অন্ধকার ছোট কুঠরিটার সামনে।

ঘরটা পেছন দিকের একটা কোণায়। সংসারের প্রয়োজনে কোনোদিন লাগেনি- কোনোদিন ঘরটাকে

ছিল। পাসিভাল যখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিল এ অঞ্চলে, তখন এদিককার স্বাধীন রেশম চাষীদের এই অন্ধকার কুঠরিতে এনে বন্ধ করা হত। স্বেচ্ছায় যারা রেশম কুঠিকে পলু বেচতে চাইত না, তাদের।

সেই পুরোনো ইতিহাস। ঘরের নোনা-ধরা দেওয়ালে দেওয়ালে এখনো হয়তো আঁকা আছে রক্তের চিহ্ন, এখনো হয়তো এর স্যাঁৎসেঁতে মেজেতে অনেক চোখের জলে স্মৃতি-চিহ্নিত। দেওয়ালের গায়ে মরচে-পড়া ভটো লোহার আংটায় এখনো বুঝি ছড়ে-যাওয়া হাতের ছেঁড়া চামড়া শুকিয়ে আছে।

এই আংটায় ঝুমরি বাঁধা।

দোর গোড়ায় এসে আবার ফিরে গেল ক্যারু। নিয়ে এল এক টুকরো আধপোড়া মোমবাতি। কাঁপা হাতে সেটাকে জ্বালালে, তারপর একটানে খুলে ফেলল দরজাটা।

ঘরের মধ্যে আর্তনাদ করে উঠল ঝুমরি।

বাতাসের গর্জনের সঙ্গে ক্যারুর মাতালের হাসি মিশে গেল। ধীরে সুস্থে মোমবাতিটা রাখল মেজের ওপর।

ভয় পাচ্ছ কেন ডিয়ার? আমি কোটিপতি কাল বাদে পরশু গোল্ডেন গ্রীন থেকে আমার চিঠি আসবে। মার্থা পেলনা, কিন্তু আমার সব আমি তোমায় উইল করে দেব। ইজ্ নট ইট এ প্রসপেক্ট?

হট যাও– নাগকন্যা গর্জন করে উঠল।

ক্যারু টলতে লাগল।

ভয় নেই, আই মাস্ট সেট ইউ ফ্রি ফার্স্ট। আই অ্যাম দ্য সন অব অ্যান ইংলিশ ফাদার মেয়েদের গায়ে আমি হাত দিই না। প্রেম দিয়ে আমি তাকে জয় করতে চাই।

হট যাও– হট্ যাও দু চোখে বিষ বর্ষণ করল ঝুমরি।

দরকার কেন? ক্যারু হাসল: তুমি হচ্ছ আমার ক্যাপটিভ প্রিন্সেস। আগে তোমাকে মুক্ত করে দিই, তারপর আই মাস্ট গেট ইয়োর লাভ! আই অ্যাম এ শিভালরাস নাইট— নট এ ব্রুট- ইউ সী!

সত্যি সত্যিই ঝুমরির হাতের বাঁধন খুলে ফেলল সে। তারপর দু বাহু বাড়িয়ে বললে, নাউ, ইউ সী–

কিন্তু কথাটা আর শেষ হতে পেলনা। তার আগেই ঝুমরির রুপোর ভারী কাঁকণ সশব্দে এসে আছড়ে পড়ল তার কপালে। লাল মাটির রুদ্র রৌদ্র, মহিষের তুর, খোড়ো হাওয়ার ঝাপটা আর ক্ষমাহীন ক্রোধের যে আঘাতে জটাধর সিংয়ের মাথাটা গুড়ো গুড়ো হয়ে গিয়েছিল, তার একটিমাত্র দমকায় মাতাল ক্যারু কুঠরির স্যাঁৎসেঁতে মেজেয় লুটিয়ে পড়ল। কপাল দিয়ে গড়াতে লাগল রক্ত।

অন্ধকার আর বৃষ্টি বাতাসে কখন ঝুমরি মিলিয়ে গেল ক্যারু জানলনা। জানলনা, কখন মোমবাতিটা জ্বলতে জ্বলতে এল একেবারে তলায়, সেখান থেকে সঞ্চারিত হল খানিকটা শুকনো আবর্জনায়, এগিয়ে গেল কবাটে, তারও পরে।

অনেক দিনের সঞ্চিত ইন্ধন আনন্দে মৃত্যুকে বরণ করে নিল আজ। বৃষ্টির ঝাপটায় রঠিবাড়ি সবটা পুড়ল না—মাঝপথেই নিবে এল আগুন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড হাওয়ার দমকে বিদগ্ধ ক্ষত বিক্ষত কুঠিবাড়ির আধখানা সশব্দে ধসে পড়ল একরাশ আবর্জনার স্তূপে হারিয়ে গেল পাসিভালের পীড়ন-কক্ষের দুঃস্মৃতি। ক্যারু আর উঠে এলনা তার তলা থেকে।

লাল মাটির বুক-শুষে-খাওয়া পাসিভালের সেই রক্তের ঋণ মিটিয়ে দিয়ে গেল তারই বংশধর কালো মায়ের কালো ছেলে স্যাইদ ক্যারু। বাইরে বৃষ্টি চলল সমানে, খরস্রোতে নামল কাঁদড়ের জলে। আর কে বলতে পারে, সেই আকস্মিক ঘোলা জলের আবর্ত-আঘাতে কাদার নিচে পুঁতে দেওয়া কোনো বাদামী রঙের নরকঙ্কাল খোড়ো হাওয়ায় হা হা করে হেসে উঠল কিনা!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চারটি মুস্লিম রাষ্ট্রে

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

পারস্য উপসাগরের পশ্চিমকূলে নেজ্‌দ মরুভূমির পূর্বে ছোট দ্বীপ বহরাণ। প্রাচীন বা আধুনিক ইতিবৃত্তের আখ্যায়িকায় বহরাণ কোনো দিন প্রসিদ্ধিলাভ করেনি। প্রথম মহাযুদ্ধে ইংরাজ কর্মবীর লরেন্স বিক্ষিপ্ত আরব শক্তিকে সংহত করে যখন পশ্চিম ও মধ্য এসিয়াকে তুর্কীর কবলমুক্ত করেছিল, আরবী ফৌজের অভিযান ও কর্ম-কুশলতা পশ্চিম আরবেই নিবদ্ধ ছিল। বহু পূর্বে এই বহরীণ দ্বীপপুঞ্জে সাগর হ'তে মুক্তা উদ্ধার করা হ'ত। সে ব্যবসার কোনো বিশেষ আয়োজন আজ বহরীণে নাই। এর নবীন সমৃদ্ধি খনিজ তৈলে। এখানে পেট্রোলের সন্ধান পেয়ে ইংরাজ দ্বীপটি নিজের আয়ত্তাধীন করেছে। বহরীণে সুলতান আছেন—কিন্তু তিনি বিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন। বহরীণের বড় দ্বীপ প্রায় ত্রিশ মাইল লম্বা, দশ মাইল চওড়া। যে ক্ষুদ্র সহরে জাহাজ আসে তা অবস্থিত, তার নাম মনামেহ।

বেহরীণে সকল শ্রেণীর আরব দেখা যায়। বেদুইন আসে বেহরীণ ও কোয়েতে—উট ও ভেড়ার বিনিময়ে, গম চাল বাজরা প্রভৃতি সংগ্রহ করতে। ভেড়ার লোমের ব্যবসাও বেদুইনের সাথে নগর বা গ্রামের আরবের মেলামেশার অবকাশ দেয়। পূর্বে ভেড়ার লোমের বস্ত্রে বেদুয়ার তাব এর পোষাক নির্মিত হ'ত। এ যুগে সে আমদানী-করা সুতী ও রেশমী কাপড় কেনে বিশেষ স্ত্রী ও কন্যার জন্য। নারীদের প্রধান লক্ষণ সৌন্দর্য্য প্রিয়তা—সে সৌন্দর্য্যের ভোগ তার দেহের সাজ সজ্জা এবং প্রসাধন ঘিরে প্রধানতঃ। কাজেই সুবিধা পেলে বেদুয়া রমণী তার পুরুষ-আত্মীয়ের প্রেমের মূল্য পরীক্ষা করে ভ্রাম্যমান পরিবারের সঞ্চিত অর্থে সোনা, রূপা, জেড্‌ ও ফিরোজার অলঙ্কার সংগ্রহের আগ্রহে। সহরের শরীফি আরবের বর্ণ গৌর। বেদুইনের তামার রং তার পুষ্ট দেহকে কর্মঠ ও বলিষ্ঠ দেখায়। একজন আরব সংবাদ দিলে যে বহু বেদুইন মহিলার সহরবাসীর সঙ্গে বিবাহ হয়।

—তারা ভ্রাম্যমান জীবন ছেড়ে সহরের সসীম জীবনে তৃপ্তি পায়?

—পুরুষ পারেনা, কিন্তু নারী মরু ছেড়ে অন্তঃপুরচারিণী হ'তে পারে। পুরুষের দেশে একাধিক বিবাহ প্রচলিত। নারীর সংখ্যাও সে অনুপাতে কম, সুতরাং বেদুয়া মহিলা আমাদের ঘরে আনন্দেই রয়। তারা স্বভাবতঃ পরিশ্রমী, তাই কষ্টসহিষ্ণু।

—আপনারা বেদুইনকে কন্যাদান করেন?

—কখনই না। ইসলাম করলে বংশানুক্রমে সংগ্রাম চলে।

নারী গৃহলক্ষ্মী, সুতরাং বেদুয়া নারী গৃহ পেলে

[illegible] গৃহের ছাদের উপর আলাপরত আরব

নিশ্চয়ই আকাশ-চাঁদোয়া মরু ছেড়ে বদ্ধ গৃহে গৃহস্থ হয়। ছোট বাড়ির খোলা ছাদে স্বামীকে সরবত পান করায়, আকাশ দেখে। কিন্তু মরুভূমির বিপদ বহুল স্বাধীন জীবন ছেড়ে পুরুষ বেদুইন সহরে বাস করতে পারেনা। তুর্কিয়া বা মিশরীর কলিকাতা যেমন অপ্রিয় মনে হয়। হেনা আরব মহিলার প্রসাধনের সামগ্রী। মিশরে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিতাদের মধ্যে লিপষ্টিক আধিপত্য লাভ করেছে। কিন্তু শুনলাম আরব এখনও হেনাকে পরিত্যাগ করেনি। অবশ্য ধর্মপ্রাণ মোল্লা মৌলভী সকল দেশে হেনার বহিত

করে কাঁচা পাকা দাড়ি ও কেশ। মিশরের অল-আজাহার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এখন শ্মশ্রুর আদর নাই বিশেষ তরুণদের মাঝে।

যেখানে যে পদার্থ দুর্লভ, স্বদেশ প্রিয় সেই দুর্লভের মাঝে নিজের দেশের সুখ্যাতি করে। আরব মরু-ভূমিতে জলের আদর স্পষ্ট। বহু দূর ভ্রমণ ক'রে, বালির উত্তাপ সহ্য ক'রে, বৈরীসঙ্ঘের মারাত্মক আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে ভ্রাম্যমান বেদুয়ার দল জলের সন্ধান পেলে নতুন তাবু গাড়ে। বালির ভিতর দিয়ে জল চালিয়ে আমরা বারি শুদ্ধ করি। যে কূপের জল বালুস্তরের ভিতর হ'তে বয়ে আসে, তার জল শীতল ও সুস্বাদু। আরবের জলকূপ

কূপ হইতে জলসংগ্রহ—আরব

তৃপ্তি, কাব্য এবং রোমান্সের ক্ষেত্র। বাইবেলের কূপের ধারে রেবেকা এক প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা। মরুভূমির মাঝে কষ্ট এবং রোমান্স স্রোতস্বতী, নালা বা সরোবর জাতীয় বারি-ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া। যেখানে জল থাকে, হয়তো সেথায় একটু মাটির আবরণও থাকে এবং মাটি থাকলেই খেজুর গাছ গজায়। মায়া মরীচিকা নিশ্চয়ই ভ্রমণকারীকে বিপথে নিয়ে যায়। আমার মনে হয় আকাশের তারা দেখে বেদুইন দিক নির্ণয় করে।

বলছিলাম সহরের বা নদীর উৎকর্ষের লক্ষণের কথা। বহরিণের উত্তরে ব্রিটিশ অধিকৃত কোয়েত নগর। কোয়েতের অবস্থা ভাল। কিছু ব্যবসা বাণিজ্যও আছে। কোট পেণ্টুলেন চলে ইংরাজিনবীশের সমাজে। কোয়েতে ইংরাজের অধীনস্থ সুলতান আছে।

—কোয়েত বেশ ভালো সহর।

একটি আরব ভদ্রলোক বল্লেন—কোয়েত! সেথায় এক বিন্দু জল নাই। প্রতি বিন্দু ইরাকের বাসরা হ'তে আমদানী করতে হয়। কোয়েত আবার সহর কিসের?

আরবের দেশে গরুর মূল্য খুব বেশী। তাই গোহত্যা নাই। সাধারণতঃ এরা রুটি ও খেজুর খায়, তার সঙ্গে উটের দুধ। তিব্বত, লাডাক, ভূটান প্রভৃতি দেশে যেমন ইয়াকের দুধের চীজ্‌ ব্যবহৃত হয়, আরবে তেমনি উটের দুধের হালুয়া উপাদেয় খাদ্য। উৎসবে উট বা ভেড়া কোরবানী হয়। অন্য সময়ও অনেকে মিলে একটি ভেড়া জবাই ক'রে ভক্ষণ ক'রে একই পাত্র হ'তে একত্রে। আমি তেমন একটি ভোজের বর্ণনা দেব।

খুব বড় কলাই করা দস্তার তস্তরী বা কানা উঁচু থালা। পোলাও জাতীয় ঘৃত-পক্ক চালে ছিল পাত্র পূর্ণ। মাঝে ঘি বা চর্বী গড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় মাংসের চাংড়া। ভেড়ার পা, কাঁধ, বুক, পিঠ, গ্রীবা প্রভৃতি বেশ উত্তমরূপে সিদ্ধ। তাদের গায়ে লাগছে ঐ চর্বি। কিন্তু শোভার্থে ঠিক মাঝে একটি সলোম চর্মাবৃত মেষ-মুণ্ড। তার দশন-পংক্তি উদ্ভাসিত ম্লান বিদ্রূপের হাসিতে। চোখে তেজ নাই, লাবণ্য নাই, এক অব্যক্ত ভাব। দেখতে ঠিক দুটি বরবটির দানার মত।

যেদিন আরব ভারত বিজয় করেছিল, সেদিন দ্বাদশ রাজপুতের ছিল ত্রয়োদশ হাঁড়ি। চৌকা-বর্ত্তন শুচি-অশুচি ছুৎ-অছুৎ ইত্যাদি ইত্যাদির চাপে তার সেই দশা হয়েছিল—যে অবস্থায় সশস্ত্র-সেপাহীর নাকের ডগায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেড়ে চোর চুরি ক'রে পালিয়ে যায়। এক হাতে ঢাল এক হাতে তলবার, বেচারা চোর ধরে কেমন করে।

আরবে ছুৎ-অছুতের বালাই নাই। ইসলাম ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ। সকল মুসলমান হদীশ মতে ভাই। তাই একত্র একপাত্র হ'তে ভোজন তার পক্ষে বিসদৃশ নয়। নেহাৎ

বয়োবৃদ্ধ বা সামাজিক সম্মান-ভূষিতেরা। ভোজে সুলতান প্রভৃতি প্রথম পাংক্তেয়। তাদের ভোজন-কর্ম শেষ হ'লে অন্যে সেই পাত্রস্থ ভক্ষ্য গ্রহণ করতে পারে।

সেই রসাল থালার চারিদিকে এক হাঁটু মুড়ে ছয়জন বিশিষ্ট বুভুক্ষু উপবেশন করলে। অন্য কয়েকজন অপেক্ষা করছিল দ্বিতীয় পংক্তির জন্য। তারপর সেই অন্ন-ব্যঞ্জনের স্বাদ গ্রহণ করবার মানসে পাত্রে একজন প্রধান হাত ডুবিয়ে ঝোল-সিক্ত করলে বলিষ্ঠ অঙ্গুলি। কিন্তু গরম মেষ-মুণ্ডের কী হবে? প্রধান ভক্ষক ভেড়ার কাঁধের ছালের ভিতর দিয়ে আঙ্গুল চালিয়ে দৃঢ়ভাবে টিপে ধরলে মুণ্ডকে। তারপর দাঁত দিয়ে ধমনী টিপে এমন একটি টান দিলে যার ফলে ছালটি ছাড়িয়ে এলো। তখন মাথা-খাওয়া সহজ হ'ল। মাথার চর্বিও নষ্ট হ'ল না। অবশ্য একটা চামড়ার মসক হ'তে সবাই একপাত্রে জলপান করলে।

প্রত্যেক জাতির জীবন-ধারার একটা বিশিষ্ট খাদ্য আছে। সে স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিবেশ এবং জাতীয়

আরবের রাজপথ

চর্বি তার স্বধর্ম ছাড়বে কেন? ভদ্রলোক দগ্ধ অঙ্গুলির জ্বালা নিবারণ করলেন মুখের নালের সাহায্যে। চোষা আঙ্গুল যখন জ্বালাহীন হ'ল তখন তিনি আবার আহার্যের ব্যূহকে আক্রমণ করলেন।

এইরূপে সবাই মিলে সেই পাত্রের রসাল আহার্যে ক্ষুধা উপসম করলে। যার যতটুকু আবশ্যক মাংস ও পোলাও খেলে সেই যৌথ পাত্র হ'তে। কিন্তু সেই লোম ও তকারক

সংস্কার। অন্নজীবী বাঙ্গালী ভাতের ফেন বাদ দিয়ে অন্ন আহার করে, এ ব্যাপার বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞের মনে দারুণ উদ্বেগের সৃষ্টি করে। আরবকে যেরূপ পরিবার এবং কঠোর পরিবেশের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, তার পক্ষে ভেড়ার মগজ খাওয়া হয়তো বিশেষ প্রয়োজন। আফগানেরও মাংস খাওয়ার পদ্ধতিটা ঐ রকম।

অতিবাহিত করি, দাঁতে টিপে ভেড়ার মাংসের ছাল-ছাড়ানো আমাদের চক্ষে বিসদৃশ ও বীভৎস কাণ্ড। একপাত্র হ'তে সকলের তিন কিস্তিতে ভোজন করাও একটু দৃষ্টিকটু ব্যাপার।

আরবকে চিরদিন সহ্য করতে হয়েছে নির্দয় মরুভূমির কঠোর অত্যাচার। একদিন সে বিশ্ববিজয় করেছিল। আজিও তার সভ্যতা উত্তর আফ্রিকার একপ্রান্ত হ'তে আরব ও ইরাক অবধি বিস্তৃত। পারস্য, পাকিস্তান, আফগানিস্থান মায় ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমান মক্কায় তীর্থযাত্রা করবার আশা পোষে বক্ষে। কিন্তু একটা কথা স্বীকার না করে উপায় নাই। আরবের সভ্যতা এবং পয়গম্বর প্রদর্শিত ধর্মপথ যাদের নব জীবন দান করেছিল, তারা বিলাসিতার ও সাম্রাজ্যবাদের কুহকে ইসলামের রূপ বদলে দিল। আরবের মরুভূমির আরব কিন্তু নিজের বিশিষ্টতা ছাড়লে না। ইবন্ সৌদের ওহাবী মত, পীর পূজা প্রভৃতিকে পৌত্তলিকতার রূপান্তর বলে নির্দেশ করেছে। যে আরব দেশ ছেড়ে সাম্রাজ্য শাসনে গিয়েছিল তার চরিত্রের সরলতা বিলুপ্ত হয়েছিল। তাতার যেমন বিলাসী তেমনি সাহসী। কাজেই আরবের বাহিরে তার গৌরবকে ম্লান করলে তাতার। শেষে আরবের দেশও তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হ'ল। বেদুইন তাতারের নিকট হেঁটমুণ্ড হ'ল না। কোনো আরব নিজের ভাষা বা জীবন-ধারা ছাড়লে না।

ইংরাজ ও ফরাসী, আরব, ইরাক, ট্রান্সজর্দান, প্যালেস্টাইন প্রভৃতিকে তুর্কীর কবল হ'তে মুক্ত করেছে। কিন্তু সে পাপ মোচনের উদ্দেশ্য ছিল—তুর্কীকে ধ্বংস করা। সে চক্রান্ত কর্মের অপ্রত্যক্ষ ফলে হ'ল এশিয়ার মুক্তি। ইংরাজ সেদিন ভাবেনি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিজয়ের মাঝে থাকবে তার সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ। সে জানতো চিরদিন এশিয়ায় তার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। সে আধিপত্যকে সরল ও নির্বিবাদ করবার জন্য প্রত্যেক দেশকে টুকরো ক'রে চতুর ইংরাজ-রাষ্ট্রনীতি একই জাতির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্ঘের সৃষ্টি করেছে। আজ ইংরাজ নাই, কিন্তু সাত টুকরা আরব আছে—দুই টুকরা হিন্দুস্থান আছে এবং তুচ্ছ স্বার্থের প্রতিযোগিতা আছে অতি মাত্রায় খণ্ডিত প্রদেশগুলিতে।

আরবের স্বাধীনতা সংগ্রামে টি, ই, লরেন্সের সহায়তার আখ্যায়িকা অসাধারণ ধীরতা, বীরতা এবং পরিশ্রমের ইতিহাস। কিন্তু তার রিভোল্ট অফ্ দি ডেজার্ট নামক পুস্তক পড়লে বোঝা যায়, আরব-প্রীতি তার প্রাণে মোটেই ছিল না। তার প্রেরণার মূলে ছিল কায়জারের জার্মানী বিদ্বেষ এবং জার্মানীর মিত্র তুর্কীর শাস্তির বিধান।

আরব-জাতি আকাশ ভালোবাসে। দিনের শেষে আরব পরিবার পরিজন নিয়ে ছাদে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারার মালা দেখে মনে মনে নিশ্চয়ই অনুরূপ আরবী ভাষায় বলে—ওগো নভোমণ্ডল নীল স্বরূপ

কে দিল তোমারে এরূপ রূপ।

মিশর বহু জাতির মিলন ক্ষেত্র। তার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে আছে পিরামিড, মন্দির, শবাধার এবং স্ফিনকস। লণ্ডনে নদীর ধারে আছে ক্লিয়োপেট্রার নিডল্ (সূচ) নামক এক বৃহৎ পাথরের স্তম্ভ। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, এল্বার্ট ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ম, ফরাসী দেশের লুভের যাদুঘর—এমন কি আমাদের কলিকাতার সংগ্রহ-শালায় প্রাচীন ইজিপ্টের শিল্প সম্পদের টুকরা মাত্র নবীন মানুষের প্রশংসার বস্তু। কিন্তু প্রাচীন মিশরের আসল কোনো সম্পদ, তার ভাবরাজ্যে বিশেষত, মানুষের হাতে আজ নাই। কারণ ফারাওহদের মিশর টলেমির ইজিপ্টে পরিণত হয়ে গ্রীক্ সভ্যতার সার বস্তু টেনে নিয়েছিল। তারপর যখন রোম এলো, তখন কৃষ্টির নিদর্শন বিলোপের যুগ প্রবর্তিত হ'ল। তারপর তুর্কী-বিজয় প্রাচীন কৃষ্টিকে নিমজ্জিত করলে নীলনদের জলে বা ভূমধ্য-সাগরের পরিধির মধ্যে অগ্নির দাহিকাশক্তির সহায়তায়। লোকে ফেলাহীন বা কৃষক শ্রেণীকে প্রাচীন ইজিপ্সীয়ের বংশধর ব'লে নির্দেশ করে। সে আমাদের পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষকের মত। তারা প্রাচীন হিন্দু বা বৌদ্ধের বংশধর। কিন্তু পূর্ববঙ্গের কৃষক পূর্ব-পুরুষের সংস্কৃতি, গৌরব বা ভাবধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তবু সে পূর্ব-পুরুষের ভাষাভাষী। মিশরের ফেলাহীন জানতেও চাহে না, মানতেও চাহে না যে সে প্রাচীন পৌত্তলিক জাতির বংশধর। সে জানে যে সে মুসলমান—ভাষা তার আরবী। সুতরাং যেমন নেমাজের কালে, তেমনি সকল সময়ে তার দৃষ্টি মক্কার দিকে। অনেকে মিশ্র আরবী বা তাতার।

ফেলাহীনকে দেখলেও বোঝা যায় তার ধমনীতে বহু

রক্ত বহমান। অনেকের ওষ্ঠ স্পষ্ট নিগ্রোর মত। কেহ আরবের মতো। সুতরাং সে প্রাচীন মিশরবাসীর অবিমিশ্র সন্তান, এ ধারণা নির্ভুল নয়।

ইজিপ্তে দেখা যায় বহু জাতি বহু পোষাক। চোখে পড়ে, বহু স্তরের ও প্রকারের সভ্যতার নিদর্শন। কলিকাতার রাজপথে যেমন—'কেহ নাহি-জানে কার আহ্বানে কত-মানুষের ধারা' বহমান, ইজিপ্তের কায়রো প্রভৃতি সহরের তেমনি অবস্থা। তবে চৌরঙ্গীতে বা চাঁপাতলায় উট্ দেখতে পাওয়া যায় না, পোর্ট-সৈয়দ, কায়রো প্রভৃতি সহরের পথে রোল্স্ রয়েসের সঙ্গে উট্ও চলে। অবশ্য দিল্লী আগ্রা,বেনারস বা লক্ষৌতে উষ্ট্র দুর্লভ-দর্শন নয়।

কায়রোর হাওয়াই-আড্ডা সংলগ্ন ভোজনালয়ের লম্বা খোলস-পরা পরিবেশক ফেলাহীনরা অল্প স্বল্প ইংরাজি বলে। হোটেলের বাগানে পান-ভোজনের জন্য টেবিল আয়োজন। অনেক মুসলমান বেগম য়ুরোপীয় পোষাকে সেখানে আসেন। প্রথমে আরমানী বা য়িহুদী ভ্রম হয়। কিন্তু শুনলাম তাঁরা পাশাদের বেগম।

ইংরাজ-শাসনের অবসানের জন্য ভারতবর্ষ তথা মিশর বিবিধ মতে চেষ্টা করেছে। কত স্বার্থ বলি দিতে হয়েছে, কত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে এতদুভয় দেশের সু-সন্তানের, সে কাহিনী ইতিহাসের পাতায় সুবর্ণ অক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে। ১৯২২ সালে ইংরাজ মিশরের স্বাধীনতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু মাত্র গত বৎসর সৈন্য অপসরণ করেছে মিশর হ'তে। এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে ইংরাজ শাসনের দিনে মাত্র মুষ্টিমেয় নরনারী পাশ্চাত্য সামাজিক রীতিতে আত্ম-বিস্মৃত হয়েছিল; আজ বহুলোক তাদের সমাজের বাহিরের আবরণটুকুতে নিজেদের অঙ্গের শোভা বাড়াবার চেষ্টা করছে। আত্ম-প্রশংসা যেমন পাপ, গৃহ-লক্ষ্মীদের দোষের কথা বলাও তেমন। কিন্তু স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। মিশরের এবং ভারতের শিক্ষিত মহলে ইংরাজ ও ফরাসী বিদ্বেষ দিন দিন যত বাড়ছে, তাদের রীতি অনুকরণের স্পৃহাটাও তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে। পুরাতন চিকিৎসক মুসলমান মহিলার নাড়িটিপতে পারতেন না। আজ মিশরে তাদের কুলের বহু মহিলা পুরুষের বাহু পাশে ওয়ান-স্টেপ ফক্সট্রট প্রভৃতি নৃত্য কলার আশীর্বাদধন্যা। আজ অল্প মাত্রায় তেমনি কলিকাতায় চৌরঙ্গীর হোটেলগুলায় এ দৃশ্য দেখা যায়। পরিবর্তনশীল জগতের ইহা একটা বিকাশ—মধুর কি তিক্ত, সে সিদ্ধান্তের ভার ভাবীকালের ইতিহাসের হাতে।

ভারতবর্ষের মত ইজিপ্তেও ইংরাজ ও ফরাসী নিজ নিজ সাম্রাজ্যের ভিদ্ গাড়তে ব্যস্ত ছিল। ফরাসী প্রথমটা কৃতকার্য্য হ'য়েছিল। কিন্তু মহম্মদ আলির স্বদেশ-প্রেম মিশরকে উন্নত করেছিল। শেষে ইংরাজের খপ্পরে পড়লো ইজিপ্তের খেদিভ।

ইজিপ্তের খ্যাতনামা স্বদেশ-সেবক আরবী পাশা ছিলেন ফেলাহীন। তিনি মাত্র য়ুরোপীয় কেন, তুর্কী ও কারকেসিয়ার বিরুদ্ধেও আন্দোলন সুরু করেছিলেন। মিশর লীল মিশরীয়ীন তাঁরই যুগান্তকর ধ্বনি। মিশর মিশরীয়ের! সত্যই তো এ শত্রু থাকলে ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদ চোট খায়। যুদ্ধও বাধলো। ১৮৮২ সালে তেলেল কবীরের যুদ্ধে আরবী পাশা পরাস্ত হলেন। খেদিভ তাঁকে হত্যা করতে চাহিলেন। ইংরাজ মহত্ত্ব দেখিয়ে আরবীকে লঙ্কাদ্বীপে নির্বাসন করলেন। বেচারা ভাঙ্গা বুক নিয়ে ১৯২১ সালে দেহত্যাগ করেন।

আরবী পাশার নির্বাসনে সিংহাসন গেল ইংরাজের অধীনে। ঠাট্ ঠিক বজায় রহিল—খেদিভ—গণ-সভা, বিশ্ব-বিদ্যালয়, বন্দর ও বিলাস—গেল কেবল প্রকৃতশক্তি। পুতুল-নাচের কলকাঠি রহিল ইংরাজের হাতে।

য়ুরোপের বাজারে দরদস্তর নাই। মিশর প্রাচ্য দেশ। আরমানীর দোকানে নানা সুন্দর পণ্য বিক্রয় হয়। হাতে-আঁকা একটু ব্যঙ্গ ছবি। পুরাতন ইজিপ্তীয় চেহারা চামড়ার ব্যাগে উৎকীর্ণ। মেয়েদের বড় প্রিয়। ছোট ছোট কার্পেট বিক্রী হয়, সে গুলা মোটেই মিশরের তৈরী নয়। আমি নির্ভীকভাবে দর করতে লাগলাম। আমাদের নিউ মার্কেটে ঐ পদার্থ আরও সস্তায় যদি পাওয়া যায় তা হ'লে সেখানে কিনব কেন—এককথায় চতুর আরমানী বিব্রত হ'ল।

একটা কাগজ-রাখা ব্যাগ কলিকাতার কল্পিত দাম ব'লে খরিদ করলাম। কতকগুলা চিত্র সংগ্রহ করলাম কিন্তু নিশ্চয়ই দোকানীর দুধে হাত পড়লো না। অবশেষে বল্লে—তুমি আমাদের একজন। এ দাম য়ুরোপীয়দের কাছে বলবার প্রয়োজন নাই।

—মোটেই না।

বাস্তবিক পরক্ষণে লোকটা একজন সাহেবকে অনুরূপ পদার্থ তিন সিলিঙ্ অধিক দামে বিক্রয় করলে।

যাক্ তুচ্ছ কথা। তবে সকল দেশেই এ কথা ঠিক যে—কিনিলেই কোনো দ্রব্য দাম চাহে যত অসভ্য। এবং ঝোঁপ বুঝে কোপ মারা চাতুরী বিশ্ব জুড়ে।

দ্বারমণ্ডল

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

জংশন শহর, দ্বারমণ্ডল বিচিত্র স্থান।

অরুণা বলিয়াছিল—এইটুকু জায়গায় অজয় কোথায় লুকাইয়া থাকিবে? কিন্তু এইটুকু জায়গা বলিতে যে কথাটা বুঝায়, জংশন দ্বারমণ্ডল তাহা নয়। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তাহার পরিধি খুব বড় নয়, কিন্তু জটিলতায় সে অত্যন্ত কুটীল। একটা মহানগরীতে যাহা আছে—এখানেও তাহার সবগুলিই আছে, অবশ্য কম পরিমাণে। কিন্তু জট—সে ছোটই হউক আর বড়ই হউক—সে পাকাইয়া উঠিলে জমিয়া গেলে—তাহার প্রকৃতি এক।

এইটুকু জায়গা—কিন্তু শহরের মতই এখানে কেহ কাহাকেও বড় চেনে না। গলি ঘুঁজি পাড়া-পটী জাতি-সম্প্রদায় এখানে মিশাইয়া চালে ডালে সরিষায় একাকার হইয়া গিয়াছে।

অরুণা নিজেই কয়েক দিন উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইল। হাটে বাজারে সকাল হইতে নয়টা পর্যন্ত ঘুরিয়া ইস্কুলে যাইত, ইস্কুলের ছুটির পর—আবার একদফা ঘুরিত। ষ্টেশনে গিয়া ঘুরিয়া দেখিত। এই সময়েই কলিকাতার গাড়ীতে খবরের কাগজ আসে। এ যুগের ছেলেরা খবরের কাগজের আকর্ষণ অনুভব করিবে ইহা স্বাভাবিক। আরও একটা কথা—আপ এবং ডাউন ট্রেণ দুইটার এইখানেই—এই সময়ে ক্রসিং হয়। কোথাও গেলে এলেও নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। ওভার-ব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে। ষ্টেশনের বাহিরেই যেখানটা হইতে বাস ছাড়ে—সে জায়গাটাও নজরে পড়ে। মোটর বাসেরও এখান হইতে চার পাচটা রুট আছে।

ট্রেণ আসে, প্লাটফর্মটায় চাপবন্দী মানুষ শুধু নড়ে চড়ে। মৌমাছির চাকে ফু দিলে—কি খোচা দিলে—মাছিগুলার মধ্যে যেমন একটা চাঞ্চল্য জাগে, ভন ভন শব্দ করিয়া সাড়া তোলে—ঠিক তেমনি ভাবেই—চলা-ফেরা নড়া-চড়া ও কলরব করিয়া একদল মানুষ গাড়ী হইতে নামে, একদল ওঠে, গাড়ী দুইখানা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাঁশী বাজাইয়া হুস-হুস শব্দে ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিয়া যায়, প্লাটফর্ম দুইটা আবার শান্ত জনবিরল হইয়া পড়ে। অরুণা আরও কিছুক্ষণ থাকে ওই ওভারব্রিজের উপর। লোকগুলি বিভিন্ন রাস্তায় ছড়াইয়া পড়িয়া মিশিয়া যায়, জংশন শহরের গলি ঘুঁজির মধ্যে—আর তাহাদের চিনিয়া বাহির করা যায় না! অরুণা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে; আরও কিছুক্ষণ ওভারব্রিজের উপর দাঁড়াইয়া দূর সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত রেললাইনের দিকে চাহিয়া থাকে; তারপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া একবার রামভরোসার সঙ্গে দেখা করে। রামভরোসাকে সে বলিয়া রাখিয়াছে—ট্রেণের সময় সেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে।

রামভরোসা খুব ভাল করিয়া না-হইলেও অজয়কে দেখিয়াছে এবং চিনিতে পারিবে বলিয়াই মনে করে।

—রামভরোসা। অরুণা কাছে আসিয়া দাঁড়ায়।

—নেহি মাঈজী! রামভরোসা বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে। অর্থাৎ সে কোন সন্ধান পায় নাই।

অরুণা সেখান হইতে ফিরিয়া ষ্টেশনের বাহিরে—নলিনের গিরিন-কেবিনের সামনে গিয়া দাঁড়ায়।

নলিনকেও সে বলিয়াছে। নলিনও তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। নলিনও অজয়কে দেখিয়াছে। নলিন বলিয়াছে—একবার দেখলে কি হবে—তিনি যে একেবারে তাঁর বাপের মত দেখতে; বিশ্বনাথবাবুকে যে দেখেছে সে তাকে দেখলেই চিনতে পারবে।

শুধু কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। একদিন একখানি ছবি বাহির করিয়া অরুণার হাতে দিয়া বলিয়াছিল—দেখুন ঠিক হয়েছে কিনা।

একটু হাসিয়া কাঁধ দুইটা নাড়িয়া অস্বস্তি প্রকাশ

করিয়া বলিল—আমরা তখন তো ছেলেমানুষ—বিশ্বনাথবাবুকে দেখতাম কঙ্কনার ইস্কুল যেতেন, দেবু ঘোষের কাছে আসতেন; তখন ফাষ্ট কেলাসে পড়তেন। একদিন, মনে আছে—আকাশে খুব মেঘ করেছে, আমি মেঘের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখছি মেঘগুলা ফুলছে—ফাঁপছে—আর হরেক রকম ছবি হচ্ছে। এই একটা পাহাড়ের চূড়ো—দেখতে দেখতে এই একটা মানুষ হয়ে গেল—তার পরেই দেখতে দেখতে হয় তো লম্বা হয়ে কেটে দুখানা হয়ে হ'ল চারপাওয়ালা একটা জন্তু। বিশ্বনাথবাবু দেখে—আমাকে ডেকেছেন—তা' আমি শুনতেই পাই নাই। তখন চুপি-চুপি এসে কাছে দাঁড়িয়েছেন। আমার মুখটা হা হয়ে গিয়েছিল—তিনি একটা পাকাকলা ছাড়িয়ে আমার মুখে টপাস্ করে ফেলে দিলেন। বোশেখ মাস—কাদের ফলদানের ব্রতের কলা পেয়েছিলেন, সেই কলা। আমি বেকুব হয়ে মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালাম, তো জিজ্ঞাসা করলেন—হাঁ ক'রে কি দেখছিলি। আমি লাজে বলতে পারি না—তিনিও ছাড়েন না। শেষে বললাম—মেঘে ছবি দেখছিলাম। তা', তিনি বললেন—মেঘে ছবি? সে কি? আমি বললাম—হ্যাঁ, মেঘে ছবি হয়। পাহাড় হয়—মানুষ হয়, আবার জন্তু জানোয়ার হয়—কত রকম হয়। তিনি বললেন—কই দেখা আমাকে। তখন দেখালাম। তিনি আমাকে যে আদর করেছিলেন' পরের দিন একটা লালনীল পেনসিল কিনে দিয়েছিলেন। সেই দিনকার তার মূর্ত্তি—আমার চোখে জলজল করছে। বুঝেছেন না, সেদিন যখন অজয়বাবু নামলেন—ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে—আমি একেবারে চমকে উঠেছিলাম। ঠিক যেন তিনি।

একটু হাসিয়াছিল নলিন—তাহার স্বভাবগত সেই সলজ্জ অপ্রতিভ হাসি। হাসিয়া বলিয়াছিল, কাল বিকেলে আপনি বললেন, অজয়ের খোঁজ করতে, রাতে বাড়ীতে গিয়ে—ভাবতে ভাবতে সেই সব কথা মনে হ'ল। তা পরেতে এঁকে ফেললাম ছবিখানা। বলি—দেখি—কেমন মনে আছে। তা—দেখলাম ঠিক মনে আছে।

আবার বারকয়েক ঘাড় নাড়িয়া, অস্বস্তিকর অঙ্গভঙ্গি করিয়া—বোধ হয় সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়াই বলিল—আপনি তো সে সময়ের বিশ্বনাথবাবুকে … আপনি তাকে—। কথাটা আর শেষ করিল না সে, একটু বিচিত্র হাসি হাসিল। বোধ হয় বুঝাইতে চাহিল যে, সে বিশ্বনাথ ছিল অপরূপ অপূর্ব্ব। পরবর্ত্তী কালের শহরের মার্জ্জনায় উজ্জ্বল—যুবক বিশ্বনাথ অপেক্ষা—সেই কিশোর বিশ্বনাথ অনেক মনোহর ছিল।

অরুণা হাসিল। কোন কথা বলিল না। কেমন করিয়া বলিবে—সেই কিশোর বিশ্বনাথই তাহার ভালবাসার দেউলে দেবতার মত অক্ষয় হইয়া আছে! কিন্তু এই বিচিত্র গ্রাম্য চিত্রকরটির আশ্চর্য্য শক্তিতে সে বিস্মিত হইয়া গেল। বিশ্বনাথের কৈশোর, ফাষ্টক্লাসের ছাত্র বিশ্বনাথ, সে তো আজ হইতে আঠারো উনিশবৎসর পূর্ব্বের কথা! সেই দিনের একটি বালকের চিত্তে সমাদরের স্মৃতি হয় তো অক্ষয় হইয়াই আছে, তবু সেই স্মৃতি হইতে এমন ছবি আঁকা তো সহজ নয়! প্রসন্ন মুগ্ধ দৃষ্টিতে অরুণা নলিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নলিনের শক্তির কথা তার না-জানা নয়। দেবু তাহাকে দিয়া যে সব প্রাচীর পত্র আঁকাইয়াছিল সেগুলি সত্যই ভাল হইয়াছিল; নলিনের হাতের তৈয়ারী পুতুল এখানে তো সকলের চিত্ত জয় করিয়াছে, এই সেদিন—সেই বুড়া পুতুলটা লইয়া কঙ্কনার বাবুদের সঙ্গে যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল—তাহার মূলে তো ছিল সে নিজে। কিন্তু সে শক্তির সঙ্গে এ শক্তির অনেক প্রভেদ। অনেক! মুহূর্ত্তের জন্য সে আপনার কথা ভুলিয়া গেল, মুগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে নলিনের দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি এত ভাল ছবি আঁক নলিন? এত ভাল!

নলিন একেবারে লজ্জা ও সঙ্কোচের অস্বস্তিতে অধীর হইয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া অনবরত ডান হাতখানা দোলাইতে সুরু করিল।

—এটা আমি নিলাম নলিন।

—বেশ। বেশ। নিন। হ্যাঁ—ও তো আপনার লেগেই—। মানে আমি নিয়ে কি করব?

—কি দিতে হবে বল?

—কি দেবেন? অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল সে!

—হ্যাঁ।

নলিনের পয়সার গরজের কথা অরুণা জানে।

নেন। আমি এঁকেছিলাম—বলি—দেখাব আপনাকে যে, অজয়কে দেখলেই আমি চিনতে পারব। বলিয়াই সে হনহন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। খানিকটা গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—আপনাকে খুব ভক্তি করি আমি। আগে ভয় লাগত। যে দিনে কঙ্কনার বাবুদের ছেলেটার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নিয়েছিলেন—সে দিনে খুব খারাপ লেগেছিল। কিন্তু এখন আপনি দেবতা হয়ে গিয়েছেন, খুব ভক্তি হয় আমার। মায়ের মতন ভক্তি করি।

অরুণার চোখের স্নায়ুগুলির প্রকৃতি হৃদয়ের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাইয়া গিয়াছে। আজকাল সহজেই চোখে জল আসে। একটা ভূমিকম্পে যেন পাথরের শক্ত দেশ ফাটিয়া তলদেশের জলের উৎসগুলি উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। অরুণা কাঁদিতে চাহে নাই—তবু চোখে জল আসিয়া গেল। তাড়াতাড়ি সে আঁচল দিয়া চোখের জল মুছিল।

নলিন বলিল—চোখে আমার পড়তেই হবে। আমি ঠিক সন্ধান বার করব। আমি ইষ্টিশানের ফটক আগুলে বসে থাকি। আমার চোখ এড়িয়ে যাবে কোথা?

আজ সে ষ্টেশন প্লাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া নলিনের গিরিন-কেবিনের সম্মুখে দাঁড়াইল।

—নলিন!

নলিন খুব ব্যস্ত। অনেক পুতুল লইয়া সাজাইতে বসিয়াছে। গিরিন-কেবিনের কাঠের সেল্‌ফের পিছন দিকে পুতুলের ঝুড়িগুলি হইতে সন্তর্পণে প্রত্যেক রকমের পুতুল দুইটা একটা করিয়া বাহির করিতেছিল। সে বোধ হয় তন্ময় হইয়া গিয়াছে। কথা সে শুনিতে পাইল না।

সামনেই বাসগুলা দাঁড়াইয়া আছে। যাত্রীরা কতক বাসে চাপিয়াছে, কতক চা-পান-মিষ্টির দোকানে বসিয়া আছে।

—নলিন!

—কে?

মুখ বাড়াইয়া অরুণাকে দেখিয়া নলিন বলিল—অ।

সে বাহির হইয়া আসিল।—আমি বুঝতে পারি নাই।

—খোঁজ কিছু পাওনি?

—না। আমি খুব ব্যস্ত। মানে গাজন এসেছে কি না! মেলা যাব। তা-ছাড়া গাজনের সঙের লেগে—এবারে আবার ছবি এঁকে দেবার ভার পড়েছে। কাল থেকে আর একবারও বেরুতে পারি নাই। আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক খোঁজ করব।

অরুণা সেখান হইতে চলিয়া আসিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল।—"আমি ঠিক খোঁজ করব।" আর কবে খোঁজ করিবে? আজ এক সপ্তাহ অজয়ের মা আসিয়াছে, তাহারও এক সপ্তাহ পূর্ব্বে—অজয় আসিয়া চলিয়া গিয়াছে। এতদিনের মধ্যে কেহই তাহাকে দেখিল না?

এবার সে ফিরিল। এইবার গৌরের কাছে যাইবে। গৌরকেও সে বলিয়াছে। তাহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তনের ফলে—রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগ প্রায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দলের প্রত্যেক সভ্যটিই তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে; সেও সরিয়া আসিয়াছে। কাছাকাছি হইলেই পরস্পরের অন্তরের উত্তাপের সংঘর্ষণে বজ্রপাত হইবার সম্ভাবনা ঘনাইয়া উঠে। কিন্তু গৌরের সঙ্গে তাহার অন্তরের যোগ যেন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। বিচিত্র ছেলে; অদ্ভুত প্রাণশক্তি। কোন মতবাদ, কোন দলবাদ তাহার প্রাণশক্তিকে আচ্ছন্ন বা আয়ত্ত করিতে পারে না। অপরে যেখানে ভাসিয়া যায় প্রবল স্রোতে—সেখানে সে স্বচ্ছন্দে মাথা জলের উপর তুলিয়া সাঁতার কাটিয়া চলে। গান গায়, পা আছড়াইয়া জল ছিটাইয়া কৌতুক করে। দূরের খাতে যে বা যাহারা সাঁতার কাটে, ভাসিয়া চলে—তাহাদের সঙ্গে চীৎকার করিয়া আলাপ করে। আশ্চর্য্য! গৌর লেখাপড়া শেখে নাই, গৌর মূর্খ; স্বর্ণ দেবু লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে কথা যাক। বিচিত্র গৌর, অদ্ভুত ছেলে। সংসারের সকল দিক দিয়াই আশ্চর্য্য রকমে নিজেকে মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। খবরের কাগজ বিক্রী করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। স্বর্ণ ও দেবুর সংসারে মাসে দশ টাকা হিসাবে দেয়, দুই বেলা ভাত খায়। বাস। টাকাটা নিয়মিতই দেয়, কিন্তু খাওয়াটা নিয়মিত নয়। জংসনের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাইকেল ঠ্যাঙাইয়া কাগজ বিলি করিয়াই বাহির হইয়া যায়—পুরাণো দ্বারমণ্ডল; সেখানে এবং কাছাকাছি দুখানা গ্রামে একখানা হিসাবে দুখানা কাগজ বিলি করিয়া জংসনে ফিরিয়া আসে।

ফিরিয়া আসিবার কথা কিন্তু সব দিন ফেরে না। কোথায় কাহার বাড়ীতে কোন দিন আড্ডা জমাইয়া—ভাত হোক—চিঁড়া মুড়ি হোক—খাইয়া রাত্রি কাটাইয়া—সকালে আর একদফা সাইকেল ঠ্যাঙাইয়া আরও খান দশেক গ্রামে খান পনের কাগজ ফেলিয়া দিয়া নাগাদ এগারটা ফিরিয়া আসে। তুই একদিন তাও আসে না। দিনের খাওয়াটাও কোথাও খাইয়া—ফেরে আপ ট্রেণের ঠিক আগে। এইটিতে কখনও ভুল হয় না। স্বর্ণ দেবু এবং অন্যান্য সহকর্মীদের ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া সে অরুণাকে বলিয়াছিল—ভারী ইয়ে হল—অরুণা দি! এদের ধারাধরণ দেখে—

হাসিয়া অরুণা বলিয়াছিল—কিয়ে হ'ল? তোরও শেষে লজ্জা হল গৌর?

—না—না—না। লজ্জা-টজ্জার ধার আমি ধারি না। ইয়ে মানে দুঃখ! দুঃখ হল! কি রকম এরা? আমি তো—। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিয়াছিল—আপনার মধ্যে কি পরিবর্ত্তন দেখলে ওরাই জানে! আপনি তো সেই মানুষই আছেন। শুধু থান কাপড় পরেছেন আর একাদশী করেছেন—এতেই ক্ষেপে গেল ওরা? স্বর্ণকে সেদিন আমি বলেছি। তুই যে ঘরে সন্ধ্যে প্রদীপ জ্বালিস, ধুনো দিস, গো মাংস খাস না।

—থাক—থাক। আর পণ্ডিতি করতে হবে না গৌর, তুই থাম।

—কেন? এর আবার পণ্ডিতি কোথায়? ওগুলো তো এতদিন ধ'রে ধর্ম্মের নামেই চলে আসছে। স্বর্ণ-ই বল, আর দেবুই বল—এগুলো যে ওরা মানে—সে তো সেই ছেলেবেলার মেনে আসা থেকেই মানছে।

—ওরে গৌর। ও সব কথা থাক। কারুর দোষ ধ'রে খুঁত ধ'রে বিচার করতে আর আমার ভাল লাগে না ভাই। স্বর্ণ কি দেবুবাবুর নিন্দে তুই আমার কাছে করিস নে। ওতেও আমি দুঃখ পাব। ওরা আমার নিন্দে করেছে শুনলে যত দুঃখ পাব, তার চেয়ে কম দুঃখ পাব না।

গৌর আবার অতি স্বল্প মৃদু একটু হাসিয়া বলিয়াছিল—অরুণা দি, আপনি কিন্তু সত্যিই খানিকটা পাল্টেছেন। এইবার আমার চোখে সেটা ধরা পড়ল। আগে আপনি দুঃখ পেতেন না। নিজের নিন্দেতেও না; রাগে জ্বলে উঠতেন। এখন পরের নিন্দেতেও দুঃখ পাচ্ছেন। চোখে আপনার জল আসছে। কাঁদতে সুরু করেছেন। পরিবর্ত্তন আপনার হয়েছে।

অরুণা বলিয়াছিল—মানুষ তো পালটাবেই ভাই। সেই তো নিয়ম।

—সে অবস্থা পাল্টালে—যে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষ যুদ্ধ করে সেটা ভাঙলে তখন সে পাল্টায়।—যাক্ গে। আপনি পালটেছেন তাতেই বা কি? আপনাকে আমার ভাল লাগে, ভালবাসি। সেটা কেন যাবে? সেটাই যদি যায় তবে আর—ওই ঠাকুর মশাই—আপনার দাদাশ্বশুরকে দোষ কি? যার সঙ্গে তাঁর মতে মেলে নি তিনি তাকেই বর্জ্জন করেছেন, কটু কথা বলেছেন। ছেলে নাতি—

—না—না। গৌর, তাঁর সমালোচনা থাক। ও সব বলিস নে। কারুর নিন্দেতে কারুর সমালোচনাতেই আর দরকার নেই ভাই! আমায় তোর ভাল লাগে, আমায় ভালবাসিস, আমার একটা কাজ কর। তুই তো ভাই জংশন শহরের, শহরের চারিপাশের সর্ব্বজ্ঞ, সবই তো তোর নখদর্পণে; অজয়ের সন্ধান আমায় করে দে। তুই তাকে ভাল করে চিনিস, তার সঙ্গে সঙ্গে কাশী গিয়েছিলি, তুই তাকে খুঁজে বের করে দে। আমি যে তার মায়ের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারছি না!

গৌর বলিয়াছে আচ্ছা। তিন দিনের মধ্যে তোমাকে খবর এনে দিচ্ছি।

তিন দিন আজ সাত দিন হইয়া গেল। গৌরও কোন সন্ধান আনে নাই। আজ আবার দিন তিনেক গৌরেরই কোন পাত্তা নাই। গৌরের কাগজ-বিলির কাজ করিতেছে অন্য একটি ছেলে। দলের মধ্যে আবার গৌরের একটি নিজস্ব দল আছে। সেই দলের একটি নতুন ছেলে। অরুণা তাহাকে গতকাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—তুমি কাগজ দিচ্ছ, গৌর কোথায়?

—ব'লে তো যায় নি। আমাকে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিল, আমি তো সদর শহরে থাকি; খবর পাঠিয়েছিল—পত্রপাঠ আসবে, ডাউন প্লাটফর্ম্মে ডাউন ট্রেণের সময় আমার সঙ্গে দেখা করবে। দেখা হ'ল তখন গৌর দা ট্রেণে চড়েছে। বললে আমি যত দিন না—ফিরি, কাগজ বিলির ভার তোমার রইল। [illegible]

জান তাই তোমাকেই আনালাম। বলতে বলতে ট্রেণ ছেড়ে দিলে।

গৌর কবে ফিরিবে কে জানে!

সেই খোঁজেই সে চলিল। গৌর ফিরিয়াছে কিনা খোঁজ করিতে হইবে। ওভার-ব্রিজের উপর হইতে যতটা সে লক্ষ্য করিতে পারিয়াছে তাহাতে গৌর নামে নাই। তবে রাজনীতিক দলের কর্ম্মী ফিরিল কিনা ওই-টুকু লক্ষ্য করিয়াই বুঝা যায় না। আগের ছোট ষ্টেশনে নামিয়া থাকিতে পারে। তারপর পায়ে হাটিয়া ফিরিবে বা ফিরিয়াছে হয়তো।

বাজারের পথ ধরিল সে।

চৈত্র মাসের অপরাহ্ণ। জংসন শহরের পথ ঘাট ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে। পা ফেলিতেই ধূলা উঠিতেছে, ছাইয়ের মত। মিউনিসিপালিটির একচেটিয়া এক বলদের জলের গাড়ী হইতে টিনে জল ভরিয়া রাস্তায় জল ছিটাইবার ব্যবস্থা আছে; সেই জল ছিটানো চলিতেছে। কিন্তু সে এতই অপর্য্যাপ্ত যে একঘণ্টা হইতে না হইতেই সে জলের আর চিহ্নমাত্র থাকে না। লোকে এ অঞ্চলের উপমায় বলে—হাজারকি মুড়কির ভিয়েন! অর্থাৎ—অতি কম পরিমাণে গুড় দিয়ে—এক হাজার খইয়ের মধ্যে একটি খইয়ে গুড় মাখাইয়া যে নামমাত্র মুড়কি করা হয়—এও তাই। ধূলার হাত হইতে আপন আপন দোকানের জিনিষপত্র বাঁচাইতে অনেক দোকানদার এই কারণে দোকানের সামনে—নিজেরা আর এক দফা জল দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দুই দলে জল লইয়া বেশ উল্লাস করিতেছিল।

একজন দোকানী অকস্মাৎ হাকিল—এই, আস্তে। এই জল। এই! শেষটা চীৎকার করিয়া বলিল—ওরে এই জলওয়ালা—উল্লুক।

—আজ্ঞে?

—কালা হয়েছিস না মাতন লেগেছে? দেখছিস না উনি যাচ্ছেন! জলের ছিটে লাগবে। ওঁকে যেতে দে।

বিস্মিত হইয়া গেল অরুণা।

—যান মা, চলে যান আপনি।

দ্রুত অরুণা পার হইয়া গেল। সে নিচের দিকে চোখ রাখিয়াই চলিতেছিল। জংসন স্থানটি একটি কুৎসিত জায়গা। ভাল এবং মন্দ লইয়াই সংসার, সব কিছুর মধ্যেই ভালও আছে মন্দও আছে। জংশনে মন্দের পরিমাণটাই বেশী। এখানকার ওই এক তরুণ সম্প্রান্ত চুড়িদার পাঞ্জাবী, ফাইন ধুতি ও নিউকাট জুতো পরা ক্লাব-বিহারীর দল, আর এই বাজারের একদল যাদের মধ্যে বিড়িওয়ালা হইতে ষ্টেশনারী দোকানের দোকানদার আছে—যাহাদের বক্র ও শীলতাহীন ইঙ্গিতে এপথে হাটিবার উপায় ছিল না। অরুণাদের একটা নামও আবিষ্কার করিয়াছিল উহারা। রাধে। অরুণা কি স্বর্ণ—কি অমনি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তরুণীকে দেখিলেই তাহারা আকস্মিক চীৎকার করিয়া সকলকে সচকিত করিয়া তুলিত—রা—ধে! জয় রাধে!

কতদিন অরুণার দেহের মধ্যে রক্ত যেন টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, মনের মধ্যে বিদ্রোহ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, মস্তিষ্কের স্নায়ুশিরা প্রচণ্ড ক্রোধে ছিঁড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হইয়াছে; চোখের দৃষ্টিতে আগুনের ছটা ঝিলিক মারিয়াছে।

কাব্যের রাধা নয়, ব্যঙ্গের রাধা। নীচ অশ্লীল মন যাহাদের, তাহারা ভস্মকে জলে গুলিয়া কাদা করিয়া শিবের অঙ্গে মাখাইয়া দেয়। রাধার নামে স্বৈরিণীর কলঙ্ক লেপিয়া কদর্থের ইঙ্গিত দিয়া তাহাদের মর্য্যাদা তাহাদের চরিত্র তাহাদের জীবনকে ধূলায় মিশাইয়া দিতে চায়! মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিত। সেই কারণেই অরুণা এ দিকটা দিয়া বড় একটা হাটিত না।

আজ প্রথমেই তাহার সন্দেহ হইয়াছিল—ব্যঙ্গ করিতেছে না—তো!

না।—"যান মা, চলে যান" কথাটা শুনিয়াই সে সন্দেহ তাহার ঘুচিয়া গেল। না—এ ব্যঙ্গ নয়। সে চোখ তুলিল।

রাস্তায় জনতা ক্রমশ বাড়িতেছে।

চৈত্রের অপরাহ্ণ। চারিদিকে একটি প্রসন্ন মাধুর্য্য ক্রমশঃ ফুটিয়া উঠিতেছে! ছেলের দল বাহির হইয়াছে। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, ফিন্ ফিনে ধুতি, চকচকে নিউকাট বা প্রীসিয়ান কাট জুতা, মুখে সিগারেট। কিছু লইয়া একটা উত্তপ্ত বিতর্ক করিতে করিতে চলিয়াছে। হয় তো

না নূতন কোন নাটকাভিনয় কিম্বা ফটবল টীম্—নয় তো না কাহারও কোন কুৎসা !

আশ্চর্য্য। তাহারা অরুণাকে দেখিয়াও একটুক উজ্জল হইয়া উঠিল না।

অরুণা আরও খানিকটা আগাইয়া গেল।

ওই যে। গৌরের অনুচর আসিতেছে। পুরাণো নড়বড়ে ঝনঝনে একটা সাইকেল। ডাণ্ডার উপরে একগাদা কাগজ।

—আজ গৌরদার খবর পেলাম।

—কবে আসবে সে ?

—দেরী হবে আসতে।

—দেরী হবে ?

—হাঁা। লেবার ইউনিয়নের ইলেকসন যে। সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাড়াচ্ছে কিনা !

লেবার-ইউনিয়নের ইলেকসন, গাজনের সঙ, ছেলেদের কোন একটা মিটিং বা অভিনয় ! এই সব উচ্ছ্বাসের মধ্যে অরুণা নিচে পড়িয়া গিয়াছে। জীবন দ্বারমণ্ডল—অরুণাকে লইয়া মাতিয়াছিল কিছু দিন। আবার নূতন উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কিন্তু অরুণা তলাইয়া গেলেও মিলাইয়া যায় নাই। সে যেন ফল্গুর মত নিচে নিচে বহিয়া চলিয়াছে। সে অনুভব করিতেছে সমস্ত কিছুর সঙ্গে—সকলের সঙ্গে—একটি সূক্ষ্ম—অব্যাহত যোগাযোগ।

ময়দানটায় গাজনের ধুম লাগিয়াছে।

সামিয়ানা খাটানো হইতেছে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বহুদিন পরে গত ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী তারিখে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে কলিকাতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে দেড়শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশন এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন হয় আলিপুরের বেলভেডিয়ারস্থ ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে। সম্মেলনের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনে একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। এই প্রদর্শনীতে ব্রিটিশ কাউন্সিল, ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস, ম্যাকমিলন কোম্পানী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি, গ্রন্থাগার প্রচার সমিতি, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সঙ্ঘ, ঝাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গ্রন্থ, পুঁথি ইত্যাদি প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ এবং সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-মন্ত্রী মাননীয় রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় সমাগত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বলেন—বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎপত্তি হয় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগত কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের চেষ্টায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু সকল সময়ে পরিষদ সফলকাম কোন সাহায্য পান নাই। পরিষদকে সাহায্য করিবার জন্য রাজ্য সরকার অগ্রসর হইয়া না আসিলে পরিষদের পক্ষে কার্য্যের পরিধি বিস্তার করা সম্ভব নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কার্য্য এবং গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার কাজে গ্রন্থাগার পরিষদ শেষ পর্য্যন্ত সফলকাম হইবে বলিয়াই পরিষদের দৃঢ় ধারণা। এই সম্মেলনে ঐ সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা ঐ সকল বিষয়ে জনমত যথেষ্ট পুষ্ট হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। সম্মেলনের উদ্বোধক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এবং সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার চন্দ মহাশয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট অপরিচিত নহেন। উভয়েই বহুদিন যাবৎ পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন বা আছেন। কাজেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাহার প্রগতিমূলক কার্য্যকলাপে তাঁহাদের নিকট হইতে সক্রিয় সহায়তা পাইবার দাবী এবং আশা বিশেষ ভাবেই রাখেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন যে, এই গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনি আগন্তুক নহেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল ও সার্থক করিতে হইলে সারাদেশব্যাপী বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। রাজ্য সরকার অবশ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার সমস্যা লইয়াই ব্যস্ত। সেজন্য স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিবার অবসর নাই। তবে গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্বন্ধে সরকার অবহিত আছেন। বয়স্কদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে সরকার এক পরিকল্পনা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে একশত ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার সহ [illegible]

তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারের কার্য্য পরিচালিত হইলে গ্রন্থাগারের যথোচিত ব্যবহার হওয়া সম্ভব। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ও কলেজে অন্ততঃ একজন এরূপ শিক্ষক থাকা প্রয়োজন যিনি গ্রন্থাগারিকের কার্য্যে শিক্ষা করিয়াছেন। দেশে গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য অর্থের প্রয়োজন। আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে গ্রন্থাগারের জন্য কর ধার্য্য করা হয় এবং তাহার দ্বারা গ্রন্থাগার প্রতিপালিত হয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের উচিৎ গ্রন্থাগারের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গুলিকে সচেতন করিয়া তোলা। ইহা ব্যতীত গ্রন্থাগারের জন্য স্বেচ্ছামূলক দান সংগ্রহ করাও প্রয়োজন। জনসেবার আগ্রহ লইয়া গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনের জন্য একনিষ্ঠ কর্ম্মীদল অগ্রসর হইয়া আসিলে দেশব্যাপী গ্রন্থাগার স্থাপনের স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবরূপ গ্রহণ করিবে।

অতঃপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীতিনকড়ি দত্ত সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সকল বাণী পাওয়া গিয়াছে তাহা পাঠ করেন।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅপূর্ব্বকুমার চন্দ তাঁহার অভিভাষণে বলেন—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে তিনি নবাগত নহেন। পরিষদ অনেক উচ্চাশা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে আগ্রহশীল, ইহা বিশেষ আশার কথা। এদেশের খুব কম-সংখ্যক কলেজের অথবা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার যথোচিতভাবে পরিচালিত হয়। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থ ছাত্রছাত্রীরা পাঠ করিবে আমাদের দেশের অভিভাবকরা সাধারণতঃ তাহা পছন্দ করেন না। গ্রন্থাগারের প্রতি জনসাধারণের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে না পারিলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও আয়তন বৃদ্ধি অথবা উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে না। গ্রন্থাগারের প্রসারের প্রশ্ন উপস্থাপিত হইলেই অর্থের অভাবের কথা উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যদি অর্থের অভাব না হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যই বা অর্থের অভাব হইবে কেন?

ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি মিঃ লিটলার ব্রিটিশ কাউন্সিলের উৎপত্তি ও কার্য্যধারা বর্ণনা করেন এবং ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত বহির্জগতের পরিচয় সাধন করাইয়া দিবার কার্য্যে পুস্তকই তাহাদের প্রধান সহায় বলিয়া উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারের সহিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের কার্য্য কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

ইউনাইটেড ষ্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিস এর প্রতিনিধি মিঃ ম্যান বলেন যে, গ্রন্থাগারিকেরা জ্ঞান-ভাণ্ডারের রক্ষক। জ্ঞান ও সংবাদ পরিবেশনের কার্য্য তাঁহাদের উপর নির্ভর করে। তিনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সংস্কৃতিমূলক কার্য্যের সহিত তাহার সম্পর্ক। কাজেই স্থানীয় গ্রন্থাগার সমূহের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় ইহা তাঁহারা বিশেষ ভাবে কামনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মী শ্রী নিখিলরঞ্জন রায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি ও কার্য্যক্রম বর্ণনা করেন। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা দানের জন্য যে সকল শিক্ষককে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে সেই সকল শিক্ষকদের গ্রন্থাগার পরিচালনা বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহিত সহযোগিতার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী বি, এস, কেশভন বলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধীর গতিতে পরিচালিত হইলেও যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যস্থানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সমাজ-সেবার ব্রত ও মনোভাব লইয়া গ্রন্থাগারিকদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষাদান কার্য্যে রত কর্ম্মীদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিচালনা শিক্ষাদান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য বিষয় গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, গ্রন্থাগারকে জনগণের ব্যবহারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলার কৃতিত্বের উপরেই ইহার জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। যে সকল বস্তুর সমাবেশে গ্রন্থাগার গঠিত তাহাদের উৎকর্ষ সাধনের উপরই শেষ পর্য্যন্ত গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। গ্রন্থাগারের উপাদানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ গ্রন্থ ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য বস্তু; দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগারের বন্ধু অর্থাৎ পাঠক; তৃতীয়তঃ গ্রন্থাগারিক ও পরিচালকমণ্ডলী। এই তিনটি উপাদানের সমাবেশে গ্রন্থাগারের স্থাপন ও পরিচালনা হয়। এই উপাদানসমূহের উৎকর্ষ সাধন কি ভাবে হইতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার-গুলির এই মূল উপাদানের উৎকর্ষ ব্যতীত যে সকল পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্রচেষ্টার দ্বারা গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব তাহাও তিনি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন এবং এই সূত্রে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র, চিত্রগৃহ, রেল ষ্টেশন, পার্ক, পোষ্ট অফিস, মেলা, সভা, প্রদর্শনী, রেডিও প্রভৃতির সাহায্যে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা কি প্রকারে বৃদ্ধি করা যায় তাহাও বর্ণনা করেন। গ্রন্থাগারের বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে এবং উহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য অল্পবয়স্কদের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার এবং তাহাদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার উপায় ও প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য এবং বিদ্যালয়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার যথাযথভাবে ব্যবহার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত তিনি শিক্ষা বিভাগকে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন সিংহ, শ্রীসুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীবিজয়লাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই আলোচনায় যোগদান

করেন। অতঃপর ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় আলোচনা সমাপ্ত করিয়া বক্তৃতা দিবার পর এই দিনকার সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন শেষ হয় এবং প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ কাউন্সিলের আমন্ত্রণে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে বিলাতের গ্রন্থাগার শতবার্ষিকী প্রদর্শনী দেখিতে যান। ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ সেখানে প্রতিনিধিগণকে বিশেষ যত্নের সহিত তাঁহাদের গ্রন্থাগার ও প্রদর্শনী দেখান। পরে তাঁহাদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন ও কয়েকটী শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখান।

পরদিন (১লা জানুয়ারী) ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের আমন্ত্রণে প্রতিনিধিগণ প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার দেখিতে যান এবং সেখানে আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে চলচ্চিত্র দেখান হয়। অতঃপর বেলভেডিয়ারে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে পরিষদের সভ্যদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সমিতির নিয়মতন্ত্রের কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হয়। অধিবেশন শেষ হইলে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক প্রতিনিধিগণকে বিশেষ যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থা ও আশুতোষ সংগ্রহশালা দেখান এবং তাঁহাদিগকে চা পানে আপ্যায়িত করেন।

পশ্চিমবাংলা কি ঘাট্‌তি প্রদেশ

অধ্যাপক শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় ও 'ষ্টেট্' মন্ত্রীদের বিবৃতি, বেতার ভাষণ ও বক্তৃতাতে আমরা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছি—পশ্চিম বাংলা একটি ঘাট্‌তি অঞ্চল। যে 'চিরকল্যাণময়ী' 'দেশ বিদেশে অন্ন বিতরণ' করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ আজ বুভুক্ষু, অনশনক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষনিপীড়িত। পূর্ব্বে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য স্থানে স্থানে কখন কখন দুর্ভিক্ষ হইত। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এরূপ সমগ্র দেশব্যাপী খাদ্যসংকট আর কখনও দেখা যায় নাই; আর ঐ মন্বন্তর ত তৎকালীন সরকারের অসাধু কর্মচারীদের অর্থ-গৃধ্নুতাপ্রসূত, তাহার প্রমাণ ইতিহাসই দিতেছে। আমাদের যুগের তের শ' পঞ্চাশের মন্বন্তরও লীগ গবর্নমেন্টের অযোগ্যতা ও অসাধুতার জন্যই ঘটিয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য। ফ্লাউড্ কমিশন ত স্পষ্টই উহাকে 'মানুষের কৃত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। পঞ্চাশের পর আজ সাত বৎসর অতীত হইয়াছে, তিন বৎসরেরও অধিককাল আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। আমাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার এখন আমাদেরই আয়ত্ত। কিন্তু এই দীর্ঘকালস্থায়ী (Chronic) খাদ্য সংকটের কোনও প্রতিকার হয় নাই। "অধিক উৎপাদন কর" আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ টাকা (অপ?) ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছে। ইহার সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইলে প্রকৃত রোগ কোথায় ও তাহার ব্যাপকতা কতখানি নির্ণয় করা প্রথমেই আবশ্যক।

বঙ্গ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবাংলা গবর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের একখানি Statistical Abstract বিবরণী প্রকাশ করেন। উহাতে বিভিন্ন জেলার ও সমগ্র প্রদেশের আবাদী জমী ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ইত্যাদির পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে ১৯৪৬-৪৭ সালে ৭৪ লক্ষ ১১ হাজার ৭ শত একর জমীতে আমন, ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩ শত একর জমীতে আউস ও ৪৯ (Clean rice) পরিমাণ যথাক্রমে ৯ কোটী ২০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ শত মণ, ১ কোটী ৬১ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫ শত মণ ও ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার মণ—মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ১০ কোটী ৮৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩ শত মণ। ইহাই হইল বিভাগীয় পূর্বাভাষ (Statistical Abstract, West Bengal, Tables 4·4 ও 4·5)। Sample Survey দ্বারা নির্ণীত হিসাবে (Estimate by Sample Survey—Tables 4·6A ও 4·6B) আউস ও আমন ধানের জমীর পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ও ৮৩ লক্ষ ৯০ হাজার একর দেখান হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ হইতে ১৯৪১-৪২ এই পাঁচ বৎসরের Crop-Cutting Experiment এ দেখা যায় প্রতি একরে আমন চাউল (Clean rice) ১২·৪ মণ ও আউস চাউল ১০·৯ মণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই হিসাবে সমগ্র প্রদেশে উৎপন্ন আমন চাউলের পরিমাণ হয় ১০ কোটী ৪০ লক্ষ ৩৬ হাজার মণ। পূর্বাভাষে প্রদত্ত সংখ্যা অপেক্ষা ইহা অনেক অধিক। সেই হেতু পূর্বাভাষে প্রদত্ত পরিমাণই সমধিক নির্ভরযোগ্য মনে করিতেছি। Sample Survey দ্বারা স্থিরীকৃত ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমীতে উৎপন্ন আউস চাউলের পরিমাণ হয় ১ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭০ হাজার ৪ শত মণ। এই হিসাবে আমন, আউস ও বোরো চাউলের পরিমাণ হয় মোট ১০ কোটী ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার ২ শত মণ। এই পরিসংখ্যান বিবরণীতে ১৯৪২-৪৩ সালের পর কোন বৎসরের গমের চাষের জমীর পরিমাণ দেখান হয় নাই। ঐ বৎসর ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২ শত ৯ একর জমীতে গমের আবাদ হয়। প্রতি একরে ৯ মণ (crop cutting experiment Table 4·2 ও Table 4·3) করিয়া গম উৎপন্ন হইলে গমের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ লক্ষ ১৮ হাজার ৯ শত মণ। সমগ্র প্রদেশে উৎপন্ন খাদ্য শস্যের পরিমাণ হয় ১০ কোটী ৯২ লক্ষ ৯৪ হাজার মণ।

পক্ষে পর্য্যাপ্ত কি না? ১৯৪১ সালের সেন্‌সাসে পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যা হইতেছে ২ কোটী ১১ লক্ষ ৯৬'৪ হাজার (Table I'I)। এই দশ বৎসরে উহা আরও বাড়িয়াছে। ১৯০১-১১, ১৯১২-২১, ১৯২২-৩১ ও ১৯৩২-৪১ এই চারি দশকে প্রতি জেলার বৃদ্ধির গড় নির্ণয় করিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে বর্তমানে পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যা হয় ২ কোটী ৩২ লক্ষ ৪৬'২ হাজার। ইহার মধ্যে দুই বৎসর ও তাহার অনধিক বয়স্কের সংখ্যা ৯ লক্ষ ২৯'৯ হাজার। উহাদের বাদ দিলে জনসংখ্যা হয় ২ কোটী ২৩ লক্ষ ১৬'৩ হাজার। জনপ্রতি দৈনিক ১৬ আউন্স খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইলে বৎসরে ৪ ১/২ মণ লাগে। এই হিসাবে সমগ্র প্রদেশের প্রয়োজন বৎসরে ১০ কোটী ৪ লক্ষ ২৩৩ হাজার মণ, এই হিসাবে ঘাটতির পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হয় ৮৮ লক্ষ ৭০'৩ হাজার মণ।

বর্তমান ১৯৫০-৫১ সালে ৮০ লক্ষ ৪২ হাজার একর জমীতে আমন ধানের আবাদ হইয়াছে। ১৯৪৬-৪৭ সালের অপেক্ষা উহা ৬৩০'৩ হাজার একর বেশী। এবং এই হিসাবে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ হয় আরও ৭৮ লক্ষ ১৫'৭ হাজার মণ অধিক। মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১ কোটী ৭'১ লক্ষ ৯'৭ হাজার মণ ও উদ্বৃত্ত হয় ১ কোটী ৬৬ লক্ষ ৮৬'৪ হাজার মণ।

উপরের হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ধরা হয় নাই। প্রথমতঃ উহাদের পুনর্বাসন ও খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের নহে। উদ্বাস্তু সমস্যা ভারত বিভাগের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ও তাহার সমাধান ভারত সরকারকেই করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উদ্বাস্তুদের সংখ্যার নির্ভরযোগ্য কোন হিসাব গবর্ণমেন্ট কর্তৃক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। নিউদিল্লী হইতে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত ইউনাইটেড্ প্রেসের সংবাদে দেখা যায় যে ৮ই এপ্রিল হইতে ১৭ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ২৩ লক্ষ হিন্দুর মধ্যে ১৬ লক্ষ পূর্ববঙ্গে ফিরিয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ লক্ষ। বঙ্গ বিভাগের পর হইতে গত ফেব্রুয়ারীর হাঙ্গামার পূর্ব পর্য্যন্ত আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ও ফেব্রুয়ারী মার্চে আগতের সংখ্যা ৫ লক্ষ ধরা যাইতে পারে। তাহা হইলে মোট আগতদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ। ইহাদের মধ্য হইতে দুই বৎসরের ন্যূন বয়স্কদের বাদ দিলে সংখ্যা হয় ২৬ লক্ষ ৯২ হাজার ও ইহাদের খাদ্যের জন্য প্রয়োজন ১ কোটী ২১ লক্ষ ১৪ হাজার মণ। উদ্বৃত্ত খাদ্য শস্যের পরিমাণ হইতে ইহা বাদ দিলে নিট্ উদ্বৃত্তের পরিমাণ হয় ৪৫ লক্ষ ৭২'৪ হাজার মণ।

গত দুই বৎসরে অনেক চাউলের জমীতে পাটের চাষের প্রবর্তন হইয়াছে। উহার পরিমাণ ৬০০'০ হাজার একর হইবে ও সেজন্য উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ ৬৫ লক্ষ ৪০ হাজার মণ কম হইবে ও ফলে ১৯ লক্ষ ৬৭'৬ হাজার মণ ঘাটতি পড়িবে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এই ঘাটতি-পূরণ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

গবর্ণমেণ্টের পরিসংখ্যান হইতে নিঃসংশয়ে ইহাই প্রমাণিত হয় যে পশ্চিম বাংলায় খাদ্য শস্যের কোন ঘাটতি নাই। তাহা হইলে এই দীর্ঘকাল স্থায়ী খাদ্য সংকটের প্রকৃত কারণ কোথায় নিহিত? ইহার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী বর্তমান গবর্ণমেণ্টের কর্মচারীদের অযোগ্যতা এবং জোতদার ও ব্যবসায়ীদের অসাধুতা ও অতিলোভ। তাহাদের সমাজদ্রোহী কাযকলাপ অতি কঠোর হস্তে দমন করিতে না পারিলে এ অবস্থার প্রতিকার সুদূর পরাহত। গবর্ণমেণ্ট হইতে খাদ্য সংহরণ (Procurement) দ্বারা ইহার প্রতিকার হইবে না। সহস্র সহস্র নরনারীর নিদারুণ দুর্ভোগ স্বাস্থ্যহানি ও অনেকের মৃত্যুর কারণ হইতেছে, মুষ্টিমেয় জোতদার ব্যবসাদার এবং উহাদের সহিত যুক্ত রহিয়াছে গবর্ণমেণ্টের কতিপয় অযোগ্য বা অসাধু কর্মচারী। ইহাদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে এই মানুষের কৃত খাদ্য সংকটের কোনও সমাধান হইবে না। খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন তাঁহার ভাষণে বলিতেছেন যে বাংলায় ঘাটতির পরিমাণ এ বৎসর ৫ লক্ষ টন। কিন্তু তাঁহারই গবণমেণ্টের প্রকাশিত Statistics ইহার বিপরীতই প্রমাণ করিতেছে। দেশের লোককে এই ভুল বোঝান আর কতকাল সম্ভব হইবে? যে কোন কারণেই হউক গবর্ণমেণ্ট চোরা-কারবারী অসাধু পুঁজিপতি ও সমাজশত্রু ব্যবসাদার জোতদারদের দমনে অপারগ। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই অক্ষমতার জন্য জনসাধারণকে আর কতদিন এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে?

ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলন

মাণিকচন্দ্র দাশ

কলিকাতা অধিবেশন ১৯৫০

লাল ব্যাজ লাগিয়ে কতকগুলি যুবক ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছিল হাওড়া ষ্টেশনে ২৬শে ডিসেম্বর সকাল বেলায়। বহুলোক আকৃষ্ট হয়ে তাদের ঘোরাফেরা লক্ষ্য করছিল—সেখানে তাদের একটা ছোট্ট অফিস, তার মাথায় লাল কাপড়ে সাদা অক্ষরে বিজ্ঞান সম্মেলনের কথা লেখা ছিল। সারা ভারতের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা একে একে আসছেন—হঠাৎ ব্যাণ্ড বেজে উঠল, সবাই সাগ্রহে সেদিকে এগিয়ে গেল—গলায় ফুলের মালা সুন্দর একজন পুরুষ এগিয়ে আসছেন—সম্মেলনের সভাপতি শ্রীরাম শর্ম্মাকে সম্ভাষণ ও অভিনন্দন জানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে আসছিলেন—সম্মেলনের স্থানীয় সম্পাদক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিথিদের বাসস্থানাভিমুখে তাঁরা যাত্রা করলেন।

ঐদিন বেলা ২-৩০টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল ডাঃ কৈলাশনাথ কাটজু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র বেশ চাঞ্চল্য রয়েছে—চারদিকের সৌন্দর্য আরও অনেক বেড়ে গিয়েছে। বিরাট সিনেট হল ...

প্রদেশ থেকে আগত সত্তর জন ও স্থানীয় সাঁইত্রিশ জন প্রতিনিধি এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে সিনেট হলে সর্বভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের ত্রিদিবসব্যাপী ত্রয়োদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন শোলাপুর ডি, এ, ভি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীশ্রীরাম শর্ম্মা।

সম্মেলনের উদ্বোধনকালে নানা প্রসঙ্গক্রমে রাজ্যপাল ডাঃ কাটজু ভারতে আঞ্চলিক ভাষা ও প্রদেশ গঠনের সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে—এই সমস্যা আছে অস্বীকার করা যায় না। পুঁথিগত তত্ত্বের অনুকূল বলিয়া অথবা ব্যবহারিক শাসন কার্যের সুবিধার খাতিরে ভৌগলিক অভিন্নতা এবং ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সামীপ্য উপেক্ষা করা উচিত নয়। ডাঃ কাটজু মনে করেন, আজ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপকগণের এমন একটী উপায় আবিষ্কার করা কর্তব্য—যাহা দ্বারা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা ও সংহতি কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ না করে জনগণের আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সংহতির প্রবল আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করা যায়।

ডাঃ কাটজু আরও বলেন, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রশক্তিকে বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্নটা তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তিনি সর্বদাই এই অভিমত পোষণ করেন যে ভারতবর্ষ কেন্দ্রীয় শাসনের সহিত অপরিচিত নহে বটে, কিন্তু পৃথিবীর রাজনৈতিক ভাবক্ষেত্রে গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র প্রথাই ভারতের বৃহত্তম দান।

বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার বিচারপতি শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানরূপে তাঁর অভিভাষণে বলেন যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চর্চা এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে যে বিশেষ কড়াকড়ি সত্ত্বেও গত বছর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ছাত্রের সংখ্যা হয়েছিল দুই শত।

তিনি বলেন বর্ত্তমানে রাজনৈতিক সমস্যাকে সামাজিক সমস্যা হতে এবং সামাজিক সমস্যাকে ধর্মগত সমস্যা থেকে পৃথক করে দেখা কঠিন হয়ে পড়েছে। আজ চিন্তানায়কমাত্রেই স্বীকার করেন যে, প্রাচীন ব্যবস্থার অবসান অপরিহার্য। সমাজ সম্বন্ধে নতুন ধারণার দরকার। বর্ত্তমানের সমাজ কাঠামো গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে না। ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, সত্যিকার রাজনীতিক হতে হলে তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞান জানা চাই। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর বহু জটিল প্রশ্ন তাঁদের সামনে এসে পড়েছে। মানবের দুর্গতির অপনোদন ও সুখবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শুনছেন—তাঁরা সত্যই জানতে ইচ্ছুক যে রাজনীতি শিক্ষাবিদগণ নতুন স্বাধীন ভারত ও তার বহু জটিল সমস্যার সম্বন্ধে কি মতামত পোষণ করেন এবং কিভাবে সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করেন।

সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীরাম শর্ম্মা তাঁর অভিভাষণে বলেন—ভারতে গণতান্ত্রিক সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ...

পারছেন না বলে আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে হতাশার ভাব ছিল, ইহার ফলে তাই দূর হয়েছে মাত্র। আজ আমরা নিজেরাই নিজেদের শাসক, সুতরাং সকল সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি সাফল্য অর্জন করতে হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাহায্যেই ইহা সম্ভব। বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রীরাম শর্ম্মা বলেন, ১৯৪৯ সালের ২৬শে নবেম্বর নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণের পর ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রসার লাভ করেছে এবং কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত শর্ম্মা আরও বলেন কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইন সভায় কোন শক্তিশালী বিরোধী দল নাই, ইহা উল্লেখযোগ্য। অনেকে এ অবস্থাকে দলীয় একনায়কত্ব আখ্যা দিয়ে থাকেন; কিন্তু দলীয় শাসন বলতে কী বোঝায় ইঁহারা বুঝেন না। এই সকল রাষ্ট্র অন্য কোন দলকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেন না। তিনি বলেন—সরকারী কর্মচারী, গবর্ণমেণ্ট এবং দলের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন পার্থক্য না থাকার দরুণই বর্ত্তমান শাসন কার্য পরিচালনার ব্যাপারে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে।

পরিশেষে অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শর্ম্মা বলেন আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বাধীনতাই গণতন্ত্রের সারাংশ। জনসাধারণ যদি, সেবাও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় তবেই গণতন্ত্র কার্যকরী হতে পারে। যে সব ব্যক্তি রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন নয়, তারা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। রাজনৈতিকগণ জনসাধারণের জড়তা ও বিচ্ছিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের শিক্ষকদের ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনসাধারণকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন করে তোলা উচিত।

সভাপতির অভিভাষণের পর ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক এস, ভি, কোগেকার সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এরপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই সম্মেলনের প্রতিনিধিদের এক ফটো তোলা হয়। এর পর পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল অপরাহ্নে প্রতিনিধিদের গবর্ণমেণ্ট হাউসে চাপানে আপ্যায়িত করেন। ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইন্‌স্টিটিউটে সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রতিনিধিগণ নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন—এর আগে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারস্থ বৌদ্ধ বিহার পরিদর্শন করে এসেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিক গম্‌গম্ করছিল, দ্বারভাঙ্গাবিল্ডিং এ অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। শিক্ষাবিদগণের সঙ্গে যাদের মেলামেশা করার সুযোগ হয়েছিল, তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। দেশ ও দশের মঙ্গলার্থে তাঁদের এই সাধনা সত্যই অপূর্ব।

২৭শে ডিসেম্বর সকাল ৮ টায় অধিবেশন আরম্ভ হল। এটা গুরুত্ব-পূর্ণ অধিবেশন। বিভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ তাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা পাঠ করবেন। সেই সভায় ঐ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন।

বি, এম, শর্ম্মা, তারপর শ্রীযুত মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়—কানপুরের শ্রীযুত ভি, এন, শ্রীবাস্তব ও মাদ্রাজের শ্রী আর, পার্থসারথী ভারতের প্রেসিডেন্টের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করলেন।

এ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা চল্ল।

ঐ দিন দুপুরের বৈঠকে Fundamental Rights এর ওপর প্রবন্ধ পাঠ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি, এন, ব্যানার্জ্জি এবং মিরাট কলেজের অধ্যাপক জে, পি, সুভা। বহু আলোচনা হয়—র‍্যাভেন্শ কলেজের অধ্যাপক এস, সি, দাস ও কলিকাতার অধ্যাপক নির্ম্মল চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। এ ছাড়া আরও কয়েকটা প্রবন্ধ পাঠ করা হয় ভারতের শাসন তন্ত্রের উপর। তার মধ্যে অধ্যাপক এ, কে, ঘোষালের প্রবন্ধ বহু শিক্ষাবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

ঐ দিন প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা-বৈঠক শেষ হবার পর সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম পরিদর্শন করতে যান্। এই সব শিক্ষাবিদের অনেকের পক্ষেই ইতিপূর্বে কলিকাতায় আসা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। তাঁরা সত্যিই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পরিদর্শন করেছিলেন ঐ-মিউজিয়াম্—যেখানে ৪,৫০০ বছরের মোমিটী শোয়ান আছে সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা বিস্ময়ে নানা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে সত্যকে উপলব্ধি করছিলেন। এ ছাড়া এতবড় মিউজিয়াম এতটুকু সময়ে পরিদর্শন অসম্ভব—প্রাচীন সভ্যতার নানা নিদর্শন রয়েছে যার সামনে নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রতিনিধিরা ফেরবার কথা ভুলে গেছেন—এমন সময় ডাঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন এবং সকলে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল গৃহে রওনা হলেন—ও সেখানে ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের উপস্থিতিতে প্রতিনিধিগণ চা পান করেন। পুনরায় ফেরার পথে তাঁরা একাডেমী অব ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। সেদিন সন্ধ্যায় ফেরার পর প্রতিনিধিদের আবার ভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর সকাল বেলায় আবার প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা সভা সুরু হয়। এদিন বিষয় ছিল বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় মতবাদ এবং সামাজিক আইন গঠন সম্বন্ধেও প্রবন্ধ পাঠ হয়। মাদ্রাজ ইউনিভারসিটার অধ্যাপক পি, আর, পাকাড়িশঙ্কর এ সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন ও নানা শিক্ষাবিদ্ এই আলোচনায় যোগ দেন। তিনি liberalismকে রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বলেন।

সেদিনকার সভা শেষ হলে পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিনিধিদের চা পানে আপ্যায়িত করেন হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ। আশুতোষ বিল্ডিংএর সামনে সবুজ ঘাসের ওপর সেদিনকার রাষ্ট্র বিজ্ঞান শিক্ষাবিদদের সেই চায়ের আসর বড় মনোরম হয়েছিল। সেই সঙ্গে সম্মেলনের শেষে বিদায়ের পালা সুরু হ'ল।

এই সম্মেলনকে যিনি আহ্বান করেছিলেন এবং এর সাফল্যের পেছন পেছনে যাঁর অমানুষিক পরিশ্রম কর্ম্ম নৈপুণ্যতা রয়েছে ও যাঁর চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে সবাই কাজ করেছে সেই অধ্যাপক ডি, এন, ব্যানার্জ্জি সকলেরই ধন্যবাদাহ।

হে ঈশ্বর তুমি কহ কথা

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সমুদ্র সঙ্গীতে ওঠে ভৈরবের রুদ্র নৃত্য
হে ঈশ্বর! তুমি কহ কথা।
আণবিক উপাদানে ইস্পাতের প্রসাধনে
সুসজ্জিত মারণ দেবতা।
—চমকে তড়িৎ মেঘে মেঘে ঃ
প্রলয় লোহিত রাগে চলিবে কি দিন আবর্ত্তন!
লৌহ মানবের দল মিথ্যা আঁকে আশার স্বপন—
অন্তরের অজন্তা গুহায়। যাত্রা হবে সমাপন
ধরা বক্ষে ধ্বংস শিখা লেগে।
অসহায় আদর্শের শুনেছ কি আর্ত্তনাদ?
ওই বুঝি বাজে রণভেরী!
দুঃসহ নির্দ্দয়রূপে দুরন্ত নিয়তি চক্র
নিখিলের চক্রবালে হেরি!
দিকে দিকে দম্ভ আস্ফালন।
শঠতার উপাসনা দেশে দেশে মূলমন্ত্র এবে,
নব চর্ম্মাসনে বসি পশ্বাচার ঃ চিত্ত ওঠে কেঁপে,
শান্তি বৈঠকের মিথ্যা প্রহসনে কেবা রক্ত দেবে—
তাই ভেবে ধ্বনিছে ক্রন্দন।

সত্য হ'তে সত্যান্তরে সংসারের ভাবধারা
বহে আত্ম ভাবনার স্রোতে।
চেতনার স্তর ভেদি প্রচেতন স্তরে কত
জ্বলে দীপ দৈব জ্ঞান জোতে;
—শান্তি সাম্য মৈত্রী আকাঙ্ক্ষায়।
কেন তবে এ বিশ্বের ভেঙ্গে পড়ে আনন্দের সেতু,
অশোক স্তম্ভের বুকে জন্ম লভে বিপ্লবের কেতু,
কাঁদে পৃথ্বী দয়াহীন দস্যু তার রাজনীতি হেতু
দুর্ব্বলেরা দাঁড়াবে কোথায়!
মানবের মর্ম্মে মর্ম্মে স্মরণে ও বিস্মরণে
দিনপঞ্জী পুঞ্জীভূত যত
তারি মাঝে সাম্প্রতিক সভ্যতার জিঘাংসার
ঘৃণ্যতম আখ্যায়িকা শত
আনিতেছে মৃত্যু অবসাদ।
যৌবনের শবযাত্রা দেখেছ কি বিচ্ছিন্ন প্রহরে?
শতাব্দীর উপকূলে ধরিত্রীর নিভৃত অন্তরে
সত্যের অমৃত বাণী কাঁদে কল্যাণের তরে
—যুগযাত্রী হোলো কি উন্মাদ?

আণবিক শক্তি তুমি গর্ব্ব করো আত্মাশক্তিধর
ভস্মাসুর বধ করি শান্তি দাও বিশ্বে নিরন্তর।

আইনের ত্রুটি—

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীমান প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় গত
ে মাচ্চ কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের এক সম্মিলনে ভারতে আইন
ম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান
বস্থায় আইন প্রণয়নে সরকারের ত্রুটি দেখাইয়া তিনি ত্রুটি সংশোধনের
া সকল উপায় নির্দ্দেশ করেন, তাহাতে সরকার ও জনসাধারণ বিশেষ
পকৃত হইতে পারেন।

তিনি বলেন, দেখা যাইতেছে, পুনঃ পুনঃ—এমন কি এক বৎসরের
ধ্যও আইনের সংশোধন করিতে হইতেছে! কেন এমন হয়? অসাধারণ
বস্থায় আইন সংশোধনের প্রয়োজন হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ
বস্থায় ইহার কারণ কি? সাধারণ লোকের দ্বারা শাসনই গণ-
ানুমোদিত; কিন্তু আইন প্রণয়ন বিশেষজ্ঞাতিরিক্ত রাজনীতিকের দ্বারা
ব হইতে পারে না। বর্ত্তমান জটিল সামাজিক অবস্থায় বিশেষজ্ঞের
। আইন রচনার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ
ইনের পরিবর্ত্তনে বা সংশোধনে অনেক ক্ষেত্রে বিচার-বিভ্রাট ঘটে।
ুক্তরূপে রচিত না হইলে আইনে ত্রুটি থাকিয়া যায়। রচনার ত্রুটিতে
াক আইনের দ্বারা ঈপ্সিত ফললাভ সম্ভব হয় নাই। সুতরাং শিক্ষিত
াভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহাকেও আইন রচনা কার্য্যের ভার প্রদান
অসঙ্গত। সে কাজ স্বতন্ত্র একদল লোকের দ্বারাই সম্ভব।

আইনের বিধান যাহাতে লোকের গোচর হয়, সে ব্যবস্থা করাও একান্ত
্য। লক্ষ লক্ষ গ্রাম্য লোক "পতিত" জমী "হাসিল" করার আইনের
ই শুনে নাই; তাহার বিধান জানিলে লোক যে নিশ্চয়ই "পতিত"
ব্যবহারের কার্য্যে সরকারকে সাহায্য করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

াবার ভাড়া সম্বন্ধীয় আইনের দ্বারা বাসস্থানের অভাব মোচন করা
নহে। সেজন্য জাতির গঠনকার্য্য হিসাবে গৃহ-নির্ম্মাণ প্রয়োজন।
সঙ্গে নগর স্থাপন—নগরের উপকণ্ঠের উন্নতিসাধন করিয়া তাহা
াযোগী করা ব্যতীত উপায় নাই।

হাতে আইনের বিধান সর্ব্বজনের পরিচিত হয়—সে ব্যবস্থা
াকেই করিতে হইবে। তাহা করা হয় না; এমন কি প্রণীত
া অনেক ক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য হয়!

দিনের মধ্যে প্রণীত সকল আইন ...

মামলায় আদালতের মন্তব্যে প্রকাশ পাইয়াছে। বিচারকরা মত প্রকাশ করিয়াছেন—আইনের ত্রুটিতে সরকারের কাজ অসিদ্ধ হয় এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হয়।

সেদিন যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব বলিয়াছেন, হাজতে লোকের উপর অত্যাচার করা যে অসঙ্গত তাহা পুলিসকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে, পুলিসের কি তাহা জানা ছিল না? যদি না থাকিয়া থাকে, তবে সেজন্য কে দায়ী? আবার তিনিই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, কোন ঔষধালয়ের ব্যাপারে গ্রেপ্তার করা লোকের সম্বন্ধে যে তাহাকে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল, তাহা একদেশদর্শিতাহেতু নহে—পুলিস অনেক স্থলে অসঙ্গত ব্যবহার করে বলিয়া। আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতাই কি ইহার কারণ নহে?

আইন যে স্থানে অসঙ্গত বা ত্রুটিপূর্ণ হয়, সেই স্থানে অনাচারের সুবিধা ঘটে—অত্যাচার আরম্ভ হয়।

দেখা যাইতেছে, ভারতের জন্য যে শাসনতন্ত্র রচিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই তাহার কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহা শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারীদিগের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। তবে এমনও হইতে পারে, কর্ম্মচারীদিগের সুবিধার জন্যই তাহারা পরিবর্ত্তনের দাবী করিতেছেন।

ভারত-রাষ্ট্র ও পাকিস্তান—

ভারত রাষ্ট্র পাকিস্তানের মুদ্রামূল্য স্বীকার করিতে অসম্মতি জানাইয়া শেষে যে ভাবে তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা যে তাহার পক্ষে সম্ভ্রমজনক নহে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জয়োল্লাসে পাকিস্তানের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, কাশ্মীর লাভ করিবার জন্য পাকিস্তান সবই করিতে প্রস্তুত। ইহার পরে করাচী হইতে প্রেরিত বোম্বাইএর 'ব্লিটস' পত্রে প্রকাশিত সংবাদ—

পাকিস্তানের সার্ভেয়ার জেনারল পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক নূতন মানচিত্র সরকারী ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে জম্মু ও কাশ্মীর, জুনাগড় ও মানভাদার রাজ্য পাকিস্তানের অংশরূপে চিত্রিত হইয়াছে। উহাতে সমগ্র ভারত-পাক উপমহাদেশ 'ভারতবর্ষ' ও ভারত রাষ্ট্র 'ভারত' নামে অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ শত শত মানচিত্র সরকারী অফিস নিলামে

পাকিস্তানের দূতাবাসসমূহে উক্ত ঐ সকল দেশের সরকারী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিনামূল্যে প্রদান করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কাশ্মীর সম্বন্ধে পাকিস্তানের মনোভাব পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিতে এবং বিদেশে পাকিস্তানের উক্তিতে ও প্রচারকার্য্যে বুঝিতে পারা যায়। একদিন জার্ম্মানী যেমন ইরাকের পথে কোয়েট পর্য্যন্ত আসিয়া তথা হইতে ভারত আক্রমণের জন্য মানচিত্র প্রচার করিয়াছিল—ইহাও কি সেইরূপ নহে? ভারত সরকার এ সম্বন্ধে কি করিবেন, জানিবার বিষয়, সন্দেহ নাই। পণ্ডিত নেহরু মুখে যাহাই কেন বলুন না, কার্য্যকালে তিনি কাশ্মীর সম্বন্ধে কি করিবেন, সে বিষয়ে কিছু বলা দুষ্কর—কারণ, পাকিস্তানের সহিত চুক্তিতে তিনি যে ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মতের দৃঢ়তা সূচিত হয় না।

প্রতিদিন প্রায় ২ শত গাড়ী কয়লা পাকিস্তানে প্রেরিত হইতেছে—অথচ পাকিস্তান হইতে অতি অল্পই চাউল প্রেরিত হইয়াছে। তুলার কথা উল্লেখযোগ্য নহে। পাট সম্বন্ধে বক্তব্য, পাটে ভারত রাষ্ট্রের ফাটকা-বাজ অধিবাসী ও বিদেশী বণিকদিগের যে সুবিধা হইবে, ভারতবাসীর বা ভারত সরকারের সে অনুপাতে সুবিধা হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে পাকিস্তানীদিগের অনধিকার আক্রমণ বন্ধ হয় নাই। যশোহরের মত ক্ষুদ্র সহরে যে পাকিস্তান সরকার মুসলমানদিগের জন্য ৩ শতেরও অধিক হিন্দু গৃহ অধিকার করিয়াছেন, তাহাও বিবেচনার বিষয়।

এখনও যে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দলে দলে হিন্দু নরনারী প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা অকারণ নহে।

অথচ ভারত সরকারের রেলওয়ে বোর্ড—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া, কলিকাতা হইতে হাসনাবাদ পর্য্যন্ত যে প্রায় অচল রেলপথ আছে, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই সীমান্ত-পথের উন্নতিসাধনে কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছেন না; যেন সতর্কতার কোন প্রয়োজনই নাই! লাভের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কলিকাতায় সরকারী বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অপেক্ষা যে এই পথের উন্নতিসাধন অধিক প্রয়োজন, তাহা কি ভারত সরকার বুঝিতে অসমর্থ?

পাকিস্তান সম্পর্কে ভারত সরকারের যে সতর্কতাবলম্বন কর্ত্তব্য তাহা যদি অবজ্ঞাত হয়, তবে যে বিপদ ঘটিলে তাহা জটিল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাকিস্তানের আয়োজন তাহার মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন এবং কাশ্মীরে সম্ভব হইলে যে পূর্ব্ব পাকিস্তানে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবে, তাহাও মনে করিবার কারণ থাকিতে পারে।

সে বিষয়ে ভারত সরকারের ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ঔদাসীন্যের কারণ কি?

জমিদারী উচ্ছেদ—

কংগ্রেস জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে জমিদারের পক্ষে নালিশ রুজু করা হয়। সেই মোকর্দ্দমায় জমিদার পক্ষে প্রফুল্লরঞ্জন দাশ যে যুক্তি উপস্থাপিত করেন, তাহাই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়া বিচারক রায় দিয়াছেন—বিহার সরকারের কার্য্য আইনতঃ অসিদ্ধ। সুতরাং বিহার সরকারকে জমিদারদিগকে জমিদারী প্রত্যর্পণ করিতে হইয়াছে। এইবার, বোধ হয়, আইনের ত্রুটি সংশোধন করা হইবে এবং তাহার পরে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন আরম্ভ হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদে একাধিক সদস্য জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন না হওয়ায় সরকারকে দোষ দেন। তাহাতে জমিদার ও সচিব রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বলেন—সরকার জমিদারী উচ্ছেদ করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতি পালনের পথে বিঘ্ন আছে—পশ্চিমবঙ্গে কৃষি-জীবীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; এই প্রদেশে জমির বিভাগ হেতু ক্ষেত্রের আয়তন হ্রাসও অসাধারণ, পশ্চিমবঙ্গের জমির ৫ ভাগের ৪ ভাগেই এক ফশল হয় এবং প্রদেশে পরিপূরক শিল্পও সামান্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন—অনুসন্ধান শেষ হইলেই সরকার তাহাদিগের জমিদারী উচ্ছেদের পরিকল্পিত ব্যবস্থা উপস্থাপিত করিবেন।

সচিব যে সকল বিঘ্নের উল্লেখ করিয়াছেন—জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধনই সে সকল দূর করিবার উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—জমি সরকারের অধিকারগত হইলে তবে সমবেত ভাবে চাষের ও উন্নতিকর ব্যবস্থার উপায় হইতে পারে। দীর্ঘ ৩ বৎসরেও যে জমির ৫ ভাগের ৪ ভাগে মাত্র এক ফসল ফলনের পরিবর্ত্তন সাধিত ও শিল্প প্রতিষ্ঠা হয় নাই ইহা সরকারের পক্ষে গৌরবজনক বলা যায় না। তিন বৎসরেও যে অনুসন্ধান ব্যবস্থা হয় নাই, ইহাও পরিতাপের বিষয়। কত দিনে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়া কত দিনে শেষ হইবে, সে সম্বন্ধে সরকারের কোন সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি?

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় তৎকালীন গভর্ণর সার জন এণ্ডারশন বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় লোকের ও উপকরণের অভাব নাই; অথচ ঋণগ্রস্ত দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায় অধিকাংশ জিলায় যে উপযুক্ত কার্য্যের অভাবে, বৎসরে ৯ মাস কাল বেকার থাকে, ইহার কারণ কোথাও কোন বিশেষ ব্যবস্থা-ত্রুটি আছে। তিনি সেই জন্য ব্যবস্থা করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং শিল্প বিভাগকে যেমন সে বিষয়ে অবহিত হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তেমনই প্রদেশের উন্নতি সাধন পরিকল্পনার কার্য্যে মিষ্টার টাউনএণ্ডকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি যে সকল ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, আজও সে সকল দূর হয় নাই! আর সেই সকল ত্রুটির উল্লেখ করিয়াই যে জাতীয় সরকার জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে বিলম্ব সমর্থন করিতেছেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। সেই সকল ত্রুটির সংশোধন জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে সচেতন হইবার কারণ না হইয়া বিলোপ সাধন বিলম্বিত করিতে পারে না। সে যুক্তি গ্রহণযোগ্য নহে। যে সকল ত্রুটির জন্য বাঙ্গালার উন্নতি ব্যাহত

অনিবার্য্য, লোকের দুঃখ দুর্দ্দশাভোগ তেমনই অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য আমরা আশা করি, সরকার আর কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিশ্রুতি পালনে অগ্রসর হইবেন এবং তাঁহাদিগের প্রতিশ্রুতি পালনে আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া লোকের হতাশাজনিত অসন্তোষ দূর করিবার প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিবেন।

কলিকাতার জনসংখ্যা—

গত লোকগণনায় যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, হাওড়া, বালী, বারাকপুর, মেটিয়াবুরুজ, টালিগঞ্জ ও বেহালা লইয়া গঠিত বৃহত্তর কলিকাতার লোক-সংখ্যা —৪৫ লক্ষ। ইহার মধ্যে

হাওড়া……৪২৪৫০০
বালী ……২০০০০০
বারাকপুর…৯০০০০০
মেটিয়াবুরুজ ১৪১০৯০
টালিগঞ্জ…২১৩০০০
বেহালা … ১১৭০০০

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত স্থানের লোক-সংখ্যা ২৫ লক্ষ এবং ইহার মধ্যে ৪ লক্ষ ৩০ হাজার ২ শত ৯০ জন পূর্ববঙ্গ হইতে আগত। দশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে বাসিন্দার সংখ্যা ২১ লক্ষ ছিল। এবার ২৫ লক্ষ হইতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত ৪ লক্ষ বাদ দিলে দেখা যায়, গত দশ বৎসরে খাস কলিকাতার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি অতি সামান্য। সেই জন্য এই হিসাবে ত্রুটি আছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতায় লোক দেখিয়া মনে করিবার কারণ আছে—লোক-সংখ্যা আরও অধিক। সংশোধিত হিসাবে কি দেখা যায়—সে জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে লোকগণনাকালে রাজনীতিক কারণে—সাম্প্রদায়িক হিসাবে সংখ্যা সম্বন্ধে মিথ্যা বৃদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকগণনার হিসাবের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগ স্থির করেন—রাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা মোট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৩৫ হাজার এবং গত বৎসরের প্রাথমিক লোকগণনা অনুসারে (চন্দননগর বাদ দিয়া) লোক-সংখ্যা ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ধরা হইয়াছিল।

অরবিন্দ স্মৃতিরক্ষা—

পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ দেহ-রক্ষার পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিব শ্রীযুত দত্ত মজুমদার পশ্চিমবঙ্গের জন্য তাঁহার কোন দেহাবশেষ রক্ষার কথা জানাইয়া অরবিন্দ আশ্রমে সংবাদ দেন। কিন্তু তাহার পরে তিনি আর সরকারকে সে বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে প্ররোচিত করিতে পারেন নাই এবং নিজেও কোন চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু অরবিন্দের জন্মভূমি ও প্রথম কার্য্যক্ষেত্র বাঙ্গালার পক্ষে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আগ্রহ স্বাভাবিক। সেই জন্য সরকার ও সচিব নিরপেক্ষ হইয়া সে বিষয়ে চেষ্টা হইবে। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছেন, অরবিন্দের পিতার সম্পত্তি মুরারিপুকুর বাগান ক্রয় করিয়া তথায় স্মৃতিমন্দির রচনা করা হউক এবং তথায় পাঠগোষ্ঠী ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক।

অরবিন্দ আশ্রমের আশ্রম-মাতা অরবিন্দের অভিপ্রায়ানুসারে তথায় আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, পূর্ব্ব-আফ্রিকাস্থ অরবিন্দ ভক্তগণ গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় জন্য অর্থ প্রদানের এবং আমেরিকার ভক্তগণ উপকরণ ও যন্ত্রাদি সরবরাহের ও অন্য অনেকে অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ও আগ্রহ জানাইয়াছেন। ইতিমধ্যেই কয় জন বিদেশী অধ্যাপক অধ্যাপনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং নানা দেশের ছাত্ররা অধ্যয়ন করিতে আসিবেন, জানাইয়াছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্ববিধ সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দের মতেরও শিক্ষা প্রদানই অভিপ্রেত। পণ্ডিচেরীতে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের বিদ্যালয়টিতে সে শিক্ষা-পদ্ধতির প্রাথমিক পরীক্ষা হইয়াছে ও হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিনা ব্যয়ে বাসের ও শিক্ষালাভের সর্ব্ববিধ সুযোগ প্রদান করা হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অন্ততঃ এক কোটি টাকা প্রয়োজন।

আইনের অমর্য্যাদা—

কিছুদিন হইতে শাসন বিভাগের কার্য্যে বিচারকদিগের নিন্দা দেখা যাইতেছে। বিনা বিচারে লোককে আটক রাখা যদিও ইংরেজের শাসনকালে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের দ্বারা বিশেষ ভাবে নিন্দিত হইত, তথাপি দেখা যাইতেছে, শাসনক্ষমতা লাভ করিয়া ভারতীয় রাজনীতিকরা সেই নিন্দিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। গত ১০ই মার্চ্চ মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি মামলায় এই বিষয়ের প্রতি লোকের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। ঘটনায় প্রকাশ, কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী গোপালনকে সরকার আটক করিয়া রাখিলে তাহার মুক্তির জন্য আবেদন করা হয়। সেই আবেদন অনুসারে হাইকোর্ট গত ২২শে ফেব্রুয়ারী তাহার মুক্তির আদেশ প্রদান করেন। তিনি আদালতের বাহির হইলেই তাঁহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। দেখা যাইতেছে, পাছে হাইকোর্ট তাঁহাকে মুক্তি দেন, সেই সম্ভাবনায় কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার জন্য এক পরোয়ানা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হাইকোর্টের জজরা মত প্রকাশ করিয়াছেন, যদি গোপালনের মুক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া সরকার বিবেচনা করেন, তবে সে কথা ২২শে ফেব্রুয়ারী—তাঁহারা যখন রায় দেন, তাহার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে জানান সরকারের কর্ত্তব্য ছিল। সরকার তাহা করেন নাই—সুতরাং ঐদিন রায় দানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে নূতন পরোয়ানা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা অসিদ্ধ।

বিনা বিচারে লোককে আটক রাখার ব্যাপারে একাধিক আদালত রায় দিয়াছেন—ঐ কার্য্য ভারতের শাসনতন্ত্রবিরোধী। সে বিষয়ে কয়টি আদালতের অভিমত আমরা গতবার উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। তথাপি যে সরকারসমূহ, হয়ত বা কেন্দ্রী সরকারের অনুমোদনে, বিনা বিচারে

আমাদিগের বিশ্বাস ...

ভারতীয় শাসনতন্ত্র যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য এবং বিনা বিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল সূত্রের বিরোধী।

শুনা যাইতেছে, কোন কোন সচিব প্রভৃতি এই জন্য শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে যে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অন্যান্য সভ্য ও গণতন্ত্রশাসিত দেশের শাসনতন্ত্রের তুলনায় অমর্য্যাদাগ্রস্ত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

মাদ্রাজে গোপালনের মামলায় সরকার পক্ষে এডভোকেট জেনারল আদালতে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, বিচারকরা তাহা আপত্তিকর মনে করায় শেষে তাঁহাকে সেজন্য বলিতে হইয়াছে—তিনি বিচারকদিগের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব দেখান নাই। তবে কি তিনি শাসন বিভাগের উদ্ধত ভাবে সংক্রমিত হইয়া ঐরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন?

এই প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর অসতর্ক উক্তিও আপত্তিজনক। তাঁহার উক্তির ভাবার্থ এই যে বিচারকদিগকে পার্লামেন্টের মতানুসারে কাজ করিতে হইবে। কিন্তু তিনি কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, বিচারকরা শাসনতন্ত্রানুগ ভাবে বিচার-কার্য্য করিবেন—পার্লামেন্টের মতও তাঁহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন? বরং বলা যায়, পার্লামেন্টেও শাসনতন্ত্র মান্য করিয়া চলিতে বাধ্য। বিচার যদি নিয়ম ও ন্যায়সঙ্গত না হয়, তবে তাহা কেবল অবিচারের পর্য্যায়ভুক্তই হয় না—পরন্তু তাহার ফলে দেশের সরকারের সম্ভ্রম ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়।

পুনর্ব্বসতি ও পুনরুচ্ছেদ—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার "অনেক চিন্তার পর" স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত যে সকল বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া—সরকারের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া "পতিত" জমীতে বাস করিতেছেন, তাঁহারা অধিকাংশই অনধিকারবাসী, সুতরাং উচ্ছেদযোগ্য। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু নরনারীর মান ও প্রাণ রক্ষার্থ আগমন বাঙ্গালা বিভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় হইতে আরম্ভ হয়—নোয়াখালী, ত্রিপুরার পৈশাচিক ব্যাপার তাহার প্রথম কারণ। তাহা দেখিয়াও যখন ভারত সরকার, মিষ্টার জিন্নার অধিবাসি-বিনিময়ের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিয়া, দেশ বিভাগে সম্মত হইলেন তখন পঞ্জাবে ও বাঙ্গালায় আনার অগ্নি জ্বলিল। পঞ্জাবে "করাল কৃপাণ মুখে" সমস্যার যেমনই হউক একটা সমাধান হইল। বাঙ্গালায় তাহা হইল না। বাঙ্গালা দূরস্থ এবং অবজ্ঞাত বলিয়া বাঙ্গালার সমস্যা কেন্দ্রী সরকারের আবশ্যক মনোযোগ আকৃষ্ট করিল না; যে জওহরলাল দিল্লীতে পঞ্জাবের বাস্তুত্যাগীদিগকে আশ্রয়ে বঞ্চিত করিতে পারিলেন না, তিনিই বলিলেন, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত বাঙ্গালী হিন্দুরা পূর্ব্ববঙ্গে ফিরিয়া যাউন—পশ্চিম বঙ্গে স্থানাভাব। বিস্ময়ের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন প্রধান সচিব ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ—পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা জানিয়াও বলিলেন, পশ্চিম বাঙ্গালায় উদ্বাস্তু-সমস্যা নাই! তাঁহাকে তক্ত হইতে সরাইয়া তাহা অধিকার করিলেন, সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিধানচন্দ্রের পৈত্রিক বাস পূর্ব্বপাকিস্থানে হইলেও, তাহার সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই বলিলেই চলে। তিনি উদ্বাস্তুদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা করিলেন না; শিয়ালদহ ষ্টেশনে তাহাদিগের দুর্দ্দশাও বিবেচনা করিলেন না। তবে তিনি সমস্যা অস্বীকার করিলেন না—করিতে পারিলেন না। পশ্চিম বঙ্গের ত্যক্ত গ্রামগুলিতে যে বহু লোকের স্থান হইতে পারে, তাহাতে গ্রামগুলির নষ্ট সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার হইতে পারে এবং পশ্চিম বঙ্গের জমীতে যে, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলে এক ফশলের স্থানে দুই বা তিন ফসল উৎপন্ন করা যায়, জল নিকাসের ও সেচের ব্যবস্থায় বহু "পতিত" জমা "উঠিত" হইতে পারে—সে সকল তিনি বিবেচনা করিলেন না। ফলে সুব্যবস্থা হইল না। অব্যবস্থা হইতে লাগিল। উদ্বাস্তুরা যে অনন্যোপায় হইয়া "পতিত" জমীতে বাস করিলে তাহা অনধিকার প্রবেশ হইতে পারে, তাহাও তাহাদিগকে বলিয়া সাবধান করা হইল না। পরন্তু নানাস্থানে তাহারা নিজ চেষ্টায় যে "পতিত" জমীতে গ্রাম রচনা করিল, প্রদেশপাল, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ও তাহার জন্য তাহাদিগের প্রশংসা করিলেন—কারণ, তাহারা সরকারের ভার না হইয়া স্বাবলম্বী হইয়াছিল। বহু উদ্বাস্তু যে কলিকাতার উপকণ্ঠে ঐরূপ জমীতে বাস করিল, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক; কারণ, কলিকাতাই কামধেনু।

কিন্তু কলিকাতার উপকণ্ঠে বহু বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী ধনী ফাটকাবাজ লাভের জন্য জমী কিনিয়াছিল। তাহাদিগের যেন "বাড়া ভাতে ছাই" পড়িল। তাহারা প্রভাবশালীও বটে। তাহারা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল এবং সুযোগ বুঝিয়া "ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা নাশের" ধুয়া তুলিল। ফলে এই দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সহসা—নিদ্রাভঙ্গে কুম্ভকর্ণের মত হইয়া—আইন বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। প্রধান সচিব ব্যবস্থা পরিষদে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন—তাঁহার পক্ষে যখন অধিক ভোট আছে, তখন তিনি কাহাকেও ভয় করেন না—অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের অভিযোগেও নহে। তিনি জানেন, স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশের অধিবাসীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত নহেন এমন প্রতিনিধিদিগের সংখ্যাধিক্যে তিনি "যোহুকুম" ব্যবস্থা পরিষদে ইচ্ছামত আইন করাইতে পারেন এবং তিনি "স্পেশাল" নির্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত।

কিন্তু সেইজন্যই যে তাঁহার অধিক সতর্ক, সংযত ও সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা বলাবাহুল্য। তিনি অবশ্যই বুঝিতে পারেন, যুদ্ধের সময়—সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা হিসাবে যেমন সরকার জমী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই অস্বাভাবিক অবস্থাতেও সেইরূপ গ্রহণ করিতে পারেন। কেবল তাহাই নহে, অনেক স্থানে উদ্বাস্তুরা যে জমীতে বাস করিয়াছেন, সে জমীর মূল্য দিতে তাঁহারা প্রস্তুত; বিলাসী বাগানবাড়ীর ব্যসনের জন্য "ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতার" কথা তুলিতে পারেন না—এ সবও বিবেচ্য। বিধানবাবু বলিয়াছেন, কোন কোন স্থানে উদ্বাস্তুরা ৭ হাজার

পারেন না—কারণ সরকার যে ঋণ দিবেন, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি সত্যসত্যই কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন জমীর মূল্য ৭ হাজার টাকা কাঠা হয়, তবে সরকার প্রথমেই উদ্বাস্তুদিগকে সে জমিতে বাসা বাঁধিতে নিষেধ করেন নাই কেন? আর ঐ জমী কত দিন পূর্ব্বে কি দামে সংগৃহীত হইয়াছিল? এ কথা কি সত্য নহে যে, কোন কোন স্থানে জমী সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া পরে আবার ত্যাগ করিয়াছেন? কেন সেরূপ অব্যবস্থিতচিত্ততার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে? কেনইবা পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থানে স্থানে লোককে উদ্বাস্তু করিয়া সহর রচনার ব্যবস্থা করিতেছেন; অথচ পরিত্যক্ত গ্রামে পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করেন নাই? তাহা না করিয়া যে স্থানে স্থানে চাষের জমী বাসের জন্য গৃহীত হইতেছে, তাহাতে কি পশ্চিমবঙ্গকে খাদ্য বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী রাখাই হইবে না?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অকারণ সর্ব্বজ্ঞতার দম্ভ ত্যাগ করিয়া সরকারী ও বেসরকারী লোক লইয়া পরামর্শ সমিতি গঠিত করিতেন, তবে যে বহু ভ্রম হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত। সেই দোষেই কলিকাতায় সরকারী যান বিভাগের জন্য যে অর্থ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা অসমর্থনীয়। সে অর্থ হয়ত অপব্যয়িতই হইবে—অথচ তাহা সচিবদিগের নহে বলিয়া তাঁহারা উদ্ধতভাবে বলিয়াছেন, ব্যবসায়ে প্রথমেই লাভ হয় না। সেই জন্যই প্রধান সচিবের পরিকল্পনানুসারে বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে সমুদ্রের মৎস্য ক্রীতজাহাজে করিয়া আসিতেছে এবং তাহা মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া ফেলিতে হইতেছে! হয়ত তাহা সেই "গোল্ডেন ক্রাউনের" মতই ব্যর্থ হইবে। সেই জন্যই যে প্রদেশে সরকার লোককে আবশ্যক খাদ্য দিতে পারেন না—বস্ত্রের অভাবে লোককে হাফপ্যাণ্ট পরিতে বলেন, সেই প্রদেশের রাজধানীতে ভূগর্ভে রেলপথ প্রতিষ্ঠার পরীক্ষায় অর্থ ব্যয় হয়!

আজ পুনর্ব্বসতি ব্যাপারে আমরা আর একটি কথা বলিব, সরকার আপত্তি না করায় উদ্বাস্তুরা যে সকল স্থানে গ্রাম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে নূতন সমাজ গঠিত করিয়াছেন—জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া লইয়াছেন—বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—নলকূপ বসাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে যদি অপসারিত করা হয়, তবে যেন এই বিষয় স্মরণ রাখিয়া সরকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন।

পুনর্ব্বসতির নামে যেন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদিগকে আবার উদ্বাস্তু করা না হয়—স্থানদানের নামে বাসের অযোগ্য অস্বাস্থ্যকর স্থান প্রদান করা না হয়। শিয়ালদহ ষ্টেশনের নির্ম্মম অব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়াই আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

অপব্যয়, অপচয় ও অন্যায়—

গত মাসে আমরা ভারত সরকারের বিদেশ হইতে সার আমদানী ব্যাপারে এক কোটিরও অধিক টাকা অপহরণের উল্লেখ করিয়াছি। [illegible] সে [illegible] মাত্র একজন সরকারী কর্ম্মচারীকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। গত ১২ই চৈত্র পার্লামেণ্টে দেশরক্ষা বিভাগের বিরুদ্ধে অপব্যয়ের ও অন্যায়ের যে অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে, মন্ত্রী তাহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং তিনি যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতে সদস্যরাও সন্তুষ্ট হইতে না পারায় দেশরক্ষা খাতে ব্যয়ের বরাদ্দ সে দিন মঞ্জুর করা যায় নাই।

শিব রাও বলেন, দেশরক্ষা বিভাগ ইংলণ্ডে যে প্রতিষ্ঠানকে ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ হাজার সংস্কার-করা পুরাতন "জীপ" গাড়ী সরবরাহের ভার দিয়াছিলেন, সে প্রতিষ্ঠানের মূলধন মোট—৯ হাজার ৭৮ টাকা; আর সেই প্রতিষ্ঠানকে ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়!

পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু বলেন, যে প্রতিষ্ঠানকে বন্দুক ও সমর-সরঞ্জাম সরবরাহের ভার দেওয়া হয়, তাহাকে প্রায় ২ কোটি ৯ লক্ষ টাকার মাল দিতে বলা হয়; অথচ তাহার মোট মূলধন দেড় হাজার টাকা; আর তাহার "অর্ডার" বাতিল করায় প্রতিষ্ঠান ৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করে এবং ক্ষতিপূরণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য একটি সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানে ২৪ হাজার টন ইস্পাত সরবরাহ করিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানের মূলধন মোট ৪ হাজার টাকা!

দেখা যায়, যে ২টি প্রতিষ্ঠানকে ঐ ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগের উপযুক্ত মূলধন ছিল না এবং সেইরূপ প্রতিষ্ঠানকে বহু টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়।

বলা হয়, দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (সর্দ্দার বলদেব সিংহ) এ বিষয়ে নিন্দা হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না।

বৃটেনে ভারতের হাই-কমিশনারের মারফতে "জীপ" যানের সরবরাহের ঠিকা দেওয়া হইয়াছিল। দোষ প্রধানতঃ তাঁহারই।

সর্দ্দার বলদেব সিংহ বলেন, হায়দ্রাবাদের হাঙ্গামার সময় ঐ সকল সরবরাহ করিবার ঠিকা দেওয়া হয়। যেন, সরকার যখন যুদ্ধে রত তখন তাহাকে লুণ্ঠন করা সঙ্গত!

শিব রাও বলেন, ভারত সরকার যে প্রতিষ্ঠানকে পুরাতন সংস্কারকরা "জীপ" সরবরাহের ভার দিয়াছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠানকে ঐরূপ ভার দেওয়ার অপরাধে মিশরে সরকারী কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হয়। কিন্তু এ দেশে—অডিটর-জেনারল, তাঁহার ২ জন সহকারী ও অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী অনুসন্ধান জন্য বৃটেনে গিয়াছিলেন, অথচ কাহারও কিছুই হয় নাই!

এই ব্যাপারে স্বতঃই ১৯২১ খৃষ্টাব্দের "মিউনিশনস বোর্ডের" কেলেঙ্কারী মনে পড়ে। তাহাতে বোর্ডের কর্ত্তা সার টমাস হল্যাণ্ডকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে সেরূপও হয় নাই।

কেন্দ্রী সরকারে দুর্নীতি যেমন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারেও যে তেমনই, তাহার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পাওয়া গিয়াছে। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়াছেন—তাঁহারা সমালোচনা গ্রাহ্য করেন না। বৃটেনে ভারতের হাই কমিশনারও কি তাহাই বলিয়াছেন বা বলিবেন? এ যেন "[illegible]"।

লোকমত এইরূপ অপব্যয়ের অপচয়ের ও অন্যায়ের কি প্রতীকার ... করে, তাহাই এখন দেখিবার বিষয়।

পাকিস্তানে হিন্দু

যদিও পাকিস্তান সরকার তথায় হিন্দুর ধন প্রাণ ও মান নিরাপদ রাখিতে পারেন নাই, তথাপি যে হিন্দুপ্রধান ভারত রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে আগত হিন্দুদিগকে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে এবং যে সকল হিন্দু এখনও তথায় আছেন, তাঁহাদিগকে পাকিস্তান ত্যাগ না করিতে বলিতেছেন, ইহা—উদ্দেশ্যমূলক না হইলেও—মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি সেই কাজের জন্য একজন অতিরিক্ত মন্ত্রী (অবশ্য পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নহেন) নিযুক্তও করিয়াছেন।

পাকিস্তানবাসী মুসলমানদিগের ও পাকিস্তানী মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারীদিগের বর্ত্তমান মনোভাবের পরিচয়ঃ—

(১) বরিশালের ব্রাহ্মণদীয়া গ্রামে গত বৎসর বিলাস দে'র গৃহে ১০ জন হিন্দু নিহত হয় ও হিন্দুদিগকে রক্ষা করিতে যাইয়া আলতাব মিঞা প্রাণ হারায়। যাহারা সেই ব্যাপারের পরে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছিল ... গঙ্গোপাধ্যায় তাহাদিগের অন্যতম। সদ্ভাব মিশনের আশ্বাসে ও দিল্লী চুক্তিতে বিশ্বাসহেতু সে গ্রামে ফিরিয়া গিয়াছিল। গত ১৭ই মার্চ্চ সে তাহার গৃহেই নিহত হইয়াছে। প্রকাশ, একদল মুসলমান তাহাকে হত্যা করিয়াছে।

(২) বরিশালে শান্তি-সমিতির সভাধিবেশনের পরেই মুসলমানরা হিন্দুদিগকে আক্রমণ করে। তাহাতে লজ্জিত হইয়া জিলার মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সভা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা তাঁহারা নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই।

(৩) হিন্দুদিগের গৃহ অধিকার করিয়া—অন্ততঃ সহর হইতে—হিন্দু-বিতাড়নের কার্য্য পূর্ব্ব পাকিস্তানে এখনও চলিতেছে। দিল্লী চুক্তির পরেও যে, সে চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া, হিন্দুর বাড়ী অধিকার করা হইতেছে, খুলনায় তাহার প্রমাণ দিয়া ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ চেষ্টা করিলে বলা হয়, ঘটনা সত্য; কিন্তু ত্রুটি "টেকনিক্যাল"; কারণ বাড়ীটি ৮ই এপ্রিলের পরে দখল করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা দখল করিবার ইচ্ছা পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

ইহাই যদি দিল্লী চুক্তির ব্যাখ্যা হয়, তবে সে চুক্তি কি পাকিস্তান "ভস্মরাশি করি ফেল কর্ম্মনাশা জলে" করিতেছে না?

(৪) যশোহরে রাজেন্দ্র দত্তের সব বাড়ী দখল করা হইয়াছে—বলা হইয়াছে, তিনি তথায় ফিরিয়া না যাইলে দখল ছাড়া হইবে না। তিনি যাইয়া কোথায় থাকিবেন?

ব্যবসা প্রভৃতিতে হিন্দুরা কোন সুযোগই পাইতেছে না।

এই সকল কারণে মনে হয়, দিল্লী চুক্তি ব্যর্থ হইয়াছে এবং ভারত সরকারের নীতির দৌর্ব্বল্য বুঝিয়া পাকিস্তান সে চুক্তির সর্ত্ত পালনের আগ্রহ দেখাইতেছে না।

এই অবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে—অতিরিক্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সম্পর্কিত মন্ত্রীর পদ রক্ষা করা কি অর্থের অপব্যয় ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারা যায়?

চুক্তির এক পক্ষ যদি তাহার সর্ত্ত মানিতে অসম্মত হয় বা কার্য্যে অসম্মতি দেখায়, তবে কি অপর পক্ষ তাহার সর্ত্ত মানিতে বাধ্য? ইহা ধর্ম্মনিরপেক্ষতার কথা নহে—সাধারণ কথা। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হয় ভারত সরকার কি দিল্লী চুক্তি বহাল বিবেচনা করিতেছেন? যদি না করেন, তবে তাহা বাতিল মনে করিবেন কি?

কারণ, সেই চুক্তি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা যে সকল সুবিধা সম্ভোগ করিতেছে, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুরা সে সকল সুবিধায় বঞ্চিত। যদি তথায় হিন্দুর গৃহ প্রত্যর্পিত না হয়, তথাপি কি পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদিগের গৃহ প্রত্যর্পণে হিন্দুদিগকে বাধ্য করা হইবে?

গত ১৪ই চৈত্র পার্লামেণ্টে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দুর বাস অসম্ভব?

কাশ্মীর—

জাতিসঙ্ঘে ইংলণ্ড ও আমেরিকা একযোগে কাশ্মীর সম্বন্ধে এক নূতন প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন। কাশ্মীর ভারত রাষ্ট্রে থাকিতে চাহিয়াছিল এবং ভারত রাষ্ট্রও সে বিষয়ে আগ্রহশীল ছিল। কিন্তু যে সময় ভারতীয় সেনাবল কাশ্মীরে প্রবেশকারী পাকিস্তানী সেনাদলকে বিতাড়িত করিয়া আনিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সহসা কাশ্মীরী সমস্যার সমাধান জন্য অস্ত্র ত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়া জাতিসঙ্ঘের শরণ ল'ন। ফলে কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান হইতেছে না। জাতিসঙ্ঘ সার আওয়েন ডিক্সনকে মধ্যস্থতা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্য সফল হয় নাই। তবে তিনি কাশ্মীরে পাকিস্তানের প্রবেশ অনধিকার প্রবেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। আবার মধ্যস্থ নিয়োগ হইতেছে।

এ বার জাতিসঙ্ঘে আবার নূতন প্রস্তাব ইংলণ্ড ও আমেরিকা উপস্থাপিত করিয়াছে। সে প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করিতে পারেন না। কারণ,—

(১) তাহাতে বিদেশী সেনাদল কাশ্মীরে আনয়নের কথা বলা হইয়াছে।

(২) কাশ্মীর হইতে ভারতীয় সেনা অপসারণ ও গণভোট গ্রহণ সম্বন্ধে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকার একমত হইতে না পারিলে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক মধ্যস্থ নিযুক্ত করা হইবে, বলা হইয়াছে।

(৩) জম্মু ও কাশ্মীর সরকারকে পরিদর্শনাধীন রাখা হইবে।

ভারত সরকার বার বার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ভাবে বলা হইয়াছে—কাশ্মীর সম্বন্ধে কোনরূপ মধ্যস্থতায় ভারত সরকার সম্মত হইতে পারেন না; কারণ, কাশ্মীরের জনগণের ও কাশ্মীর সরকারের আহ্বানে ভারত সরকার আইনসঙ্গত ও নীতিসঙ্গত অধিকারে কাশ্মীরে গিয়াছেন। সুতরাং ভারত সরকারের কাশ্মীরে গমন রাজনীতিক ব্যাপার এবং পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া অনধিকার প্রবেশের অপরাধে অপরাধী হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, ভারত সরকার এখন সমগ্র কাশ্মীরে অর্থাৎ কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যে তাঁহাদিগের অধিকার সম্বন্ধে দৃঢ়তা ত্যাগ করিয়া কেবল কাশ্মীর সম্বন্ধে দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। সে দৃঢ়তা তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিবেন কি না এবং জাতিসঙ্ঘের শরণাগত হইবার পরে আর সে দৃঢ়তায় কোন গুরুত্ব থাকিবে কি না, তাহা বলা যায় না।

সেই জন্য অনেকেই মনে করিতেছেন, ভারত সরকারের পক্ষ হইতে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—হায়দ্রাবাদে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা গ্রহণ না করিয়া—জাতিসঙ্ঘের দরবারে উপনীত হইয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, পাকিস্তান তাহারই সুযোগ লইয়াছে এবং জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি পাকিস্তানকে অনধিকার-প্রবেশকারী বলিলেও যে জাতিসঙ্ঘ সেই মতানুসারে কাজ করিতেছেন না, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব অনিবার্য্য।

কাশ্মীরে ভারত সরকারের প্রবেশাধিকার যদি আইন ও ন্যায়সঙ্গত হয়, তবে সে অধিকার যাহারা অস্বীকার করে তাহারাই বে-আইনী ও অসঙ্গত কাজ করে; তাহারাই অপরাধী। যদি তাহাই হয়, তবে ভারত সরকার সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের কার্য্য বে-আইনী ও অসঙ্গত বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেন কি? সে জন্য যদি জাতিসঙ্ঘের সদস্য-পদ ত্যাগ করিতে হয়, তাহার জন্য ভারত সরকার প্রস্তুত আছেন কি? রুশিয়ার রাষ্ট্রনেতা জাতিসঙ্ঘকে আমেরিকার প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন। আজ কি ভারত সরকারও তাহাই মনে করিতেছেন?

কাশ্মীরের সমস্যা যদি ভারতের সমস্যা হয়, তবে ভারত সরকার কেন জাতিসঙ্ঘকে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দিবেন?

গত ১৪ই চৈত্র দিল্লীতে ভারতীয় পার্লামেণ্টে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীর সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘে পাকিস্তানপক্ষীয় বক্তৃতার নিন্দা করেন এবং ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে ভারত সরকারের দৌর্ব্বল্য-পরিচয়ে বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন—যাহারা ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে, ভারত রাষ্ট্র যে তাহাদিগকেই প্রেমালিঙ্গন দিতেছে, এ দৃশ্য অশোভন।

যদিও ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাহায্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে দোষারোপ করেন নাই। তথাপি পার্লামেণ্টে বলা হইয়াছে—ভারত সরকার সম্মিলিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্যস্থতার প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন; অর্থাৎ এ বিষয়ে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপে যথাকর্ত্তব্য ব্যবস্থা করুন।

পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, কাশ্মীর দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারতের অংশ ছিল; বর্ত্তমান ভারত সরকার যখন পূর্ব্ব সরকারের উত্তরাধিকারী, তখন বৃটেন আর এমন কথা বলিতে পারেন না যে, কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রের অংশ নহে। শেষে তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, ভারত রাষ্ট্র আর তোষণনীতির দ্বারা পাকিস্তানকে তুষ্ট করিবার নীতি অনুসরণ করিবে না।

ভারত রাষ্ট্রের আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন অধিবাসীরা ইহাই চাহিয়া করিয়া লোকমতানুসারে কাশ্মীর সমস্যার ও পূর্ব্ববঙ্গ-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হ'ন, তবে যে তাঁহারা জনগণের সমর্থনই—সে কাজের জন্য—লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অর্ডিন্যান্স ও ব্যবস্থা পরিষদ—

কোন বিরাট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়কর আদায় সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে সে সম্বন্ধে কোন কোন সচিবের অকারণ ও অসঙ্গত হস্তক্ষেপের অভিযোগও উপস্থাপিত হয়। শেষে উত্তেজিত হইয়া প্রধান-সচিব বলেন, তিনি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া ঐ বিষয়ে তদন্ত করাইবেন। ইহাতে আপত্তি করা হয় এবং সভাপতিও বলেন, যে সময় পরিষদের অধিবেশন চলিতেছে, সে সময় অর্ডিন্যান্স জারি করিবার সঙ্কল্পজ্ঞাপন অনভিপ্রেত। তাহাতে বিধানচন্দ্র রায়কে এই কথা বলিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয় যে, তিনি পরিষদের প্রতি অসম্মান দেখান নাই—যদি পরিষদের অধিবেশনকালের মধ্যে আইন প্রণয়ন অসম্ভব হয়, সেই জন্য—তাঁহার আগ্রহপ্রকাশার্থ—অর্ডিন্যান্স জারির কথা বলিয়াছেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন বড়লাটকে অর্ডিন্যান্স জারির ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তখনই লর্ড এলেনবরা তাহাতে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অর্ডিন্যান্স কখনই আইনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না এবং যদি কোন সঙ্কটকালে সরকারের কোন ব্যবস্থা পরিষদের অনুমোদন না লইয়া কাজ করা অনিবার্য্য হয়, তবেই অর্ডিন্যান্স জারি করা সমর্থিত হইতে পারে—নহিলে নহে। সেই জন্যই অর্ডিন্যান্সের আয়ুষ্কাল স্বল্প।

সেই অবস্থায় যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব—ব্যবস্থা পরিষদে অর্ডিন্যান্স জারি করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন, ইহা পরিতাপের বিষয় এবং বোধ হয়, অজ্ঞতাপ্রসূত। তিনি যে আপনার ভুল বুঝিয়া সেই অনভিপ্রেত উক্তির জন্য, প্রকারান্তরে, ত্রুটি স্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, পরিষদের প্রতি অসম্মান জ্ঞাপন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না তাহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

পশ্চিম বঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ—

বাজেট বিচারকালে পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থাপরিষদে যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা যেমন সচিবসঙ্ঘের পক্ষে অগৌরবজনক, তেমনই রাষ্ট্রের পক্ষে দুর্ভাগ্যদ্যোতক। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যখন সচিবসঙ্ঘ গঠন করেন, তখনই তাহার সঙ্গসচিব-নিয়োগে ত্রুটি লক্ষিত হইয়াছিল; রাষ্ট্রেও তখন নানারূপ অভাব অভিযোগ। খাদ্য সম্বন্ধে অভিযোগ দূর হয় নাই; রাষ্ট্রের অভাব বাড়িয়া গিয়াছে; উদ্বাস্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নাই; রাষ্ট্রের লোক কোন দিকে উন্নতি প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই। বাজেট সম্বন্ধে যাহা হয়, পশ্চিম বঙ্গেও তাহাই হইয়াছে—

দুর্নীতির অভিযোগ পূর্ব্ব হইতে গুঞ্জিত হইতেছিল—ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে, প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর চাউল আনয়ন সম্পর্কিত বে-আইনী কার্য্যে ও যান বিভাগের কার্য্যে অভিযোগ অধিক প্রচারিত হইয়াছিল; এবার ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান-সচিবের গৃহ হইতে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর লিখিত পত্রে, স্বয়ং প্রধান-সচিবের সাধারণ চাকরীতে লোক নিয়োগের নির্দেশ পত্রে এবং কর ফাঁকি দিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে অভিযোগে সেই অভিযোগ যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কোন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর বেসরকারী কার্য্যে সরকারী ডাক টিকিট ব্যবহারও দুর্নীতিদুষ্ট হীন কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—ইত্যাদি। এ সবই যে লজ্জাজনক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পরিষদে যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছে সে সকলই যে শিষ্ট এমন বলা যায় না। শিক্ষা-সচিব তাঁহার বক্তব্য শেষ করিবার অবসর লাভ করেন নাই। অন্য কোন কোন সচিব লাঞ্ছিত হইয়াছেন। অর্থ-সচিব তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করেন, দুর্নীতি ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে।

পরিষদে আলোচনায় যে লোকমতই প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দলের বাহিরে অবস্থিত 'ষ্টেটস্‌ম্যান'ও স্বীকার করিয়াছেন। পরিষদে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের খাদ্য, পরিধেয় ও উদ্বাস্তু নীতির তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। যান বিভাগের ও শ্রমিক নীতিরও নিন্দা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার গঠনমূলক কার্য্যে আবশ্যক মনোযোগ দেন নাই, অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ও একদেশদর্শিতায় পরিচয় দিয়া ব্যয়বাহুল্য করিয়াছেন, জমীদারী উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই—ইত্যাদি।

'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন, ডক্টর রায়কে তাঁহার কম্পিতকায় সহসচিবদিগকে সমর্থন দিতে হইয়াছে এবং বাঙ্গালী যে নেতৃত্বে অভ্যস্ত তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সহসচিবরা তাঁহার সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকায় আবশ্যক দায়িত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ডক্টর রায়ও যে সংযমের অভাব দেখাইয়াছেন, তাহা অশোভন—কারণ, তাঁহার ধৈর্য্যের অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। সে অগ্নিপরীক্ষায় তিনি যে অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন—সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

সচিব সঙ্ঘের ত্রুটির প্রধান কারণগুলির মধ্যে দেখা যায়—জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদিগের সহিত সহযোগে অনিচ্ছা, জনমতের প্রতি আবশ্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনিচ্ছা, দলরক্ষার অর্থাৎ ক্ষমতারক্ষার অত্যুগ্র আগ্রহ, দুর্নীতি সম্বন্ধে উপেক্ষা।

যে সময় রাষ্ট্রে লোক অন্নাভাবে শীর্ণ সেই সময় যে কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষায় বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে; বহু অর্থ ব্যয়ে সমুদ্র হইতে মৎস্য কলিকাতায় আনিবার জন্য যে জাহাজ বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার কল যে অচল হইয়াছে; বিদেশী ট্রাম কোম্পানীকে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশীয় বাস কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বহু ব্যয়ে যে বাস সার্ভিস চালাইতেছেন, তাহাতে উপযুক্ত লাভ হইতেছে না—যাহাদিগের অর্থে হইতেছে, তাহারা যে ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না—তাহা কি বিবেচ্য নহে?

আবার জমীদারীপ্রথার উচ্ছেদ করা হয় নাই; পঙ্গু ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত সচিবরা শয্যাশায়ী থাকিলেও তাঁহাদিগের স্থানে অন্য সচিব গ্রহণ করা হইতেছে না; যাঁহাদিগের চাকরীর বয়স অতিক্রান্ত, এরূপ বহু লোককে আবার চাকরী দিয়া অন্যের উন্নতি-পথ বন্ধ করা হইতেছে; চোরা-বাজার দমিত হইতেছে না; পুলিসের সম্বন্ধে প্রধান-সচিবও কটূক্তি করিতে বাধ্য হইতেছেন—ইত্যাদি অভিযোগে লোকের অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছে।

"মহাজাতি সদনের" নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ না করায় সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে অবজ্ঞার অভিযোগও যে উপস্থাপিত হয় নাই, এমন নহে।

পুলিসের সম্বন্ধে অভিযোগ অনেক।

কেন্দ্রী সরকারও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, এমন মনে হয় না। কারণ, বিধানবাবুই বলিয়াছেন:—

(১) তিনি পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদিগকে যেরূপ ভোটদানের অধিকার দিতে বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহাতে সম্মত হ'ন নাই।

(২) সীমান্তের পথের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা না করায় আবশ্যক অর্থসংগ্রহার্থ মোটর ট্যাক্স বাড়াইতে হইতেছে।

ব্যবস্থা পরিষদে যে দৃশ্য লক্ষিত হইতেছে, তাহা প্রীতিপ্রদ ত নহেই, পরন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকের পক্ষে আশঙ্কার কারণও বলা যায়।

নেপাল—

নেপালের রাজা ত্রিভুবন পরিজনগণসহ ভারত রাষ্ট্র হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ যে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে উল্লসিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তা প্রতিপন্ন হয়। এইবার স্বৈরশাসনাধীন নেপালে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যেমন, নেপালী কংগ্রেসের নেতা কৈরালাও তেমনই তাঁহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি নেপালে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। বোধ হয়, প্রথমে ১০জন মন্ত্রী লইয়া নেপালে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে—নেপালী কংগ্রেসের প্রতিনিধি ৫জন এবং জেনারল মোহন সমসেরের পক্ষীয় ৫জন। জনগণের প্রতিনিধিরা অর্থ, শিল্প বাণিজ্য, যানবাহন ও সংযোগ—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভার পাইবেন। রাণা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা দেশরক্ষা, গণস্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিভাগসমূহের পরিচালন করিবেন।

যদিও উভয়পক্ষে যাঁহারা চরমপন্থী তাঁহারা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে না পারেন, তথাপি আরম্ভ হিসাবে এই ব্যবস্থা যে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সংস্কারের নামে সংহার যেমন কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না, তেমনই সংস্কার যদি অত্যন্ত উগ্র হয়, তবে তাহা বিপজ্জনক হইতেও পারে। ইংলণ্ডের বর্ণনায়

"Where freedom slowly broadens down
From Precedent to Precedent."

অর্থাৎ তথায় স্বাধীনতা ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থায় ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে, সেইরূপ স্বাধীনতা স্থায়ী হয়। ভারত সরকার নেপালে এই শাসন-ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। এখন নেপাল সরকার যে গণপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তাহাতে গণমত আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানে বিচার-বিবেচনাফলে যে সকল বিধিবিধান প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই সকল নেপালের জনগণকে ক্রমে অধিক অধিকার লাভের যোগ্যতা প্রদান করিতে পারিবে।

রাজনীতিক অধিকার-বিস্তারের প্রয়োজন অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, নেপালের মত যে দেশ দীর্ঘকাল অনুন্নত শাসনাধীন, সে দেশে প্রথমেই জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ও তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় করা প্রয়োজন। সে কাজের গুরুত্ব যেমন অধিক, তাহা তেমনই মনোযোগসাপেক্ষ। এই কার্য্যদক্ষতা ও দেশসেবার আগ্রহ ইহার সাফল্যেই পরীক্ষিত হইবে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ নেপালের লোকের সমরদক্ষতায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে এবং দীর্ঘকালের বন্ধুত্বহেতু নেপালের জনগণের উন্নতিতে প্রভাবিত হইতে ও সেই উন্নতি প্রভাবিত করিতে পারে। নেপাল স্বাধীন রাজ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু নেপাল স্বৈরশাসনাধীন ছিল। নেপালের শাসকগণ বুঝিয়াছেন, কোন শক্তিই দেশে গণতান্ত্রিক প্রভাবের গতিরোধ করিতে পারে না এবং যাঁহারা শাসন-কার্য্য পরিচালিত করেন, তাঁহারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে যে পরিমাণ দায়িত্ববোধের ও সংযমের পরিচয় দিতে পারেন, গণতন্ত্রের জয়রথের যাত্রা তত দ্রুত ও বাধাশূন্য হয়।

নেপাল সরকার যে বিদ্রোহীদিগকেও ক্ষমা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে যে সুফল ফলিবে, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

নেপাল এই শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন গণমতের জয় এবং সেইজন্য আমরা নেপালের গণজাগরণ অভিনন্দিত করিয়া নেপাল রাজ্যে গণমতের জয়যাত্রার আশা পোষণ করিতেছি।

নেপালে এখন নূতন বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে আশা করা যায় তাহা অচিরে দূর হইবে।

পৌর নির্ব্বাচন—

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের পরে সর্ব্বপ্রধান পৌর প্রতিষ্ঠান। তাহাতে কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল—এ বার বিরোধীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইয়াছে। পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচন যে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাভাস, এমন নহে। তবে হাওড়া কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং তথায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কেবল যে নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন, এবং নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হাওড়ায় পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পৌর নির্ব্বাচনে রাজনীতিক দলাদলির প্রভাব অভিপ্রেত নহে এবং সে প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক হয় না। দমদমার একাংশের পৌর নির্ব্বাচনে একজন কংগ্রেসদলভুক্ত প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক জানাইয়াছেন, তথায় কমিটী কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। আমরা তাহাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। হাওড়াতেও তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন। আমাদিগের বিশ্বাস, দক্ষিণ কলিকাতায় ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যদি শরৎচন্দ্র বসুর কায্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়ন না করিতেন, তবে অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিত না। সে সময় কলিকাতার কংগ্রেসপন্থী সংবাদপত্রগুলি যে ভাবে শরৎবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আজ তাঁহারাও নিশ্চয় লজ্জিত। সে সময় পণ্ডিত জওহরলাল যাহা বলিয়াছিলেন, সে সত্যও রক্ষিত হয় নাই। কংগ্রেস দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান—একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কংগ্রেসের পক্ষে পৌর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে?

কোরিয়া—

কোরিয়ার যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবার কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। আমেরিকার সেনাবল তথায় যুদ্ধ করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার এটলী পার্লামেণ্টে যাহা বলিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে রুশিয়ার রাষ্ট্রপতি ষ্ট্যালিন যে উক্তি করিয়াছিলেন তদুত্তর পাঠ করিলে কোরিয়ার যুদ্ধে যে আলোকপাত হয়, আর কিছুতেই তাহা হইতে পারে না।

মিষ্টার এটলী বলিয়াছিলেন—বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংলণ্ড ও আমেরিকা সমরসজ্জা হ্রাস করিয়াছিল, কিন্তু রুশিয়া তাহা করে নাই। রুশিয়া সেই বিরাট সেনাবলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। ইহার অর্থ—রুশিয়াই যুদ্ধকামী—ইংলণ্ড ও আমেরিকা নহে।

ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, এটলীর উক্তি মিথ্যা; যুদ্ধের অবসানে রুশিয়া সমরসজ্জা হ্রাস করিতে ত্রুটি করে নাই।

তিনি বলেন, যুদ্ধ নিবারণ করা এখনও অসম্ভব নহে। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা যদি চীনের শান্তি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তবেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে। এটলী রুশিয়ার শান্তিস্থাপনচেষ্টা আক্রমণাত্মক এবং অ্যাংলো-আমেরিকান দলের আক্রমণাত্মক চেষ্টা শান্তি স্থাপনোপায় বলিয়া মিথ্যার দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করিতেছেন। তাহার কারণ, ইংলণ্ডের ও আমেরিকার জনগণের অধিকাংশ যুদ্ধ চাহে না এবং উভয় দেশের সৈনিকরা যুদ্ধবিরোধী বলিয়াই তাহাদিগের যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। দেশের জনগণকে যুদ্ধপ্রয়াসী করিতে না পারিলে যুদ্ধে অ্যাংলো-আমেরিকান দলের পরাভব ঘটিবে। দেশের লোক ও সৈনিকরা

দুর্নীতির অভিযোগ পূর্ব্ব হইতে গুঞ্জিত হইতেছিল—ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে, প্রচার বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর চাউল আনয়ন সম্পর্কিত বে-আইনী কার্য্যে ও যান বিভাগের কার্য্যে অভিযোগ অধিক প্রচারিত হইয়াছিল; এবার ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান-সচিবের গৃহ হইতে কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর লিখিত পত্রে, স্বয়ং প্রধান-সচিবের সাধারণ চাকরীতে লোক নিয়োগের নির্দ্দেশ পত্রে এবং কর ফাঁকি দিবার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে অভিযোগে সেই অভিযোগ যেন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে। কোন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীর বেসরকারী কার্য্যে সরকারী ডাক টিকিট ব্যবহারও দুর্নীতিদুষ্ট হীন কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে—ইত্যাদি। এ সবই যে লজ্জাজনক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পরিষদে যে সকল উক্তি-প্রত্যুক্তি হইয়াছে সে সকলই যে শিষ্ট এমন বলা যায় না। শিক্ষা-সচিব তাঁহার বক্তব্য শেষ করিবার অবসর লাভ করেন নাই। অন্য কোন কোন সচিব লাঞ্ছিত হইয়াছেন। অর্থ-সচিব তাঁহার বক্তৃতায় স্বীকার করেন, দুর্নীতি ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে।

পরিষদে আলোচনায় যে লোকমতই প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা দলের বাহিরে অবস্থিত 'ষ্টেটস্‌ম্যান'ও স্বীকার করিয়াছেন। পরিষদে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের খাদ্য, পরিধেয় ও উদ্বাস্তু নীতির তীব্র সমালোচনা হইয়াছে। যান বিভাগের ও শ্রমিক নীতিরও নিন্দা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার গঠনমূলক কার্য্যে আবশ্যক মনোযোগ দেন নাই, অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ও একদেশদর্শিতায় পরিচয় দিয়া ব্যয়বাহুল্য করিয়াছেন, জমীদারী উচ্ছেদের প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই—ইত্যাদি।

'ষ্টেটসম্যান' বলিয়াছেন, ডক্টর রায়কে তাঁহার কম্পিতকায় সহসচিবদিগকে সমর্থন দিতে হইয়াছে এবং বাঙ্গালী যে নেতৃত্বে অভ্যস্ত তিনি তাহা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার সহসচিবরা তাঁহার সাহায্য সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকায় আবশ্যক দায়িত্ব-জ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ডক্টর রায়ও যে সংযমের অভাব দেখাইয়াছেন, তাহা অশোভন—কারণ, তাঁহার ধৈর্য্যের অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল। সে অগ্নিপরীক্ষায় তিনি যে অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন—সে সম্বন্ধে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

সচিব সঙ্ঘের ত্রুটির প্রধান কারণগুলির মধ্যে দেখা যায়—জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিদিগের সহিত সহযোগে অনিচ্ছা, জনমতের প্রতি আবশ্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে অনিচ্ছা, দলরক্ষার অর্থাৎ ক্ষমতারক্ষার অত্যুগ্র আগ্রহ, দুর্নীতি সম্বন্ধে উপেক্ষা।

যে সময় রাষ্ট্রে লোক অন্নাভাবে শীর্ণ সেই সময় যে কলিকাতায় ভূগর্ভে রেলপথ স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষায় বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে; বহুঅর্থ ব্যয়ে সমুদ্র হইতে মৎস্য কলিকাতায় আনিবার জন্য যে জাহাজ বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার কল যে অচল হইয়াছে; বিদেশী ট্রাম কোম্পানীকে আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেশীয় বাস কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া বহু ব্যয়ে যে বাস সার্ভিস চালাইতেছেন, তাহাতে উপযুক্ত লাভ হইতেছে না—এই সব সম্বন্ধে সরকারের কৈফিয়ৎ—পরীক্ষায় ক্ষতি হয়! কিন্তু পরীক্ষা যাহাদিগের অর্থে হইতেছে, তাহারা যে ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না—তাহা কি বিবেচ্য নহে?

আবার জমীদারীপ্রথার উচ্ছেদ করা হয় নাই; পঙ্গু ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত সচিবরা শয্যাশায়ী থাকিলেও তাঁহাদিগের স্থানে অন্য সচিব গ্রহণ করা হইতেছে না; যাঁহাদিগের চাকরীর বয়স অতিক্রান্ত, এরূপ বহু লোককে আবার চাকরী দিয়া অন্যের উন্নতি-পথ বন্ধ করা হইতেছে; চোরা-বাজার দমিত হইতেছে না; পুলিসের সম্বন্ধে প্রধান-সচিবও কটূক্তি করিতে বাধ্য হইতেছেন—ইত্যাদি অভিযোগে লোকের অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছে।

"মহাজাতি সদনের" নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ না করায় সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে অবজ্ঞার অভিযোগও যে উপস্থাপিত হয় নাই, এমন নহে।

পুলিসের সম্বন্ধে অভিযোগ অনেক।

কেন্দ্রী সরকারও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, এমন মনে হয় না। কারণ, বিধানবাবুই বলিয়াছেন :—

(১) তিনি পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদিগকে যেরূপ ভোটদানের অধিকার দিতে বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহাতে সম্মত হ'ন নাই।

(২) সীমান্তের পথের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহা করিতে বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাহা না করায় আবশ্যক অর্থসংগ্রহার্থ মোটর ট্যাক্স বাড়াইতে হইতেছে।

ব্যবস্থা পরিষদে যে দৃশ্য লক্ষিত হইতেছে, তাহা প্রীতিপ্রদ ত নহেই, পরন্তু পশ্চিমবঙ্গের লোকের পক্ষে আশঙ্কার কারণও বলা যায়।

নেপাল—

নেপালের রাজা ত্রিভুবন পরিজনগণসহ ভারত রাষ্ট্র হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। প্রজাগণ যে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে উল্লসিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার জনপ্রিয়তা প্রতিপন্ন হয়। এইবার স্বৈরশাসনাধীন নেপালে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধা হইল। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী যেমন, নেপালী কংগ্রেসের নেতা কৈরালাও তেমনই তাঁহাকে সাদরে সম্বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনি নেপালে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। বোধ হয়, প্রথমে ১০জন মন্ত্রী লইয়া নেপালে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইবে—নেপালী কংগ্রেসের প্রতিনিধি ৫জন এবং জেনারল মোহন সমসেরের পক্ষীয় ৫জন। জনগণের প্রতিনিধিরা অর্থ, শিল্প বাণিজ্য, যানবাহন ও সংযোগ—এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভার পাইবেন। রাণা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা দেশরক্ষা, গণস্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিভাগসমূহের পরিচালন করিবেন।

যদিও উভয়পক্ষে যাঁহারা চরমপন্থী তাঁহারা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে না পারেন, তথাপি আরম্ভ হিসাবে এই ব্যবস্থা যে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচনা করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সংস্কারের নামে সংহার যেমন কিছুতেই সমর্থিত হইতে পারে না, তেমনই সংস্কার যদি অত্যন্ত উগ্র হয়, তবে তাহা বিপজ্জনক হইতেও পারে। ইংলণ্ডের বর্ণনায় ইংরেজ কবি টেনিসন বলিয়াছেন, সে দেশ—

"Where freedom slowly broadens down
From Precedent to Precedent."

অর্থাৎ তথায় স্বাধীনতা ব্যবস্থা হইতে ব্যবস্থায় ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে, সেইরূপ স্বাধীনতা স্থায়ী হয়। ভারত সরকার নেপালে এই শাসন-ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। এখন নেপাল সরকার যে গণপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, তাহাতে গণমত আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবে এবং সেই প্রতিষ্ঠানে বিচার-বিবেচনাফলে যে সকল বিধিবিধান প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই সকল নেপালের জনগণকে ক্রমে অধিক অধিকার লাভের যোগ্যতা প্রদান করিতে পারিবে।

রাজনীতিক অধিকার-বিস্তারের প্রয়োজন অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, নেপালের মত যে দেশ দীর্ঘকাল অনুন্নত শাসনাধীন, সে দেশে প্রথমেই জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের ও তাহাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় করা প্রয়োজন। সে কাজের গুরুত্ব যেমন অধিক, তাহা তেমনই মনোযোগসাপেক্ষ। এই কার্য্যদক্ষতা ও দেশসেবার আগ্রহ ইহার সাফল্যেই পরীক্ষিত হইবে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশ নেপালের লোকের সমরদক্ষতায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতবর্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে এবং দীর্ঘকালের বন্ধুত্বহেতু নেপালের জনগণের উন্নতিতে প্রভাবিত হইতে ও সেই উন্নতি প্রভাবিত করিতে পারে। নেপাল স্বাধীন রাজ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু নেপাল স্বৈরশাসনাধীন ছিল। নেপালের শাসকগণ বুঝিয়াছেন, কোন শক্তিই দেশে গণতান্ত্রিক প্রভাবের গতিরোধ করিতে পারে না এবং যাঁহারা শাসন-কার্য্য পরিচালিত করেন, তাঁহারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে যে পরিমাণ দায়িত্ববোধের ও সংযমের পরিচয় দিতে পারেন, গণতন্ত্রের জয়রথের যাত্রা তত দ্রুত ও বাধাশূন্য হয়।

নেপাল সরকার যে বিদ্রোহীদিগকেও ক্ষমা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে যে সুফল ফলিবে, এমন আশা আমরা অবশ্যই করিতে পারি।

নেপাল এই শাসন-ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন গণমতের জয় এবং সেইজন্য আমরা নেপালের গণজাগরণ অভিনন্দিত করিয়া নেপাল রাজ্যে গণমতের জয়যাত্রার আশা পোষণ করিতেছি।

নেপালে এখন নূতন বিশৃঙ্খলা লক্ষিত হইতেছে আশা করা যায় তাহা অচিরে দূর হইবে।

পৌর নির্ব্বাচন—

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের পরে সর্ব্বপ্রধান পৌর প্রতিষ্ঠান। তাহাতে কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল—এ বার বিরোধীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হইয়াছে। পৌর প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচন যে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনের পূর্ব্বাভাস, এমন নহে। তবে হাওড়া কলিকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এবং তথায় পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কেবল যে নির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাই নহে—মনোনীত প্রার্থীদিগকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন এবং নির্ব্বাচনের অব্যবহিত পূর্ব্বে হাওড়ায় পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক সম্মিলন অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পৌর নির্ব্বাচনে রাজনীতিক দলাদলির প্রভাব অভিপ্রেত নহে এবং সে প্রভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক হয় না। দমদমার একাংশের পৌর নির্ব্বাচনে একজন কংগ্রেসদলভুক্ত প্রার্থীও নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক জানাইয়াছেন, তথায় কমিটী কোন প্রার্থী মনোনীত করেন নাই। আমরা তাহাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। হাওড়াতেও তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন। আমাদিগের বিশ্বাস, দক্ষিণ কলিকাতায় ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে কংগ্রেস যদি শরৎচন্দ্র বসুর কার্য্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়ন না করিতেন, তবে অনেক অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিত না। সে সময় কলিকাতার কংগ্রেসপন্থী সংবাদপত্রগুলি যে ভাবে শরৎবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আজ তাঁহারাও নিশ্চয় লজ্জিত। সে সময় পণ্ডিত জওহরলাল যাহা বলিয়াছিলেন, সে সত্যও রক্ষিত হয় নাই। কংগ্রেস দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান—একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলিলেও অসঙ্গত হয় না। কংগ্রেসের পক্ষে পৌর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কি প্রয়োজন অনুভূত হইতে পারে?

কোরিয়া—

কোরিয়ার যুদ্ধ নিবৃত্ত হইবার কোন সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। আমেরিকার সেনাবল তথায় যুদ্ধ করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী মিষ্টার এটলী পার্লামেণ্টে যাহা বলিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে রুশিয়ার রাষ্ট্রপতি ষ্ট্যালিন যে উক্তি করিয়াছিলেন তদুভয় পাঠ করিলে কোরিয়ার যুদ্ধে যে আলোকপাত হয়, আর কিছুতেই তাহা হইতে পারে না।

মিষ্টার এটলী বলিয়াছিলেন—বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংলণ্ড ও আমেরিকা সমরসজ্জা হ্রাস করিয়াছিল, কিন্তু রুশিয়া তাহা করে নাই। রুশিয়া সেই বিরাট সেনাবলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। ইহার অর্থ—রুশিয়াই যুদ্ধকামী—ইংলণ্ড ও আমেরিকা নহে।

ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, এটলীর উক্তি মিথ্যা; যুদ্ধের অবসানে রুশিয়া সমরসজ্জা হ্রাস করিতে ত্রুটি করে নাই।

তিনি বলেন, যুদ্ধ নিবারণ করা এখনও অসম্ভব নহে। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকা যদি চীনের শান্তি-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তবেই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে। এটলী রুশিয়ার শান্তিস্থাপনচেষ্টা আক্রমণাত্মক এবং অ্যাংলো-আমেরিকান দলের আক্রমণাত্মক চেষ্টা শান্তি স্থাপনোপায় বলিয়া মিথ্যার দ্বারা লোককে বিভ্রান্ত করিতেছেন। তাহার কারণ, ইংলণ্ডের ও আমেরিকার জনগণের অধিকাংশ যুদ্ধ চাহে না এবং উভয় দেশের সৈনিকরা যুদ্ধবিরোধী বলিয়াই তাহাদিগের যুদ্ধের ফল সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। দেশের জনগণকে যুদ্ধপ্রয়াসী করিতে না পারিলে যুদ্ধে অ্যাংলো-আমেরিকান দলের পরাভব ঘটিবে। দেশের লোক ও সৈনিকরা জার্ম্মানী ও জাপানের বিরোধী ছিল বলিয়াই, তাহারা ঐ দেশদ্বয়ের

বিরুদ্ধে প্রবল বলে যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। কেবল সেনাপতিরা উপযুক্ত হইলেই যুদ্ধে জয় হয় না।

ষ্ট্যালিন বলিয়াছেন, আমেরিকা যে চীনের রাজ্যাংশ—টিটেয়ান দ্বীপ অর্থাৎ ফরমোশা অধিকার করিয়াছে, তাহা লজ্জাজনক ব্যাপার এবং চীন তাহা পাইবার চেষ্টা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে চীন তাহার সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছে। এই অবস্থায় চীনকে পরস্বাপহরণলোলুপ বলা অসঙ্গত।

ষ্ট্যালিন মত প্রকাশ করিয়াছেন, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ তাহার পূর্ববর্তী "লীগ অব নেশানের" মতই—সমগ্র পৃথিবীর প্রতিষ্ঠান নহে, কেবল আমেরিকার প্রতিষ্ঠান এবং আমেরিকার স্বার্থসাধনই তাহার উদ্দেশ্য। সেই প্রতিষ্ঠানই পৃথিবীতে আবার যুদ্ধের উদ্ভব ঘটাইতেছে।

ষ্ট্যালিনের উক্তি সমগ্র পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের উদ্ভব করিয়াছে। যখন দুই দলে মনোভাব এত বিভিন্ন এবং পরস্পরের প্রতি তাহাদিগের সন্দেহ সুস্পষ্ট, তখনই যে—যে কোন মুহূর্ত্তে কোরিয়ার যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। বিশেষ ষ্ট্যালিন ফরমোশার ব্যাপারে যে ভাবে আমেরিকাকে পরস্বাপহরণকারী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহাতেই যুদ্ধ ঘোষিত হইলে রুশিয়া যে চীনের পক্ষাবলম্বন করিবে এবং উভয়ে কোরিয়ার কম্যুনিষ্ট অংশকে সাহায্য করিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তাহা যে বিশ্বযুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমেরিকা যুদ্ধ চাহিতেছে। তাহার বিশ্বাস, রুশিয়া বিমান-শক্তিতে আরও দৃঢ় হইতে পারিলে আমেরিকার পক্ষে অর্থাৎ অ্যাংলো আমেরিকান দলের পক্ষে তাহাকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য হইবে সুতরাং এখনই যুদ্ধ ভাল।

যদি বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় তবে—"কমনওয়েথ"ভুক্ত ভারতরাষ্ট্র কি করিবে? এ পর্য্যন্ত সে চীনের কম্যুনিষ্ট সরকারকে স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষাবলম্বনই করিয়া আসিয়াছে এবং সেই জন্য ইংলণ্ডের বহু পত্রের বিরাগভাজন হইয়াছে। অতঃপর কি হইবে?

সম্প্রতি ম্যাকআর্থারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে চীন যে উক্তি করিয়াছে, তাহাও যুদ্ধের আয়োজন বলা অসঙ্গত নহে। তাহার পরে কি চীনা ও কোরিয়ান কম্যুনিষ্টরা রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে সম্মত হইবে? না হইলে যুদ্ধও চলিবে এবং রুশিয়াও যে যুদ্ধে যোগ দিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৫ই চৈত্র—১৩৫৭

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ (২)

শ্রীসুরেশচন্দ্র বিশ্বাস

(শ্রীশুক)

উদ্ধব এ কথা শুনি' কৃষ্ণ বাক্য অনুসারি
রথে চড়ি' ব্রজপুর অভিমুখে যায়,
রবি গেল অস্তাচলে, গোকুলে পশিল যবে,
পুষ্পবতী ধেনু পানে মত্ত বৃষ ধায়।

চলেছে উড়ায়ে ধূলি, পুচ্ছ তুলি' ধেনুগুলি
স্তন ভারাক্রান্ত গাভী ধায় হাম্বারবে,
ইতস্ততঃ ছোটাছুটি করে শুভ্র বৎস কটি,
ধেনু-বৎসে নন্দপুর শোভিছে গৌরবে।

গোদোহন শব্দ সহ মিলিয়া মধুর বেণু
নিঃস্বনে নিনাদে পূর্ণ সে অপূর্ব্ব পুরী,
কৃষ্ণ বলরাম—কথা, গুণাগান যথাতথা
কেমনে বর্ণিব আমি ব্রজের মাধুরী?

অগ্নি আর অতিথিরা গাভী বিপ্র পিতৃগণ
দেবতা অর্চ্চিত সেথা পরম আদরে,
ধূপ দীপ পুষ্পমাল্যে ভূষিত সকল গেহ
সর্ব্বত্র পুষ্পিত বনে ভ্রমর গুঞ্জরে।

হংস কারণ্ডবাকীর্ণ পদ্মফুলে সুমণ্ডিত
কৃষ্ণ প্রিয় উদ্ধবের সেথা আগমন,
প্রীতিভরে নন্দ তারে বাসুদেব সমজ্ঞানে
আলিঙ্গিয়া সমাদরে করে আপ্যায়ন।

পরমান্ন সেবনান্তে সুখশয্যা পরে শুয়ে
পদ-মর্দ্দনাদি শেষে শ্রম হ'ল হ্রাস,
জিজ্ঞাসিল, মহাভাগ, কহ সখা—বসুদেব
বিমুক্ত বন্ধন এবে সুখে করে বাস?

সুধী সাধু ধর্ম্মশীল যদুকুল দ্বেষকারী
কংস স্বীয় পাপে হত স্বজন সহিত,
আজো কৃষ্ণ আমাদের স্মরণ করে কি কভু
পিতামাতা সখা সখী ভুলে কদাচিত?

গোপ গোপী এই ব্রজ, যেথা তার পদরজ
তিনিই গোকুলপ্রাণ জানি সুনিশ্চয়,
শ্যামলী ধবলী ধেনু বৃন্দাবন গিরি শৃঙ্গ,
মনে কি ভাসে না তার স্মৃতি সমুদয়?

ভাষা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বৈদিক ভাষাই প্রাকৃত ভাষার মূল।

দেশজ ভাষাই প্রাকৃত ভাষা। তাহাকে সাধু ভাষা বলা চলে না। দেশ-ভাষা মার্জ্জিত হইলে তাহা লেখ্য-ভাষা হয়। লিখিবার ভাষা ও কহিবার ভাষায় এজন্য পার্থক্য থাকে অনেক, বেদকে অপৌরুষেয় বলার কারণ ইহা দীর্ঘ অতীতে রচিত।

ঋগ্বেদ রচনা হয় বহুদিন ধরিয়া। মুখে মুখেই তাহা থাকে। লিখিতে তাঁরা নারাজ ছিলেন। বেদ লিখিলে নরকে যাইতে হইবে ভয় দেখান (—বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ)। কিন্তু লিপি-বিদ্যা ভারতের প্রাচীন জিনিষ। মহেঞ্জোদরোতেও লিপি পাওয়া গিয়াছে। যদিও সে লিপির এখনও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। বিশেষজ্ঞগণের মতে মহেঞ্জোদরোর সভ্যতা আবেস্তিক আর্য্যদের আসার পূর্ব্বের ভারত-সভ্যতার নিদর্শন।

বেদের কাহিনীগুলি প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যদের বংশপরম্পরাক্রমে শ্রুত বিবরণ। সেজন্য বেদকে শ্রুতি বলা হইত। লেখা হওয়ার পরও সেই শ্রুতি নামেই বেদগুলি পরিচিত হইতেছে। এই সব বেদের ভাষাই তখনকার দিনের কথ্য ভাষা ছিল। কথ্য ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপেক্ষা সহজ ও সরল হয়। বৈদিক ভাষা ব্যাকরণসম্মত সংস্কৃত হয় অনেক পরে। বৈয়াকরণিক পাণিনির জন্ম তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে। সংস্কৃত ভাষা প্রাকৃত ভাষার অপেক্ষা দুর্ব্বোধ হইল। সাধারণ লোক সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারিল না, দেশজ প্রাকৃত ভাষাই তাহারা ব্যবহার করিতে লাগিল। লিখিবার ভাষারূপে বা ভদ্র সমাজের কথ্য ভাষারূপে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইতে লাগিল।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ বলেন—ঋগ্বেদ রচনার কালে আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তর হইতে পূর্ব্বদিকে গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদী পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়েন। প্রথমে যে 'আবেস্তিক' আর্য্যদল ভারতে আসেন, ইঁহারা তাহাদেরই বৃহৎ গোষ্ঠী, পূর্ব্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর ভূমি তাহারা তখন করায়ত্ত করিয়াছেন। ইহাই বিরাট আর্য্যাবর্ত্ত। আদি অধিবাসী অনার্য্যদের খুব সহজে তাঁহারা পরাজিত করিতে পারেন নাই। প্রাচীন ভারতের ভূস্বর্গ কোথায় ছিল তাহার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। তবে এই স্থানের নিকটবর্ত্তী কোথাও ছিল। সেই স্বর্গোপম স্থান হইতে বহুবার আর্য্য-গরিষ্ঠগণ (দেবতা বা প্রজাপতিগণ) পরাজিত ও বিতাড়িত হ'ন এবং বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেন। তাহা পুনঃপ্রাপ্তির বিবরণই—বেদ হইতে পুরাণগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। তবে অনার্য্যগণ এই প্রদেশ হইতে উৎখাত হয়। সংঘর্ষের ভিতর তাঁহাদের মধ্যে যৌন সম্বন্ধ হইয়াছে। অনার্য্য আচার-ব্যবহার ও অনার্য্য ভাষা এইভাবে বৈদিক ভাষায় মিশিয়া যায়। তখনি দেখা যায় আর্য্যাবর্ত্তেরই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে। অবশ্য বেদের ব্রাহ্মণ কাণ্ড অনেক পরে লেখা। সেই সময়ে রচিত কৌশিতকী-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, উত্তর দেশের ভাষাই উৎকৃষ্ট ছিল। যাস্ক বলিয়াছেন, অন্য দেশে অপ্রচলিত যে গত্যর্থ-ক্রিয়া বিশেষ, তাহা কম্বোজে প্রচলিত ছিল।

রামায়ণের পূর্ব্বে লেখা কোনও প্রাচীন গ্রন্থে 'সংস্কৃত' কথাটি পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় রামায়ণ ৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে লেখা হয়। এখন বৈদিক ও সারসিক—উভয় ভাষাকেই সংস্কৃত বলা হইতেছে। অনেকে দেব ভাষাও আখ্যা দেন।

প্রাকৃত ভাষার মধ্যে তিন প্রকারের শব্দ আছে—তৎসম (বিশুদ্ধ সংস্কৃত), তদ্ভব (সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন) ও দেশ (অসংস্কৃত দেশজ ভাষা)। পালি একটি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা। ৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দেও পালি ভাষা প্রচলিত ছিল।

সারসিক ও বৈদিক ভাষা কতটা কাছাকাছি যায়, ভাষাবিদ্‌গণ তাহা আলোচনা করিয়াছেন। দুই একটা দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিয়া দিতেছি: সারসিক ভাষায় অকারান্ত করণ কারকে বহুবচনে অকারের স্থানে ঐঃ হয়। যথা—শিবৈঃ। বেদের ভাষায় ঐঃ ও এভিঃ দুই-ই হয়। যথা—অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যোনূতনৈরুত (ঋক্—২ঋক)। সারসিক সংস্কৃত অত্যন্ত সন্ধি-সমাসযুক্ত, বৈদিক সংস্কৃত তাহা নহে।

পালি ও বৈদিক সংস্কৃতভাষা কতটা কাছাকাছি যায়, ভাষাবিদ্‌গণ তাহারও দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বেদে যে স্থানে ঐঃ ও এভিঃ আদিষ্ট হয়, পালিতে সেই স্থানে এভিঃ ও এহি আদিষ্ট হয়। যথা—বুদ্ধেভি বা বুদ্ধেহি। পালিতে গো শব্দের বহুবচনে গোণাং, তাহার বৈদিক বানান গোনাং। সংস্কৃত কৃত্বা, পালিতে কত্বান বা কাতূন। পালির ফল, অস্থি ও মধু শব্দের বহুবচনে ফলা, অর্থী, মধু—প্রায় বৈদিক শব্দের রূপান্তর।

বাঙলার প্রাকৃত ভাষায় যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ—যত্নের স্থলে যতনে, রত্নের স্থলে রতনে, ধর্ম্মের স্থলে ধরমে বলা হয়। সংস্কৃতেও ত্বম স্থলে তু অম, তুভ্যম স্থলে তুবিয়ম, বরেণ্যম স্থলে বরেনিয়ম প্রয়োগ দেখা যায়।

অন্য প্রদেশের প্রাকৃত ভাষাতেও এরূপ অক্ষর বাড়ানোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন—সংস্কৃত শ্রী'র স্থানে সিরি, ত্বম স্থানে তুমং, চন্দ্রেণ স্থানে চাঁদ এণ, কায়স্থঃ স্থানে কায়থ ইত্যাদি।

ভাষাতত্ত্বজ্ঞগণের মতে সংস্কৃত ভাষার পালির সঙ্গেই মিল অধিক, অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার সঙ্গে মিল কম। যথা—

সংস্কৃত জীবিতম পালিতে জীবিতং, কিন্তু প্রাকৃতে জীবিঅং বা জীঅং

" পিতা " পিতা " " পিআ,

" যষ্টি " যটঠি " " লটঠি—ইত্যাদি।

বৌদ্ধ গ্রন্থে যে সব 'গাথা' পাওয়া যায়, তাহার ভাষা আবার পালির অপেক্ষাও প্রাচীন। গাথাগুলি ৫ম খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে লেখা হয় বলা হইতেছে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নিকৃষ্ট ভাষা বলার কথাও আছে। স্যাপর্ণ সত্ত্বগণ খারাপ ভাষা বলিত (—ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত)। ব্রাত্যেরা খারাপ ভাষা বলিত (২৫শ ব্রাহ্মণে)। অসুরগণ খারাপ ভাষা বলিত (শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত)। এই সব খারাপ ভাষা নিশ্চয় দেশজ ভাষাই ছিল।

বৈদিক ভাষা রূপান্তরিত হইয়া কবে গাথা, পালি ও প্রাকৃতের সঙ্গে মিশিতে লাগিল? ভাষাবিদগণ অনুমান করেন তাহা বেদের ব্রাহ্মণ রচনার পূর্ব্বে (১) হইয়াছে। কাজেই সারসিক ভাষা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ইহা ঘটিয়াছে।

ব্রাহ্মণভাগে আছে ব্রাহ্মণগণ দেবভাষা বলিতেন, মনুষ্য-ভাষাও বলিতেন (—নিরুক্ত পরিশিষ্ট ভাষ্য ১।৯)। এই মনুষ্য ভাষাই দেশজ বা প্রাকৃত ভাষা। সব দেশের কাব্য-নাটকাদিতে ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনও সভ্য ব্যক্তি সমকক্ষ স্তরের লোকের সঙ্গে কথা বলিলে উৎকৃষ্ট ভাষায় বলেন, আবার নিম্নস্তরের লোকের সঙ্গে কথা বলিলে চলিত অপকৃষ্ট ভাষায় বলেন।

রামায়ণেও আছে যে, ব্রাহ্মণগণ ঐ সময়ে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিতেন (২)।

যাস্ক নিরুক্ত (১।৪) ও পাণিনি (৩।২।১০৭, ৬।১।১৮১, ৬।৩।২০, ৭।২।৮৮ প্রভৃতি স্থানে) তাঁহাদের পরস্পরের সময়ে কথ্য ভাষাকে 'ভাষা' বলিয়াছেন এবং বৈদিক ভাষাকে অধ্যায়, ছন্দস, নিগম প্রভৃতি বলিয়াছেন।

অশোকের সময়ে (২৬৩-২২৬ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে) আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বে একরূপ, পেশোয়ারে অন্যরূপ এবং গুজরাটে আর একরূপ দেশজ ভাষা ছিল। তাহা তাঁহার অনুশাসনগুলিতে উৎকীর্ণ ভাষা হইতে প্রমাণ হয়। লিখন পদ্ধতিও দুই প্রকারের ছিল। ব্রাহ্মী পদ্ধতিতে বামদিক হইতে দক্ষিণে এবং খরোষ্ঠী পদ্ধতিতে দক্ষিণ হইতে বামদিকে লেখা হইত। এখনও পার্শি উর্দ্দু খরোষ্ঠী পদ্ধতিতে লেখা হয়, অন্য সব ভাষা ব্রাহ্মী পদ্ধতিতে লেখা হয়।

ভারতবর্ষে দ্বিতীয় আর্য্যদল আসিয়া নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় (বিহার ও বাঙলায়) একশাখা ও দাক্ষিণাত্যে (মহারাষ্ট্রের দিকে) অন্য শাখা বিস্তার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের ভাষাও যায় এবং প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এইভাবে ভারতের প্রতি প্রাদেশিক ভাষায় কম-বেশি সংস্কৃত ভাষা মিশিয়া আছে। শুধু তাহাই নয়, প্রতি প্রদেশের লিখিত অক্ষরগুলির মধ্যে কম-বেশি ভাঙা-সংস্কৃত (দেবনাগরী) অক্ষরের আকৃতি চোখে পড়ে।

শুধু ভারতের নয়, এশিয়া ও য়ুরোপের আদি ভাষাগুলিরও মূলশব্দ বেশির ভাগ সংস্কৃত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত। এখানে তাহার বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

পারসীক মাহ শব্দ সংস্কৃত মাস শব্দের অপভ্রংশ
" গাও " " গৌ " "
" অহুর " " অসুর " " (অসুর = প্রাণদাতা… সায়নাচার্য্য)
" আইর্য " " আর্য্য " "
গ্রীক দে-অর " দেবর " "
" প্যাট্রোস্ " পিতৃব্য " "
নৌস্ " " নৌ " "
" জিউস্ " " দৌস্ " " (ল্যাটিন জুপিটার)
" উরনস্ " " বরুণস্ " "
ল্যাটিন ডিউস " " দেব
" সক্র " " শ্বশ্রু
" সসর " " শ্বশুর
—ইত্যাদি

ভারতবর্ষে বহু ভাষা ও উপভাষা আছে। যথা—(১) তামিল (২) তেলেগু, (৩) মালায়ালম (৪) কানাড়ি, (৫) গুজরাঠি, (৬) মারাঠি (৭) রাজস্থানি, (৮) উড়িয়া, (৯) হিন্দী, (১০) কাছাড়ী, (১১) অসমিয়া, (১২) বাঙলা, (১৩) নেপালী, (১৪) উর্দ্দু, (১৫) মণিপুরী, (১৬) তিব্বতী, (১৭) কাশ্মিরী ও (১৮) সিন্ধি প্রভৃতি। এইগুলি প্রধানভাবে দেশজ ও প্রাকৃত ভাষা। উপভাষার মধ্যে (১) সাঁওতালি, (২) খাসিয়া, (৩) শবর, (৪) ভূমিজ, (৫) হো, (৬) বীর হো, (৭) মুণ্ডারী, (৮) ভিল, (৯) মিশমি, (১০) অবর, (১১) কুকি, (১২) তিপ্রা, (১৩) গারো, (১৪) নাগা, (১৫) চাকমা, (১৬) লুশাই, প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে সাঁওতাল ও খাসিয়াদের ভাষা খ্রীষ্টান পাদ্রিগণের চেষ্টায় উদ্ধার হইয়াছে এবং ইংরাজি অক্ষরে (রোমানস্ক্রিপ্টে) লেখা পুস্তকে এই ভাষাশিক্ষার বিবরণ বাহির হইয়াছে। অন্য উপভাষাগুলির ভাগ্যে তাহা হয় নাই।

চেষ্টা করিলে দক্ষিণ ভারতে, আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পাদদেশে বিভিন্ন অসভ্য জাতির সন্ধান মিলিতে পারে। তাহাদের উপভাষা কিরূপ তাহাও জানিবার বিষয়। মনে হয় আগামী আদমসুমারীতে এ সমস্ত বিষয়ের অনেক অনুসন্ধান মিলিবে।

বন্যজাতির লোকরা সভ্যদেশে আসিলে ক্রমে সেদেশের ভাষা ও সভ্যতা পায়, ইহার দৃষ্টান্ত বুনো জাতি। তিন পুরুষ পূর্ব্বে রাজোয়াড়

---

(১) ব্রাহ্মণ রচনার পর, বিশেষভাবে মনুসংহিতায় (১।৩১ প্রভৃতি বহুস্থানে) জাতিভেদের কঠোরতা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বেদে আছে কতকগুলি স্ত্রী ও শূদ্র বেদ রচনাকারী। কবষ ঋষি দাসীপুত্র, ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের বহু সূক্ত রচয়িতা। কক্ষীবান ঋকের ১ম মণ্ডলের ঋষি। বাক্ নাম্নী ঋষিকন্যার দেবী সূক্তের বিবরণ সকলেই জানেন। সুতরাং স্ত্রী-শূদ্রের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষী ছিলেন।

(২) রামায়ণে সারসিক-প্রয়োগ বিরুদ্ধ অনেক পদ আছে। সুতরাং ৪র্থ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেরও লেখ্য ভাষা মার্জ্জিত (বা সংস্কৃত) হয় নাই।

জাতীয় এই সব লোক কুলিগিরি কাজে নিযুক্ত হয় তখনকার নীলকর সাহেবদের দ্বারা। এখন তাহারা বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায়—যেখানে আছে, সেই প্রদেশের ভাষা বলিতেছে এবং চাষী গৃহস্থে পরিণত হইয়াছে।

ভারতে কিন্তু দুইটি (৩) আদিম জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে নিজেদের পৃথক গণ্ডি স্পষ্টভাবে টানিয়া রাখিয়াছে। প্রথম দল ইন্দো-ইরানিয়ান আর্য্যগণ, দ্বিতীয় দল দ্রাবিড়গণ।

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে বসিয়া সামান্য ভাবে তাহাদের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। নূতন দুই একটা কথা আমাদের বলিবার আছে:

সাইবিরীয়ার নীচে (মধ্য এসিয়ার) যে তাকলামাকান মরুপ্রদেশ আছে, তথা হইতে আর্য্যদল বাহির হ'ন এবং ক্রমে ভারতে আসেন তাঁহাদের ভাষা ও সভ্যতা লইয়া। য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের এই মতবাদ বিশেষ কয়েকজন ভারতীয় মনীষী সম্পূর্ণভাবে মানিয়া না নিলেও, তাহা এখনও প্রসিদ্ধ।

ভারতে আসিয়া বহু পূর্ব্বে আগত দ্রাবিড়দের সঙ্গে নবাগত আর্য্যদের প্রতিযোগিতা ও প্রবল যুদ্ধ বিগ্রহ হয়—ইহাই বেদ পুরাণাদিতে দেবাসুর যুদ্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এই দ্রাবিড়রা কে?

য়ুরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন—এই দ্রাবিড়গণ সুদীর্ঘ প্রাচীনকালে—আর্য্যগণ ভারতে আসার বহুকাল পূর্ব্বে—ভূমধ্য সাগরের উপকূলবাসী ছিল। তাহারা বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া আসে। এজন্য দ্রাবিড়দের ভূমধ্যসাগরীয় ভারতবাসী (Mediteranian Indian) আখ্যা দিয়াছেন নৃতত্ত্ববিদগণ। তাহারা আসিয়া বর্ত্তমান ভারতের আদিভূখণ্ড 'গণ্ডোয়ানা'তে বসতিস্থাপন করিয়াছিল—ইহাই আমাদের বক্তব্য। তখন হিমালয়ও হয়তো জন্মায় নাই (বা সমুদ্র মধ্যে ছিল)। দক্ষিণাপথের এই গণ্ডোয়ানা প্রদেশের সঙ্গে আফ্রিকার যোগাযোগ ছিল মৃত্তিকা দিয়া। যোগাযোগ ছিল যে ভূখণ্ড দিয়া, তাহার নাম 'লিমুরিয়া'। ইহা প্রাচীন নৃতত্ত্ববিদগণই বলিয়া গিয়াছেন। আমাদের পুরাণাদিতেও এরূপ কথা আছে যে, যোগবলে বলরাম দেহত্যাগ করিয়া শ্বেতসর্পরূপে মৃত্তিকার উপর দিয়া আফ্রিকা প্রদেশে চলিয়া যান। গণ্ডোয়ানার উদ্ভব হয় আগ্নেয়গিরি হইতে। তাহা এখন মৃত (inactive)। দাক্ষিণাত্যে কোনও আগ্নেয়গিরি এখন নাই। লিমুরিয়া প্রদেশ যেমন সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে, এটলান্টিক সমুদ্রের ধারে এটলান্টিস প্রদেশও তেমনি অতলের তলে সমাধি পাইয়াছে।

ভাষাতত্ত্ববিদগণ বলেন—কেবলমাত্র বেলুচি উপজাতি ব্রাহুদের ভাষার সঙ্গে দ্রাবিড়দের ভাষার মিল আছে, পৃথিবীর আর কোনও জাতির ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিল নাই।

জার্ম্মানী ও জাভা আদি পৃথিবীর অংশ—প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এরূপ মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। কারণ অদ্ধমানবের (subman এর) অস্থি পাওয়া গিয়াছে উভয় দেশে। জার্ম্মানীতে হিডেলবার্গম্যানের ও জাভায় জাভাম্যানের কঙ্কাল নিশ্চয় প্রমাণ করে—প্রাগৈতিহাসিক যুগের অদ্ধমানবের অস্তিত্বের বিবরণ। সৃষ্টিতত্ত্ববিদগণ বলেন, ইহার পরই বনমানুষ (ape) সৃষ্ট হয়। আফ্রিকার ও বোর্নিও দ্বীপের শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাং প্রভৃতি বনমানুষ, মানুষ সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার স্থলচর জীব। তাহাদেরও যে ভাষা ছিল ইহাও অনুসন্ধিৎসুগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এপর্য্যন্ত দ্রাবিড়ে অদ্ধমানবের কোন কঙ্কাল পাই নাই। তাহা না পাওয়া পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যকে প্রাচীনতম জগতের অংশ বিশেষ বলিলে সে কথার মূল্য কমিয়া যায়, তাহাও আমরা বুঝি। তবে অদ্ধমানব কিন্নর প্রভৃতির বিবরণ ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থে অনেক স্থানে আছে। তাহারা অনার্য্য। দ্রাবিড় সভ্যতা যে অতি উচ্চাঙ্গের ছিল তাহাও জানা যাইতেছে। দ্রাবিড় ও আর্য্যসভ্যতার মিশ্রণে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এই ভারত সভ্যতার জন্ম হইয়াছে, ইহাও ইতিহাস-বেত্তারা স্বীকার করিতেছেন। ভাষা ও ভাবের আদান-প্রদানে উভয় জাতির প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ভারতে হিন্দুদের ঐক্যের পথে দারুণ বাধা জাতিভেদ প্রথা (৪) ইহাও সকলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। এখন

(৩) কিন্তু পাণ্ডবরা কোন দেশের, কোন্ জাতিভুক্ত ব্যক্তি? মহাভারতে পাণ্ডবগণই প্রধান ব্যক্তি। আদি পর্ব্বেই (১।১২৭) এরূপ প্রশ্ন আছে—বহু লোকে কহিল পাণ্ডু তো দীর্ঘদিন পূর্ব্বে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তবে ইহাঁরা তাঁহার পুত্র এরূপ সম্ভব নয়। ঐ আদিপর্ব্বের শেষে (১২৫।২৭-২৯) আছে পাণ্ডুর দেবদত্ত পাঁচ পুত্র হিমালয়ে বৰ্দ্ধিত হ'ন। গ্রীকগণ (প্লিনি ও সোলিনস্) বলেন—বাহ্লিক দেশে (ভারতের পশ্চিমোত্তরে) পাণ্ডা নামে নগর আছে, সিন্ধু নদীর মোহনায় পাণ্ডানামক জাতি বাস করিত। বেদে কুরু ও ভারতবংশের নাম আছে, পাণ্ডব নাম নাই, কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ প্রসঙ্গও নাই। কিন্তু পাণ্ড্য রাজা এক্ষণে ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত। কোনও বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন—ঐ পাণ্ডা জাতীয় লোকরা মোগডিয়েনার অধিবাসী ছিল, সে হস্তিনাপুরবাসী হয়, দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যরাজা তাহাদেরই স্থাপিত (Wilson A. R. Vol xv, pp 95 96)। রাজতরঙ্গিনীর মতে কাশ্মীরের প্রথম রাজা কুরুবংশীয়। পাণ্ডবদের জন্মঘটিত গোলযোগ সকলেই জানেন। পাণিনির বার্ত্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ডব নিষ্পন্ন হইয়াছে, কাত্যায়নও পাণ্ডু ও পাণ্ডু-সন্তান বাচক পাণ্ড্য, এইরূপ বলিয়াছেন। মোক্ষমূলর অনুমান করেন পাণ্ডু ও পাণ্ডব কথাগুলি আদি মহাভারতে ছিল না (Muller's Ancient Sanskrit Literature—pp 45)।

(৪) ঋগ্বেদের শেষের দিকে (১০।৯০সূ।১২ ঋ) চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি বিবরণ থাকিলেও যজুর্ব্বেদের কাঠক সংহিতায় প্রশ্ন আছে—যে লোক জ্ঞানের দ্বারা ব্রাহ্মণ হইলেন, তাঁহার পিতা-মাতার পরিচয় লইবার প্রয়োজন হয় কেন? বরং তাঁহাকে আরও জ্ঞান দিতে পারেন এমন লোকই তাঁহার পিতা, এমন লোকই তাঁহার পিতামহ (কাঠক সং ৩০।১)। বজ্রসূচিকোপনিষৎ বিচার করিলেন—কে ব্রাহ্মণ…জীব, দেহ, জাতি,

ভারতকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ সমভাষাভাষী এক জাতিতে পরিণত করিবার শুভ প্রচেষ্টা হইতেছে। ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছে ইহাই ভারতের প্রধান রাষ্ট্রীয় সাধনা হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষের ভাষা ১৭৯টি, উপভাষা ৫৪৪টি (Gearson's Linguistic Survey of India)। উপভাষাগুলি বড় ভাষার প্রাদেশিক রূপভেদ। আবার এই ১৭৯টি বড় ভাষার মধ্যে ১১৬টি ভোট-চীন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত উপজাতির ভাষা।

এইসব বাদ দিয়া ভারতের মুখ্যভাষা ১৫টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যথা—উত্তর ভারতের (১) হিন্দী, (২) উর্দ্দু, (৩) বাঙলা, (৪) উড়িয়া, (৫) মারাঠী, (৬) গুজরাটী, (৭) সিন্ধী, (৮) কাশ্মীরী, (৯) সাধু হিন্দীর সহোদর পাঞ্জাবী, (১০) নেপালী, (১১) তামিল, (১২) মালয়লম, বাঙলার আত্মীয় (১৩) আসামী এবং দক্ষিণ ভারতের (১৪) তেলেগু ও (১৫) কানাড়ী।

কিন্তু আমরা সংবাদপত্রের মারফৎ জানিতে পারিলাম যে, সকল এশিয়া খেলাধূলা প্রতিযোগিতার সঙ্গে (১৯৫১, মার্চ্চের প্রথমে) নয়াদিল্লীর লাল কেল্লার দেওয়ান-ই-খাসে যে চারুকলা ও কারুশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ভারত সরকার ১৫টির স্থলে ১৪টি ভারতীয় মুখ্য ভাষার ক্রম বিকাশের ধারা প্রদর্শন করান। কোন্ মুখ্যভাষাকে বাদ দেওয়া হইল জানা যায় নাই।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী (মৌলানা আবুল কালাম আজাদ) নয়াদিল্লীতে (১৯৫১।১।৫ই মার্চ) ভাষার সমন্বয় সাধন জন্য "জাতীয় বিদ্বজ্জন পরিষদ" গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করেন। উদ্দেশ্য -যাহাতে আগামী ১৫ বৎসরের মধ্যে জাতীয় ভাষারূপে হিন্দী, ইংরাজীর স্থলবর্ত্তী হইতে পারে, এমনভাবে সর্ব্বোপায়ে তাহার উন্নতি করিতে হইবে। যদিও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, হিন্দী, ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হওয়া 'আকস্মিক' (?) ঘটনা মাত্র···কিন্তু যখন (হিন্দীর অনুকূলে) এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন হিন্দীর বিকাশ ও পুষ্টিসাধন করা প্রত্যেক ভারতবাসীর জাতীয় কর্ত্তব্য। তিনি আরও স্বীকার করেন যে—'ব্রজভাষা' ও 'অবধি' হইতে স্বতন্ত্র ভাষারূপে হিন্দীভাষা বর্ত্তমান (২০শ) শতাব্দীতেই বিকাশলাভ করিতে আরম্ভ করে। হিন্দী-ভাষায় যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কলেবর বিশাল হইলেও, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থানলাভের মত ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষ হয় নাই। তবে, ভারতীয় সাহিত্যের ক্রমবিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী ইহাও বলিয়াছেন যে—উর্দ্দু বাদে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বাঙলাই আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে···ইহা প্রায় সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভার জন্য সম্ভবপর হইয়াছে··· তাঁহার নাম যথার্থই চিরস্মরণীয়দের মধ্যে অন্যতম।

জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম—কোন্ গুণে বড় হইলে তিনি ব্রাহ্মণ? উত্তর দিলেন —যিনি পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, তিনি ছাড়া অন্যে ব্রাহ্মণ নহেন। এইসব কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারদেরই কথা। ইহাতে জাতিভেদ গুণগত, বর্ণগত নয়—এরূপ ধারণাই আনিয়া দেয়। আর্য্যপ্রধান পাঞ্জাব অপেক্ষা অনার্য্যপ্রধান দাক্ষিণাত্যেই কিন্তু জাতিভেদের বজ্রবাঁধন বেশি দেখা যায়। জাতিভেদ প্রথা পারসীকদের নিকট হইতে আসে কি-না বিচারযোগ্য। সেখানে পুরোহিত, যোদ্ধা ও ব্যবসায়ীদের তিনটি পৃথক জাতিতে পরিণত করা হইত। ভারতের বাহিরে কোনও আর্য্য উপনিবেশে জাতিভেদ নাই। ভারতে নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য জাতিভেদের প্রয়োজন হইয়াছিল। আর্য্য ঔপনিবেশিক ব্রাহ্মণগণই পরে (যজুর্ব্বেদের উপরোক্ত সংহিতা প্রভৃতির বর্ণনামত) জাতিভেদ প্রথার জন্য মানুষে মানুষে পর হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, যেন অধিক দুঃখিত এরূপ প্রকাশ পাইতেছে।

কতকাল

আশা দেবী

কতকাল আর বলো?
এমনি করে কি বসে বসে থাকা
আর চেয়ে কাল গোণা
আর বসে বসে চরণের ধ্বনি শোনা
এমনি করে কি চিরকাল তুমি চেনা-অচেনার মাঝে
লুকোচুরি খেলা খেলবে বলো?

চেয়ে চেয়ে দেখি আজ
সোনালি আলোর সেতারের তারে ভোরের আঙুল কাঁপে:
স্বপ্ন শেষের অশ্রুশিশির পল্লবে যার দুলে।
হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে চলে-যাওয়া আকাশী ফুলের মতো
উড়ে উড়ে যায় রঙীন ডানার পাখি—
আমার মনের প্রজাপতি তবু এখনো রুদ্ধ পাখা—
ফুলের ফসলে এখনো তো তার এলোনা নিমন্ত্রণ!

তাই মনে হয়: মুছে যাক এ সকাল
ঘনাক মেঘের কৃষ্ণ-কাজল মৃত-জটায়ুর মতো
হা-হা-হা হাসির মত্ত-পুলকে আসুক দুর্নিবার
ভয়াল নীরব পাষাণ অন্ধকার:
মৃত প্রজাপতি, ঝরা ফুল আর ঝড়ে খসে-পড়া পাখা
নিমিয়ে মিলিয়ে যাক—
থাক সেথা এক স্তব্ধ সমাধি—স্তম্ভিত কালো রাত।

গুপ্তিপাড়ায় শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির—

ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মবক্তা, বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থপ্রণেতা এবং ধর্ম্মসঙ্গীতরচয়িতা পরিব্রাজকাচার্য্য কৃষ্ণানন্দ স্বামীর তিরোধানের অর্দ্ধশতাব্দী পরে, তাঁহার আবির্ভাব-স্থান হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়, তদীয় স্মৃতিরক্ষাকল্পে —"শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" স্থাপিত হইয়াছে। দেশ-

গুপ্তিপাড়া ষ্টেশনে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ফটো—প্রভাত হালদার

বরেণ্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিগত ৬ই ফাল্গুন রবিবার অপরাহ্ণে উক্ত মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ ও হুগলী জেলার নানাস্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পণ্ডিত মণ্ডলী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ তাঁহার ভাষণে সনাতন ভারতবর্ষের শাশ্বত সংস্কৃতি ও সভ্যতা রক্ষাকল্পে স্বামীজীর আপ্রাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে সাম্যবাদ আছে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম্মই হইতেছে সাম্যবাদীর ধর্ম্ম। শ্রীচৈতন্য চণ্ডালকেও কোল দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী কৃষ্ণানন্দের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা ছিল না। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলেও অনেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেও অগৌরব মনে করে। ইহা অপেক্ষা লজ্জার বিষয় কিছুই নাই। আজ ভারতের সমাজকে পুনর্গঠন
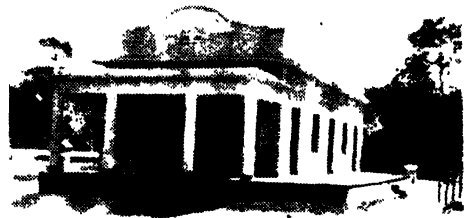
শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির · গুপ্তিপাড়া। হুগলী।

ফটো প্রভাত হালদার

করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর মহান জীবনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সভায় পণ্ডিত জানকীনাথ শাস্ত্রী, শ্রীবিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীসুমতি দাস বক্তৃতা করেন। সভার প্রারম্ভে মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া নিবেদন করেন যে, মন্দির নির্ম্মাণে ১১ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। ইহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে

আরও ৫।৬ হাজার টাকা আবশ্যক। এ যাবৎ দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, বাকি অর্থের জন্য তিনি ভক্ত সাধারণের নিকট অর্থ ভিক্ষা করেন। ডাঃ ইন্দুভূষণ রায় সভার উদ্বোধনে, মধ্যে ও অন্তে স্বামীজী রচিত কয়েকটী জনপ্রিয় ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

হাওড়া প্রাদেশিক সম্মিলনের জনসভায় সভাপতি শ্রীজগজীবন রামের বক্তৃতা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম—

বসুমতীর স্বত্বাধিকারী স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানে ২৪পরগণা জেলার খড়দহ রেল ষ্টেশনের নিকট রহড়া গ্রামে আজ ৬ বৎসর কাল যে বালকাশ্রমটি পরিচালিত হইতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের চেষ্টায় তাহা দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহা প্রকৃতই আনন্দের বিষয়। ৬ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানের অবস্থা যাহা ছিল, এখন আর তাহা নাই। জঙ্গল পরিষ্কার হইয়াছে, খানা ডোবা ভরাট হইয়াছে, নূতন পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। ২১ বিঘা জমীতে এখন চাষ চলিতেছে। আরম্ভের সময় আশ্রমের জমী ছিল ১৩ বিঘা, এখন হইয়াছে ৬১ বিঘা। গত ৬ বৎসরে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে। এখন আশ্রমে ২৩১ জন অনাথ বালক বাস করে—তন্মধ্যে ১৮৩ জনের ব্যয় গভর্ণমেণ্ট ও ৪৮ জনের ব্যয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন দিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য দাতা সতীশবাবু, জমী, বাটী ও অর্থ সবই মিশনকে দান করিয়া গিয়াছেন। আশ্রমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি কারিগরী বিদ্যালয় চলিতেছে। প্রতি বালকের আহার ব্যয় মাসিক ২০ টাকা। তাহা ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে বিনামূল্যে দুগ্ধ দান করা হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ১০ হাজারেরও অধিক টাকা ব্যয় করা হয়। গৃহ নির্ম্মাণ বাবত ১৯৪৮ সালে প্রায় ৩৩ হাজার টাকা, ১৯৪৯ সালে ৩৪ হাজার টাকা ও ১৯৫০ সালে ৫৫ হাজার টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ১৯৫০ সালে মোট আয় হইয়াছে ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা ও ব্যয় হইয়াছে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এখনও আশ্রমকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সম্ভব হয় নাই। সে জন্য এখনও বহু অর্থের প্রয়োজন। যদিও গভর্ণমেণ্ট আশ্রমকে নানাবাবতে বহু অর্থ দান করিয়া থাকেন, তথাপি সদাশয় জন-সাধারণের সাহায্য ব্যতীত আশ্রমকে আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হইবে না। আমরা দেশবাসী জনগণকে এই বালকাশ্রম দেখিতে ও তাহার উন্নতির জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

হাওড়া প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্রীবিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শহিদ বেদীতে মাল্যদান ফটো—অমিয় তরফদার

নবীনচন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন—

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার কলিকাতা চেতলা বয়েজ হাইস্কুলে প্রাচ্যবাণী ও সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে নবীনচন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ডাঃ কালিদাস নাগ। উদ্বোধন করেন কবি শ্রীকালিদাস রায়। সাহিত্য শাখার সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, কাব্য-শাখার সভাপতিত্ব করেন কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, দর্শন শাখার সভাপতিত্ব করেন শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বিচারপতি শ্রীপুষ্পিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান এবং প্রস্তাব করেন (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যেন নবীনচন্দ্রের নামে পদক দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। (২) কবির রচনাবলীর বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে সুলভ সংস্করণের জন্য প্রকাশকদের অনুরোধ জানান। পরিশেষে সভাপতি ডাঃ নাগ নবীনচন্দ্রের সাহিত্য সাধনার কথা উল্লেখ করেন। কবির পুস্তকগুলির বহুল প্রচারের জন্যও দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

গীতা জয়ন্তী—

দক্ষিণ কলিকাতা ঢাকুরিয়ায় বর্ণেন্দু গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্প্রতি গীতা-জয়ন্তী উৎসব হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। দেশের ও জাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে দেশবাসীকে গীতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইতে নির্দ্দেশ করিয়া সভায় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী বিরজানন্দ ও সভাপতির বক্তৃতার পর উৎসব শেষ হয়। সভায় 'গীতা—চয়নিকা' নামক পুস্তক বিতরণ করা হয়। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অঞ্চলে গীতা প্রচারের চেষ্টা দ্বারা সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

শ্রীমতী রাধারাণী দেবী—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ১৯৫০ সালের জন্য সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে "ভুবন মোহিনী দাসী স্বর্ণপদক" দান করিতেছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। প্রতি ৩ বৎসরে একবার বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য বা বিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখিকাকে এই পদক দান করা

কবি শ্রীরাধারাণী দেবী

হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ এবার উপযুক্ত পাত্রেই সম্মান দান করিতেছেন সে জন্য তাঁহারা অভিনন্দিত হইবেন।

ভারত সংস্কৃতি পরিষদ—

ভারত সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আগামী ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই শনিবার ও রবিবার মালদহ সহরে ভারত সংস্কৃতি সম্মিলন হইবে। স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীরণজিত ঘোষ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও স্থানীয় জেলা জজ খ্যাতনামা লেখক ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ সম্পাদক হইয়াছেন। ডক্টর শ্রীরাধাবিনোদ পাল, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় তিনটি বিভিন্ন সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। সমাগত প্রতিনিধিদিগকে গৌড় ও আদিনা দেখান হইবে। শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া সোমবার সকালে ফিরিয়া আসা যাইবে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও সুধীবৃন্দ মালদহের প্রাচীন কীর্ত্তি দেখিবার এই সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

পরলোকে ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতা বেলগাছিয়া নিবাসী খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ও লেখক ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি পরলোক গমন

করিয়াছেন। তিনি শিক্ষক ও সাংবাদিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করিয়া পরে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থার্জন করেন। তিনি দুইবার জাপান ভ্রমণ করেন। তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। কবি ও নাট্যকার হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছিল এবং তাঁহার কয়েকখানি নাটক মিনার্ভা ও রঙ্গমহলে অভিনীত হইয়াছিল।

প্রাদেশিক সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন

‘কৃষি পণ্ডিত’ উপাধি লাভ—

মেদিনীপুর জেলার [illegible] গ্রাম নিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র পানি [illegible] সালে এক একর জমিতে [illegible] মণ ৩ সের ধান উৎপাদন করিয়া রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক ‘কৃষি পণ্ডিত’ উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতে প্রতি একরে গড়পড়তা উৎপাদনের পরিমাণ সাড়ে ১২ মণ। যোগেশচন্দ্রের ৩২ একর জমী, ২ জোড়া লাঙ্গল ও ২ জোড় বলদ আছে। তাঁহার এই চেষ্টা সকলের অনুকৃত হওয়া উচিত।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর একটি শিবলিঙ্গ ফটো—সুধীর বক্স

ইতিহাস প্রসিদ্ধ সিংদালান

শাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র [illegible] রাজমহলে রাজধানী [illegible] মানসিংহ তাঁহার গভর্ণর ছিলেন। [illegible] খৃষ্টাব্দে মান সিংহের [illegible] রক্ষার্থে রাজমহলে গঙ্গার [illegible] এই সিংদালান (Marble Pavilion) কষ্টিপাথর দ্বারা নির্মিত হয়

ফটো—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচা।

সিংদালানের একটি খিলানের মধ্য দিয়া গঙ্গার দৃশ্য

ফটো—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার

সিংদালানের সম্মুখের একটি দৃশ্য

ফটো—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচা।

রাজমহল নীলকুঠির সম্মুখে গঙ্গার স্রোতের প্রতিরোধ করিবার জন্য এই বিরাট স্তম্ভটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের নির্মিত। বর্তমানে ইহা গঙ্গাবক্ষে কাত হইয়া পড়িয়া আছে
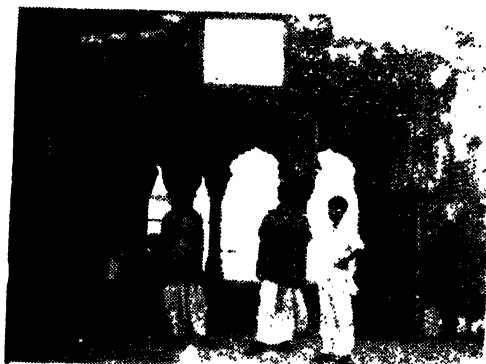
ফটো—শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার

রাঁচিতে যক্ষ্মা স্বাস্থ্য নিবাস—

গত জানুয়ারী মাসের শেষভাগে বিহার প্রদেশে রাঁচী জেলায় হাতিয়া পোষ্টাফিসের অন্তর্গত রামকৃষ্ণ নগরে 'রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষ্মা স্বাস্থ্য নিবাস' উদ্বোধন করা হইয়াছে। সকলেই জানেন ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৫লক্ষ লোক যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করে। প্রায় ২৫ লক্ষ ভারতবাসী সর্বদা যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া থাকে, তাহাদের চিকিৎসার জন্য সমগ্র ভারতের হাসপাতাল-সমূহে মাত্র ৮ হাজার রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে। যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে সে শুধু নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, সেখানে থাকে, সেখানের চারিদিকে ঐ রোগ সংক্রামিত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা সেজন্য ১৯৩৩ সালে দিল্লীতে একটি যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং ১৯৩৯ সালে শ্রীজহরলাল নেহেরু ও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাহায্যে রাঁচীর নিকট ৭২০ বিঘা জমী স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রহ করেন। তাহার পর যুদ্ধের জন্য কাজ বন্ধ করিতে হয় ও ১৯৪৮ সালে ঐ কার্য পুনরায় আরম্ভ করিয়া ১৯৫০ সালে তাহার কতকাংশ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ঐ কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট লক্ষাধিক টাকা দান পাওয়া গিয়াছে, ভারত গভর্ণমেণ্ট এক লক্ষ টাকা ও বিহার গভর্ণমেণ্ট ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বর্তমানে মাত্র ৩০জন রোগী রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই—জল সরবরাহ ব্যবস্থা হয় নাই, গো-পালন কেন্দ্র, পক্ষী-পালন কেন্দ্র ও কৃষিক্ষেত্র করা প্রয়োজন। রোগ-মুক্তদের বাসের জন্যও একটি পল্লী নির্মাণ করা প্রয়োজন। জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে একটি বাঁধ নির্মাণের জন্য বিহার
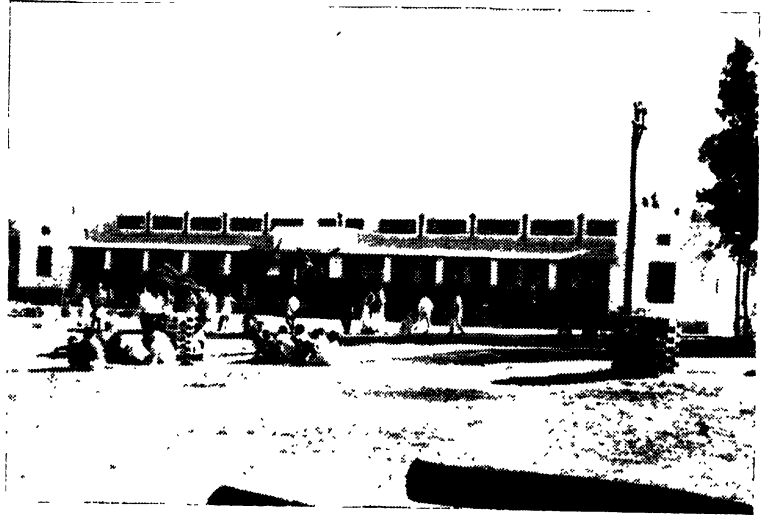
রাঁচী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মা হাসপাতাল—সাধারণ বিভাগ
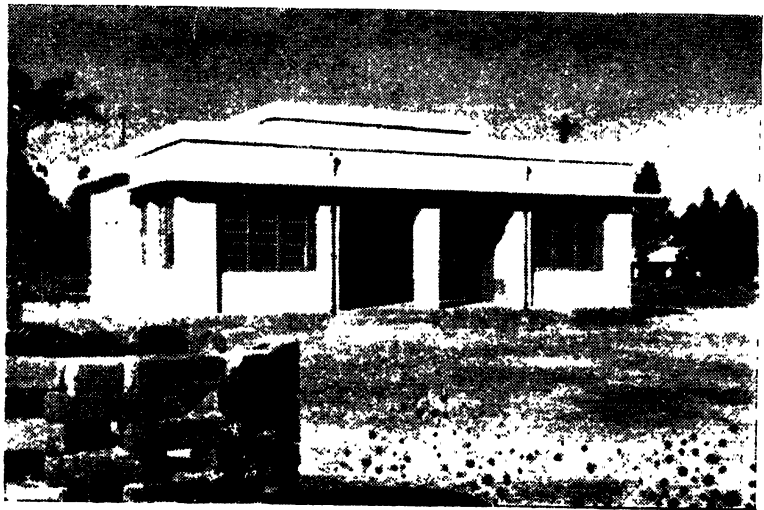
রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতালের রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহ এবং ঔষধালয়

সরকারের সেচ বিভাগ হইতে ১৫ হাজার টাকা সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। একটি রোগীকে বাসস্থান, আহার ও চিকিৎসা দানের জন্য তাহার ব্যয় পড়িবে মাসিক দেড় শত টাকা। ঐরূপ ১০০ রোগী না হইলে স্বাস্থ্য নিবাসের কার্য্য ভালরূপে আরম্ভ করা যাইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দরিদ্রের সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত—কাজেই অর্দ্ধেক রোগী যাহাতে বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান ও চিকিৎসা পায়, তাহার ব্যবস্থা করাই মিশনের প্রধান কার্য্য। একটি বা দুইটি রোগী থাকিতে পারে, এরূপ ছোট ছোট গৃহ নির্ম্মাণ প্রয়োজন। ১টির জন্য ৬ হাজার টাকা ও ২টির জন্য ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে কুটীর নির্ম্মাণ করা যাইবে। সহৃদয় জনসাধারণ এজন্য অর্থদান করিলে বহু লোক চিকিৎসার সুযোগ পাইবে। গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য নিবাসের জন্য ৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা সংগৃহীত ও ৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। স্বামী বেদান্তানন্দ মহারাজ বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য নিবাসের সম্পাদকরূপে তাহার কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। গত ২৭শে ডিসেম্বর বিহারের অর্থসচিব শ্রীঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহ উহার উদ্বোধন করেন। স্থানটি রাঁচী হইতে ১০ মাইল দূরে ডুংরী গ্রামে অবস্থিত। উদ্বোধনের দিন বেলুড় মঠের স্বামী বীতশোকানন্দ মহারাজ তথায় যাইয়া সভার মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন। রাঁচীনিবাসী খ্যাতনামা দেশসেবক ডাক্তার যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় স্বাস্থ্যনিবাস পরিচালন কমিটীর সহ-সভাপতি। উদ্বোধনের দিন সম্পাদক স্বামী বেদান্তানন্দজী জানাইয়াছেন যে বর্ত্তমানে তথায় ৩৪টি রোগী রাখার ব্যবস্থা হইলেও শীঘ্রই তিনি এক শত রোগী রাখার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশা

রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতালের একটি কুটীর

রাঁচী যক্ষ্মা হাসপাতালের অদূরস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য

করেন। কসৌলী স্বাস্থ্য নিবাসের ভূতপূর্ব কর্মী ডক্টর মৃগাঙ্কশেখর মিত্র বর্তমানে রাঁচী রামকৃষ্ণ মিশন স্বাস্থ্য নিবাসের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্বাস্থ্য নিবাসের উপকারিতার কথা জনসাধারণের নিকট বলা নিষ্প্রয়োজন। দেশে সহৃদয় ধনী ব্যক্তিরও অভাব নাই। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কৃপায় মিশনের কর্মীদিগের এই শুভ প্রচেষ্টা শীঘ্রই সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়া সাফল্যমণ্ডিত হইবে এবং তাঁহারা দেশের অসংখ্য পীড়িত জনসাধারণকে রোগ হইতে মুক্তি দান করিতে সমর্থ হইবেন।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্যার হিউবার্ট রেন্স। স্যার রেন্স সভাস্থলে পৌছিলে হিন্দু-রীতি অনুযায়ী তাঁহাকে মাল্যভূষিত করা হয়। তাঁহার বামে- ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীআনন্দমোহন সহায় -দক্ষিণে মিঃ ভবেশমগন মহারাজ, শ্রীজংবাহাদুর সিং, স্বামী অদ্বৈতানন্দজী প্রভৃতি দৃশ্যমান

ভারত সেবাশ্রম সংঘের পশ্চিম ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভাষণরত ত্রিনিদাদের গভর্ণর স্যার হিউবার্ট রেন্স

বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচার—

কলিকাতাস্থ ভারত সেবাশ্রম সংঘের একদল সন্ন্যাসী প্রচারক পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাইয়া প্রবাসী ভারতীয়গণের মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতি প্রচার করিতেছেন। ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ গত ২৪শে মার্চ ত্রিনিদাদের পোর্ট অফ স্পেন সহর হইতে আমাদিগকে লিখিয়াছেন—আমরা গত ৩ মাসে ৬টি সহরের কাজ শেষ করিয়াছি। সর্বত্র কাজ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গত শিবরাত্রি উৎসব জাঁক-জমকের সহিত পালিত হইয়াছে—ঐ উপলক্ষে একটি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন হইয়াছিল—ত্রিনিদাদের গভর্ণর সার হিউবার্ট রেন্স সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ও ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীআনন্দমোহন সহায় সভাপতিত্ব করেন। আইন পরিষদের শ্বেতাঙ্গ দলের নেতা সার জেরাল্ড

হোয়াইট, শ্রীচংকা মহারাজ এম-এল-সি, শ্রীভদেশ মগন মহারাজ এম-এল-সি, শ্রীরণজিৎ কুমার, শ্রীজং বাহাদুর সিং প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। শিবরাত্রির পূর্বদিনে শিবের মূর্তি লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহর প্রদক্ষিণ করে। শত শত হিন্দু এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। ২৩শে মার্চ দোল-পূর্ণিমা উৎসব প্রতিপালিত হয়—একটি সুন্দর দোলনা নির্মাণ করা হইয়াছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের হিন্দুদের এমন অবস্থা যে এই সব উৎসবের কথা তাহারা কিছুই জানে না। তাহারা খ্রীষ্ট মাস, গুড ফ্রাইডে প্রভৃতি বিরাট আকারে পালন করে, কিন্তু জন্মাষ্টমী, রামনবমী ইত্যাদির কিছুই জানে না। সুতরাং এই জাতীয় উৎসবের মধ্য দিয়া হিন্দুরা যে শুধু আনন্দ বা ধর্মপ্রেরণা লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু খৃষ্টান উৎসবগুলিতে যোগ দিবার নেশাও তাহাদের কাটিয়া যাইতেছে। খৃষ্টানরা ত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুদের কোন স্কুল নাই—তাই শিক্ষার জন্য হিন্দুদিগকে সরকারী বা মিশনারী স্কুলে যাইতে হয়। স্কুলে ভর্তির সময় ছেলেমেয়েদের হিন্দু নাম বদলাইয়া খৃষ্টান নাম রাখা হয়—সাধারণ ক্লাসে হিন্দুধর্মের নিন্দা করিয়া ২।৩ বৎসরের মধ্যে তাহাদের খাটি খ্রীষ্টানে পরিণত করা হয়। সরকারী স্কুলে এই ব্যবস্থা কম, কিন্তু মিশনারী স্কুলে পুরাপুরি ব্যবস্থা। একজন হিন্দুর নামও পবিত্র নাই। চার্লস গোবিন্দ সিং, ক্লার্ক বাবুলাল, জুলিয়াস মহাবীর—এই ধরণের সব নাম। মেয়েদের নাম ত একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতে খৃষ্টের মূর্তি, গলায় ক্রস প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ, রামচন্দ্র প্রভৃতির মূর্তি কোথাও নাই। হিন্দুরা মাত্র ১০৫ বৎসর পূর্বে এখানে আসিয়াছে, কিন্তু তাহার পর হইতে সনাতন ধর্মের কোন প্রচারক তথায় যায় নাই। তথাপি তথায় এখনও ১ লক্ষ ১২ হাজার হিন্দু আছে। এখন অনেকে আমাদের পূজা আরতিতে নিত্য আসিতেছে, তাহাদের বাড়ীতে আমাদের ডাকাইয়া পূজা আরতি করিতেছে। বহু হিন্দু ভুল পথে চলিয়াছিল, হিন্দু রীতি নীতি আচার বিচার ছাড়িয়া অন্যভাবে জীবনযাপন করিতে সুরু করিয়াছিল—তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। আমরা ত বিশ্রাম একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছি—সকাল ৫টায় কার্য্য আরম্ভ করি, রাত্রি ১২টায় শেষ হয়। মধ্যে দুপুরে এক ঘণ্টা খাওয়া-দাওয়া। পূজা, আরতি, ভজন, কীর্তন, যজ্ঞ ছাড়াও ম্যাজিক লণ্ঠন, বক্তৃতা প্রভৃতি হইতেছে। স্বামী অদ্বৈতানন্দই প্রধানত বক্তৃতা করেন; স্বামী পূর্ণানন্দ ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা করেন, আমি আলোচনা ও ঘোরাফেরা করি, ব্রহ্মচারী মৃত্যুঞ্জয় ভজন কীর্তন করিয়া থাকেন। হিন্দুরা ভাষা ভুলিয়াছে, তাহাদের হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। পুরুষরা ধুতি ও মেয়েরা সাড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। হিন্দু নেতারা স্থায়ী আশ্রম স্থাপনের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন। মোটের উপর আমাদের কাজকর্মের প্রভাবে লোকের মন পরিবর্তিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি।

পরলোকে সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র—

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ রায় বাহাদুর অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র গত ২৫শে মার্চ ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক ও ঢাকাস্থ জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং ১বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন।

পরলোকে সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

স্বর্গত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ও শিল্পাচার্য্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ৩রা মার্চ ৮৩ বৎসর বয়সে কলিকাতায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত, লাটিন, ফরাসী, ইংরাজি প্রভৃতি বহু ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন ও জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে সুবৃহৎ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের জ্ঞাতি ভ্রাতার পুত্র ছিলেন।

শ্রীঅরুণকুমার মিত্র—

কলিকাতার খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীঅরুণকুমার মিত্র ফরাসী সাহিত্যে গবেষণা করিয়া সম্প্রতি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করিয়াছেন। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া এরূপ উচ্চ সম্মান লাভ করিলেন।

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৫১ সালে ভারতীয় ক্রীড়া-মহলে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। দিল্লীর নবনির্ম্মিত জাতীয় ক্রীড়া মঞ্চে (National Stadium) অনুষ্ঠিত প্রথম সর্ব্বএশিয়া ক্রীড়াপ্রতিযোগিতা

১৫০০ মিটার দৌড়ে নিক্কা সিং (ভারতীয়) প্রথম হচ্ছেন। তাঁর পিছনে দু'জন জাপানী যথাক্রমে ২য় ও ৩য় স্থান পান

ফটো—ডি রতন

বিশেষ সমারোহে এবং সাফল্যের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশগুলির কাছে এই ক্রীড়ানুষ্ঠান নানা দিক থেকে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ক্রীড়ামঞ্চটি কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল না। রাজধানী দিল্লীর এই জাতীয় ক্রীড়ামঞ্চটি বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের এবং দর্শকদের ভাব-বিনিময় এবং আলাপ পরিচয়ের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিলো। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দূরের মানুষকে বন্ধুত্বের বন্ধনে সুদৃঢ় করতে খেলাধুলার যে এক অপরিসীম ক্ষমতা আছে এ ক্ষেত্রেও আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। রাজনৈতিক দিক থেকে এইরূপ আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ। এশিয়ার অন্তর্গত ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষ যে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে আগ্রহশীল তা এই সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন থেকে সহজে অনুমান করা যায়। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে জাপান, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, আফগানিস্থান, ইরাণ, সিংহল, নেপাল এবং ভারতবর্ষ। আমাদের ঘরের পাশের অতি নিকট প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্থান কিন্তু প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রীসের প্রাচীন অলিম্পিক গেমসের কয়েকটি রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়। অলিম্পিক গেমস প্রথা অনুসারে এক্ষেত্রে দিল্লীর ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ লাল কেল্লায় সূর্য্যরশ্মি থেকে অগ্নি উৎপাদন করা হয় এবং সেই অগ্নিশিখা চল্লিশজন মশালধারী ১১½ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে জাতীয় ষ্টেডিয়ামে বহন ক'রে আনেন। শেষ মশালধারী ছিলেন শুভ্রকেশধারী ব্রিগেডিয়ার দলীপ সিং। তিনি মশালটি নিয়ে ক্রীড়ামঞ্চটির চারধার

পরিক্রমণ করেন। দলীপ সিং একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯২৪ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমসে ভারতবর্ষ সরকারীভাবে দলীপ সিংহের নেতৃত্বে যোগদান করে। ক্রীড়ামঞ্চে এক বিশেষ অগ্নিপাত্রে লালকেল্লা থেকে সংগৃহীত অগ্নিশিখা দিয়ে একটি অগ্নিকুণ্ড রচনা করা হয়। এই পবিত্র অগ্নিকুণ্ডটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত ছিল।

৪ঠা মার্চ্চ ভারতবর্ষের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জাতীয় পতাকা বহন ক'রে মাঠ পরিক্রমণ করেন। এদিকে উদ্বোধন উপলক্ষে হাজার হাজার পারাবত ক্রীড়ামঞ্চ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আকাশের বুকে চক্কর দিতে দিতে এই শুভ উদ্বোধনের সংবাদ তারা নাগরিকদের জানিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে খেলাধূলার অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় ৫ই মার্চ্চ এবং শেষ হয় ১১ই মার্চ্চ।

ব্যক্তিগত ক্রীড়ানুষ্ঠানে (Individual Event) জাপানের প্রতিনিধিরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সাফল্যলাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বিগত ১২ বছর জাপান বিশেষ কোন আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি। সুতরাং এই প্রতিযোগিতার জন্য জাপান একপ্রকার প্রস্তুতই ছিল না। বিগত ১৯৩৬ সালে জার্ম্মানীতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে জাপানের সাফল্যের কথা মনে পড়ে। অলিম্পিকে কোন কোন বিষয়ে জাপানের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড আজও অক্ষুণ্ণ আছে। সম্প্রতি জাপানী সাঁতারুরা আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়ামহলে বিশেষ কৃতিত্বলাভ করেছে। কিন্তু সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জাপান সাঁতারে নামেনি। ভারতবর্ষের স্থান জাপানের পর। পয়েণ্টের দূরত্বে অনেক পিছনে। ভারতবর্ষের পয়েণ্টের অর্দ্ধেকের কম পেয়ে ইরাণ তৃতীয় স্থান পেয়েছে। দলগত অনুষ্ঠানে (Team Event) বেশী পয়েণ্ট পেয়ে ভারতবর্ষ প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এখানে জাপান ২য় স্থান পেয়েছে।

দিল্লীর ন্যাশানাল ষ্টেডিয়ামের একাংশের দৃশ্য   ফটো—ডি রতন

বাঙ্গালার প্রতিনিধি সাঁতারু শচীন নাগ ১০০ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে

ভারতবর্ষকে প্রথম স্বর্ণপদক পাইয়ে দেন। দৈহিক সৌন্দর্য্যের জন্য পরিমল রায় 'Mr. Asia' উপাধি পান।

মেয়েদের ডিসকাস থ্রোতে ১ম স্থান অধিকারিণী যোশিনো উচিইয়োকো (জাপান) পাতিয়ালার মহারাজার কাছে থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন। ২য় স্থানে দাঁড়িয়ে কোজিমা ফুমি (জাপান) এবং ৩য় স্থানে এ এস সালামুন (ইন্দোনেশিয়া) ফটো ডি রতন

সর্ব্ব এশিয়া ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে (Individual Event) কিম্বা দলগত অনুষ্ঠানে (Team Event) মোট সাফল্য জড়িয়ে কোন দেশকে প্রথম স্থান লাভ করার জন্য সরকারীভাবে চ্যাম্পিয়ানসীপ দেওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একটি বে-সরকারী হিসাব তালিকা তৈরী ক'রে কোন দেশের কত পয়েন্ট এবং সেই হিসাবে তাদের স্থান দেখানো হ'ল। কোন দেশ কতগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছে তারও একটি হিসাব তালিকা নীচে দেওয়া হ'ল।

ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তির সংখ্যা

		স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক	পয়েন্ট
১ম	জাপান	২০	১৮	১৭	১৬৮
২য়	ভারতবর্ষ	১২	১৩	১৭	১১৬
৩য়	ইরাণ	৮	৫	১	৫৬
৪র্থ	সিঙ্গাপুর	৩	৬	২	৩৫
৫ম	ফিলিপাইন	৩	৪	৬	৩৩
৬ষ্ঠ	ইন্দোনেশিয়া	০	০	৪	৪
৭ম	ব্রহ্মদেশ	০	০	৩	৩
	সিংহল	০	১	০	৩

দলগত অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তির সংখ্যা

		স্বর্ণপদক	রৌপ্যপদক	ব্রোঞ্জপদক	পয়েন্ট
১ম	ভারতবর্ষ	৩	৩	২	৫২
২য়	জাপান	৩	২	১	৪৪
৩য়	ফিলিপাইন	২	১	২	৩০
৪র্থ	সিঙ্গাপুর	১	২	০	২২
৫ম	ইরাণ	০	১	১	৮
৬ষ্ঠ	ইন্দোনেশিয়া	০	০	১	২

ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণ পদক

নিম্নলিখিত ১৫টি অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষ স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

	অনুষ্ঠান	বিজয়ী	সময় কিম্বা দূরত্ব
১।	১০০ মিটার দৌড় :	(১ম) লেভী পিণ্টো	„ ১০·৮ সেঃ
২।	২০০ মিটার দৌড় :	(১ম) লেভী পিণ্টো	„ ২২ সেঃ
৩।	৮০০ মিটার দৌড় :	(১ম) রঞ্জিৎ সিং	„ ১ মিঃ ৫৯·৩ সেঃ
৪।	১,৫০০ মিটার দৌড় :	(১ম) নিক্কা সিং	„ মিঃ ৪১·১ সেঃ
৫।	১০,০০০ মিটার ভ্রমণ :	(১ম) মহাবীর প্রসাদ	„ ৫২ মিঃ ৩১·৪ সেঃ
৬।	৫০,০০০ মিটার ভ্রমণ :	(১ম) ভগতোয়ার সিং	„ ৫ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭·৪ সেঃ

অনুষ্ঠান	বিজয়ী	সময় কিম্বা দূরত্ব
৭। ম্যারাথন রেস :	(১ম) ছোটা সিং	„ ২ ঘ. ৪২ মি: ৫৮.৬ সে:
৮। ১,০০০ মিটার রীলে :	(১ম) ভারতবর্ষ	„ ৩ মি: ২৪.২ সে:
৯। ডিস্‌কাস থ্রো :	(১ম) মাখন সিং	দূরত্ব ১৩০ ফিট ১০¾ ইঃ
১০। লৌহ বল নিক্ষেপ :	(১ম) মদন লাল	„ ৪৫ ফিট ২১/২ ইঃ
১১। ১০৯ মিটার ফ্রি-ষ্টাইল সাঁতার :	(১ম) শচীন নাগ	সময় ১ মি: ৪ ১ ৫ সে:
১২। ডাইভিং (স্প্রিং-বোর্ড)	(১ম) কে পি থাক্কার	৩৭১.২৫
১৩। „ (ফিক্সড-বোর্ড)	(১ম) কে পি থাক্কার	৩৬১.০৫

১৪। ওয়াটার পোলো : ফাইনালে ভারতবর্ষ ৬-৪ গোলে সিঙ্গাপুরকে হারায়।

১৫। ফুটবল : ফাইনালে ভারতবর্ষ ১-০ গোলে ইরাণকে পরাজিত করে।

রঞ্জিট্রফি ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান ঃ

হোলকার ঃ ৪২৯ (মুস্তাকআলি ১৮৭, মানকড় ১৩২ রানে ৬ উইঃ) ও **৪৪৩** (সারভাতে ২৩৪, মানকড় ১৩৫ রানে ৪ উইঃ)

গুজরাট ঃ ৩২৭ (কিষেণচাঁদ ৯৮, সোধান ৭৫*। গাইকোয়াড় এবং নাইডু ৪টে ক'রে উইকেট পান) ও **৩৫৬** (জেস্থ প্যাটেল ১৫২, ডি স্বজা ৭৭। গাইকোয়াড় ১০৯ রানে ৪ উইঃ)।

ইন্দোরে অনুষ্ঠিত রঞ্জি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে হোলকার দল ১৮৯ রানে গুজরাট দলকে পরাজিত ক'রে রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হয়েছে। এই নিয়ে হোলকার দল তিনবার রঞ্জিট্রফি বিজয়ী হ'ল। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৫-৪৬ এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে হোলকার রঞ্জিট্রফি পায় এবং রাণার্স আপ হয় তিন বছর—১৯৪৪-৪৫, ১৯৪৬-৪৭ এবং ১৯৪৯-৫০ সালে।

অক্সফোর্ড—কেম্ব্রিজ বোট রেস ঃ

৯৭তম বাৎসরিক বোট রেসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ৫ লেংথে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। এই নিয়ে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ক্রমে পাঁচ বছর এই আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোট রেসে বিজয়ী হ'ল।

মোট জয়লাভ ঃ কেম্ব্রিজ—৫৩ বার; অক্সফোর্ড—৩। একবার 'dead heat' হয়েছে।

হকি লীগ ঃ

প্রথম বিভাগের হকি লীগ খেলায় গত বছরের লীগ-জয়ী কাষ্টমস দলের সঙ্গে মোহনবাগান এবং ভবানীপুর দলের জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিলো। মোট ২১টি দল প্রথম বিভাগের লীগে খেলছে। এই তিনটি দলের মধ্যে
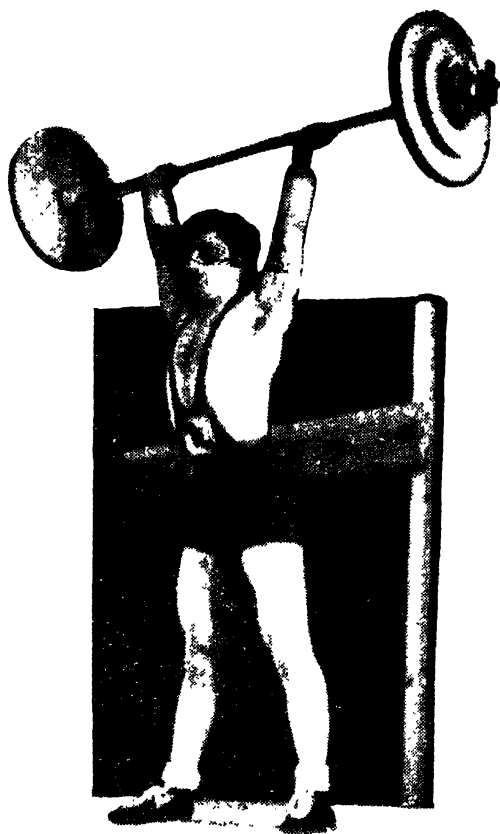
ফিরোজ পোজহান (ইরাণ) মিড্‌ল ওয়েট ৩১০ পাউণ্ড ভার উত্তোলন ক'রে ...

মোহনবাগান প্রথম পরাজয় স্বীকার করে ভবানীপুরের কাছে ২-০ গোলে। মোহনবাগানের ১৪টা খেলায় ২৬ পয়েণ্ট ছিল, ড্র ২টো, হার ছিল না। ২৮শে মার্চ্চের খেলা শেষ হবার পর লীগের তালিকায় কাষ্টমস এবং ভবানীপুর এই দুটি দলই অপরাজেয় ছিল। কিন্তু এই দুটি দলও শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় থাকতে পারলো না। লীগবিজয়ী কাষ্টমসের প্রথম হার হ'ল পুলিসের কাছে ১-২ গোলে, ৩১শে মার্চ্চ। এরপর ভবানীপুর দল ০-১ গোলে কাষ্টমসের কাছে হেরে যায় ৪ঠা এপ্রিল। ভবানীপুর দলকে হারিয়ে কাষ্টমস লীগের তালিকায় এই তিনদলের উঠা-নামার প্রতিযোগিতায় একধাপ এগিয়ে যায়। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে তার শেষ খেলায় কাষ্টমস ০-১ গোলে হেরে গিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের প্রতিযোগিতার পাল্লা থেকে দূরে সরে গেছে। এখন লীগ-চ্যাম্পিয়ানসীপ নিয়ে মোহনবাগান এবং ভবানীপুরেরমধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। ভবানীপুরের ২টো খেলা বাকি। ভবানীপুর যদি তার বাকি খেলায় কোন পয়েণ্ট নষ্ট না করে তাহলে সমান ৩৫ পয়েণ্ট দাঁড়াবে। সে অবস্থায় দু'দলকে পুনরায় খেলতে হবে লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারণের জন্যে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৫ সালে মোহনবাগান প্রথম বিভাগের হকিলীগে প্রথম চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছিলো। এবছর মোহনবাগান এবং ভবানীপুর দলের মধ্যে যে কোন এক দল হকি লীগ-চ্যাম্পিয়ানসীপ পাবে। কিন্তু লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপের জন্য বাঙ্গালী হকি খেলোয়াড়দের মর্য্যাদা কতখানি বৃদ্ধি পাবে সে কথা স্মরণ ক'রে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই হতাশ হবেন। দলের সমর্থকদের কাছে চ্যাম্পিয়ানসীপের অদম্য আকাঙ্ক্ষা কতখানি জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, আশা করি সকলেই সাম্প্রতিক হকি দল গঠনের দৃষ্টান্ত থেকে উপলব্ধি করবেন।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বিপক্ষে	পয়েণ্ট
মোহনবাগান	২০	১৬	৩	১	৫৭	১০	৩৫
ভবানীপুর	১৮	১৪	৩	১	৪০	৯	৩১

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-অনূদিত উপন্যাস "অনৈকা"—২॥০, "অবন্ধনা"—২৲

শ্রীমতী বীণা দেব বি-এ প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ "হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভে শ্রীশ্রীশোভা মা"—॥০

কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রবন্ধ-সমষ্টি "প্রভাত-চিন্তা" (১৭শ সং)—২॥০

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "ঝিন্দের বন্দী" (৭ম মুদ্রণ)—২৲

শ্রীজ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ "হাত-দেখা" (৩য় সং)—৪৲

রামনাথ বিশ্বাস প্রণীত "কোরিয়া ভ্রমণ" (৩য় সং) ১৲

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "সুদামা" (৪র্থ সং)—১।০

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পণ্ডিত প্রণীত "গন্ধর্ব-বিবাহ"—১॥০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট্"—১৲

শ্রীবলাই প্রামাণিক প্রণীত উপন্যাস "মেঘ ও রৌদ্র"—২৲

শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প গ্রন্থ "হালখাতা"—১।০

শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত "পল্লী-সংগঠন"—১।০

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের প্রাথমিক জ্ঞাতব্য"—১৲

কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত "স্বাধীনতা-দিনের উপহার"—।৵০

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায় প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "পূর্বরঙ্গ"—২৲

শ্রীতারাচরণ তর্কদর্শনতীর্থ প্রণীত "শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ"—২॥০

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শিল্পী—শ্রীদ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৮

দ্বিতীয় খণ্ড | অষ্টত্রিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

তন্ত্রের ইঙ্গিত

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

রতবর্ষের অন্তরের ইতিহাস অপূর্ব্ব জয়যাত্রার সাধনার হিনী। স্থিতধী আরণ্যক ঋষিদের যুগ হইতে সমিধোজ্জ্বল মধূমাগ্নির যজ্ঞক্ষেত্র হইতে, আজও এই বিংশশতাব্দীর াদে, গুহাগহ্বর আশ্রমের উপান্ত হইতে জনঅধ্যুষিত ন্তরে প্রাণোৎসবের সার্থকতায় এই সাধনার ধারা ারূপে নানা চিন্তায় নানা মত ও পথের মধ্য চলিয়াছে। কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কত শতাব্দী হইয়া মানুষ চলিয়াছে, দেশে দেশে সৃষ্টির রূপ ইয়াছে, সংস্কৃতির রূপান্তর সাধিত হইয়াছে। পথ, নতুন রীতি, নতুন নীতি চলতি পথে ভিড় য়াছে। কত দুঃখবেদনা, কত পতন-অভ্যুদয়-আঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়া বন্ধুর পথ বাহিয়া ্থে আসিয়া থামিয়াছে, বিরাট সে অভিসার যাত্রা, তার প্রকাশ, প্রাণবন্ত তার বহমান মননধারা। নানা আদানপ্রদানে ভারতবর্ষের সনাতনবিত্ত রসসমৃদ্ধ হইয়াছে, কবির ভাষায় সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থ-নীরে। আজও সেই সমন্বয়ের ক্রিয়া অব্যাহত, আজও তার কালজয়ী-ধারা অক্ষুণ্ণ।

সেই বিভিন্ন ধারার একটি বিশেষ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তন্ত্রে ও তার নানা শাখা প্রশাখায়। লক্ষ্য কিন্তু এক—পূর্ণ-জ্ঞানের সম্বোধি, সম্ভূতি, পূর্ণশক্তির উদ্বোধন, সেই চিররাসরসিক আনন্দময়ের শিবতমের অনুভূতি, সেই অনাহত তুরীয় অবস্থার বিকাশ। যোগ শুধু চিত্তবৃত্তি-নিরোধ নয়, প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মযুক্ত হইবার প্রয়াসও বটে। সাধন প্রক্রিয়া হিসাবে তন্ত্র পরবর্ত্তীকালের হইলেও তার শাশ্বত ইঙ্গিত বেদ উপনিষদ পুরাণের সমগোত্রীয়। অবশ্য অবস্থাভেদে, অধিকারীভেদে, প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ রূপের উপর সীমা টানিয়া দিয়াছেন তন্ত্রবেত্তা।

তন্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইল—ভুক্তির দ্বারা মুক্তি, ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়াই ইন্দ্রিয়াতীতের স্পর্শলাভ, ভোগের সম্পর্কেই আদি প্রকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া। পার্থিব যত কিছু বিষয় আছে সবই যে ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। প্রয়োজন শুধু চিত্তশুদ্ধির, সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের।

তব চিরচরণে চাই শরণাগতি
জপি আঁধার বনে তব অলখজ্যোতি (দিলীপ)

আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রামের মধ্যে, সমস্ত বাহ্য ও আন্তর জগতে দেহবিগ্রহের মধ্যে 'আদি চৈতন্যশক্তিই সুপ্ত, মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত তার ক্রিয়া অবাধ। এই সীমিত ভোগায়তনকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্যশক্তি পুঞ্জীভূত দিব্যাধারে পরিণত করিবার যে সাধনা তারই নির্দ্দেশ তন্ত্রের প্রতি ছত্রে। ইহার ক্রম আছে, রূপ আছে, স্তর আছে, সকলের পক্ষে পথও এক নয়। এই সাধনা মূলতঃ প্রত্যেক অনুভূতিকে আপ্তকাম করিয়া শিবময় করিয়া তুলিবার সাধনা—সবই শিব, সবই কল্যাণ, শিব এব কেবলং। ভোগযোগ একই ধর্ম্ম, অতি কঠিন দুস্তর পথ সন্দেহ নাই—বিশেষ করিয়া অনধিকারীর পক্ষে, আর সমাজে যখন অনধিকারীর সংখ্যাই প্রবল এবং আরও প্রবল যখন তার ভোগাভিমুখী প্রবৃত্তিগুলি এবং সামান্য শক্তির উদ্বোধনে বিভূতির প্রকাশে মানুষ দিশাহারা হইয়া যায়। সত্তার নিম্নতম কেন্দ্র হইতে পূর্ণতম কেন্দ্র পর্য্যন্ত এই সুষুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করিয়া বিশ্বের পরাশক্তির সঙ্গে একই ছন্দে মিলাইয়া দেওয়াই তন্ত্রের গূঢ়তম উদ্দেশ্য। প্রত্যেক পদেই পদস্খলনের যে বিপুল সম্ভাবনা আছে প্রকৃত তন্ত্রবেত্তা তাহা বারে বারে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। তন্ত্রের এই নিম্নগামী দিকটাই সমাজে বিকৃত হইয়া দেখা দিয়াছিল, একথাও সত্য এবং তন্ত্র সাধনার যে অপূর্ব্ব রহস্য এবং যাহার সঙ্গে ভোগাচারের বিকৃত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই সেই রসঘনদিকটিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে ফেলিয়া দিয়াছিল।

আজিকার শিক্ষিত সমাজে তান্ত্রিকতা বলিতে আমাদের মনে যে একটা বিরূপতা ও কদাচারের ছায়া জাগে ইহা এই জন্য। যদিও সার জন উড্রফ, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, ডাঃ সরকার প্রভৃতি মনীষীরা তন্ত্রসাধনার প্রকৃত তথ্যটিকে শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট পরিচিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রসাধন বলিতে যে একটা বিকৃত ভোগবাদ বুঝাইত তাহা ইতিহাসসম্মত একথা অস্বীকার্য্য নয়। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই মতবাদের মধ্যে প্রাচীন অনার্য্যদের লিঙ্গপূজা, বৈদিক শিশ্নবাদ, রুদ্রতত্ত্ব, অষ্ট্রিকদের মাতৃতন্ত্র, সমাজের চিন্তার ধারা প্রভৃতি আসিয়া আর্য্য অনার্য্য, দ্রাবিড় অষ্ট্রিক নিগ্রোবটুর সমীকরণের প্রকাশ। কামরূপ কামাখ্যার ইতিহাস পড়িলে এই সমন্বয়ের রূপটি বিশেষভাবে ধরা পড়িয়া যায়। যোগিনীতন্ত্র, কালিকা-পুরাণ, শৈব আগম, বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার শেষরূপ সব আসিয়া এক Dynamic integrationএর সৃষ্টি করিয়া কামাখ্যার পাদপীঠ প্রস্তুত করিয়াছে। ইহা যে বিকৃত অনাচারে পরিণত হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে; যেমন রাতি খোয়ার দল, ভোগীর দল। কিন্তু ইহাতেই প্রমাণ হয় না যে তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন বা তার বক্তব্য দূষণীয়। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আজিকার তন্ত্রবাদ বেশী দিনের প্রাচীনত্ব দাবী করিতে পারে না একথাও সত্য, যদিও উমা হৈমবতীর আখ্যান, ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত শক্তিবাদের কল্পনাকেও প্রাচীনত্বের পর্য্যায়ে লইয়া যায়। "অহং চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম, অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাম"। তবু তন্ত্রবাদ বলিতে সাধারণ মানুষে বুঝে তার দার্শনিক ঐতিহ্য নয়, তার শক্তি সঞ্চালনের প্রক্রিয়াগুলিকে। তন্ত্রের মূলতত্ত্ব ও তার বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে এক করিয়া দেখিলে তাহার সম্যক বিচার হইবে না। মূল ইঙ্গিতটি কি সেই প্রশ্নের অবতারণাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য।

তান্ত্রিকতা বলিতে আমরা কি বুঝি সেটা স্পষ্ট না হইলে বক্তব্যটা অস্পষ্টই থাকিয়া যায়। পূর্ব্বে এই সম্পর্কে অন্য একটি প্রবন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলাম তাহারই পুনরাবৃত্তি করি। খুব ব্যাপকভাবে ও রূপকচ্ছলে যদি ধরা যায় যে, যা অসংযম, যা আত্মবিস্মৃতি, যা অকল্যাণ, তা মৃত্যুরই প্রতীক, শবেরই রূপায়ণ, মৃত্যুর বীজ তাহাতে নিহিত। সেই শবকে সাধনায় শিবে পরিণত করিতে হইবে। সাধনার প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিতে হইবে—যত কিছু বীভৎসতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা, কুৎসিত, ক্লেদ, গ্লানি, বিভীষিকা, লোভ, ভয়—দূরে পালাইয়া নয়—তাহাদেরই ভিত্তি করিয়া। শুধু ছোট ছোট অহঙ্কার, রক্তমাংসের

লোভ নয়—অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি ষড়ৈশ্বর্য্যের লোভও, ছোট ছোট মারণ উচাটন মদমত্ততার ভয় নয়, আত্ম অবিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনার ভয়ও। এই সব বিভেদ মানিয়া লইয়া এদের মধ্য দিয়া যিনি অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন তিনিই বীরসাধক, তিনিই পঞ্চমকারতত্ত্বজ্ঞ, দিব্যপুরুষ। তিনিই আত্মারাম, ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত সুধা পান করিয়া আত্মস্থ আত্মসমাহিত। সেই স্তরেই সহস্রারে কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতী। তিনিই পরাবিজ্ঞানময়ী মহাচেতনা, যিনি একাধারে আধার চৈতন্যে শক্তি, প্রজ্ঞা, পারমিতা, মহালক্ষ্মী, মহেশ্বরী, মহাসরস্বতী। তখনই ব্রহ্মবিদ্যায় সম্বোধি লাভ হয়। ইহাই তন্ত্রের শেষ উল্লাস। মোক্ষায়তে হি সংসারঃ, ভুক্তি দ্বারা মুক্তি, অপ্রমত্ত বিষয় সেবার দ্বারা ভোগবতী পার হইয়া নিবৃত্তিমার্গের অপ্রগলভ শুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হওয়াই আগমনিগম যামলের দুর্লভ দুস্তর পথ। জীবনের গূঢ়তম মজ্জায়, রক্তে তন্ত্রে শিরায় উপশিরায় তার অন্তরতম প্রদেশে প্রকৃতির এই লীলা চলিতেছে শক্তির এই উন্মাদনা। সেই শক্তি যেন বলদর্পিত না হয়, ভোগমত্ত না হয়, লোভী-লালসাতুর না হয়, প্রজ্ঞাহীন, শ্রদ্ধাহীন. আনন্দহীন না হয়—ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে, সেই ব্রত ও তার সাধনই তন্ত্রের অপূর্ব্ব ইঙ্গিত—প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া নয়—তাহাকে সীমিত, রূপায়িত, রূপান্তরিত করিয়া। এই রূপপিপাসাকে, ভোগপ্রকৃতিকে রূপান্তরের সাধনাই তন্ত্রের সাধনা।

শক্তি আমরা কাকে বলি। শরতের শুক্লপক্ষে শক্তিকে আমরা আহ্বান করি ষড়ৈশ্বর্যময়ী বিশ্বজন-মনোলোভা মূর্ত্তি-রূপে সর্ব্বমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকেরূপে। আবার নিবিড় অমা তিমির রাত্রে তিনি কালিকা, নগ্নিকা, ভূষণহীনা—'ক্ষুৎক্ষামা কোটরাক্ষী মসীমলিনমুখী মুক্তকেশী রুদন্তী।" শ্মশান অগ্নির মধ্যস্থলে "শবং বামপাদেন কণ্ঠে নিপীড্য 'ললজিহ্বা মহাভীমা"। একদিকে ধ্বংসের চিতাচুল্লী, নরকরোটি পরিপূর্ণ মহাশশ্মান "কালীকরালী মনোজবা চ, সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা স্ফুলিঙ্গিনী"। মূলীভূতা মহাশক্তির অপূর্ব্ব লীলাবিলাসের এ এক অপরূপ কল্পনা। শিবাকুল চকিত, দেবী নামিতেছেন ডামরী ঝামরী ভৈরবীদের সঙ্গে, ক্ষেত্রপাল অসিতাঙ্গ ভৈরবদের সঙ্গে। যিনি সৌম্যা, যিনি সৌম্যতরা, যিনি অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বরী তিনিই আবার মহাকালের বক্ষের উপরে নৃত্যপরা উন্মাদিনী। বামকরে সংহারের খড়্গ উদ্যত, সদ্যচ্ছিন্ন নরমুণ্ড—এও কিন্তু সাধকের কল্পনায় তার বামরূপ নয়—তখনও তিনি "কালিকাং দক্ষিণ্যাং দিব্যাং"। ভয়ঙ্করীর আর একরূপ যে শঙ্করী, অন্ধকারের অপর পারেই যে আলো—খড়্গ ও নরমুণ্ডের অপরদিকেই বরাভয়। শক্তির এই অপূর্ব্ব রহস্য যে সাধকের অনুভূতিতে ধরা দেয়, সেই পারে যোগাসনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে—কিছু তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, কিছু তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না, কিছু তাহাকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না—অন্ধকার যতই সূচীভেদ্য হউক না, যতই কিছু ঝঞ্ঝা লোভ ভয় বিভীষিকা আসুক না। তন্ত্র বলিলেন, মহাশ্মশানই নবসৃষ্টির, নব জাগৃতির সূতিকাগার—প্রলাম্বুরাশির অপরপারেই অমৃতের সন্ধান—শিব এব কেবলংএর অনুভূতি—সবই শিব, সবই মায়াভব।

এটা শুধু কথার কথা, তত্ত্ব কথা নয়। আজিকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারাও প্রায় এই পথে ছুটিয়াছে। বস্তু জড় নয়—বস্তু চঞ্চল—তারও প্রাণ আছে, তারও আলোড়ন আছে. দ্বন্দ্বের তাড়নায় নব নব রূপ বিকশিত হইতেছে, বস্তুর পঞ্জর বাহিয়াই প্রাণের আবির্ভাব। বের্গস তাই বলিলেন—আমরা কালের মহিমা জানি না, স্থানের হিসাবেই ভাবি, স্থান স্থাণু, কিন্তু কাল প্রবহমান (Enduring) ক্রমসঞ্চরী। তাই কালং কলয়তি যা সা সেই যে শক্তি, কালের উপর যিনি নৃত্য করিতেছেন, তিনি শুধু ধ্বংসের দেবতা নন্ সৃষ্টিরও দেবতা। Time space continumenএর উপরে, Four domensionএর বাইরে সেই শক্তির লীলার কল্পনা করা শুধু কবিবিলাস বা বাতুলের প্রলাপ নয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—আজকাল এডিংটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকরা এই কথাই বলিতেছেন যে আদিতে এই বিশ্বে আকারবিশিষ্ট কোন বস্তু ছিল না—বিরাটশূন্য—সীমাহীন দিশাহীন সেই মহাশূন্যের মাঝে "শান্ত শিব প্রপঞ্চ, অতীত"। মহাযানী নাগার্জ্জুনের শিষ্য আচার্য্য আর্য্যদেব সেই "মহাব্যোম সমান শূন্যতা"ই দেখিলেন—অথচ শক্তির লীলা সেই শূন্যে প্রচ্ছন্ন। বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরের ঘুমন্ত দিনের কথা সেই ভাবেই বর্ণনা করিলেন—ইলেকট্রন প্রটোনের ঘূর্ণী ঝড় নাই, পজিট্রন বা

যুগ্ম আলোককণার সন্ধান নাই—সব সমাহিত, শান্ত, স্তব্ধ। বহু লক্ষ বর্ষ পরে সেই যোগনিদ্রা ছুটিয়া গেল—চাঞ্চল্য স্বরু হইল—Potential wall ভাঙিয়া গেল—unclear bombardmentএর আরম্ভ। সাধকের ভাষায় যোগস্থ শিব শক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাণ্ডবে মত্ত হইলেন। জমাট বাঁধিল সৃষ্টির স্তর, গতিতে বেগ আসিল, নৃত্যে আবেগ ও ছন্দ। নটরাজের পদক্ষেপে বিবশবিশ্ব চেতনায় মূর্ত্ত হইল। "দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি" দেবতাদের কাব্য মরেও না, জীর্ণও হয় না। মূলীভূতা শক্তিকে কি বৈজ্ঞানিক, কি দার্শনিক, কি সাধক, কি কবি কেহই অস্বীকার করেন না। শুধু প্রশ্ন থেকে যায় এই শক্তি চিৎশক্তি না অন্ধ আবেগ। জীনসের মত বৈজ্ঞানিকও তাই একদিন বলিয়াছিলেন—"The universe begins to look more like a great thought than a great machine." রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে গেলে বলা যায় "বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না তখন বলা যেতে পারে চৈতন্য তার প্রকাশ। জড় থেকে জীবে এক পর্দ্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।"

শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটাই আরো চমৎকার করে বলিয়াছেন তার দিব্য জীবনে। "অনির্বাণের" অপূর্ব্ব ভাষায় একে বলা যায় নচীকেতার অভীপ্সা। মানুষের মনে রহিয়াছে এষণা, উৎশিখ হইয়াছে তপোবীর্য্য। মানুষ চায় পূর্ণতা, উল্লাস, দীপ্ত প্রাণের মূর্চ্ছনা। শক্তি অনন্ত, ছন্দে উল্লসিত, অনন্তগুণে বিভূষিত—শ্রী তেজ মহিমা আপনিই তার প্রকাশ। জড় প্রাণের একটু কঞ্চুক মাত্র, প্রাণ ও চেতনার তাই। মৃৎশক্তির মধ্যেই চিৎশক্তি সংবৃত, তাই চিন্ময় যিনি তাঁর বিলাস এই মৃন্ময় তনুতে। তাই এই সাজের মেলা, ঘর বাঁধার খেলা অসার্থকের নয়, অগৌরবের নয়। এইখানেই জড়বাদীর নাস্তি, বৈরাগীর নেতি। তিনি বলিয়াছেন "নিঃসংশয়ে যদি এ কথা জানি তবেই অসঙ্কোচে বলা চলে এই পার্থিব জীবনেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত্ত্য আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রৈতি···দেহের প্রতি যে বিতৃষ্ণা আমাদের অভ্যস্ত, তার মোহ কাটিয়ে উঠতে চাই উপনিষদের ঋষির সেই সত্য ও গভীর দৃষ্টি—যা চিন্ময় ও অন্নময়ের সকল বিরোধ ছাপিয়ে এক অদ্বয় তত্ত্বকেই দেখতে পায় দূরের মূলে।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একটি গভীর সত্যের অবতারণা করিয়াছেন। "নেতিবাদের করাল ছায়ায় সকল সাধনাই হয়ে গেছে পাণ্ডুর, সন্ন্যাসীর গৈরিকে রাঙা হয়েছে সবার মন। বৌদ্ধ কর্ম্মবাদের প্রতীত্য সমুৎপাদের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছে অস্তিত্বের সকল উল্লাস এবং তা হতে এসেছে বন্ধন ও মুক্তির দ্বিকোটিক বিরোধ—ভব প্রত্যয়ে বন্ধন আর ভবনিরোধে মুক্তি····সন্ন্যাসীর এই আহ্বানে সাড়া দেবার মত সমবেদনা আধুনিক মনে আর বেঁচে নেই। মনে হয় জগতের সর্ব্বত্রই সন্ন্যাসীর যুগ ফুরিয়েছে বা যেতে বসেছে। তাই এ যুগের মানুষ ভাবতে পারে বৈরাগ্যের ধুয়া একটা পরিশ্রান্ত জরাজীর্ণ জাতির প্রাণ-বৈকল্যের পরিচয় শুধু—ভারতবর্ষের বৈরাগ্যবাদ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম' বেদান্তের এই মহাবাক্যকেই মেনেছে, কিন্তু "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই আর একটি মহাবাক্যের সঙ্গে তার অখণ্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দেয়নি।" এই জ্যোতির্ময় উন্মেষকেই শ্রীঅরবিন্দের মতে আর্য্য পিতৃ-পুরুষেরা উষা বলে বন্দনা করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপাদে চরম প্রতিষ্ঠা তার। উত্তরায়ণের পথেই মানবপ্রকৃতির জয়যাত্রা, এই তার পরমব্রত, তার দেবতার অভীষ্ট যজ্ঞ। "তিনি অবিভক্ত, ভূতে ভূতে বিভক্ত হয়ে আছেন"—বোধির এই ত "পশ্যন্তি বাণী"। তিনিই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা—তত্ত্বমসি শ্বেত-কেতো"—কঠোপনিষদের "এই তো তিনি যিনি জেগে আছেন ঘুমন্তদের মাঝে"। তাই তিনি "মায়াকে" বলিলেন সেই বিশ্ব প্রকৃতির সীমার মধ্যে "মিত" করে নাম ও রূপের মধ্যে ফুটিয়ে তোলার সাধনাকে। তন্ত্রেরও সেই উদ্দেশ্য। মৃত্যু, কামনা, বুভুক্ষা সবই সেই বৃহদারণ্যকের "আত্মবান হবার আকাঙ্ক্ষা"। কামনার যথার্থ নিবৃত্তি তার সম্প্রসারণে, অনন্তের কামনায় পর্য্যবসানে। সান্তের ভূমিকায় অনন্তের আস্বাদন প্রকৃতিরই আকুতি। গীতা বলিতেছেন—অপরা প্রকৃতি হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য প্রকৃতির মধ্যে নূতন চেতনা লাভ করাই সাধনার শেষ কথা। কারণ আমাদের চরমতম সম্ভাবনা সাংসারিক সুখ দুঃখকে অতিক্রম করিয়া। সাংখ্য ও বেদান্ত ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয়তার দিকটার উপরই জোর দিলেন,

তাঁদের ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সেই নিবাত নিষ্কম্প অজর অমর শাশ্বত অব্যয় অক্ষয়কে লইয়া। তত্ত্ববেত্তা বলিলেন—জল স্থির থাকিলেও জল, হেলিলে দুলিলে জল ব্রহ্ম, আর ব্রহ্মের যে বিদ্রূপা শক্তি দুইই অভিন্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কথায় "কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা রূপা। প্রক্রিয়া হিসাবে তন্ত্র জোর দিলেন গীতার সেই সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বের উপর "প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি"। তাই আত্মশুদ্ধিপূর্ব্বক ভগবৎশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য পন্থা নাই। ঐ প্রকৃতি আনন্দময়ী, কখনও "কলা", কখনও "নাদ", কখনও ঘনীভূত "বিন্দু", "মহাকারণ" "সোহং ধারা"। সেই ধারা আনন্দেই সৃষ্ট, আনন্দেই বিধৃত। সীমাবদ্ধ জীব সেই আনন্দকে আধারের মধ্যে রূপের মধ্যে পাইতে চাহে, সীমাতীতকে, রূপাতীতকে পাইবে বলিয়া। রুদ্রযামলে দেখি যে দেবী রূপাতীতা, রূপ শূন্যা, বিরূপা আবার রূপমোহিনী। কিন্তু যে দেহবিগ্রহ, যে কাঠামোটী এর বাহন তাহাকে perfect vehicle করিয়া লওয়া সর্ব্বপ্রথমে দরকার—তান্ত্রিকের ভাষায় সব কিছুকেই শোধন করিয়া লওয়া অর্থাৎ নূতনরূপে, সীমিত ভোগায়তনের শুদ্ধ পাত্র রূপে ব্যবহার করা। উদয়নের প্রথম পর্ব্বে প্রাণ প্রকাশ পায় অন্ধ প্রবেগরূপে, দ্বিতীয় পর্ব্বে উদগ্র কামনারূপে, তৃতীয় পর্ব্বে জাগে প্রেম, সমঞ্জসা রতি, আত্মদানের ছন্দ। এই তিন পর্ব্বকে তন্ত্রের ভাষায় বলিতে পারা যায় পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার। তন্ত্রের শেষ উল্লাস সেই ব্রহ্মের সাধনা, অখণ্ড শিবের কল্যাণের সাধনা, আপ্তপূর্ণকাম বৈষ্ণবের সাধনা। তৈত্তেরীয় উপনিষদে তাই বলা হইয়াছে—

"এক অন্নরসময় আত্মা আছেন, তারও অন্তরে রয়েছে এক প্রাণময় আত্মা, তারও অন্তরে আছে মনোময় আত্মা, তারও অন্তরে আছেন এক বিজ্ঞানময় আত্মা, তারও অন্তরে আছেন এক আনন্দময় আত্মা"। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে এই আদর্শের উদ্দেশ্য সুপ্রতিষ্টিত—চক্রোপাসনায় সবাই সমান

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যঃ
শূদ্রঃ সামান্য এত চ
কুলাবধূত সংস্কারে
পঞ্চানাম অধিকারিতা"

ইহাতে বর্ণভেদ কুল-ভেদ নাই—ঐতিহাসিক সমন্বয়ের ফলে একটি Democratic Sense গড়িয়া উঠিয়াছে

"যে কুর্ব্বন্তি নরাঃ মূঢ়াঃ
দিব্যচক্ষে প্রমাদতঃ
কুলভেদং বর্ণ ভেদং
তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিং"

এই স্থানে তন্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও বেদান্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একই। বিকৃত ভোগবাদ, নানা অঘোরপন্থী, বৌদ্ধতান্ত্রিক অভিচারীদের নানা বীভৎসতায় তন্ত্রের সেই প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিয়া শক্তিলাভের এক আশু প্রক্রিয়া হিসাবেই ভারতবর্ষের সমাজে ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এই ঐতিহাসিক তথ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তন্ত্রসাধক সর্ব্ব সম্প্রদায়েরই ছিলেন। নবরত্নেশ্বর তন্ত্রে "বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণবমেবচ শাক্তং" এই ছয় সম্প্রদায়ের তান্ত্রিকের কথা পাই। সবাই কৌল।

ককার শিববাচকঃ উকার প্রস্থে শক্তি
কাল সংযোগার্থ কং জ্ঞানং তদজ্ঞানং কুলমুচ্যতে।

এই কৌল সাধনার নানা রূপ নানা ছন্দ নানা প্রক্রিয়া। সেখানে দূতীযাগ, নায়িকা সাধন, চারিচন্দ্রসাধন প্রভৃতি নানা রহস্যের অবতারণা আছে, সমস্ত জগৎকে স্ত্রীময় ধ্যানের নির্দ্দেশ আছে, সবই যুবতীময়। শিবেন কথিতং দেবি মোহনার্থায় কেবলং—রামানুজের মতে এই 'মোহন' শব্দের অর্থ হচ্চে বিপর্য্যয় জ্ঞানকরং, শ্রীধর স্বামী গীতার টীকায় যাকে বলেছেন "ভ্রান্তিজনক্"।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার দেখিলে দেখা যায় তন্ত্রশাস্ত্রের চারিধারা—আগম, নিগম, যামল ও তন্ত্র। তাহাতে সৃষ্টি প্রলয়ের ব্যাখ্যা আছে, পূজা, ধ্যানধারণা, পুরশ্চরণের মন্ত্র আছে, কৌলিক প্রথার নির্দ্দেশ আছে। সেখানে আমরা পাই সিদ্ধ নাগার্জ্জুন কক্ষপুটের ইতিহাস, পঞ্চমী বিদ্যার কাহিনী, কামরাজকূটত্রয়ের সাধনা। তিব্বতে তন্ত্রের নাম ছিল ঋগযুগ। তান্ত্রিক বৌদ্ধের, সহজিয়া মীননাথ লুইপাদ প্রভৃতি আচার্য্যদের সাধনা শক্তিবাদকে আর এক রূপ দিয়াছিল। তন্ত্রোক্ত সাধনায় যন্ত্রের পূজা একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। ভুবনেশ্বরী, ত্রিপুটী, ত্বরিতা, নিত্যা, বজ্রপ্রস্তারিণী, বাগীশ্বরী, ত্রিপুরভৈরবী, চৈতন্যভৈরবী,

ষটকূটীভৈরবী প্রভৃতির পূজা তন্ত্রসাধনার এক একটি স্তরের এক একটি রূপ। অসংখ্যতন্ত্রে ও উপতন্ত্রে সাধনার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। দেবী শুধু কালী, দুর্গা, সতী সাধ্বী ভবগেহিনী নন, কাল মঞ্জীররঞ্জিনী চৈতন্যময়ী ব্রহ্মবাদিনীও বটেন্। তাহার উপর ছিল গুরু সম্প্রদায়—যেমন বশিষ্ঠানন্দনাথ, ক্রোধানন্দনাথ, কুমারানন্দনাথ, জ্ঞানানন্দনাথ, বোধানন্দনাথ প্রভৃতি। কিন্তু তন্ত্রের নানা প্রক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইলেও সর্ব্বসম্মতিক্রমে তন্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি একই ছিল। মূলাধারকে বলা হইত ভূলোক বা ক্ষিতিচক্র (in line with peraneum, স্বাধিষ্ঠান—ভুবর্লোক (in line with reproductive organ) মণিপুর স্বর্লোক বা নাভিমণ্ডল, অনাদৃত মর্ইলোক বা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, বিশুদ্ধাক্ষ, জনলোক বা স্বর ও ব্যোমের সঙ্গে সংযুক্ত, আজ্ঞা, তপলোক বা নেত্রপল্লবের সঙ্গে যুক্ত, সহস্রসার সত্যলোক বা মণীষার শেষ শিখা। যাকে বৌদ্ধরা বলিলেন অবলোকিতেশ্বর বা Highest point of consciousness, বৌদ্ধ কারণ্ডব্যুহের মতে তার কাছে সবই অবলোকিত বা দৃষ্ট) সারদাতিলকে বলা হইয়াছে—আসীৎ শক্তি স্ততো নাদঃ ততো বিন্দু সমুদ্ভব। কলার অর্থ হইতেছে শক্তি, শক্তির ক্রিয়াবস্থার নাম নাদ, নাদ হইতে শূন্য বা Cosmic pointlessness, স্পন্দন স্থিতি—কখনও বিন্দু ও কেন্দ্র বা আবার ব্যাপ্ত—এই ইএর মিলনে ভোগ ও লয়ের মধ্য দিয়াই স্বরূপের সম্বোধি। ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার তন্ত্রের সেই ব্যাপিনী বৃত্তির উপর জোর দেন, যেখানে শক্তি লীলায়িত হচ্চে দেশকাল অতীত মহাব্যোমে। "তন্ত্রের লক্ষ্য হচ্চে ব্যবহারে সঙ্কীর্ণ ভাব ও প্রকৃতিকে প্রসারীভূত করে দিব্যজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, এ সম্ভব হয় শক্তির প্রেরণা থেকে—জীবনের প্রতি সঞ্চারে বিরাটের ছন্দ আছে তার সম্ভাবনাকে জীবনের লৌকিক স্বাভাবিক চেতনায় জাগিয়ে তুলে ধরবার যে কৌশল তাই তন্ত্র"। এর জন্য মুখ ফিরাইয়া ইহাকে বিকৃত ভোগবাদ বলিলে ইহাকে সম্যক্ বিচার করা হইল না। স্থূল পঞ্চমকারের স্তরের সাধনা সাধককে নীচস্তরেরই শক্তির অধিকার দেয়, শক্তির সেটা অপব্যবহার এবং সত্যকার শক্তিমান তান্ত্রিকের উচ্চাভিলাষের পরিপন্থী ও সাধন বিরোধী। এই শ্রেণীর সাধনাকে প্রায় Antisocial বা জীবননিষ্ঠ সমাজ চেতনার বহির্ভূত বহিরঙ্গ বলা যায়। জীবনের প্রতীকে জীবনকে ত্যাগ না করিয়া আস্তে আস্তে রূপান্তর করিয়া এই দেহবিগ্রহকে কিরূপে দেবায়তন করে তোলা যায় তারই ইঙ্গিত তন্ত্র সাধনায়। এই সাধনায় সিদ্ধ কৌলদের বলা হইত দিব্যৌঘ সিদ্ধ সংঘ—এঁরাই Supermen যার ভাগবতী চেতনাকে দ্যুলোকের অভীপ্সাকে নামিয়ে নিয়ে আসছেন পৃথিবীতে। আজ সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত হোক্

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ

আজকের দিনে তন্ত্রের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তা তার আবার বিচার-কৌল নির্ণয়ে নয়. আজ সর্ব্বভূতে সেই শক্তি ক্ষান্তি শান্তি ও শ্রদ্ধাকে আবিষ্কার ও স্বীকার করবার কাল এসেছে। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। আজ দীপ জলে না, অন্ধকার কাটেনা, তমসা দৃঢ় হয় না। কোন আলোকের অববাহিকার এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের হবে সমাধি, কোন আনন্দের চেতনায় এই মূকজীবন হবে মুখর। কোন রসউচ্ছল উন্মাদনায় রক্তে তন্ত্রে স্নায়ুতে জাগবে নূতন শিহরণ, নব নচীকেতার নূতন অভীপ্সা! রাত্রির তপস্যা কি সাধককে দিনের সন্ধান দিবে না। আজ শিবহীন শক্তির সাধনায় হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী আবার শক্তিহীন শিবের সাধনায় করে দেশ জড় ক্লীব, নির্বীর্য্য, নির্বিষ। আজ শিব ও শিবানী, কল্যাণ ও শক্তির মিলনেই একমাত্র পথ—সেই শিবময় শক্তির সাধনাই শ্রেয় ও প্রেয়ের ছন্দ। আজ স্বাস্থ্য-হীন রূপহীন যশোহীন দেশে রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি—আনন্দময় রসময় পূর্ণ মিদং পূর্ণমদ হোক্—নমঃ শিবায়ৈ চ নম শিবায়, তখনই জোর গলায় বলিতে পারিব—পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পপাত ধরণী তলে। তখনই তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বম। এবং সেই মহেশ্বর আকাশ পেরিয়ে স্বর্গ রাজ্যের কোন পরম দৈবত নন্—মানুষে মানুষে মিলিয়ে মহাদেবতা।

"In Man alone does the universal come to consciousnes . He alone is aware that there is a universe that it has a history and may have a destiny. When once this recognition arises pride prejudice and privilege fall away and a new humanity is born in the soul—Religion is not mere Eccentricity, not a historical encident, not a psychological device, not an Escape-mechanism not an Economic lubricant induced by an indifferent world. It is an integral element of human nature, an ultimation of destiny." (Dr. Radhakrishnan).

এক

সুকুমার মৃত্যুর মধ্যে অবগাহন করে এসে এক নবজীবনের সামনে মুখোমুখি হয়ে বসল।

কী ভীষণ! এতদূর চলে এসেছে, তবু তার কল্লোল যায় শোনা। ডাক্তার, তবুও তার করাল রূপ সহ্য করতে পারলে না, কর্তব্যহানি হচ্ছে জেনেও চলে এল। কিন্তু এই ধ্বনি-তাণ্ডব থেকে কি করে রক্ষা পায়? ওর মনে হয় পৃথিবীর যে-প্রান্তেই উঠুক, কালের সে-সীমান্তেই—এ থেকে ওর মুক্তি নেই; সে আর্তনাদ আজকের আকাশ এমন ভাবে মথিত করছে তা ওর জীবনের আকাশেও চিরায়ু হয়ে রইল।

দৃশ্যটাও ঘুরে ফিরে আসছে মনের পটে, যতই ঠেলে রাখবার চেষ্টা করুক না কেন।···খানিকটা আগে থেকে বেশি স্পষ্ট, অর্থাৎ ঘটনাটুকুর সঙ্গে সে-অংশটার বেশি সম্বন্ধ। আসানসোলে ঘুমটা পাতলা হয়ে গেল। কে একজন উঠল গাড়িতে, সুকুমার জড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করলে—

"কোন্ স্টেশন?"

"আসানসোল।"

"আসানসোল?···টাইমে এল?"

"না, একঘণ্টা লেট।"

"বেড়েই গেল! বর্ধমানে ছিল তিন কোয়ার্টার।··· আজ একটা কাণ্ড না করে···"

হাওড়াতেই কুড়ি মিনিট দেরি হয়ে যায়; ড্রাইভারটা ইয়ার্ড থেকে বেরিয়েই প্রাণপণ চেষ্টা লাগিয়েছে। হাওড়া—বর্ধমান কর্ড, ফাঁকা লাইন, তবুও কিন্তু ক'বারই সিগনালের প্রতিকূলতা গেল। মত্ত বেগে ছুটে আসতে আসতে ইঞ্জিনটা পাথার লাল আলোর সামনে নিরুপায়ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে আর গর্জায়। যাত্রীদের পর্যন্ত কেমন একটা গতির নেশা লেগেছে, মুখ বাড়িয়ে থাকে উৎসুক দৃষ্টিতে। অন্ধকার আকাশের গায়ে লালটা নিভে গিয়ে পাথার নীলটা জেগে ওঠে, গাড়ি চলতে আরম্ভ করে, একটুখানির মধ্যেই আবার সেই অন্ধ গতিবেগ, স্টেশনের পর স্টেশন ছিটকে পেছনে বেরিয়ে যাচ্ছে, দেরির ওপর দেরি-করিয়ে এরা সব যেন ইঞ্জিনটাকে দিয়েছে ক্ষেপিয়ে; গাড়ি দুলে দুলে উঠছে, চাকাগুলা মনে হয় লাইন ছেড়ে উঠে পড়ল। তারপর পাগলামি যখন চরমে উঠে এসেছে, আবার লাল আলো; ক্ষিপ্ত কণ্ঠে অভিশাপ দিতে দিতে ইঞ্জিনটা মাঠের মধ্যে থেমে পড়ল।

একজন বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতাতেই গোড়ায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, জেগে উঠে বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গেই গুটিসুটি মেরে বসে আছেন।

প্রশ্ন করলেন—"ইষ্টিশান?"

"না, মাঠ; সিগনাল পায়নি।"

বৃদ্ধ একটু চুপ করে রইলেন। তারপর ড্রাইভারকে উপলক্ষ করে কতকটা নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে বললেন—"লাইন ক্লিয়ার না থাকলে তো ঢুকতে দিতে পারে না। তা যখন পৌছুবি, তোর এত মাথা-ব্যথাটা কিসের রে বাপু?"

একজন বললে—"অনেক সময় বেতর নেশা করে ওঠে এরা ইঞ্জিনে, অনেক দুর্ঘটনার গোড়ার কথা তাই···"

আলোচনাটা সবার মনের আতঙ্কেই যে আর এগুল না, এটা বেশ বোঝা যায়।

বর্ধমানে কুড়ি-মিনিটটা তিন কোয়ার্টারে দাঁড়াল। তারপর সুকুমার কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছে, ঝাঁকানির অভ্যাসে কি ঝাঁকানির ক্লান্তিতে ঠিক বলা যায় না, হয়তো দুই-ই, তার সঙ্গে ছিল গভীরতর রাত্রি।

আসানসোলেও ঐ ক'টি কথার পর আবার পড়ল ঘুমিয়ে। তারপর এই ঘুম ভেঙেছে।

একটা প্রচণ্ড শব্দ। স্বপ্নের মধ্যে গাড়ির গতিবেগের যে-শব্দটা একটা আলোড়ন তুলে রেখেছিল সেটা যেন মুহূর্তের মধ্যে হাজারগুণ হয়ে ফেঁপে উঠল, তারপরেই সেই একটা হুঙ্কার হাজার কণ্ঠের হাহাকারে টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে পড়ল। সুকুমার জেগে উঠল একেবারে একটা নূতন জগতে।···ঘূর্ণমান জগৎ নাকি?—কেননা সে জাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরল এক পাক এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরের আবরণটা একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গিয়ে তারায় ভরা নৈশ আকাশ উঠল জেগে। সেই আকাশ লক্ষ্য করে ছুটেছে খণ্ডিত হুঙ্কারের সেই হাজার হাজার হাহাকার।···অসহ্য বেদনা···কোথায়?···কেন?···পিঠের নিচে কি সব কিলবিল করে কেন?···পাঁচটি মোটে ইন্দ্রিয়, অথচ কত বিচিত্র কি সব যে অনুভূতি!—সব উগ্র, আর যেন একটি মুহূর্তের মধ্যে ঠাসা···ঠিক গুছিয়ে ধরা যায় না।···তারপর আর একটা জগৎ, বুদ্ধি আসছে ফিরে—বুঝতে পারলে গাড়ি লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। জানাই—পড়বে, পড়তে বাধ্য। গাড়ি কাৎ হয়ে দেয়াল আর ছাতের জোড়ের কাছটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে মাথার ওপর। পিঠের নিচে কিলবিল করে মানুষ! জন পাচেক যাত্রী ছিল এ গাড়িটায়, সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে, গাড়িটার একটা অংশ তুমড়ে গিয়ে যে একটা ডোঙার মতো হয়ে গেছে, তারই মধ্যে। শুধু মানুষ নয়, যত মালপত্র; তাই কিলবিলানিটা নরম হয়ে আসছে। সুকুমার পড়েছে সবার ওপর।

সারা গায়ে বেদনা; কিন্তু সে জন্য নয়, বিরাট একটা ধ্বংসের অনুভূতির যে মোহ আছে তারই ঘোরে সুকুমার চুপ ক'রে রইল প'ড়ে। নিশ্চয় বেশিক্ষণ নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধ'রেই আছে পড়ে—ঐ তারায় ভরা আকাশ কত আর্তনাদ যে কত যুগ ধ'রে নিজের অন্ধকারের মধ্যে লুপ্ত করে ফেলছে!···

তারপর প্রকৃত হুস হোল, ডাক্তারের সহজ বোধ নিয়ে ঘোরটা থেকে জেগে উঠল সুকুমার। উঠে বসল; শব-সাধনা করার মতো সে বৃদ্ধের দেহের ওপর বসে আছে। শব-সাধনাই, কেননা তার শরীর মৃত্যু-হিম, পায়ের উল্ট পিঠ দিয়ে অনুভব করছে সুকুমার। আরও নিচে থেকে একটা ক্ষীণ আওয়াজ উঠে আসছে। সুকুমার সচকিত হয়ে উঠল, ও লোকটা বেঁচে আছে!—তবে আর বেশিক্ষণ নয়—কিছু করা যায় না?···ভেতরটা একেবারে অন্ধকার, তবু হঠাৎ উৎসাহের ঝোঁকে উঠে পড়ে বৃদ্ধের শরীরটা সমস্ত শক্তি দিয়ে পাঁজা করে তুলে ধরলে—ওপরে ভাঙা ছাত বেয়ে বাইরে ফেলে দেবে, এই রকম একটা একটা করে মোটঘাট পর্যন্ত সব।···ডাক্তার জেগে উঠেছে, কান্নাটাকে খুঁড়ে বের করতে হবে, বাঁচাতে হবে লোকটাকে।···বৃদ্ধকে তুলে ধরতেই নিচে চাপ পড়ে মোটঘাট, ভাঙা তক্তা, লাস—সবগুলো আরও গেল নেমে, কান্নাটা মিহি হতে হতে থেমে গেল, বর্দ্ধিত চাপে পিষ্ট হয়েই গেল বলা যায়।

ভুল হয়ে গেছে, তবে অনুশোচনা হয় না ভুলের জন্য, করতই বা কি বের করে—মৃত্যুর একেবারে দোর থেকে টেনে এনে?—ওষুধ নেই, নিতান্তই ফার্স্ট এডের দু'একটা যা থাকে সব ডাক্তারের ব্যাগেই, তাও কোন্ অতলে কে জানে?

দুটা তক্তা দুদিক দিয়ে এমন ঢালু হয়ে নেমে এসেছে যে ছাতে ওঠা দায়—বেরুবার যা একমাত্র পথ। অন্ধকারে হাতাড় হাতড়ে মোট-মানুষ একজায়গায় জড়ো করে তার ওপর উঠে সুকুমার ছাতে পৌছুল, তারপর আন্দাজে আন্দাজে কি সবের ওপর পা দিয়ে দিয়ে বাইরে নেমে এল।

নেমে এসে দাঁড়াল লাইনের উঁচু বাঁধটার বেশ খানিকটা নিচের দিকে। অন্ধকারে চোখ অনেকটা সয়ে এসেছে। কী বীভৎস দৃশ্য! ওদের গাড়িটা প্রায় ট্রেণের মাঝামাঝি, ইঞ্জিন থেকে এ পর্যন্ত সমস্তটা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ইঞ্জিনটা ছিটকে বাঁধের নিচে গিয়ে পড়েছে, চাকাগুলা ওপরে, ফায়ারবক্সে আগুন এখনও দাউ দাউ করে জলছে; তার রাঙা আলোটা সামনের ধ্বংসস্তূপের ওপর নাচছে যেন একটা বিরাট তাণ্ডবে। সব পেছনের মাত্র দু'খানি গাড়ি লাইনের ওপর আছে দাঁড়িয়ে, তার আগের সবগুলাই টাল খেয়ে লাইন থেকে নেমে গেছে কম-বেশি ক'রে। মাঝখানের একটা কি ক'রে একেবারেই কয়েকটা পাক খেয়ে বাঁধের একেবারে নিচে চলে গেছে, মাঝামাঝি একটা জায়গা খালি ক'রে।

ঐ অন্ধকারের মধ্যেই ছুটাছুটি, হাঁকাহাঁকি, খোঁজাখুঁজি। আর্তনাদে কান পাতা যায় না। মুমূর্ষুর গোঙানি—জল! জল!·····পানি দেও!·····সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকছে, যতই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না, আতঙ্কে, নৈরাশ্যে গলা যাচ্ছে চিরে। বৃদ্ধ গোছের একজন হন্তদন্ত হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে চাইতে সুকুমারের কাছে এসে একেবারে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। উৎকণ্ঠায় চোখ দুটো জ্বলছে কোটরের মধ্যে; শুধু বললে—"কৈ, এ না তো; কোথায় গেল তা'হলে? কি হোল?"······হন্তদন্ত হয়ে আবার চলে গেল।·····কত করবার আছে, কিন্তু আরম্ভ করে কোথায় সুকুমার? এগিয়ে গেল সামনের ধ্বংস স্তূপটার দিকে। মানুষের এ রকম বিকৃত অঙ্গ দেখেনি কখনও; ডাক্তারির ছাত্র হওয়া সত্বেও, এক সময় কত রকম দুর্ঘটনার কেস্ তো ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয়েছে।·····একটা লোক জ্যান্ত, তাঁর চোখের উগ্র কাতর দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হয়েই সুকুমার দাঁড়াল। কোমরের নিচেটা একরাশ লোহা আর কাঠের মধ্যে চাপা; টেনে বের করতে ডান-পায়ের আধখানা ভেতরেই রয়ে গেল; লোকটার দৃষ্টিও সেই সঙ্গে গেল নিভে।···সুকুমারের মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবে এ আবেষ্টনীর মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলে, হয়তো শুধু এই জন্যই যে, এত করবার আছে অথচ কোন উপায় নেই। ভেতরের ডাক্তার ওকে টেনে রাখতে চাইছে, মনটা কিন্তু আইটাই করছে, এখান থেকে মুক্তি পেলে বাঁচে।

এমন সময় ধ্বংসস্তূপের একটা আড়াল ছাড়িয়ে দাঁড়াইতেই দূরে দিকচক্রের এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। সিগনালের নীল আলো, গাড়িটার প্রতীক্ষায় বহু দূরে আকাশের কোলে রয়েছে জেগে।

মুক্তি পেলে সুকুমার, ভেতরের ডাক্তারকে ক্ষুণ্ণ না করেই। সত্যই তো, আগে গিয়ে স্টেশনে যে খবর দিতে হবে। যদি ছোট স্টেশন হয় তো ওরা আবার পাশের বড় স্টেশনে দেবে খবর, সাহায্য নিয়ে গাড়ি আসবে—ওষুধপত্র, লোকজন, তারপরে তো পারা যাবে কিছু করতে।··· অন্তরের সঙ্গে বাইরের রফা হোল।

বাঁধ থেকে আরও খানিকটা নেমে সুকুমার সোজা চলল, গাড়ির বিকট দৃশ্যটা সাধ্যমতো এড়িয়ে, ইচ্ছে করেই আর চাইছ না ওদিকে। ইঞ্জিনটা পেরিয়ে আবার বাঁধের ওপর উঠে পড়ল। পাহাড়ে অঞ্চল, কোন্‌খানটা বোঝবার উপায় নেই, তবে লাইনটা সামনে-পেছনে দুদিকেই ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে; তার মানে বেগমত্ত গাড়িটা ওৎরাইয়ের মুখে আর টাল সামলাতে পারে নি। সামনের চড়াই ঠেলে উঠতে লাগল সুকুমার, এদিকটা খুব খাড়া নয়, অন্ধকারে চোখ বেশ ভালো রকমই সয়ে এসেছে; ছুটতে লাগল। নীল আলোটাকে লাগছে বড় মিষ্ট; স্নিগ্ধ, অবিচল, চোখ দুটো যেন জুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু অনেকটা দূর; দুইটা পাহাড় দুইদিক থেকে এসে লাইনের অবকাশটুকু হয়েছে গলির মতো, তারই একটা বাঁকের মুখে সিগনালের ঐ আলোটা। ডিস্‌টেণ্ট অর্থাৎ বাইরের সিগনাল, স্টেশনটা তাহলে ও থেকেও আধ মাইল দূরে হবে।

খানিকটা এগিয়ে একবার চোখ তুলে দেখলে আলোটা কখন্ নীল থেকে লাল হয়ে গেছে। ওরা তাহলে টের পেলে নাকি?

পৌঁছে দেখলে স্টেশন নয়—একটা ছোট আড্ডা, রেলের ভাষায় বলে হল্ট্। পাহাড়ে জায়গা—স্টেশন সেখানে বহু দূরে দূরে, সেখানে মাঝে মাঝে এইরকম এক একটা হল্ট বসানো থাকে একটা লোকের চার্জে, সে সিগনাল দিয়ে গাড়ির গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে, স্টেশনে খবর চালান্ দেয় টেলিফোনযোগে। একটা নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হোল। সে অনেকক্ষণ আগে জানতে পেরেছে—আওয়াজ শুনলে, বেরিয়ে দেখে সার্চলাইট নেই, তারপর গাড়ি আসতেও দেরী হতে লাগল। স্টেশনে টেলিফোন করে দিয়েছে, দুদিকেই লাল আলো জ্বালিয়ে দিয়ে। জায়গাটা ঝাঝা আর শিমুলতলার মাঝামাঝি।

বললে তার উপায় নেই হল্ট ছেড়ে যাবার। সব ভগবানের মর্জি। বুঝিয়ে দিলে লাইনই যখন, তখন গাড়ি চলবেও, আবার ডিরেলও হবে। কলিশনও হবে। যেমন মানুষের জিন্দগি, ভোগও আছে, আবার মৃত্যুও আছে। সুকুমার যখন পৌঁছল, সে নিশ্চিন্ত স্বরে রামায়ণ পাঠ করছিল।

ফিরল সুকুমার। সাহায্যের গাড়ি আসতে আসতে সেও যেন আবার পৌঁছে যেতে পারে ঘটনাস্থলে। একটা

ঝোঁকের মাথায় এসেছিল, মাঝে মাঝে ছুটেই, সে-ঝোঁকটা কেটে গিয়ে আবার শরীরে মনে ক্লান্তি ছেয়ে আসছে, আরও অনিবার্যভাবেই। ক্লান্তিটা অনুভব করছে বলেই হাওয়াটা লাগছে বড় মিষ্ট—হালকা, কনকনে পাহাড়ে হাওয়া। শুধু তাই নয়, অতবড় একটা ট্রাজেডি প্রত্যক্ষ করেছে বলেই পাহাড়ের স্নিগ্ধ পরিবেশে রাত্রির এই অপরূপ শান্তি অবসর পেয়ে ওর মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগল।··· এইটেই টানছে, একটু আগে ট্রাজেডির ভীষণতাটা যেমন ভাবে টেনেছিল; ক্রমে যেন তার চেয়েও বেশি ক'রে। এগুতে ইচ্ছা করছে না, শুধু ক্লান্তির জন্য নয়, সারা মনটাই কেমন যেন গুটিয়ে আসছে।···একটা পুল পেলে, ছোট্ট একটা পাহাড়ী ঝরণার ওপর, একটু দাঁড়িয়ে কি ভাবলে সুকুমার, তারপর খানিকটা নেমে এই এসে বসেছে।

দুই

জায়গাটা সত্যই চমৎকার। রেলবাঁধের নিচে থেকে জঙ্গল আরম্ভ হয়ে সেটা ডাইনে বাঁয়ে আর সামনে একটা বিরাট পরিধি নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আরও দূরে, আকাশের কোলে একটা পাহাড়ের স্তূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সমস্ত জঙ্গলটাকে রেখেছে ঘিরে, দৈর্ঘ্যে সবটা বোধহয় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইলেরও বেশি। সমস্ত জায়গাটা নিঃশব্দ; এইটিই যেন তার স্বধর্ম, তাই দূর থেকে যে-আওয়াজটা ভেসে আসছে—আর্তনাদের, সেটাকে অপঘাতের মতো আরও কর্কশ বলে মনে হচ্ছে।

সুকুমার সামনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। অন্ধকারে চোখ ঠেলে ঠেলে সামনের মসীলিপ্ত বিরাট গ্রন্থ থেকে কি একটা যেন পাঠোদ্ধার করবার চেষ্টা করছে। যে-জীবনটাকে এত সত্য বলে মনে হচ্ছিল, একটা ক্ষণিকের প্রলয়ে তো দেখা গেল সেটা কত মিথ্যা। এই মিথ্যার জন্যই কত ত্রুটি, স্খলন, কত গ্লানি; আবার গিয়ে একেই ধরবে আঁকড়ে?···শ্মশান-বৈরাগ্য বলে যে একটা জিনিস আছে, আসলে সেইটাই সুকুমারের মনকে করেছে অধিকার; শুধু এইটুকু প্রভেদ যে আজকের শ্মশানটাও ছিল বিকটতম, তাই বৈরাগ্যটাও তেমনি অতল গভীর। মনটা হয়ে উঠছে নরম, উদাস, উদার। একটি প্রশ্নই জটিলতর হয়ে বারে বারে আসছে ফিরে—সুকুমার বুঝতে পারছে না। সামনে ঐ ঘন অরণ্যের মধ্যে নেমে গিয়ে এ-সবের সম্ভাবনা থেকে নিজেকে চিরতরে আলাদা করে দেবে, কি ফিরেই যাবে স্খলন-ত্রুটি-গ্লানিতে ভরা ঐ মিথ্যার মধ্যে। ঐ যদি হয় মানুষের অদৃষ্ট—তো নির্বিচারে মেনে না নিয়ে উপায় কি?

চিন্তায় ক্লান্তি আসছে বলে সুকুমার জোর করেই তাকে ঠেলে সরিয়ে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ গেল। একবার ঘড়িটার দিকে হাত উলটে দেখলে, নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবেই। এই প্রথম দেখলে। ঘড়িটারও অপমৃত্যু হয়েছে, বন্ধ হয়ে গেছে একটা বেজে। নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু খালি পেয়ে সুকুমারের মনে যে স্তব্ধতার সমতান জেগে উঠছিল তাতে সে আর একটি সুর সংযুক্ত হোল। এই রাত্রি, এই জনহীন অরণ্য, এই নিকষের মতো অন্ধকার, যার গায়ে কোনখানেই একটু আলোর রেখাপাত নেই—এই সবের পাশে সময়ও যেন হঠাৎ গতিহীন হয়ে পড়ল দাঁড়িয়ে। মৃত্যুর গহ্বর থেকে উঠে এসে সুকুমার মৃত্যুর চেয়েও রহস্যময় কিসের সামনে এসে পড়েছে।

ক্রমে অনুভব করলে এ তারই জীবন। আজকের এই মৃত্যুস্রোতে, পরম বেদনার মধ্যে যে তার তীর্থস্নান হোল এটা বুঝতে পারে নি সুকুমার। তারই জীবন; নূতন রূপের রহস্যেই তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বলে তাকে চেনা যায় নি।

নব জন্মের আনন্দেই আরও অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। শেষ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার এক সময় যেন নিবিড়তম হয়ে উঠে আস্তে আস্তে আবার স্বচ্ছ হয়ে আসতে লাগল; বুঝলে পাহাড়ের আড়ালে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাত্রিরও নবজন্ম। বড় অপূর্ব লাগছে, বাইরের সুরের সঙ্গে মনের সুর আছে মিলে। সমস্ত পৃথিবীটারই রূপ ধীরে ধীরে যাচ্ছে বদলে।

সুকুমার পারবে। জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। স্বার্থে, লোলুপতায় যে-জীবনে গ্লানি এনে ফেলছিল, কর্মে সেবায় সেই জীবনকে আবার সার্থক করে তুলবে।···ধীরে ধীরে সেই সার্থক জীবনের পুণ্যচ্ছবি তার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আজ থেকেই যাত্রার আরম্ভ। যার বিধানে সামনে এই বিপুল শান্তি, তাঁর বিধানেই তো

ঐ বিরাট ধ্বংস; তাঁরই যখন আহ্বান, কাপুরুষের মতো জ্ঞান-বধির হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকবে সে?

এক সময় উঠে পড়ল; চিন্তার মধ্যে সময়ের ঠিক আন্দাজ রাখতে পারে নি, তবু নিশ্চয় বেশই দেরি হয়ে গেছে। এখনি সাহায্যের ট্রেণটা নিশ্চয় পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। পুলের পাড় বেয়ে অনেকটা নেমে এসেছিল, কয়েকবার পা ফসকে ফসকে তাড়াতাড়ি উঠে এল; দু' এক জায়গায় গেল ছড়ে, গ্রাহের মধ্যে আনলে না।

ওপরে উঠে এসে হঠাৎ একটু দ্বিধায় পড়ল; কোন্ দিকে যাবে?—দক্ষিণে, না, উত্তরে হন্টটার দিকে? হন্টে গেলে খোঁজ পেতে পারে সাহায্য-ট্রেণটা রওয়ানা হয়েছে কিনা, কিম্বা কখন্ এসে পড়বে।···নিরুপায় ভাবে দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসের দৃশ্য দেখাও তো যন্ত্রণা। তেমনি আবার গাড়িটা যদি ইতিমধ্যে এসে পড়ে তো বৃথা সময় নষ্টও তো। তার পর মনে হোল হন্ট্ম্যান গাড়িটা একটু রুখে দিতেও তো পারে; একজন ডাক্তার সাহায্যে যোগদান করবার জন্য অপেক্ষা করছে জানলে ওরা আপত্তি নাও করতে পারে। আর, আজ সবই তো নিয়মের ব্যতিক্রম।

আর বেশি তর্কের দিকে না গিয়ে হন্টের অভিমুখেই পা বাড়াল; এমন কিছু দূরেও নয়।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রামায়ণ পাঠে বাধা পড়ল। খবর পেলে এখনও খানিকটা দেরি আছে গাড়ি আসতে।

আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে সুকুমার ঘুরে দক্ষিণ মুখো হোল। পাঁচ-সাত পা যেতে না যেতেই রামায়ণের সুর উঠল। আবার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল, পেছন থেকে ডাক পড়ল—"বাবুজী!"

সুকুমার ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়াল। হন্টম্যানটা বেরিয়ে এসেছে।

"কি?"

"একঠো মাইয়ালোক এসেছে; বাঙ্গালীন, ভোদ্দোর লোক।"

বেশ ভালো ক'রে ঘুরে দাঁড়াল সুকুমার।

ভদ্র ঘরের বাঙালী মেয়ে! কোথায় আছেন? চোট-ফোট লেগেছে নাকি? ওখান থেকেই আসছেন?

"না, চোট না আছে, আপনি আসেন না, দেখবুন।"

বেশ উৎকণ্ঠিত ভাবেই পেছনে পেছনে চলল সুকুমার।

হন্টের একটু দূরেই একটা ছোট ঘর, খুবরি বললেই হয়। রেলের দিক থেকে বোধ হয় তৈয়ার করাও নয়, হন্টম্যান নিজের প্রয়োজনে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে করে থাকবে। ভেতরে একটা টেমি জলছে। তারই আলোয় সামনে একটা দড়ির খাট দেখা যায়; হয়তো মেয়েটি তার ওপর বসেছিল, এরা যখন পৌছাল, ঘরের মুখটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ততক্ষণে জ্যোৎস্নাও খানিকটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মেয়েটির বয়স তেইশ-চব্বিশ বছর হবে। বেশ সুন্দরী, তবে মনে হোল রংটা হয়তো একটু ময়লা। সাজ-সজ্জায় মনে হয়, রুচিও আছে, সামর্থ্যও আছে; অর্থাৎ সব দিক দিয়ে এক নজরে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো মেয়ে।

কিন্তু তার নিজের দৃষ্টি একটু অদ্ভুত ধরণের। উঠে এসে দাঁড়িয়েছে, হয়তো বা ছিলই দাঁড়িয়ে, কিন্তু চোখে কৌতূহল, প্রশ্ন বা অভিনিবেশের কোন চিহ্ন নেই, কেমন যেন শূন্যলগ্ন। ডাক্তার সুকুমার খুব বিস্মিত হোল না, ব্যাপারখানা যা হয়ে গেল তাতে আজ অনেকেরই চৈতন্য নষ্ট হয়ে গিয়ে দৃষ্টি এই রকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যাবার কথা। সুকুমার হন্টম্যানের পেছনে ছিল, সামনে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনি ওখান থেকে আসছেন?—ঐ কলিশনের জায়গা থেকে?"

"হ্যা, কলিশন নয় তো, গাড়িটা ডিরেল হয়ে গেছে।"

সুকুমার একটু থতমত খেয়ে গেল, শুধরে নিয়ে বললে—"ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল, ডিরেলমেণ্ট্ই।···ওখান থেকেই আসছেন তাহলে—ঐ গাড়িতেই ছিলেন?"

"হ্যা।"

মুস্কিলে পড়া গেল, আর কথা এগোয় না; প্রশ্ন করতে গিয়ে কোন্ মর্মন্তুদ স্মৃতিতে ঘা দিয়ে আবার সেটাকে জাগিয়ে তুলবে! প্রথম উত্তরটায় উন্মাদের লক্ষণ না পেলেও, দৃষ্টিটা বেশ সহজ বোধ হচ্ছে না তো।

মেয়েটি নিজেই বলে গেল—"ঐ গাড়িতেই ছিলাম একটা ফার্ষ্ট ক্লাসে। একটা শক লেগেছিল, কিন্তু···"

একটু যেন মনে করবার চেষ্টা করলে, তারপর—"কিন্তু তেমন কিছু নয়। জিনিসগুলো অবিশ্যি খুঁজে পেলাম না—হোল্ডঅল আর সুটকেসটা।"

একটু মনে করে ক'রে দিলেও বেশ সুসংলগ্ন বিবরণই।

সুকুমার বেশ সাহস পেল প্রশ্ন করতে, তবে বেশ সাবধানেই অগ্রসর হোল—

"একলাই চলে এসেছেন…এই এতটা পথ ?"

"হ্যাঁ, একলাই ছিলাম।"

নিশ্চিন্ত হোল সুকুমার। এর পর কি ভাবে অগ্রসর হতে হবে, ভেবে নিলে, প্রশ্ন করলে—"বাড়িতে আছেন কে ?…মানে, কাকে খবরটা দেওয়া যায় ? আমার মনে হয় এখান থেকে ফোন্ করা চলবে—জংশন স্টেশনে, তারপর তারা জানিয়ে দেবে…ঠিকানাটা কি ?"

আশা করছিল ভরসার কথাগুলো শুনে ওর মনে যেটুকু আতঙ্কের জড়তা লেগে আছে সেটুকু কেটে যাবে ; কিন্তু ফল হোল উল্ট। মেয়েটি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইল এবং চোখের ভাবটা আগেকার চেয়েও বিহ্বল আর শূন্যময় হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে এমন একটা দীপ্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে যাতে মনে হয় ভেতরে ভেতরে কিসের একটা অমানুষিক চেষ্টা চলছে মস্তিষ্কের মধ্যে। একটু পরে হতাশ হয়ে প্রশ্নে-উত্তরে জড়িয়ে বললে—"বাড়িতে ?…জানিনা তো কে আছে…"

সুকুমার আবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল, চোখে কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছে, প্রশ্ন করলে—"ঠিকানাটা ? কোন্ ঠিকানায় জানাব ?"

ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়েই রইল, কোন উত্তর নেই, স্মৃতিটা আলোড়ন করে দেখবার শক্তিটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে। সুকুমারের সন্দেহটা গেছে মিটে, রোগ যে কোথায় ধরতে পেরেছে—হঠাৎ একটা প্রবল সংঘর্ষে স্মৃতির একটা প্রকোষ্ঠই গেছে নষ্ট হয়ে, একটা সীমারেখার পর থেকে সমস্ত অতীতটা ওর জীবন থেকে গেছে মুছে। তবুও দু'একটা প্রশ্ন করলে—

"কলকাতা থেকে আসছেন ?…চড়েছেন কোথায় ?"

কোন উত্তর নেই। সুকুমার একটু দ্বিধায় পড়ল, তবে ডাক্তারের মন দিয়ে সেটা সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়ে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—"আপনার নাম ? মানে রেলের লোকেরা হয়তো জানতে চাইবেন, তাই…"

এটা যেন অনেকটা হাতের কাছের জিনিস, মেয়েটির দৃষ্টিতে আবার চেষ্টা করবার ভাবটা ফুটে উঠল একটু। কিন্তু ফল হোল না। শেষে হঠাৎ সেই দৃষ্টিতে একটু বুদ্ধির দীপ্তি জেগে উঠল, ব্লাউসের ভেতর থেকে রুমালটা বের করে একটা কোণের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সুকুমারও এগিয়ে গেল। রাঙা ক্রচেটের সুতায় একটা ইংরাজী "S" অক্ষর লেখা।

সুকুমার একটু সময় দিলে, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"সুনন্দা ?"

"না তো।"

"সুচেতা ?"

মাথাটা ধীরে ধীরে নাড়লে শুধু, চারটে আঙুলের ডগা দিয়ে কপালটা একটু ঘষলে। সুকুমার 'স' দিয়েই নাম বললে—"সরলা ?"

তাও না।

"সরমা ?"

মুখে নিশ্চিন্ততার অল্প একটু হাসি ফুটে উঠল, বললে—হ্যাঁ, সরমা—সরমা—সরমা সেনগুপ্তা।"

সুকুমারের মনে হোল মস্তিষ্কের ওপর আর বেশি চাপ দেওয়া ভুল হবে।

এই সময় লাইনে যেন একটা ক্ষীণ শব্দ উঠল। হন্টম্যান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তখনই ঘুরে এসে বললে—"গাড়ি পহুঁছে গেল, সার্চলাইট দিখাই দিচ্ছে।

সুকুমারও সচকিত হয়ে উঠল, জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে একবার দাঁড় করাতে পারবে ? আমি ডাক্তার, গেলে কাজ হবে।"

তারপর উগ্র তাড়াহুড়ার মধ্যে অত কিছু না ভেবেই মেয়েটির পানে চেয়ে বললে—"আপনিও যাবেন না হয় ?"

"না ! না !—ওখানে নয় !!"

—দারুণ আতঙ্কে চোখ দুটো যেন ঠেলে আসছে, যেন আগলে রাখবার জন্যেই সুকুমারের চেয়ে দু'পা এগিয়ে গিয়েই বললে—"আপনিও যাবেন না…শুনেছি ওরা মেরে ফেলে যারা বেঁচে আছে তাদের !"

—শেষের কথাগুলো বললে বোধ হয় নিজের অসহায়তাকে ঢাকবার জন্যেই ; ভয় দেখালে যদি কার্যসিদ্ধি হয়, সুকুমার না যায়।

সুকুমার অন্যরকম ভয়ে শান্তকণ্ঠে বললে—"না, আমি যাচ্ছি না ; আপনি চঞ্চল হবেন না মোটেই।"

(ক্রমশঃ)

মহাকবি কৃত্তিবাস

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফেরঙ্গ সভ্যতার নাগপাশ আমাদের জাতির শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করেছিল। আমাদের কুটীর শিল্পগুলি ধ্বংস হ'তে বসেছিল, আমাদের গ্রামগুলি শ্মশানে পর্য্যবসিত হ'য়েছিল। এখনও যে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে—এমন কথা বলা চলে না। কিন্তু পাশ্চাত্য পারে নি আমাদের জাতির আত্মাকে বিনষ্ট করতে। জাতি যুগ যুগ ধরে যে সকল আদর্শকে অন্তরের মণিকোঠায় সযত্নে লালন ক'রে এসেছে সেগুলিকে ভুলে গেলে আমাদের নবজীবনলাভের আর কোনই আশা থাকতো না।

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে জাতির বাহিরের চেহারার মধ্যে তার আত্মারই অভিব্যক্তি। আমরা অন্তরের গভীরে যে স্বপ্নকে লালন ক'রে থাকি আমাদের বাহিরের জীবনে সেই স্বপ্নই কি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না? সৌন্দর্য্যকে যে ভালোবেসেছে সে কখনও নোংরা আবেষ্টনীর মধ্যে আনন্দে বাস করতে পারবে না। আমাদের দেশের মফঃস্বলের সহরগুলির কি নিদারুণ অবস্থা! নর্দ্দমার দুর্গন্ধে পথ চলা দায়। মাঝে মাঝে আবর্জ্জনার স্তূপ। পায়খানাগুলো নরককুণ্ড হয়ে আছে। সহরের হাওয়াকে সর্বক্ষণের জন্য বিষিয়ে দিচ্ছে। সদর রাস্তার উপরে মদের দোকান। মাতালেরা মদ খেয়ে মাতলামি করছে। সহরগুলির এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কি সহরবাসীদেরই বুদ্ধির এবং সৌন্দর্য্যবোধের দীনতা প্রকটিত হচ্ছে না? বুদ্ধিমান লোক এই রকমের একটা ছন্দহীন এলোমেলো ব্যবস্থাকে মেনে নিতে কিছুতেই রাজী হবে না। আমাদের গ্রামগুলির অবস্থাও তথৈবচ। লোকেরা পথ-ঘাট বিষ্ঠায় বিষ্ঠায় নোংরা ক'রে রেখেছে। রাস্তা ঘাটে বর্ষাকালে চলবার উপায় নেই। গ্রাম্য আবহাওয়া এমন যে কদর্য্য হ'য়ে আছে—এর মূলে রয়েছে গ্রামের লোকেদের মনের জীবনের অপরিসীম দারিদ্র্য। সেই জীবন এখনও তমসাচ্ছন্ন হয়ে আছে। দেশের মানুষগুলির শরীর ও মনকে রুগ্ন রেখে জাতিকে বড় করতে পারবো—এমন একটা বিদ্ঘুটে ধারণাকে আমরা যেন মনের মধ্যে পোষণ না করি। দেশকে মহিমান্বিত করতে হ'লে মানুষগুলিকে আগে বরণীয় করতে হবে। মানুষগুলির চরিত্রে পরিবর্ত্তন আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সভ্যতার চেহারাও বদলে যাবে, গ্রামগুলি রূপান্তরিত হবে, গৃহগুলি মনোরম হ'য়ে উঠবে। আর মানুষের চরিত্রকে রূপান্তরিত করার উপায় তার মনের জীবনকে নূতন ছাঁদে গড়ে তোলা, তার চিত্তলোকে মহৎ আদর্শগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করা, তার অন্তরে যুগান্তকারী ভাবধারা বইয়ে দেওয়া।

এই কাজটী সুসম্পন্ন করতে হ'লে যাঁরা কবি, যাঁরা বৈজ্ঞানিক, যাঁরা চিন্তাবীর—তাঁদের শরণ আমাদের নিতেই হবে। কেবল রাজনীতির ক্ষেত্রের মহারথীদের দিয়ে নূতনতর বিশালতর ভারতবর্ষকে রচনা করা কখনই সম্ভব নয়। আজিকার তমসাচ্ছন্ন পটভূমিকায় মহাকবিদের স্মরণ করবার একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য্য আছে। যাঁরা কবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি-পূজার আয়োজন করেছেন তাঁদের উদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। জাতির লক্ষ লক্ষ নরনারীর পক্ষ থেকে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে একটা বিরাট উন্মাদনার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা গণবিপ্লবের প্রচণ্ড গদাঘাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের লৌহ-দুর্গকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছি। তখার এই উন্মাদনার প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। প্রগতির প্রথম সর্ত্ত হোলো যার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তাকে ধ্বংস করা। ধ্বংস ভিন্ন নব সৃষ্টি অসম্ভব। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকেও ধ্বংস করবার প্রয়োজন ছিল, আর সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে সিদ্ধ করবার জন্য গান্ধীজী বিপ্লবের পথে ডাক দিয়েছিলেন তাদের যাদের হৃদয় ছিল সিংহের মতো নির্ভীক। সে দিনের ঝড়ের রাতে প্রয়োজন ছিল পাণ্ডিত্যের ততখানি নয় যতখানি সাহসের। গান্ধীজী বলেছিলেন, একজন ভীরু ব্যবহারজীবীর চেয়ে একজন সাহসী চর্ম্মকার শ্রেয়ঃ।

আজ পট-পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজ দিন এসেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চিতাভস্মের উপরে রামরাজ্যের আকাশচুম্বী সৌধ রচনা করবার, আর এই সৌধ রচনা করতে হলে দরকার তাঁদেরই বেশী ক'রে—যাঁরা গণমানসকে নব নব ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধিশালী ক'রে তুলতে পারবেন, জাতীয় চৈতন্যকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবেন বিরাট বিরাট আদর্শের নবারুণজ্যোতিতে। জাতির অন্তরলোকে আমরা যদি নূতনতর ভাবের রাজ্য রচনা করতে না পারি আমাদের রাজনৈতিক বাদানুবাদ, আমাদের নানাবিধ 'ইজ্‌মে'র কচ্‌কচি, আমাদের সমরসজ্জার আড়ম্বর কোনখানে আমাদিগকে পৌঁছে দিতে পারবে না, আমাদের কনষ্টিটুশন উৎকৃষ্ট হ'লেও তার দ্বারা আমাদের জাতির কোন উন্নতি সম্ভব হবে না। এই ভাবরাজ্য রচনা করবার বায়না নিয়ে আসেন যাঁরা বিধাতার কাছ থেকে—তাঁরা কবি, তাঁরা ভাবুক, তাঁরা শিল্পী।

ভাবাবেগের আতিশয্যে তাণ্ডার-যুগকে অতিক্রম করে আমরা নবসৃষ্টির যুগান্তরের তোরণদ্বারে আজ উপনীত হয়েছি। আমাদের রাষ্ট্রতরণীর হালকে কতকগুলি রাজনীতিবিশারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা আজ জাতিকে উন্নত দেখবার নিশ্চিত বিশ্বাসে যদি নিশ্চিন্ত থাকি, আমাদের রাষ্ট্র যদি বৃহৎ নৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত না হয়, শুভবুদ্ধির আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে না ওঠে—এতকালের এত শহীদের আত্মদান ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমাদের স্বরাজের শিব দেখবার কামনা অরাজকতার বাঁদর দেখার নৈরাশ্যের মধ্যে নিশ্চয়ই পর্য্যবসিত হবে। এই জন্য আলো-আঁধারের এই যুগসন্ধিক্ষণে আজ সবচেয়ে দরকার জনগণের চিত্তলোকে জাতীয় আদর্শগুলিকে সযত্নে গড়ে তোলা, আর এই আদর্শ রচনার

দুঃসাধ্য কাজে দরকার সেই তপস্যার, সেই নিষ্ঠার—যে তপস্যা এবং নিষ্ঠা দিয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা একদিন ভুবনেশ্বরের আকাশচুম্বী মন্দির তৈরী করেছিলেন, ইলোড়ার এবং অজন্তার গুহাগুলিকে স্বর্গীয় চিত্র-সম্পদে সাজিয়েছিলেন।

আজ জাতি যখন চরম দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে চলেছে মাতালের মতো, তার নৈতিক দুর্গতি চরমে গিয়ে পৌঁচেছে তখন, হে কবি কৃত্তিবাস, তোমার পরমদানের অপরিসীম মহিমাকে নতশিরে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উপলব্ধি করি। বাঙলা ভাষায় পয়ারছন্দে রামায়ণ রচনা ক'রে তুমি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে মহত্তর নূতনতর বাঙলাকে—যে-বাঙলা সত্যানুরাগে হবে সমুজ্জ্বল, শৌর্য্যে হবে জ্যোতিষ্মান, ঔদার্য্যে হবে মহিমাময়। তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে বাঙালীর ছেলে রামচন্দ্রের মতো সত্যের অমোঘ আহ্বানে চরম দুঃখবিপদকে করবে হাসিমুখে বরণ, যারা অস্পৃশ্য হয়ে আছে সমাজের নিদারুণ অবজ্ঞার মধ্যে—বাঙালীর ছেলে তাদের ললাট থেকে কোমল চুম্বনে মুছে নেবে অস্পৃশ্যতার কালিমাকে, যারা আছে সকলের নীচে, সকলের পিছে অবজ্ঞাত হ'য়ে, বাঙালী তাদের আলিঙ্গন করে বুকে টেনে নেবে যেমন করে অসীমপ্রেমে রামচন্দ্র একদা গুহক চণ্ডালকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে বাঙালী জাতির ঘরে ঘরে জন্মাবে সীতার মতো ধৈর্য্যশীলা মহিমাময়ী পতিব্রতা নারী, লক্ষ্মণের মতো ভ্রাতৃপ্রেমে পাগল নিঃস্বার্থ ভাই। সেই স্বপ্ন যাতে বাস্তবে একদিন সত্য হ'য়ে উঠে বাঙলাকে জগতের সভায় বরণীয় করতে পারে—তারই জন্য তুমি এই পল্লীর নিভৃতে ব'সে একাগ্রচিত্তে কবিতায় রামায়ণ রচনা করলে। বাল্মীকির রামায়ণ সংস্কৃত ভাষার দুর্গম শিখরে ছিলো জনসাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য। সেই ভাষার দুরতিক্রম্য বাধাকে অতিক্রম ক'রে রামায়ণের রসাস্বাদন করবার ক্ষমতা ছিল তাদের নাগালের বাহিরে। তুমি দেবভাষার সুদুর্গম শৈলশিখর থেকে রামায়ণের কাব্যামৃতধারাকে ভগীরথের মতো নিয়ে এলে সমতলক্ষেত্রে জনসাধারণের নাগালের মধ্যে। তোমার তপস্যা গৌড়জনের তৃষার্ত্ত হৃদয়কে অমৃত পরিবেশন করেছে, মিটিয়েছে তাদের পিপাসা গরিমাময় জাতীয় আদর্শগুলির দীপালোকে উজ্জ্বল করেছে বাঙলার গণমানসকে। জাতির চিত্তকে উর্ব্বর করেছে তোমার মহাকাব্যের রসধারা। তুমি ধন্য—তোমার জন্ম নদীয়াকেও ধন্য করেছে। বাঙলা ভাষা ধন্য হয়েছে তোমার তপস্যার দ্বারা। তোমার কাছে আমাদের ঋণ অপরিমোচনীয়। আজিকার এই স্মরণীয় দিনে বরণীয় তোমাকে আমরা বারম্বার প্রণাম করি। এই প্রণামের দ্বারা আমরা ঋষিঋণকে স্বীকার করবো। এই স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে—ঋষিঋণ পরিশোধের কাজে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করবার জন্য।

কবি কৃত্তিবাসের কাছে আমরা যে অপরিমেয় ঋণের বন্ধনে বাঁধা আছি সেই ঋণ পরিশোধ করার কাজে আমরা কেমন ক'রে অগ্রসর হ'তে পারি? শুধু কি বর্ষে বর্ষে তাঁর স্মৃতিপূজার অনুষ্ঠান ক'রে? তাঁর স্মৃতিসভায় কবিতা আর প্রবন্ধ পাঠ ক'রে? পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ আর তাঁর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য দিয়ে? এসব অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নেই এমন কথা বলছিনে। প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কিন্তু সবচেয়ে প্রয়োজন যে-রামরাজ্য রচনার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে কবি কৃত্তিবাস তপস্যার মধ্যে ডুবে গিয়ে রামায়ণ রচনা করেছিলেন সেই আদর্শকে আমাদের অন্তরের মধ্যে সাদরে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু রামরাজ্যরচনার জন্য কাব্যরচনার কি প্রয়োজন থাকতে পারে? কবিরা তো মেঘলোকে উধাও স্বপ্নবিলাসী জীব, আর রামরাজ্যরচনার কারবার আমাদের এই মর্ত্ত্যলোকের ধূলিমাটির সঙ্গে। যাঁরা এই রকমের কথা ব'লে থাকেন তাঁরা কর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানের কি যে নিগূঢ় সম্পর্ক—তা ঠিক জানেন না। সত্যের এবং প্রেমের ভিত্তিতে নবতর সমাজ-ব্যবস্থা আপনা-আপনি কখনও সম্ভব হবে না। এই নূতনতর সমাজকে তৈরী করতে হলে চাই Remaking of Man অর্থাৎ নূতনতর মানুষ তৈরীর ব্যবস্থা—যে মানুষ হবে সত্যাশ্রয়ী এবং উদারচেতা। শূকরের রোম দিয়ে রেশমী রুমাল তৈরী যেমন কোনকালেই সম্ভব নয় সঙ্কীর্ণমনা মিথ্যাবাদী ভীরু মানুষকে দিয়ে তেমনি কোনকালেই মহত্তর সমাজব্যবস্থা রচনা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের চরিত্র এবং আচরণ শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করে তার অন্তরতম বিশ্বাসগুলির উপরে। আমরা যে আদর্শকে মনের মধ্যে লালন করি তার দ্বারাই আমাদের আচরণ এবং চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই আদর্শ তৈরী কবিদের কাজ। রামায়ণের মধ্যে মহাকবি যে-সব আদর্শ তৈরী করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে সত্যানুরাগের, সৌভ্রাত্রের, শৌর্য্যের এবং প্রেমের জয়গান। রামরাজ্য তৈরী করতে হলে তৈরী করতে হবে রামচন্দ্রের মত অপূর্ব্ব চরিত্র। বাল্মীকির কবিমনের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী রামচন্দ্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে পরিচালিত করছে। কবি কৃত্তিবাস এই রামচরিত্রকে মহাকাব্যের মাধ্যমে জনগণের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রামরাজ্য রচনার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। তাঁর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই। রামায়ণের সঙ্গে আমরা যদি জনসাধারণের যোগকে ঘনিষ্ঠতর ক'রে তুলতে পারি লোকশিক্ষার কাজকে আরও ব্যাপক ক'রে—তবেই কবি কৃত্তিবাসের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে।
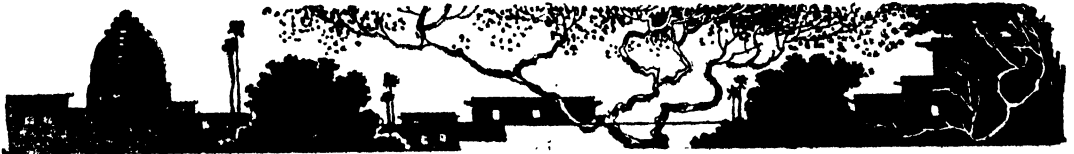
রাশি ফল

জ্যোতি বাচস্পতি

মীন রাশি

মীন যদি আপনার জন্মরাশি হয় অর্থাৎ যে সময় চন্দ্র আকাশে মীন নক্ষত্র-পুঞ্জে ছিলেন সেই সময়ে যদি আপনার জন্ম হয়ে থাকে, তাহ'লে এই রকম ফল হবে—

প্রকৃতি

আপনার প্রকৃতি রহস্যময় ও বিচিত্র। তাতে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী ভাবধারা মিশে যেন এক অখণ্ড বস্তুতে পরিণত হয়েছে। কাজেই আপনাকে অপরে ঠিক মত বুঝে উঠতে পারে না।

আপনার মধ্যে কল্পনাপ্রিয়তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও, তার সঙ্গে বাস্তবিকতাও কম-বেশী জড়িত আছে। আদর্শবাদ এবং বস্তুতান্ত্রিকতা একসঙ্গে মিশে আপনার মধ্যে এক অপূর্ব বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

আপনার ব্যক্তিত্ব অসাধারণ হ'লেও এবং তার মধ্যে অদমনীয়তা ও তেজস্বিতা থাকলেও, তাতে এমন একটা মাধুর্য দেখা যায় যে, অপরে সহজেই আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়।

আপনার মধ্যে সহানুভূতি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বিশেষ ক'রে যারা দুর্বল ও অসহায় তাদের দিকে আপনার সহানুভূতি স্বতই প্রসারিত হয়। আর্ত ও বিপন্নকে সাহায্য করতে পারলে আপনি যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেন এবং আশ্রিত প্রতিপাল্যের সুখ সুবিধার দিকে আপনার সদাই লক্ষ্য থাকে। প্রার্থীকে বিমুখ করতে আপনার প্রাণে বাজে। কিন্তু আপনার বাইরের ভাব ভঙ্গীতে বা আচরণে সব সময়ে আপনার মনের ভাব সম্পূর্ণ পায় না। বাইরে থেকে সময় সময় আপনাকে কঠোর বা উদাসীন ব'লেও মনে হ'তে পারে।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, রোমান্স ও অদ্ভুত ব্যাপারের দিকে আপনার একটা অন্তরের টান আছে। পড়াশুনোর ব্যাপারে আপনি পছন্দ করেন সেই সব বিষয় যা হৃদয়কে বিচলিত করে। তবুও জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা আপনি করতে পারেন এবং তাতে আপনার কৃতিত্বও প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু যে কোন বিষয়ের হোক্, আপনার মত বা ধারণা ততটা যুক্তি বা বুদ্ধির সাহায্যে গ'ড়ে ওঠে না, যতটা গ'ড়ে ওঠে অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। আপনার বুদ্ধি যতই পরিণত হোক্ তা চালিত হয় আপনার হৃদয়কে কেন্দ্র ক'রে।

আপনার মধ্যে ধীরতা ও চাঞ্চল্য, স্থিরতা ও অস্থিরতা দুয়েরই অপূর্ব সমাবেশ লক্ষিত হওয়া সম্ভব। যে সময় হয়ত বাইরে আপনি ধীর ও গম্ভীর, সেই সময়ই মনে আপনার চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা থাকতে পারে। আবার এ-ও হ'তে পারে যে, বাইরের ভাবভঙ্গী অস্থির বা চঞ্চল হ'লেও ভিতরে আপনার স্থিরতা ও দৃঢ়তা অটুট আছে। কিম্বা এক সময়ে আপনি অধীর ও চঞ্চল, আবার আর এক সময়ে শান্ত ও সমাহিত, এমন হওয়াও অসম্ভব নয়।

আপনার মধ্যে সৃজনীশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে তা পরিচালিত হবে বা কোন ক্ষেত্রে তার অভিব্যক্তি ঘটবে, তা কম বেশী নির্ভর করবে আপনার শিক্ষা-দীক্ষা ও পরিবেশের উপর।

আনন্দের দিকে আকর্ষণ আপনার প্রকৃতি-গত। আপনি নিজেও যেমন আনন্দ পেতে চান অপরকেও তেমনি আনন্দ দিতে চান। আপনার মধ্যে দরদ খুব বেশী এবং যে বিষয়ে আপনার মন যায়, তার জন্য সব ভুলে নিজেকে বিসর্জনও দিতে পারেন।

আপনি একেবারে অসামাজিক নন। কিন্তু আন্তরিকতাহীন শিষ্টতা ও সামাজিকতা আপনি পছন্দ করেন না। সমাজে মিশলেও, নিজের আদর্শ ও ভাবধারা ছাড়তে পারেন না ব'লে, অনেক সময় একটা দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলতে হয়, যাতে ক'রে লোকে আপনাকে দাম্ভিক ও অহঙ্কৃত ব'লে মনে করতে পারে।

আপনার মধ্যে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রবৃত্তিগুলি খুব প্রবল, সেইজন্য সব-কাজে আপনার মধ্যে একটা আতিশয্য বা উচ্ছ্বাসের ভাব দেখা যেতে পারে। কথাবার্তায়, লেখায় সর্বত্র আপনি বাহুল্যের পক্ষপাতী হ'য়ে পড়তে পারেন এবং কল্পনা ও অতিরঞ্জনের চেষ্টা আপনার স্বভাবে পরিণত হ'তে পারে। এ বিষয়ে সংযম আবশ্যক। নতুবা আপনার শক্তির অপচয় ও নৈতিক অবনতির যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। প্রকৃতির প্রাবল্য দমনের দিকে যদি লক্ষ্য না রাখেন, তাহ'লে অসৎ সঙ্গে প'ড়ে মাদক সেবন, জুয়াখেলা, ব্যভিচার ইত্যাদিতে লিপ্ত হ'য়ে একটা পঙ্গু ও অক্ষম জীবন যাপন করাও অসম্ভব নয়। সুতরাং এ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

আপনি কম-বেশী গোপনতা-প্রিয়। আপনার মনে যে সব কল্পনার উদয় হয়, তা এমনি বিচিত্র ও অ-সাধারণ যে সব সময়ে তা বাইরে প্রকাশ করা চলে না। কাজেই অনেক সময় আপনাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে হয় এবং অপরের সঙ্গে মেলা মেশা করলেও চট্ ক'রে কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয় না।

আপনার প্রকৃতি বহুমুখীন—নানা বিষয়ে শেখবার ইচ্ছা ও শক্তি আপনার আছে এবং যে কোন অবস্থার সঙ্গে আপনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। আপনার উপভোগের ক্ষমতাও অসীম; সব জিনিষের মধ্যকার রস্‌টুকু নিংড়ে বের ক'রে নেওয়ার কৌশল আপনি জানেন। কিন্তু ভোগী প্রকৃতির হ'লেও, আপনি নিতান্ত আত্মপরায়ণ নন্ অপরকে বঞ্চিত ক'রে ভোগ করা আপনার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।

আপনি সাধারণতঃ শান্তি-প্রিয়, বিবাদ-বিসম্বাদ এড়াবার জন্য অনেক সময় ভুল জেনেও অপরের কথার প্রতিবাদ করেন না। কিন্তু তা ব'লে

আপনার মধ্যে যে সমালোচনা-শক্তির অভাব আছে, তা নয়। প্রয়োজন মনে করলে, আপনি বেশ অপক্ষপাত সমালোচনা করতে পারেন। অনেক সময় অপরের ভুল-ত্রুটি নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে সমালোচনাই হোক্ কি শ্লেষ-বিদ্রূপই হোক্, তার মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঝাঁঝ বড় একটা থাকে না। সহজে আপনি অপরকে পীড়া দিতে চান না।

আপনার মধ্যে যথেষ্ট ঔদার্য আছে, কোন বিষয়ে বিশেষ গোঁড়ামি না থাকাই সম্ভব। নিজের বিরুদ্ধ মতও শান্তভাবে শোনবার ও বিবেচনা করবার শক্তি আপনার মধ্যে আছে। কাজেই, সমাজে আপনার ব্যবহার শিষ্টতাপূর্ণ ও কথাবার্তা মধুর ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে।

আপনার কল্পনা ও আদর্শের অসাধারণত্বের জন্য, অনেক সময় আপনার মধ্যে একটা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য লক্ষিত হ'তে পারে। অনেক সময় নিজের করা কাজও আপনার মনঃপূত হয় না। একটা কাজ শেষ করার পরই তার খুঁতগুলো আপনার নজরে প'ড়ে এবং আবার তা নতুনভাবে বা নতুন উপায়ে সম্পূর্ণ করতে চান। এইজন্য আপনার মধ্যে আদর্শের স্থিরতা থাকলেও মত ও পথ প্রায়ই পরিবর্তিত হয়, যাতে ক'রে লোকে আপনাকে অব্যবস্থিত-চিত্ত মনে করতে পারে।

ধীরে সুস্থে কাজ করা আপনার প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খায় না। সব কাজ আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করতে চান। এমন কি হাঁটা, চলা লেখা, কথা বলা এ সবের মধ্যেও দ্রুতগতি আপনি পছন্দ করেন। আপনি শরীর চালনারও পক্ষপাতী—ব্যায়াম, দৌড় ঝাঁপ, খেলা-ধূলা, প্রভৃতি আপনার ভাল লাগে। বিশেষ ক'রে ভ্রমণের দিকে আপনার একটা প্রবল ঝোঁক থাকা সম্ভব।

আপনি একটু বেশী মাত্রায় আত্মসচেতন হ'তে পারেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অনর্থক দুশ্চিন্তা আপনার মনে আসতে পারে, যার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। নিজের কাজের খুঁটিনাটি নিয়েও অনেক সময় আপনি অনাবশ্যক তোলাপাড়া করতে পারেন। কিন্তু আপনার এই প্রবৃত্তি যতদূর সম্ভব সংযত করা উচিত, নতুবা হীনমন্যতা ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব আপনার জীবনকে নিষ্ফল ও অশান্তি পূর্ণ ক'রে তুলবে।

এর একমাত্র উপায় হচ্ছে নিজের কথা ভুলে যাওয়া। নিজের দিক থেকে মন যত সরিয়ে নেবেন, অপরের সঙ্গে নিজের তুলনা করা পরিত্যাগ করবেন এবং মন থেকে ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবেন, ততই আপনার জীবন সফল ও সার্থক হ'য়ে উঠবে। মনে রাখবেন, মীনরাশি আত্মোৎসর্গের রাশি, পরার্থেই হোক্ কি পরমার্থের জন্যই হোক্, নিজেকে উৎসর্গ করতে না পারলে শান্তি বা স্বাচ্ছন্দ্যের আশা নেই।

অর্থ ভাগ্য

আর্থিক ব্যাপারে আপনার নানা রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হওয়া সম্ভব। অপরের সাহচর্যের প্রভাবে আপনার অর্থ-ভাগ্য কম বেশী নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে। অর্থ উপার্জন করার একটা স্বাভাবিক যোগ্যতা আপনার মধ্যে আছে, এবং কী ক'রে অল্প পরিশ্রমে বেশী উপার্জন করা যায়, তার কৌশল সহজেই আপনার মাথায় আসে। সুতরাং আপনি নিজের গুণপনা ও কৃতিত্বের অনুপাতে যথেষ্ট উপার্জন করতে পারেন। আপনার বন্ধুবান্ধব, পরিচিত ব্যক্তি, মুরুব্বি ইত্যাদির তরফ থেকে উপার্জনের ব্যাপারে অনেক সাহায্যও আপনি পেতে পারেন। কিন্তু আপনার উপার্জনের সব সময় স্থিরতা থাকবে না। আর্থিক ব্যাপারে কম বেশী চিন্তা প্রায়ই থাকবে। উপার্জন যথেষ্ট হ'লেও, আয় ব্যয়ের সমতা রাখা অনেক সময় কঠিন হ'য়ে উঠবে। কোন অভিনব পরিকল্পনা বা কোন স্পেকুলেটিভ্ কাজে অর্থ নিয়োগ ক'রে আপনার আর্থিক ক্ষতি হ'তে পারে। তা ছাড়া বন্ধু বান্ধবের সংসর্গে ও আমোদ-প্রমোদ, উৎসব, ইত্যাদিতে অযথা অপব্যয়ের জন্য আর্থিক চিন্তা উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য এ বিষয়ে সাবধান হ'তে পারলে, আপনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করতে পারবেন এবং শেষ বয়সে আপনার যথেষ্ট অর্থ ও সম্পত্তি থাকবে।

কর্মজীবন

আপনার সেই সব কাজ ভাল লাগবে যাতে কম বেশী মৌলিকতা আছে এবং যাতে বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রয়োগ-কুশলতা দরকার হয়। যে কোন শিল্প-কলা অথবা পরিকল্পনায় কাজ কিম্বা যে সব কাজের সঙ্গে বিজ্ঞান, দর্শনের সংস্রব আছে অর্থাৎ যে সব কাজে উচ্চস্তরের চিন্তা শক্তির পরিচয় দিতে হয়, সেই সব কাজে আপনার কৃতিত্ব প্রকাশ পেতে পারে। যাতে বহুজনের উপকার আছে, অথবা বহুজনকে আনন্দ দেওয়া যায় সেই সব কাজও আপনি ভালবাসেন। ইচ্ছা ক'রেই হোক্ বা অবস্থা-গতিকেই হোক্ অনেক সময় আপনাকে ভিন্ন ধরণের একাধিক কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

শিল্পী, সাহিত্যিক, গ্রন্থকার, সম্পাদক, শিক্ষাব্রতী ইত্যাদির কাজে যেমন আপনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে পারেন তেমনি আইনও, ব্যবস্থাপক, মন্ত্রণাদাতা, পূর্ত কর্মবিদ্ ইত্যাদি হিসাবেও আপনার যোগ্যতা প্রকাশ পেতে পারে। আপনার মধ্যে যথেষ্ট সংগঠন শক্তি আছে, পুরানো জিনিসকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলার দক্ষতা আপনার খুব বেশী। অপরের করা অসম্পূর্ণ বা বিশৃঙ্খল কাজ সুসম্পূর্ণ বা সুসংবদ্ধ ক'রে তোলার ব্যাপারে আপনার জুড়ী মেলা ভার। একটা অসমাপ্ত গ্রন্থের বাকী অধ্যায়গুলি ঠিক ক'রে তা সম্পূর্ণ ক'রে দেওয়া, একটা খাপ ছাড়া পরিকল্পনাকে বদলে সদলে তার মধ্যে একটা সংহতি এনে দেওয়া, একটা অসঙ্গত ও এলোমেলো ব্যবস্থাকে সংগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে তোলা, ইত্যাদিতে আপনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন।

কর্মের ব্যাপার এক বিষয়ে আপনার সতর্ক থাকা উচিত। আপনার মন একটু খুঁতখুঁতে ব'লে, অনেক সময় কাজে সামান্য একটু ত্রুটি বেরিয়ে পড়লে, তা অপরের বিরুদ্ধ সমালোচনা পেলে, আপনি হতাশ হ'য়ে যান এবং নিজের শক্তিতে সন্দেহ ও অবিশ্বাস এসে পড়ে। এমন কি, সেক্ষেত্রে নিরুৎসাহ হ'য়ে, কর্মত্যাগ করাও আপনার পক্ষে বিচিত্র নয়। এতে ক'রে আপনার উন্নতির বিঘ্ন হ'তে পারে।

কিন্তু আপনি যদি এই দ্বিধা, সংশয়, ও হীনমন্যতা বর্জন করতে পারেন, তাহ'লে আপনার শিক্ষা ও পরিবেশের অনুপাতে কর্মে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও গৌরব পাবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই

পারিবারিক

আপনার আত্মীয়-কুটুম্বের সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব এবং ভ্রাতা-ভগ্নী (সহোদর বা সম্পর্কীয়) অনেক থাকতে পারেন। ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে কারো কারো অকালমৃত্যু হ'তে পারে। আপনার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে খ্যাতনামা বা পদস্থ ব্যক্তিও যেমন থাকতে পারেন, তেমনি কোন আত্মীয়ের জন্য কিছু কু-খ্যাতিও হ'তে পারে। সে যাই হোক, আত্মীয়ের কাছ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনি প্রশংসা বা সুখ্যাতি পাবেন।

আপনার পিতা বিখ্যাত হ'তে পারেন, তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠাও থাকতে পারে, কিন্তু পিতামাতার জন্য আপনার কম-বেশী অশান্তি আসা সম্ভব। অল্প বয়সে তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকাও অসম্ভব নয়। কিম্বা বাল্যে পিতামাতার কোনরকম বিপদ অথবা ক্ষতি হ'তে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ ও ঝঞ্ঝাটের আশঙ্কা আছে।

আপনার অনেকগুলি সন্তান হ'তে পারে, যদি না আপনার কোষ্ঠীতে চন্দ্র খুব বেশী পীড়িত হয়। সন্তানদের মধ্যে অনেকেই কৃতী ও ভাগ্যশালী হ'তে পারেন, কিন্তু তবুও কোন কোন সন্তানের ব্যাপারে আশাভঙ্গ বা মনোকষ্ট হওয়া সম্ভব। সন্তানের জন্য বহু ব্যয় আপনাকে করতে হবে এবং সন্তানের কোন কাজের জন্য আপনার নিজের আর্থিক ক্ষতিও হ'তে পারে।

স্নেহ প্রীতির আদর্শ আপনার একটু অসাধারণ ব'লে, সে ব্যাপারেও আপনাকে কমবেশী আশাভঙ্গের দুঃখ পেতে হবে। প্রীতির পাত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ, তাদের অসঙ্গত আচরণ ইত্যাদি কারণে কম-বেশী মনোকষ্ট আপনাকে ভোগ করতেই হবে, যদিও বাইরে এ সম্বন্ধে আপনি উদাসীন ভাব দেখাতে পারেন।

বিবাহ

বিবাহ বা দাম্পত্য জীবনের প্রভাব আপনার উপর খুব সামান্যই অভিব্যক্ত হবে। আপনার স্ত্রী আপনার অনুগত হ'তে পারেন এবং গৃহকর্মে তাঁর নিপুণতাও থাকতে পারে, কিন্তু তিনি ঠিক আপনার সহধর্মিণী বা সহযোগিনী হ'তে পারবেন না। তাঁর মধ্যে স্পষ্ট ব্যক্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। মোটের উপর দাম্পত্য জীবন আপনার মামুলী ধারাতেই চলবে এবং দাম্পত্য ব্যাপারে আপনি শেষ পর্যন্ত উদাসীন হ'য়ে উঠতে পারেন। আপনি যদি স্ত্রীলোক হন, আপনার স্বামীর স্বাস্থ্যহীনতা অথবা তাঁর কর্ম-জীবন আপনার দাম্পত্য সুখের অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। আপনার কোষ্ঠীতে চন্দ্র যদি পাপপীড়িত হয়, তা'হ'লে স্ত্রীর (অথবা স্বামীর) জন্য নানারকম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আপনার যদি এমন কারো সঙ্গে বিবাহ হয় যাঁর জন্মমাস শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ অথবা চৈত্র কিম্বা যাঁর জন্মতিথি শুক্লপক্ষের একাদশী বা কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, তা'হ'লে আপনার দাম্পত্য জীবন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হবে।

বন্ধুত্ব

আপনার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা বেশী হওয়াই সম্ভব। বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ আপনার অপ্রীতিকর হবে না বটে, কিন্তু সে সংসর্গের মধ্যেও আপনি একটা দূরত্ব রক্ষা ক'রে চলবেন। বেশী ঘনিষ্ঠতা বা অন্তরঙ্গতা হবে আপনার অতি অল্প লোকের সঙ্গে। আপনার পরিচিতদের মধ্যে বহু পদস্থ ও প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি থাকবেন এবং তাঁদের সংশ্রব আপনার কর্মোন্নতি বা খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। আপনি নিজেও বিপন্ন বন্ধু-বান্ধবকে সাহায্য করতে যথেষ্ট চেষ্টা করবেন এবং প্রয়োজন হ'লে তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হবেন না। আপনার বহু অনুচর-পরিচর থাকবে, অধীনস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার শত্রুতা করতে পারে, কিন্তু তাতে গুরুতর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। সহযোগী বা সহকর্মীদের মধ্যেও কেউ কেউ ঈর্ষ্যান্বিত হ'য়ে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করবে কিন্তু আপনার শত্রু কখনই খুব বেশী প্রবল হ'তে পারবে না। আপনার শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী অতি সহজেই পরাভূত হবে। বন্ধু মহলে আপনার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা থাকবে বটে, কিন্তু অধিকাংশ বন্ধুর কাছ থেকে আন্তরিক হৃদ্যতা পাবেন কম। বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য পেলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা হবে স্বার্থ-প্রণোদিত। সুতরাং বন্ধুত্বের ব্যাপারে কারো সঙ্গে খুব বেশী মাখা মাখি করা কখনই সম্ভব হবে না। যদিই কিছু অন্তরঙ্গতা হয় তা হবে এমন কারো সঙ্গে যাঁর জন্মমাস শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ অথবা চৈত্র কিম্বা যাঁর জন্ম তিথি শুক্লপক্ষের একাদশী কি কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী।

স্বাস্থ্য

সাধারণতঃ আপনার দেহ মজবুত এবং জীবনীশক্তি প্রবল। যদি অত্যাচার বা অবহেলা না করেন, তা'হ'লে বেশী রোগ ভোগের ভয় নেই। অসুস্থ হ'লেও, অতি সহজেই আপনি নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। আপনি ভোগী প্রকৃতির লোক সুতরাং উপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধন আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য একান্ত আবশ্যক। আপনার মধ্যে চক্ষুরোগ, হৃদ্রোগ, মূত্রগ্রন্থি বা মূত্রস্থলীর পীড়া, পায়ের নিম্ন ভাগের দুর্বলতা, প্রভৃতির প্রবণতা আছে, সুতরাং সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। নিয়মিত স্নান, লঘু ব্যায়াম অঙ্গ সংবাহন, খাদ্যে তরল পদার্থের আধিক্য, প্রচুর জলপান,. প্রভৃতি আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। উত্তেজক বা মাদকদ্রব্যের অসংযত ব্যবহার আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। আপনার দেহের আভ্যন্তরিক গঠন একটু বিচিত্র, অসুস্থ হ'লে অনেক সময় নানারকম বিচিত্র লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে, যা সচরাচর দেখা যায় না। অনেক সময় সাধারণ চিকিৎসক লক্ষণ দেখে আপনার রোগ নির্ণয় করতে বা পরিণতি অনুমান করতে পারবেন না। অনেক সময় আপনার রোগ আরোগ্যও হবে অদ্ভুত উপায়ে। দীর্ঘ চিকিৎসায় যে রোগ বাগ মানছিল না। তা হয়ত সামান্য একটা টোটকা, কি এক ফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কিম্বা একটুখানি জল পাড়াতেই আশ্চর্য ভাবে ভাল হ'য়ে যাবে। অনেক সময়

বিনা ঔষধে স্থান, পরিবেশ অথবা পথ্য পরিবর্তনের দ্বারাই আপনি নিরাময় হ'য়ে উঠবেন। সে যাই হোক্, আহার-বিহারে যদি আপনি বেশী অত্যাচার বা অবহেলা না করেন, তাহ'লে আপনি সুন্দর স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু পেতে পারেন।

অন্যান্য ব্যাপার

আপনার আধ্যাত্মিকতার দিকে একটা ঝোঁক থাকতে পারে। অনুশীলন করলে আপনি দিব্য দৃষ্টি, দিব্যশ্রুতি, স্বপ্নে ভবিষ্যদ্দর্শন প্রভৃতি যে কোন ক্ষমতা লাভ করতে পারেন। আগেই বলেছি আপনার প্রকৃতির দুটো দিক আছে, ধর্মের ব্যাপারেও তার অভিব্যক্তি অসম্ভব নয়। একদিকে প্রেম-ভক্তির সাধনায় আপনি আনন্দ পেতে পারেন, অপর দিকে জন-শিক্ষা বা লোক হিতকর কাজে আত্মনিয়োগ ক'রে জীবন সফল ও সার্থক ক'রে তুলতে পারেন। এর মধ্যে কোন্‌টা আপনি নেবেন, তা নির্ভর করবে আপনার শিক্ষা দীক্ষা ও পরিবেশের উপর।

ভ্রমণের দিকেও আপনার একটা সহজ আকর্ষণ আছে। আপনার ভ্রমণের বা বাস পরিবর্তনের অনেক যোগাযোগ উপস্থিত হবে। কর্মোপলক্ষে অনেক ভ্রমণ হ'তে পারে, তা ছাড়া শিক্ষার জন্য কি তীর্থযাত্রা হিসাবে অথবা নিজের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্যও আপনি ভ্রমণ করতে পারেন। ভ্রমণ সাধারণতঃ প্রীতিজনক হ'লেও, দূর বিদেশে কোন রকম বিপদ বা মনোকষ্ট হ'তে পারে।

স্মরণীয় ঘটনা

আপনার ১১, ২৩, ৩৫, ৪৭, ৫৯ এই সকল বর্ষগুলিতে নিজের অথবা পরিবারস্থ কারো সংস্রবে কোন দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে। ৫, ১২, ১৭, ২৪, ২৯, ৩৬, ৪১, ৪৮, ৬০ এই সকল বর্ষগুলিতে আনন্দজনক কিছু ঘটা সম্ভব।

বর্ণ

আপনার প্রীতিপ্রদ ও সৌভাগ্যবর্ধক বর্ণ হচ্ছে সবুজ এবং সবুজের সব রকম প্রকার ভেদ। ফিকে বা গাঢ় যে কোন রকম সবুজ রঙ আপনি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু হাল্কা ও জল জলে রঙই আপনার পক্ষে বেশী প্রশস্ত। দেহ মনের অসুস্থ অবস্থায় কিন্তু সোনালী বা জরদা রঙ ব্যবহারে উপকার পাবেন।

রত্ন

আপনার ধারণের উপযুক্ত রত্ন পান্না, ফিরোজা (turquoise), এ্যাগেট, প্রভৃতি। দেহের অসুস্থ অবস্থায় হলদে পোখরাজ য়্যাম্বার বা স্বর্ণক্ষেত্র বৈদূর্য (Cat's eye) ধারণে আপনি উপকার পাবেন।

যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই রাশিতে জন্মেছেন, তাঁদের জন কয়েকের নাম—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, প্রসিদ্ধ লেখক জর্জ স্যাণ্ড, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর রায়, স্যার আর, এন, মুখার্জী, স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ শার্দূল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জাষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রভৃতি।

কবিতার মানে নাই

শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই বলে মোর কবিতার হয় নাকো মানে,
আড়ষ্ট বন্ধনে শুধু গুণে গুণে অক্ষর বয়ন ;
ছন্দের স্বাচ্ছন্দ্য নাই, খালি ব্যর্থ-শব্দ-সঞ্চয়ন,
পরের চোরাই ভাব ; আরো কতো বলে, শুনি কানে।

তুমিও কি বলিবে তা' ? বারেকের তরে কোনোখানে
পড়িয়া ওঠেনি ভিজে কোনোদিন তোমার নয়ন ?
আমারে পড়েনি মনে ? বিরহের বিনিদ্র-শয়ন
প্রভাত করোনি চাহি' আকাশের সুনীল খিলানে ?

বলে যা' বলুক ওরা, ক্ষতি নাই মোটে প্রিয়তমা,
মর্মের ক্রন্দন মূক জানিয়াছ তুমি তো সকলি ;
নিন্দার আনন্দে মোর অন্ধ চোখে তাই হয় জমা
বঞ্চনার বেদনায় কবিতার কুন্দ ফুল-কলি।

কাহার লাগিয়া লিখি কেহ খোঁজ রাখে নাকো তার,
মনে মনে তুমি একা বোঝ মানে মোর কবিতার ॥

যযাতি ও দেবযানী

শ্রীদাশরথি সাংখ্যতীর্থ

অমররাজ্যের অমৃতের লোভ দেখিয়ে যখন কচ ফেলে গেলেন দেবযানীকে হতাশার তীব্র তুহিনের মাঝখানে, তখন তাঁর হৃদয়োদ্যানের স্ফুটনোন্মুখ কুসুম-নিকর বৃন্তচ্যুত হ'য়ে একটি একটি করে ঝরে পড়ল পৃথিবীর বক্ষে। স্বর্গে তারা যেতে পারল না, মর্ত্তের কুসুমমঞ্চেই পড়ে রইল, দেবযানীর বাসনা চরিতার্থ হল না। মনের রাগাত্মক বৃত্তিনিচয় যখন বুদ্ধির সংসর্গ পায় না, তখন তারা কিছুতেই পূর্ণতালাভ করতে পারে না। রাজসিকী-প্রকৃতি দেবযানীরও তাই হ'ল। তাঁর কল্পনা-কুসুমগুলি অকালে ঝরে পড়ল, কোরক প্রস্ফুটিত হল না।

কচ ও দেবযানী শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে কচ জীবের বুদ্ধিতত্ত্ব এবং দেবযানী রাজসিকী প্রকৃতি। কচ দেবযানীকে ফেলে গেলেন, তাই রাজসিকী প্রকৃতির বুদ্ধির সঙ্গে সংযোগ হ'ল না। রাগাত্মিকা দেবযানী, তৃষ্ণা ও আসক্তি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ধরণী বক্ষে—বুদ্ধির স্থৈর্য্য না পাওয়ায় দেবযানী স্খলিতচরণা হ'য়ে পড়ে গেলেন একটি গভীর কূপের মধ্যে। সে কূপের নাম মোহ। সে কূপ হ'তে উত্থানের শক্তি দেবযানীর ছিল না। এ মোহ কাটান সহজ নয়। রাগান্ধতাই এই পতনের কারণ। মোহকূপে পতিত হ'য়ে রজঃ শক্তি যখন সকরুণ চীৎকারে জানায় তার উত্থানের অশক্তি, তখন মন এসে হাত ধ'রে তাকে তোলে। দেবযানীর হাত ধ'রে তুলেছিলেন চন্দ্রবংশের রাজা যযাতি। এই যযাতি নামের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই মনস্তত্ত্বের একটা সাদৃশ্য। য-উপপদে যা ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে তি-প্রত্যয় যোগে যযাতিশব্দ ব্যুৎপন্ন। য-শব্দের একটি অর্থ বায়ু এবং যা-ধাতু ব্যবহৃত হয় গমনার্থে। অতএব যে বায়ুর মত গমনশীল, তার নাম যযাতি। মানবের মনস্তত্ত্বের গতি বায়ুর মত। মনের চাঞ্চল্য সর্ব্বজনবিদিত। আবার যযাতি চন্দ্রবংশসম্ভূতও বটে। আমরা জ্যোতিষশাস্ত্রে দেখতে পাই চন্দ্র মনঃকারক গ্রহ। অতএব চাঞ্চল্যবোধক যযাতি শব্দে আমরা গ্রহণ করতে পারি চন্দ্রনিয়মিত মনকে। যতক্ষণ ভোগের আসক্তি থাকে, ততক্ষণ রাজসিক প্রকৃতি পায় মনের সঙ্গ, বুদ্ধি তাকে ফেলে যায়। বিষয়রস আমরা ভোগ করে থাকি মনেরই আধিপত্যে। বুদ্ধির আধিপত্যে আসে বিচার, এবং অসারবোধে বিষয় ত্যাগ। তাই রজঃ-প্রকৃতিরূপা ভোগাসক্তা দেবযানীকে ত্যাগ ক'রে গেলেন বুদ্ধিরূপ কচ, গ্রহণ করলেন মনোরূপ যযাতি। কচের সঙ্গে বিবাহ হ'ল না, হ'ল যযাতির সঙ্গে। রাজসিকী প্রকৃতির বিষয়ভোগে আসক্তি থাকলেও, বুদ্ধির সংসর্গ সে একবার পেলে, কখনই চায় না মনকে। তাই দেবযানী বিবাহ করলেও যোগ্য সম্মান দিতে পারেন নি যযাতিকে। প্রবাদ আছে যে রাজা যযাতির মৃগয়ায় একটা প্রবল আসক্তি ছিল। আমাদের মনেরও কার্য্য মৃগয়া বা ভোগ্যরূপাদি বিষয়ানুসন্ধান। মনোরূপ যযাতি যখন দীর্ঘ কর্ম্মদিবস রূপাদি বিষয়ানুসন্ধান ক'রে ফিরে এলেন রজঃপ্রকৃতি-রূপা দেবযানীর কক্ষে, তখন দেখলেন তিনি নিদ্রিতা, তাঁর অযত্নরক্ষিত খাদ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, তাঁর সুপ্তির মধ্যে একটা গর্ব্ব ও অশ্রদ্ধা মাখান। যযাতি চলে গেলেন শর্মিষ্ঠার কাছে।

এই শর্মিষ্ঠা ছিলেন অসুররাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা। বৃষ-শব্দের একটি অর্থ ধর্ম এবং পর্ব শব্দে আমরা পাই প্রস্তাবিত মত বা আসক্তি। বৃষে অর্থাৎ ধর্মে যার পর্ব বা আসক্তি তার নাম বৃষপর্বা। মনের রাজসিক ভাবের নাম অসুর। বৃষপর্বা অসুর হ'লেও তাঁর ছিল রাজধর্ম। এই রাজধর্ম তাঁর অসুরত্বের মধ্যেও জাগিয়ে রেখেছিল ধর্ম প্রবৃত্তি। জীবের অহংকার-তত্ত্বেই পাওয়া যায় কর্ত্তৃত্বাভিমান বা রাজধর্ম। আবার শুক্রের আধিক্যেই কর্ত্তৃত্বাভিমান পূর্ণভাবে বিকসিত হয়। তাই অসুরগুরু অহংকারী শুক্রের শিষ্য ছিলেন রাজা বৃষপর্বা। রজোগুণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে অহংকার তত্ত্বে থাকে বিষয়াসক্তি, সত্ত্বের প্রেরণায় অহংকার আশ্রয় করে ধর্মকে। বৃষপর্বা অহংকার তত্ত্ব হলেও এই কারণেই তাঁর কন্যা শর্মিষ্ঠা সত্ত্বভাব জাগিয়েছিলেন। শর্ম শব্দের অর্থ সুখ। অতএব 'শর্মী' এই পদের অর্থ সুখী। শার্মন্ শব্দের উত্তর ইষ্টপ্রত্যয়যোগে শর্মিষ্ঠ-শব্দ ব্যুৎপন্ন হয়। তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয়-যোগে শর্মিষ্ঠা শব্দের উৎপত্তি। অতএব শর্মিষ্ঠা শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ অতিসুখিনী। সুখ সত্ত্বগুণের বিকাশ। তাই আমরা শর্মিষ্ঠা শব্দে সাত্ত্বিকী প্রকৃতিকেই ধরতে পারি। দেবযানীর দ্বারা তাড়িত হ'য়ে রাজা যযাতি গেলেন শর্মিষ্ঠার কক্ষে। অর্থাৎ রজঃপ্রকৃতির চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করে মন নিল সত্ত্বগুণের আশ্রয়। দেবযানীর অশ্রদ্ধা অপমান দম্ভ ও কামনার মধ্যে যে চাঞ্চল্য ছিল, তা কেবল রজোগুণেই থাকে। শর্মিষ্ঠার শ্রদ্ধা, সম্মান, বিনয় ও প্রেমের মধ্যে ছিল সত্ত্বগুণের স্থৈর্য্য। মন যখন ভোগের উদ্দামতায় পীড়িত হয়, তখন সে চায় ত্যাগের শান্তি। এ ত্যাগ উদ্দামতা-ত্যাগ, কিন্তু আনন্দ ত্যাগ নয়। আনন্দ জীবের স্বরূপ। আনন্দ ত্যাগ ক'রে জীবের অস্তিত্ব কিছুতেই থাকতে পারে না। তবে বিষয়ানন্দকে ব্রহ্মরসে পর্য্যবসিত করতে না পারলে তার মধ্যে যে যাতনার তীব্রতা থাকে, তা সহ্য করা জীবের শক্তি নয়। তাই মন বিষয়কে ব্রহ্মরসে পরিবর্ত্তিত ক'রে তার মধ্যে পায় ব্রহ্মানন্দ; অতএব তাকে ত্যাগ করে, নিতে যায় সত্ত্বগুণের আশ্রয়। যযাতিরূপী মন দেবযানীর রজশ্চাঞ্চল্যকে সত্ত্বের শান্তিতে পর্য্যবসিত করতে না পারায় বাধ্য হয়ে তাকে নিতে হ'য়েছিল শর্মিষ্ঠার সত্ত্বস্থৈর্য্য। কিন্তু জড় মন সহজে ভোগের বাসনা সহজে ত্যাগ করতে পারে না। সত্ত্বের আশ্রয়েও সে চায় রূপাদিবিষয়ভোগের আনন্দ। শুদ্ধ কল্পনায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। এই বিষয়ানন্দভোগের চাঞ্চল্য ও উত্তেজনায় হয় শরীরের শুক্রক্ষরণ।

যযাতিরও অনারতবিষয়ভোগেও বিষয়ানুধ্যানে হ'য়েছিল শুক্রনাশ। এই শুক্রনাশকেই পৌরাণিক বলেছেন অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের অভিশাপ। সে অভিশাপ তাঁকে দিল জরা বা অকালবার্দ্ধক্য। শরীরের ক্ষীণতা, ইন্দ্রিয়বৈকল্য প্রভৃতি জরার সহচরগণও তাঁকে আক্রমণ করল প্রচণ্ড বিক্রমে। কিন্তু ভোগস্পৃহাও দূর হয় নি। অতৃপ্ত মন চাইছে জড়-ভোগ, শুদ্ধ কল্পনার আনন্দে সে তুষ্ট নয়। তাই তাঁর প্রয়োজন হ'ল পুষ্টি ও ক্ষয়পূরণ। পুরাণকার তাঁর আখ্যায়িকায় বর্ণনা করেছেন—দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য্য যখন জানতে পারেন, যযাতি শর্মিষ্ঠাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করেছেন, তখন তিনি অভিশাপ দেন যযাতিকে এবং সেই অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত ও ভোগে অশক্ত হন। তবে তিনি একথাও বলেছিলেন—যদি তাঁর কোন পুত্র নিজদেহে জরা সংক্রমিত করে তার যৌবন অর্পণ করে তবে যযাতি পুনর্বার ভোগে সমর্থ হবেন এবং ভোগান্তে পরিণত বয়সে জরা ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আখ্যায়িকার এই রূপককে বাস্তবে আনতে গেলে আমরা দেখতে পাই—মন যখন অনবরত বিষয় ভোগও বিষয়ানুধ্যানে রত থাকে, তখন উত্তেজনার ফলে হয় শরীরের শুক্রনাশ এবং তার ফলেই অকালবার্দ্ধক্য। এরই নাম শুক্রের জরার অভিশাপ। জীব যখন আবার ব্রহ্মচর্য্যপালন ও পুষ্টিকর খাদ্যভক্ষণদ্বারা কতকটা ক্ষয়পূরণ করে, তখন সে অকালবার্দ্ধক্যের মধ্যেও ফিরে পায় যৌবনের সাময়িক শক্তিস্ফুরণ। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে—যযাতির অন্য কোন পুত্রই তাঁর বার্দ্ধক্য নিতে চায় নি—চেয়েছিল কেবল শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পুরু। পুরাণের এই পুরু বাস্তবের ব্রহ্মচর্য্য বা শুক্রধারণ। পুরু বার্দ্ধক্য নিয়ে অর্পণ করেছিল যৌবন—তাই যযাতির পুনর্ভোগের সামর্থ্য উপস্থিত হ'ল। এই পুরু শব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসন্ধান করলে আমরা পাই—পৃ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'কু'-প্রত্যয়যোগে পুরু শব্দ হয়। পৃ—ধাতুর অর্থ পূরণ করা। অতএব যে পূরণ করে অর্থাৎ নষ্ট শুক্রের পূরণ করে তার নাম পুরু। শুক্র ধাতুর পূরণ হয় ব্রহ্মচর্য্যে, তাই ব্রহ্মচর্য্যকে 'পুরু' নামে অভিহিত করা অসঙ্গত নয়। জীবের মন যখন রজঃক্ষোভে চঞ্চল হ'য়ে সত্ত্বগুণের আশ্রয় লয়, তখনও সে তার উদ্বেলতা দূর করতে পারে না। অসংযত কাম ভোগে শুক্র ক্ষয়ের ফলে যখন উপস্থিত হয় জরা বা অকাল বার্দ্ধক্য, তখন সে প্রাণপণে চেষ্টা করে—তার নষ্টপ্রায় যৌবন-শক্তি ফিরিয়ে আনতে। তার একমাত্র উপায় ব্রহ্মচর্য্য বা বীর্য্যধারণ। এই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারাই নষ্টশক্তির পূরণ হয়। তখন জীব আবার সমর্থ হয় কামনা ভোগে। পুরাণকার এই সহজ সত্য স্বাস্থ্যনিয়ম সাধারণকে বুঝাবার জন্য অবতারণা করলেন রূপকের। কচ আমাদের বুদ্ধিবস্থা, দেবযানী রজঃ প্রকৃতি, যযাতি মন, শর্মিষ্ঠা সত্ত্বশুদ্ধি, বৃষপর্বা অহংকার, শুক্রাচার্য্য শুক্র ধাতু এবং পুরু ব্রহ্মচর্য্য। তার আখ্যায়িকার মধ্যে এই রূপকের সন্নিবেশ করতে তিনি যে রসের অবতারণা করেছেন সুনিপুণ হস্তে ও বুদ্ধি কৌশলে, তা আমাদিগকে যুগ যুগ ধরে আনন্দ দেবে। তাঁর এই সকল প্রয়াসের অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। সাম্যের জয় হ'ক, সত্যের জয় হ'ক, শান্তির জয় হ'ক।

স্নেহের পরশ

চাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী

আজো মনে আছে সেদিনের কথা—স্পষ্ট মনে আছে। সেদিনের সঙ্গে আজকের ব্যবধান কম নয়—আঠারো বছরের। তবু সেদিনের এতটুকু স্মৃতিও বিস্মৃত হয়নি উমা। বিস্মৃত হবার কথাও নয়।

তখন উমার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর। এই পঁচিশ বছর বয়সেই সংসারের আনন্দলোক থেকে অকস্মাৎ ছিটকে পড়েছিল সে দুঃখের অতল গভীরে। বেদনার আলোড়নে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিল তার জীবন-নদী। কোন্ অলক্ষ্য দেবতার অমোঘ অভিশাপ তার জীবনবীণার তার ছিন্ন ক'রে দিয়েছিল—স্তব্ধ করে দিয়েছিল তার আনন্দস্বর। কিন্তু সে আজ নয়—আঠারো বছর আগেকার একদিন। সেদিন সহসাই তার জীবনসূর্য অস্তমিত হয়েছিল। নারী-জীবনের চরম অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল তার শিরে। সামান্য কদিনের অতি সামান্য অসুখে স্বামী তার ইহলোক পরিত্যাগ করলেন। উঃ, সে কি দিনই না গিয়েছে!

বসে বসে ভাবছিল উমা, পাশে পড়েছিল একটা খোলা চিঠি। চিঠিখানার দিকে শূন্য দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বসেছিল সে। চিঠিখানি পাঠিয়েছে তার ছোট ভগ্নীপতি অসিতবরণ।

সেদিনের সমস্ত কাহিনীই আজো তার মনের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বল জ্বল করছে। মনে আছে স্বামীর মৃত্যুদিনটির কথা। চোখের ওপর দেখেছে সে তার স্বামীর মৃত্যু। তারপর—তারপর আর তার কোন জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান হ'ল যখন তখন গভীর রাত্রি।

ঘর শূন্য নয়। তখনো তার মা, আর আর কারা যেন জেগে বসে আছেন তার কাছে। কখন তাঁরা এসেছেন সে জানে না। হঠাৎ একটা চমক লেগেছিল তার—কোলের মধ্যে একটি শিশুর অস্তিত্ব অনুভব ক'রে। চোখ চাইতেই দেখতে পেয়েছিল একটা বছর খানেকের ছোট্ট ছেলে মহাবিস্ময়ে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। চোখে যেন তার অনন্ত জিজ্ঞাসা। নিজের কোন সন্তান নেই উমার। একটি সন্তানের কামনায় অনেক কিছুই করেছে সে—অনেক ঠাকুর দেবতার মানত করেছে—অনেক সাধু সজ্জনের পায়ের ধূলো মাথায় নিয়েছে, কিন্তু কিছুই হয়নি। আর হবার সম্ভাবনাও রইলো না। ভগবান সমস্ত সম্ভাবনার মূলে কঠিন কুঠার হেনেছেন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করলে উমা—মর্মছেড়া দীর্ঘশ্বাস। কেমন করে এই জীবন ভার বহন করবে সে এর পর থেকে। অর্থবিত্ত প্রচুর রেখে গেছেন স্বামী—কিন্তু অর্থ-ই তো জীবনের সব নয়। অবলম্বন যে একটা কিছু চাই।

ছেলেটার মুখের দিকে তাকাতেই খিল খিল ক'রে হেসে উঠে সে তার ছোট্ট দেহটি আন্দোলিত ক'রেই ঝাঁপিয়ে পড়লো উমার বুকে। উমা সস্নেহে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। এতো শোকের মধ্যেও কি যেন একটা শান্তির শিহরণ বয়ে গেল তার সর্বশরীরে: রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো সে। ক্লান্তস্বরে মাকে জিজ্ঞাসা করলে—এ কে মা?

—রমার ছেলে।

রমা উমার ছোট বোন। কয়েক মাস আগে এই শিশুটিকে রেখে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। মা বললেন—আজ থেকে এ তোর ছেলে। একটা অবলম্বন তো চাই মা, বেঁচেই যখন থাকতে হবে।

কে একজন বললে—তা তো বটেই। নিজের পেটের একটা থাকতো তবু—

মা বললেন—ওটিকেই সেই রকম করে মানুষমুনুষ করুক। ও-ই ওর ছেলে।

* * * *

বসে বসে ভাবছিল উমা। পাশে পড়ে আছে একখানা খোলা চিঠি—ছোট ভগ্নীপতি অসিতের চিঠি। অসিত আবার বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছে। এ পক্ষের ছেলেপুলেও হয়েছে। কিন্তু রমার ছেলে বেণু সেই থেকেই উমার কাছেই আছে। উমাকেই সে মা বলে জানে। অসিতের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয় তার আজো হয়নি। পরিচয় করতেও সে চায় না—উমাও পরিচয় করিয়ে দিতে চায় না। এতোদিন বেণু জানতোও না যে অসিত তার পিতা এবং সে মাতৃহীন। সম্প্রতি উমাই জানিয়েছে তাকে সে কথা। শুনে সে প্রথমে বিশ্বাস করতেই চায় নি। তারপর উমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল—ধ্যেৎ, মিছে কথা। আমার মা মরবে কেন? এই তো আমার মা গো। আর আমার বাবা আছে কি নেই তা আমি জানতে চাই না। থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। তুমি বুঝি ছল ক'রে এখন আমায় সরিয়ে দেবার মৎলব করেছ? কিন্তু আমি কিছুতেই যাবো না—সে কথা এখন থেকেই বলে রাখছি।

বেণুকে কোলে টেনে নিয়ে উমা বলে উঠেছিল: দূর পাগল! তোকে কোথাও সরিয়ে দিয়ে কি আমি বাঁচতে পারিরে? তোর বাবা চাইলেই বা আমি দেব কেন তোকে। তুই তো আমারই ছেলে।

সত্যিই বেণুকে তফাতে সরিয়ে দেওয়ার কল্পনাও করতে পারে না উমা। অসিত বহুবার বেণুকে নিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু উমা দেয়নি। তার বদলে প্রতিবারই মোটা মোটা টাকা দিয়ে তার চাওয়ার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছে। অবস্থা অসিতের ভালো নয়। কোন একটা আপিসে সামান্য মাইনের চাকরী করে। বেশ কষ্টের সংসার। অসিতও তাই যখন কোন দিকে কোন কূল দেখতে পায় না—সাংসারিক অনটন যখন কিছুতেই মেটাতে পারে না তখন বেণুকে নিয়ে যাবার নাম ক'রে উমাকে মোচড় দিয়ে মাঝে মাঝে অর্থ-সাহায্য নিয়ে যায়।

আজকে যে চিঠিটি উমার পাশে পড়ে রয়েছে সেখানিও ঐ জাতীয়। অসিতের দ্বিতীয় পক্ষের বড় ছেলে কলকাতায় থেকে লেখাপড়া শিখতে চায়; কিন্তু অসিতের সে অবস্থা নয়, তাই সে ঐ পত্রে উমার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেছে। শুধু অসিত একা নয়, সেই সঙ্গে তার এ পক্ষের স্ত্রী শ্যামলীও।

ভাবছিল উমা, কি করবে সে? সাহায্য করবে—কি না! অথচ সাহায্য না করেও উপায় নেই। অসিত যদি ছেলের দাবী ক'রে বসে তাহলেই তো মুশকিল! অবশ্য বেণু তাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না—সে জানে। কিন্তু তবুও ভয় হয়। কেন, তা কে জানে! শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তার পর স্থির করলে—এ সম্বন্ধে বেণুকে কিছু জানাবে না—কোনোদিনই জানতে দেবে না। আর বেণুর মুখ চেয়েই বেণুর বৈমাত্র ভাইকে সে সাহায্য করবে।

অসিত লিখেছে—কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে চায় তার ছেলে অভয়। অভয় ভালো ছেলে, ম্যাট্রিকে বৃত্তি পেয়েছে। ভালো চান্স পেলে তার ভবিষ্যৎ আছে।

বেণুও প্রেসিডেন্সীর ছাত্র। তবে সে বি-এ পড়ে। একটা ভাবনা হ'ল উমার যে, যদি কোনোদিন তুই ভাইয়ের পরিচয় হ'য়ে যায়। যদি বেণুর মন কোনো কারণে ওর বাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়? কিন্তু না, তা হবে না—হ'তে দেবে না সে। বেণু ও তার তেমন ছেলে নয়।

* * * *

দশবছর পর। উমা দেবীর অর্থ সাহায্যে বোনের সতীন-পো অভয় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করল। তারপর আই-সি-এস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান পেয়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছে। অসিত ও শ্যামলীর অবস্থা ফিরেছে—তারা সুখে শান্তিতে বাস করছে। বেণু এখন বীরেন রায় নামে ব্যবসা ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। তিনটী মিলের মালিক সে—তার স্ত্রী রেবা দেবী শিক্ষিতা সহৃদয়া মহিলা। তার প্ররোচনায় বেণু তার মিলে শিক্ষিতা মহিলাদের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরীতে বহাল করেছে। উত্তর সহরতলীতে বেণু প্রাসাদ-তুল্য বাড়ী তৈরী করেছে—উমা শ্বশুর বাড়ী ছেড়ে বাস করছে বেণুর বাড়ীতে এসে। শ্বশুরের বসত বাড়ীতে করেছে এষ্টেটের অফিস ও কর্মচারীদের বাসস্থান। শ্বশুরের সম্পত্তির আয় থেকে করেছে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিধবাশ্রম। উমা দেবীর দানশীলতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার সর্বস্থানে। বীরেন একটি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছে সহর-তলীতে। সেই প্রতিষ্ঠানের পাশে সদাসুক জেঠিয়া নামে এক ধনী মাড়োয়ারীও সেইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করে এক বিস্তীর্ণ জমি খরিদ করে রেখেছেন বহুদিন পূর্বে। তার সেই জমির পাশে বীরেনের প্রতিষ্ঠান সমাপ্তির মুখে দেখে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক ঈর্ষায় জলে উঠলেন। এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা বাঙ্গালীদের চিরদিনই ঈর্ষার চোখে দেখেন।—বাংলা দেশে বাঙালীরা ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এটা হচ্ছে তাদের চক্ষুশূল। সদাসুক জেঠিয়া এক প্রস্তাব পাঠাল বীরেনের নিকট। বলে পাঠালো যে তাকে অংশীদার করে নিতে তার নতুন প্রতিষ্ঠানের। তার বিনিময়ে সে দিতে চাইলে তা'র বিস্তীর্ণ জমি ও বহু লক্ষ টাকা। কিন্তু বীরেন প্রত্যাখ্যান করল সেই প্রস্তাব। ফলে ধনী ও প্রতাপশালী মাড়োয়ারী রাগান্ধ হয়ে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল বীরেন রায়কে লোক সমাজে হেয় করার জন্য—তার সব ব্যবসা ধ্বংশ করার জন্য।

বীরেন রায়ের কাপড়ের কলে মিস্ বেলা দে নামে একজন শিক্ষিতা মহিলা কাজ করত। মহিলাটির বয়স কম—বোধ হয় উনিশ কুড়ি হবে। বীরেন তার কাজে ও ব্যবহারে একটু খাতির করে চলতো। এই নিয়ে মিলে অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে বেলা ও বীরেনের নামে কুখ্যাতি করলে। সহসা একদিন মিলে খবর পৌছল বেলা দে'কে পাওয়া যাচ্ছে না। বদলোকে প্রচার করল বীরেন রায় মিস বেলা দে'কে অন্যত্র চালান করেছে কু-মতলবে। বেলার ভাই শরৎ দে কাজ করত এক মারোয়াড়ীর পাটের কারবারে। সে থানায় এজেহার দিল, তার সুন্দরী ভগ্নী বেলাকে অসৎ অভিপ্রায়ে অপহরণ করেছে তার মনিব বীরেন রায়। পুলিশ প্রাথমিক তদন্ত করতে এসে যে সব সাক্ষী সাবুদ পেল তা'তে এই ঘটনাটাকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। পুলিশ-সুপার অবস্থা জানতে পেরে বীরেন রায়কে ডেকে পাঠাল। বীরেন দৃঢ় ভাবে জানাল, এই সব উক্তি অমূলক ও মিথ্যা। সে পুলিশ সুপারকে স্বয়ং এই তদন্ত কার্য করতে অনুরোধ করল। তদন্ত চলল।

উমা ও রেবার নিকট সব ঘটনা জানালে বীরেন। এই ঘটনা এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল সমস্ত শহরে।

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের তদ্বিরে ও অর্থব্যয়ে শেষ পর্য্যন্ত বীরেনের ব্যাপার কোর্টে গড়াল। বীরেনকে

আসামী হয়ে দাঁড়াতে হল 'ডকে'—অনেক তদ্বির করে বীরেনের কোর্টে উপস্থিতি মকুব হল মোটা জামিনের টাকা কোর্টে জমা রেখে। কোর্টে রাজসূয় যজ্ঞ চলল। খবরের কাগজওয়ালাদের কলম বন্ধ করা হল মোটা বকসিস দিয়ে। বীরেনের আনন্দোজ্বল মুখ হল বিষাদাচ্ছন্ন। উমা দুর্ভাবনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন! পুত্রের এই মিথ্যা অপবাদ কোর্টে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে এই তেজস্বিনী নারী বদ্ধপরিকর হলেন। একজন বিখ্যাত বেসরকারী 'ডিটেক্‌টিভ' নিয়োগ করলেন এই রহস্যজাল উদ্ঘাটন করতে।

একজন সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে বীরেনের মোকদ্দমা—কড়া হাকিম, কারুর খাতির রাখেন না—পুলিশের 'রিপোর্ট' বেদবাক্য বলে মানেন। উকিল মিত্র বললেন—এঁর কোর্ট থেকে মামলা অন্যত্র নিতে না পারলে সাজা হবার যথেষ্ট আশঙ্কা। আসামী শঙ্কিত হল—তার মুখে চোখে ফুটে উঠল বিষাদের ছায়া। উমা দেবী ছেলের মলিন মুখ দেখে নিজের বুকে সাহস সঞ্চয় করলেন—বিপদে ভগবানকে স্মরণ করলেন কায়মনপ্রাণে। ছেলেকে বোঝালেন যে উকীলরা অমনি ভয় দেখায়। মক্কেলকে দোহন করার পন্থাই তো ওদের ওই।

শীতের অবসান। শহরের একাংশে একটি সুসজ্জিত বাংলো—সামনে ফুলের বাগান—পিছনে বাংলো। ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রায়ের আবাস স্থান। গগনস্পর্শী দেবদারু গাছগুলির দিকে রায়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ—মৃদু বাতাসে দেবদারু গাছ থেকে ঝরে পড়ছিল পাতাগুলি। রায় একজন সুকবি—প্রকৃতির খেলা এনেছিল তাঁর হৃদয়ে প্রেরণা। তাঁর ভাবাবেশ ভংগ করলে স্ত্রী নমিতা'র নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর—"হবে না, হবে না, হবে না। এক্ষুণি বেরিয়ে যান বলছি?" তারপর শোনা গেল কোমল বামাকণ্ঠ—মা একটি বার দেখা করব ছেলের সঙ্গে—

শ্রীরায় কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে এগিয়ে এসে দেখলেন, বারান্দার সিঁড়ি ধরে অশ্রুমুখে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিধবা—মুখে চোখে উৎকণ্ঠার ছাপ—কিন্তু কমনীয় মুখখানিতে স্নেহ মমতার জ্যোতি বিকশিত। দৃষ্টি বিনিময় হল। ভদ্রমহিলা আশান্বিত হয়ে বারান্দার উপরে উঠে এলেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন—বাবা—। নমিতা ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় ঝংকার করে বলল: সাট্ আপ্!—আপনি যাবেন, না দারোয়ান ডাকব?—ভদ্রমহিলার মুখ চোখ আরক্ত বর্ণ ধারণ করল ক্ষণিকের জন্য। আত্মসংবরণ করে অভিমানভরা কণ্ঠে বললেন: 'না মা, আমিই যাচ্ছি, তোমাকে কষ্ট করে দারোয়ান ডাকতে হবে না—আর—আর—অসিতকে বলো তার দিদি এসেছিল—। দ্রুত পাদবিক্ষেপে নেমে গেলেন মহিলা। শ্রীরায় আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে কি যেন স্মৃতি পথে আনতে চেষ্টা করছিলেন। নমিতা স্বামীর মুখচোখের পরিবর্তন লক্ষ্য করে অবাক হ'ল। উপর থেকে কিছুক্ষণ পরে নেমে এলেন এক বৃদ্ধ—পরিধেয় দেখে সহজেই অনুমান করা যায় তিনি আহ্নিক শেষ করে নামলেন উপর থেকে। তাঁর পদশব্দে চমকে উঠলো সস্ত্রীক শ্রীরায়। সেই মুহূর্তে সেখানে এসে উপস্থিত হলো ঝি নীরদা—কোলে তার খোকনমণি—রায়ের শিশু পুত্র। ঝি সোল্লাসে খোকনের গলার হার ও হাতের বালা দেখিয়ে জানাল—এক ভদ্র-মহিলা খোকনকে আদর করে কোলে নিয়ে পরিয়ে দিয়ে গেছে এই গয়না। নীরদা মহিলার অজস্র প্রশংসা করে বলল: এ যেন মা দুগ্‌গা, মর্ত্যে এয়েছেন—যেমন রূপ তেমনি গুণ। রায় ও নমিতা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে। বৃদ্ধ আশ্চর্য হয়ে বললেন: তিনি কে নীরদা?

নীরদা আবেগভরা কণ্ঠে বলল: বাবা—আমি তানার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে তিনি এক গাল হেসে বললেন, আমি যে খোকা ভাইর দিদিমা—আর কি আশ্চর্যি—খোকন আসতে চায় নি তানার কোল ছেড়ে।

বৃদ্ধ নমিতাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন: কে এসেছিল বউমা?

নমিতা মুখ অন্ধকার করে বলল: জানি না তো।

বৃদ্ধ পুত্রের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালেন। শ্রীরায় অপরাধীর ন্যায় মাথা হেঁট করে বললেন: পরিচয় নেবার সুযোগ হয় নি, তবে এখন আমি অনুমান করে বলছি তিনি বোধ হয় উমা মাসীমা।

বৃদ্ধ বিরক্তি-ভরা কণ্ঠে বললেন: তোমাদের কথার হেঁয়ালী বুঝতে পারছি না! উমা দিদিকে অভয় দেখনি সত্যি, কিন্তু যাকে আমি আমার গৃহে আনার জন্য

কত সাধ্য সাধনা করেছি—কতো অনুরোধ করেছি। আজ তিনিই এসে ফিরে গেলেন—এর মানে?

অভয় নির্বাকভাবে নমিতার দিকে তাকাল অসহায়ের মত। অপরাধিনী নমিতা এগিয়ে এল শ্বশুরের কাছে, তার পর অকপট ভাবে ব্যক্ত করল—উমাদেবীর আগমন ও প্রত্যাবর্তনের কথা অসিতের কাছে। অসিত করুণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠল এই কাহিনী শুনে—আত কণ্ঠে বলল: বউমা, কি করেছ! মনে পড়ে তোমার স্বর্গীয়া শাশুড়ীর কথা—সে বলেছিল তোমার কাছে এই মহীয়সী উমা দেবীর অনুকম্পার কাহিনী— যার দানশীলতায় আমাদের অভয় হয়েছে জেলার শাসন কর্তা। এবারে দেখলে সেই নারীর মহানুভবতা! তুমি তাঁকে ভিকিরির মত তাড়িয়ে দিলে—কিন্তু তিনি তোমার পুত্রকে উপহার দিয়ে গেলেন হার বালা। উমা দি, নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন? আজ এক যুগ হল তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ নেই—বেণুর খোঁজ খবরও নেই নি। জানি না—কি কারণে এসেছিলেন তিনি।

পরদিন। বীরেন রায়ের মোকদ্দমার দিন। উকিল মিত্র নিরাশ কণ্ঠে জানাল আজ মোকদ্দমা চললে আসামীর মুক্তি অসম্ভব। খবর এসেছে মিস বেলা দে'র খোঁজ পাওয়া গেছে বোম্বেতে—তাকে নিয়ে আসছে ডিটেক্‌টিভ্‌ সমর ঘোষ; কিন্তু হাকিম আর সময় দেবেন না বলেছেন গত তারিখে—এই হাকিমের হুকুম নড়াতে পারে এমন উকিল নাই আদালতে। বীরেন আজ কোর্টে এসেছে স্বয়ং—মুখ বিষণ্ন। উকিল মিত্র উদ্বিগ্ন ভাবে এজলাসে প্রবেশ করলে পেশকার সত্যেন সেন জানাল—হাকিম তাকে ডেকেছে খাসকামরায়, এক্ষুণি। শ্রীমিত্র ব্যস্তভাবে হাকিমের খাসকামরায় ঢুকে দেখলেন পাবলিক প্রসিকিউটর অনিল মুখুজ্জে বসে আছেন সেখানে। হাকিম শ্রীরায় সসম্মানে অভ্যর্থনা করে বসালেন শ্রীমিত্রকে তাঁর পাশে। কিছুক্ষণ পরে একটি মোকদ্দমার 'ফাইল' এগিয়ে দিলেন শ্রীমিত্রের সামনে। শ্রীমিত্র একবার চোখ বুলিয়ে তার চশমার মোটা কাঁচখানি রুমাল দিয়ে পুঁছে আর একবার পড়ল রুদ্ধশ্বাসে—তাঁর মুখ থেকে অস্ফুট ধ্বনি বেরুল: কি আশ্চর্য্য! আমি জানি না এই খবর? ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বললেন: আমিও আজ জানতে পেরেছি। আমি কেস ট্রান্সফার করছি শ্রীমুখার্জির ফাইলে। শ্রীমিত্রের মুখে ফুটে উঠল আনন্দ রেখা।.

দুই সপ্তাহ পর। বিচারক শ্রীমুখার্জির এজলাসে মিস বেলা দে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করল—যাতে ব্যক্ত হল কি প্রকারে সদাসুখ মাড়োয়ারী তাকে চাকুরী দেবার প্রলোভনে নানা স্থানে ঘুরিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল বোম্বে সহরে। মোকদ্দমা শুনানীর পর বীরেন রায় মুক্তি পেলেন সসম্মানে।

হাকিমের হুকুমেসদাসুখ মাড়োয়ারীকে গ্রেপ্তার করা হল ও বিচারে সাজা হল তার সশ্রম কারাবাস একটি বছর।

* * * তারপর। এক ছুটির দিন প্রাতে অভয় ও নমিতা চায়ের টেবিলে বসে চা পান করছিল, বেয়ারা এসে ট্রেতে করে দিল একখানি চিঠি। অভয় চিঠিখানি পড়ে হাসিমুখে এগিয়ে দিল নমিতার দিকে। নমিতা পড়ল ক্ষুদ্র চিঠিখানি:

"স্নেহের অভি ও নমি—আমার আদেশ, আজ এই গাড়ীতেই আসবে তোমরা আমার বাড়ীতে—সংগে আনবে দাদুমণিকে। আজ আমাদের নতুন করে পরিচয় হবে—নতুন ক'রে মিলন হবে পরস্পরের সঙ্গে। অসিত আগেই এসে অপেক্ষা করছে।

তোমাদের—মা।"

নমিতা জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল অভয়ের দিকে। অভয় দৃপ্তকণ্ঠে বলল: চলো—এ যে মায়ের ডাক এসেছে, কোর্টের পরোয়ানার চেয়েও এ জরুরী!
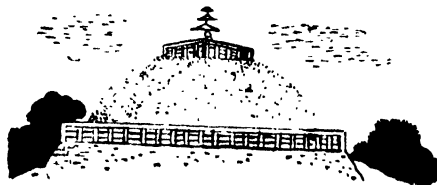
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

অধ্যাপক শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিকোবর দ্বীপ

২৭-এ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ পোর্টব্রেয়ার হইতে বেলা তিনটার এস. এস. মহারাজা জাহাজে উঠিয়া পরদিন অর্থাৎ ২৮ এ সেপ্টেম্বর বুধবার বেলা দশটার সময় আমরা 'কার নিকোবর' (Car Nicobar) বন্দরে উপস্থিত হইলাম। কার নিকোবরে কোন জেটী নাই। সমুদ্রের তীরভূমি হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে জাহাজটি নঙ্গর করিয়া দাঁড়াইয়া গেল, তারপর ছোট নৌকা বা মোটর-লঞ্চে করিয়া ঐ অর্দ্ধমাইল পরিমিত জলপথ অতিক্রম করিয়া যেখানে নামিতে হয় সেখানেও প্রায় এক হাঁটু জল। এক হাতে জুতা এবং অন্য হাতে কোঁচা লইয়া কোন রকমে টলমল্ করিতে করিতে নিকোবরের শুকনা বালি ও মাটীতে আসিয়া পা দিলাম।

পোর্টব্রেয়ার হইতে মাদ্রাজ যাওয়ার পথে 'মহারাজা' জাহাজ অল্প ঘুরিয়া এই কার নিকোবর বন্দরে আসিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য দাঁড়ায়। এখানে কিছু মাল তোলা নামানো হয়, চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া হয় এবং কোন যাত্রী যদি কালেভদ্রে থাকে তবে তাহারাও নামে। জাহাজের অধিকাংশ যাত্রীই কষ্ট করিয়া এই বন্দরে নামে না, তবে আমাদের ন্যায় সকেজো ভবঘুরেরা কয়েক ঘণ্টার জন্য এখানে নামিয়া দ্বীপটি দেখিয়া লয়। মাটের উপর জাহাজের ৩০০ আন্দাজ যাত্রীর মধ্যে বোধ হয় ৪০।৫০ জন যাত্রী সেদিন জাহাজ হইতে এই বন্দরে নামিয়াছিল বেড়াইবার উদ্দেশ্যে, এখানে থাকিবার উদ্দেশ্যে একজন যাত্রীও সে যাত্রায় ছিল না।

কার নিকোবর বন্দরে বছরে বারো বার করিয়া 'মহারাজা' জাহাজ আসে, অতএব যেদিন জাহাজ আসে সেদিন ইহার বন্দর এলাকায় উৎসব পড়িয়া যায়। এই দ্বীপটিতে ভারতীয় থাকেন প্রায় দশ বারো জন, তন্মধ্যে সেই সময় বাঙ্গালী ছিলেন মাত্র একজন।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারত সরকারের নিযুক্ত একজন Asst. Commissioner এর দ্বারা শাসিত হয়, কার নিকোবরেই তাঁহার হেড্ কোয়াটার্স। বর্ত্তমানে যিনি আছেন তিনি উত্তর প্রদেশের লোক, স্ত্রী ও কন্যা লইয়া কার নিকোবর বন্দর হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে নারিকেল, পেঁপে ও অন্যান্য বৃক্ষকুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী সরকারী বাংলোয় বাস করেন। ইঁহার বালিকা কন্যার গৃহশিক্ষক রূপে যিনি নিযুক্ত আছেন তিনিই এই দ্বীপের একমাত্র বাঙ্গালী অধিবাসী। ভদ্রলোক আমাদের সাক্ষাৎ পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালী বলিয়া এক কথায় একেবারেই সমস্ত অপরিচয়ের বাধা বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আন্দামানের দক্ষিণতম বিন্দু হইতে নিকোবরের উত্তরতম বিন্দুর দূরত্ব আন্দাজ ৭৫ মাইল। পোর্টব্রেয়ারের দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য দ্বীপের নাম রাটল্যাণ্ড দ্বীপ, তাহার দক্ষিণে Little Andamans এবং ইহারই দক্ষিণে Car Nicobar দ্বীপ। Car Nicobar-এর দক্ষিণে Camorta ও Nancowri দ্বীপ, তাহার দক্ষিণে Little Nicobar এবং সর্ব্ব দক্ষিণে Great Nicobar। Great Nicobar এর দক্ষিণে বিরাট ভারত মহাসাগর। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বসমেত ২১টি দ্বীপ আছে, এই ২১টি দ্বীপের ভূভাগের মোট আয়তন ৬৩৫ বর্গমাইল। দ্বীপগুলি উত্তর দক্ষিণে ১৬৩ মাইল ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৩৬ মাইল সমুদ্রভাগের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে। এই ২১টি দ্বীপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি দ্বীপের নাম ও বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সভ্যসমাজে প্রচলিত নাম	আদিম নাম	আয়তন
Car Nicobar	পু	৪৯ বর্গমাইল
Camorta	নন্‌কৌড়ী	৫৭·৯১ ,,
Nancowri	নন্‌কৌড়ী	১৯·৩২ ,,
Little Nicobar	অঙ্	৫৭·৫০ ,,
Great Nicobar	সুঙ্	৩৩৩·২ ,,
অন্যান্য ক্ষুদ্রাকৃতি দ্বীপের একত্র আয়তন		১১৮·০২ ,,
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন		৬৩৪·৯৫ বর্গমাইল

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ত্তমানে জাহাজ দাঁড়াইবার জন্য দুইটি মাত্র স্থানে বন্দরের আয়োজন করা আছে, একটি কার নিকোবরে, অপরটি কামোর্টা দ্বীপে। তবে জেটী কোথাও নাই।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ৪৯ বর্গমাইল পরিমিত কার নিকোবর দ্বীপটি একেবারে সমতল একটি ভূখণ্ড। মধ্যে মধ্যে নিচু জলা জমী আছে, কিন্তু নদী বা খাল বলিয়া কোন কিছুই নাই। এখানে মাটী খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিলে সেই গর্ত্তের মধ্যে চোয়াইয়া যে জল আসে উহাই পানীয়রূপে ব্যবহার করা হয়; বন্দর এলাকায় কয়েকটি নলকূপ বসানো আছে। Little Nicobar ও Great Nicobar কিন্তু Car Nicobar-এর মত সমতল নহে। Little Nicobar এ ১৩০০।১৪০০ ফিট উঁচু পাহাড় আছে, Great Nicobar-এ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পাহাড় ২১০৫ ফিট; ইহা Mt. Thuillier নামে পরিচিত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এই Great Nicobar দ্বীপেই কতকগুলি নদী আছে, অন্য দ্বীপগুলিতে নদী নাই। নিকোবর দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত Bompoka নামক দ্বীপে ৬৩৪ ফিট উচু একটি মরা-আগ্নেয় গিরি আছে। আন্দামানের সহকারী হারবার মাষ্টার শ্রীমিহিরকুমার সান্যাল মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার স্বহস্তে তোলা এই আগ্নেয়গিরির একটি আলোক চিত্র আমরা দেখিয়াছিলাম। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমস্তটাই ভারত সরকারের অধীনস্থ হইলেও নন্‌কৌড়ী দ্বীপ পর্য্যন্তই ভারতীয়ের গতিবিধি আছে, তাহার দক্ষিণে Little এবং

Great Nicobar-এ কদাচ যাওয়া আসা হয়। তবে জানা যায় যে, চীনা দেশী-বোট (Chinese Junks) পিনাং হইতে সুমাত্রা ঘুরিয়া এই দুইটি দক্ষিণতম দ্বীপে মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করে। চীন, মালয় এবং সুমাত্রা হইতে মধ্যে মধ্যে দুই চারিটি দল নাকি এখানে বাস করিতেও আসে, তবে এ সম্বন্ধে সরকারী ভাবে আমাদের কিছু জানা নাই। ভারত সরকার নামেই ইহার শাসক, কার্য্যতঃ ইহার কোন সংবাদই রাখেন না। ভারতীয় পুনর্ব্বসতির দিক দিয়া বলা যায় যে, আন্দামানে পুনর্ব্বাসন সাফল্য লাভ করিলে Little ও Great Nicobar-এর দিকে নজর দিতে হইবে, কারণ Car Nicobar ও Nancowry স্থানীয় অধিবাসীতেই পূর্ণ, ওখানে বাহির হইতে নূতন লোক যাইবার স্থান নাই। অভিজ্ঞ লোকের মতে এই দুইটি দক্ষিণতম দ্বীপ লোক বসতি এবং যুদ্ধ-জাহাজের ঘাঁটী হিসাবে অপূর্ব্ব স্থান। Nancowri, Trinkat এবং Camorta-র মধ্যবর্তী স্থানটি এত সুন্দর স্বাভাবিক বন্দর যে এখানে জাহাজ মেরামত ও তৈয়ারীর কাজ খুব ভালো ভাবে হওয়া সম্ভব। মার্কিণী বিশেষজ্ঞেরা ইহাকে 'Magnificient land locked natural harbour' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় কাজ করিলে এই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের অন্যতম রক্ষক এবং পোষকরূপে বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া ভবিষ্যতে গণ্য হইবে। নিকোবর দ্বীপের নামকরণ লইয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, ইহার আদি নাম ছিল 'নক্কবার' (Nakkavar) অর্থাৎ উলঙ্গের দেশ। এই শব্দটি প্রাচীন আরবীয়েরা ভুল করিয়া লিখিতেন, লঙ্কাবালস (Lankabalas)। ইংরাজের মুখে 'লঙ্কাবার' শব্দটি 'নিকোবর' এইরূপ ধারণ করিয়াছে। ভূতাত্ত্বিকের মতে এই দ্বীপগুলি আন্দামানের অংগীভূত। এখানকার আবহাওয়া ও তাপমান আন্দামানেরই অনুরূপ, তবে বারিপাত অপেক্ষাকৃত কম। এখানকার মাটীর সহিত সুমাত্রা ও যাভার সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বীপগুলি সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা উনবিংশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম, এখানে ড্যানিস্ বৈজ্ঞানিক Dr. Rink of Galathea ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার গবেষক Dr. Von Hochstetter of Novara এবং তাঁহার পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক Dr. Valentine Ball এখানে আসিয়াছিলেন। ইঁহারাই সভ্যসমাজে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দেই এই দ্বীপপুঞ্জ আনুষ্ঠানিক ভাবে বৃটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক সম্পদ কি কি আছে তাহার পূর্ণ অনুসন্ধান এখনও করা হয় নাই। খনিজের দিক দিয়া দেখা যায় যে, এখানকার মাটীতে অল্প পরিমাণ তামা পাওয়া যায়। টিন এবং তৈল স্ফাটিকও (amber) এখানে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। এ ছাড়া কামোর্টা এবং নন্‌কৌড়ী দ্বীপের চীনা মাটী (white clay) বৈজ্ঞানিক মহলে কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, তবে উপযুক্তরূপ রপ্তানীর ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

উদ্ভিদ হিসাবে এখানকার প্রধান গাছ, নারিকেল বৃক্ষ। জংগলী গাছ হিসাবে Mangrove, Pandanus এবং পৃথিবীর আদিম অবস্থায় যে সমস্ত তরুলতা নবোত্থিত ভূভাগের উপর দেখা দিয়াছিল সেই সমস্ত তরুলতা এখানে প্রচুর পরিমাণে জঙ্গল হইয়া আছে। এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের চেষ্টায় ভারতবর্ষ এবং চীন দেশ হইতে নানাজাতীয় লেবু, পেঁপে, বেল, আতা, তেঁতুল, কাঁঠাল, কলা, ইক্ষু ইত্যাদি গাছ আনীত ও উপ্ত হইয়াছিল। সেগুলিও সুন্দরভাবে এখানে ফলপ্রসূ হইয়া রহিয়াছে। এখানকার ব্যবহারিক কাষ্ঠ (timber) আন্দামানের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর, তবে এই কাঠেও ঘর বাড়ী বা জানলা দরজা তৈয়ারী হইয়া থাকে। আসবাবপত্রের জন্য এই কাঠ তেমন ভালো নয়। ভালো কাঠের প্রয়োজন হইলে তাহা আন্দামান হইতে আমদানী করিতে হয়। আমাদের সহিত জাহাজে সেই বারেই এইরূপ বহু তক্তা কার নিকোবরে আনা হইয়াছিল।

নিকোবরের প্রধান বাণিজ্য নারিকেল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, গত দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া নিকোবর দ্বীপ হইতে নারিকেল চালান হইয়া আসিতেছে। এখান হইতে প্রতি বৎসর কম বেশী দেড় কোটি নারিকেল চালান হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অধিকাংশই নারিকেলের শুষ্ক শাঁস (copra) হিসাবে রপ্তানি হয়, গোটা নারিকেলও কিছু পরিমাণ চালান হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে ছোপ্‌ড়াও চালান হইতেছে। কার নিকোবরে নারিকেল ভাঙ্গিয়া শাঁস বাহির করিয়া উহা শুকাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে, তবে উহাকে 'copra factory' নাম দেওয়া অনুচিত। এখানে সম্পূর্ণ প্রাচীন প্রণালীতে নারিকেলের খোলা ভাঙ্গিয়া শাঁস বাহির করিয়া ঐ শাঁসকে রৌদ্রে ফেলিয়া শুকাইয়া চালান দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে সমগ্র নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হইতে নারিকেল রপ্তানির কাজ করেন আন্দামানের 'আর আকুঞ্জী এণ্ড সন্স' নামক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ এই প্রবন্ধেই ইতঃপূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া নিকোবর হইতে এইরূপ চালানী কারবার চলিলেও এখনও পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসিগণ টাকা পয়সা ব্যবহার করিতে শিখে নাই। ইহারা বিনিময়ের দ্বারাই এই বাণিজ্য করিয়া থাকে। একটি হাফ্‌প্যান্ট বা একটি গেঞ্জী জামা দিলে ১৫।২০ কাঁধি নারিকেল পাওয়া যায়। এইরূপে জামা, প্যান্ট, ছুরি, কাঁচি, কাটারী, বিড়ি, সিগারেট, ইত্যাদির বিনিময়ে এখান হইতে ব্যবসায়িগণ এ দেশীয় লোকের দ্বারা নারিকেল সংগ্রহ ও বহন করাইয়া থাকেন। তাহাদের দ্বারা যাবতীয় শ্রমের কাজও এইরূপ জিনিষের বিনিময়েই এখনও পর্য্যন্ত করানো হইয়া থাকে।

নিকোবরের আদিম অধিবাসীরা আন্দামানের আদিম অধিবাসী জারোয়াদের ন্যায় হিংস্র বা বিপজ্জনক নহে। ইহারা বুদ্ধিমান, শিকারপ্রিয় অথচ অলস প্রকৃতির মানুষ। মিথ্যা কথা বলা বা চুরি করা ইহারা এখনও পর্য্যন্ত জানে না। নৃতত্ত্বের দিক দিয়া গবেষণা করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহারা মঙ্গোলীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত। সম্ভবতঃ ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ইন্দোচীন হইতে আড়াই বা তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কোন অজ্ঞাত উপায়ে এইখানে আসিয়াছিল এবং তদবধি এইখানেই সমস্ত

পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের সহিত আবয়বিক ও সামান্য ভাষাগত সাদৃশ্য আছে বর্ম্মী, শান্ ও মালয়ীদের সহিত। ইহারা আকারে খর্ব্ব, গাত্রচর্ম্ম লাল্‌চে বা হরিদ্রাভ, চুলগুলি, মোটা, খাড়া এবং অল্প বাদামী রঙের, ঠোঁটগুলি অসম্ভব পুরু। মুখ ও চোখ দেখিলে বেশ একটু চীনা বা ভুটীয়া ছাপ আছে বলিয়া মনে হয়। ইহাদের প্রধান খাদ্য নারিকেল, কলা, পেঁপে, প্যাণ্ডানাসের শাঁস, সমুদ্রের মাছ ইত্যাদি। বন্দর অঞ্চলে যে কয়জন ভারতীয় আছেন তাহারা নিজেদের জন্য চাউল আমদানী করেন, ইহারা সেই ভাত পাইলে পরম আগ্রহে ভোজন করিয়া থাকে। অন্যথায় এখানে চাউলের কোন চাষ আবাদ এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই। ইংরাজ আমলের লোক গণনায় কার নিকোবরের লোকসংখ্যা দেখা গিয়াছিল, ১৯২১ সালে ৯২৭২, এবং ১৯৩১-এ, ৯৪৮১, তন্মধ্যে পুরুষ ছিল ৪৮৮৯ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল ৪৫৯২। বর্ত্তমানে কার নিকোবরের লোক সংখ্যা ১১,০০০ এবং নন্‌কৌড়ীর লোক সংখ্যা ২,০০০-এর মতন হইবে।

কার নিকোবর দ্বীপের বন্দর এলাকায় দুই তিনখানি বড় বড় টিনের [illegible]লা আছে। উহাতে রপ্তানির উপযোগী নারিকেল, নারিকেলের শাঁস ও ছাবড়া সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, জাহাজ আসিলে ওখান হইতে সেইগুলি নৌকায় তুলিয়া জাহাজে আনিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয়। সমস্ত দ্বীপে [ক]য়েকখানি মাত্র লরী, কতকগুলি বয়েল গাড়ী, একখানি সরকারী বাস্ [গা]ড়ী ও কয়েকখানি জীপ্ আছে। বন্দরে নামিয়া আমরা একখানি জীপে [আ]রোহণ করিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী সহকারী কমিশনারের বাংলো অঞ্চলে [গ]মন করিলাম। ইহাই এখানকার সহর। পাশাপাশি কমিশনারের [বা]ংলো, হাসপাতাল, ডাক্তারের বাংলো এবং ইহারই অল্প দূরে বেতার [কে]ন্দ্র। এই বেতার কেন্দ্র হইতে কেবলমাত্র সরকারী খবরই দেওয়া-[নে]ওয়া হয়। সাধারণের টেলিগ্রাম এখান হইতে দেওয়া বা পাঠানোর [ব্য]বস্থা এখনও পর্য্যন্ত হয় নাই, কারণ টেলিগ্রাম করিবার লোকও এখানে [না]ই। বেতার কেন্দ্রে দুইজন সাহেব ও জন তিনেক ভারতীয় কর্ম্মচারী [আ]ছেন। হাসপাতালে জন দুই ভারতীয় ডাক্তার ও দুই তিনজন [ক]ম্পাউণ্ডার বা সহকারী আছেন। পুলিশের চাকুরীতেও এখানে কয়েকজন [মা]ত্র বহাল আছেন। ইহাই এখানকার সমগ্র ব্যবস্থাপনা। এই [অ]ঞ্চল হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি বিমান অবতরণের ক্ষেত্র আছে। [ক্ষে]ত্রটী প্রায় অকেজো অবস্থায় রহিয়াছে, তবে সামান্য সংশোধন করিলে [তাহা] পুনরায় চালু হইতে পারে। এ ছাড়া সমগ্র নিকোবর দ্বীপে নিকোবরী-[দে]র অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। গ্রাম অর্থে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর [এ]বং পানীয় জল সংগ্রহের জন্য মাটী খুঁড়িয়া কতকগুলি খানা তৈয়ারী করা [আ]ছে। কার নিকোবরে পাহাড় বলিয়া কোন কিছুই নাই। একে-[বা]রেই সমতল ক্ষেত্র, অনেকের মতে ইহার উপরিভাগ প্রবালের দ্বারা [আবৃ]ত (coral covered)। এই দ্বীপে উল্লেখযোগ্য কোন নদী নাই, [সে]খানে মাটী খুঁড়িয়া পানীয় জল বাহির করিতে হয়। হাঁসপাতাল অঞ্চলে [ই]কুপ আছে।

নিকোবরীদের কুটীর তৈয়ারী করিবার কায়দা বড় মজার। কতকগুলি মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি মাটীতে পুতিয়া সেই গুঁড়ির মধ্যভাগে কাঠের সাহায্যে প্লাটফরমের মত তৈয়ারী করা হয়। এইরূপ প্লাটফরম মাটী হইতে দশ বারো ফুট উপরে হয়। ঐ প্লাটফরমই তাহাদের কুটীরের মেঝে। প্লাটফরমগুলি গোলাকার এবং উহার উপরে চতুর্দ্দিকে টোপরের ন্যায় আকারের দেওয়াল ক্রমশঃ উপর দিকে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় উঠিয়া শেষে মিশিয়া গিয়াছে। একখানি গোলাকার থালার উপরে একটি টোপর বসাইয়া দিলে থালা ও টোপরের অভ্যন্তরে যেরূপ জায়গা থাকে ইহাদের বাড়ীও সেইরূপ। মনে করুন ঐ থালাখানি বিরাট আকারের এবং উহা মাটী হইতে দেড় মানুষ উপরে মাটীতে পোতা পঞ্চাশ খাটটি খুঁটির উপর অবস্থিত। ঐ থালার একপাশে তলায় চৌকা করিয়া কাটা আছে এবং ঐ কাটা অংশ হইতে মাটী পর্য্যন্ত একটি মই আছে। ঐ মই দিয়া গৃহের বাসিন্দারা বাড়ীতে ওঠা নামা করে। এ ছাড়া ঐ ঘরে আর কোন জানলা বা দরজা নাই। দিনের বেলাতেও ঐরূপ ঘরের ভিতর গভীর অন্ধকার। দিনের বেলায় বাড়ীর নিচে মাটীর উপর বাড়ীর ছেলেমেয়ে লোকজন শুইয়া বসিয়া থাকে। এইরূপ কাছাকাছি কয়েকখানি বাড়ী লইয়া এক একটি ছোট গ্রাম গঠিত হইয়া থাকে।

নিকোবরীদের সমাজ ব্যবস্থা অতি আধুনিক সাম্যবাদী রীতিতে চলে। ইহাদের গ্রামের মোড়লকে বলা হয় ক্যাপ্টেন। গ্রামের ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সকলেই ইহাকে রাজার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মান্য করে। মাছ, নারিকেল, প্যাণ্ডানাস যে যেখান হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করে সমস্তই ক্যাপ্টেনের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়; ক্যাপ্টেনের তত্ত্বাবধানেই তাহা যথাযথ ভাবে সকলের মধ্যে বণ্টিত হয়। অসুস্থ হইলে ক্যাপ্টেন চিকিৎসা করে, প্রয়োজন মত ক্যাপ্টেনই বিবাহ দেওয়ায় বা বিবাহ নাকচ করে, গ্রামের লোকের চাহিদা ক্যাপ্টেনই মিটাইয়া থাকে। বন্দর এলাকা হইতে ২।৪ মাইলের মধ্যে মেয়ে পুরুষ সকলেই কিছু না কিছু পরিধান করে কিন্তু ৫।৭ মাইল দূরের গ্রামগুলিতে সকলেই উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। দূর গ্রামে আমাদের ন্যায় বাহিরের লোক কেহ আসিলে ক্যাপ্টেন তাহাদের সহিত ইঙ্গিতে আলাপ করিয়া যদি মনে করে যে আগন্তুকরা সম্মানার্হ, তাহা হইলে সে দ্রুত নিজের ঘরে গিয়া একখানি হাফ্ প্যাণ্ট পরিয়া বাহির হইয়া আসে। অন্যান্য মেয়েছেলে বুড়োবুড়ী পূর্ব্ববৎ উলঙ্গই থাকে। ইহাদের ধারণা যে, ক্যাপ্টেন প্যাণ্ট পরিলেই সারা গ্রামের প্যাণ্ট পরা হইয়া গেল। বর্ত্তমান সাম্যবাদীদের তুলনায় ইহারা যে কত বেশী অগ্রণী তাহা এই একটি ব্যাপার হইতেই সহজে অনুমেয়।

ঘণ্টা পাঁচেক নিকোবর দ্বীপে ঘুরিয়াছিলাম। দেখিলাম বন্দর এলাকার নিকটবর্ত্তী লোকেরা অসুস্থ হইলে ক্যাপ্টেনের উপদেশ লইয়া সরকারী হাসপাতালেই ভর্ত্তি হইতে শিখিয়াছে। হাঁসপাতালে ৫০।৬০টি বিছানা আছে। ঐগুলির অধিকাংশই ভর্ত্তি। সন্তান প্রসব হইতে আরম্ভ করিয়া হাত-পা ভাঙ্গা, পেটের অসুখ, সকল রকম রোগীই এখানে আছে। তিনটি রোগী একটি স্বতন্ত্র ঘরে রহিয়াছে। তাহাদের যক্ষ্মা সন্দেহ করা হইয়াছে (Suspected T. B.)। হাঁসপাতালটির কাঠের

মেঝে, মাটী হইতে ৩।৪ ফুট উচু কাঠের দেওয়াল ও কোথায় বা টিনের চাল কোথাও বা কাঠের তক্তা দিয়া (Shingles) ছাওয়া হইয়াছে। ইহার পর একখানি জীপ সংগ্রহ করিয়া ৫।৭ মাইল দূরের গ্রাম দেখিয়া আসিলাম। মনে হইল দ্বীপে লোক বসতি কম নহে। উলঙ্গ নরনারী প্রথম চোখে পড়িলে কেমন যে বিসদৃশ মনে হয়, কিন্তু পরে উহাতে আর কোন নূতনত্ব থাকে না। ভাষা কিছুই বোঝা যায় না, আকারে ইঙ্গিতে বক্তব্য বুঝাইতে হয়। একজন নিকোবরী পুরুষ এক কাঁধি ডাব লইয়া যাইতেছিল, আমরা ইঙ্গিতে তাহাকে থামাইয়া ডাব খাইব বলিলাম। লোকটি খুসি মনে ডাবের কাঁধি নামাইয়া হাতের চোরা জাতীয় একপ্রকার তীক্ষধার অস্ত্র দিয়া ডাব কাটিয়া দিতে লাগিল। তিনটি ডাব ও তাহার শাঁস খাওয়ার পর যখন বুঝাইলাম যে আর খাইব না, তখন লোকটি নিতান্ত বিরক্তি এবং অবজ্ঞার ভাবে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। পকেট হইতে দুয়ানি, সিকি প্রভৃতি বাহির করিয়া দিতে গেলাম, সে নিতান্ত উপেক্ষাভরে একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, উহা গ্রহণ করিতে তাহার মোটেই ইচ্ছা দেখাইল না। জীপের ড্রাইভার তাহাকে একটি বিড়ি দেখাইতে সে পরম আগ্রহে উহা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ডাবগুলি কাঁধে উঠাইয়া বিড়ি টানিতে টানিতে চলিয়া গেল। উহাদের এক গ্রামে যখন গেলাম, তখন সেই গ্রামের ক্যাপ্টেনকে জীপ-ড্রাইভার বুঝাইয়া দিল যে, আমরা গ্রাম দেখিতে আসিয়াছি। সে দ্রুত প্যাণ্ট পরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত এদিক ওদিক ঘুরিয়া তাহাদের ঘর দেখাইয়া ডাব, পেঁপে খাওয়াইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমরা একটি করিয়া ডাব খাইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম। আমাদের গাড়ীর আশে পাশে ১০।১৫ জন বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ নগ্ন ভাবে শিশুর বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আকারে ছোট হইলেও প্রত্যেকেই বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান। সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে পৃথিবীর গতিপথের সম্পূর্ণ বাহিরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিতে জীবনযাপনকারী এই সমস্ত নিকোবরীদের দেখিয়া ও নিজেদের সহিত তাহাদের তুলনা করিয়া আমাদের মধ্যে কে অধিক সুখী তাহা এখনও নির্ণয় করিতে পারি নাই।

বেলা ৪টা নাগাদ কার নিকোবর হইতে মহারাজা জাহাজ ছাড়িবে, অতএব আমরা সময় থাকিতে পুনরায় বন্দর এলাকায় ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সভ্য নিকোবরী উত্তম সিঙ্গাপুরী কলা লইয়া বিক্রয় করিতেছিল। ইহারা প্যাণ্ট পরিয়াছে, পয়সা লইয়া বন্দরে বসিয়া মাল বিক্রয় করিতে শিখিয়াছে, এবং সুযোগ বুঝিলে ঠকাইতেও চেষ্টা করে। আমরা সকলেই যার যেরূপ বহন ক্ষমতা সে সেইরূপ কলা কিনিলাম, তারপর পুনরায় হাঁটু জলে নামিয়া মোটর বোটে উঠিয়া নঙ্গর-করা মহারাজা জাহাজে নিজের নিজের স্থানে ফিরিয়া আসিলাম। অপরাহ্নে জাহাজ চলিতে সুরু করিল। পিছনে রহিয়া গেল নিকোবর দ্বীপ, এবং বহুদূর পর্য্যন্ত দ্বীপের তীরভূমিতে দণ্ডায়মান নিকোবরীদের দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, আর দেখা যাইতেছিল বন্দরের ধ্বজদণ্ডে উড্ডীয়মান অশোকচক্র চিহ্নিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা। সূর্য্যাস্তের শেষরশ্মি ঐ পতাকাকে আরও উজ্জ্বল, আরও মহিমময় করিয়া তুলিয়াছিল।

সমাপ্ত

ফ্রেডারিক নিৎসে

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঈশ্বরের মৃত্যু

বহুদিন পূর্ব্বেই প্রাচীন দেবতাদের মৃত্যু হইয়াছে। সে আনন্দের মৃত্যু—প্রদোষের অন্ধকারে রোগ-ভোগের পর মৃত্যু নহে। হাসিতে হাসিতে দেবতারা মরিয়া গিয়াছে। একজন দেবতা বলিয়াছিল "একজন মাত্র দেবতা আছেন। সে আমি, আমা ভিন্ন অন্য কোনও দেবতার পূজা করিও না।" একটি ঈর্ষ্যাতুর বৃদ্ধ দেবতা এই কথা বলিয়াছিল। তখন অন্যান্য দেবতারা হাসিতে আরম্ভ করিল। তাহারা বলিল "কোনও ঈশ্বর নাই, কিন্তু দেবতারা আছেন। ইহাই কি ঈশ্বর-পরায়ণতা নয়?"

বিপদ-সঙ্কুল জীবন

বিপদ-সঙ্কুল জীবন যাপন কর। বিসুবিয়াসের পার্শ্বে নগর নির্ম্মাণ কর। যে সকল সমুদ্রে কেহ কখনও যায় নাই, তথায় তোমাদের জাহাজ প্রেরণ কর। যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে বাসকর।

ক্ষুদ্র লোক

ক্ষুদ্র লোকেরা আজ প্রভু হইয়াছে; তাহারা বিনীত হইতে বলে, অধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে বলে; আরও কত কি দাসসুলভ মনোভাব অবলম্বন করিতে বলে। যাহা কাপুরুষোচিত ও দাস-প্রবৃত্তি হইতে উদ্‌ভূত, তাহাই আজ সমগ্র মানবজাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে উৎসুক। আজকার এই সকল প্রভুদিগকে অতিক্রম করিয়া যাও, এই সকল ক্ষুদ্র লোকদিগকে অতিক্রম কর। অতি-মানুষের তাহারা ভীষণ শত্রু। ক্ষুদ্র গুণ (petty virtues) সকল অতিক্রম করিয়া যাও; ক্ষুদ্র নীতি, অনুকম্পার্হ আত্মতুষ্টি, "অধিকাংশ লোকের সুখ"—প্রভৃতি সকলই অতিক্রম কর।"

পাপের প্রয়োজন

পণ্ডিতেরা আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য এক সময়ে বলিয়াছিলেন, মানুষ পাপী। আজও তাহাই সত্য হউক। কেননা পাপই মানুষের

শ্রেষ্ঠতম শক্তি। আমি বলি মানুষকে আরও ধার্মিক এবং আরও পাপী হইতে হইবে। অতি-মানুষের সর্ব্বোত্তম প্রকাশের জন্য শ্রেষ্ঠতম পাপের প্রয়োজন। মহাপাপ দেখিয়া আমি আনন্দিত হই।

১৮৮৬ সালে নিৎসের Beyond Good and Evil (ভালো মন্দের অতীত) এবং ১৮৮৭ সালে The Genealogy of morals (চরিত্র-নীতির বংশ পরিচয়) প্রকাশিত হয়। এই দুই গ্রন্থে নিৎসে প্রচলিত চরিত্র-নীতির সমালোচনা করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে সকল গুণ বর্ত্তমানে নৈতিক গুণ বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কোনও মূল্য নাই। বর্তমানে মূল্য (Values)-সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ (Revaluation of Values) করিয়া নিৎসে পূর্ব্ব ধারণা বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন। তিনি প্রভু-নীতি এবং দাস-নীতির কথা বলিয়াছেন। খৃষ্টের পূর্ব্বে যে নীতি প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রভু-নীতি। খৃষ্ট দাস-নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাচীন রোমানদিগের নিকট মনুষ্যত্ব, বীর্য্য, দুঃসাধ্য-সাধন-চেষ্টা ও সাহসই ছিল ধর্ম্ম। Virtue (Virtus) শব্দের ইহাই ছিল অর্থ। ইহুদীদিগের দাসত্বের সময় তাহাদের মধ্যে যে নীতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাই পরে রোমান্ নীতির স্থান গ্রহণ করে। অধীনতা হইতে বিনয় ও অসহায় অবস্থা হইতে পরার্থপরতা উদ্ভূত হয়। দাস-নীতিতে বিপদ ও ক্ষমতা প্রিয়তার স্থান গ্রহণ করিল নিরাপত্তা এবং শক্তির ইচ্ছা; শক্তির স্থান গ্রহণ করিল ধূর্ত্ততা, প্রকাশ্য প্রতিহিংসার স্থান গুপ্ত প্রতিহিংসা, কঠোরতার স্থান করুণা এবং আত্মসম্মানের স্থান বিবেকের কশাঘাত। খৃষ্ট ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়গম্বরদিগের বাগ্মিতার সাহায্যে দাসের নীতি সর্ব্বজনীন নীতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

খৃষ্ট-প্রচারিত নীতিতে ইচ্ছার কোনও স্থান নাই। তাহাতে ইচ্ছা হইতে অবতরণ করিয়া সত্তার নিশ্চলতার মধ্যে বাসের আকাঙ্ক্ষাই (descent from the will to perfect in being) ব্যক্ত হইয়াছে। খৃষ্টের নিকট প্রত্যেক মানুষের মূল্য ছিল সমান। তাহারই ফল গণতন্ত্র, উপযোগবাদ ও সাম্যবাদ। জীবনের অধোগতিকে উন্নতি বলিয়া নিম্ন শ্রেণীর দার্শনিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন। অনুকম্পা ও স্বার্থত্যাগের মাহাত্ম্যও কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনুকম্পা অবসাদ-জনক বিলাসিতা মাত্র। যাহাদের উন্নতির আশা নাই, যাহারা অনুপযুক্ত, যাহারা নিজের দোষে পীড়াগ্রস্ত, তাহাদের জন্য হৃদয়বৃত্তির অপচয় মাত্র। দাস-নীতির জয় মানবের অবনতির সাক্ষী। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা—অল্প-সংখ্যক সবলের ভোগ্যা। জয় ও প্রভুত্বের ইচ্ছা যতদিন মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণে অক্ষম থাকিবে, ততদিন মানুষ তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত থাকিবে। প্রাণীবিজ্ঞান (Biology) চরিত্র-নীতির মূলভিত্তি। যাহা জীবন-বর্দ্ধক, তাহাই উৎকৃষ্ট, যাহা জীবনের অবসাদক, তাহাই অপকৃষ্ট। ক্ষমতা, সামর্থ্য ও শক্তিই মূল্যের প্রকৃত মানদণ্ড।

১৮৮৮ সালে নিৎসের The Case of Wagner এবং The Twilight of the Idols, এবং ১৮৮৯ সালে Anti-Christ, Ecce Homo (লোকটির দিকে চাহিয়া দেখ) এবং The Will to Power প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত গ্রন্থ আত্মপ্রশংসায় পরিপূর্ণ। ইহার পূর্ব্বেই নিৎসের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। অতিরিক্ত মানসিক চিন্তার ফলে মস্তিষ্ক বিকৃতির সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার রচনা তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছিল। প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের সমালোচনা করিয়া তিনি নিরস্ত হন নাই, ব্যক্তিগত আক্রমণে তাহার লেখনী নিযুক্ত হইতেছিল। খৃষ্টকে তিনি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববন্ধু ওয়াগনারও অব্যাহতি পান নাই। তাহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক বিকৃতিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। একদিকে আপনার গৌরবের ভ্রান্ত ধারণা (paranoia) তাহার মন অভিভূত করিল; অপরদিকে উৎপীড়নের ভয় তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তাহার একখানা গ্রন্থ তিনি ফরাসী সমালোচক টেইন্-কে (Taine) উপহার পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন "এ রকম আশ্চর্য্য-জনক গ্রন্থ পূর্ব্বে কেহ লেখে নাই।" তাহার Ecce Homo গ্রন্থের আত্মশ্লাঘা কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না। এতদিন তিনি তাহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান প্রাপ্ত হন নাই। সকলেই তাহার নিন্দা করিতেছিল। কিন্তু টেইন্ তাহার গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া তাহাকে পত্র লিখিলেন। এই সময়ে ব্রাণ্ডেস্ (Brandes) তাহাকে লিখিলেন, যে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার "অভিজাত মৌলিকবাদে"র (Aristocratic Radicalism) উপরে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ষ্ট্রিনড়বার্গ লিখিয়াছিলেন যে তিনি নিৎসের ভাব অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন। একজন অজ্ঞাত-নামা ভদ্রলোক তাহাকে ৪০০ ডলারের এক চেক পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু তখন নিৎসের দৃষ্টিশক্তি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছিল এবং মস্তিষ্ক-বিকৃতিও বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৮৯ সালে টিউরিনে অবস্থানকালে তিনি এপোপ্লেক্সি রোগে আক্রান্ত হন। সুস্থ হইলে তাহাকে এক উন্মাদ-আশ্রমে লইয়া যাওয়া হয়। তখন তাহার বৃদ্ধা মাতা আসিয়া তাহাকে লইয়া যান, এবং ১৮৯৭ সালে মাতার মৃত্যু পর্য্যন্ত নিৎসে তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকেন। মাতার মৃত্যুর পরে নিৎসের ভগিনী তাহাকে উইমারে লইয়া যান। এইখানে ১৯০০ সালে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দিন ওয়াগনারের ছবি দেখিয়া নিৎসে বলিয়াছিলেন "উহাকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম।"

Thus Spake Zarathustra গ্রন্থের প্রধান কথা দুইটি—অতিমানব এবং অনাদি পুনরাবর্ত্তন (Eternal Recurrence), ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ অতিমানব-বাদের ভিত্তি। জীবন ক্ষুদ্রতম জীবকোষ হইতে মানুষে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মানুষেই অভিব্যক্তি স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। মানুষ উন্নত হইতে হইতে অতি-মানুষে পরিণত হইবে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া মহাশক্তিমান অতি-মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমান মানব মর্কট হইতে যতটা উন্নত, অতি-মানব বর্ত্তমান মানব হইতে ততটা উন্নত হইবে। তাহা যদি না হয়, অতিমানুষের উদ্ভব যদি না হয়, তাহা হইলে মানব-সমাজের

হওয়াই শ্রেয়। কিন্তু অতিমানবের জন্য প্রাকৃতিক নির্বাচনের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, তাহার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে, যৌন-নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রকৃতি তাহার শ্রেষ্ঠতম সন্তানদিগের প্রতি নিতান্তই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। যাহা অসাধারণ, তাহার প্রতি প্রকৃতি বিরূপ, যাহা সাধারণ, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই প্রকৃতি সচেষ্ট। যাহা সর্ব্বোত্তম, গুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সংখ্যা-বাহুল্য দ্বারা তাহাকে অভিভূত করিবার জন্যই তাহার প্রয়াস। অতি-মানুষ আবির্ভূত হইবার পরেও যৌন নির্বাচন ও উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত তাহার স্থায়িত্ব সম্ভবপর নহে।

যাহারা উন্নততর শ্রেণীর মানুষ, প্রেমের জন্য তাহাদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া মূর্খতা। পরিচারিকাদিগের সহিত বীরের, সীবনকারিণী-দিগের সহিত প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিবাহ অযৌক্তিক—প্রজননতত্ত্বের 'খাতির' করে না। সমগ্র জীবনের সুখদুঃখ বিবাহের সহিত জড়িত। প্রেমগ্রস্ত লোকের বুদ্ধিভ্রংশ হয়, ভাবিয়া চিন্তিয়া কার্য্য করিবার সামর্থ্য তাহার থাকে না। সুতরাং প্রেমিকাদিগের পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুতির কোনও মূল্য নাই, আইনেও তাহার কোনও মূল্য স্বীকৃত হওয়া উচিত নহে। যেখানেই প্রেম, সেখানে বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণীত হওয়া উচিত। প্রেম থাকুক সাধারণ লোকের জন্য; সর্ব্বোত্তমের বিবাহ হইবে সর্ব্বোত্তমার সহিত। বংশরক্ষাই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, বংশের উন্নতিও তাহার উদ্দেশ্য। আপনাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সন্তান উৎপাদন-অভিলাষী নরনারীর ইচ্ছাই বিবাহ। তাহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাই বিবাহ।

উৎকৃষ্ট জন্ম ব্যতীত মহত্ত্বের উদ্ভব অসম্ভব। কেবল বুদ্ধি থাকিলেই লোকে মহান্ হয় না। বুদ্ধিকে মহত্ত্বে মণ্ডিত করিবার জন্য সদ্বংশে জন্ম আবশ্যক। সদ্বংশজাত উপযুক্ত পাত্র ও পাত্রীর (প্রজনন তত্ত্বানুমোদিত) বিবাহজাত সন্তানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন। সেই শিক্ষায় বিলাসের বাহুল্য থাকিবে না, কিন্তু দায়িত্ব থাকিবে প্রচুর। দেহকে বিনা প্রতিবাদে কষ্ট সহ্য করিতে শিখিতে হইবে। ইচ্ছাকে শিখিতে হইবে আদেশপালন ও আদেশপ্রদান করিতে। কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা সহ্য করা হইবে না, কিন্তু প্রচুর আনন্দে হাসিতে শিখিতে হইবে। চরিত্র নীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে না। ইচ্ছার বৈরাগ্য (asceticms) শিক্ষা দেওয়া হইবে, কিন্তু দেহকে (flesh) কলুষিত বলা চলিবে না। এইভাবে জাত এবং শিক্ষিত লোক ভালো মন্দের অতীত হইবে। সৎ হইবার চেষ্টা না করিয়া সে নির্ভীক হইবার চেষ্টা করিবে। সাহসী হওয়া আর সৎ হওয়া এক। যাহা শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই সৎ। দুর্ব্বলতা হইতে যাহার উদ্ভব, তাহাই অসৎ। অতি-মানবের প্রধান চিহ্ন বিপদ্ এবং যুদ্ধের প্রতি আকর্ষণ—যদি তাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। অতি-মানব অধিকাংশ লোকের জন্য ব্যবস্থা করিবে সুখ, নিজের জন্য বিপদ। যুদ্ধ যে উদ্দেশ্যেই হউক্ না কেন, তাহা ভালো। বিপ্লবও ভালো, কেননা বিপ্লবের ফলে ব্যক্তির শক্তি প্রকাশিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের ফলে নেপোলিয়ানের উদ্ভব হইয়াছিল।

শক্তি, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই তিনটিই অতিমানবের স্বরূপ। কিন্তু ইহাদের সামঞ্জস্য চাই। যে দুর্ব্বল, সেই তাহার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে; তাহার প্রবৃত্তিকে "না" বলিবার শক্তি তাহার নাই। যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অন্যের প্রতি, বিশেষতঃ নিজের প্রতি, কঠোর হইতে পারা যায়, যাহার জন্য বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন প্রায় অন্য সকল কার্য্যই করিতে পারা যায়, তাহার অনুসরণ করাই মহত্ত্বের প্রধান নিদর্শন; অতি-মানবের শেষ লক্ষণ।

অতি-মানবের উদ্ভবের ক্ষেত্র গণতন্ত্র নহে, অভিজাত তন্ত্র। "নাসিকা গণনার" উপর যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সময় থাকিতে থাকিতে তাহার মূলোৎপাটন করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রথম করণীয় খৃষ্টধর্মের ধ্বংস-সাধন। খৃষ্টের জন্ম হইতেই গণ-তন্ত্রের আরম্ভ। যিনি ছিলেন প্রথম খৃষ্টান, তিনি যাবতীয় বিশেষ অধিকারের (privilege) শত্রু ছিলেন; সমান অধিকারের জন্য তিনি অবিশ্রাম সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন "যিনি তোমাদের মধ্যে সকলের বড়, তিনি তোমাদের ভৃত্য হউন।" ইহা পাগলের কথা, রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, এই রকম মনোভাব তাঁহাদের মধ্যেই উদ্ভূত হইতে পারে। যে যুগে শাসক-শ্রেণী শাসন করিতে অপারগ, সেই যুগেই এইরূপ মনোভাবের উৎপত্তি সম্ভবপর। যখন নীরো ও ক্যারাক্যালা রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখনই এই অদ্ভুত কথা শ্রুত হইল, সে যে সকলের নীচে, সে যে সকলের উপরে, তাহা অপেক্ষা ভাল। খৃষ্টধর্ম যখন ইউরোপ জয় করিল, তখন প্রাচীন অভিজাত-সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধিত হইল। কিন্তু টিউটন ব্যারণগণ যখন সমগ্র ইয়োরোপ জয় করিল, তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন পৌরুষ ফিরিয়া আসিল। নূতন আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নীতির ভার ইহাদের বহন করিতে হইত না; সামাজিক কোনও বিধি নিষেধ তাহাদের ছিল না। শত শত নরহত্যা করিয়া, সহস্র সহস্র গৃহ ভস্মীভূত করিয়া, বহু নারীর ধর্ষণ করিয়া, তাহারা বিজয়-গর্ব্বে ফিরিয়া আসিত। তাহারাই জার্মানী, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইটালী ও রুশিয়ার শাসকগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহারাই এই সকল দেশে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রজার সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার তাহাদের প্রয়োজন ছিল না। এই গৌরবান্বিত শাসক-গোষ্ঠীর অবনতি ঘটিয়াছিল প্রথমতঃ নারী-সুলভ গুণাবলীর গৌরব-খ্যাপনদ্বারা; দ্বিতীয়তঃ ধর্ম-সংস্কারের (Reformation) পিউরিটান ও নিম্ন শ্রেণীর উপযুক্ত (plebian) আদর্শদ্বারা; তৃতীয়তঃ নিকৃষ্ট বংশের সহিত বিবাহদ্বারা। রেনাসাঁর নীতি-বর্জিত, অভিজাত সংস্কৃতির প্রভাবে যখন ক্যাথলিক ধর্ম আভিজাত্য-মণ্ডিত ও কোমল হইয়া আসিতেছিল, তখনি ধর্ম-সংস্কার আবদ্ধ হইয়া য়িহুদী ধর্মের কঠোরতার আমদানী করিয়া, তাহাকে অভিভূত করিল। খৃষ্টীয়-ধর্ম-কর্ত্তৃক যে মূল্যের ধারণা (values) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, রেনাসাঁ ছিল তাহার সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা; যে সকল মহৎ গুণ দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাদের জয় ঘোষণা।......"সিজার বর্জিয়া পোপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, এই গৌরবোদ্দীপ্ত সম্ভাবনা আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে।" জার্মাণ বৈদগ্ধ্য প্রটেষ্টাণ্ট

ধর্মের ফলে মলিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরে এখন আসিল ওয়াগনারের অপেরা। ইহার ফলে আধুনিক প্রাসিয়ানগণ সংস্কৃতির ভীষণ শত্রু হইয়া পড়িয়াছে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মকর্ত্তৃক ক্যাথলিক ধর্ম্মের পরাভবের মতো জার্মাণীকর্ত্তৃক নেপোলিয়ানের পরাভবও সংস্কৃতির ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সেই পরাভবের পরেই জার্মাণী তাহার গেটে, সোপেনহর এবং বিটোভেনকে অবহেলা করিয়া স্বদেশাভিমানীদিগের পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। "সকলের উপরে জন্মভূমি"— এইখানেই জার্মাণ দর্শনের পরিসমাপ্তি। তবু জার্মাণ চরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা হইতে আশা করা যায়,যে তাহারা ইয়োরোপকে পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। ইংরেজ ও ফরাসীদিগের অপেক্ষা তাহারা অধিকতর পৌরুষের অধিকারী। তাহাদের অধ্যবসায়, ধৈর্য্যও শ্রমশীলতার ফল তাহাদের পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞান ও সামরিক আজ্ঞানুবর্ত্তিতা। সমগ্র ইয়োরোপ জার্মাণ সৈন্যের ভয়ে সন্ত্রস্ত। জার্মাণ সংগঠন শক্তির সহিত যদি রুশিয়ার জনবল ও দ্রব্যসম্ভার সংমিলিত হয়, তাহা হইলে মহা রাজনীতির যুগের আবির্ভাব হইবে। জার্মাণ ও স্লাভ জাতির মিলন আমাদের প্রয়োজন। পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা চতুর অর্থনীতিবিদ ইহুদীদিগেরও আমাদের প্রয়োজন। রুশিয়ার সহিত বিনা সর্ত্তে আমাদের মিলন আবশ্যক।

জার্মাণ সংস্কৃতি নূতন; তাহার কোনও ঐতিহ্য নাই। একমাত্র ফ্রান্সের সংস্কৃতিকেই আমি সংস্কৃতি বলিয়া গণ্য করি। কিন্তু অভিজাত সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন করিয়া ফরাসী বিপ্লব সংস্কৃতির উৎসের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। রুশিয়ার অধিবাসিগণ ঘোর অদৃষ্টবাদী। রুশিয়ার শাসনযন্ত্র শক্তিশালী—মূর্খতার জনক পার্লিয়ামেণ্ট সেখানে নাই। ইচ্ছাশক্তি বহুদিন যাবত রুশিয়ায় বলসঞ্চয় করিতেছে। এখন তাহা বন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রুশিয়া যদি ইয়োরোপ জয় করে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। ভবিষ্যতের শক্তির সংগ্রামে রুশিয়ানগণ এবং ইহুদীগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। ইহা খুব সম্ভবপর। কিন্তু মোটের উপর সকল জাতির মধ্যে ইতালিয়ানগণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং উৎসাহী। সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর ইটালিয়ানদিগের মধ্যেও পৌরুষ এবং আভিজাত্যের গর্ব্ব আছে। ইংরেজেরা সর্ব্ব নিকৃষ্ট। গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করিয়া তাহারাই ফরাসী মনের অপকর্ষ সাধন করিয়াছিল। দোকানদার, খৃষ্টান, গাভী, নারী এবং ইংরেজ—সকলে এক শ্রেণীভুক্ত। ইংরেজদিগের উপযোগবাদ (Utilitarianism) পার্থিব বিষয়ে আসক্তি (philistinism) ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির নিকৃষ্টতম কথা। যেদেশে কণ্ঠচ্ছেদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবাধ প্রসার, কেবল সেই দেশেই জীবনকে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রামরূপে ধারণা করা সম্ভবপর। যেদেশে দোকানদার এবং জাহাজওয়ালার সংখ্যার অতিরিক্ত বৃদ্ধির ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের পরাভব ঘটিয়াছিল, কেবল সেই দেশেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছিল। গ্রীকদিগের এই দান ইংলণ্ড বর্ত্তমান জগৎকে দিয়াছে। ইয়োরোপকে ইংলণ্ডের হাত হইতে এবং ইংল্যাণ্ডকে গণতন্ত্রের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? (ক্রমশঃ)

সত্যেন দত্ত রোড

"ভাস্কর"

সত্যেন দত্ত
ছন্দের ভক্ত।
　　তারি নামে পথটি,
　　কবিতার স্বরটি।
ঢুকিতেই মাষ্টার,
তারপরে ডাক্তার।
　　সকালেতে ইস্কুল
　　মেয়েদের বিলকুল।
ইস্কুল দুপুরের
চঞ্চল ছেলেদের।
　　আছে হাঁস আছে পাখী,
　　আছে গরু আছে শাখী।
চুরাস্তার মোড়ে
ছেলেগুলি ঘোরে।
　　খেলে গুলি-ডাণ্ডা
　　পথটায় ঠাণ্ডা।
সারাদিন কলকল
ফুটবল ব্যাটবল।
　　মাঝে মাঝে থান কয়
　　পথ জুড়ে গাড়ী রয়।
ফ্রক যায় প্যাণ্ট যায়,
ধুতী যায় গাড়ী যায়।
　　হাসি যায় কাসি যায়,
　　দুধ যায় ফেরি যায়।
মন যায় আশা যায়
আকাশের কিনারায়
　　খাসা ছোট পাড়াটি
　　বকুলের মালাটি।

—বাইশ—

বৃষ্টি নেমেছে, তবু মেঘে ঢাকা কালো আকাশ। যেন কোনো জীর্ণ মন্দিরের পাথুরে ছাদ ঝুলে আছে মাথার ওপর—তার ফাটলে ফাটলে বিদ্যুৎ বিলাস। এক সময়ে যেন সবটা হুড়মুড় করে সশব্দে ভেঙে পড়বে, তার সঙ্গে সঙ্গে নিচের পৃথিবীটাকে নিয়ে যাবে রসাতলের দিকে।

লাল মাটির তমসা দিগন্ত মুখর করে তীব্র স্বর উঠেছে মালিনী নদীর জলে। সেই বান এসেছে নদীতে—সেই ঢল নেমেছে লাল-মাটীতে: যার প্রতীক্ষায় বরিন্দের পৃথিবী এতকাল সহস্র দীর্ণ হয়েছিল—তুলছিল ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের গৈরিক ঝড়; এতদিন ধরে দেখা দিয়ে মিলিয়ে মিলিয়ে যাওয়া মেঘে মেঘে পড়ছিল যার পদাঙ্ক লেখা, টিলার ওপর নিঃসঙ্গ তালগাছের মাথার ওপর যার তর্জনী সংকেত দেবার জন্যে স্তব্ধ হয়ে ছিল!

সেই বৃষ্টি এসেছে—এসেছে সেই সমুদ্র-প্রতিভাস বন্যার আবেগ। এইবার বন্যার সঙ্গে লড়াই। অন্ধ মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের বোঝাপড়া। কালাপুখরির তিন হাজার বিঘে ধানী জমির ফসল আর ভেসে যেতে দেবনা আমরা।

শেষ পর্যন্ত যমুনা আহীরও এসেছে দলবল নিয়ে। বুক পুড়ে যাচ্ছে ঝুমরীর জন্যে—বরিন্দের বন্য হিংসা জ্বলছে মাথার মধ্যে ধুধু করে। তার শোধ নেবে সে কড়ায় গণ্ডায়, একটা আধলা বাকী রাখবেনা। কিন্তু তার আগে বাঁধ বাঁধা চাই।

সাঁওতালেরা এসেছে—এনেছে তীর ধনুক। সোনাই মণ্ডলের নেতৃত্বে চাপ চাপ মাটি কোদালের মুখে তুলে ডাঁড়ার মুখে ফেলছে তুরীরা। বৃষ্টি নেই এখন—এলো-মেলো হাওয়ায় কাঁপছে পঞ্চাশটা মশালের শিখা—প্রেত-দীপ্তি জ্বলছে ফেনিল ঘোলা জলের ধারায়, মানুষগুলোর মুখে বুকে, মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা হোসেনের দল, আর কৃষাণ-সমিতির লোকগুলির লাঠিতে লাঠিতে। আকাশের জমাট মেঘ যেন সেইদিকে তাকিয়ে আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে আছে।

একটু দূরে অপেক্ষা করে আছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার রঞ্জন, নগেন, আর হোসেন বাদিয়া। কারো মুখে কথা নেই: শুধু মশালে মশালে দোল-খাওয়া রক্তাভ আলো-ছায়ায়, মালিনী নদীর গর্জনে, ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসা ডাঁড়ার মুখে চাপ চাপ মাটি পড়ার শব্দে অভিভূত হয়ে আছে চারদিক। আকাশের ফাটলে ফাটলে লুটিয়ে যাচ্ছে সাপের জিভের মতো ক্ষীণ বিদ্যুৎ।

—ঠাকুরবাবু!

একটা চাপা স্বর শোনা গেল বাঁধের তলা থেকে। এক চাপ অন্ধকারের আড়াল থেকে আবার ডাক শোনা গেল: ঠাকুরবাবু!

—কে?

সীমাহীন বিস্ময়ে ঝুঁকে পড়ল রঞ্জন। ছায়ার মধ্যে কায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। একটুখানি শাদা কাপড়ের আভাস ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ছে না। যেন কোথাও থেকে সে আসেনি। মাথার ওপরের অন্ধকার আকাশ থেকে নিঃশব্দে ঝরে পড়েছে এখানে।

—একটু এদিকে আসবি ঠাকুরবাবু?

নগেন জিজ্ঞাসা করলে, কে ডাকছে?

রঞ্জন বললে, কালোশশী।

—সেই বেদের মেয়েটা? কী চায় এখানে?

—দেখছি।

বাঁধের গা বেয়ে রঞ্জন নিচে নেমে এল।

এইবার আরো স্পষ্ট করে দেখা গেল কালোশশীকে। ..এ দু হাত দূরে সে দাঁড়িয়ে। দেহের ধারালো রেখাগুলো মূর্তির মতো কঠিন রেখায় জেগে উঠেছে। চিক চিক করছে গলার রূপোর হাঁসুলী, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দুহাতের দুটো সাপের ঝাঁপি।

সেই বৃষ্টির রাত—মেটে প্রদীপের ছায়া-কাঁপা ঘর—সেই অর্থহীন কান্না। কালো পাথরের মতো বেদের মেয়ের হৃৎপিণ্ড-ফাটা অশ্রুর উচ্ছ্বাস। কয়েক মুহূর্ত একটা কথাও বলতে পারলনা রঞ্জন। এই অসময়ে—এই বাঁধের ধারে কোথা থেকে এল কালোশশী? কী চায়?

কিন্তু সে তো ঘর। সে তো আকুল বৃষ্টির সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এ তা নয়। এখানে মেঘের কোলে বিদ্যুৎ জাগছে ভয়ঙ্করের ভ্রূকুটির মতো, দিগন্তে এখানে স্তম্ভিত ঝড়, এখানে প্রায় দুশো মানুষের অপমৃত্যু সংকল্পে চারদিক আকীর্ণ হয়ে আছে। কোদালের মুখে চাপ চাপ মাটি পড়ে এখানে যখন মালিনী নদীর ফেনিল জল অসহায় আক্রোশে রুদ্ধস্রোত হয়ে আসছে, তখন কয়েক বিন্দু চোখের জল কখন কোন্ মাটিতে নিঃশেষে মিলিয়ে গেছে—কে তার খবর রাখে?

তবু কালোশশীর সামনে দাঁড়িয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল রঞ্জন।

কিন্তু যা আশঙ্কা করছিল, তার কিছুই ঘটলনা।

কালোশশী বললে, তোরা তৈরী আছিস ঠাকুরবাবু?

রঞ্জন হাসল: তৈরী বই কি। আর দু তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তুই এখানে কেন?

—খবর দিতে এলাম—শুকনো স্বর শোনা গেল কালোশশীর। যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেইখানেই সে রইল। এক পাও সে নড়লনা—গলার আওয়াজ ছাড়া মূর্তির মতো কঠিন রেখা-দিয়ে-গড়া দেহে এতটুকু স্পন্দন লক্ষ্য করা গেলনা।

—কিসের খবর?—রঞ্জন ভ্রূকুটি করল।

—ওরা আসছে।

—কারা?

—শাহু আর জমিদারের লোকজন।

—শাহু!—রঞ্জন চমক খেল: শাহু কেন?

—তা তো জানিনা।—কালোশশী একবার থামল: শাহুর সব বরকন্দাজ আসছে, সেই সঙ্গে জমিদারের লাঠিয়াল। তরোয়াল, বন্দুক, বল্লম—সব আসছে ঠাকুরবাবু!—এতক্ষণে কালোশশীর গলায় প্রাণের লক্ষণ পাওয়া গেল, কাঁপতে লাগল উৎকণ্ঠার রেশ: তোদের মারতে আসছে।

কিন্তু কালোশশীর সে উৎকণ্ঠা রঞ্জনকে স্পর্শ করলনা। শাহু—শাহুও আসছে! কালাপুখরির বাঁধে তার কোনো স্বার্থ নেই, তবুও আসছে লোকজন, লাঠিয়াল আর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে! যে ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে প্রতিদিন তার মামলা-মোকদ্দমা আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা—আজ অহেতুক-ভাবে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে একবিন্দু দ্বিধা হলনা ফতেশা পাঠানের!

—তুই জানলি কী করে?

—ওরা একসঙ্গে বেরিয়েছে। তাই দেখেই তো তোকে খবর দিতে এলাম। তোরা সাবধান হয়ে থাকিস।

—সাবধান!—রঞ্জন হাসল: হাঁ, সাবধান হয়ে আমরা আছি।

ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে শাহু আসছে। কিন্তু বিস্ময় বোধ করবার কী আছে এতে? যে কারণে আজ আলিমুদ্দিন মাস্টার তাঁর মত আর পথের সম্পূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও এসে দাঁড়িয়েছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ঠিক সেই কারণেই শাহুর সঙ্গে মৈত্রী রচনা হয়েছে ভৈরবনারায়ণের। আজ দুদিকে দু দলকে জোড় বাঁধতেই হবে—শোষক আর শোষিতের সমস্ত স্বার্থ দুটি দলেই ভাগ হয়ে গেছে আজকে। এই নিয়ম—এই ইতিহাস।

চিন্তার ঘোর কাটল কালোশশীর একটা নিশ্বাসে। ভালো করে ব্যাপারটা বোঝবার আগেই রঞ্জন দেখল, হাতের ঝাঁপি নামিয়ে কখন কালোশশী এসেছে তার কাছে, নুয়ে পড়ে নিয়েছে তার পায়ের ধুলো। তার আঙুলের মৃদু ছোঁয়ায় সে চমকে উঠল।

—কী হল রে?

—চলে যাচ্ছি ঠাকুরবাবু। শুনলাম আইহোর বাজারে এসেছে বেদের দল। ওরাই আমার আপনার লোক—চলে যাব ওদের সঙ্গেই। পথে বেরিয়ে ভাবলাম তোকে একবার খবরটা দিয়ে যাই।

মুহূর্তের জন্যে একান্ত কাছের মানুষটির কাছে ফিরে এল রঞ্জন। একটি দীর্ঘশ্বাস তাকে চকিত করে তুলল, মাত্র মুহূর্তের জন্যেই।

—তুই চলে যাচ্ছিস কালোশশী।

—হাঁ ঠাকুরবাবু।—এতক্ষণে যেন একবার হাসল কালোশশী: ঘর আর বাঁধা হলনা।

পরক্ষণেই ঝাঁপি দুটো তুলে নিয়ে সে অন্ধকারের মধ্যে হাঁটতে শুরু করল। মনের ভুল কিনা বোঝা গেলনা—কাঁধে মাটি পড়বার আওয়াজ সে ভুল শুনল কিনা তাও বোঝা গেল না। শুধু যেন দীর্ঘশ্বাসের মতো কানে এল: ওরা আসছে। কিন্তু তুই মরিসনে ঠাকুরবাবু, তুই মরিস নে—

চোখ দুটো কচলালো রঞ্জন। স্বপ্ন দেখছিল নাকি এতক্ষণ। কোথাও কেউ নেই। আরো অনেকবার যেমন করে নিঃশব্দে অন্ধকারে মুছে গেছে কালোশশী, আজো তেমনি করে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আর সে ফিরবে না। ঘর বাঁধতে চেয়েছিল, পারল না। বন্যার মুখে একদিন একটা ঘাটে এসে বাঁধা পড়েছিল, আবার বন্যার মুখেই শূন্যতায় ভেসে গেল সে।

দূর হোক ছাই। স্রোতের কুটোর জন্যে কী হবে সময় নষ্ট করে! আকাশে বিদ্যুতের আর একটা ভ্রূকুটি জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সে সজাগ হয়ে উঠল। একটা বেদের মেয়ে নয়—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ। বেনো জল নয়, দিকে দিকে প্রাণবন্যার উচ্ছলিত উদ্দাম প্রবাহ।

রঞ্জন বাঁধের ওপরে উঠে এল।

নগেন বললে, এত দেরী হল যে? কী হয়েছে?

—জরুরি খবর আছে ভাই। ভৈরবনারায়ণের সঙ্গে ফতেশা পাঠান আসছেন বাঁধ বাঁধা রুখতে।

—কী বললেন!—আলিমুদ্দিন অস্ফুট চীৎকার করলেন একটা।

—হাঁ, খবরটা পাকা বলেই মনে হচ্ছে।

তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে রইল খানিকক্ষণ। শুধু অন্ধকার মুখর হয়ে চলল ঝপাঝপ কোদালের আওয়াজ—ঝপাস্ ঝপাস্ করে মাটি পড়ায় আর ক্রমাগত বাধা পাওয়া জলের ক্রুদ্ধ বিরাক্ত গর্জনে।

নগেন বললে, মাস্টারসাহেব, বড়লোকেরা একজাত হিন্দুস্থানীও নয়—পাকিস্তানীও নয়।

আলিমুদ্দিন কী ভাবছিলেন। আস্তে আস্তে মাথা তুললেন। ঝক ঝক করে উঠল চোখ।

সংক্ষেপে বললেন, জানি।

—কী করবেন এবার?—মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে নগেন।

—যা করতে এসেছিলাম—আলিমুদ্দিন তেমনি সংক্ষেপেই জবাব দিলেন। তার পর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে ওঠা মাটি কাটা কালো মানুষগুলির পিঠের দিকে, নিঃশব্দে কান পেতে জলের মুখে মাটি পড়বার আওয়াজ শুনে বললেন, সেই তো আমার আজাদ পাকিস্তান। বড়লোকের নয়। গরীব মুসলমানের—গরীব হিন্দুর।

সেই মুহূর্তে চারদিকের মানুষগুলো কলরব করে উঠল। আকাশ ফাটানো একটা গর্জন করল যমুনা আহীর—যেন বরিন্দের লাল মাটির অন্ধকার বুকের ভেতর থেকে জেগে উঠল ইতিহাস। শতাব্দীর পর শতাব্দীর সীমা পার হল—পার হল মহাকালের সিংহদ্বারের পরে সিংহদ্বার; জলস্তম্ভ উঠল "দীপের দীঘি"র শ্যাওলা ধরা নির্জীব স্তব্ধতায়, থর থর করে কেঁপে উঠল দিব্যোকের জয়স্তম্ভ, একটা বিরাট বিস্ফোরণে "ভীমের জাঙ্গাল" দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়ে গেল।

সেই সঙ্গে লাল মাটির টিলাগুলোও গর্জন তুলল—যেন একদল ক্রুদ্ধ সিংহ যুগ-যুগান্তের ঘুম ভেঙে লেজ আছড়ে উঠে দাঁড়ালো। কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল—তালগাছের মাথাগুলো দুলে উঠল ঝড় খাওয়া ঝাণ্ডার মতো। অন্ধকার আকাশ থেকে বিদ্যুতের তরোয়াল হাতে নামলেন গণ-বিপ্লবের নেতা দিব্যোক: মাথার ওপর বজ্রগর্জিত রুদ্রতা, পায়ের তলায় থর থর শব্দে কেঁপে ওঠা পৃথিবী।

মাঠের ওপারে একরাশ মশাল। রক্তের ছোপ লাগা দিগন্ত।

যমুনা আহীর আবার পৈশাচিক স্বরে চীৎকার করে উঠল।

—ঠিক হো যাও ভাই সব।

বুড়ো সোনাই মণ্ডল থেকে টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়া পর্যন্ত; জরাতুর শার্দূল থেকে নাগশিশু। হোসেনের দল আর তুরীরা। 'কৈবর্ত-বিদ্রোহের' নবজন্ম।

—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—গম্ভীর স্বর উঠল নগেনের। তার প্রতিধ্বনিতে মালিনী নদীর জল পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। আর দূরে মাঠের পারে রক্তের রঙ ধরানো মশাল-গুলো থমকে দাঁড়ালো একবার—কিন্তু মুহূর্তের জন্যেই।

—ঠিক হো যাও—যমুনার বজ্রধ্বনি বাজতে লাগল পর পর। যে তেলপাকানো পিতলের গাঁট বাঁধা লাঠির ঘায়ে জটাধর সিংয়ের মাথা গুঁড়ো হয়ে গেছে, সেই লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে সে ওই মশালগুলোর দিকে ছুটে চলল, আগ্ বাড়ো ভাই, আগ্ বাড়ো—

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দুটো ঝড় মুখোমুখি দাঁড়ালো।

সকলের আগে কুমার ভৈরবনারায়ণ। আফিঙের নেশায় নিদ্রিত স্থূলোদর মাংসপিণ্ড নয়। আরক্তিম ভয়ঙ্কর চোখ। ঘোড়ার পিঠে তার চেহারাটাকে অতিকায় বলে মনে হতে লাগল—মনে হতে লাগল: কাঞ্চনগরের যুদ্ধে তার পিতৃপুরুষের গৌরব কীর্তি নিতান্তই তবে ইতিহাস নয়!

ভৈরবনারায়ণ বললেন, সরে যাও সব। খুন-খারাপী হবে নইলে।

জবাব দিলেন আলিমুদ্দিন: কেউ সরবে না।

মশালের আলোয় পেছনে ফতেশা পাঠানকে দেখা গেল। চীৎকার করে শাহু বললেন, শালা কাফের!

—কাফের!—আলিমুদ্দিন চীৎকার করে বললেন, কে কাফের? ইংরিজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গরীবের রক্ত শুষে খেতে এসেছো—কে কাফের?

—খবদার!—শাহু আকাশে হাত তুললেন: মারো শালাদের!

—চলা আও—যমুনা আহীরের হাতের লাঠিটা ঘুরতে লাগল বন্ বন্ করে। ওদিক থেকে একটা বল্লম ছুটে এসে রঞ্জনের পায়ের কাছে মাটিতে গেঁথে গেল—শন্ শন্ করে ছুটল টুলকু মাঝির ব্যাটা ধীরুয়ার হাতের তীর!

চীৎকার, গর্জন, গোঙানির ভেতরে বাজতে লাগল লাঠির আওয়াজ। নেচে নেচে ফিরতে লাগল মশালের প্রেতছায়া। ফট্ ফট্ করে উঠতে লাগল মানুষের মাথা ফাটার শব্দ।

দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ এল একটা।

পেছন থেকে নির্ভুল লক্ষ্যে বন্দুক ছুঁড়েছে ডাক্তার খোদাবক্স খন্দকার। এতদিন পরে সেই ঘুষির বদলা নিয়েছে সে।

সভয়ে রঞ্জন দেখল, নিঃশব্দে বুকে হাত দিয়ে বাঁধের ওপর শুয়ে পড়েছেন আলিমুদ্দিন মাস্টার।

* * *

তবু তৈরী হয়ে গেছে রক্তমাখা বাঁধ। মালিনী নদীর জল ষাঁড়ার মুখে ঢুকতে না পেরে ক্রুদ্ধ আক্রোশে পাশের ঢাল জমি বেয়ে নেমে গেছে চাকালে। আর পালিয়েছে শাহু আর ভৈরবনারায়ণের দল, আট দশজন আহত লোককে কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে তাড়া-খাওয়া কুকুরের মতো।

এর পরে হয়তো পুলিশ ফৌজ নিয়ে পৌঁছুবেন বদরুদ্দিন জমাদার, আর দারোগা তারণ তলাপাত্র। কিন্তু বাঁধ বাঁধা হয়ে গেছে, বাধ রুখতেও হবে। সে হয়তো আরো বড় লড়াই।

কিন্তু এ অন্ধকারের পার থেকে যে সূর্য উঠছে, সে সূর্য সেদিনও জেগে থাকবে। যে রাত্রি প্রভাত হল—সে রাত আর ফিরে আসবে না।

রঞ্জনের ঘুম ভাঙল জয়গড়ে নগেনের বাড়িতে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে পাশ ফিরতে গিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল সে।

কপালে হাত দিয়ে কে বললে, আর একটু শুয়ে থাক্ চুপ করে।

রঞ্জন চমকে চোখ মেলল।

—কে?

—চিনতে পারছিস না রঞ্জু? আমি পরিমল।

পরিমল লাহিড়ী অল্প অল্প হাসছিল।

—কখন এলি তুই?

—তোদের যুদ্ধ শেষ হবার পর। এসে দেখি, সৈনিক হবার আর দরকার নেই, তাই নার্স হতে হল।

রঞ্জন উত্তেজিতভাবে বললে, আর মাস্টার সাহেব? আলিমুদ্দিন মাস্টার?

—পাশের ঘরে আছেন। নগেনের বোন নার্স করছে।

—বাঁচবেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল পরিমল: বোঝা যাচ্ছে না।

যন্ত্রণায় রঞ্জনের হৃৎপিণ্ড যেন স্তব্ধ হয়ে এল। নিঃশব্দ গলায় বললে, বড্ড খাঁটি মানুষ।

পরিমল অন্যমনস্কভাবে বললে—হাঁ, সব শুনলাম নগেনের কাছ থেকে। ওই মানুষগুলোর হাতেই খাটি পাকিস্তান জন্ম নেবে। এখন শোন্। এখানে আপাতত তোকে নিয়ে বিস্তর গণ্ডগোল হবে। তুই আজই চলে যাবি কলকাতায়। থাকলে না-হক ঝামেলা বাড়বে কতগুলো।

—তারপর এখানকার ভার?

—সেইটে নেবার জন্যেই তো আমি এলাম।

এই আহত অসুস্থ মুহূর্তে একটা কথা বারবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল। অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় একটা আর্ত প্রশ্ন জেগে উঠতে চাইল বারে বারে—কিন্তু উচ্চারণ করতে পারল না রঞ্জন।

পরিমল নিজেই বললে সে কথা।

—একটা খবর তোকে এখনো দেওয়া হয়নি। মাস-খানেক আগে মিতাকে অ্যারেস্ট্ করেছে।

—ওঃ!

আর কিছু জানবার নেই, আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। এইবার যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে পারে রঞ্জন। এখনো অনেক দেরী—নীড়ের স্বপ্ন এখনো অনেক দূরান্তের অরণ্যছায়ায়। তার আগে শুধু বেদের মেয়ে কালোশশী কেন—কেউই ঘর বাঁধতে পারবে না। না—কেউ নয়।

দরজার গোড়ায় ছায়ার মতো এসে দাড়ালো নগেন। পাণ্ডুর মুখে বললে, একবার উঠতে পারবেন রঞ্জনদা—আসতে পারবেন এঘরে?

রঞ্জন সোজা বিছানার ওপর উঠে বসল: মাস্টার সাহেব?

নগেন বললে, আসুন।

উত্তমার কোলে মাথা রেখে ঘুমভরা চোখ মেলে একবার তাকালেন আলিমুদ্দিন। কাউকে চিনলেন না। রঞ্জনকে নয়, নগেনকেও নয়।

ফিস্ ফিস্ করে ডাকলেন, কল্যাণী?

উত্তমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল।

—কল্যাণী নয় দাদা, আমি উত্তমা।

—না, কল্যাণী!—আলিমুদ্দিন হাসলেন: আর তো তুমি দূরে নেই বোন, এবার কাছে চলে এসেছো। কিন্তু এ যাত্রা আর হলনা দিদি, আবার তোমার ভাইফোঁটা নেব আজাদ পাকিস্তানে। পাকিস্তান জিন্দাবাদ!

নিবিড় তৃপ্তিতে আস্তে আস্তে তাঁর চোখ দুটি বুজে এল।

* * *

লাল মাটি।

আমার মা। অনেক ইতিহাসের রক্ত-স্বাক্ষরে সীমন্তিনী তুমি—অনেক প্রাণ-সাধনার তুমি মহাভৈরবী। আজও তোমার সাধনা শেষ হয়নি, আজও গৈরিক মাটিতে তোমার ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, আজও কালবৈশাখীর ঝড়ে দিকে দিকে উড়ে চলেছে তোমার ছিন্ন ভিন্ন ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি।

কিন্তু আমরা আজ এসেছি। আমাদের হাতে নতুন ইতিহাসের লেখনী তলোয়ার হয়ে জ্বলছে। আমাদের বুকে আমরা বয়ে এনেছি রুকনপুরের নির্বাপিত দীপ স্তম্ভের শেষ শিখা।

আমার জন্মভূমি—আমার লাল মাটি। আজকের এই রক্তিম প্রভাতে তোমার রক্তধারা মাটির একটি তিলক শুধু আমার কপালে পরিয়ে দাও॥

শেষ

অধিক ধান্য ফলানো সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতের চাষীদের কাছে আমাদের শিক্ষণীয়

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস এম্‌-এস্‌সি, ডি-ফিল্‌

গত অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে নিখিল ভারত কৃষ্ঠকর্মী সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমাকে মাদ্রাজ যেতে হয়েছিল। ডিসেম্বরের শেষে মাদ্রাজ হয়েই ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান কংগ্রেসে গেলাম। সঙ্গে নাড়ীর টান থাকার দরুণ রেলপথের দুই পাশের মাঠ দেখতে দেখতে যাই। বাঙ্গালোর থেকে মোটরে মহীশূরে যাওয়াতে ঐ অঞ্চলের চাষের অবস্থাও ভাল করে দেখবার সুযোগ পাই।

ওদের ধান চাষ দেখেই আমি সব চেয়ে বেশী বিস্মিত হয়েছি। অক্টোবরে দেখলাম—মাঠের অনেক ক্ষেতেই ধান পেকেছে, আবার তার পাশেই সদ্য ধান কেটে নেওয়া জমিতে চাষ দিয়ে ধান চারা বসানো হচ্ছে। এবারেও ঠিক তাই চোখে পড়ল। কোথাও বা ধান কাটা হচ্ছে ; সেত ক্ষেতের পাশেই আধ-পাকা ধান-ক্ষেত—পাশে দেড়মাস দুমাস পূর্বে রোপিত ধান গাছের সবজ শোভা-আবার তার পাশেই নতুন ধান চারা রোপনের ব্যবস্থা। এই যে একের পর এক ধানের অবিরাম চাষ চলেছে, এর জন্য বৃষ্টির বা দেবতার দয়ার ওপর চাষীরা নির্ভর করছে না। রেলপথের পাশের খাদ, গোদাবরী, কৃষ্ণার খাল এবং অনেক জায়গাতেই কুয়ো থেকে কপি-কল সাহায্যে গরু জুড়ে জল তুলে পরিশ্রমী চাষীরা সারাদিনমান খেটে ধরিত্রীকে সরস করে সোনার ফসল ঘরে আনছে। অবশ্য ধান কেটে নেবার পর সেই ক্ষেতে গোবরের সার দিতেও দেখা গেল। সুতরাং উপযুক্ত পরিমাণে জল ও সার পেলে একই জমিতে বছরে যে দুই তিনবার ধান ফলানো যায় এদের কাজ থেকে তা বেশ বুঝা গেল। মহীশূর অঞ্চলে ধান ও আখ এত সুন্দর জন্মেছে যে মাঠের দিকে চাইলে চোখ জুড়িয়ে যায়। পৌষ মাসে আখে ফুল ধরেছে, অথচ তখনও সারা আখ ক্ষেতে জল দিচ্ছে। ফেরবার পথে দিনের আলোতে দাঁতন থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত দেখলাম, রেলপথের পাশের খাদে ও মাঝে মাঝে খালে জল যথেষ্ট, কিন্তু ধান কেটে নেবার পর মাঠ সর্বত্রই খাঁ খাঁ করছে—শ্যামলতার চিহ্ন মাত্র কুত্রাপি নেই। পশ্চিমবাংলার চাষীরা অধিকাংশ স্থলেই একবার মাত্র ধান চাষ করে সারা বছর 'হাত পা কোলে করে' বসে থাকে। মাদ্রাজ অঞ্চলের ধান চাষের প্রণালী এদের শিখিয়ে দিতে পারলে এরা নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বাড়াতে পারে—সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অন্ন কষ্ট ও অনেকটা কমতে পারে।

আমাদের নিদারুণ অন্নাভাবের দিনে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়াতেই আমি ঐরূপ ধান চাষের প্রবর্তনের জন্য আমাদের কৃষিবিভাগ ও কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমাদের চাষীরা দক্ষিণ ভারতের চাষীদের চেয়ে বুদ্ধি বা শারীরিক শক্তিতে হীন নয়। তবে শীতকালে বাংলার পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী—পরন্তু বৃষ্টিহীন শুষ্ক মাদ্রাজ অঞ্চলে সে বালাই নেই। মাদ্রাজ অঞ্চলে শীতও বেশী নয়, যদিও বাঙ্গালোর মহীশূর অঞ্চলে বাংলা দেশের মতই শীত মনে হল। সরকারের তরফ থেকে ম্যালেরিয়া প্রধান অঞ্চলে ডি ডি টি ইত্যাদি ছড়িয়ে এবং কুইনিন, প্যালুড্রিন প্রভৃতি সরবরাহ করে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নিবারণ করা আজকাল কষ্টসাধ্য নয়।

এখন কি উপায়ে আমাদের চাষীদের দক্ষিণ-ভারতীয়দের মত ধান চাষে প্রবৃত্ত করা যায় সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

সম্ভবতঃ এজন্য ঐ অঞ্চলের ধানের বীজ নিয়ে আসা সর্বাগ্রে কর্তব্য। বাংলার কৃষিবিভাগের উদ্যোগে এর ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর দশ বিশ গ্রামের মধ্যে কৃষিবিভাগ থেকে পরীক্ষামুলকভাবে এই প্রকার ধান চাষের প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কি উপায়ে সহজে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় কৃষিবিভাগের লোকেরা নিজেরা করে না চাষী সাধারণকে দেখিয়ে দেবেন। কৃষিবিভাগের পরীক্ষা ক্ষেত্রে ঐ ধানের চারা তৈরী করে ন্যায্য মূল্যে আশপাশের চাষীদের মধ্যে বিতরণ করলে হয়ত ভাল চারা অভাবে গজাবে না, ফলে চাষীরা গোড়াতেই উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে।

তদ্ভিন্ন আমাদের চাষীদের উদ্যম অধ্যবসায় ও উৎসাহ বাড়িয়ে তোলবার জন্য প্রত্যেক গ্রাম থেকে দু' একজন মাতব্বর চাষীকে সঙ্গে করে মাঝে মাঝে এক একটি দল নিয়ে যদি কৃষিবিভাগের একজন দক্ষ গাইড বা উপদেষ্টা দক্ষিণ ভারতের ঐ সব অঞ্চল ঘুরে আসেন তবে সত্যই বাংলার চাষীদের চোখ খুলবে। বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রভৃতিতে যোগদানের সুবিধার জন্য রেলকোম্পানী যেরূপ সস্তা ভাড়ার ব্যবস্থা করে থাকেন, দেশের সাধারণের কল্যাণকর এইরূপ একটি পরিকল্পনা সার্থক করে তোলবার জন্য রেলকোম্পানী সানন্দে অনুরূপ সাহায্য দান করবেন সন্দেহ নেই। অবশ্য এর জন্য কৃষিবিভাগের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রচেষ্টাই সর্বাগ্রে আবশ্যক।

বাংলার মাননীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী থেকে আরম্ভ ক'রে সরকারের কৃষিবিভাগ এবং দেশের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৃষিজীবী সম্প্রদায় এই প্রস্তাব অনুযায়ী সবাই একযোগে সাড়া দিয়ে কার্য্যারম্ভ করলে বাংলার যে সব জায়গায় বৎসরে একটিবার মাত্র ধান ফলছে সেখানে বৎসরে তিনবার না হ'ক, অন্ততঃ দুবার ধান ফলানো যাবে এবং তাতে করে আমাদের অন্নাভাব অনেকটা হ্রাস পাবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর। কয়েক মাস একই অভিনয় হচ্ছিল, দিনের পর দিন। শুনলাম প্রত্যহ নস্থানং তিলধারণমের কাণ্ড।

কেন বলছি সর্বাঙ্গসুন্দর, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমরা মাত্র সখের দলে কেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও অনুরোধে কাটা-সৈন্য ও জনতার লোকের ভূমিকায় অদক্ষ অভিনেতা নিযুক্ত করি। তাদের দক্ষতা ও সহ-কর্ম যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের অংশকে ফুটিয়ে তোলে, সে কথা আমরা ভুলে যাই। জুলিয়াস সিজারের অভিনয়ে দেখলাম, প্রত্যেক রোমান নাগরিক জানে যে সে রোমীয় এবং তার বিশিষ্ট স্থান আছে রঙ্গমঞ্চে। যখন জুলিয়াসের মৃত্যুর পর এণ্টনীর বক্তৃতা সভা। আমাদের দেশের বহু ছাত্রবাদিত সে উত্তেজনার দৃশ্য। ব্রুটাস প্রশমিত করেছে জনতার আবেগ। কিন্তু সে প্রশমন ক্ষণিক। বহু লোক তার বাগ্মিতায় উচ্চাভিলাষী-হত্যার নৃশংসতা রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর উপলব্ধি করেছে।

অ্যান হ্যাথাওয়ের কুটীর ফটো—শ্রীজয়দেব গুপ্ত

তবু তাদের হৃদয়ে শঙ্কা ও সংশয় বিদ্যমান। জনতার মনে একটা ভাব প্রতিষ্ঠিত হ'লে সে চায় না—তাকে আবার তর্ক ও বিচারের লৌহ-কটাহে ফেলে গালাতে—নূতন ছাঁচের উপকরণ সৃজনের জন্য। মন সচল হ'লেও অলস—তাই স্থিতিশীল।

যখন এণ্টনী মঞ্চে উঠ্‌লো—নানা মনে নানা মত—তবে অধিকাংশ লোক ষড়যন্ত্রকারীর ফাঁদে ধরা পড়েছে, ক্যাসিয়াস তা জানে। তবু সে চায় না এণ্টনীর বক্তৃতা। কিন্তু উদার ব্রুটাস অনুমতি দিয়েছে ভাষণের। সম্মুখে সিজারের মৃত-দেহ। এণ্টনী চতুর। সে প্রথমে বল্লে—ফ্রেণ্ডস্। তাতে মাত্র কতক জন শান্ত হ'ল। এইখানে জনতার জন-ভূমিকার সাফল্য। কিন্তু বহুর ভিড়ে কে শোনে তার বাণী। তখন এণ্টনী সেই শব্দ ব্যবহার করলে যার মধ্যে যাদু আছে—রোমান্স। তাতে বহু লোক শান্ত হ'ল। কিন্তু তবু সকলে শোনে না। তখন সে বল্লে—কান্ট্রি মেন। এ অস্ত্র বুদ্ধিমান দেশবাসীর পক্ষে মারাত্মক। যে স্বদেশবাসী শব্দে সম্ভাষণ করে, তার কথা প্রণিধানযোগ্য। এখন জনতার তিন ভাগ শান্ত হ'ল। সেই জনতার তিন ভাগের দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল বক্তার মুখে, তাদের মুখে প্রত্যাশা ও চাঞ্চল্যের ভাব। কিন্তু অশিক্ষিতা নারী—ভাবপ্রবণ। একদল নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করছিল, নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করছিল। এবার এণ্টনী তাদের দিকে ফিরে বল্লে—ওগো আমার কথায় কান দাও। লেণ্ড মি ইওর ইয়ারস। এই মি'র ওপর জোর তাদের শান্ত করলে। প্রত্যেক নরনারী যারা জনতার ভূমিকা করছিল, যদি ঐ ভাবে শিক্ষা না পেতো নিশ্চয়ই প্রেক্ষা-গৃহে নিস্তব্ধতা বিরাজ করত না। ভাষণের যুক্তি অনুধাবন অপেক্ষা জনতার ভুল নিয়ে রসিকতায় আনন্দ অধিক। কিন্তু জনতার অভিনয় নির্ভুল তাই মনে হয় সমাজে, গৃহে, সঙ্ঘে এবং রঙ্গমঞ্চে যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ ভূমিকায় সিদ্ধ হয়, যৌথ সাফল্য অবশ্যম্ভাবী।

আভনের ওপারে প্রকাণ্ড খালি জমির বাগান। ইংলণ্ডের যেমন সর্বত্র,তেমনি এখানেও জলে মরালের দল সাঁতার কাটছে। লোকের দেওয়া খাদ্য কণার আস্বাদনে নরে ও নরেতরে মিলে বিশ্ব-মৈত্রীর আভাস দিচ্ছে।

আমরা গেলাম কবির জন্মভূমিতে। প্রায় ৪০০ বছরের পুরাতন কাঠের বাড়ি স্থাপত্যে দেখবার আছে কি ? কিন্তু সে ভূমিতে পৌঁছে যে চিত্ত-স্পন্দন অনুভূত হয়, আর তার সাথে কবির সৃষ্টির স্মৃতি মনের মাঝে যে সব নরনারী, ঘটনা বৈচিত্র্য ও ভাবধারা জাগিয়ে তোলে, তাদের শোভাযাত্রা অপরূপ। কতকগুলি পুরাতন সরঞ্জাম আছে, যা কবি ব্যবহার করতেন। একখানা উঁচু খাট আছে, কতকগুলি ওকের খুঁটি নতুন। জেরার উত্তরে সুন্দরী পরিদর্শিকাকে সে কথা স্বীকার করতে হ'ল। মহাকবির শয়নকক্ষের এক জানালার কাচে বায়রণ, শেলী, ওয়াডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিদের সহি আছে। রাজপুরুষ প্রভৃতির স্বাক্ষরের মধ্যে সাহি আছে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের। একখানি পুরাতন ফোলিও সংস্করণের অংশ কৌতূহল জাগালো।

সেক্সপীয়ারের জন্মভূমিতে মনে নানা ভাব ওঠে। মহাকবি ষোলো আনা ইংরাজ ছিলেন, তার ঐতিহাসিক নাটকগুলি সে কথার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বকবি। কারণ তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি বিশ্ব-মানবের চিত্তের গভীর হ'তে ভাব উদ্ধার করেছিল ব'লেই তিনি অমর। রবীন্দ্রনাথ ষোলো আনা ভারতীয় হ'লেও তিনি বিশ্ব কবি। তাঁর বিশ্ব-প্রীতি জীব ছাড়িয়ে সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে। রবীন্দ্রনাথ আপনাকে বিশ্বের মাঝে এবং বিশ্বকে আপনার মাঝে ওতপ্রোতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। শেক্সপীয়র ইংলণ্ডের ষোলো শতকের কৃষ্টির প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুণ্য মাতৃ-ভূমির যুগ যুগান্তরের কৃষ্টির উত্তরাধিকারী।

কিন্তু মানবের সুষ্ঠু-ভাবধারা শাশ্বত। অল্‌স্ ওয়েল ছাট এণ্ডস্ ওয়েল নাটকে সতীত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ কবি যে কথা বলেছেন, যে কোনো যুগের হিন্দু লেখক গৌরবে সে কথা বলতে পারতেন।

—আমার সতীত্বই আমার বংশের মণিরত্ন। বহু পূর্ব-পুরুষ হ'তে উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা তা পেয়েছি।

আবার লেডী ম্যাকবেথের মতো উচ্চাভিলাষিনী দুষ্টা কি সারা বিশ্ব-জুড়ে পাওয়া যায় না যুগ-যুগান্তে ?

ওফেলিয়া, ডেসডিমোনা, জুলিয়েট প্রভৃতি প্রেমিকারা স্বচ্ছন্দে বৈষ্ণব কবিদের সৃষ্টির পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের প্রেমের ছবি অতি মনোহর, প্রেমের পরিধি বিশাল, তীক্ষ্ণতা গভীর।

যাত্রীদের মধ্যে ছিল নানা দেশের লোক, সবাই নীরব। সকলেরই প্রাণের শ্রদ্ধা পরিস্ফুট মুখে ও হাব ভাবে। মার্কিনী কেহ ছিল না বোধ হয়।

হঠাৎ মনে হ'ল যে সন্ধ্যা আগত প্রায়। কবি দয়িতা অ্যান্-হাথাওয়ের কুটীর দেখতে হবে। সেটি পাশের গ্রামে সটারীতে। ছুটে ছুটে গেলাম। যখন তাঁর কুটীরের সম্মুখে গাড়ি দুয়ারে ছিল, একটি যুবতী সে দুয়ার রুদ্ধ করছিল—হাতে চাবী, মুখে হাঁসি।

হাঃ অদৃষ্ট !—বল্লে ঘোষ।

মহিলা ঈষৎ হেঁসে বল্লে—গুড্ লাক্। আমি এখনও আছি। ধন্য বাদ দিয়ে দেখলাম সে গৃহ। অ্যান কবি হতে আট বছর বয়সে বড় ছিলেন। ঐ বাড়িতে প্রেম করেছিলেন তিনি যিনি রোমীয়, ওথেলো প্রভৃতি প্রেমিকের জ্বলন্ত চিত্র এঁকেছিলেন ! স্থান মাহাত্ম্য স্মরণ করলাম।

শেষে গেলাম ষ্ট্র্যাটফোর্ড হোলি ট্রিনিটি গির্জায় তাঁর সমাধি দেখ্‌তে। প্রশস্ত উদ্যানের মাঝে গির্জা। উইলো নতশির, রোরুদ্যমান। ওক মাথা তুলে দেখাচ্চে কবি কোথা গিয়েছেন। নানা রঙের ফুল তাঁর বহুমুখ প্রতিভার সৌন্দর্য্যের আভাস দিচ্ছিল।

কবির কথায়—সারা বিশ্বটাই একটা রঙ্গমঞ্চ। নর-নারী অভিনেতা অভিনেত্রী মাত্র। তাদের প্রবেশ ও প্রস্থান আছে, আর প্রত্যেকে অনেক-গুলি ভূমিকায় অভিনয় করে।

মহাকবিও কো এ সত্যের বাহিরে ছিলেন না।

তাঁর কথায় জীবন ও স্বপ্ন একই উপকরণে গঠিত। কিন্তু তাঁরই ভাষায়—

এই মর জীবন যে উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য দান করে সে হ'ল নিষ্কলঙ্ক সুযশ। সেটি না থাকলে মানুষ—সোনালী রঙের নোনা মাটি বা রঙিন কাদা।

গির্জা নদীর কুলে। নদীতে হাঁস ভাসছে। ওপারে বিস্তীর্ণ উদ্যান। নিঃশব্দে সন্ধ্যা নামছে।

কবি তার রসভূমিতে বাস্তবের কঠোর রূপ দেখা দিল। তাইতো আবার ৪২ মাইল ফিরতে হবে বিদেশের পথে।

এক যুবক সঙ্গী কবির ভাষায় বল্লে—কা-পুরুষ মরে বহুবার মরণের আগে।

হাকিম বোঝালেন, ইংরাজেরই প্রবচন—বিক্রম হ'তে সদ্বিচার ভাল।

গাড়িতে ওঠ্‌বার পূর্বে কবরের ফলকে লেখা কবিতাটা দেখলাম। লোকে ঠিকই সন্দেহ করে যে সেটি মহাকবির রচনা নয়। নিশ্চয়ই কোন্ রসিক এ কবিতা তাঁর সমাধিতে বসিয়েছে—

প্রিয় বন্ধু—যিশুর দোহাই বিরত থাক এর মধ্যে যে ধূলা আছে তা খুঁড়তে। এই পাথরকে যে রেহাই দেবে সে লোক আশীর্বাদ লাভ করবে, আর যে আমার হাড় সরাবে সে হবে অভিশপ্ত।

নিশ্চয় এ কবিতা নিজের জন্য লিখে রাখেন নি বিশ্ব-কবি বিজ্ঞ শেক্স্‌পীয়র। সিম্বেলিনে তাঁর মৃত্যু-সঙ্গীত মনে পড়ে—কত গভীর দর্শন, কী সরল ভাষা—

আর ভয় করতে হবে না রবির তাপ অথবা প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ, তোমার পৃথিবীর কর্ত্তব্য শেষ করেছ, ঘরে গেছ ফিরে পারিশ্রমিক নিয়ে।

সূর্য্যতেজের উৎস

অধ্যাপক শ্রীকামিনীকুমার দে

সুদূর অতীতের কোন্ প্রভাতে সূর্য্যকে 'জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং' বলিয়া মানুষ বন্দনা করিয়াছিল তাহা আজ আমরা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না, সূর্য্যকে আদিমানব যেমনটি দ্যুতিমান্ দেখিয়াছে আজ বহুলক্ষ বৎসর পরেও আমরা তাহাকে তেমনটি দ্যুতিসম্পন্নই দেখি, মনে প্রশ্ন জাগে—সূর্য্যতেজ কি অনাদি অনন্ত? অন্যথা ইহার উৎসই বা কোথায়? আমরা কাঠ, কয়লা বা তেল পোড়াইয়া তাপ উৎপাদন করি—আবার সেই তাপের সাহায্যে ইঞ্জিন চালাই এবং আলো, বিদ্যুৎও পাইতে পারি। সূর্য্য কি এরকম ভাবে পুড়িয়া পুড়িয়া তাপ ও আলো জোগাইতেছে ?

প্রকৃতি অবিরত নিজের আত্মজীবনী লিখিয়া চলিয়াছে। এই যে শৈলকিরিটিনী সরিৎমালিনী বনরাজিনীলা ধরিত্রী—ঐ যে সুদূরের তারকা নীহারিকা সকলেই নিজ নিজ পরিচয় লিখিয়া চলিয়াছে। মানুষ যখনই এই লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারে, তখনই তাহার পরিচয় পায়। আমরা ভাবি আমার জন্মের বহুযুগ পূর্ব্বে আমার যে মাতা ধরিত্রী জন্মলাভ করিয়াছে তাহার ইতিহাস জন্ম সন তারিখ আমি কিরূপে জানিব? কিন্তু বিশ্বে যে লিখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে লিপিবদ্ধ হইতেছে তাহা পাঠ করারই যা অপেক্ষা; তারপর এমন কিছু নাই যাহা অজানা থাকিতে পারে। বিজ্ঞানী সেই লিখনেরই পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত মাত্র।

একথা বিজ্ঞানী নিঃসন্দেহে জানে যে ধরিত্রী সূর্য্য পিতারই কন্যা। জন্মের পর হইতে আজিও কন্যা সমভাবেই পিতার নিকট হইতে পুষ্টি ও ঐশ্বর্য্য পাইয়া সমৃদ্ধ হইতেছে। সূর্য্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ইহা অবগত

যে সূর্য্য ভয়ঙ্কর তপ্ত একটি গ্যাসের প্রকাণ্ড পিণ্ড। একদিন সূর্য্যের অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর জন্ম হইল। মহাশূন্যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবী (সূর্য্যের আয়তন পৃথিবীর একলক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ এবং ওজন তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ) ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকিল এবং কিছুকাল পরেই তাহার পৃষ্ঠদেশ কঠিন অবস্থায় পরিণত হইল। বিভিন্ন রকমের পদার্থগুলিও এক এক জায়গায় জমা হইল। রেডিয়ম্ নামক ধাতু আপনা হইতেই রূপান্তরিত হইয়া সীসাতে পরিণত হয়। এই সীসা প্রকৃতিতে অন্য যে সীসার সঙ্গে আমরা পরিচিত তাহার অপেক্ষা কিছু পৃথক্, বিজ্ঞানী এই সীসাকে চিনিতে পারে এবং সীসার পরিমাণ মাপিয়া হিসাব করিয়া বলিয়া দিতে পারে তাহার রূপান্তরের কাল, এইরূপে পৃথিবী যেন নিজের বয়সের হিসাব লিপি রাখিয়া চলিয়াছে। আর এই লিপি হইতে বিজ্ঞানী জানিয়াছে পৃথিবী-পৃষ্ঠ কঠিন হইয়াছে অন্ততঃ ১৬০ কোটি বৎসর আগে এবং পৃথিবীর জন্ম প্রায় ২০০ কোটি বৎসর পূর্ব্বে, এই ২০০ কোটি বৎসর ধরিয়া সূর্য্য প্রায় একই ভাবে তাপ ও আলো বিতরণ করিয়া আসিতেছে, কারণ সূর্য্যের তেজ বর্ত্তমানের অর্দ্ধেক হইলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রির অনেক নীচে নামিয়া পড়িবে অর্থাৎ সমস্ত জল জমিয়া ঠাণ্ডা বরফে পরিণত হইবে, আর তাহার তেজ বর্ত্তমানের চারিগুণ হইলে সপ্তসমুদ্রের জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে। সূর্য্য কি তবে অজরামর, আর সূর্য্য তেজ কি অনাদি?

বিজ্ঞানী সূর্য্যের বস্তু পরিমাণ ও আয়তন অবগত আছে—সূর্য্য হইতে প্রতিনিয়ত কি পরিমাণ তেজ বিকীর্ণ হইতেছে তাহারও হিসাব রাখে; তাহা হইলে ২০০ কোটি বৎসর ধরিয়া সে কি তেজ বিকীরণ করিয়াছে তাহাও বলিয়া দিতে পারে। সূর্য্য সমান কয়লা রাশি পোড়াইলে আমরা যে তাপ পাই তাহারও হিসাব বিজ্ঞানী অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে; এই কয়লা রাশি সাত আট হাজার বৎসরের মধ্যেই নিঃশেষে পুড়িয়া যাইবে। সুতরাং সূর্য্যে কিছু জ্বলিতেছে এরকম ব্যাপার হইতে পারে না—অধিকন্তু কোন রাসায়নিক মিলনেই সূর্য্য-তেজের ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ বিজ্ঞানী হেলম্‌হোৎস্ তাই এই মতবাদ প্রকাশ করিলেন যে, সূর্য্যের ক্রমশঃ সঙ্কোচনের দ্বারাই তাহার এই তেজ রক্ষা সম্ভব হইতেছে, কিন্তু সূর্য্যের আয়তন প্রায় অনন্ত ছিল কল্পনা করিলেও বর্ত্তমানে সূর্য্যের যে আয়তন তাহা দেখিয়া এই মতবাদ হইতে সূর্য্য তেজের উৎস সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সূর্য্য তেজের উৎস অন্য কিছু।

কিছুদিন হইতে বিজ্ঞানী এক নূতন শক্তির সন্ধান পাইয়াছে। য়ুরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি ধাতু হইতে সর্ব্বদা আপনা হইতেই এক রকম তেজ বাহির হয়। কোন কৃত্রিম উপায়ে এই তেজের মাত্রা কমান বাড়ান চলে না, এই তেজঃ বিচ্ছুরণের কারণ অনুসন্ধানে গিয়া বিজ্ঞানী দেখিল—এই সকল পদার্থের পরমাণু ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার ভিতর হইতে আল্‌ফাকণা বা হিলিয়াম্ নামক হাল্‌কা একটা মৌলিক পদার্থের কণা (নিউক্লিয়াস) অতি বেগে বাহির হইয়া আসে—এই বেগবান্ আল্‌ফা কণার শক্তি খুব বেশি। বিজ্ঞানীর পূর্ব্বধারণা—পরমাণুই বস্তুর আদি উপাদান—আর টিকিল না। পরমাণুকে তবে ভাঙ্গা সম্ভব। পরমাণু বিরানব্বই রকম, সেই জন্য ধরা হইত মৌলিক পদার্থ বিরানব্বইটি, কিন্তু সকল পরমাণুই আবার কয়টি মূল উপাদান দ্বারা নির্ম্মিত এবং দুইটি প্রধান উপাদান হইল প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন। বিজ্ঞানী এখন গবেষণাগারে পরমাণু ভাঙ্গিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। প্রত্যেক পরমাণুরই দুইটি অংশ; একটি কেন্দ্রিণ (Nucleus), অন্য তাহার বহিরাবরণ। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিণে আছে একটি মাত্র প্রোটন; অন্যান্য পরমাণুর কেন্দ্রিণ পূর্ব্বোক্ত প্রোটন এবং নিউট্রন নামক আর একটি উপাদান দিয়া গঠিত। বিভিন্ন পদার্থের বহিরাবরণে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেক্‌ট্রন ঘুরিতেছে। হাইড্রোজেনের পরমাণু কেন্দ্রিণ ঘেরিয়া একটি, হিলিয়মের বেলায় দুইটি ইত্যাদিক্রমে সর্ব্বশেষ সংখ্যা বিরানব্বইটি ইলেক্‌ট্রন য়ুরেনিয়মের বেলায়।

সূর্য্য-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি, যতই সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায় তাপ ততই বাড়িতে থাকে, এবং কেন্দ্রের কাছে তাপ প্রায় ২ কোটি ডিগ্রি, সূর্য্য পৃষ্ঠে যে তাপ, সে তাপে কোন পদার্থ যৌগিক আকারে থাকিতে পারে না। যে কোন যৌগিক পদার্থই তাহার রাসায়নিক মৌলিক উপাদান পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। আবার সূর্য্যের অভ্যন্তর দেশে যে তাপ তাহাতে মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি হইতেও ইলেক্‌ট্রনগুলি বাঁধন-হারা হইয়া পড়ে। তখন কেন্দ্রিণগুলির মধ্যেই সংঘর্ষ চলে। সূর্য্যে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে। সেই হাইড্রোজেনের কেন্দ্রিণ (যাহা একটি মাত্র প্রোটন) কার্ব্বন ও নাইট্রোজেন কেন্দ্রিণের সংঘর্ষে হিলিয়ামের কেন্দ্রিণ বা আল্‌ফা কণাতে রূপান্তরিত হইতেছে। আলফা কণাগুলি প্রচণ্ড শক্তির আধার ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। এইরূপে হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রিণ বা প্রোটন হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রিণ বা আল্‌ফা কণাতে রূপান্তরের ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহাই সূর্য্য তেজের উৎস।

কয়লার ভাণ্ডার পুড়িয়া পুড়িয়া তাহা হইতে উৎপন্ন তেজ কমিয়া যায়। কিন্তু সূর্য্যের অভ্যন্তরে যে প্রক্রিয়া চলিয়াছে তাহার ফলে সূর্য্যের তাপ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার ত আর অফুরন্ত নয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হইয়া আসিবার পূর্ব্বে সূর্য্যের তেজ বর্ত্তমানের শতগুণে গিয়া দাঁড়াইবে, তবে তাহাত আর দু দশ লক্ষ বৎসরে বা কোটি বৎসরে নয়। গত একশত কোটি বৎসরে সূর্য্যের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার হইতে শতাংশও ব্যয় হয় নাই, আর পৃথিবীর তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি মাত্র বাড়িয়াছে। সহস্রকোটি বৎসর পরে সূর্য্যের তেজ বর্ত্তমানের শতগুণ হইবে, মানুষ যদি ততদিনেও যদুবংশের মত নিজের সৃষ্ট মারণাস্ত্রে ধ্বংস না হয়, তবে সে হয়ত দূরগ্রহ নেপচুনে গিয়া তাহার উপনিবেশ গড়িবে, কারণ নেপচুন গ্রহ ইহার বহু পূর্ব্বেই মানব বাসের উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। আর পৃথিবী হইতে গ্রহান্তরে ভ্রমণ মানুষের আয়ত্তে আসিবে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে। কিন্তু সূর্য্যের কথাই ত বলিতেছিলাম, তাহার তেজ বাড়িতে বাড়িতে যখন সর্ব্বোচ্চ

মাত্রায় পৌঁছিবে তখন তাহার হাইড্রোজেন ফুরাইয়া যাইবে। সুতরাং তাহার তেজের এই যে উৎস—তাহা ত আর থাকিতে পারে না, তখন সূর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া তাহার তাপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। এই উপায়ে যে তাপ উৎপাদিত হইবে তাহা পরমাণুর কেন্দ্রিণ ভাঙ্গা গড়ার ফলে উৎপন্ন তাপের অনেক কম, আর তখন হইতে অর্দ্ধকোটি বৎসর পরেই সূর্য্য আবার এখনকার মত উজ্জ্বল হইবে এবং তাহার আয়তন হইবে বর্ত্তমানের দশমাংশ। পরে উজ্জ্বলতা কমিতে কমিতে একদিন তাহার এই অতুল তেজের ঐশ্বর্য্য নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সূর্য্য জীবনের এখন কৈশোর অবস্থা—তাহার যৌবনের প্রারম্ভে সে যে তেজ বিকীরণ করিবে সেই তেজ পৃথিবী সহ্য করিতে পারিবে না। তখন পৃথিবী কোন জীব বা উদ্ভিদ্ বাসের আর যোগ্য থাকিবে না, বার্দ্ধক্যে, সূর্য্যের তেজ যখন কমিতে থাকিবে তখন তাহার আয়তন ও কমিতে থাকিবে। ভারতীয় বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের হিসাবে এই তেজ কমিতে কমিতে সূর্য্য যখন হিমশীতল অবস্থায় আসিবে তখন তাহার আয়তন বৃহস্পতি গ্রহের তুল্য হইবে। সেই কোটি কোটি বৎসর পরে ঘোরান্ধকারের মধ্যে গ্রহগুলিও হিমশীতল অবস্থায় সূর্য্যের চারিদিকে এমনই ঘুরিতেছে ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি।

পূর্ণাহুতি

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বহুদিন পরে—
তোমার অধীর স্পর্শ আমার অন্তরে
জাগাল নূতন সুর, সর্ব্ব দেহে নব শিহরণ।
তোমারে ঘিরিয়া মোর জীবন মরণ
একাকার হয়ে যায়; তুমি আর আমি
মাঝখানে কিছু নাই। এস তুমি নামি
আমার গভীরে প্রিয়ে; আমার অতলে
একে একে দীপগুলি ওঠে যদি জ্বলে
দীর্ঘশ্বাসে দিওনা নিভায়ে।
পরম মুহূর্ত্ত এ যে, যদি নিরুপায়ে
বিফল হইয়া যায়—সে বঞ্চনা সহিব কেমনে?
আমি যে রেখেছি আশা অতি সংগোপনে
সে কথা ত বুঝিতে পারিনি,
তোমার দাক্ষিণ্যে আমি আজীবন
হতে চাই ঋণী।

আজ তুমি এলে কাছে বিনিদ্র নয়নে স্বপ্নসম
তাইত বিস্ময় লাগে মম;
হয়ত এ স্বপ্ন নয়—এ আমার মনের বিকার
আমারে জাগায়ে তুমি খুলে দিলে স্মৃতির দুয়ার।
ভাবিতে দিলে না অবসর
স্পর্শ মাত্রে যেন পঞ্চশর
ফুটাইল রক্তোপেল-চূত-নবমল্লিকা-অশোক
ফুটাইল শতদল—সুন্দর লাগিল বিশ্বলোক।

অবসন্ন দেহে মোর এতখানি ছিল যে উষ্ণতা
শোণিত প্রবাহে ছিল হেন চঞ্চলতা
একথা ছিলাম ভুলে
আজিকে উঠিল দুলে
নিস্তরঙ্গ সাগরের জল
বুকে আকাশের ছায়া বায়ুভরে কম্পিত চঞ্চল।
বিচিত্ররূপিণী তুমি আহা মরি মরি
দাঁড়ালে সম্মুখে মোর এ কী রূপ ধরি?
রজনী উতলা হোল গভীর আশ্লেষে
আজি তুমি এ কী বেশে
ধরা দিলে অজানিতে মোর?
লীলায়িত তব বাহুডোর
আমারে বাঁধিল আজ দৃঢ় আলিঙ্গনে;
তবু মোর শঙ্কা জাগে মনে—
আমার ভাণ্ডারে আছে যত গুপ্তধন
সে কি প্রিয়ে হবে তব মনের মতন?
যে সঞ্চয় রাখিয়াছি তোমারি লাগিয়া
হাতে তুলে দিব ব'লে দিবারাত্র রয়েছি জাগিয়া
সে সঞ্চয় লও তুমি, লও আজি সর্ব্বস্ব আমার
দেহের উৎসর্গ লও, পূর্ণাহুতি তৃষিত আমার।

বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র

শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ

পয়লা জানুয়ারী। শীতের সকাল, আটটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। নববর্ষ উৎসবের সাড়া প'ড়ে গেছে সমস্ত রেলওয়ে কলোনীটায়। দলে দলে এংলো নরনারী চলেছে পথ বেয়ে—নববর্ষের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে। এ ছুটির দিনে রেলওয়ে কলোনীর যান্ত্রিক জীবনের স্পন্দন থেকে একটু দূরে যাবার জন্য মনটা চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। কোথায় যাই? মনে হ'লো বলরামপুর নয়া তালিমী সংঘের কথা। শুনেছিলাম ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও কুমিল্লা অভয় আশ্রমের ক'জন কর্ম্মীর প্রচেষ্টায় বর্ত্তমান বলরামপুর (মেদিনীপুর) শিক্ষা-কেন্দ্রটি গ'ড়ে উঠেছে। অনেকদিন ধরে শিক্ষাকেন্দ্রটি দেখার ইচ্ছে থাকলেও—যাবার সুযোগ আর হ'য়ে উঠেনি। এ ছুটির দিনে এমনি একটি শিক্ষাকেন্দ্র দর্শন করা মন্দ আইডিয়া নয়—একটি নতুন পরিবেশের মধ্যে সময়ের সদ্ব্যবহারই হ'বে। স্থির ক'রে ফেল্লাম, আর দেরী ক'রে লাভ নেই। বন্ধুমহলে সংবাদ দিতেই তারাও ৪।৫ জন এসে হাজির হ'লেন।
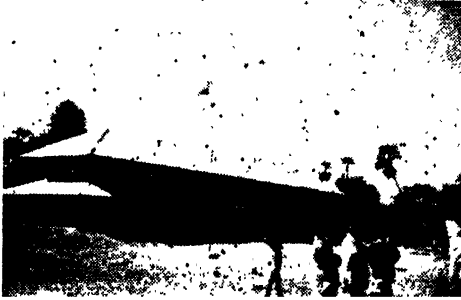
বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র—জাতীয় পতাকা অভিবাদন উপলক্ষে কর্মতৎপর ছেলেরা

বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্র—দূরে মহিলাদের বাসস্থান সম্মুখে সব্‌জী বাগান

সাইকেলে আমরা বলরামপুর অভিমুখে রওনা হ'য়ে পড়লাম। খড়গ্‌পুর সুভাষপল্লী থেকে বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রটির দূরত্ব প্রায় চার মাইল হ'বে। খড়গ্‌পুর ষ্টেশন পেরিয়ে আমরা এগিয়ে চল্লাম পীচের সোজা রাস্তা ধরে। রেলওয়ে কলোনী ছাড়িয়ে ঝাপেটাপুর এসে লাল সুরকীর পথে নামলাম। দু' ধারে ধানের ক্ষেত ও মাঠ, আর তারি ভেতর দিয়ে লাল সুরকীর পথ এঁকেবেঁকে বলরামপুর অভিমুখে চলে গেছে। ভোরের উজ্জ্বল আলোয় সমস্ত মাঠ ঘাট ঝলমল্ করছে। আমরা দল বেঁধে সাইকেলে চলেছি। রেলওয়ে কলোনীর কোলাহল থেকে ক্রমেই দূরে এগিয়ে চলেছি। প্রায় ন'টার সময় বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের ফটকের কাছে এসে উপস্থিত হ'লাম। ফটকেরই পাশে একটি বৃক্ষে একটি সাইন্‌বোর্ড লাগানো রয়েছে—তা'তে লেখা আছে "নয়া তালিমী সংঘ, বলরামপুর।"

বলরামপুর শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেই প্রথমে দৃষ্টি পড়লো—বলরামপুর পোষ্ট অফিসটির দিকে এবং তারি সংলগ্ন কেন্দ্রের চিকিৎসালয়ের দিকে। সদলবলে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। দেখলাম সমস্ত আশ্রমটি ঘিরে যেন পরিপূর্ণ শান্তির আবহাওয়া বিরাজ ক'চ্ছে খবর নিয়ে জানলাম—শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ (যিনি শিক্ষাকেন্দ্রটি গ'ড়ে তুলেছেন) এবং তার সহকর্ম্মী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী উভয়েই বলরামপুরে অনুপস্থিত। কার্য্যোপলক্ষে তারা অন্যত্র বাইরে গেছেন। শুনে একটু নিরাশই হ'লাম। ভাবছিলাম এঁদের অবর্ত্তমানে হয়তো শিক্ষাকেন্দ্রটি দেখার বিশেষ সুবিধে হ'বে না। এমনি সময় একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হ'লো। সে বল্লে, "আপনারা মোহিতবাবুর সঙ্গে দেখা করুন তিনিই আপনাদের সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

অদূরে মোহিতবাবুর অফিস ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। শুনতে পেলাম শ্রীযুক্ত মোহিতকুমার সেন শিক্ষাকেন্দ্রটির জেনারেল ম্যানেজার। মোহিতবাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মোহিতবাবু খবর পেয়ে আমাদের ডেকে নিলেন। আমাদের অভিপ্রায় তাঁকে জানাতেই—শিক্ষাকেন্দ্রটি ঘুরে দেখবার জন্য তিনি একজন গাইডের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। দেখতে পেলাম, কতকগুলো ঘরের বরান্দায় ছোটো ছেলে-মেয়েদের ক্লাস হ'চ্ছে। কোনো হট্টগোল নেই, যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। গাইডের সঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। গাইড্ বল্লেন, "আজ পয়লা জানুয়ারী, তাই ক্লাসগুলো প্রায়ই ছুটি দিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।" যাইহোক অফিস ঘরটি ছাড়িয়ে

এসে লক্ষ্য করলাম—একটি পৃথক ঘর, কয়েকটি খাট পাতা রয়েছে তা'তে। শুনলাম, অসুস্থ ছাত্রদের জন্য এ ঘরটির ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। প্রথমে বুনিয়াদী শিক্ষাভবনের পাঠ্য এবং অভ্যাসযোগ্য বিষয়গুলির বিবরণ সম্বন্ধে সন্ধান নেওয়া গেল। মূল হস্তশিল্প এবং তদ্ সম্বন্ধে জ্ঞান, সবজী বাগানের কাজ, নয়ী তালিমের মূল নীতি, সমবায় পদ্ধতি। সাফাই, চিত্র-কলা, সংগীত, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও আহার শাস্ত্র, গঠনমূলক কর্ম্মের মূলনীতি, নাগরিক শাস্ত্র ও সমাজ সেবা এবং রাষ্ট্রভাষা প্রভৃতি বিষয়গুলিই নাকি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত।

কি ভাবে প্রতিদিনের কার্য্যপরিচালনা করা হয় গাইড্ আমাদের প্রথমেই তা' বুঝিয়ে দিলেন। সারাদিনের কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে একটি বিবরণও পেলাম। বিবরণটি এইরূপ। জাগরণ—ভোর ৫ টায়। প্রার্থনা—ভোর ৫-৩০ মিঃ থেকে ৫-৪৫ মিঃ, কৃষি কাজ—ভোর ৫-৪৫ মিঃ থেকে ৬-৩০ মিঃ, সাফাই কাজ—ভোর ৬-৩০ মিঃ থেকে ৭টা, জলযোগ- ৭টা থেকে ৭-২০ মিঃ বগ বা ক্লাস—৭-৩০ মিঃ থেকে ১০-৪৫ মিঃ, স্নান—১০-৪৫ থেকে ১১-১৫ মিঃ এবং আহার ১১-১৫ মিনিটে। আহারের পর বিশ্রামের পালা। বেলা ২টা পর্য্যন্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা, তার পরেই আবার ক্লাস আরম্ভ। ক্লাসের পর বেলা ৩-৩০ মিনিটে জলযোগ, তারপর কৃষিকাজ, খেলাধূলা, হাত পা ধোওয়া, প্রার্থনা, সংবাদপত্র পাঠ, আহার। স্বাধ্যায় রাত্রি ৮-৩০ মিঃ থেকে ১০টা এবং রাত্রি ১০ টায় শোবার ঘণ্টা। এ ছাড়া রবিবারের বিশেষ কর্ম্মসূচী এবং দু' একটি ক্ষেত্রে বগ বিষয়ে সামান্য অদল বদল ব্যতীত এ কর্ম্মসূচীই সাধারণতঃ প্রতিপালিত হয়। এ ব্যবস্থা শুধু শীতের দিনেই কার্য্যকরী হ'য়ে থাকে, গ্রীষ্মকালে কর্ম্মসূচীর কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে। এখানে আবাসিক (Residential) ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা মিলিয়ে প্রায় ১৫০এ গিয়ে দাঁড়াবে। যে সব ছাত্র বয়সে কিছু বড়—তাদের সংখ্যা প্রায় ৩৫ হ'বে।

এরা বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের আবাসে থাকে না। ছোট ছাত্রছাত্রী এবং মহিলাদের থাকার জন্যই এখানে ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রের একটি বড় দ্বিতল ঘর এ জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া একচালা ঘর ও কতকগুলো রয়েছে। যে ছেলেরা একটু বয়স্ক, তাদের থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছে এ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি আশ্রমে। এ আশ্রমটি "অভয় আশ্রম" নামে গ'ড়ে উঠ্ছে। এক্ষণে ছেলেরা বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে থাকে।

এখানে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে কস্তুরবা ট্রাষ্টের পরিচালনায় গ্রাম-সেবিকা ট্রেনিংএরও ব্যবস্থা রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্য-তালিকায় যে সব শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে এখানেও সে সব শিক্ষাই দেওয়া হয়—উপরন্তু সেলাইয়ের কাজ ও সাবান তৈরী শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। সমগ্র গ্রাম সেবার আদর্শেই এখানে বিশেষভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষাভবনে একটি 'প্রাক্-বুনিয়াদী' শিক্ষালয় আছে। এখানে ছাত্রীরা হাতে কলমে শিক্ষাদানের সুযোগ পায়। শিক্ষাকাল দু' বছর মাত্র। ডিপ্লোমা দেবারও ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১ম বর্ষে ১৮জন এবং ২য় বর্ষে ১৪জন আছেন বলেই জানতে পারলাম। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম—এখানে কস্তুরবা বিদ্যালয়ের জন্য ছ'জন, বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য পাঁচজন এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য সাতজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন। শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ সময় সময় বুনিয়াদী বিদ্যালয়েও শিক্ষাদান ক'রে থাকেন। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ একাধারে কস্তুরবা ট্রাষ্টের বাংলা শাখার প্রতিনিধি এবং নয়ী-তালিমী সংঘের বাংলার সভানেত্রী (এ সংঘ ওয়ার্দ্ধার হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের অন্তর্ভুক্ত)। সুতরাং তাঁরই প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এ দু'টি প্রতিষ্ঠানই চল্ছে। বলরামপুর শিক্ষাকেন্দ্র থেকে প্রায় ২০০শত শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগে ট্রেনিং পেয়েছেন। গত ১৯৫০ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ বন্ধ আছে। ট্রেনিং পাশ করলে প্রমাণ-পত্রেরও ব্যবস্থা আছে। এ শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ছাড়াও কলকাতা থেকে অনেক অধ্যাপক এখানে মাঝে মাঝে এসে শিক্ষা দিয়ে যান। মোহিতবাবুর

শিক্ষাকেন্দ্রের ছেলেরা—স্নানের পূর্বে

কাছে জানলাম—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেনও কলকাতা থেকে এ কেন্দ্রে লেকচার দিতে এসে থাকেন।

ধীরে ধীরে কেন্দ্রের পুকুরটির ধার দিয়ে চল্লাম। গাইড্ বল্লেন, "এখানে খাওয়ার জিনিস যেমন নষ্ট করা হয় না, তেমনি মলমূত্রও নষ্ট করার প্রথা নেই।" মলমূত্র ছেলেমেয়েদের নিজেদেরই পরিস্কার করতে হয়—এজন্য রুটিন করা আছে। এগুলোকে সারে পরিণত করা হয়। রান্নার ব্যাপারেও দেখলাম—ছেলে ও মেয়েদের পৃথক রান্নাঘর রয়েছে এবং তাতে রুটিন মাফিক এক একদিন এক একজনের উপর ভার ন্যস্ত রয়েছে। যার যার কর্ত্তব্য সে পালন করে চলেছে। সবাই স্বাবলম্বী।

আর একটু এগিয়ে গেলাম পূবের দিকে। ফুল ও সবজীতে প্রাঙ্গণটি ভরপুর হ'য়ে রয়েছে, আর আশে পাশে ক্লাস ঘরগুলোয় ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে, কেউবা সুতো কাটছে আপনমনে। একটি শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হ'য়েছে—কোথাও হট্টগোল নেই, যে যার কাজ নিয়ে মেতে আছে। আর একটি ঘরে দেখতে পেলাম—

কস্তুরবা ট্রাষ্টের গ্রাম-সেবিকার দল, সেলাই ও সুতো কাটায় মগ্ন। তাঁতের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাপড় উৎপন্নের দিক থেকে এঁরা নাকি প্রায় স্বাবলম্বী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৪৯ সালে উৎপন্ন সুতায় মাথা পিছু গড়ে ২৮ বর্গ গজ কাপড়ের সংস্থান হ'য়েছে। ১৯৫০ সালের হিসেব তখনও শেষ হয়নি—তবে ছ'মাসের হিসেবে ৬৫০ বর্গ গজ কাপড় উৎপন্ন হ'য়েছে ব'লেই শোনা গেল।

গাইডের সঙ্গে যখন শিক্ষাকেন্দ্রের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি তখন মোহিতবাবু পুনরায় এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন। মোহিতবাবু শিক্ষাকেন্দ্রের রন্ধনশালার উনুনগুলো দেখিয়ে আমাদের ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। কি ভাবে কম জ্বালানিতে রান্নার ব্যবস্থা করা হয় এবং কি ভাবে রান্নার পর অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি গরম রাখা হয় ইত্যাদি সব বুঝিয়ে দিলেন। খাওয়ার ব্যাপারে কোনো বিধি নিষেধ নেই এখানে। উনুনগুলোর কিছু অভিনবত্ব যে আছে তা অস্বীকার করা যায় না। ফসল ও সবজীর কথায় তিনি বল্লেন যে, এদিক দিয়ে

শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাশ, ম্যানেজার শ্রীমোহিতকুমার সেন ও লেখক

তাঁরা প্রায় ৩০% স্বাবলম্বী। দুগ্ধ বিষয়েও তাঁরা প্রায় স্বাবলম্বী বল্লেই চলে। গো-পালনও এখানে শিক্ষারই অন্তর্গত।

শিক্ষাকেন্দ্রের লাইব্রেরী ঘরটিতে প্রবেশ করলাম। ছোট্ট একটি ঘরে কতগুলো আলমারীতে বই সাজানো রয়েছে। সংরক্ষিত বইর সংখ্যা খুব বেশী না হ'লেও—মোটামুটি কিছু ভালো বইএর সন্ধান পাওয়া গেল। লাইব্রেরী ঘরটির বারান্দার দু'দিকে দু'টি হস্তলিখিত সাপ্তাহিক পত্রিকাও দেয়ালের সঙ্গে আঁটা রয়েছে দেখতে পেলাম। একটি পত্রিকার নাম 'কস্তুরী'—এ পত্রিকাখানি কস্তুরবা ট্রাষ্টের ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত। অপরটি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের তরফ থেকে 'অভিযান' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এ পত্রিকাখানি ছাত্ররা প্রকাশ ক'রে থাকে। লাইব্রেরী ঘর থেকে বাইরে এসে এগিয়ে চলেছি। সুমুখেই প্রাঙ্গণের একদিকে একটি জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান। প্রতিদিন জাতীয় পতাকাটি অভিবাদন করেই নাকি কার্য্যসূচী আরম্ভ হয়ে থাকে।

মোহিতবাবুর সঙ্গে আর কিছুদূর এগিয়ে এলাম একটি গৃহের কাছে। দেখতে পেলাম ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা ব'সে জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়াশোনা কচ্ছে। শুনলাম—এসব ছেলেমেয়েদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয় লেখাপড়া শেখাবার জন্য। প্রতিদিন লেখাপড়ার পর এদের দুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে। আমরা যখন ক্লাস ঘরটির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি—তখনো দেখলাম গ্লাস ও বাটি হাতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা দুধ খেতে ব্যস্ত। একজন মহিলা তাদের পরিবেশন কচ্ছেন। এই গৃহটির ঠিক উত্তরদিকে ধানের মোড়া স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হ'য়েছে। এ ধান শিক্ষাকেন্দ্রের নিজেদেরই জমির ফসল।

প্রশ্ন ক'রে জানলাম—এ বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থাপিত হ'য়েছে ১৯৪৬ সালে। শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মীর প্রচেষ্টাতেই আজ এ শিক্ষাকেন্দ্রটি এরূপ ধারণ ক'রেছে। এর পূর্ব্বে বাংলা দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হ'য়েছিল ১৯৪৪ সালে ঝাড়-গ্রামে। এর পেছনেও ছিলেন 'অভয় আশ্রমের' কয়েকজন কর্ম্মী ও শ্রীযুক্তা চন্দ। ঝাড়গ্রামের অস্থায়ী আশ্রমটিই পরে বলরামপুরে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র সংলগ্ন জমির পরিমাণ ৪½ একর, তদুপরি ২৩ একর ধান জমি এবং ৩৬ একর শাল বন আছে। মোহিতবাবুর কাছে জানতে পারলাম—৺সীতানাথ বর্ম্মা নামক স্থানীয় এক জনহিতৈষী ব্যক্তি তাঁর মৃত্যুকালে এ সম্পত্তিটি কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে শিক্ষা ব্যাপারে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অর্পণ ক'রে যান। ব্রাহ্মসমাজ ১৯৪৫ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বার্ষিক ১২ টাকা জমায় ১৫ বছরের জন্য শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা চন্দ এবং তাঁর এক সহকর্মীর কাছে ইজারা দেন। সেই থেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যাপারে জমিটুকু ব্যবহৃত হচ্ছে। মোহিতবাবু বল্লেন, "আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হ'বার সময় এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাচুর্য্য ছিল, বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়া অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।" মহাত্মা গান্ধীর প্রতিষ্ঠিত 'সেবাগ্রাম' সম্বন্ধে অনেকদিন আগে পড়েছিলাম, "প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে বিচার করলে স্থানটি আদর্শ স্থান বলা চলে না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে বিচার করলেও স্থানটিকে খুব ভালো বলা চলে না। ম্যালেরিয়া বেশ আছে। মহাত্মাজী ভারতবর্ষের মধ্যে আরো সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থানের হয়তো সন্ধান রাখেন। ভারতের ধনকুবের নন্দন কাননের মত স্থান মহাত্মার জন্য তৈয়ার করে দিয়ে হয়তো ধন্য হ'তে পারতেন। তবুও মহাত্মা এমন একটি স্থান বেছে নিলেন, যে স্থান দারুণ গ্রীষ্মের দিনে ধূলির তলে ঢাকা থাকে, আর বর্ষায় থাকে পথ ঘাট সমস্ত কিছু কাদায় ভর্ত্তি। এর কারণ তিনি হচ্ছেন মহাত্মা, তাই ভারতের সাত লক্ষ পল্লীর সঙ্গে যার মিল রয়েছে সেই স্থানটিতে তিনি তাঁর প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তির সন্ধান পেলেন।" বস্তুতঃ মহাত্মাজী গ্রামের প্রাণকেন্দ্ররূপে এ শিক্ষা কেন্দ্রটি গ'ড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষার ভেতর দিয়ে সমগ্র জাতিটাকে কি ক'রে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়—কি ক'রে দেশের আবহাওয়াকে জ্ঞানযুক্ত কর্ম্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা যায়—এ চিন্তাই ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা। মহাত্মাজী বলতেন, "বুনিয়াদী শিক্ষা এক সঙ্গে শরীর ও মনকে গ'ড়ে তোলে। দেশের মাটির সঙ্গে শিশুকে সংযুক্ত ক'রে রাখে এবং

তার সম্মুখে ভবিষ্যতের এক গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করে।" তাই প্রতিটি মুহূর্ত্তকে কাজের ভেতর দিয়ে সার্থক ক'রে তোলার নির্দ্দেশই মহাত্মাজী দিয়েছিলেন তাঁর আশ্রমবাসীদের। বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রটিও সেবাগ্রামের আদর্শেই পরিচালিত। বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা-কেন্দ্রটিও আজ গ্রামের প্রাণকেন্দ্ররূপে দাঁড়িয়ে আছে। শুনতে পেলাম, বলরামপুর বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছাড়া নয়া-তালিমী সংঘের অধীনে আরও ৬টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন স্থানে চলছে।—বলরামপুর শিক্ষা কেন্দ্রটিতে সমস্ত উৎসবই প্রতিপালিত হয়। উৎসবগুলো সুষ্ঠু ভাবে প্রতিপালন করাও শিক্ষার একটি অংগ। এখানে সংগীত শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্তা বাণী বসু এবং কস্তুরবা বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্তা অঞ্জলিকা রায় চৌধুরী সংগীত শিক্ষা বিভাগ পরিচালনা ক'রে থাকেন।

মহাত্মা গান্ধী মান্দ্রাজ যাবার সময় পথে কিছু সময়ের জন্য একবার এ শিক্ষা কেন্দ্রে এসেছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্রের গা ঘেঁসে পুরী রেলওয়ে লাইন চলে গেছে। বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে ট্রেনটি আশ্রমের কাছেই থামানো হ'য়েছিল। মহাত্মাজী ট্রেনে বসেই শিক্ষাকেন্দ্রের সব শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদের ডেকে তাদের উৎসাহ ও উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর মহাত্মাজীকে পুনরায় এ আশ্রমে পাবার আর সৌভাগ্য হয়নি। এই তাঁর সঙ্গে আশ্রমের প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। আজও শিক্ষাকেন্দ্রের এই স্থানটিতে দেশের পিতার মৃত্যু তিথিতে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় আশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে থাকেন।

বেলা ১১টা বেজে গেল। ফিরবার পথে হিজলী হ'য়ে খড়্গপুর জোনের Higher Technical Institute টি দেখে যাবার মনস্থ পূর্ব্বেই করেছিলাম। ইংরেজ আমলের সুপরিচিত হিজলী বন্দীশালাটিই বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতে Technical Institute এ পরিণত হতে চলেছে, আর ডাঃ জে, সি, ঘোষ এর ডাইরেক্টর পদে নিযুক্ত হ'য়েছেন। বলরামপুর শিক্ষা কেন্দ্র থেকে বিদায় নেবো, ঠিক এমনি সময় মোহিতবাবু বল্লেন, "চলুন আমাদের 'অভয় আশ্রমটি দেখে যান। এখান থেকে সাইকেলে ৫।৭ মিনিটের।" রাজী হ'য়ে গেলাম। বলরামপুর শিক্ষাকেন্দ্র ছেড়ে এগিয়ে চল্লাম সাইকেলে দল বেঁধে মোহিতবাবুর সঙ্গে আরও দক্ষিণে। কিছুদূর গিয়ে দূরে একটি শালবন দেখিয়ে তিনি বল্লেন—"ঐ যে দূরে শালবনটি দেখছেন ওটিও আমাদের আশ্রমেরই অন্তর্ভুক্ত।" মিনিট সাত পরে এসে 'অভয় আশ্রমে' প্রবেশ করলাম। এখানেও একটি বড় পুকুরের চারপাশে সবজীর বাগান দেখতে পেলাম, আর তারই দু'দিকে ঘর ও ছাত্রাবাস। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নাকি এখানে এলে এ আশ্রমেই একটি ঘরে বাস করেন। ডাঃ ঘোষের ভগ্নী শ্রীযুক্তা যমুনা ঘোষও বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। 'অভয় আশ্রমের চারদিকটা ঘুরে—আশ্রমের ছাত্রাবাস, পোল্ট্রি, ফারমটি দেখে অবশেষে এসে প্রবেশ করলাম শিক্ষাকেন্দ্রের চিত্র শিল্পীর ঘরে। শিল্পী তখন তাঁর ছবিগুলো বাক্সবন্দী ক'রে চলেছেন কলকাতা অভিমুখে—প্রদর্শনীতে যোগ দিতে। যে দু'কখানা ছবি দেখলাম—তাতে শিল্পীর সত্তাকারের পরিচয় পেলাম। শান্তিনিকেতনে Pacifist Conference এ পাশ্চাত্য দেশ থেকে যে সব সভ্য সভায় যোগদান করতে এসেছিলেন—তাঁদের মধ্যে অনেকেই দল বেঁধে এ বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রটি ও অভয় আশ্রমটি দেখতে এসেছিলেন। তাঁরা শিল্পীর ছবির প্রশংসা ক'রে গেছেন খুব এবং তাঁর আঁকা ছবিও কিছু ক্রয় করবার ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। অভয় আশ্রমেও একটি হাতে লেখা সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখতে পেলাম। ছাত্রাবাস থেকে বের হয়ে থাকে—নাম দেওয়া হ'য়েছে "নবারুণ।" অভয় আশ্রম পরিক্রমা শেষ ক'রে ফিরে এলাম আবার—বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রে। মোহিতবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা হিজলীর পথে পা বাড়ালাম। মনে হ'লো কোন্ এক শান্তির দেশ থেকে এতক্ষণ বিচরণ ক'রে এলাম।—

ফুল ও সবজী বাগান—দূরে একটি কাশ ঘর

বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষা কেন্দ্রের একটি দৃশ্য

আজ বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির যে সংযোগ নেই, এ কথা শিক্ষিত সমাজ মাত্রই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন সন্দেহ নেই। তবু বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির দিকে আমূল পরিবর্তন এনে দেশের মানুষ ও মাটির সংগে সংযোগ ঘটিয়ে স্বাবলম্বী ক'রে তোলার প্রয়াস কোথায়? রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী শিক্ষাগঠনমূলক কাজে যেটুকু চিন্তা করেছিলেন দেশ ও দশকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে দূরে আলোর রাজ্যে নিয়ে যেতে—তাঁদের

মহাপ্রয়াণের পর আমরা তাঁদের আদর্শমূলক শিক্ষাপদ্ধতি বিস্তার করতে কতটুকু তৎপর হ'য়েছি জানি না! স্বাধীন দেশে যে শিক্ষার প্রয়োজন, যে শিক্ষা দেহ ও মন একযোগে গ'ড়ে তুলবে আমাদের স্বাবলম্বী ক'রে প্রতিকাজে আত্মনিয়োগ করতে—সে শিক্ষা আমাদের কোথায়? যে ক'টি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে তার সংখ্যাই বা কত? যে দিক থেকে বিচার করলেও দেখতে পাই—জনসাধারণের ও গভর্ণমেন্টের ঔদাসীন্য সমতা রক্ষা করেই চ'লেছে। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণন কমিশন্ বলেছেন, "Taking Gandhiji's concept as a whole it presents the seeds of a method for the fulfilment and refinement of human personality." সেণ্ট্রাল বোর্ড অব্ এডুকেশনের অষ্টাদশ অধিবেশনে বোম্বের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বি, জি, খের ট্রিবেনড্রামে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন—তা' উল্লেখযোগ্য। বর্তমান শিক্ষিত বেকার সমস্যার কথা বলতে গিয়ে—তিনিও "Self supporting aspect of basic education"এর কথাই বলেছেন। কারণ,—"The essence of the Philosophy underlying basic education is that it combines practice in every day processes of living with more formal training." কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে ও বিস্তার করতে হ'লে—গভর্ণমেন্টের পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন। জনসাধারণের কাছে এ শিক্ষার সুফল ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ প্রয়োজন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এ শিক্ষাপদ্ধতি কতটা সার্থক হয়ে উঠ্ছে—তারও প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হ'বে। নতুবা জনসাধারণের কাছে এ শিক্ষার তাৎপর্য্য ব্যর্থই হ'য়ে দাঁড়াবে। বর্তমানে নানা বাধাবিঘ্ন ও আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে যে কটি বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র তাদের আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে—তাদের মধ্য বলরামপুর বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্রটি অন্যতম। অল্পদিনের ভেতর এ শিক্ষা কেন্দ্রটি বর্তমানে যে রূপ ধারণ করেছে—তা'তে আশ্রমের কর্ম্মীদের কর্ম্মনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়ে থাকে। তাঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, সুষ্ঠু শিক্ষা পরিকল্পনায় দেশের শিক্ষাপদ্ধতির দিকে একটি নতুন জীবনের সূচনা করুক—এই প্রার্থনাই করি।

বিদায়

শ্রীকালিদাস রায়

(যুক্তাক্ষর হীন ভাষায়)

গোধূলি ঘনায়,
কাতর চাহনি হানি নিল সে বিদায়
কহিল না কোন কথা   বেদনার গভীরতা
গলার ডুয়াব তার রুধিল কি হায়?
নিল সে বিদায়,
দেখিল কি মোর চোখে বাণ ব'য়ে যায়?
ঝরিল কি চোখে জল   দিয়া রাঙা করতল
লুকাইয়া করি ছল মুছিল কি তায়?
তরী চলে যায়,
কলকল রাঙা জল দুধারে লুটায়।
নদীজলে রেখা টানি   চিরে চিরে প্রাণখানি
তরী চলে বুকভেঙে বইঠার ঘায়।
নদী কিনারায়,
দেখি চোখে, তরী ঢাকে সাঁঝের ছায়ায়।
আকাশে লোহিত রাগ,   নদীতে তরীর দাগ
ঘুচে যায়, বুকে দাগা নাহি ঘুচে হায়।

সুদূরে মিলায়,
বইঠার ঘাও আর শোনা নাহি যায়।
মাঝিদের ভাটিয়ালী   সুর কানে আসে খালি,
সাঁঝের তারকা দূরে ছল ছল চায়।
প্রাণ চলে যায়
দেহখানি পড়ে থাকে নদী কিনারায়।
রাখাল বাজায়ে বেণু   ঘরে নিয়ে যায় ধেনু
আমি কি ফিরিব ঘরে? কোন ভরসায়?
ওপারে চিতায়
আগুনের শিখা নদী জলেরে রাঙায়।
বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে   এপারে শিয়াল ডাকে,
গহন নদীর নীর ডাকিছে আমায়।
এই দেহ হায়
ফিরিতে না চায় ঘরে, মরিতে না চায়।
ফিরিয়া আসিব বলি'   গিয়াছে সে বঁধু চলি'
জীবন রাখিতে হবে তাহারি আশায়।

(পূর্বানুবৃত্তি)

গাজন আসিয়াছে। চৈত্রের শেষ সপ্তাহ। আজ দুই দিন ধরিয়া গোটা জংশন সহরটা ঢাকের শব্দে গম্ গম্ করিতেছে। বাজারের দক্ষিণ দিকে—যে দিকটায় পুরানো দ্বারমণ্ডল—সেইদিকে বুড়া শিবতলায় প্রাচীনকাল হইতে গাজন চলিয়া আসিতেছে। আগে বুড়াশিবের একটা মাটির ঘর ছিল, এখন সেখানে পাকা ঘর হইয়াছে, সামনের একটা চত্বর বাঁধানো হইয়াছে। একবার সেখানে পাকা টিনের চালাও তৈয়ারী হইয়াছিল, কিন্তু বার বার তিনবার ঝড়ে টিনের চাল উড়িয়া যাওয়ায় এখন সামিয়ানা খাটাইয়া গাজনের উৎসব হইয়া থাকে। উৎসবটা বেশ জাঁকালো রকমেরই হয়। দিন তিনেক যাত্রা হয়, মেলা বসে, চড়কের দিন প্রায় ত্রিশচল্লিশ হাজার লোক জমায়েৎ হয়।

ও দিকে—লেবার ইউনিয়নের ইলেকসন আসিয়া পড়িয়াছে।

আর একদিকে আসিতেছে পচিশে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন।

তাহার আগে ১লা বৈশাখ হালখাতা।

কলিকাতায় ফুটবলের মরসুম আসিতে দেরী থাকিলেও—জংসনের মাঠে ফুটবল পড়িয়াছে।

সুরপতিবাবুর দল ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে মিউনিসিপ্যাল ইলেকসনে। ক্লাবে তিন তিনখানা নাটক মহলায় পড়িয়াছে। সত্যযুগ হইতে কলিযুগের বিংশশতাব্দী পর্য্যন্ত সংস্কৃতির সে এক বিচিত্র সমন্বয়। একখানা পৌরাণিক—একখানা ঐতিহাসিক—একখানা সামাজিক। ক্লাবে ব্রিজটুর্ণামেণ্ট সুরু হইবে—ফাইনাল হইয়া গেলে—শিল্ড কাপ বিতরণ এবং অভিনয় একসঙ্গে হইবে।

সবচেয়ে আগে গাজন এবং হালখাতা। গাজনের ঢাক বাজিতেছে। বুড়া শিবতলায় সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে, বাঁশের খুঁটিগুলির গায়ে দেবদারুর পাতা দিয়া ঢাকিয়া রঙীন কাগজের মালা জড়াইয়া সাজানো হইয়াছে, শিবতলার চারিদিক ঘিরিয়া দোকানীরা চালা তুলিতে সুরু করিয়াছে। এবারকার আয়োজন-সমারোহ যেন কিছু বেশী। গাজনতলার উদ্যোক্তা জীবন দে সকাল হইতে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত চরকির মত ঘুরিতেছে।

জীবন দে—পুরানো দ্বারমণ্ডলের বাসিন্দা। বহুকালের পুরানো গন্ধবণিক বংশের সন্তান। তাহারাই পুরুষানুক্রমে পুরানো দ্বারমণ্ডলের প্রধান ব্যবসায়ী হিসাবে গাজনতলার ভারপ্রাপ্ত বংশ। গাজনের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সেকাল হইতেই কিছু জমি আছে—সে জমিরও কিছু অংশ তাহারা ভোগ করে। জীবন দে নূতন কালের ছেলে, সে বি-এ পাশ করিয়াছে। ব্যবসার সঙ্গে দ্বারমণ্ডলের প্রাচীন গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এখানে বণিক সমিতি গড়িয়াছে, বারোয়ারি গন্ধেশ্বরী পূজার পর্ব্বটিকে জমজমাট করিয়া তুলিয়াছে, মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের গো-সেবা-সমিতির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিয়াছে; সুরপতির ক্লাব, মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসন বোর্ড, এমন কি কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা এ দুয়ের সঙ্গেও তার যোগাযোগ আছে। জীবন দের সঙ্গে ঘুরিতেছে রামভল্লা।

রামভল্লাকে জীবন চাকরী দিয়াছে। সেদিন মাড়োয়ারী পটিতে অরুণার ব্যাপার হইয়া ময়েব সেখের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে করিতে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত যে আকস্মিক বিবাদটা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল—তাহার মধ্যে রাম যে প্রচণ্ড সাহস ও শক্তির পরিচয় দিয়াছিল—তাহা দেখিয়াই জীবন মুগ্ধ হইয়া তাহাকে চাকরী দিয়াছে।

রাম বহুকালের ডাকাত। লোকে তাহাকে ভয়ই করিয়া আসিয়াছে এতদিন, দুর্জ্জন বলিয়া সযত্নে পরিহার করিয়া আসিয়াছে। সেদিন কিন্তু অরুণার পক্ষ লইয়া যে প্রতিবাদ করিল—সে প্রতিবাদটাকে এ অঞ্চলের প্রায়

সমস্ত হিন্দুই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিল এবং তাই উপলক্ষ করিয়াই রাম সকলের প্রশংসা এবং পৃষ্ঠপোষকতা অর্জ্জন করিল একমুহূর্ত্তে। সেদিন দারোগা পুলিশ আসিয়া রাম এবং ময়েবদের জনকয়েককে থানায় ধরিয়া লইয়াও গিয়াছিল। কিছুদিন আগেই জয়তারা আশ্রমের পশ্চিম প্রান্তে পীরতলা লইয়া অঞ্চলব্যাপী দাঙ্গার যে প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল—তাহার পর এই ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করিতে দারোগা-সায়েব সাহসী হন নাই। বিশেষ করিয়া অরুণাকে লইয়া এই বাদানুবাদটিকে সেই ব্যাপারের জের ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

তাহার উপর বাংলা দেশে লীগ মন্ত্রিত্ব—এবং এ জেলার পুলিশ বিভাগটি সামসুদ্দিন সাহেব—দরবারী সেপ, গফুর মিঞার করায়ত্ত। ওদিকে আই-জি সাহেবকে সামসুদ্দিন পুলিশ-সাহেব বাবা বলিয়া ডাকেন। মধ্যে সামসুদ্দিন সাহেব রিভলভারের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। কোন বিপ্লবপন্থী গুলি করে নাই, সামসু সাহেবের নিজের রিভলভারটাই হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল এবং সামসু সাহেবের কপালখানা চার চৌকস বলিয়াই গুলিটা পায়ের মাংসপেশীর মধ্যে ঢুকিয়াই নিরস্ত হইয়াছিল। সেই সময় তাহাকে কলিকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেই হাসপাতালে আই-জি সাহেব সামসুদ্দিনকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। সামসু সাহেবকে দারোগারা বলিয়া থাকে—দুর্ব্বলের মুগুর—সবলের কুকুর। খুব আস্তে আস্তে বলে ওই শেষ কথাটা। বলে—ঠিক ওই জীবটির মত লেজ নাড়িয়া সজল চক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিয়া শায়িত সামসু শয্যাপার্শ্বে দাণ্ডায়মান দীর্ঘকায় ইংরেজ আই-জির হাটু দুটি স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিল—স্যার—আমার চোখে জল আসচে। মনে হচ্ছে—আমার মরা বাপ বেহেস্ত থেকে আমাকে দেখতে এসেছেন। আমার বাবার মুখ আর আপনার মুখ ঠিক একরকম। আপনি ইংরেজ, কিন্তু আমার বাবার রঙও কম ফরসা ছিলনা।

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই সে যন্ত্রণা-কাতর শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল—উঃ!

সাহেব একটু ব্যস্ত হইয়াই ডাকিয়াছিলেন—ডাক্তার! নার্স!

সামসু বলিয়াছিল—নাঃ, দরকার নাই ফাদার। তুমি শুধু একবার আমার কপালে হাত দাও!

সাহেব হাত দিয়াছিলেন। জাত ইংরেজ আই-জি সাহেবটি ইংরেজ সাম্রাজ্য-রক্ষার প্রয়োজনে দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে পারঙ্গম এই লোকটাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াও গরজের দায়ে ভাল না বাসিয়া পারেন নাই। সাহেবের দপ্তরে সামসু সাহেবের প্রতাপ প্রবল। তাঁহার এক রিপোর্টে দু চারটি দারোগার চাকরী—এক কলমে খতম হইয়া যায়। কাজেই রামকে থানায় না আনিয়া পারেন নাই। রামকে আনিতে গেলেই ময়েবদের আনিতে হয়। কিন্তু ময়েবরা আসিবামাত্র হাফিজুল্লা সাহেব স্বয়ং আসিয়া তাহাদের জামিন হইয়া খালাস করিয়া লইয়া গেলেন। হাফিজ সাহেবরা থানার একালা পার হইতে না হইতে জীবন দে আসিয়া হাজির হইল। জীবন বলিল—আমি রামের জামীন হচ্ছি দারোগাবাবু।

দারোগা এটা ভাবেন নাই। রামের জন্য কেহ জামীন দাঁড়াইবে এ তিনি ভাবেন নাই। সেই কারণে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি ময়েবদের জামীন দিয়াছেন। ময়েবদের ছাড়িয়া দিয়া রামকে সদরে লইয়া গিয়া খোদ সামসু সাহেবের পায়ের বুটের সীমানায় ফেলিয়া দিবার কল্পনা ছিল তাঁহার। সাহেব গোটা কয়েক লাথি ঠুকিবেন, তার পর যা হয় করিবেন। তবে সে যে সাহেবের প্রসন্ন দৃষ্টির প্রসাদ পাইবে এ সম্বন্ধে তাহার সংশয় ছিল না।

জীবন আসিয়া জামীন দাঁড়াইতেই সে অবাক হইয়া গেল।

জীবনের পিছনে পিছনে দেবকী সেন। তাহার পিছনে পিছনে সুরপতিবাবু। তাহার পিছনে পিছনে শেঠ সুরজমলবাবর লোক।

দারোগাকে জামীন দিতে হইল। না দিয়া উপায় ছিল না। জীবন বলিল—পাঁচ হাজার দশ হাজার—যত টাকার জামীন লাগে—দেব আমি।

জামীন হইয়া রামকে খালাস করিয়া সঙ্গে লইয়া গেল নিজের বাড়ী। তাহার ভাবাবেগ তখন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। বলিল—রাম চাকরী করবে?

—চাকরী?

—হ্যাঁ। বয়েস তো অনেক হ'ল। আর ও সব কেন? এইবার ডাকাতি-টাকাতি ছাড়।

রাম লজ্জিত হইয়া খানিকটা হাসিয়া লইল। মৃদুস্বরে সলজ্জ হাসিয়া বলিল—এই দেখ। কি সব বলছে দেখ। ডাকাতি আবার কবে করলাম আমি। দেখলে না পুলিশের জুলুম। এই এমনি করে ধরে এনে—ভরে দেয় জেলে। যত দোষ নন্দ ঘোষ—বুঝলে না। সেই কোন কালে ঘি খেয়েছি—তারই গন্ধ হাতে শুঁকে বলে—রোজ ঘি খাস তু! সেই একবার ডাকাতি করেছেলাম তারই দায়ে দেখ না—ডাকাতি হলেই খোজে আমাকে।

নিজের রসিকতায় সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

জীবন বলিল—হাসি তামাসা করি নাই আমি রাম। তুমি যদি চাকরী কর তবে আমি তোমাকে রাখব।

এবার জীবনের কণ্ঠস্বরে এমন কিছুর সন্ধান রাম পাইল যে সে আর হাসিল না, গম্ভীর হইয়াই বলিল—কি করতে হবে? ছোট কাজ আমি করতে পারব না। গরুর ছানি-কাটা কি ছেলে-কোলে-করা কি তোমার তামুক-সাজা এ সব আমি করব না।

—তা তোমাকে করতে হবে না।

—বেশ, তা হলে করব কাজ। কিন্তু কাজটা কি বল? আমি তো তোমার গদিতে বসে লেকাপড়া করতে পারব না। সে তো জানি না।

—রাত্রে পাহারা দেবে বাড়ী ঘর।

—তা বেশ। সে তোমার ঘরে শুয়ে থাকলেই হবে। আমার নাক ডাকার শব্দ শুনলে যে শালা ডাকাত হোক—লেজ গুটিয়ে পালাবে।

—আর দিনে গদিতে বসে থাকবে। গাড়োয়ানরা মাল বইবে, নজর রাখবে। দেখা-শুনো করবে।

—বেশ, তা করব।

—বেটাদের যা মেজাজ হয়েছে বুঝেছ কি না! কথায়—কথায় চোখ রাঙায়।

—সে আমি রাঙা চোখ সাদা করে দোব।

—কি মাইনে নেবে বল?

—তা দিয়ো গোটা কুড়িক টাকা। না কি বলছ? আর খেতে দিয়ো পেট ভরে।

—বেশ তাই পাবে। আর কাপড়ও পাবে। কেমন?

অবাক হইয়া গেল রাম। সে ভাবিয়াছিল, সে যখন কুড়ি বলিয়াছে তখন জীবন নিশ্চয় বলিবে দশ। তার পর দুই পক্ষে কাটাকাটি করিয়া হয় চৌদ্দ নয় পনের—নয় যোল—এই তিনটার যে কোনটায় রফা হইবে। সে এক কথায় কুড়িতেই রাজী হইয়া গেল? শুধু তাই নয়—কুড়ি টাকার উপর পোষাক সমেত? খোরাকী তো আছেই।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কি যে তোমাকে বলব দে-মশায়, তা বুঝতে পারছি না। তা—ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন গো! আমার আর কি দাবি বল? তবে আমি তোমার তরে দরকার হ'লে পরাণটা দিয়ে দোব এ তুমি ঠিক জেনো।

জীবন হাসিল।

রাম আবার বলিল—এ বুঝেছ—ওই মায়ের আশীর্ব্বাদ। এ আমি নিশ্চয় বুঝেছি। ওই ঠাকুরমশায়ের নাত-বউয়ের। আহা—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণগো! ওর নামে কুকথা বলে ওই পাজী বেটা? কি বলব? লোকজন জমে গেল নইলে—দেখম ঘায়েই আমি ওই মরের বেটার মাথাটা চেলিয়ে দিতাম। সে মনে মনে আমি ঠিক করেই রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম—আর জেল—কালাপানি—নয় এবার শালা ঝুলেই পড়ব ফাঁসী কাঠে।

—না—না—না। সে কর নাই ভালই করেছ রাম। তা হ'লে জেলে যেত, আগুন জলে যেত এখানে।

বাড়ী আসিয়া বেশ একপেট খাইয়া রাম আর একরকম হইয়া গেল। যাহা করিতে পারিবে না, করিব না বলিয়া সর্ত্ত করাইয়া লইয়াছিল সেই সব একটা সর্ত্ত নিজেই লঙ্ঘন করিয়া বসিল। জীবনের চার বছরের ছোট ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া বলিল—এ যে তোমার সোনার চাঁদ গো দে-মশায়।

জীবন হাসিয়া বলিল—সোনা কি কাল হয় রাম? ও হ'ল কেলে। ভারী বজ্জাত! কথায় কথায় মাথা খুঁড়বে।

রাম বলিল—তুমি ছাই জান দে। সোনা কাল হলেই তার কদর বেড়ে যায়। তখন হয় কেলে-সোনা।

জীবন বলিল—কিন্তু তুই এসেই নিজে নিজেই সর্ত্ত ভাঙলি। ছেলে কোলে করলি?

রাম হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তারপর হঠাৎ বলিল—দে, আজ মনে হচ্ছে কি জান?

—কি ?

—মনে হচ্ছে সেকালে—মানে আমরা যে কালে জোয়ান হলাম পেথম—সেকালে যদি তোমরা জন্মাতে তবে চিরজীবনটা ডাকাতি করে কাটত না। জীবন ভোর বার সাত আট মেয়াদ খাটলাম, আজ তুমি আমাকে চাকরী দিলে। সেকালে পেথম মেয়াদ খাটলাম একবছর। ফিরে এলাম—এসে ভাবলাম—নাঃ—চাকরীবাকরী করব, আর উসব লয়। তা' চাকরীই কেউ দিলে না। এবারে ফিরে এসে দেখি—দেশের বেবাক পাল্টে গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ে ডাকাতি করব তার ধর নাই। সব মোটা গেরস্ত পড়ে গিয়েছে। একটা একটা ঘর আঙুল ফলে কলাগাছ হয়েছে। তাও তারা ঘরে থাকে না। জংসন, নয় তো কলকাতা। দেখলাম—ভাত এক জংসন ছাড়া আর কোথাও নাই। তাই এসেছিলাম জংসনে। ঘুরছিলাম—বলি—কি করা যায় একবার দেখি। এত লোকের ভাত হচ্ছে আমার হবে না। দেখি—ভূপতে ছুতোর এখানে। নলে যে নলে—মাটির পুতুল গড়ে সে এখানে জাঁকিয়ে বসেছে। সতীশ বাউড়ী—সে মাটির ঘর গড়ে, সেও এখানে ব্যবসা জমিয়েছে। আমি ভাবছিলাম, লাঠি ছাড়া তো আমার বিদ্যে নাই, সে বিদ্যে এখানে খাটাব কি ক'রে। একজনা খবর একটা দিলে—রেলের মালগাড়ী ভেঙে মাল সরানোর কথা। তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ শুনলাম—ওই মা ঠাকরুণের বিবরণ। দেখতে গিয়ে নয়ন সাথক হ'ল, জীবনটা ভ'রে গেল। মায়ের পুণ্যে থানার দুয়োর থেকে—তুমি আমাকে খালাস ক'রে এনে চাকরী দিলে। জংসনের বাড়-বাড়ন্ত হোক, তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক—বুড়ো বয়সে নিশ্চিন্দি হ'লাম।

* * *

রামভল্লা জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিতেছিল। হঠাৎ সে নলিনের দোকানের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। একসারি পুতুলের দিকে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছিল। সাদা থান কাপড় পরা পূজারতা একটি নারী মূর্ত্তি।

অবিকল—মায়ের মত। অবিকল।

—রাম, চল এইবার বাড়ী চল। জীবন তাহাকে ডাকিল।

—যাই।

সে একটা পুতুল তুলিয়া বলিল—নলিন ভাই, একটা পুতুল আমি নিলাম। দাম যা হয় নিস। দোব কাল।

নলিন—টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব হুঁসিয়ার। ধারে তাহার কারবার নাই। তবু রামকে সে না বলিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

মানব-হৃদয়-স্বর্গ

শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী

মানব-হৃদয়-স্বর্গ হইতে দেবতা নিবাসিত,
শুনি চারিদিকে দানব-জয়োল্লাস।
পুণ্যের শিরে অধর্ম-ধরের লাঞ্ছনা পুঞ্জীত,
সুন্দর আজি কুৎসিত-কৃতদাস !
মানব-হৃদয়-অমরায় আজি অমরী-বৃন্দ যারা
দয়া-স্নেহ ক্ষমা-প্রীতি আর ভালবাসা,
ঘোর বিভীষিকা-তামস-কারায় বন্দিনী সবে তারা
পীড়নে পংগু, নীরব তাদের ভাষা !
মানব-হৃদয়-নন্দনে ম্লান মন্দার পড়ে ঝরি
লোভের বহ্নি-ঝঞ্ঝায় পুড়ে যায় !
দেবতা-ঋষির মধুর বীণায় সংগীত যায় মরি,
স্পন্দন তার বদ্ধ কী বেদনায়।

নামে দিকে দিকে অমারাত্রির গভীর কৃষ্ণ ছায়া
দেবতা-পান্থ-জনের ভ্রান্তি আনে
চকিত তড়িৎ থাকিয়া থাকিয়া রচিয়া মিথ্যা মায়া
মুগ্ধ পথিকে টানে তমিস্রা-পানে।
তবু নাহি ভয়, হবে হবে জয়, ঘুচিবে অন্ধকার,
বিলুপ্ত হবে দানব-অত্যাচার,
মানব-হৃদয়-নন্দনে সুর পশিবে পুনর্বার,
পরিবে গলায় পারিজাত ফুলহার
থাক জাগ্রত, হও একত্র, ভ্রান্ত দেবতা দল,
জাগাও আবার নিদ্রিত নারায়ণে
মানব-হৃদয়-স্বর্গে অমর—অমর হইয়া র'বে
নির্জিত করি দম্ভী দৈত্য-গণে।
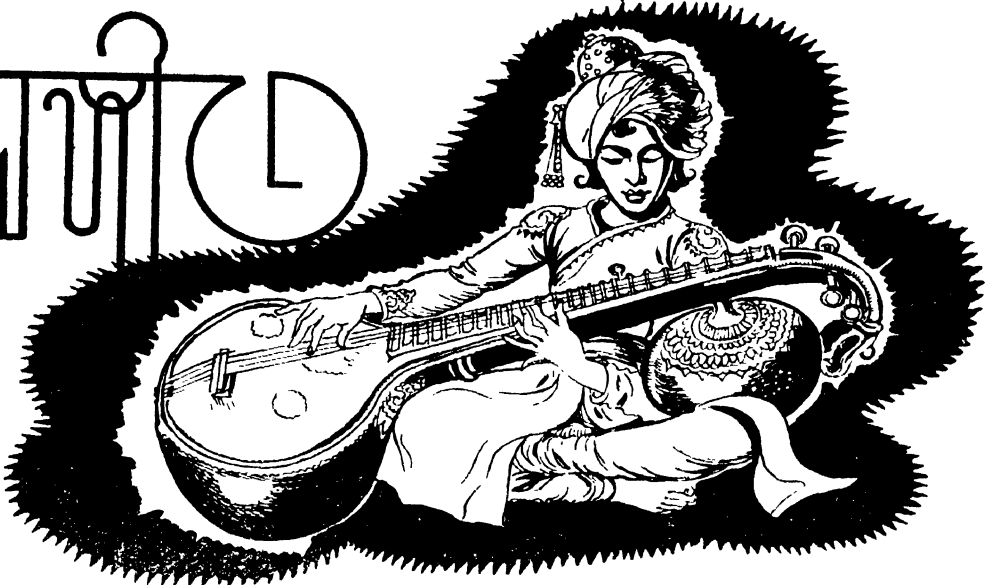
হিন্দি—শ্রীমতী ইন্দিরা মালহোত্র

দেশমাতৃকা

হম্ ভারতকে হৈঁ রখবালে,
দেশকা বল হম্ প্রাণ হৈঁ হম্ ।
ইজ্জৎ ইস্কী শান হমারী,
মা হৈ য়ে সন্তান হৈঁ হম্ ॥

উঁচা রহে নিশান হমারা :
সংকা রহবর—স্তভকা তারা,
সর্ য়ে ঝুকে না,
পাঁব রুকে না,
আঁধী বন্ কর্ ছায়েঁ হম্
বঢ়ে চলেঙ্গে—বঢ়ে চলেঙ্গে
মৌতসে ভী লড় জায়েঁ হম্ ॥

তুফানোঁকে সঙ্গ পলে হৈঁ
আগসে হোলী খেলী হৈ ;
সূরজ শকতী—ধন্নক দামিনী,
ইন্ হাথোঁমে লে লী হৈ ।

উঁচা রহে··· লড় জায়েঁ হম্ ॥

মুশকিল হোঁ আসাঁ হোঁ রাহেঁ
মনজিল তক্ হম জায়েঙ্গে ।
দেশকি খাতির লাল রতনকে
নীলসে তারে লায়েঙ্গে ॥

উঁচা রহে······লড় জায়েঁ হম্ ॥

অনুবাদ—শ্রীদিলীপকুমার রায়

দেশমাতৃকা

আমরা যে ভারতের ধর্মধারক ভাই,
দেশের আমরা বল—তনু, মন, প্রাণ ।
তারি গরিমার মহাগৌরবে গৌরবী,
সেবক মায়ের—অনুগত সন্তান ॥

দেয় যেন আমাদের পতাকা পাহারা :
সত্য-দিশারি আলো—সকালের তারা,
শির নত হবে কেন ?
চরণ না টলে যেন !
দিকে দিকে ঝড় হ'য়ে বাজাব বিষাণ :
"আগে চল্—আগে চল্" দীপক সুররাগে
মৃত্যুরো সাথে রণে হব আগুয়ান্ ॥

আমরা-যে তুফানের সাথী—খেলি দোললীলা
বহ্নি-আবির ল'য়ে রজনীবিহান ,
সূর্যের জ্বালাশিখা—দামিনীর চলধনু
ধরি করে বরি' দেশমায়েরি বিধান ॥

দেয় যেন আমাদের হব আগুয়ান্ ॥

দুর্গম কিবা হোক সুগম চলার পথ
যেতে হবে—যেথা ডাকে লক্ষ্যনিশান ।
দেশের মহিমা জপি' দেশের দুলাল—ছিনি'
আনিব আকাশ হ'তে তারা অম্লান ॥

দেয় যেন আমাদের····· হব আগুয়ান্ ॥

II সা -া গা -া | রা রা সা -া I পা -া না না | ধা -া পা -া I
হ ম্ ভা - র ত কে - হৈ - র থ রা - লে -
আ ম রা যে ভা র তে র ধ র্ম - ম ধা র ক ভা ই

র্সা -া র্গা র্গা | র্রা -া র্সা -া I না -া পা ধা | র্সা -া -া -া I
দে - শ কা ব ল্ হ ম্ প্রা - ণ হৈ হ ম্ - -
দে শে র আ ম রা ব স্ ত মু ম ন প্রা - ণ্

না -া না র্রা | র্সা -া র্সা র্রা I না -া না র্রা | র্সা -া র্সা র্রা I
ই .জ্ .জ ত্ ই স্ কী - শা - ন হ মা - রী -
তা রি গ রি মা র ম ণা গৌ - র বে গৌ - র বী

না র্রা র্সা -া | ধা র্সা না -া I পা না ধা না | পা -া -া -া I
মা - হৈ - য়ে - স ন্ তা - ন হৈ হ ম্ - -
সে ব ক মা য়ে র অ মৃ গ ত স ন্ তা - - ন্

মা -া মা পা | পা পা -া ধা I মা ধা পা ধা | মা পা গা -া I
উঁ - চা - র তে - নি শা - ন হ মা - রা -
দে র যে ন আ মা দে র প তা কা পা হা - রা -

সা -া রা -া | গা গা পা -া I ধা -া র্গা -া | র্রা -া র্সা -া I
স ত্ কা - র হ ব র্ সু ভ্ কা - তা - রা -
স - ত্য দি শা রি আ লো স কা লে র তা - রা -

র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা -া পা -া I না -া না না | না -া মা -া I
স র্ য়ে ঝু কে - না - পা - র রু কে - না -
শি র্ ন ত ভ যে কে ন চ র ণ না ট লে যে ন

ধা -া ধা -া | ধা -া গা গা I পা মা গা রা | সা -া -া -া I
আঁ - ধী - ব ন্ ক র্ ছা - য়েঁ - হ ম্ - -
দি কে দি কে ঝ ড় ভ' য়ে বা জা ব বি ষা ণ - -

সা মা -া মা | রা পা পা -া I গা ধা -া ধা | ন্ধা না না -া I
ব ঢ়ে - চ লে ং গে - ব ঢ়ে - চ লে ং গে -
আ গে চ ল্ আ গে চ ল্ দী প ক তু র্ য রা গে

পা র্সা র্সা র্সা | ধা র্রা র্রা র্রা I না র্গা র্রা র্গা | র্রর্সা -া -া -া II
মৌ - ত সে ভী - ল ড় জা - য়ে - হ ম্ - -
মৃ - ত্যু রো সা থে র ণে হ ব আ গু য়া ন্ - -

র্সা -া র্সা -া | ধনা -া না -া I পধা -া ধা ধা | ক্ষপা -া পা -া I
তু - ফা - নোঁ - কে - স ং গ প লে - হৈঁ -
মু শ কি ল্ হোঁ - আ - সাঁ - হোঁ - রা - হৈঁ -
আ ম রা যে তু ফা নে র সা থী খে লি দো ল লী লা
ডু বু গ ম কি বা হো ক্ সু দূ র চ লা র প থ

গমা -া মা মা | রগা -া গা -া I মা গা রা সা | ন্া -া -া -া I
আ - গ সে হো - লী - খে - লী - হৈঁ - - -
ম ন্ জি ল ত ক হ ম জা - য়ে ং গে - - -
ব - হ্নি আ রী র ল' য়ে র জ নী বি হা - - ন্
যে তে হ বে যে থা ডা কে ল - ক্ষ্য নি শা - - ন্

সা -া সা সা | রা রা রা -া I গা গা গা গা | মা মা মা -া I
সু - র জ শ ক তী - ধ মু ক দা - মি নী -
দে - শ কি খা - তি র লা - ল র ত ন কে -
সু র্ যে স জা লা শি খা দা মি নী স চ ল ধ নু
দে শে র ম হি মা জ পি' দে শে র ডু লা ল ছি নি

পা -া পা -া | ধা -া না -া I র্রা র্সা না ধা | পা -া -া -া I
ই ন্ হা - থোঁ - মে - লে - লী - হৈ - - -
নী - ল সে তা - রেঁ - লা - য়ে ং গে - - -
ধ রি ক য়ে ব রি' দে শ মা য়ে রি বি ধা - - ন্
আ নি ব আ কা শ হ' তে তা রা অ - ম্লা - - ন

পাদটীকা : জেনেরাল কারিয়াপ্পা আমাকে লিখেছিলেন সৈন্যদের জন্যে একটি মার্চ-সঙ্গীত দিতে। তাঁর অনুরোধে এ-গানটি লেখানো ও সুরে-বসানো। তবে এ গানটি কবে যে গাওয়া হবে ভগবানই জানেন। ইতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

একটি ছোট গ্রাম

দক্ষিণ-চাতরা বসিরহাট মহকুমার (জেলা ২৪পরগণা) একটি গ্রাম—উহা বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত এবং চাতরা ইউনিয়ন। বনগাঁ লাইনের মসলন্দপুর রেল ষ্টেশন হইতে মাত্র ২ মাইল দূরে অবস্থিত। যশোহর রোড ও বাদুড়িয়া রোড দিয়া মোটরযোগেও ঐ গ্রামে যাওয়া যায়। পূর্বে ঐ গ্রামে বহু মুসলমান বাস করিত—তাহাদের সংখ্যা শতকরা ৯০ জন ছিল। গ্রামের বৃদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে কংগ্রেসের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৯২৮ সালে গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়—১০টি ক্লাসের জন্য ১০টি পাকা ঘর সমেত চমৎকার পাকা গৃহ ও তাহার সঙ্গে একটি পুষ্করিণী সমেত ২৮ বিঘা জমী স্কুলের জন্য জমীদারগণ দান করিয়াছেন। স্কুলের সম্মুখে পথ, ঐ পথ দিয়া পূর্বদিকে যাওয়া যায়। পথের অপর পার্শ্বে সপ্তাহে ২ দিন একটি হাট বসে—হাটের জমী বিদ্যালয়ের—কাজেই হাট হইতে স্কুলের মাসিক ৫০. টাকা আয় আছে। গ্রামে জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে—তাহার গৃহ সুন্দর এবং পাকা—তাহার নিকটে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের পাকা বাসগৃহ আছে। যুদ্ধের সময় স্কুলের নিকটে যে মিলিটারী হাসপাতাল হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট তাহা বজায় রাখিয়া পরিচালন করিতেছেন—সেখানে ২০ জন রোগীর থাকিবার গৃহ আছে—সেখানেও ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, নার্স প্রভৃতির বাসগৃহ আছে। সম্প্রতি জমীদারদের প্রদত্ত ৬ বিঘা জমীর উপর জেলা স্কুল বোর্ড নূতন বুনিয়াদি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন—প্রাথমিক বিদ্যালয় তথায় স্থানান্তরিত হইবে। বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে ৫টি ক্লাসের ঘর ছাড়া শিক্ষকদের বসিবার ঘর ও গুদাম ঘর আছে। সঙ্গে ৪ জন শিক্ষকের বাসগৃহ ও নির্মিত হইয়াছে—প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য ২ খানি শয়নঘর, ২ ধারে বারান্দা, রন্ধনগৃহ, স্যানিটারী পায়খানা প্রভৃতি হইয়াছে। গ্রামের যুবকগণের চেষ্টায় উত্তর-চাতরা গ্রামে ১ বিঘা জমীর উপর একটি পাকা ও বৃহৎ পাঠাগার-গৃহ নির্মিত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয় উত্তর ও দক্ষিণ চাতরার সীমান্তে অবস্থিত। তাহার নিকটে তিন বিঘা জমীর উপর শীঘ্রই বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মিত হইবে। বর্তমানে বালিকা বিদ্যালয়টি দক্ষিণ চাতরা গ্রামে একটি মাটীর ঘরে বসিতেছে। হাই স্কুলের নিকটেই একটি প্রশস্ত নদী আছে—উহা ৩ মাইল পূর্বদিকে যাইয়া চারঘাট নামক স্থানে যমুনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে ও সেখান হইতে অল্প দূরে উভয় নদী একত্র হইয়া যাইয়া ইছামতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ঐ নদীটির সংস্কার করা হইলে নৌকাযোগেও চাতরা গ্রামে যাওয়া-আসা যাইবে ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হইবে। সূর্য্যবাবু সহৃদয় ব্যক্তি—গত মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতায় বোমা পড়িলে যখন কলিকাতার লোক গ্রামের দিকে পলায়ন করিতেছিল, সে সময়ে সূর্য্যবাবু কলিকাতার বহু লোককে গ্রামে জমী দিয়া বাস করাইবার চেষ্টা করেন। খ্যাতনামা সংবাদিক শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, শিশুপাঠ্য কবিতা-লেখক শ্রীসুনির্মল বসু প্রভৃতি সে সময়ে তথায় গমন করিয়াছিলেন। পাকিস্তান হইবার পরও তিনি এবং তাঁহার আত্মীয় শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় বহু হিন্দুকে জমী দিয়া ঐ গ্রামে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। হরেন্দ্রনাথও কংগ্রেসকর্ম্মী এবং গত মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বৎসর কারারুদ্ধ ছিলেন। ঐ গ্রামে বর্তমানে শ্রীযুক্ত রবী সেন, আশু কাহালী, যতীন রায় প্রভৃতি কয়েকজন পুরাতন অনুশীলন দলের বিপ্লবী কর্ম্মী বাস করিতেছেন। তন্মধ্যে রবী সেন মহাশয় সাড়ে ৪ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি পাকা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং একটি ১০ বিঘা ও একটি ৫ বিঘা জমী সংগ্রহ করিয়া কলা, তরিতরকারী, পেঁপে প্রভৃতির চাষ করিতেছেন। হরেন্দ্রনাথ উচ্চশিক্ষিত, অকৃতদার, তিনি বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়ের ও বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালক এবং তাঁহার একান্ত আগ্রহে ও চেষ্টায় গ্রাম দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে ঐ গ্রামে প্রায় ২ শত উদ্বাস্তু পরিবার গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছে—মুসলমানদিগের অধিকাংশই পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছে—তাহার ফলে উদ্বাস্তুরা সহজেই সে সকল গৃহের অধিকার লাভ করিয়াছেন। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫০ জন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০০ জন ছাত্র পাঠ করেন। উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬টি শ্রেণীর জন্য ৯জন শিক্ষক—তন্মধ্যে ৬জন উদ্বাস্তু-বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ পার্শ্ববর্তী গোবরডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী ও সাইকেলে বাড়ী হইতে স্কুলে যাতায়াত করেন। স্কুল সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাস আছে—তথায় একজন উদ্বাস্তু শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ৩০টি ছাত্র বাস করিয়া থাকে। উদ্বাস্তু ছাত্রগণকে ছাত্রাবাসে থাকার জন্য মাত্র মাসিক ১০ টাকা করিয়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য উদ্বাস্তু ছাত্রদের স্কুলের বেতন গভর্ণমেণ্টই প্রদান করিয়া থাকেন। স্কুলের একটি ভগ্ন গৃহ আছে—ইহার সংস্কার করিতে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে—ঐ গৃহটি হইলে তথায় আরও ৪০ জন ছাত্রকে বাসস্থান দান করা যাইবে। গ্রামটিতে ক্রমে লোকের বাস বাড়িলে স্কুলে ছাত্রের অভাব হইবে না। গ্রাম হইতে কয়েকজন সাইকেলে ২ মাইল যাইয়া রেল ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ কলিকাতায় কাজ করিতে গিয়া থাকেন—মসলন্দপুর হইতে কলিকাতা মাত্র ৩৪ মাইল। গত বৎসর বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের সময় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর তথায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়াছিলেন—তিনি দয়া করিয়া একটু সচেষ্ট হইলে নূতন জমীতে বালিকা বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ নির্মিত হইতে পারিবে। আজ স্বাধীন দেশে এই ভাবে গ্রামগুলির উন্নতি বিধান প্রয়োজন, সেজন্য আদর্শ হিসাবে এই গ্রামেরকথা বলা হইয়াছে।

বহির্ভারতে সাংস্কৃতিক অভিযান

ব্রহ্মচারী রাজকৃষ্ণ

ভারতবর্ষের যদি কিছু গৌরবের বস্তু থাকিয়া থাকে তবে তাহা তাহার সংস্কৃতি ও সভ্যতা। পরাধীনতার যুগেও ভারত যদি জগতের বরেণ্য জনগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকে—তবে তাহা তাহার মহান্ কৃষ্টি তথা ঐতিহ্যের জন্য, তাহা বিশ্বের কাহারও অস্বীকার করিবার স্পর্দ্ধা নাই। বিশ্ব যদি ভারতকে কোনদিন চিনিতে পারিয়া থাকে—তবে পারিয়াছে তাহার সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মাধ্যমে। তাই আজ স্বাধীন ভারতকে জগতের সম্মুখে মহামহীয়ান করিয়া তুলিতে হইলে তাহার সনাতন আদর্শ তথা বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। কোন রাষ্ট্রের সহিত অপর একটি রাষ্ট্রের কূট রাজনৈতিক সম্বন্ধ সংস্থাপন এবং সৌভ্রাত্য রক্ষার জন্য যেমন রাজদূত প্রেরণ এবং বিপুল অর্থ ব্যয়ে দূতাবাস পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা আছে, বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার সহিত সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি তথা ধার্ম্মিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ঠিক তেমনই আছে। সেইজন্য দেখা যায় পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নাই যে তাহার সভ্যতা তথা সংস্কৃতি প্রচারে তৎপর নহে। তাই রাজনৈতিক সৌভ্রাত্র তথা মৈত্রী স্থাপনের জন্য যখন ভারতের শিশু রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে বিশ্বের দিকে দিকে সুদক্ষ রাষ্ট্রদূত প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখন ভারতকে তাহার প্রাচীন গৌরব তথা মর্য্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার শাশ্বত আদর্শ এবং উদার সংস্কৃতি প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? সংস্কৃতিই ভারতের আত্মা, রাজনীতি তো ভারতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সংস্কৃতির প্রচারেই ভারতের প্রকৃত মর্য্যাদা। জগত ভারতকে তাহার রাজনীতির উৎকর্ষতার মাধ্যমে চেনে নাই, চিনিয়াছিল তাহার উন্নত সভ্যতার অবলম্বনে। ভারত জগতের পূজা পাইয়াছে তাহার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আভিজাত্যে নয়—পূজা পাইয়াছে, ত্যাগ ও তপস্যার গরিমায়। তাই ভারতের স্বাধীনতালাভের পর যখন দেখা গেল,—ভারত তাহার সনাতন "ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের" নীতিকে জলাঞ্জলি দিয়া "ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ" রাষ্ট্র রূপে মাথা তুলিল, তখন ভারতের একটি সাংস্কৃতিক তথা মানবসেবী প্রতিষ্ঠান ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বহির্ভারতে সংস্কৃতি প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। যদিও সঙ্ঘের অর্থ ভাণ্ডার এই গুরুদায়িত্ব বহনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তথাপি কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে সঙ্ঘ উক্ত কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হয়।

ইং ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘ হইতে ১০ জন সন্ন্যাসীর একটি বাহিনী সংস্কৃতি প্রচারের জন্য পূর্ব্ব আফ্রিকায় প্রেরণ করা হয়। সেখানে প্রায় দেড় বৎসর

মরিসাসের 'রেজ হল'— শিবালয়'

থাকিয়া উক্ত মিশন প্রতি জেলায় ঘুরিয়া প্রচার কার্য্য পরিচালন করে এবং স্থায়ী প্রচারের উদ্দেশ্যে দুইটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

এই সময় হইতেই সঙ্ঘ পৃথিবীর চারিদিকে ভারতীয়গণের নিকট হইতে তদ্দেশসমূহে সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ পত্রাদি পাইতে থাকে। সঙ্ঘ পরিচালকগণ বিচার করিয়া দেখিলেন যে পৃথিবীর যে সমস্ত স্থানে সহস্র সহস্র ভারতীয়—বিশেষত হিন্দু, আজ দীর্ঘদিন প্রবাসের ফলে স্বীয় সংস্কৃতি, জাতীয়তা তথা আচারানুষ্ঠান বিস্মৃত হইয়া বিজাতীয় ভাবা

দর্শে জীবন যাপন করিতেছে, ধর্ম্ম এবং সংস্কৃতির প্রচারের দ্বারা তাহাদিগকে প্রকৃত ভারতীয় করিয়া-গড়িয়া তোলা অপেক্ষা বিদেশে সংস্কৃতি প্রচারের সার্থকতা আর কী হইতে পারে? তাই সঙ্ঘ বহির্ভারতে ভারতীয় জনবহুল প্রদেশগুলিতেই সর্ব্ব প্রথম "মিশন" প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহার ফলে, প্রথমতঃ তদ্দেশীয় হিন্দুগণকে পূজা-পাঠ, যজ্ঞ-অনুষ্ঠানাদি শিক্ষাদান করিয়া খাঁটি-হিন্দুত্বে দীক্ষাদান, দ্বিতীয়তঃ বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া দীর্ঘ-প্রবাসী ভারতীয়গণের হ্রাসপ্রাপ্ত স্বদেশপ্রীতির পুনরুদ্বোধন, তৃতীয়তঃ অভারতীয়গণের মধ্যে ভারতের উদার বিশ্বজনীন সংস্কৃতির প্রচারের দ্বারা তাহাদিগকে বন্ধুত্বে আবদ্ধ করা, এই তিনটি কার্য্য এই মিশনগুলির দ্বারা একই সময়ে সম্পন্ন হইতে থাকে।

১৯৪৯ সালে সঙ্ঘ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বৃটিশ এবং ওলন্দাজ অধিকৃত গায়না এবং দক্ষিণ আমেরিকার ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে সংস্কৃতি প্রচারের আশু প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লিখিত স্থানীয় ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীযুত সত্যচরণ শাস্ত্রীর এক পত্র পায়। ক্রমে পত্র ব্যবহারে জানা যায় যে উক্ত অঞ্চলসমূহে প্রায় চার লক্ষ ভারতীয় স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তন্মধ্যে ৩ লক্ষেরও অধিক হিন্দু। তাহাদের অনেকেই দুই তিন পুরুষের মধ্যে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন নাই—অথবা করেন নাই। ভাষা তথা আচার-পদ্ধতিতেও বিজাতীয় প্রভাব যথেষ্ট পড়িয়াছে। আরও জানা গেল যে কানাডীয় খৃষ্টান মিশনারীগণের বিশেষ তৎপরতায় গত বিশ পঁচিশ বৎসরে বহুসংখ্যক ভারতীয় ধর্ম্মান্তরিতও হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। তাই সঙ্ঘ হইতে এতদঞ্চলে একটি মিশন প্রেরণের চেষ্টা চলিতে লাগিল।

মরিসাসের নিউগ্রোভ সহরে হিন্দুদের একটি মন্দির

শ্রীযুত শাস্ত্রীর বিশেষ চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই স্থানীয় সরকারের নিকট হইতে "প্রবেশানুমতি" (Entry Permit) সংগৃহীত হইল। কিন্তু তখন পূর্ব্ববঙ্গের শরণার্থী সেবাকার্য্যে সঙ্ঘ এমনই ব্রিত যে বিদেশে মিশন প্রেরণ সম্ভব হইয়া উঠে নাই।

এইদিকে আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিশন প্রেরণ না করায় প্রবেশানুমতির সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। সেইটি ফেরৎ পাঠাইয়া নূতন 'অনুমতি' চাওয়ার প্রায় দুইমাসের মধ্যেই পুনরায় 'প্রবেশানুমতি' আসিয়া পৌঁছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সঙ্ঘ যেভাবে দেশে বিভিন্ন প্রকার সেবাকার্য্যে ব্যস্ত তাহাতে বিদেশে প্রচারোপযোগী অর্থ সঙ্ঘের তহবিলে নাই। ইউরোপ বা আমেরিকায় দুই একটি খ্রীষ্টান মিশন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করে, সমগ্র ভারতে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাহা ব্যয়িত হয় কিনা সন্দেহ। কারণ হিন্দু আজ ধর্ম্মের প্রচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। তথাপি সঙ্ঘ কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিক গণের সহিত এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিতে থাকায় অনেকেই বিশেষভাবে সঙ্ঘকে উৎসাহিত করিলেন। এই বিষয়ে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত কমলচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় বিশেষ-ভাবে অগ্রণী হইয়া যাঁহারা বহি-ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে বিশেষ উৎসাহী—তাঁহাদের লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করিলেন। সেই কমিটিও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Wes Indies) বৃটিশ এবং ওলন্দাজ অধিকৃত গায়েনা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় একটি সাংস্কৃতিক মিশন প্রেরণের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সঙ্ঘকে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতি দান করিল। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীযুত বেণীশঙ্কর শর্ম্মা এবং ব্যবসায়ী শ্রীযুত রামেশ্বর প্রসাদ পটোডিয়া যথাক্রমে উক্ত কমিটির সাধারণ এবং যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। প্রবেশানুমতি পূর্ব্বেই আসিয়াছিল, তাই এখন যাত্রার তোড়জোড় চলিতে লাগিল।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় কাশীধামে শ্রীশ্রীসঙ্ঘ নেতা তথা সঙ্ঘ সন্ন্যাসীগণ সমবেত হন। শ্রীশ্রীসঙ্ঘনেতার শুভ আশীর্ব্বাদলাভান্তে পূজার পরে সঙ্ঘ-কর্ম্মীগণ পুনরায় স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্ত হন। এইবার তাই শ্রীশ্রীমহাপূজায় সঙ্ঘাধিষ্ঠাতা আচার্য্যদেব এবং শ্রীশ্রীমহামায়ার আশীর্ব্বাদ লইয়া সাংস্কৃতিক মিশন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকা অভিমুখে রওনা হইবে—তাহাই স্থির হইল। বাগ্মীপ্রবর শ্রীমৎ স্বামী

অদ্বৈতানন্দজী এইবারও মিশনের নেতৃপদে বৃত হইলেন। শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দজী সহনেতা, আমি এবং ব্রহ্মচারী মৃত্যুঞ্জয় উক্ত মিশনের সদস্য হইলাম।

শ্রীশ্রীপূজার অব্যবহিত পরেই, সঙ্ঘের পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষী নেতৃগণের নিকট হইতে পরিচয়-পত্র সংগ্রহের জন্য দিল্লী গমন করিলাম। সকলেই বিশেষভাবে আনন্দপ্রকাশ করিয়া পরিচয়-পত্রাদি প্রদান করিলেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুত চক্রধর শরণকে বলিয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার শ্রীযুত আনন্দমোহন সহায়কে আমাদের মিশনকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করিবার জন্য পত্র দিলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুও সাতিশয় আগ্রহ সহকারে বলিলেন—"ভারতের সংস্কৃতি প্রচারে দূর বিদেশে যাইতেছেন—এতদপেক্ষা আনন্দের সংবাদ আর কী হইতে পারে। আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের মিশনকে প্রয়োজনীয় সাহায্যদানের জন্য আমাদের প্রতিনিধিকে লিখিয়া জানাইব।" শ্রমসচিব শ্রীযুত জগজীবন রাম, বাণিজ্যসচিব শ্রীযুত শ্রীপ্রকাশ, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত মুন্সী, আইন সভা বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত সত্যনারায়ণ সিংহ, পুনর্ব্বসতি সচিব শ্রীযুত অজিতপ্রসাদ জৈন, শিল্প-সচিব শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মহাতাব, আচার্য্য কৃপালনী, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী, জাতীয় মহাসভার সাধারণ এবং বহির্বিভাগের সম্পাদক শ্রীযুত মোহনলাল গৌতম এবং ডাঃ এন্-ভি-রাজকুমার প্রভৃতি নেতৃগণ স্ব স্ব পরিচিত ব্যক্তিগণের নিকট পত্রাদি প্রদান করিলেন। এইভাবে দিল্লীর কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

এদিকে কলিকাতায় স্বামী অক্ষয়ানন্দজী বিশেষ চেষ্টা করিয়া যে সময়ের মধ্যে সাধারণতঃ "পাসপোর্ট" ইত্যাদির কাজ শেষ হয় না—তাহার পূর্ব্বেই পাসপোর্ট, টিকিট ইত্যাদি করিয়া ফেলিয়াছেন। দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়া পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তারবার্ত্তা এবং পত্রাদি আসিতে লাগিল। যাহারা সঙ্ঘকে উৎসাহিত করিয়া পত্রাদি দিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিহারের গভর্ণর শ্রীমাধব শ্রীহরি আনে, বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী এস্-কে পাতিল, ভারতীয় পার্লামেন্টের স্পীকার শ্রী জি-ভি মবলংকার, ভারতীয় জাতীয় মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক শ্রীশংকররাও দেও, ডাঃ পট্টভি সীতারামীয়া, আসামের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম প্রভৃতি অন্যতম।

১১ই নভেম্বর কলিকাতা হইতে আমাদের জাহাজ "বেটোয়া" ছাড়িবে। ৯ই অপরাহ্নে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত চন্দ্রের সভাপতিত্বে বালীগঞ্জে এক জনসভায় মিশনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। ১০ই দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মহামান্য ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজু তাঁহার প্রাসাদে মিশনের সভ্যগণকে সম্বর্দ্ধিত করেন এবং বৈকালে মহাবোধি সোসাইটি হলে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হইতে মিশনকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১১ই অতি প্রত্যূষে আমরা স্নানাহ্নিক এবং আহারাদি শেষ করিলাম।

মরিসাসের ভারতীয় দূতাবাস—মধ্যস্থলে ভারতীয় হাইকমিশনার মিঃ জন, এ-থিবি।—বাম হইতে দক্ষিণে—শ্রীগঙ্গা, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ, ভারতীয় হাইকমিশনার, মরিসাস সরকারের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্য ডাঃ রামগোপাল, শ্রীজয়নারায়ণ রায় এম-এল-এ

রওনার অব্যবহিত পূর্ব্বে শ্রীমৎ বড়স্বামীজি * স্বীয় আসনে বসিয়া আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ দান করিলেন এবং একটি পাত্রে কিছু গঙ্গাজল এবং অপর একটিতে শ্রীশ্রীসঙ্ঘ দেবতার শ্রীচরণামৃত দিয়া দিলেন। আমরা প্রাতঃ ৬টার মধ্যেই জাহাজ ঘাটে রওনা হইলাম। ঘাটে পৌঁছিয়া দেখি সঙ্ঘের ভক্ত, অনুরাগী অনেকেই আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই 'কাষ্টমস্' এর কাজ মিটিয়া গেলে

* শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহারাজ। সঙ্ঘ-নেতা আচার্য্যদেবের স্থূল দেহাবসানের অব্যবহিত পূর্ব্বে ইনি সঙ্ঘের সভাপতি পদে বৃত হন। ইনি বর্ত্তমানে সঙ্ঘ-সভাপতি এবং সঙ্ঘের গুরু।

নৌকায় মালপত্র লইয়া আমরা জাহাজে উঠিলাম। ভারী ভারী মালগুলি পূর্ব্বদিনই জাহাজে বোঝাই করা হইয়াছিল। সজ্ঞের প্রধান সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী, স্বামী ওঁকারানন্দজী, স্বামী অক্ষয়ানন্দজী এবং আরও অনেক সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তও নৌকায় করিয়া জাহাজে গেলেন। পুলিশের অনুসন্ধান, ডাক্তারের কাজকর্ম্মাদি মিটিতে মিটিতে প্রায় ১০টা বাজিল। ১১টার সময় আমাদের ৪ জন, অন্য যাত্রী ৬ জন এবং জাহাজের অফিসার এবং কর্ম্মী ব্যতীত সকলকে নামিয়া যাইতে হইল। সজ্ঞের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত, অনুরাগী সকলেই সাশ্রুনেত্রে নৌকায় উঠিয়া কিনারায় ফিরিয়া গেলেন। প্রেম এবং ভালবাসা, স্নেহ এবং ভক্তি এমনই জিনিষ—যাহার বন্ধন ছিন্ন করিতে আমাদের আঁখি পাতেও অশ্রু দেখা দিল। একটি ঘটনা আজও আমার মনে ব্যথার সঞ্চার করে, তাহা এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না।

[illegible]

আমাদের জাহাজ ছাড়িতে প্রায় দেড়টা বাজিল। একে একে সকলেই ইতিমধ্যে বিদায় লইয়াছেন। বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম,—সজ্ঞের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজী, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃসম ব্রহ্মচারী পরেশ, ব্রহ্মচারী পঙ্কজ প্রভৃতিরা কিন্তু তখনও আমাদের জাহাজের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া তীরে দাড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের আশা আমাদের জাহাজ ছাড়িয়া যখন ডকের 'লক-গেট'এ যাইবে, তখন আর একবার আমাদের সহিত সাক্ষাৎ বা বার্ত্তালাপের সুযোগ পাইবেন। তারপর আমাদের জাহাজ গঙ্গাবক্ষে অবতরণ করিলে তবে আশ্রমে ফিরিবেন।

স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক প্রচারের ইতিহাসে বোধহয় ১৯৪৮ সালের ৭ঠা জুন এবং ১৯৫০ সালের ১১ই নভেম্বর চিরস্মরণীয় তিথি হিসাবে গণ্য হইবে। এই তিথিদ্বয়ে স্বাধীন ভারতের বক্ষ হইতে একদল হিন্দু সন্ন্যাসী বহির্ভারতে সংস্কৃতি প্রচারে যাত্রা করিয়াছিল। বৌদ্ধ যুগে তথাগত শ্রীবুদ্ধের সজ্ঞ হইতে একদিন স্বাধীন ভারতের বাণী লইয়া দলে দলে শ্রমণেরা অভিযান করিয়াছিল বিশ্বের দিকে দিকে। প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে পুনরায় স্বাধীন ভারতের এক ধর্ম্ম-সজ্ঞের সন্ন্যাসী-দলের ব্যাপক অভিযান।

আজ এই অভিযাত্রী বাহিনী দ্বাদশ সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী দেশসমূহে স্বতন্ত্রভারতের ত্রিশ কোটি নরনারীর প্রতিনিধি হিসাবে, তাহার উদার সার্ব্বজনীন সংস্কৃতির চিরউড্ডীন বৈজয়ন্তী বহন করিয়া চলিয়াছে জগতের বুকে ভারতের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য (Cultural Empire) সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে। প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন ভারত-সম্রাট অশোকের সময়ে একদিন বৌদ্ধ সজ্ঞের শ্রমণের দল সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়া অশোকের 'ধর্ম্ম সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—জগতের বুকে ভারতীয় সভ্যতার প্রোজ্জ্বল আলোক-শিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিল—আজ তেমনি ভারতের বুক হইতে নবীন যুগের আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত এক সন্ন্যাসী প্রচারক বাহিনী ছুটিয়াছে—জগতের সামনে ভারতকে মহামহীয়ান করিয়া তুলিতে। পার্থক্য শুধু এইটুকু—সেদিনের শ্রমণের দল পাইয়াছিল রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সমর্থন—আর আজিকার রাষ্ট্র "ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ।" যেদিন পূর্ব্ব বাংলার এক নিভৃত পল্লীর শ্মশান বক্ষে সমাধিস্থ এই সন্ন্যাসী সজ্ঞ সংস্থাপকের মুখ হইতে বাণী বহির্গত হইয়াছিল—"ভারত আবার জাগিবে, আবার উঠিবে, আবার ভারত জগদ্গুরুর আসনে উপবেশন করিবে—" সেদিন ভারতের নিষ্পিষ্ট পরাধীন জাতি তো দূরের কথা, সিদ্ধ সাধকের আশ্রিত সন্তান দলের অনেকের মনেই সন্দেহ জাগিয়াছিল—"ইহাও কি সত্য?" আজ কয়টী বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই সেই সিদ্ধ বাক্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন।

বেলা প্রায় দেড়টায় খিদিরপুরের কিং জর্জ্জ ডক হইতে আমাদের জাহাজ ছাড়িয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। 'বেটোয়া' মালবাহী জাহাজ; তাই যাত্রী মাত্র ১১ জন, তন্মধ্যে তিনটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়ে। সকলেই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের যাত্রী, একজন দক্ষিণ আমেরিকার। যাত্রীদের একজন নিগ্রো। বাকী সকলেই হিন্দু। জাহাজ ধীরে ধীরে আসিয়া 'লক-গেটে' পৌঁছিল। দেখিলাম ইতিমধ্যেই অপেক্ষমান স্বামীজীরা—'লক-

গেট'এ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সারাদিনের ক্ষুধা এবং বিদায়ের বিয়োগ-ব্যথায় তাঁহাদের বদন বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমরা জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া আছি—তাঁহারা আমাদের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছেন। এ দৃশ্য বড় করুণ ও মর্ম্মন্তুদ। মায়াবাদীরা হয়তো বলিবেন—'ইহাই মায়া।' কিন্তু নিস্পৃহ সন্ন্যাসীর হৃদয়ে মায়ার স্থান কোথায়—তাহা জানি না ; শুধু এইটুকু জানি যে এই সঙ্ঘ-প্রীতি সঙ্ঘ-জীবনের পারস্পরিক এই দরদ, এই মমতা, এই ঐশ্বরিক বা আত্মিক টানই সঙ্ঘকে দীর্ঘজীবী করে।

শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ স্বামীজি উক্ত স্বামীজিদের ক্ষুধা এবং বেদনাক্লিষ্ট শুষ্ক বদন নিরীক্ষণ করিয়া আমাদের খাবার হইতে কিছু 'পুরী' কাগজে জড়াইয়া ছুঁড়িয়া তাঁহাদের খাওয়ার জন্য দিলেন। শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ স্বামীজি তাঁহাদের আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন—"এইগুলি খেয়ে তোমরা আশ্রমে ফিরে যাও, আমরা কাজকর্ম্ম বছর খানেকের মধ্যেই শেষ কোরে আবার ফিরে আসবো।" জানি না কি কারণে এই কথা শুনা মাত্রই স্বামীজিদের আঁখি আবার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল।

জাহাজ লক গেট ছাড়িয়া গঙ্গাবক্ষে অবতরণ করিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গৈরিকবস্ত্র দৃষ্টিগোচর হয় ততক্ষণ দেখিলাম—স্বামীজিরা লক-গেটের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ক্রমে জাহাজ নির্ম্মমভাবে তাঁহাদিগকে আমাদের দৃষ্টিশক্তির অন্তরালে লইয়া গেল—তাই তাঁহারা কতক্ষণে আশ্রমে প্রত্যাবৃত হইয়াছেন—তাহা দেখিতে পাইলাম না।

বেটোয়া—বার হাজার টনের জাহাজ। একেবারে নূতন—এইবারই তাহার প্রথম সমুদ্রযাত্রা। জাহাজটি লণ্ডনের 'নোস' কোম্পানীর। তাই চালক, অফিসার, কারিগর সকলেই ইংরাজ। কেবল কতিপয় খালাসী পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান। বড় জাহাজ, তাই গঙ্গায় জোয়ার ব্যতীত চলে না। জোয়ারের সময় চলে—ভাঁটার সময় নঙ্গর করিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাই "বেটোয়া" ১৩ই বেলা প্রায় ১১টার সময় বঙ্গোপসাগরে পৌঁছিল। এখান হইতে জাহাজ অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। সমুদ্র এখন বেশ শান্ত। তাই জুনমাসে আফ্রিকা যাওয়ার সময় বোম্বাই হইতে জাহাজ ছাড়িয়া আরব সাগরে পতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঢেউএর আধিক্যে সকলে বমন করিতে সুরু করিয়াছিল—এবার আর তাহা হইল না। আমাদের কেবিনটি নীচের তলায়, তাই গরম। চার জনেই একটি কেবিন থাকিতে পারায় বেশ আনন্দই হইল।

জাহাজের হোটেলের খাবার আমরা খাইব না,—আমরা রান্না করিয়া খাইব—এই ব্যবস্থা জাহাজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমাদের হইয়াছে। তাহাতে দুইটি সুবিধা আমাদের হইয়াছে,—প্রথমতঃ প্রত্যেকের খাওয়ার জন্য দুইশত করিয়া টাকা টিকিটের দাম কমিয়াছে এবং দ্বিতীয়তঃ জাহাজের হোটেলের মাছ-মাংস-স্পৃষ্ট খাদ্যাদি আমাদের খাইতে হইতেছে না। জাহাজ কোম্পানী আমাদের জন্য একটি কয়লার চুল্লী এবং প্রায় পাঁচশ ত্রিশ মণ কয়লা বিনামূল্যে দিয়াছেন। কলিকাতা হইতেই আমরা যথেষ্ট পরিমাণ চাউল, ডাল, তরকারী ইত্যাদি নিয়া আসিয়াছি, তাই আমরা রান্না করিয়া দুই বেলা আমাদের ইচ্ছামত সময়ে খাইতেছি। রাত্রে ভাত বেশী হইয়া গেলে সকালে কেবিনের মধ্যেই কাগজ জ্বালাইয়া লংকা পোড়াইয়া পান্তা ভাত খাই, দুপুরে ভাত বেশী হইলে রাত্রে খাই এবং কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে রন্ধিত দ্রব্য চার ভাগে ভাগ করিয়া খাইতেছি। চুল্লীটি বিরাট অথচ আমাদের মাত্র চারজনের রান্না—তাই বেশ কষ্ট হইতেছে রান্না করিতে। সেইজন্য আমরা একবেলা রান্না করিয়া দুইবেলা খাইতেছি। সেই কথা জানিতে পারিয়া জাহাজের চীফ-অফিসার হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য যাত্রীরা সকলে আমাদের বলিতে লাগিলেন, —"স্বামীজি, আপনারা এইভাবে চলিলে তো শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। দেড়মাস পর্য্যন্ত জাহাজে এইভাবে খাওয়া দাওয়া কী সম্ভব! সমুদ্রপথে খাওয়াটাকে বিলাসীর মতই লইতে হয়। ভালভাবে রান্না করুন, দুইবেলা, প্রয়োজন হইলে তিন বেলা পেট ভরিয়া খান—নচেৎ ৫।৭ দিনের মধ্যেই নিদারুণ দুর্ব্বল এবং অসুস্থ হইয়া পড়িবেন।" এই সব কথা শুনিয়া আমরা কথঞ্চিৎ ভীত হইলাম। সারেঙ্গ সাহেবকে বলিয়া একটা ছোট চুল্লী নির্ম্মাণ করানো হইল। ছোট উনান প্রস্তুত হইলে আমরা দুই বেলাই রান্না করিতে লাগিলাম। কিন্তু রাজসিক খাদ্য আর কোথায়! আলুর তরকারী আর ভাত—কোনদিন ডাল আলু সিদ্ধ—আর ভাত। কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আলু আর আমাদের ভাল লাগিতে লাগিল না। কিন্তু উপায় কি? ক্রমে সকলেই অল্প-বিস্তর দুর্ব্বল, কৃশ এবং অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিল। আমি তো কয়েকদিনের মধ্যেই একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলাম। চীফ-অফিসার, সেকেণ্ড-অফিসার নিজেরা আসিয়া আমাকে ঔষধপত্রাদি দিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগ দুই দিনেই অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। তাই ডাক্তার একটি ব্যবস্থাপত্র দিলেন কলম্বো হইতে ঔষধ খরিদ করিয়া লইবার জন্য। পথ্যাদিও আমাদের কিছুই নাই তাই উপবাস চলিতে লাগিল। জাহাজের ঝাঁকুনি এবং উপবাসের ফলে আমি উত্থানশক্তি রহিত হইলাম।

ক্রমশঃ

ভারত রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা—

ভারত রাষ্ট্রে লোক গণনার প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের (অবশ্য কাশ্মীর ও জম্ বর্জ্জন করিয়া) লোকসংখ্যা—৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৬ শত ২৪ জন; পুরুষ ১৮ কোটি ৩৪ লক্ষ স্ত্রীলোক ১৭ কোটি ৩৫ লক্ষ। ইহার পূর্ব্বে দুই বার লোক গণনায় ত্রুটির কারণ ছিল—প্রথম বার কংগ্রেস অসহযোগ নীতি অনুসারে লোককে লোকগণনা-কার্য্যে সহযোগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বার যে সকল প্রদেশে মসলেম লীগের প্রাধান্য ছিল, সে সকলে অভিযোগ পাওয়া গিয়াছিল—মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার জন্য অসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন। অখণ্ড বাঙ্গালায় সে সম্বন্ধে সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের উক্তি স্মরণীয়।

এ বার লোকগণনা সম্বন্ধে গোপালস্বামী বলিয়াছেন, লোক গণনা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিল। দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গে—এমন কি কলিকাতায়ও আমরা সরকারী কর্ম্মচারী ও জনগণ কোন পক্ষেই এই সচেতনতার বিশেষ পরিচয় পাই নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই কার্ত্তিক তারিখের 'সুলভ সমাচার' হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যে রাত্রিতে (কলিকাতায়) সেনসাস্ লওয়া হইয়াছিল, বিভারলী সাহেব সে রাত্রিতে স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া সহরে বেড়াইয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'সে রাত্রিতে ৮টার সময় দ্বিপ্রহর রজনীর মতন সহর নিস্তব্ধ হইয়াছিল, রাজপথে প্রায় একটীও লোক দেখা যায় নাই, সকলেই আপন আপন বাটীতে আলো জ্বালিয়া ইনিউমারেটরের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গুজব উঠিয়াছিল যে, সহরের রাস্তায় আলোগুলি নিবান হইবে এবং যে কেহ রাস্তায় বাহির হইবে, তাহার মেয়াদ হইবে। যেরূপ যত্নের সহিত লোকেরা আপনাদিগের সংখ্যা লিখিয়া দিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয় এবারকার লোকসংখ্যায় ভুল নাই।"

এবার আমরা কলিকাতায় এইরূপ সচেতনতা লক্ষ্য করি নাই; অনেক বাড়ীতে গণনা হয় নাই, এমন অভিযোগও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতার লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার মাত্র হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু লোকগণনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই! কলিকাতায় জমী আর শূন্য নাই—একতল গৃহ দ্বিতল, দ্বিতল গৃহ ত্রিতল হইয়াছে; পথে জনস্রোতঃ "জলস্রোতঃ যথা বরষার কালে"—তথাপি যে কলিকাতার লোকসংখ্যা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যার তুলনায় ১৫ লক্ষ ও ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের লোকসংখ্যার তুলনায় মাত্র ৮ লক্ষ বাড়িয়াছে, তাহা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। আমরা বলিতে বাধ্য, পশ্চিমবঙ্গে গণনা সম্বন্ধে সরকারের বিশেষ সতর্কতাবলম্বনের কারণ ছিল। পশ্চিমবঙ্গ কেবল যে লোকসংখ্যানুপাতে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার পাইবে, তাহাই নহে; পরন্তু খাদ্যোপকরণের অভাব পূর্ণ করিবার ব্যাপারেও পশ্চিমবঙ্গ লোকসংখ্যানুসারে কেন্দ্রী সরকারের নিকট সাহায্য পাইবে। অথচ পশ্চিমবঙ্গকেই কেন্দ্রী সরকার আশু ধান্যের জমীতে পাট চাষ করিতে বাধ্য করিয়াছেন এবং পাট শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ অধিক নহে—পাটকল অধিকাংশই য়ুরোপীয়ের পরিচালনাধীন—বাঙ্গালীর পাটকলের সংখ্যা নগণ্য। আবার পাটকলে যে সকল শ্রমিক কাজ করে, তাহাদিগের শতকরা ১০ জনও বাঙ্গালী কি না, সন্দেহ। সে সতর্কতা যদি অবলম্বিত না হইয়া থাকে, তবে তাহা দুঃখের বিষয়।

ভারত রাষ্ট্রে লোকসংখ্যার হিসাব		বর্গমাইলে
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে	—	১০১২
পশ্চিমবঙ্গে	—	৮৪০
বিহারে	—	৫৭১
উত্তরপ্রদেশে	—	৫৬০
পঞ্জাবে	—	৩৪২
দাক্ষিণাত্যে ও মাদ্রাজে	—	৪৪৫
বোম্বাইএ	—	৩১০
মহীশূরে	—	৩১৩
হায়দ্রাবাদে	—	২২৭
উড়িষ্যায়	—	২২৪
মধ্যভারতে	—	১৭০
আসামে	—	১৬৪
ত্রিপুরায়	—	১৬২

নদীয়ায় ও কুচবিহারে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে সহরগুলির লোকসংখ্যা—

সহর	মোট	উদ্বাস্তু আগত
কলিকাতা	—২৫,৪৮,৭৯০	৪,৩০,২৯০
হাওড়া	— ৪,৪৩,২৭০	৩৬,৩২১
টালিগঞ্জ	— ১,৫০,৫২৭	৬৫,১০৮
শ্রীরামপুর	— ৭৩,৫৫০	৯,৬৬৭
নৈহাটী	— ৫৫,১৮০	৮,৮৯৪
বারাকপুর	— ১৩,৯২১	৪,২৩৩
দমদম	— ১১,৬৮৩	৪,১৮৭

পশ্চিমবঙ্গে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অল্প। ইহা যে কোন দেশের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে ভয়ের কারণ।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট হইতে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বহুলোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে। যাহারা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চের পরে আপনাদিগকে "উদ্বাস্তু" বলিয়া জানাইয়াছে, তাহারা পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যার শতকরা ৮ জনেরও অধিক। ইহাদিগের মোট সংখ্যা—২১,১৭,৮৯৬—

পুরুষ	—	১১,২৮,৬৫০
স্ত্রীলোক	—	৯,৮৯,২৪৬

আগত উদ্বাস্তুদিগের সংখ্যা বর্গমাইল হিসাবে কলিকাতায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বাঁকুড়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। নদীয়ায় বহু উদ্বাস্তু আসিয়াছে।

কলিকাতায় প্রতি হাজার পুরুষে ৫ শত ২১ জন স্ত্রীলোক আছে।

পশ্চিমবঙ্গে শহরের সংখ্যা ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ৯৯ ছিল—এবার ১১১ হইয়াছে। পূর্ব্বের তুলনায় সহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু হিন্দুর আগমনে যে পশ্চিমবঙ্গে সহরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোন কোন স্থানে শহর রচনার উদ্যোগও করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, কলিকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে যে বহু পুরাতন সহর ম্যালেরিয়ার উপদ্রবে, জলের অভাবে, শিক্ষাকেন্দ্রের স্বল্পতায়, কলিকাতার আকর্ষণে শ্রীহীন হইয়াছে, সে সকলে উদ্বাস্তু বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া সেগুলি জনবহুল ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন করার চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গ সরকার করেন নাই। তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। কলিকাতার নিকটে বারুইপুরে বাসব্যবস্থা না করিয়া ফুলিয়ায় সহর রচনার কারণ কি। হালিসহরে লোক বসতির ব্যবস্থা না করিয়া "কল্যাণী" সহর রচনার জন্য বহুলোকের বাস্তু গ্রহণ—এমন কি ঘোষপাড়ার ধর্ম্মস্থানের জমীও অধিকার করার কি কারণ থাকিতে পারে? তাহাতে যে ব্যয় হয়, তাহা কি অপব্যয় বলা যায় না?

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার বিস্তার কিরূপ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই জানিবার কথা। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিশূন্য শ্রমিকের সংখ্যা কত—কলকারখানায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কত—গত দশ বৎসরে কত লোক ভূমিশূন্য হইয়াছে —এ সকল বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান না হওয়া আমরা অসঙ্গত বলিয়াই বিবেচনা করি।

লোকগণনার শেষ হিসাব ও রিপোর্ট কত দিনে প্রকাশিত হইবে?

শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন—

ভারত সরকার যে শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহা দুঃখের বিষয়। এ বিষয়ে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার-সমূহের মত গ্রহণ করিলেও দেশের জনগণ যে মতামত প্রকাশের অবসর পাইবে না, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নহে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে যে দেশের লোকের প্রাথমিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবে, তাহাই সর্ব্বাধিক ভয়াবহ। ভারত সরকার বলেন, কতকগুলি মামলায় শাসন-পদ্ধতির কোন কোন ধারার যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা শাসন-পদ্ধতি-রচয়িতাদিগের অভিপ্রেত কিনা বলা যায় না। তবে সে ব্যাখ্যা যে স্বৈরশাসনবিলাসী সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মনোমত নহে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, সে সকল ব্যাখ্যায় লোকের প্রাথমিক অধিকারই রক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের শাসন-পদ্ধতি পরীক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবীরা বহু বিবেচনায় যে শাসন পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ বিচার-বিবেচনা না করিয়া পরিবর্ত্তন করা কেবল যে রচনাকারীদিগের অপমানজনক তাহাই নহে, পরন্তু সরকারেরও সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণকর। বিশেষ পরিবর্ত্তন করার অধিকারী কাহারা? বর্ত্তমান পার্লামেণ্টের সদস্যগণ অধিকারী নহেন। তাহার কারণ, তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারত রাষ্ট্রের প্রকৃতিপুঞ্জের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি নহেন—ইংরেজের আমলের নির্ব্বাচিত সদস্য। বহু বিতর্কের পরে স্থির হয়—শাসন-পদ্ধতিতে প্রাথমিক অধিকার বিধিবদ্ধ হইবে। তাহাতে প্রাথমিক অধিকার সঙ্কুচিত ব্যতীত বিস্তৃত করা হয় নাই। শাসন-পদ্ধতিকে যদি দলগত অভিপ্রায় সিদ্ধির বা সুবিধার উপায় বলিয়া বিবেচনা করা হয়, তবে সে শাসন পদ্ধতির প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে না এবং যে শাসন পদ্ধতি লোকের শ্রদ্ধাভাজন না হয়, তাহার সার্থকতা থাকিতে পারে না। বিশেষ শাসন-পদ্ধতি যদি এক দল ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের পতনের পরে যে দল ক্ষমতালাভ করিবেন, সে দল আবার পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। তাহা হইলে শাসন-পদ্ধতির স্থায়িত্ব থাকে না। শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা যে সঙ্গত নহে, এমন কথা কেহ বলে না; কিন্তু বিনাপ্রয়োজনে তাহা করা অবিমৃষ্যকারিতার পরিচায়ক ও নিন্দনীয়। বর্ত্তমান সরকার যদি সুপ্রিম কোর্টের শাসন-পদ্ধতির ব্যাখ্যা না মানিয়া আপনাদিগের ইচ্ছা বা সুবিধামত কাজ করেন, তবে তাঁহারা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবেন না। অকারণ ব্যস্ততা সহকারে শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সঙ্গত নহে।

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু অসহিষ্ণুতা সহকারে বলিয়াছেন, যাঁহারা শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করেন—তাঁহাদিগের তাহা পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার আছে। কিন্তু যাঁহারা বহু বিবেচনার পরে যে শাসন-পদ্ধতি গ্রহণ করেন, বৎসর অতীত না হইতেই তাহার পরিবর্ত্তন করেন এবং সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, দেশের লোক তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারে না। পরিবর্ত্তন প্রয়োজন কি না, তাহা নূতন শাসন-পদ্ধতি অনুসারে নির্ব্বাচিত পার্লামেণ্টের

সদস্যরা স্থির করিবেন, মনে করাই স্বাভাবিক। অবশ্য নেহরু সরকার সে নির্ব্বাচনের দিন কেবলই পিছাইয়া দিয়াছেন এবং সে বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিশ্রুতিও অনায়াসে ভঙ্গ করা হইয়াছে। যেরূপ ব্যস্ততা-সহকারে—লোকমত প্রকাশের অপেক্ষা না রাখিয়া নেহরু সরকার দেশের শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাতে কি বুঝিতে হইবে—আপনারা ক্ষমতাপরিচালন জন্য—নির্ব্বাচন আরও পরে করিবার অভিপ্রায় ঘোষণা করিতেছেন?

দেশের লোকের মনে সেরূপ সন্দেহের স্থান হওয়া অসম্ভব নহে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে হিন্দু—

ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকার পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসিতে নিষেধ করিতেছেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দুর পক্ষে বাসস্থান হিসাবে নিরাপদ কি না, তাহা কি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন?

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে নরসিংদি থানার এলাকাস্থিত পাঁচদোল গ্রামে পরলোকগত ডক্টর নিবারণচন্দ্র ঘোষের তরুণী কন্যা গৃহের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে জল আনিতে যাইলে এক মুসলমান গুণ্ডা তাহাকে তাহার স্বর্ণালঙ্কারগুলি দিতে বলে। তরুণী অস্বীকার করিয়া চীৎকার করিলে লোকটি তাহার প্রকোষ্ঠে চুড়ী ও মাংসের মধ্যে অস্ত্র প্রবিষ্ট করাইলে সে ভয়ে চীৎকার করিলে লোক আসিয়া পড়ায় লোকটি পলায়ন করে। তরুণীর হস্তে ক্ষত হয়। তরুণী নববিবাহিতা—কলিকাতা হইতে—দিল্লী চুক্তিতে পূর্ব্ববঙ্গ নিরাপদ মনে করিয়া—পিত্রালয়ে আসিয়াছিল। ঘটনার পরে "চিরদিনের জন্য" পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

অল্পদিন পূর্ব্বে জলপাইগুড়ী সীমান্তে পাকিস্তানিরা পশ্চিমবঙ্গের অধিকৃত পথ অধিকার করে; রাজগঞ্জ থানার এলাকায় সর্দ্দারপাড়া গ্রামের রাস্তায় আসিয়া দুইটি বড় গাছ কাটিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কতকটা স্থান অবৈধরূপে অধিকার করে। সে বিষয় লইয়া যখন উভয় সরকারে আলোচনা চলিতেছিল তখন পাকিস্তানী সৈনিকরা আলোচনার সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে কতকটা স্থান অধিকার করে। ঐ স্থান আবার ভারত রাষ্ট্র কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

গত ১৯শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে সরকার পক্ষ হইতে একটি প্রশ্নের উত্তর বলা হয়, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে হিন্দুর অবস্থার যে বিবরণ প্রকাশ করা হয়, তাহা ভয়াবহ। প্রকাশ—

(১) এক হাজার ৭ শত ৪৫ জন লোক নিহত হয়।

(২) দুই শত ৯১ জন স্ত্রীলোক অপহৃত হয়।

(৩) দুই শত ৯৯ জন স্ত্রীলোকের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

নিহত ব্যক্তিদিগের স্বজনগণ বা প্রতিবেশীরা যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহাতে নির্ভর করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। পাকিস্তান সরকার অনেক অভিযোগ অস্বীকার করিলেও সব অস্বীকার করিতে পারেন নাই এবং অনেক ঘটনা—তদন্তাধীন বলিয়া এড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দিল্লী হইতে প্রকাশিত সংবাদ—১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল হইতে গত ৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগত হিন্দুর সংখ্যা ৩৫ লক্ষ ২২ হাজার ৯ শত ৬৭ জন। ইহাদিগের মধ্যে হয়ত সকলেই পশ্চিম বঙ্গে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য আসে নাই; কিন্তু তাহা না হইলেও যাহারা পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের সংখ্যা অল্প নহে। আর পশ্চিমবঙ্গে সরকার তাহাদিগের বসবাসের সুব্যবস্থা না করায় যে কেহ কেহ, অনন্যোপায় হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাও বলা বাহুল্য। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে ধর্ম্মান্তরগ্রহণও করিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

'বরিশাল হিতৈষী' সম্পাদক—শ্রীদুর্গামোহন সেন মহাশয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী লাঞ্ছনার পরে যে হিন্দুরা পাকিস্তানে আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছেন না, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

এই সকল বিবেচনা করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ও কেন্দ্রী সরকারের উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে লোকমতের সহিত কোনরূপ যোগ না রাখাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অজস্র কিন্তু নিবার্য্য ত্রুটির কারণ, তাহা আমরা অবশ্যই বলিব।

খাদ্য-সমস্যা—

ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকার খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে পারিতেছেন না। অথচ খাদ্য-সমস্যার সমাধান না হইলে সবই বৃথা। বিচার বিবেচনার অপেক্ষা না রাখিয়া—১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পরে আর ভারত-রাষ্ট্র বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করিবে না, ঘোষণা করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আপনাকে অপদস্থ, ভারত সরকারকে ক্ষুণ্ণসম্ভ্রম ও দেশবাসীকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও লজ্জানুভব করেন নাই। তিনি যে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা দেশের লোক অপুষ্টাহারের কষ্টে অনুভব করিতেছে। পার্লামেন্টে খাদ্য মন্ত্রী এক বিস্তৃত বিবৃতি দিয়া "অধিক খাদ্য উৎপাদন কর" আন্দোলনের কার্য্যকাল (আপাততঃ) ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবার দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমান বৎসরের পরিকল্পনানুসারে ১৪ লক্ষ টন অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হইতে—তাহা হইলে ৯ লক্ষ টনের অভাব থাকিবে এবং সে অভাবের কারণ—কতক জমীতে পাটের ও তুলার চাষ করিতে হইবে।

ভারত সরকারের হিসাব কিরূপ ভ্রমাত্মক তাহার পরিচয় আমরা দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণের এ সিঁদরীর সারের কারখানার ব্যয়-বৃদ্ধিতে দেখিয়াছি। সুতরাং আমরা যদি শ্রীমুন্সীর বিবৃতির মুন্সীয়ানায় আস্থাবান হইতে না পারি, তবে, আশা করি, তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

পার্লামেন্টে কংগ্রেস পক্ষীয় কালা বেঙ্কট রাও বলিয়াছিলেন, বৎসরের পর বৎসর যে বিদেশ হইতে আমদানী খাদ্যোপকরণের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে হইতেছে, তাহাতে লোকের আতঙ্কের উদ্ভব অনিবার্য্য।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, গত ৩ বৎসরে কেন্দ্রী ও

প্রাদেশিক সরকারসমূহ "খাদ্যোপকরণ বৃদ্ধি" আন্দোলনে মোট প্রায় ৬০ কোটি টাকা (অর্থাৎ বৎসরে ২০ কোটি টাকা) ব্যয় করিয়াছেন। ফল কিন্তু পর্ব্বতের মূষিক প্রসবের মতই হইয়াছে—বলা হইয়াছে, ৩০ লক্ষ টন উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে ; কিন্তু সরকারের শস্যসংগ্রহের হিসাবে তাহাও দেখা যায় না। ভূমিতে উৎপাদনও হ্রাস পাইতেছে। এদিকে আবার সরকার যে স্থানে ৩ লক্ষ গাঁট তুলা ও ১২ লক্ষ গাঁট পাট উৎপাদন করিবেন বলিয়াছিলেন, সে স্থলে ৭ লক্ষ গাঁট তুলা ও ২ লক্ষ গাঁট পাট উৎপাদনের আশা করেন।

এইরূপ হিসাব যে—যে কোন সরকারের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অযোগ্যতার পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য। সেইজন্য অনেকে মনে করেন, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলের পরিবর্ত্তন ব্যতীত অবস্থার প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে না—হইতে পারে না। সরকারের সর্ব্বপ্রধান দোষ—লোকের সহিত সংযোগ-শূন্যতা। দেখা যাইতেছে, জামাদার ব্যাপারের পরে খাদ্যমন্ত্রী স্বয়ং চাউল কিনিবার জন্য ব্রহ্মে যাইতেছেন।

পার্লামেণ্টে একাধিক সদস্য "অধিক খাদ্য উৎপাদন" নীতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ডক্টর মনোমোহন দাস সে বিষয়ে একটি প্রস্তাবও উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

এই উৎপাদন বৃদ্ধি কার্য্যে সরকারের নানা ত্রুটি প্রকাশ পাইয়াছে ; কিন্তু সে সকলের সংশোধন হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গে এখনও যে বহু জমী "পতিত" আছে, তাহা আমরা বার বার বলিয়াছি, কিন্তু সরকার সে বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ দিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। সেচের ও জলনিকাশের ব্যবস্থা আশানুরূপ হইতেছে না, কাজেই বক্তৃতা যত ফলিতেছে—ফশল তত ফলিতেছে না।

কলিকাতার উপকণ্ঠে গড়িয়ার পরেই রেলপথের দুই পার্শ্বে জমী জলে ডুবিয়া যায়, অথচ জলনিকাশের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য নহে। নিকটেই "বুড়ের জলা" সম্বন্ধে সেই কথাই বলিতে হয়।

অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতার উপকণ্ঠে বহু সচিব সমবেত হইয়া কয় জন চাষীকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। তাহাতে যে প্রচার-কার্য্য হয়, তাহা যে নিষ্ফল এমন আমরা মনে করি না। কারণ, তাহাতে অন্য লোক অনুকরণ করিতে প্রচেষ্ট হয়। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। যে অঞ্চলে ভূমি ও জলবায়ু কোন বিশেষ ফশলের উপযোগী, সে অঞ্চলে যে সব ফশলের উৎপাদন-বৃদ্ধি সহজসাধ্য—অন্যত্র সেই সকল ফশলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মনোযোগ দান অধিক প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে, মুর্শিদাবাদ জিলায় আজিমগঞ্জের বেণীপুর গ্রামের তারাপদ মাত্র এক বিঘায় ২১ মণ ১৩ সের গোলআলু উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন এবং জঙ্গীপুর মহকুমায় বল্লালপুর গ্রামে গোপীনাথ দাস এক বিঘা ৩ ছটাক জমীতে প্রচুর গোলআলু উৎপন্ন করিয়াছিলেন। কিরূপ জমীতে, কি সার দিয়া ও কিরূপ বীজ ব্যবহার করিয়া—কয় বার সেচ দিয়া তাঁহারা এইরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিয়া সেই সব সংবাদ স্থানীয় ও অন্যান্য স্থানের কৃষকদিগকে জানাইয়া দেওয়া ও তাহাদিগকে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করা সরকারের কর্ত্তব্য। তাহাও কৃষি বিভাগের কাজ।

পুরস্কার দানের সময় কি সরকারী কর্ম্মচারীরা মনে রাখেন যে, সর্ব্বত্র জমীর মাপ একরূপ নহে ; সুতরাং এক অঞ্চলের বিঘায় যে পরিমাণ জমী থাকে, অন্য অঞ্চলে তাহা থাকে না।

পশ্চিমবঙ্গের সচিবরা বার বার বলিয়াছেন, প্রতি বিঘায় যদি ধান্যের ফলন এক মণ অধিক হয়, তাহা হইলেই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব ঘুচিয়া যায়। সময় সময় স্থানে স্থানে ধান্যের ফশলের বিস্ময়করূপ বৃদ্ধি বিঘোষিত হইলেও মোটের উপর বিঘায় একমণ ফলন-বৃদ্ধি গত তিন বৎসরে কেন হইল না, তাহা কি সচিবরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন?

সরকারের অনুসৃত নীতিতে সময় সময় অধিক উৎপাদনের পথে যে বাধা হয়, তাহাও এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। বিহার সময় সময় পশ্চিম-বঙ্গে মৎস্য ও শাকসব্জী রপ্তানী বন্ধ করে, কিন্তু সে নীতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে, জানিতে না পারিলে পশ্চিম বঙ্গের কৃষকগণ শাকসব্জীর চাষে অধিক সময় ও অর্থ নিয়োগ করিতে সাহসী হয় না। পাকিস্তান হইতে ধনিয়া প্রভৃতি আমদানী হইবে না জানিলে পশ্চিম বঙ্গের কৃষকগণ সে সকলের ব্যাপক চাষে প্রবৃত্ত হইতে পারে—নহিলে নহে।

আমেরিকায় স্থানে স্থানে রোগ প্রতিরোধক কপি প্রভৃতি হয়—সরকার আমেরিকা "ডলার" মুদ্রার দেশ বলিয়া তথা হইতে যে বীজ আমদানীর পথ বিঘ্নবহুল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও অসঙ্গত।

আমরা শুনিয়াছি, কোন বাঙ্গালী কৃষিবিজ্ঞানী—

(১) বীট ও পালম শাকের সংমিশ্রণে একপ্রকার বৃহৎ পালম উৎপন্ন করিয়াছেন এবং

(২) ঢেঁড়শ "শ্বেত রোগ"-শূন্য করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়া গুণগ্রাহিতার ও তাঁহার উৎপাদিত বীজ প্রাপ্তির উপায় করিয়া লোকের উপকার সাধন করিবেন?

আমাদিগের বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গে এবং সমগ্র ভারত রাষ্ট্রে কৃষিজ ফশলের ফলনবৃদ্ধি সহজসাধ্য। সেজন্য আবশ্যক উপায় ও আয়োজনই প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে য়ুরোপীয় মরশুমী সব্জীর বীজ কোয়েটায় ও কাশ্মীরে সহজে উৎপন্ন করা যায়। কোয়েটা পাকিস্থানে—কাশ্মীরের ভাগ্য এখনও অনিশ্চিত। যদি পররাষ্ট্র হইতে বীজ আনয়ন অবশ্যম্ভাবী হয়, তবে য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বীজ আনার পথ সুগম করাই কি কর্ত্তব্য নহে?

খাদ্যশস্য না হইলেও পাটের চাষে ভারত সরকারের মনোযোগ অধিক। সেইজন্য আমরা আশা করি, যাহাতে পশ্চিমবঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট পাটের বীজ পাকিস্তানে না যায়, সে ব্যবস্থা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—

ভারত রাষ্ট্রের একাধিক প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। বিহারে সরকার যত দিন পারিয়াছেন, অন্নাভাবে লোকের মৃত্যুর সংবাদ অস্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু আর সত্য গোপন করা সম্ভব নহে। প্রদেশপালের

গৃহের সম্মুখে লোক অন্নাভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছে। মাদ্রাজে অনাবৃষ্টি হেতু দীর্ঘ ৫ বৎসর অন্নকষ্ট প্রকট রহিয়াছে এবং সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে লোক গুল্মের শিকড়ও খাইতেছে—সে শিকড় সাধারণতঃ দড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে অন্নাভাব স্থায়ী হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যুক্তপ্রদেশের কোন কোন স্থান হইতেও অন্নাভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

জওহরলাল নেহরু গত বৎসর আর বিদেশ হইতে খাদ্যোপকরণ আমদানী করা হইবে না বলায় ব্রহ্ম তাহার উদ্বৃত্ত চাউল অন্যত্র বিক্রয় করায় এ বার আমাদিগকে শতকরা ২০।২৫ টাকা অধিক দিয়া খাদ্যোপকরণ আমদানী করিতে হইতেছে। আমদানীর হিসাব—

১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে ২৩ লক্ষ টন—মূল্য ৯৪ কোটি টাকা

১৯৪৮-৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৮ লক্ষ টন—মূল্য ১৩০ কোটি টাকা

১৯৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে—২৭ লক্ষ টন—মূল্য ১৪৪ কোটি টাকা

১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে—২১ লক্ষ টন—মূল্য ৮০ কোটি টাকা

১৯৫১-৫২ খৃষ্টাব্দে (অনুমান)—৪০ লক্ষ টন—মূল্য ১৬০ কোটি টাকা। (ইহার সহিত আমেরিকার নিকট প্রার্থিত ২০ লক্ষ টন যোগ দিতে হইবে)।

আমেরিকা কিন্তু রাজনীতিক সুবিধা লাভ করিবার সর্ত্তে যাহাকে দর-কশা বলে তাহাই করিতেছে। তবে আমেরিকার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ আপনাদিগের অর্থে গম ক্রয় করিয়া যেমন ভারতের নিরন্নদিগের জন্য দিতেছে, তেমনই কোন কোন কৃষকও গম দিতেছেন। কিন্তু আমেরিকার সরকার—ভারত রাষ্ট্র অ্যাংলো-আমেরিকান দলভুক্ত হইলেও—নানা আপত্তি উত্থাপিত করিয়া ভারত রাষ্ট্রের বিপদের সময় তাহাকে সাহায্য দানে বিলম্ব করিতেছেন।

আজ মনে পড়িতেছে—১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারতে দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া ইংলণ্ড ৮৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা পাঠাইয়াছিল। অবশ্য ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত। কিন্তু জার্ম্মানীর কৈশর ওয়া মে টেলিগ্রাফ করেন—

"Full of the deepest sympathy for the terrible distress in India, Berlin has, with my approval, released a sum of over half a million of marks. I have ordered it to be forwarded to Calcutta. * * *"

আমেরিকা যে সেরূপ কাজও করিতে পারিতেছে না, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

চীন পাটের বিনিময়ে চাউল ও রুশিয়া পাটের বিনিময়ে গম দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অবশ্য ভারত সরকার পাকিস্তানের সহিত যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে পাটের মূল্য অল্প হইবে না। আর সে ব্যবস্থা যাঁহারা ভয় দেখাইয়া করাইয়াছেন, সেই পাটকল-মালিকরা যে অযথা আতঙ্ক সঞ্চার করাইয়া কোটি কোটি টাকা ফাটকাবাজদিগকে উপার্জ্জনের অবকাশ দিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

কতদিনে যে ভারত সরকার রাষ্ট্রকে খাদ্যবিষয়ে স্বাবলম্বী করিতে পারিবেন, তাহা বলা যায় না। কারণ,

(১) তাঁহারা নদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ৭টি পরিকল্পনা করিয়াছেন, সে সকলের আনুমানিক ব্যয় ৩০০ কোটি টাকা হইলেও তাহার দ্বারা ১৫ বৎসরে ১০ লক্ষ টন খাদ্য শস্য বৃদ্ধি হইবে ;—

(২) পতিত জমীতে চাষের দ্বারা ১০ বৎসরে ১০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু ভারতের প্রয়োজন-তুলনায় তাহা যৎসামান্য এবং ১০ বৎসরে দেশের লোকসংখ্যাও বর্দ্ধিত হইবে।

আবার সরকারী হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত যে জমী "পতিত" হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১০০ লক্ষ একর! সেচের সুবিধার অভাব, শ্রমিকের অভাব প্রভৃতি কারণে ইহা হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতীকারে যত বিলম্ব হইবে, ততই দেশের অনিষ্ট ঘটিবে।

অন্নাভাবে কুচবিহারে জনতা শোভাযাত্রা করিলে তাহাদিগের উপর গুলি চালনা করা হইয়াছে। এই ব্যাপার যে কিরূপ নিষ্ঠুর, তাহা বলা বাহুল্য। অথচ পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক বিবৃতি দিয়াছেন, গুলি চালাইবার কোনই কারণ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিন্তু সে বিষয়ে শাসন বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে রাজা গোপালাচারী বিচার বিভাগীয় তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইহাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে যত অপমানিতই কেন করা হউক না, লোকমতের মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। কুচবিহারের জনগণ শাসন বিভাগীয় তদন্ত বর্জ্জন করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলিকাতায় বিডন বাগানে পুলিসের লাঠিতে আহত ব্যক্তিরা যখন সরকারের শাসন বিভাগীয় তদন্ত বর্জ্জন করিয়াছিল, তখন গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদে বলিয়াছিলেন—ইহাতেই বাঙ্গালার পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায়—

"The refusal of the sufferers in the recent disturbances to appear before Mr. Weston to give evidence is a significant illustration of the change that is coming over Bengal."

কুচবিহারের অধিবাসীরা গণমতে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারা কি মনে করিতেছেন? যাহারা গুলি চালনার জন্য দায়ী—হত্যার জন্য দায়ী—সেই সকল সরকারী কর্ম্মচারীকে স্ব স্ব পদে রাখিয়া তদন্ত যে উপহাস বা ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে?

কুচবিহারে হত্যাকাণ্ডের পরেও পশ্চিমবঙ্গের কোন সচিব তথায় গমন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই!

সমগ্র প্রদেশে এই হত্যাব্যাপারে যে বিক্ষোভের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার ফল কি হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ভারত সরকার যদি খাদ্যোপকরণ সম্বন্ধে দেশকে সত্য সত্যই স্বাবলম্বী করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিয়া যাহাতে প্রতি বিঘায় অধিক শস্য উৎপন্ন হয় তাহাই করিতে হইবে। তাঁহারা কি জানেন না—

(১) ভারতে প্রতি একর জমীতে মোট উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ

১০৭৪ পাউণ্ড ; আর ইটালীতে ৩৭১৪ পাউণ্ড ; (২) ভারতে প্রতি একর জমীতে মোট উৎপন্ন গমের পরিমাণ ৫২৭ পাউণ্ড ; আর ইটালীতে ৯৮২ পাউণ্ড।

রুশিয়া যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে ভারতে কেবল খাদ্যশস্যের সম্বন্ধেই নহে, পরন্তু অন্যান্য কৃষিজ পণ্য সম্বন্ধেও সেই সকল উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কারণ—ভারতে (১) তুলার প্রয়োজন ৪০ লক্ষ গাঁট, আর তুলা উৎপন্ন হয় ২৯ লক্ষ গাঁট—ঘাটতী ১১ লক্ষ গাঁট। অথচ ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে উৎপাদন ৬ লক্ষ গাঁট বাড়িবে বলা হইলেও বৃদ্ধি মাত্র ৩ লক্ষ টন।

(২) পাটের প্রয়োজন ৭২ লক্ষ গাঁট, আর পাট উৎপন্ন হয়—৩৮ লক্ষ গাঁট। ১৯৫০-৫১ খৃষ্টাব্দে উৎপাদন ১২ লক্ষ গাঁট বাড়িবে আশা করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মোট বৃদ্ধি ২ লক্ষ গাঁট মাত্র হইয়াছে!

অথচ ভারতে তুলার ও পাটের উৎপাদন বৃদ্ধিও প্রয়োজন।

অন্নাভাবে দেশের লোক দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। সেই জন্যই দেশের অন্নাভাব দূর করিবার যে উপায় রুশিয়ায়, ইটালীতে ও চীনে সফল হইয়াছে, ভারত রাষ্ট্রে সেই উপায় অবিলম্বে অবলম্বন করা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য।

বোলপুর ও পণ্ডিচেরী—

মনীষী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার আদর্শানুসারে বোলপুরে যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অসাধারণ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে গঠিত করিয়াছিলেন, সেই "বিশ্বভারতী" আজ সমগ্র সভ্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সরকারের কর্তৃত্বাধীন করেন নাই। এ বার ভারত সরকারকে তাহার কর্তৃত্বাধিকার প্রদান করা হইতেছে। যদিও সরকারের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের আদর্শেই "বিশ্বভারতী" বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত করিবেন, তথাপি সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির বিষয় বিবেচনা করিলে আশঙ্কা করিবার কারণ থাকে যে, "বিশ্বভারতী" তাহার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার এক শিক্ষানুষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—বালকদিগকে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি বোলপুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন ভারতের আরণ্য বিদ্যালয়ে তিনি তাহার আদর্শ পাইয়াছিলেন—তাহাতে জীবনে ঈশ্বরানুভূতিই যে সকল শিক্ষকের কাম্য, তাঁহারা বাস করিবেন। সে বিদ্যালয়ে মন্দিরের ও গৃহের সমন্বয় সাধিত হয়।

ভারত সরকার কিন্তু আপনাদিগকে "ধর্ম্মনিরপেক্ষ" বলিয়া গর্ব্বানুভব করেন। সে অবস্থায় ভারত সরকারের কবির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রতিশ্রুতির মূল্য কি, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকা অসম্ভব নহে।

যে সময় রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" সরকারের কর্তৃত্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইতেছে, সেই সময় পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের কল্পনাকে মূর্ত্তি দান করিয়া একটি আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য গত ২৪শে ও ২৫শে এপ্রিল পণ্ডিচেরীতে এক সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাহাতে সভাপতি ছিলেন। সেই সম্মিলন উপলক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকায় দেখা যায়—আন্তর্জ্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানজন্য আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, মিশর, আফ্রিকা, জাপান প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রগণ ও শিক্ষকগণ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের অভিপ্রায়ানুসারে এই শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রগণ বিনা ব্যয়ে শিক্ষা লাভ করিবে। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে বালকবালিকারা শিক্ষা পাইবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা হইতে উপাধি পরীক্ষা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা ইহাতে থাকিবে। ছাত্রগণ স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পাইবে এবং এক এক দেশের শিক্ষার্থী এক এক আবাসে বাস করিয়া সামাজিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীদিগের সহিত মিলিত হইবার সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে।

এই প্রস্তাবিত শিক্ষাকেন্দ্রে পুস্তকাগার ও সম্মিলন গৃহে এক সঙ্গে ২ হাজার হইতে ২ হাজার ৫ শত লোক বসিতে পারিবে এবং মুক্ত আকাশের নিম্নে শম্পাচ্ছাদিত ভূমিতে শিক্ষকগণের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাও থাকিবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থাও সেই শিক্ষাকেন্দ্রে এঞ্জিনিয়ারিং, দর্শন, ন্যায়, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, অঙ্কশাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দানের সঙ্গে থাকিবে।

বর্ত্তমানে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ব্যায়ামশালা ও গোশালা হইতে ঢালাই কারখানা, গৃহ নির্ম্মাণের উপকরণ নির্ম্মাণের কারখানা, লৌহ ঢালাই করিবার ও যন্ত্রাদি নির্ম্মাণের কারখানা, বয়ন বিভাগ, জুতার কারখানা প্রভৃতি আছে। সে সকলের দ্বারা কারীগরী শিক্ষা হইতে পারিবে।

সমুদ্রতীরে অবস্থিত পণ্ডিচেরী স্বাস্থ্যকর স্থান। তথায় বর্ত্তমানেও আশ্রমে শরীর চর্চ্চার সুব্যবস্থা আছে।

পরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ নানা দেশ হইতে ইতোমধ্যেই অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। কয়জন খ্যাতনামা বিদেশী অধ্যাপক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া শিক্ষা দানের অভিপ্রায় জানাইয়াছেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে মত ছিল, তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী বালকবালিকাকে তাহার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দানের ব্যবস্থা না করিলে কখন ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না—শিক্ষা যখন যন্ত্রবদ্ধ হয়, তখনই তাহা বাঞ্ছিত ফলদানে অক্ষম হয়। তিনি স্বয়ং শিক্ষক ছিলেন এবং পণ্ডিচেরীতে আশ্রম-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে তাঁহার মতানুযায়ী শিক্ষাদানের ফল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা হইয়াছে এবং সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে মতে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদেশে শিক্ষা যন্ত্রবদ্ধ ও সরকারের কর্তৃত্বাধীন হওয়ায় ইহা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। বিশেষ বিদেশী আদর্শই ইহাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক উপলব্ধি-জনিত শিক্ষাও এই শিক্ষাকেন্দ্রে প্রদত্ত হইবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিরূপ ফল লাভ হয়, তাহা দেখিবার বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা শ্রীঅরবিন্দের স্মৃতি রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া সুধীসমাজে বিবেচিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতীর" পরিণতি কি হইবে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই। বিহারে মাসাঞ্জোরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সম্বর্দ্ধনায় বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদিগের নৃত্য গান অনেকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। কারণ, তাহাও বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিকেন্দ্র ও আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষাগার হিসাবে ভারতের গৌরব।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি রক্ষা সমিতির কৃত কর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদের জন্য স্বতঃই আগ্রহ হয়। সমিতির চেষ্টায় বা রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারীর আগ্রহে কবির পৈত্রিক বাসভবন ও সম্পত্তি এখনও সমিতির হস্তগত হয় নাই; কেবল ঠাকুর বংশের পূর্ব্বপুরুষের যে গৃহ গগনেন্দ্র নাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের অংশে ছিল ও পরে হস্তান্তরিত হয়, তাহাই ভূমিসাৎ করিয়া (অর্থাৎ রক্ষিত না হইয়া) তথায় নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইতেছে। আমরা আশা করি, সমিতির কার্য্য-বিবরণ জনসাধারণকে প্রদান করা হইবে।

কংগ্রেস—

কংগ্রেস ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। বর্ত্তমানে ইহা এক দিকে সরকারের সমর্থন, আর এক দিকে জনগণের স্বার্থ রক্ষা—দুই নৌকায় পদ রাখিবার চেষ্টায় বিপন্ন হইয়াছে। গান্ধীজী ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার পরে কংগ্রেসকে গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। সে পরামর্শ গৃহীত হয় নাই। কারণ, যাঁহারা কংগ্রেসী পরিচয়ে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহারা আপনাদিগের সুবিধার জন্য কংগ্রেসের নাম ও সংঘ ব্যবহার করিতে প্রয়াসী এবং সেইজন্য কংগ্রেসীরা "পারমিট" দান প্রভৃতি নানা কার্য্যের সুযোগ পাইয়া স্বার্থ সিদ্ধির সুবিধা পাইতে পারেন।

এই অবস্থা দেশবাসীর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সংপ্রতি কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কংগ্রেসের মধ্যে কোন স্বতন্ত্র দল থাকিতে পারিবে না এবং কংগ্রেসীরা কেহ কংগ্রেসের পক্ষে পরিচালিত সরকারের কার্য্যের নিন্দা প্রকাশ্যভাবে করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ কংগ্রেসকে কংগ্রেসী শাসকদলের তাঁবেদার হইয়া চলিতে হইবে! প্রত্যেক কংগ্রেসপন্থীর ইহাতে আপত্তি থাকা সঙ্গত। কংগ্রেসে—মূলনীতির সমর্থক ভিন্ন ভিন্ন দলের স্থান ছিল বলিয়াই কংগ্রেস শক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহাতে জমীদারদিগেরও স্থান ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে মেটা, গোখলে, ভূপেন্দ্রনাথ, মদনমোহন প্রভৃতিরই মত তিলক, অরবিন্দ, লজপত রায় প্রভৃতির স্থান ছিল। কংগ্রেসে অগ্রগামী দলকে বর্জ্জনের যে চেষ্টা সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গের কারণ হয়, তাহার ফলেই "ক্রীড়" রচনায় কংগ্রেসের নাভিশ্বাস উপস্থিত হয় এবং তাহার পরে আবার সম্মিলিত কংগ্রেসে সকল দলের স্থান হয়। গান্ধীজী কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই তাঁহার অসহযোগ প্রস্তাব কংগ্রেসকে গ্রহণ করাইয়াছিলেন, এবং চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের মধ্যে "স্বরাজ্য দল" গঠিত করিয়া কংগ্রেসের নীতির পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কলিকাতায়, নাগপুরে, গয়ায় ও দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণে তাহার পরিচয় প্রকট।

আজ যাঁহারা কংগ্রেসকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতেছেন, আমাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা কংগ্রেসের অনিষ্ট সাধনই করিতেছেন।

কংগ্রেসের সহিত সরকারের সম্বন্ধও সুনির্দ্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কুচবিহারে গুলি চালনার নিন্দা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রী সরকার কি সেই মত গ্রহণ করিবেন?

দেশে গঠন কার্য্যের অভাব নাই। কংগ্রেস যদি সেই সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তবে কংগ্রেসের নামে দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে না এবং কংগ্রেস তাহার স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান সংরক্ষণ করিয়া তাহার গৌরব-রক্ষা করিতে পারিবে—নহিলে নহে।

যেমন বহু নদীর সম্মিলনে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়াছে; সেইরূপ বহু প্রতিষ্ঠানের সম্মিলনে বা সহযোগে কংগ্রেস যে শক্তিশালী হইতে পারে, তাহা বলা বাহুল্য। সে পথ কেন কংগ্রেস গ্রহণ করিতেছে না?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে যাহাই কেন করুন না, ভারতরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কংগ্রেসে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকার স্বীকার করা সঙ্গত হইতে পারে না—তথায় তিনি কংগ্রেসের শাসনাধীন এবং কংগ্রেস অবশ্যই, কারণ আছে মনে করিলে, তাঁহার নীতির নিন্দা করিতে পারে।

দেখা যাইতেছে, মন্ত্রীদিগের মধ্যেও সরকারের নীতি সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিতেছে। ইহা যে মন্ত্রিমণ্ডলের দৌর্ব্বল্যদ্যোতক তাহা বলা বাহুল্য। তাহার পরে আবার কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা যে মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সামন্তরাজ্য ও জমীদার—

প্রধানতঃ সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেলের চেষ্টায় ভারতরাষ্ট্রের সামন্ত রাজ্যের শাসকগণ একে একে স্বস্ব রাজ্য রাষ্ট্রভুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন। শাসকগণ মাসহারা পাইতেছেন। কিন্তু মনে হয়, প্রভুত্বভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা আপনাদিগকে অসুখী মনে করিতেছেন এবং স্বদেশে ও বিদেশে অর্থের অপব্যয় করিয়াও সে অসুখ হইতে অব্যাহতিলাভ করিতে পারিতেছেন না। বরদার রাজা গায়কবাড় ভারত সরকারের দ্বারা বরদা রাজ্যের প্রজাদিগের উন্নতিকর ব্যবস্থা না হইয়া অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি রাষ্ট্রবিরোধিতা করিতেছেন, এই অপরাধে ভারত সরকার তাঁহাকে আর বরদার মহারাজা বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব গায়কবাড়ের পরলোকগত জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্রকে সেই পদ প্রদান করিয়াছেন। যদি সামন্ত রাজ্য বিলোপ করাই ভারত সরকারের অভিপ্রেত হয়, তবে কেন যে তাঁহারা বর্ত্তমান অধিকারীদিগের পরেও শূন্যগর্ভ রাজপদ রক্ষা

করিতেছেন, তাহা বলা যায় না। সে বিষয়ে লর্ড ডালহৌসীর নীতিই সরল ছিল, বলা যায়।

বরদার ব্যাপার লইয়া সামন্তরাজ্যসমূহের ভূতপূর্ব শাসকদিগের মধ্যে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। মনে হয়, ভারতের সামন্তনৃপতিরা মতের মর্য্যাদারক্ষা করিবার জন্য রাজ্যের শাসনভার ত্যাগ করেন নাই—স্বৈর ক্ষমতা বর্জন করেন নাই; সুবিধা হইবে বলিয়াই সে কাজ করিয়াছিলেন। নহিলে তাঁহারা আবার ক্ষমতালাভের চেষ্টা করিবেন কেন? তাঁহাদিগকে কোনরূপ পদ বা ক্ষমতা প্রদানেরই বা কি কারণ থাকিতে পারে? পদ ও ক্ষমতা যোগ্যতমের প্রাপ্য। যখনই সে নীতি ত্যক্ত হয়, তখনই সরকারের কার্য্যে শৈথিল্য-সঞ্চার অনিবার্য্য হয়।

ভারত রাষ্ট্রের জমীদাররা সরকারের জমীদারী উচ্ছেদ চেষ্টার বিরুদ্ধে ভারত সরকারের আদালতে মামলা করিয়া জয়ী হইয়াছেন এবং আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জমীদারী উচ্ছেদ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়া সে প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষমতা হেতু সরকারকে বিব্রত হইতে হইতেছে। সেইজন্য তাঁহারা ভারতের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ভারত রাষ্ট্রে যাহাই কেন হউক না, পাকিস্তান অবিলম্বে জমীদারী প্রথার বিলোপ সাধনের সঙ্কল্প করিয়াছে এবং তাহার জন্য আবশ্যক আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে অধিকাংশ বড় জমীদার হিন্দু এবং তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া জমীদারী পরিচালনার ভার সরকারের (অর্থাৎ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের) উপর অর্পণ করিয়াছেন। সে অবস্থায় মূল্য পাইলে যে তাঁহারা সহজেই জমীদারী ত্যাগ করিতে সম্মত হইবেন—মনে করিবেন, স্বস্তিই ভাল—তাহা স্বাভাবিক।

ভারত রাষ্ট্রে জমীদাররা কি ভাবে স্বাধিকার ত্যাগ করিতে সম্মত হইবেন, সে বিষয়ে সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। জমীদারী উচ্ছেদ সম্বন্ধে সরকারের প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষমতা সরকারের প্রতি প্রজাসাধারণের আস্থা শিথিল করিতেছে এবং খাদ্য-বস্ত্রের অভাব, কর বৃদ্ধি, দুর্নীতি ও চোরাবাজার—এই সকলের সহিত সেই অক্ষমতা সংযুক্ত হইয়া দেশে অসন্তোষ বৃদ্ধি করিতেছে।

জমীদাররা সমাজে যে স্থানই কেন অধিকার করিয়া থাকুন না, জমীদারী প্রথা বর্ত্তমান থাকায় যে ভূমিরাজস্ব স্থিতিস্থাপক হইতে পারিতেছে না, তাহা অবশ্যস্বীকার্য্য। এখন নূতন অবস্থায় কি ব্যবস্থা হইবে—অর্থাৎ কোন ব্যবস্থা অবস্থার উপযোগী—তাহাই বিবেচনার বিষয়।

উদ্বাস্তু-সমস্যা—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রী সরকার দেশ বিভাগের সময় অদূরদর্শিতা-হেতু পূর্ব্ব পাকিস্তানত্যাগী হিন্দুদিগের পুনর্ব্বসতির কোন ব্যবস্থা না করায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কেবল যে আগতদিগের মধ্যে বহু-লোকের অকাল মৃত্যু হইয়াছে, তাহাই নহে; পরন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও বিব্রত ও বিপন্ন হইয়াছে। যে সকল উদ্বাস্তুকে বহু দূরে পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে পাঠান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে নূতন স্থানে বাস করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—

উড়িষ্যায় প্রেরিত ২৪ হাজার লোকের মধ্যে ১২ হাজার ও বিহারে প্রেরিত ২৪ হাজার লোকের মধ্যে ৭ হাজার ফিরিয়া আসিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইহাদিগকে বলিতেছেন, ইহাদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের আর কোন কর্ত্তব্য নাই। ইহা তাহাদিগের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সহানুভূতির অভাব ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।

এদিকে কলিকাতায় যে উদ্বাস্তুরা বাস করিবার জন্য অত্যন্ত ও বিব্রত-কর আগ্রহ দেখাইতেছে, সে জন্যও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী। কারণ, কলিকাতায় পূর্ণ রেশনিং থাকায় লোক ১৭ টাকা মণ দরে চাউল পাইতেছে—আর কলিকাতার বাহিরে চাউলের দাম ৩০ টাকা হইতে ৭০ টাকা মণ! কুচবিহারের মত 'বাড়তী" অঞ্চলেও যে চাউলের মণ ৭০ টাকা হইতে পারে, তাহা কেবল সরকারের ব্যবস্থার ত্রুটিহেতু। আবার সহরে রেশনিং ব্যবস্থায় যে কাপড় পাওয়া যায়, গ্রামে তাহা পাওয়া যায় না। কলিকাতার নিকটে যাঁহারা বাস করেন এবং চাকরী, ব্যবসা, শিক্ষালাভ প্রভৃতি কারণে যাঁহাদিগকে প্রতিদিন কলিকাতায় আসিতে ও দিনের ১২ ঘণ্টা কলিকাতায় থাকিতে হয়, তাঁহাদিগের পক্ষে ভাত ও কাপড়ের ব্যবস্থায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসা সুবিধাজনক। গ্রামের লোক বাধ্য হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিতেছে। এদিকে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি নাই, ইহা তাহাদিগের অযোগ্যতার পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। সরকার যদি দেশের লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিতেন, তবে এ ভুল হইত না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদ্বাস্তুদিগকে বে আইনীভাবে অধিকৃত জমী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য যে আইন করিয়াছেন, তাহার তুমুল প্রতিবাদে তাহাদিগকে আইনের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকগুলি ধারা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান সচিব বার বার উদ্ধতভাবে বলিয়াছেন বটে, যতদিন ব্যবস্থা পরিষদে তাঁহার পক্ষে অধিক-সংখ্যক ভোট আছে, ততদিন তিনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সে গর্ব্ব যে ভিত্তিহীন তাহা এই আইনেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। বিরোধী দলের ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদি শিথিল-দৃঢ়তা না হইতেন, তাহা হইলে যে সরকার আইনে আরও পরিবর্ত্তন করিতে—আইনের "পোল ও নলিচা" উভয়ই বদলাইতে বাধ্য হইতেন, তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে।

উদ্বাস্তুরা যে, সরকারের ব্যবস্থার অভাবে, অনেক স্থানে "পতিত" জমীতে বিনানুমতিতে বাস করিয়াছে, তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সরকার কি জন্য তাহাদিগকে প্রথমেই সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন নাই? কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদেশপালও নূতন (বিনানুমতিতে প্রতিষ্ঠিত) বাস-গ্রামে যাইয়া অধিবাসীদিগকে উৎসাহিত করিয়া আসিয়াছেন, আবার কোন কোন স্থানে, অপ্রকাশ্য কারণে, সরকার কর্ত্তৃক উদ্বাস্তুদিগের জন্য জমী গ্রহণের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরে সে ইস্তাহার প্রত্যাহৃত হইয়াছে!

এই সকল কারণে লোক সরকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আস্থা হারাইয়াছে।

এখন বলা হইয়াছে, উদ্বাস্তুরা যে সকল স্থানে, জমীর অধিকারীর বিনানুমতিতে, বাসস্থান করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদিগের সুবিধা বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত পরিবর্ত্ত স্থান না দিয়া সে সকল স্থানচ্যুত করা হইবে না। গত তিন বৎসরে উদ্বাস্তুরা "পতিত" জমা বাসযোগ্য করিয়া তাহাতে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে—জীবিকার্জ্জনের নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছে। এ সকলই বিবেচ্য। তাহারা যে সময় ঐ সকল স্থানে বাস আরম্ভ করে সেই সময় জমীর যে মূল্য ছিল, তাহাই অধিকারীরা পাইতে পারেন—কারণ, বর্ত্তমান অবস্থা সঙ্কট-কালীন ব্যবস্থার উপযুক্ত।

আমরা উদ্বাস্তুদিগকেও সাবধান হইতে বলিব। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদিগের মধ্যেই "ঘরের শত্রু বিভীষণ" দেখা দিয়াছে—তাহারা জমীর অধিকারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া—জমীর মূল্য অধিক স্বীকার করিয়া উদ্বাস্তুদিগের সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে।

কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের সাহায্যের অপব্যয়ও হইতেছে। সে বিষয়ে সরকারের সতর্কতার অভাবই দায়ী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি বেসরকারী লোকের সহযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন এবং উদ্বাস্তুদিগের সহিত অপরিচিত জনকয়েক লোককে লইয়া পুনর্ব্বসতি সমিতি নিয়োগের ভুল না করিতেন, তবেই সুফল ফলিতে পারিত। তাঁহারা তাহা করেন নাই।

কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কোন সচিব জমীর অধিকারীর পক্ষাবলম্বন করিয়া উদ্বাস্তুদিগের অসুবিধা ঘটাইয়াছেন, এমন অভিযোগও আমরা পাইয়াছি।

আমরা বলি—ব্যবস্থার অভাবে ও ত্রুটিতে কেবল যে উদ্বাস্তুরা কষ্ট পাইতেছে, তাহা নহে—কোন কোন স্থলে জমীর অধিকারীরাও ক্ষতি—এমন কি অত্যাচার ভোগ করিতেছে। ইহা পরিতাপের বিষয়।

ব্যবস্থা পরিষদে সচিবসঙ্ঘ—

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে সচিবদিগের যে সকল বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যথিত হইতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যয়সঙ্কোচের পথ গ্রহণ না করিয়া বর্দ্ধিত ব্যয় কুলাইবার জন্য মোটর যানের উপর যে বর্দ্ধিত কর স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কেবল যে "বাসের" বে-সরকারী মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন তাহাই নহে, পরন্তু শেষ পর্য্যন্ত "বাসের" ভাড়া বাড়াইতে হইবে এবং তাহাতে যাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। তাহাতে শেষে সরকারী বাসের ভাড়া বাড়াইবার সুবিধা হইবে।

দেখা গিয়াছে, সরকার কেবল যে চাকরীর সংখ্যাবৃদ্ধি ও বৃদ্ধ চাকরীয়া আমদানী করিতেছেন তাহাই নহে, সরকারের একজন আর্থিক পরামর্শদাতা নিয়োগ করাও হইবে!

সরকারী চাকরী কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে প্রধান সচিব যাহা করিয়াছেন, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনই বেদনাদায়ক। চাকরী কমিশনের বিদায়ী সভাপতি বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে যে রিপোর্ট—ভারত শাসন আইনের নির্দ্ধারণ অনুসারে—রাষ্ট্রপালের নিকটে পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকারের অর্থাৎ সচিবসঙ্ঘের কতকগুলি কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল। সচিবরা তাহা প্রথমে, নিয়মানুসারে, ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করেন নাই এবং পরে—পরবর্ত্তী সদস্যদিগের দ্বারা" রিপোর্টের আলোচনা অংশ বর্জ্জন করাইয়া—পরিবর্ত্তিত রিপোর্ট ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন সেই বিষয় আলোচিত হয়, তখন প্রধান-সচিব প্রথম রিপোর্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বলেন, দ্বিতীয় রিপোর্টই একমাত্র রিপোর্ট! শেষে যে তাঁহাকে প্রথম রিপোর্টের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহাতে যে তিনি লজ্জানুভব করেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের ও দুঃখের বিষয়। অন্য কোন দেশে সচিবরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াও পদস্থ থাকিতে পারেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

প্রধান সচিব বার বার সদর্পে বলিয়াছেন, যতদিন তাঁহার ভোটের আধিক্য আছে, ততদিন তিনি যাহা স্বয়ং ভাল বিবেচনা করিবেন, তাহাই করিবেন। ভোটের আধিক্যের অনেক কারণ থাকিতে পারে—আছেও বটে। বিশেষ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় পরিষদের সদস্যরা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেন না।

সে যাহাই হউক, ভোটের আধিক্য কোন সচিবসঙ্ঘকে পদস্থ রাখিবার যুক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

সংবাদপত্রে কতকগুলি পত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়; তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার কোন আশ্রিত বা অনুগত বা বন্ধু বা আত্মীয় তাঁহার চিঠির কাগজে লোককে ব্যবসা-সংক্রান্ত পত্র লিখিয়াছেন। প্রধান সচিব বলেন, তিনি সে বিষয়ে কিছুই জানেন না! যদি তাহাই হয়, তবে তিনি সে বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল অবশ্যই স্বাভাবিক।

কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রধান সচিব সে সম্বন্ধে অডিনান্স করিয়া তদন্ত-ব্যবস্থা করিবেন বলেন। ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনকালে অডিনান্স জারির কথা বলা পরিষদের পক্ষে অপমানজনক বিবেচনা করিয়া সভাপতিও তাহাতে আপত্তি করিলে প্রধান সচিবকে কৈফিয়ৎ দিয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হইয়াছিল।

পরিষদের আলোচনা যে অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। আমরা ইহাতে দুঃখিত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে—

(১) খাদ্যসমস্যার সমাধান হওয়া দূরের কথা, তাহা দুর্ভিক্ষে পরিণতি লাভের সম্ভাবনাই প্রবল হইতেছে এবং কুচবিহারের ব্যাপার কলঙ্কজনক।

(২) সচিবসঙ্ঘের প্রাধান্যকালে কত স্থানে কতবার গুলি চালনায় কত স্ত্রীলোক ও পুরুষ নিহত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

(৩) বস্ত্রসমস্যার সমাধান যে হয় নাই সেজন্য সরকারের দায়িত্ব অল্প নহে।

(৪) উদ্বাস্তু সমস্যায় সরকার নানারূপ ভুল করিয়াছেন ও করিতেছেন।

(৫) প্রধান সচিব যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কেন্দ্রী সরকারের নিকট পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্ভ্রম নাই—প্রমাণ—

(ক) প্রাদেশিক সরকার পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগতদিগকে ভোটদানের অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কেন্দ্রী সরকার তাহা গ্রহণ করেন নাই।

(খ) পাকিস্তান সীমান্তবর্ত্তী পথের উন্নতিসাধন করিবার প্রস্তাব কেন্দ্রী সরকার অবজ্ঞা করিয়াছেন।

(গ) কুচবিহারের ব্যাপারে কেন্দ্রী সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তাহা করিতে দেন নাই।

এসকলই পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে সম্মানহানিকর। বিস্ময়ের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা পরিষদ এ সকলের প্রতিবাদ করেন নাই।

এবার পরিষদে শিক্ষা সচিবকে তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিবার সুযোগও প্রদান করা হয় নাই—ইহাও দুঃখের বিষয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন লোকমতের অপেক্ষা না রাখিয়া ভোটের বলে গৃহীত হইয়াছে।

এবার পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের অধিবেশন এবং সেই অধিবেশনে একাধিক সচিবের ব্যবহার যে বেদনাদায়ক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অবলা বসু—

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্ম্মিণী অবলা বসু ৮৭ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা দুর্গামোহন দাশের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। অবলা বসু প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর মত স্বামীর সংসারের ও সেবার সকল ভার লইয়া স্বামীকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগের সুযোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল আদর্শ পত্নীই ছিলেন না; পরন্তু এদেশে নারীজাতির—বিশেষ বিধবাদিগের জন্য তিনি নারীশিক্ষা সমিতি, বিদ্যাসাগর বাণীভবন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান তাঁহার স্মৃতিরক্ষা করিবে।

কোরিয়া—

কোরিয়ার যুদ্ধের অবসান-সম্ভাবনা লক্ষিত হইতেছে না। আমেরিকার সেনাবল জয়ের সম্ভাবনার সময় পরাজয়ের গ্লানি ভোগ করিতেছে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান তাঁহার পদাধিকারে সেনাবলেরও নায়ক। তিনি জেনারল ম্যাকআর্থারকে প্রশান্ত মহাসাগরের সেনাপতির পদচ্যুত করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন, সামরিক নায়কগণকে সরকারের নীতি ও নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়, জেনারল ম্যাকআর্থার কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ও সম্মিলিত জাতি সমূহের নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুসারে কাজ করেন নাই। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তিনি, চীনকে ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, চীন যদি কোরিয়ায় যুদ্ধে বিরত না হয় তবে তাঁহার সেনাদল চীনে প্রবেশ করিবে। তাঁহার এই ব্যবহারে সকলে বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বেও আপনি প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকার নীতি নির্দেশ করিয়াছেন। গত বৎসর তিনি ফরমোসায় যাইয়া চিয়াং কাইশেকের সহিত আলোচনান্তে আমেরিকাকে লিখিয়াছিলেন, প্রশান্ত মহাসাগরে রক্ষা ব্যবস্থার জন্য আমেরিকার পক্ষে ফরমোশা অপরিহার্য্য। আমেরিকার পক্ষ হইতে সে কথা অস্বীকার করা হয় এবং গত অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ওয়েক দ্বীপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি, বোধহয় জেনারলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—তিনি যেন নীতি পরিবর্ত্তন না করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে চীনা কম্যুনিষ্টদিগের নিকট সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের সেনাবলের পরাভব ঘটে এবং তখন অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেনাবলের পক্ষে মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে আক্রমণ করা সঙ্গত হয় নাই। তাহার সেনাবলের দারুণ ক্ষতি জেনারলের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল।

মূল কথা, জেনারল ম্যাকআর্থারের বিশ্বাস, চীনা কম্যুনিষ্টরাই প্রকৃত শত্রু এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনা "জাতীয় বাহিনী" প্রয়োগ করা অসঙ্গত নহে। তিনি চীনের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ন নাই; অথচ চীনের পশ্চাতে যে রুশিয়া থাকিতে পারে, সে সম্ভাবনা আছে। গত বিশ্বযুদ্ধে যিনি বিরাট বাহিনী লইয়া জাপানকে পরাভূত করিয়াছিলেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় সীমাবদ্ধ যুদ্ধে পুলিসের কাজে তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে না। কিন্তু কোরিয়ার যুদ্ধের রাজনীতিক আবেষ্টনী যে অতৃপ্তি বিরতকারী, তাহা জেনারল ম্যাকআর্থারের স্থলাভিষিক্ত জেনারল রিজওয়েও স্বীকার করিয়াছেন।

দীর্ঘকাল পরে জেনারল ম্যাকআর্থার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তথায় তিনি যে ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আমেরিকায় তাঁহার সমর্থকের অভাব নাই। সুতরাং তাঁহার পদচ্যুতি যে আমেরিকায় রাজনীতিক জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চীনা কম্যুনিষ্টরা যে শক্তিশালী তাহার প্রমাণ তাহারা দিয়াছে ও দিতেছে। তাহারা যদি—আত্মরক্ষার অজুহতে—সম্মিলিত শক্তির সেনাদলকে আক্রমণ করে ও পরাভূত করিতে পারে, তবে যে অবস্থার উদ্ভব অনিবার্য্য হইবে, তাহাতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। সে অবস্থায় অ্যাংলো-আমেরিকান দলভুক্ত ভারত রাষ্ট্র কি করিবে তাহাও বিশেষ বিবেচনার ও আশঙ্কার বিষয়। ভারতরাষ্ট্র যে আত্মরক্ষার পূর্ণ আয়োজন করিতে পারে নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ কাশ্মীরের ব্যাপারে তাহার "শিরে সংক্রান্তি" এবং তিব্বতে যে চীনের অধিকার রহিয়াছে, তাহা ভারত সরকারও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। এই অবস্থায় হয়ত অনিচ্ছায় ভারতকে যুদ্ধের জালে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। সে জন্য ভারত রাষ্ট্রকে বিশেষ সতর্কতাবলম্বন করিয়া আপনার নীতি স্থির করিতে হইবে।

পারস্য—

পারস্যে নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। পারস্যে আবাদান নামক স্থানে যে বিরাট তৈলের কারখানা আছে, তাহার তৈল দুরস্থ আওয়াজ নামক স্থান হইতে নলে আনিয়া আবাদানে পরিষ্কৃত করিয়া নৌকায় ঢালিয়া নদীপথে পারস্যোপসাগরে আনিয়া জাহাজে বোঝাই করা হয়। সেই কারখানা পারস্যে অবস্থিত হইলেও তাহা যে প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি তাহার অর্দ্ধেকের অধিক মূলধন বৃটিশ সরকারের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বৃটেন সেই মূলধন দিয়া কারখানা বাড়াইয়াছিল। ঐ প্রতিষ্ঠান অ্যাংলো-ইরাণীয় বলিয়া পরিচিত।

পারস্যের এই তৈল সম্পদের দিকে আমেরিকার ও রুশিয়ারও দৃষ্টি আছে। বর্ত্তমান যুগে তৈল যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

পারস্য সরকার এখন তৈলশিল্প জাতীয়করণের পক্ষপাতী। তাহাতে বৃটেনের স্বার্থের বিশেষ ক্ষতি হইবে। সে ক্ষতি কেবল অর্থেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পরন্তু তাহাতে বৃটেনের পক্ষে সামরিক উপকরণেরও অভাব ঘটাইবে।

এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। বৃটেন শাসনাধিকার ত্যাগ করিলেও বিদেশে শোষণাধিকার পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে এবং আমেরিকা মনরো নীতি অনুসারে বিদেশে শাসনাধিকার বিস্তৃত করিতে বিরত থাকিলেও শোষণাধিকার প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করিতেছে। পারস্য যদি তৈল শিল্প জাতীয়করণে কৃতসংকল্প হয়, তবে যে ভবিষ্যতে বিদেশী মহাজনরা চীনে বা পারস্যে, ভারতে বা পাকিস্তানে, ইরাকে বা ইরাণে আর মূলধন নিয়োগ করিতে পারিবে না, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যায়।

কাশ্মীর—

দুষ্টক্ষত যেমন সহজে দূর হয় না, কাশ্মীর সমস্যা তেমনই সমাধান-চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে। পাকিস্তান কাশ্মীর অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিল এবং কাশ্মীর ভারতরাষ্ট্রের অংশ বলিয়া ভারত সরকার পাকিস্তানের চেষ্টা ব্যর্থ করিতে অগ্রসর হয়। যে সময় পাকিস্তানী সেনাবল পরাভূত হইয়া কাশ্মীর হইতে প্রায় বিতাড়িত সেই সময় সহসা—ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কাশ্মীরের ব্যাপারের মীমাংসার জন্য যুক্ত-জাতি সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়া নূতন অবস্থার সৃষ্টি করেন।

কাশ্মীরের ব্যাপার মিটাইবার জন্য সঙ্ঘের প্রতিনিধি আসিয়া মীমাংসায় উভয়পক্ষকে সম্মত করাইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান কাশ্মীরে অনধিকার প্রবেশকারী। তাহা হইলেও পাকিস্তান তাহার দাবী ত্যাগ করে নাই এবং ভারত সরকারও প্রথমে দৌর্ব্বল্য প্রদর্শনের পরে আর সঙ্ঘের অধিকার অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না।

জাতিসঙ্ঘ—পাকিস্তানের আবেদনে—আবার মধ্যস্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকার মধ্যস্থতার সর্ত্তে সম্মত হইতে পারিতেছেন না। কাজেই ভারত সরকারের অবস্থা কতকটা সেই "স্বখাত সলিলে ডুবে মরি।"

কাশ্মীরের বর্ত্তমান সরকার আবার চারি দিকে ষড়যন্ত্রের বিভীষিকা দেখিতেছেন। ইহা সুলক্ষণ নহে।

কাশ্মীর ভারতের অংশ বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু যত দিন সে বিষয়ে শেষ মীমাংসা না হয়, ততদিন ভারত সরকারকে অস্বস্তি ও আশঙ্কা ভোগ করিতেই হইবে এবং ভারত সরকারের সেনাবলও প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। কাশ্মীরের ব্যাপারে পূর্ব্বপাকিস্তানেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, সন্দেহ নাই।

১৫ই বৈশাখ, ১৩৫৮

দুর্দ্দিনের মাভৈঃ

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

দুঃখের দিন বীণ্ রাখ্ ভাই মৃত্যুর পথ দিন গোন্,
আধ্ পেট সব কঙ্কালসার শঙ্কায় চায় ভাইবোন্।
বৌ কথাকও বুলবুল্ পিক্ দোয়েলার দল চুপ্ কর,
অগ্নির ভীম ঝঙ্কার বেগ গর্জায় শিবশঙ্কর।
মর্ত্তের পাপ মাপ্ নেই তার লাফ্ দেয় লাখ্ সয়তান,
অম্বরতল উন্মাদ চায় পথ ঘাট মাঠ ময়দান।
আজ কোথাও আশ্রয় নেই ঠাঁই নেই বাস বাঁধবার,
শোক দুঃখের মুখ রাখ্‌বার বুক নেই আজ কাঁদবার।
লোকজন সব উচ্ছৃঙ্খল চৌর্য্যের লুঠ্ মুল্লুক,
জনবন্‌ভরা ভদ্রের বেশ্ ভল্লুক বাঘ উল্লুক।
পণ্ডিত বেশী ভণ্ডের যত ষণ্ডের ভীম চীৎকার,
গুণ্ডার দল হুঙ্কার ছায় চক্ষের নেই নিদ্‌কার।
বিদ্যাশ্রীর প্রাঙ্গণ ঘিরে সঙ্গীত গায় ছাগ্ দল,
ধর্ম্মধ্বজী খরগোস্ মেষ ছুট ছায় ভয় চঞ্চল।
ঘুস্‌খোর দল শীষ ছায় ঐ চোর গায় রামধুন্‌গান,
অন্ধকারের কারবারীভূত্ ছায় মৃত্যুর সন্ধান।
ধন্‌তান্ত্রিক যক্ষের দল লক্‌লক্ লোল জিহ্বার,
ভূত্ প্রেতদের এই উৎপাত পাপ নয় আর নিভ্‌বার।
নেতৃত্বের বীর কই আজ সংসার পাপমগ্ন,
সৃষ্টিস্থিতি প্রাণ যন্ত্রের যান্ বুঝি হয় ভগ্ন।
ওঠ্ জাগ্ ভাই জনগণ্ কর অগ্নির পণ বাঁচ্‌বার,
আত্মার তেজ জাগ্রৎ কর ইজ্জৎ মান রাখ্‌বার।
মৃত্যুঞ্জয় সন্তান তোরা দুর্জ্জয় তোরা শিবদূত্।
ত্রাণ কর সব ভাইবোনদের চমকাক্ তোর বিদ্যুৎ।
কৃষ্টির লাগি দুর্ব্বার পণ সৃষ্টির ভাই কর্ গান,
প'রতল্ তোর পাপ তাপ সব বাজ্ মার কর খান্ খান্।
ঝর্ঝর ঝর ঝম্ ঝম্ ঝম্ স্বর্গের বর বৃষ্টি,
ঐক্যের প্রেম বক্ষের পর অক্ষয় হোক্ সৃষ্টি।

ভারতচন্দ্র স্মরণোৎসব—

গত ২৫শে চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সঙ্গীতির উদ্যোগে 'অন্নদামঙ্গল' রচনার দুইশত বৎসর পূর্ণ হইবার উপক্রমে কৃষ্ণনগর রাজবাটীর সভাগৃহ বিষ্ণুমহলে রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অন্য কোন বাঙ্গালী কবির সম্পর্কে এ জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কবি শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর। প্রারম্ভে অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ও স্বরূপ বিবৃত করেন। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহার রচনার সহিত পরিচয় সম্পাদন—ইহাই ছিল অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে সংগৃহীত কবির অন্নদামঙ্গলের ১২০৪ সালে লিখিত একখানি পাণ্ডুলিপিকে মাল্যভূষিত করিয়া সভাপতি মহাশয় কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন: আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য কবির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ভারতচন্দ্রের রচনায় তৎকালীন বাংলার সমাজচিত্র সম্পর্কে তাঁহার ব্যাপক আলোচনার অংশবিশেষ পাঠ করেন। এই উপলক্ষে কবি ও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ও তদ্‌বংশীয়গণের স্মৃতিচিহ্নসংবলিত একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। অন্নদামঙ্গলের বিভিন্ন প্রাচীন সংস্করণ, কবি কর্তৃক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট লিখিত একখানি পত্র, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষর সংযুক্ত পঞ্চাশ বিঘা পরিমিত ভূমিদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত শাদা দলিলের কাগজ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নির্দ্দেশে রচিত বা লিপীকৃত কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের পুঁথি এবং এই বংশের রাজগণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বাদশাহ ও নবাবদের ফরমান এই প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত হইয়াছিল। কবির রচনার সহিত সাধারণের পরিচয় সাধনের উদ্দেশ্যে হাওড়ার প্রসিদ্ধ টপ্পাগায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক ও খ্যাতনামা সঙ্গীতবিশারদ ডাক্তার শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের নেতৃত্বে সঙ্গীত সহযোগে বিদ্যাসুন্দর পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অংশবিশেষ ও মধ্যে মধ্যে গেয় টপ্পাগুলি নির্ব্বাচিত করেন শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য। ইহাতে স্বল্প পরিসরের মধ্যে কাহিনীটির পূর্ণরূপ ও ভারতচন্দ্রের রচনার সুন্দর নমুনা পাওয়া যায়।
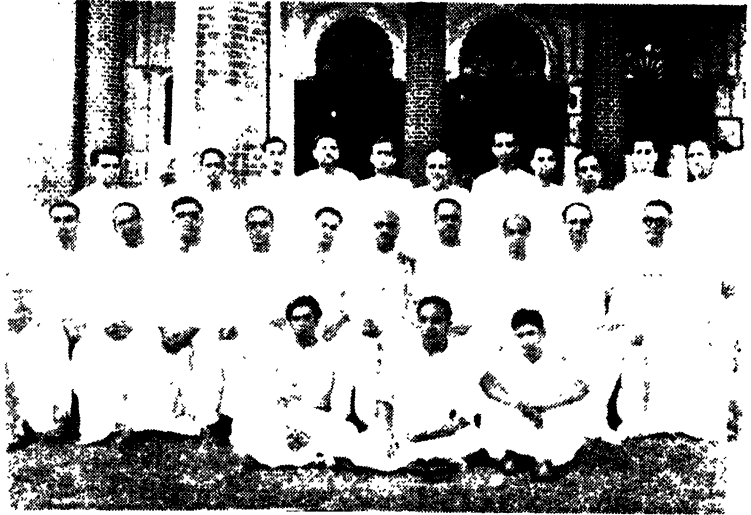
কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ভারতচন্দ্র স্মরণ উৎসব ফটো—বল্লভ ষ্টুডিও

নদীয়া জেলা সাহিত্য সম্মেলন—

কৃষ্ণনগর বাণী-পরিষদের উদ্যোগে গত ২২শে এপ্রিল রবিবার কৃষ্ণনগরে "ছায়াবাণী" চিত্রগৃহে নদীয়া জেলা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সম্মেলনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।
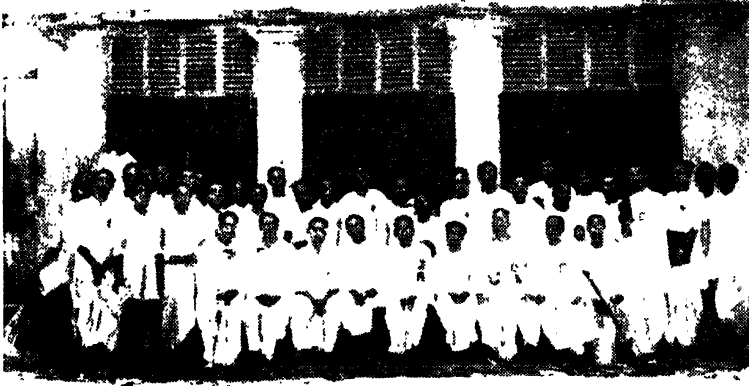
কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলা সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি, ও অন্যান্য শাখা সভাপতিগণ ফটো—বল্লভ ষ্টুডিও

কৃষ্ণনগর নদীয়া জেলা সাহিত্য-সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকাবৃন্দ ফটো—বল্লভ ষ্টুডিও

শ্রীযুত মজুমদার তাহার অভিভাষণের শেষে বলেন—"আমি আপনাদিগকে এই নিরাশার মধ্যে একটি আশার বাণী শুনাইব। একদিন আমি এক প্রবীণ পণ্ডিত ও তন্ত্রসাধক বাঙ্গালীর নিকট বর্তমান সমস্যার কথা উত্থাপন করিলে তিনি যে একটি আশ্বাস বাক্য বলিয়াছিলেন—সেই বাক্যে তাঁহার কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা ও সত্যোপলব্ধির দৃঢ়তা আমাকেও আশ্বস্ত করিয়াছিল। সেই বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালী মরিতে পারে না; তার কারণ এই বাংলার মাটীতে যে বস্তু নিহিত আছে, তাহা ভারতের আর কোথাও নাই। যেহেতু সেই পরম বস্তুতে ভারতেরও প্রয়োজন আছে এবং বাংলা মরিলে ভারতেরও মহা অনিষ্ট হইবে, অতএব বাঙ্গালী ধ্বংস হইবে না। কিন্তু আজিকার এই মৃত ও মুমূর্ষু বাঙ্গালীকে বাঁচাইবার সেই মৃত-সঞ্জীবন বিশল্যকরণী কে আনিবে? তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন মনে হইল, এই জাতির চরিত্রে একটা অনিয়মের নিয়ম আছে। কারণ, এ জাতি বিশেষ করিয়া প্রাণধর্ম্মী, ইহার এক আশ্চর্য্য প্রাণবত্তা আছে—তাহা কোন মনোবিজ্ঞান বা তর্কশাস্ত্রের অধীন নয়। আর কিছুতেই এ জাতি জাগিবে না, একমাত্র—কোন মহাপ্রাণ পুরুষের সাক্ষাৎ সংশ্রয় ব্যতিরেকে। যদি এখনও তেমন পুরুষের আবির্ভাব হয়, তবে সেই একজনের আহ্বানে এই শ্মশানভূমিতেও শবদেহ উঠিয়া বসিবে, ইহার মৃত্তিকাতল হইতেও অস্থিকঙ্কাল বাহির হইয়া কলেবর শোভিত হইবে। এ জাতির প্রাণমাহাত্ম্য এমনই। রাজনীতি নয়, অর্থনীতিও নয়—এমন কি কোন আধ্যাত্মিক ধর্ম্মতন্ত্রও নয়, ইহাকে বাঁচাইবার—মৃত্যুপুরী হইতেও ফিরাইয়া

আনিবার একটী মাত্র উপায় আছে। মহাপ্রাণ হৃদয়, বীর্য্যবান, মহাশক্তির বরপুত্র, বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের সিদ্ধ সাধক কোন বাঙ্গালী সন্তান যখনই ইহাকে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে ডাক দিবে, তখনই এ জাতির মোহ ঘুচিয়া যাইবে, সেই একজনের এক প্রাণই কোটী মানুষকে প্রাণবন্ত করিবে। সেই অমৃত—বাঙ্গালার মাটীতেই নিহিত আছে—জীবন ও মৃত্যুর সাধারণ নিয়তি তাহার নিকটে ব্যর্থ। তখন সেই নবপ্রভাতে, এই অশৌচ রাত্রির যত অপচার—ইন্দুর, ছুঁচা ও চামচিকা—ভূত প্রেত ও পিশাচের দল নিমেষে অন্তর্ধান করিবে।"

কাব্য, কথাসাহিত্য, শিশুসাহিত্য, ধর্ম ও সংগীত সাহিত্য সম্বন্ধে সম্মেলনে আলোচনা হয় এবং বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সাহিত্যিকদের ভাষণে উদ্বেগ দেখা যায়। কাব্যশাখায় শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, সংবাদ-সাহিত্য শাখায় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ধর্মসাহিত্য শাখায় শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কথাসাহিত্য শাখায় শ্রীমনোজ বসু, শিশুসাহিত্য শাখায় শ্রীঅখিল নিয়োগী ও সঙ্গীত সাহিত্য শাখায় শ্রীসুধাময় গোস্বামী সভাপতিত্ব করেন। বাঙালীর জাতীয় জীবন ও সাহিত্যে দুর্যোগের কথা উল্লেখ করিয়া মূল সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দেন।

সম্মেলনের মঙ্গলাচরণ করেন আচার্য শ্রীহেমচন্দ্র শাস্ত্রী এবং উদ্বোধন করেন আনন্দবাজার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য। কৃষ্ণনগর বাণী-পরিষদের সম্পাদক শ্রীনির্মল দত্ত তাঁহার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীতারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভ্যাগত-গণকে সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার ভাষণ পাঠ করেন। তিনি নদীয়ার ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নদীয়ার মহারাজকুমার শ্রীসৌরীশচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সরকারের সমর্থনে মূল সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। সম্মেলনে প্রবন্ধ কবিতাদি পাঠ করেন শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ, শ্রীঅজিতপাল চৌধুরী, শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, শ্রীসরোজবন্ধু দত্ত, শ্রীঅজিত দাস, শ্রীঅনিল চক্রবর্তী, শ্রীশিবপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীউত্তরা চৌধুরী, শ্রীবন্দনা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার, শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী, শ্রীফণী বিশ্বাস, শ্রীজনরঞ্জন রায় প্রভৃতির প্রবন্ধ সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। অন্যান্য বক্তৃতাদি করেন শ্রীশরৎ পণ্ডিত, শ্রীহেমন্তকুমার সরকার, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঙ্গীতাংশে থাকেন শ্রীচায়না চক্রবর্তী, শ্রীশচীন সেন, শ্রীদাশরথি আচার্য, শ্রীসুনীতি সেন, শ্রীরেখা চক্রবর্তী, শ্রীমণিমালা ভট্টাচার্য, শ্রীমঞ্জু, শ্রীতারক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ উদ্বোধন ও সমাপন সঙ্গীত করেন।

সন্ধ্যার নৃত্যানুষ্ঠানে ঝুমু মল্লিকের "ভারতীয় নৃত্য", লেডি কারমাইকেল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের "লোকনৃত্য", গীতবাণীর (শ্রীনৃপেন পরিচালিত) "রাধাকৃষ্ণ নৃত্য" এবং বঙ্গবাণীর ছাত্রীগণ কর্তৃক "মুক্তধারা" রবীন্দ্র-নাট্য অভিনীত হয়।

সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী, শ্রীনগেন দত্ত ও কৃষ্ণনগর মিউনিসি-প্যালিটীর কর্মিবৃন্দ ও অন্যান্য স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টা করেন। নদীয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে, অন্যান্য জেলা হইতে এবং কলিকাতা হইতে দুই সহস্রের অধিক সুধী সমাগমে সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়।

চীনে তিব্বতের পাঞ্চেন লামা—

তিব্বতের ১৪ বৎসর বয়স্ক পাঞ্চেন লামা কমিউনিষ্ট চীনের নায়ক মাও-সে-তুং-এর সহিত মিলনের জন্য গত ২৭শে এপ্রিল পিকিং গিয়াছেন। তিব্বত সমস্যার সমাধানই তাঁহার এই মিলনের উদ্দেশ্য। পাঞ্চেন লামা বলেন—তিব্বত চীনের অংশ, কাজেই চীনাদের সহিত আলাদা হইবেন না। তিব্বতের অপর নেতা ১৬ বৎসর বয়স্ক দালাই লামাও পিকিং যাইতেছেন। চীনা আক্রমণের পর তিনি রাজধানী লাসা ত্যাগ করিয়া সীমান্তের একটি সহরে বাস করিতেছেন। তিব্বত কি তবে ভারতের অংশ-রূপে আর বিবেচিত হইবে না?

শচীন্দ্রনাথ সম্বর্দ্ধনা—

গত ৮ই বৈশাখ রবিবার সকালে কলিকাতা মিনার্ভা থিয়েটারে এক সভায় বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার

শ্রীশচীনন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী সভায়

নাট্যকার শ্রীশচীন সেনগুপ্ত ফটো—রূপমঞ্চ

পৌরোহিত্য করেন ও শচীন্দ্রনাথকে ৫৫৫১ টাকার একটি তোড়া ও এক অভিনন্দন পত্র উপহার দেওয়া হয়। শ্রীছবিবিশ্বাস রঙ্গালয়ের শিল্পী ও কর্ম্মীদের পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, শ্রীদেবকী বসু, শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীনরেশ মিত্র, শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া শচীন্দ্রনাথের গুণবর্ণনা করেন। শ্রীসরযুবালা

পৌত্র ক্রোড়ে শ্রীশচীন সেনগুপ্ত উপবিষ্ট এবং বাম হইতে দক্ষিণে দণ্ডায়মান : শ্রীঅপর্ণা, সরযূবালা, মণিদীপা, রাণীবালা, পদ্মাবতী, অঞ্জলিবালা, বেলারাণী, বিজয় মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীগণ

পৃথক ভাবে একটি রিষ্টওয়াচ ও শ্রীপ্রফুল্ল রায় নগদ ২৫০ টাকার গ্রন্থ উপহার দেন এবং দেবকীবাবু রত্নদীপের একটি প্রদর্শনীর সমুদয় অর্থ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল সকলকে ধন্যবাদ দেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথের এই সম্বর্দ্ধনা সাহিত্যজগতে নূতন যুগের সূচনার পরিচায়ক। আমরা প্রার্থনা করি, শচীন্দ্রনাথ শতায়ু হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে ও বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চকে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলুন। যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তাঁহারা সকল বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র। শচীন্দ্রনাথের গৈরিক পতাকা, রক্তকমল, সিরাজদ্দৌল্লা, ধাত্রীপান্না, রাষ্ট্র বিপ্লব, দশের দাবী, আবুল হাসান, কালো টাকা, ঝড়ের রাতে, জননী ভারতবর্ষ, তটিনীর বিচার, নাসিং হোম, সংগ্রাম, সতীতীর্থ, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি নাটক তাঁহাকে বাঙ্গলা সাহিত্যে অমরত্ব দান করিয়াছে।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার সংস্কার—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার সংস্কারের জন্য সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া এক কমিটি গঠন করিয়াছেন —(১) ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (২) অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) অধ্যাপক জে-পি-নিয়োগী (৪) অধ্যক্ষ পি-কে-গুহ (৫) অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (৬) রেভাঃ পার্গটাটেন (৭) ডাঃ

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (৮) ডাঃ মেঘনাদ সাহা (৯) অধ্যাপক সত্যেন বসু (১০) অধ্যাপক হিমাদ্রি মুখোপাধ্যায় (১১) শ্রীবি-সি-গুহ (১২) শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন অনেক দিন হইতে অনুভূত হইতেছিল—সিণ্ডিকেট এতদিনে সে বিষয়ে অবহিত হওয়ায় ছাত্রগণ উপকৃত হইবে।

মানভূমে নেতাদের কারাদণ্ড—

মানভূম লোক সেবক সংঘের কর্ম্মীরা তথায় বাঙ্গালীদের অধিকার রক্ষার জন্য সত্যাগ্রহ করিতেছেন। সেজন্য সম্প্রতি পুরুলিয়ায় একদল সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ৩রা মে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৭ জন নেতার প্রত্যেকের ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে—প্রথম ২ জন বিহার ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ছিলেন—সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন—(১) শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (২) সাগরচন্দ্র মাহাতো (৩) বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (৪) অরুণচন্দ্র ঘোষ (৫) মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬) জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য ও (৭) সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য্য। সকলেই প্রবীণ ও খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী।

বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়—

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনিষ্টিটিউটে প্রাচ্য বাণী মন্দিরের বার্ষিক সভায় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবৃত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাচ্য-বাণী মন্দিরের পক্ষ হইতে যে চেষ্টা চলিতেছে—সকলে যাহাতে সে চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্য দান করেন, উপস্থিত বক্তারা সকলেই সে বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ঐ দিন সভা শেষে সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটক অভিনয় করিয়া সকলকে আনন্দ দান করা হইয়াছিল।

সংস্কৃত নাটকাভিনয়—

সংস্কৃত সাহিত্যের বহুল প্রচারের জন্য কলিকাতা প্রাচ্য বাণী মন্দিরের পক্ষ হইতে প্রতি ৩ মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিও মারফত একখানি করিয়া সংস্কৃত নাটক অভিনয় করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত রাজশেখর কৃত 'কর্পূর-মঞ্জরী', শ্রীহর্ষ কৃত 'নাগানন্দ', ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহার', শূদ্রক কৃত 'মৃচ্ছকটিক' ও ক্ষেমেশ্বর কৃত 'চণ্ডকৌশিক' নাটক সংস্কৃত ভাষায় অভিনয় করা হইয়াছে। নাট্যরূপ দান করিয়াছেন ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ও ডক্টর রমা চৌধুরী এবং প্রযোজনা করিয়াছেন শ্রীসরল গুহ। সম্প্রতি 'উত্তর রামচরিত'ও অভিনীত হইয়াছে। উত্তর রামচরিতে অভিনয় করিয়াছেন—ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও শ্রীমতী

প্রাচ্য বাণী মন্দিরের অভিনেতারা

রমা, শ্রীফণিভূষণ রায়, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমায়া চক্রবর্ত্তী, শ্রীআরতি দে, অধ্যাপিকা রমা দেবী ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীগৌর গোস্বামী। বাংলার সর্বত্র সংস্কৃতানুরাগীদের উদ্যোগে এই সকল নাটকের অভিনয় হইলে সংস্কৃত ভাষার প্রতি লোকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইবে।

সিঁথিতে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠা—

অমৃত বাজার পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী গত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন কলিকাতার উত্তর প্রান্তে সিঁথি কালীচরণ ঘোষ রোডে নিজ বাসভবনের নিকট তাঁহার গৃহ-দেবতা দয়াময়ী কালীর জন্য নূতন এক মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন। ফরিদপুর জেলার কালামৃধা গ্রামে তিনশত বৎসর পূর্বে ঐ কালীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল—হরিনারায়ণ চৌধুরী সামান্য অবস্থা হইতে মুসলমান রাজত্বকালে ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও মৈমনসিংহ জেলায় বহু জমীদারী

ক্রয়ের পর স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঐ মূর্তি ও তাহার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্রনারায়ণ হরিনারায়ণ হইতে সপ্তম পুরুষ। পাকিস্তান হইবার পর রবীন্দ্রনারায়ণের মাতা শ্রীমতী মনোরমা দেবী ঐ মূর্তি ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিতে অসম্মতা হইলে এক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্র তাঁহার মাতা ও কালীমূর্তি স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং নানা অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই সুন্দর

সিঁথিতে নব-নির্ম্মিত কালীমন্দির

মন্দির নির্মাণে সমর্থ হন। এঞ্জিনিয়ার এ-করের পরিকল্পনায় এবং ভাস্কর শ্রীসুনীল পাল ও শিল্পী শ্রীকমলারঞ্জন ঠাকুরের পরিশ্রম ও যত্নে মন্দিরটী সৌন্দর্য্যও শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। এ যুগে সাংবাদিকের পক্ষে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য্য অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এবং ইহা ভারতীয় সংস্কৃতির নবযুগেরই সূচনা করিতেছে।

নির্বাচনের আয়োজন—

পশ্চিম বঙ্গে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রার্থী স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়জনকে লইয়া পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভায় একটি কমিটী গঠিত হইয়াছে—(১) পশ্চিম বঙ্গের রাষ্ট্রপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ (২) পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীবিজয় সিং নাহার (৩) ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (৪) শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন (৫) শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় (৬) শ্রীশ্যামাপদ বর্ম্মণ (৭) ডাক্তার আর, আমেদ (৮) শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি ও (৯) শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫জন মন্ত্রী এই কমিটিতে স্থান পাইয়াছেন—ইহাই কমিটীর বিশেষত্ব।

শ্রীপূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—

ভারতীয় পররাষ্ট্র দপ্তরের শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪শে নভেম্বর হইতে ক্যানেডায় অস্থায়ীভাবে ভারতীয় হাই কমিশনারের কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী সোমা ও পুত্রকে লইয়া ২ বৎসর পূর্বে হাই-কমিশনারের সেক্রেটারীরূপে ক্যানেডায় গমন করেন ও তদবধি ঐ দেশে নানা সহরে শতাধিক বক্তৃতা করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ণেন্দুকুমার ক্যানাডা যাইবার পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ, বঙ্গবাসী কলেজ, রিপন আইন কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ বিভাগ প্রভৃতিতে অধ্যাপকের কাজ করিয়াছিলেন। বিদেশে ভারতীয় মিশনের কর্তাদের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ।

চিনির দর—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে কোন খুচরা বিক্রয়কারীই চিনির দর ১৪ আনা ৩

পয়সার অধিক সের দরে চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন না। চিনি প্রচুর মজুত থাকা সত্ত্বেও লোক ইচ্ছানুরূপ চিনি ক্রয় করিতে পারে না। তাহার ব্যবস্থা কবে হইবে?

মালঞ্চ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষালাভ করিয়া কুষ্টিয়ার নিকটস্থ কুমারখালিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু বৎসর তথায় জনহিতকর কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি কুষ্টিয়াতে এক শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পাকিস্তান হইবার পর আশ্রম গৃহগুলি পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করায় স্বামীজি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সম্প্রতি তিনি ২৪পরগণা জেলার হালিসহরের নিকট মালঞ্চ গ্রামে একটি ও খড়্গপুরের নিকট বলরামপুরে একটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ১লা বৈশাখ মালঞ্চে উৎসব হইয়াছিল। তিন দিন ধরিয়া বাসন্তী পূজার শেষে রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের সভাপতিত্বে এক জনসভায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা প্রচার করা হয়। বেলুড়স্থ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তথায় বক্তৃতা করেন। মালঞ্চে দাতব্য চিকিৎসালয় ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। মালঞ্চ ইউনিয়ন বোর্ড অঞ্চলে অবস্থিত—কাজেই স্বামী সোমেশ্বরানন্দ ঐ অঞ্চলে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করায় দেশবাসীর উপকার হইবে। বলরামপুরেও বৈশাখ মাসে উৎসব করিয়া আশ্রমের উদ্বোধন হইয়াছে। সেখানেও ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ও খোলা হইবে।

মালঞ্চে রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্বোধন

রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার—

পশ্চিম বঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারকগণের নির্দ্দেশ মত ১৯৫০-৫১ সালের প্রত্যেকটি ৫ হাজার টাকা করিয়া ২টি রবীন্দ্র পুরস্কার যথাক্রমে স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার রচিত 'ইছামতী' গ্রন্থের জন্য ও বাঁকুড়া নিবাসী রায় বাহাদুর শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়কে তাঁহার 'প্রাচীন ভারতীয় জীবন' সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্রদান করা হইয়াছে। বিভূতিভূষণ আজ আর ইহলোকে নাই—

তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই সম্মান দানে সকলেই আনন্দিত হইবেন। শিক্ষাব্রতী সুপ্রাচীন (৯০ বৎসর বয়স্ক) আচার্য্য যোগেশচন্দ্র বাঙ্গলা দেশে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয়—তাঁহাকে সম্মানিত করায় সকলেই গৌরব বোধ করিবেন।

নৃত্য-শিল্পী কুমারী অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়—

গত ৭ই এপ্রিল কলেজ ষ্ট্রীট ওয়াই-এম-সি-এ'তে অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য প্রতিযোগিতায় কুমারী অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায় মণিপুরী, আধুনিক ও কথাকলি নৃত্য—তিনটি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলের প্রশংসা লাভ

কুমারী অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

করিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা বলিয়া বিচারকগণ তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর সম্মান দান করিয়াছেন। মণিপুরী নৃত্যের ভঙ্গীতে তাঁহার একটি চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।

ভারতীয় শরীর শিক্ষা কংগ্রেস—

খ্যাতনামা ব্যায়ামবীর শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ কলিকাতা ৪।২ রামমোহন রায় রোডে ভারতীয় শরীর শিক্ষা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শরীর চর্চার প্রচারে মনোযোগী হইয়াছেন। শ্রীনীলমণি দাস, শ্রীরবীন সরকার, শ্রীমনোতোষ রায়, মেজর রাধানাথ চন্দ্র প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যায়ামবিদগণ তাঁহাকে এ কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন এজন্য তাঁহারা 'ব্যায়াম' নামক একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখন দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহে বাধ্যতামূলক ব্যায়াম শিক্ষা প্রবর্তনের সময় আসিয়াছে—তাহাই পরে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষায় পরিণত হইবে। নিয়মানুগভাবে ব্যায়াম শিক্ষার জন্য দেশে যে চেষ্টার প্রয়োজন, বিষ্ণুচরণবাবু সে বিষয়ে অগ্রণী হউন, ইহাই আমাদের কামনা।

রাজগীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—

বিহার পাটনার নিকটস্থ বৌদ্ধতীর্থ রাজগীরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শিষ্য স্বামী কৃপানন্দ বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী ও স্বাস্থ্যান্বেষীদের জন্য কয় বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম নামে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলের সেবা করিতেছিলেন। সম্প্রতি আশ্রমে এক খণ্ড বড় জমীর উপর কয়েকটি বড় বড় বাসগৃহ ও একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং বহির্বাটীতে ফটক ও তাহার উভয় পার্শ্বে ২টি বড়

রাজগীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

ঘর হইয়াছে। স্বামীজি ১৩৫৭ সালে কলিকাতা হইতে কয়েক হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আশ্রমকে আরও সুবৃহৎ করিবার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতেছেন। আশ্রমটিকে বিহারে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি প্রচারের একটি কেন্দ্রে পরিণত করা স্বামীজির উদ্দেশ্য। আমাদের বিশ্বাস, এ কার্য্যে সকলেই স্বামীজিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সমবেত সদস্যবৃন্দ (গত মাসে ইহার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।)

রাজ্যপালকে অভিনন্দন গ্রন্থ দান—

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীকৈলাসনাথ কাটজুর ৬৪তম জন্ম দিবস উপলক্ষে গত ২১শে এপ্রিল বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ শ্রীউদয়চাঁদ মহাতাবের আলিপুরস্থ বাসগৃহ 'বিজয়-মঞ্জিলে' এক উৎসবে রাজ্যপালকে এক অভিনন্দন গ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছে। তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধবগণ কর্ত্তৃক লিখিত তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের বিবরণ ঐ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর কৈলাসনাথ কাটজুর ৬৪তম জন্মদিন উপলক্ষে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ কর্তৃক তাঁহাকে অভিনন্দন গ্রন্থ দান

জলপাইগুড়ীতে কংগ্রেসের জয়—

আবগারী বিভাগের মন্ত্রী স্বর্গত মোহিনী মোহন বর্মনের শূন্য স্থানে জলপাই-গুড়ী-শিলিগুড়ী তপশীলী নির্বাচন কেন্দ্র হইতে উপ-নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় সরকার সর্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়া পশ্চিম বঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক স্বতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী প্রার্থীরা ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।

ডাঃ স্নেহময় দত্ত—

পশ্চিমবঙ্গের সহকারী শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন

ডিরেকটার ডাঃ স্নেহময় দত্ত গত ১লা মে হইতে এক বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাক্তার দত্ত সুপণ্ডিত, সুধী ও সুদক্ষ কর্ম্মী। তাঁহার নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আমরা আশা করি।

বর্ষ শেষ—

বর্ত্তমান সংখ্যায় ভারতবর্ষের বয়স ৩৮ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৩৯ বৎসরের দ্বারদেশে উপনীত হইল। আগামী মাস হইতে ইহার নব বর্ষ আরম্ভ হইবে। যে মহাকবি ও নাট্যকার আজ হইতে ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষ প্রকাশের আয়োজন করেন এবং ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পূর্ব্বেই যাঁহার মহাপ্রয়াণে বাংলার কাব্য ও নাট্যাকাশ হইতে একটি মহা জ্যোতিষ্ক বিচ্যুত হইয়া পড়ে আমরা আজ শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্মরণ করি তাঁহাকে—প্রণাম জানাই তাঁহার উদ্দেশে। সেই সঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণ করি তাঁহাদের যাঁহারা ভারতবর্ষ পত্রিকাকে তাহার আদর্শে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লোকান্তরিত—অনেকে এখনো আমাদের মধ্যে থাকিয়া আমাদের সহযোগিতা করিতেছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমরা আমাদের শ্রদ্ধা-নমস্কার ও প্রীতি নিবেদন করিয়া—ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার কৃপায় এবং সকলের সহযোগিতায় 'ভারতবর্ষ' তাহার সুনাম বজায় রাখিয়া দেশের তথা বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতে সমর্থ হয়। নববর্ষে যেন আমরা নবীন উদ্যম ও উৎসাহ লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি।

মহাকরণে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান-মন্ত্রীর আহ্বানে ডেনমার্কের মন্ত্রী ও ডেনমার্কের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

হকি মরসুম ঃ

ক'লকাতার মাঠে হকি মরসুম এ বছরের মত শেষ হয়ে গেল। ক্যালকাটা হকি লীগের প্রথম বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। ভারতীয় দলের মধ্যে প্রথম বিভাগের হকি লী চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রথম পায় গ্রীয়ার স্পোর্টিং ১৯১৯ সালে।

এ বছর লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ নিয়ে মোহনবাগান ভবানীপুর এবং কাষ্টমস দলের মধ্যে জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৯৫১ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী মোহনবাগান দল

ফটো—জে কে সান্যাল

ইতিপূর্ব্বে ১৯৩৫ সালে মোহনবাগান ক্লাব দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পায়। ঐ বছর মোহনবাগান একটা খেলাতেও হারেনি। প্রথম বিভাগের হকিতে মোহনবাগান রাণার্স-আপ হয়েছে এ পর্য্যন্ত চারবার—১৯৪৫, ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে। চলেছিলো। কাষ্টমস তার লীগের শেষ খেলায় মোহনবাগানের কাছে হেরে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লা থেকে পিছিয়ে পড়ে। সেই সময় কাষ্টমসের ২০টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট, মোহনবাগানের ১৯টা খেলায় ৩৩ পয়েন্ট এবং ভবানীপুরের ১৬টা খেলায় ২৭ পয়েন্ট। খেলার এ অবস্থায়

মোহনবাগান এবং ভবানীপুরের বাকি খেলায় কোন অঘটন ঘটলে কাষ্টমসের পক্ষে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের আশা পুনরায় দেখা দিত। কিন্তু মোহনবাগান তার বাকি খেলায় জয়ী হয়ে কাষ্টমসের থেকে ২ পয়েন্টে এগিয়ে যায়। তখন মোহনবাগান এবং ভবানীপুরের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপের লড়াই চলে। যখন মোহনবাগানের ২০টা খেলায় ৩৫ পয়েন্ট তখন ভবানীপুরের ১৭টা খেলায় ২৯ পয়েন্ট। খেলার এ অবস্থায় ভবানীপুরের পক্ষে মাত্র ১টা পয়েন্ট নষ্ট করা মানেই লীগের রানার্স-আপ হওয়া। খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি। উভয়দলই তাদের স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখাতে পারেনি যদিও মোহনবাগানের খেলা তুলনামূলক বিচারে ভাল হয়েছিলো। ভবানীপুরের সেণ্টার ফরওয়ার্ড দীনদয়াল ঐ দিন অনুপস্থিত থাকায় ভবানীপুর দলের আক্রমণভাগ কিছুটা দুর্ব্বল ছিল। খেলার সূচনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোহনবাগান গোল দেয়। এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার সূচনাতেই একদলের পক্ষে গোল করা বিপক্ষদলের পক্ষে দমে যাওয়ার যথেষ্ট কারণ বলতে হবে।

১৯৫১ সালের প্রথম বিভাগের হকি লীগে রানার্স—আপ-ভবানীপুর ক্লাব ফটো—জে কে সান্যাল

কিন্তু ভবানীপুর তার বাকি ৩টে খেলায় জয়ী হয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে সমান ৩৫ পয়েন্ট করে। ভবানীপুরের কৃতিত্ব বলতে হবে, কারণ খেলার এ অবস্থায় খেলোয়াড়দের পক্ষে মনোবল রক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়ে। উভয়দলের সমান পয়েন্ট হওয়ায় চ্যাম্পিয়ানসীপ নির্দ্ধারণের জন্যে উভয়দলকে পুনরায় খেলতে হয়। লীগের প্রথম খেলায় ভবানীপুর ১-০ গোলে মোহনবাগানকে হারিয়েছিলো। কিন্তু এই শেষ খেলায় মোহনবাগান পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ পায়। শেষ খেলাটি

টেবল-টেনিস ঃ

বেঙ্গল টেবল-টেনিস এসোসিয়েসন পরিচালিত বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় পুরুষদের ফাইনালে ভারতের এক নম্বর খেলোয়াড় কে জয়ন্ত, জয়ন্ত দে কে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য বিভাগের ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

পুরুষদের ডবলস্ ঃ—বিজয়ী জে, দে ও আর, কে দে

রাণার্স আপ—এফ, পি, ডেভিটি ও আর, টি, রাজন্

মিক্সড্ ডবলস্ :—বিজয়ী—টি, ঘোষ ও সি, ম্যাডান্

রাণার্স আপ—এফ্, পি, ডেভিট্ ও জি, ম্যাকার্ডিচ্

মহিলাদের সিঙ্গলস্ :—বিজয়ী—সি, ম্যাডান্

রাণার্স আপ—জি, ম্যাকার্টিচ্

নন্-মেডালিষ্ট সিঙ্গলস্ :—বিজয়ী—এস, মুখার্জ্জি

রাণার্স আপ—আর, কে, চ্যাটার্জ্জি

বয়েজ সিঙ্গলস্ :—বিজয়ী—জে, ব্যানার্জ্জি (সিনিয়ার)

রাণার্স আপ—জে, ব্যানার্জ্জি (জুনিয়ার)

ইণ্টার ক্লাব টিম্ লীগ :—বিজয়ী—এক্সেলসিয়ার "রেড্"

রাণার্স আপ—ওয়াই, এম্, সি এ, "য়্যাটম"

ইণ্টার অফিস টিম লীগ্ :—বিজয়ী—জি, ডি, চ্যাটার্জ্জী এণ্ড সন্স স্পোর্টস ক্লাব

রাণার্স আপ—হনুমান গ্লাস ফ্যাক্টরী স্পোর্টস ক্লাব

ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ্ঃ

ন্যাশানাল ক্রিকেট ক্লাব ও বেঙ্গল টেবল-টেনিস এসোশিয়েসানের যুক্ত পরিচালনায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়ান-শিপ্ টেবল-টেনিস প্রতিযোগিতা ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাবের নব নির্ম্মিত ইন্-ডোর ষ্টেডিয়ামে ১৭ই মে থেকে আরম্ভ হবে। এই প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলা ও ভারতের সর্ব্ব প্রদেশের নাম করা খেলোয়াড়রা ছাড়াও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জনি লীচ্ ও ফ্রান্সের চ্যাম্পিয়ান্ মাইকেল হাগুগনারও যোগদান করবেন।

বাইটন কাপ ঃ

১৯৫১ সালের বাইটন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফ্ট ২-১ গোলে লাহোরের শক্তিশালী বাটা স্পোর্টসদলকে হারিয়ে বাইটন কাপ পেয়েছে। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে উভয়পক্ষই একটা করে গোল দেয়। বাটা স্পোর্টসদলে পাকিস্থানের কয়েকজন গত অলিম্পিক যোগদানকারী হকি খেলোয়াড় ছিলেন। প্রতিযোগিতার তৃতীয় রাউণ্ডে পাতিয়ালা একাদশকে মাত্র ১-০ গোলে হারিয়ে বাটা চতুর্থ রাউণ্ডে উঠে। পাতিয়ালাদল বাটাদলের তুলনায় গোল করার বেশী সুযোগ পায় কিন্তু ভাগ্য এবং খেলার দোষে তারা একটা গোলও করতে পারেনি। এই সুযোগগুলি ব্যর্থ না হ'লে পাতিয়ালাই জয়ী হ'ত এবং তা অসঙ্গত হ'ত না।

বেঙ্গল টেবল টেনিস এসোসিয়েসান পরিচালিত ইণ্টার অফিস লীগ প্রতিযোগিতায় ফাইনালে বিজয়ী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স স্পোর্টস ক্লাব

বামদিক থেকে—শৈলেন চ্যাটার্জ্জী (অধিনায়ক), রমেন চ্যাটার্জ্জী ও বাংলার উদীয়মান খেলোয়াড় প্রদীপ চ্যাটার্জ্জী

চতুর্থ রাউণ্ডে স্থানীয় দুর্ব্বল ডালহৌসী দলের কাছে বাটা মাত্র ১-০ গোলে জিতে সেমি-ফাইনালে উঠে। ভবানীপুর ০-২ গোলে সেমি-ফাইনালে বাটার কাছে হেরে যায়। ভবানীপুর দলের নামকরা তিনজন খেলোয়াড় আহত থাকায় নামতে পারেনি। সুতরাং বাটা[illegible] পরীক্ষা হয়নি। প্রতিযোগিতার অপর দিকের সেমি-ফাইনালে মোহনবাগান ১-২ গোলে হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্‌টের কাছে হেরে যায়। মোহনবাগান প্রথম গোল দেয়; মোহনবাগানের গোলরক্ষকের মারাত্মক ভুল খেলার দরুণ দ্বিতীয় গোলটি হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধের খেলার দশমিনিটে একটা বল আউটের দিকে যাচ্ছিল। গোলরক্ষক মিত্র এগিয়ে গিয়ে পা দিয়ে বলটি ধরেন, কিন্তু বলটি মারতে দেরী করায় বিপক্ষের খেলোয়াড় দ্রুতবেগে এসে গোল দিয়ে যায়। অবশ্য তিনি এরপর কয়েকটি শক্ত বল আটকেছিলেন কিন্তু পূর্ব্বের মারাত্মক ভুল তা দিয়ে পূরণ করতে পারেননি। বাঙ্গালোর দলের গোলরক্ষক কয়েকটি শক্ত বল আটকে দলকে অবধারিত গোল খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। খেলার শেষদিকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর মোহনবাগান দলের খেলা ঢিলে হয়ে যায়, শেষ কয়েক মিনিট অবিশ্যি গোল করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু বিপক্ষের চমৎকার গোলরক্ষায় তা ব্যর্থ হয়। বাঙ্গালোর দলের 'Team spirit' এবং জয়লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। গত দু'বছরের (১৯৪৯-৫০ সাল) বাইটন কাপ বিজয়ী টাটা স্পোর্টস দল অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিযোগিতায় তাদের প্রথম খেলা তৃতীয় রাউণ্ডেই বিদায় নিয়েছিল মধ্যভারত পুলিশ দলের কাছে ১-০ গোলে হেরে গিয়ে। টাটা দল এবছর বোম্বাইয়ের আগা খাঁ কাপ বিজয়ী হয়েছে। এর উপর তারা এবছরের বাইটন কাপ বিজয়ী হ'লে পর্য্যায়-ক্রমে তিন বছর বাইটন কাপ জয়লাভের সম্মান লাভ করতো।

বাইটন কাপের ফাইনালে বাটা দলের ঐক্যবদ্ধ খেলা দর্শনীয় হয়। বাঙ্গালোর দলের খেলাও দর্শনীয় হয় এবং তাদের জয়লাভ মোটেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসাবে ধরা চলে না, তাদের জয়লাভ সবদিক থেকেই সঙ্গত এবং শোভন হয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "স্বয়ংসিদ্ধা" (২য় খণ্ড)—৪॥০
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত জীবনী-গ্রন্থ "চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত"—১৲
শ্রীনগেন্দ্রনাথ শেঠ প্রণীত "কৈলাসের পথে"—১৲
গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত নাটক "বিল্বমঙ্গল" (১০ম সং)—২৲
কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রবন্ধ-সমষ্টি "নিশীথ-চিন্তা" (৪র্থ সং)—২॥০
শ্রীশিবানন্দ প্রণীত সমালোচনা গ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস"—৪৲
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বিন্দুর ছেলে" (১৯শ সং)—২৲, "দেনা-পাওনা" (৯ম সং)—৪৲, "শেষ প্রশ্ন" (১৫শ সং)—৫৲
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জীবন-সঙ্গিনী"—২৲
বুদ্ধদেব বসু প্রণীত উপন্যাস "মনের মতো মেয়ে"—২৲
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের "যুগলাঙ্গুরীয় ও অন্যান্য কাহিনী"—১৲

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী আষাঢ় সংখ্যা হইতে 'ভারতবর্ষ' উনচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিবে। বিগত ৩৮ বৎসর যাবৎ 'ভারতবর্ষ' বাংলা সাহিত্যের কিরূপ সেবা করিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদের পাঠকগোষ্ঠীর অবিদিত নয়। আশা করি, সকলে আমাদের সহিত পূর্বের মতোই সহযোগিতা করিবেন।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৭॥০ (+ মণিঅর্ডার ফি ৵০) ও ভিঃ-পিঃতে ৮৴০, ষাণ্মাসিক মণিঅর্ডারে ৪৲, (+ মণিঅর্ডার ফি ৶০)—ভিঃ-পিঃতে ৪॥০, ডাকবিভাগের সাম্প্রতিক ইস্তাহার অনুসারে গ্রাহকগণের নিকট হইতে অনুমতি পত্র না পাইলে ভিঃ-পিঃ পাঠানো যাইবে না। সেইজন্য ভিঃ-পিঃতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** তাহা ছাড়া ভিঃ-পিঃর কাগজ পাইতে অনেক সময় বিলম্ব হয়, ফলে পরবর্তী সংখ্যা পাঠাইতেও বিলম্ব হয়।

আমরা সকল গ্রাহককে আগামী ২০ জ্যৈষ্ঠের মধ্যে মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করিতে সবিনয়ে অনুরোধ করিতেছি। যাঁহারা ভিঃ-পিঃ করিবার জন্য পত্র দিবেন শুধু তাঁহাদিগকেই ভিঃ-পিঃতে কাগজ প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

আশা করি গ্রাহকগণ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আগামী বৎসরের চাঁদা (গ্রাহক নম্বর সহ) মণিঅর্ডারে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। পুরাতন ও নূতন সকল গ্রাহকই অনুগ্রহ পূর্বক মণিঅর্ডার কুপনে পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে গ্রাহক নম্বর দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ 'নূতন' কথাটি লিখিয়া দিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ